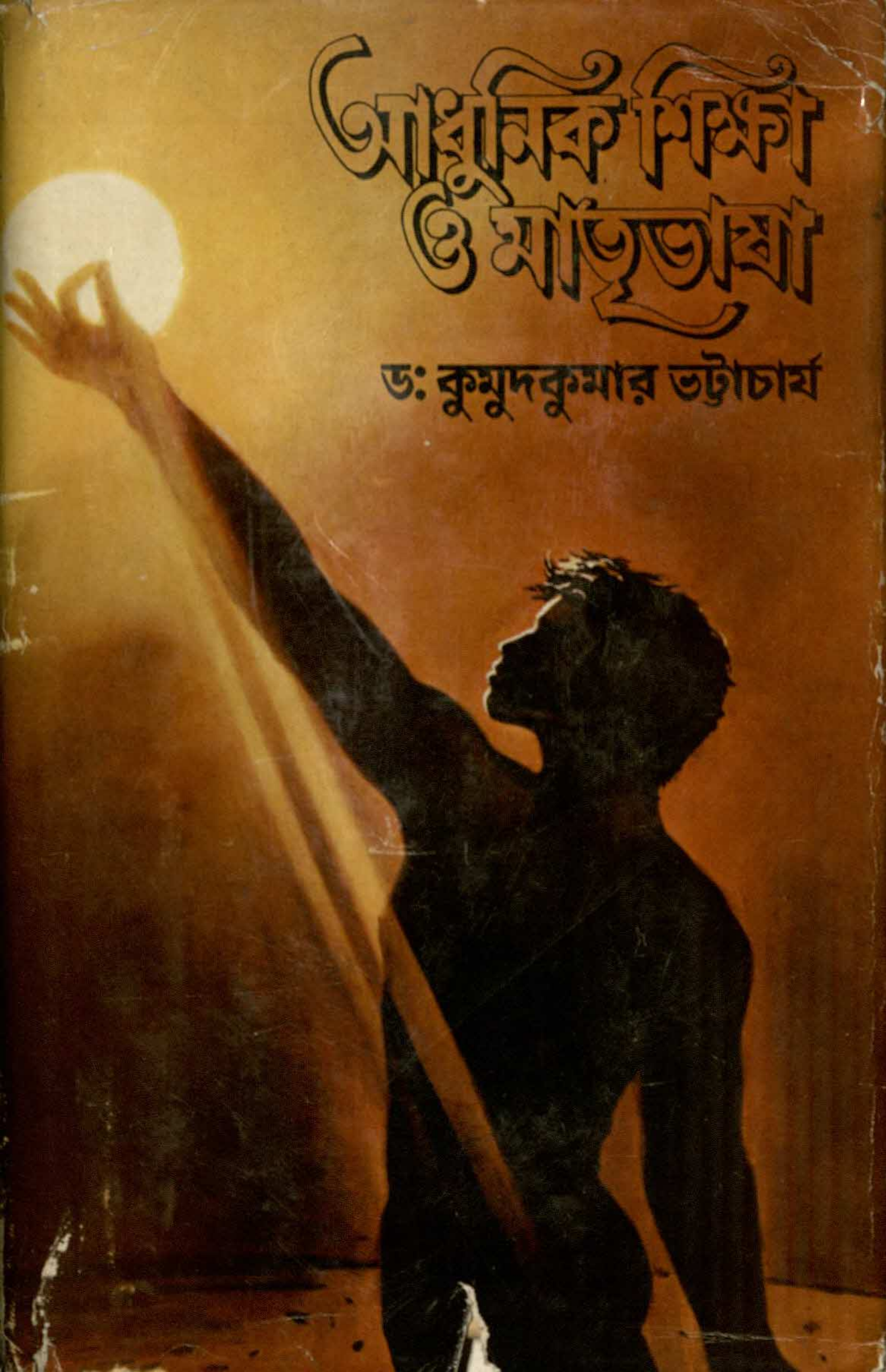
আধুনিক শিক্ষা ও মাতৃভাষা

ডঃ কুমুদকুমার ভট্টাচার্য



আধুনিক শিক্ষা
ও
মাতৃভাষা

বিজ্ঞ পণ্ডিতেরা পড়িতে চান পড়িবেন, কিন্তু তাঁহাদিগের নিমিত্তে এই গ্রন্থ লিখিত হয় নাই।
ইহা তাঁহাদিগের জন্য রচিত হইয়াছে, যাঁহারা মা, মাটি, মানুষ ও মাতৃভাষাকে বিস্মৃত হন নাই।

আধুনিক শিক্ষা ও মাতৃভাষা

ডঃ কুমুদকুমার ভট্টাচার্য

পরিবেষক
দে বুক স্টোর
১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০৭৩

ADHUNIK SIKSHA O MATRIBHASA

[Modern Education and Mothertongue]

by

Dr. Kumudkumar Bhattacharya

প্রথম সংস্করণ

১৫ আগস্ট, ১৯৮২ ॥ ২৯ শ্রাবণ, ১৩৮৯

প্রকাশক

ফণীভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

বর্ণ পরিচয়

২১৪/১, রামাচরণ রায় রোড,

কলকাতা-৭০০,০৩৪

মুদ্রাকর

প্রদীপ হাজরা

শ্রীমুদ্রণ

৪০, শিবনারায়ণ দাস লেন

কলকাতা-৭০০,০০৬

ব্লক

দি রেডিয়েন্ট প্রসেস

প্রচ্ছদ : সজল রায়

মূল্য : ৫০ টাকা

[Rs. 50·00]

শিক্ষাক্ষেত্রে একচেটিয়া শ্রেণী-আধিপত্য
বজায় রাখার স্বার্থে
রাজনৈতিক সংঘর্ষে লিপ্ত
ইংরেজি-সমর্থকদের হাতে
সত্য নিহত।
তার খণ্ডিত-বিকৃত রূপ
জাগ্রত করুক
আমাদের অন্তরে সুতীব্র ঘৃণা।

প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির আক্রমণ সত্ত্বেও
শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে
শিক্ষাঙ্গনে বিত্তহীনদের অধিকার-প্রতিষ্ঠায় অবিচল,
মৌন মূক মুখে ভাষা দেবার স্বপ্ন রূপায়ণকল্পে অনমনীয়,
আন্তর্জাতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ ভারতীয় সর্বহারার
সহজ অস্তিত্ব ও সংস্কৃতিরক্ষার স্থিরলক্ষ্য অভিযানে —
অগ্রণী যোদ্ধা,
নেতা
ও আমাদের বন্ধু
কমরেড প্রমোদ দাশগুপ্ত

শ্রদ্ধাস্পদেষু

সূচীপত্র

এই লেখকের রচিত গ্রন্থ

১. শরৎচন্দ্র ও বাংলার কৃষক

২. উনিশ শতকের নিষিদ্ধ গ্রন্থ ও কবি গোবিন্দ দাস
[রায়ত-কৃষকের ওপরে ভূস্বামীশ্রেণীর অত্যাচার সম্পর্কিত 'মগের মুলুক' কাব্য ও কবি-জীবন সম্পর্কে আলোচনা]

৩. রামমোহন-ডিরোজিও : মূল্যায়ন

৪. বঙ্গদেশের কৃষক ও রাজা রামমোহন
[যন্ত্রস্থ]

ভূমিকা

আমাদের জাতীয় শিক্ষায় মাতৃভাষার স্থান

আমাদের পরাধীনতার কলঙ্ক ঘুচেছে পঁয়ত্রিশ বৎসর আগে। কিন্তু অশিক্ষা ও নিরক্ষরতার অন্ধকার নিরসনের আন্তরিক প্রয়াস এখনও দেখা যায়নি কোথাও। অথচ আমাদের কষ্টার্জিত স্বাধীনতা ও বহুঘোষিত গণতন্ত্র একান্তভাবেই নির্ভর করে জনশিক্ষার উপরে। যে দেশে শতকরা সত্তর-আশি জন মানুষ নিজের নাম লিখতে বা অন্যের নাম পড়তেও পারে না, ভারতবর্ষ বা পশ্চিম বাংলা বলতে কি বোঝায় বা সংসদ, বিধানসভা, মন্ত্রী, ভোট, নির্বাচন ইত্যাদি শব্দের তাৎপর্য কি, এসব বিষয়ে সুনিবিড় অন্ধকার যে দেশে প্রায় সর্বজনীন, সে দেশে সর্বজনের ভোটাধিকার ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মতো প্রহসন পৃথিবীর আর কোথাও কখনও হয়েছে কিনা জানি না। এই দেশব্যাপী অশিক্ষার বোঝা নিয়ে পৃথিবীর বৃহত্তম গণতন্ত্র চালাবার প্রয়াসকে একটা বিরাট প্রহসনমাত্র মনে করলেও ভুল হবে। এ প্রয়াস শোকাবহ তথা ভয়াবহ। বিপুল জনসংখ্যা ও অশিক্ষার ক্রমবর্ধমান বোঝা নিয়ে আমাদের জাতীয় তরণী একদিন বিনাশের মধ্যে তলিয়ে যেতে পারে, এই আশঙ্কা অমূলক নয়। উচ্চশিক্ষা-মানের ক্রমাবনতি ও জনশিক্ষার অব্যাপ্তি, এই দুই অন্তরায় আমাদের দেশে প্রতিভা-বিকাশের পথ অবরুদ্ধ করে রেখেছে। কোটি কোটি অশিক্ষিত মানুষের মধ্যে যে বিপুল পরিমাণ মনঃশক্তি ও প্রতিভা-বিকাশের সুযোগ না পেয়ে ব্যর্থতার মধ্যে বিলীন হয়ে যাচ্ছে, আমাদের রাষ্ট্র-নায়কদের মধ্যে সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সচেতনতা আছে বলে মনে হয় না। দেশকে শক্তিশালী করে গড়ার কথা অহরহঃ শুনতে পাই। কিন্তু শুধু জড়শক্তি দিয়ে একটা জাতিকে কখনও শক্তিশালী করা যায় না; যদিও বা যায়, সে শক্তি পরিণত হয় আসুরিক শক্তিতে—ইতিহাসে মাঝে-মাঝে এই শক্তির আবির্ভাব হয় চরম বিনাশের অগ্রদূত রূপে। যে শক্তি একটা জাতিকে কল্যাণের পথে, অভ্যুদয়ের পথে চালনা করে সে শক্তি আসুরিক শক্তি নয়, তা মানবিক শক্তি। তার জন্য চাই মানুষের মনঃশক্তির বিকাশ, তার অন্তর্নিহিত প্রতিভার বিকাশ। জাতীয় চিত্তবিকাশ নির্ভর করে বহুব্যাপ্ত জনশিক্ষার উপরে।

জনশিক্ষার প্রধান অবলম্বন ভাষা। কিন্তু কোন্ ভাষা? বলা বাহুল্য, একটা দেশের প্রতিটি মানুষ শিশুকাল থেকে যে ভাষায় অভ্যস্ত, যে ভাষার যোগে সে মানুষকে ও বিশ্বপ্রকৃতিকে চিনেছে এবং যে ভাষায় সে শৈশবকাল থেকে আত্মপ্রকাশ করে এসেছে এবং যে ভাষায় সে অন্য সকলের সঙ্গে ভাব-বিনিময় ও কাজ-কারবার করে থাকে, সে ভাষা। ব্যাপক জনশিক্ষার বাহন হিসাবে এই পর্যায়েই যাঁরা অচেনা বিদেশী ভাষাকে শিশুর উপরে চাপিয়ে দিতে চান, আমি বিনা দ্বিধায় বলব তাঁদের মন মোহগ্রস্ত তাঁদের দৃষ্টি সংকীর্ণ, তাঁদের চিন্তা সুনীতিভ্রষ্ট। যে সব পরিবারের প্রতিটি মানুষ আশৈশব ইংরেজিভাষায় অভ্যস্ত, ইংরেজি ভাবনা-চিন্তা যাঁদের মজ্জাগত, এক কথায় যাঁরা প্রথমাবধি ইংরেজি বা অন্য কোনো বিদেশী ভাষাকে দ্বিতীয় মাতৃভাষা হিসাবে আয়ত্ত করেছেন, তাঁরা যদি তাঁদের ছেলেমেয়েদেরও অনুরূপভাবে প্রথমাবধি বিদেশী ভাষা শেখাতে চান, আমি আপত্তি করব না। কারণ যে সব পরিবারের মনোমণ্ডলে বাংলা ও ইংরেজি ভাবনা-চিন্তার হাওয়া সমানভাবে চলে, সে সব পরিবারের ছেলেমেয়েদের পক্ষে বাংলার সঙ্গে ইংরেজি আয়ত্ত করা খুব কঠিন হয় না। চিরাগত পারিবারিক সংস্কার ও চিন্তাধারাই ভিতরে ভিতরে তাদের মনে আগ্রহ ও শক্তি যোগায়। কিন্তু যে সব পরিবারের মানুষ (গ্রামে বা শহরে) পুরুষানুক্রমে নিরক্ষর যাদের কাছে মাতৃভাষার লিখিত রূপটাও বিদেশী ভাষার মতোই অচেনা ও দুর্জ্ঞেয়, তাদের বেলাতেও শিক্ষার প্রাথমিক স্তরে ইংরেজি-ভাষাকে অবশ্য শিক্ষণীয় করার প্রস্তাব শুধু যে হৃদয়হীনতারই পরিচায়ক তা নয়, তাতে শিক্ষানীতিগত অবিবেচনাও প্রকাশ পায়। যে ভাষা মানুষের প্রাত্যহিক জীবনচর্যার প্রধান অবলম্বন, সে ভাষাই হবে তাদের শিক্ষার ও মননচর্যার একমাত্র বাহন —এই নীতি স্বতঃ স্বীকার্য বলেই মনে করি।

কোনো জাতির জীবনের ভাষা ও মননের ভাষা অভিন্ন না হলে সে জাতি একাত্মক সংহতি লাভে বঞ্চিত হয়ে ইতিহাসে ধিক্কৃত হয়। কাজের ভাষা ও জ্ঞানের ভাষা পৃথক হলে জাতীয় চিত্ত দ্বিধাবিভক্ত হয়। উপরের স্তরে থাকে শিক্ষিত জ্ঞানী সম্প্রদায় আর নীচের স্তরে থাকে অশিক্ষিত কর্মী সম্প্রদায়। জ্ঞান ও কর্মের এই বিচ্ছেদ কোনো জাতির পক্ষে কল্যাণকর হতে পারে না। বিপুল পরিমাণ অজ্ঞতার টানে সামগ্রিকভাবে জাতীয় অগ্রগতি ব্যাহত হয়। তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ, ইংরেজি-শাসিত বাঙালি জাতির প্রায় দুই শত বৎসরের ইতিহাস। এই সময়ে ইংরেজি-শিক্ষার ফলে আমাদের যে অভ্যুদয় ঘটেছে তার মহিমা কতখানি তা কারও অজানা নেই। সেই

মহিমার কথা আজও নানা কণ্ঠে তারস্বরে ঘোষিত হচ্ছে। কিন্তু এই বিষমিশ্রিত অমৃত সেবনের ফলে জাতীয় জীবনে যে দুরারোগ্য ব্যাধি দেখা দিয়েছে সে বিষয়ে আমরা কিছুমাত্র সচেতন নই। বস্তুতঃ ইংরেজি-শিক্ষার সুফলের চেয়ে তার কুফলটাও যে কিছুমাত্র কম নয়, সেটুকু বোঝবার ক্ষমতাও আমরা হারিয়েছি। তা বুঝতে পেরেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, আশুতোষ প্রমুখ কয়েকজন মনস্বী। আজ আমরা তাঁদের কথাও ভুলতে বসেছি।

একটু ভেবে দেখলে বোঝা যাবে, ইংরেজিভাষার মোহ ইংরেজিবিদ্যা-লাভের সুফল থেকে আমাদের বঞ্চিত করেছে। ইংরেজিভাষা-শিক্ষা আর ইংরেজিবিদ্যা-লাভ যে এক বস্তু নয়, তা আমরা এখনও বুঝতে পারিনি। জাপানিরা বুঝেছিল প্রথম থেকেই। তাই তারা ইংরেজিভাষার মোহে না পড়েই ইংরেজিবিদ্যাটুকু আয়ত্ত করে নিয়েছে পুরো মাত্রায়। ইংরেজ এদেশ শাসনের ভার হাতে নিয়েছিল তাতে শোষণের সুবিধা হবে বলেই। শাসন এবং শোষণ —এই উভয় প্রয়োজনেই তারা নিজেরা স্থানীয় ভাষা না শিখে স্থানীয় লোকদের ইংরেজি শেখাবার নীতি গ্রহণ করল। তাই ব্যবস্থা হল ইংরেজের শাসনবিভাগে বা বাণিজ্যবিভাগে চাকরি পেতে হলে ইংরেজি শিখতে হবে। তখন থেকেই চাকরি-প্রাপ্তির সঙ্গে ইংরেজি শেখার যে শর্ত যুক্ত হয়ে আছে, আজও তার অবসান হয়নি। এখনও অধিকাংশ লোক ইংরেজি শেখে চাকরি পাবার জন্য, জ্ঞানলাভের জন্য নয়। যদি জ্ঞানদানই শাসকদলের অভিপ্রায় হত তবে ইতিহাস-বিজ্ঞানাদি সব বিদ্যা, এমন কি ইংরেজিভাষাও শেখানো হত মাতৃ-ভাষার যোগে। সব সভ্যদেশেই এই শিক্ষানীতি চলে। যদি তা করা হত তবে ইতিহাস-বিজ্ঞানাদি সব বিদ্যাই অল্প সময়ের মধ্যেই ছড়িয়ে পড়ত দেশের সর্বত্র, ইংরেজিভাষাও শিখত অনেক বেশি লোক আর বাংলা সাহিত্যও অনেক বেশি সমৃদ্ধ হত। চাকরি-প্রাপ্তিই শিক্ষালাভের একমাত্র বা প্রধানতম লক্ষ্য বলে গণ্য হত না। তাছাড়া জাতীয়তাবোধ এবং স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র লাভের স্পৃহা জাগত অনেক ব্যাপক ও প্রবলভাবে। ফলে ইংরেজ-শাসনের অবসানও ত্বরান্বিত হত। বুদ্ধিমান ইংরেজ-শাসকরা এটা সহজেই বুঝতে পেরেছিল। তাই তাদের শিক্ষাব্যবস্থায় ইংরেজিভাষা-শিক্ষাকে দুঃসাধ্য এবং অন্যান্য পাশ্চাত্য বিদ্যাকে দুষ্প্রাপ্য করে রাখা হয়েছিল সুচতুরভাবে। এজন্য বলেছি তারা আমাদের জ্ঞানের অমৃত দিয়েছিল, কিন্তু একটু বিষ মিশিয়ে। তারা আমাদের গণতন্ত্রের অমৃতও দিয়েছে একটু-একটু করে, সাম্প্রদায়িকতার বিষ মিশিয়ে এবং ক্রমে-ক্রমে তার মাত্রা বাড়িয়ে। অবশেষে যখন দেশকে স্বাধীনতা দিয়ে গেল,

তখনও তার সাথে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও দেশবিভাগের তিক্ত বিষ মেশাতে ত্রুটি করেনি। অধিকন্তু তার সাথে তফশীলী স্বাতন্ত্র্যবোধের বিষয়ও যুক্ত হল। এই হল ইংরেজ-শাসন ও ইংরেজি-শিক্ষার নিট ফল।

স্বাধীনতা-লাভের সাড়ে তিন দশক পরেও আমরা ইংরেজি-শিক্ষার বিষক্রিয়ার প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারিনি। তাই আমাদের সরকারি আপিসে-আদালতে ইংরেজির ব্যবহার প্রায় পূর্ববৎ বহাল আছে। আমাদের জাতীয় সংবিধানের বাংলা রূপও বোধ করি এখনও পর্যন্ত অপ্রাপ্যই রয়ে গেছে। যতদিন এই অবস্থা চলবে ততদিন আমাদের ইস্কুল-কলেজে ইংরেজিভাষা শিক্ষার স্থান ও মান কি হবে, তা নিয়ে বিবাদ-বিতণ্ডায় দেশের শান্তি নষ্ট করে লাভ কি? যতদিন মানুষের দৈনন্দিন ব্যবহার তথা জীবিকার্জনের ক্ষেত্রে ইংরেজির মর্যাদা অটুট থাকবে, ততদিন দেশে ইংরেজিভাষা শেখার আগ্রহও প্রবল থাকবেই। জীবিকার ক্ষেত্রে ইংরেজিকে বহাল রেখে শিক্ষার ক্ষেত্রে তাকে বাতিল বা খর্ব করার প্রয়াসকে বাতুলতা ছাড়া আর কি বলা যায়?

পূর্ব বাংলার মানুষ স্বভাষার মুক্তির জন্য লড়াই করেছে, প্রাণ দিয়েছে। ফলে সেখানে আজ সরকারি ও বেসরকারি ব্যবহারে বাংলাভাষার মর্যাদা অবিতর্কিত ও প্রতিষ্ঠিত। সেখানে টাইপ-রাইটারের অভাব ও পরিভাষার প্রশ্ন কখনও সমস্যা বা অন্তরায় বলে মনে হয়নি। আর তারই ফলে সেখানে শিক্ষার ক্ষেত্রে ইংরেজি ও বাংলা নিয়ে মর্যাদার লড়াইও দেখা দেয়নি। বস্তুতঃ সেখানে আজ শিক্ষার সর্বোচ্চ পর্যায়েও বাংলাভাষার অধিকার প্রায় সুপ্রতিষ্ঠিত। অবশ্য আরও কিছু বিশেষ ঐতিহাসিক কারণেও সেখানে এই অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির সহায়তা হয়েছে। এখানে সে প্রসঙ্গ তোলা অনাবশ্যক।

পশ্চিম বাংলায় লড়াইটা হয়েছিল স্বদেশের মুক্তির জন্য, স্বভাষার মুক্তির জন্য নয়। এখানে বাংলাভাষা প্রত্যক্ষতঃ কোনো বহিঃশত্রুর আক্রমণের সম্মুখীন হয়নি। ইংরেজিভাষা আমাদের অন্তরেই ঘাটি গেড়ে বসেছিল দীর্ঘকাল পূর্ব থেকে। তাই বঙ্কিমচন্দ্র, গুরুদাস, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ মনস্বীরা যখন শিক্ষায় বাংলার এলাকা আর-একটু বাড়াবার প্রস্তাব করেন, তখন তাঁদের এই প্রস্তাবকে প্রতিহত করেছিলেন ইংরেজি-শিক্ষিত বঙ্গসন্তানরাই। আজও সে অবস্থার খুব বেশি পরিবর্তন হয়নি। যতদিন জীবিকা ও জীবনচর্যার প্রতি ক্ষেত্রে ইংরেজিভাষার এই অসপত্ন প্রভাব চলতে থাকবে, ততদিন শিক্ষার ক্ষেত্রে তার দাপট কমাবার আশা দুরাশা মাত্র। আর শিক্ষার কোনো স্তরেই মাতৃভাষাকে প্রতিদ্বন্দ্বিহীন করার ইচ্ছাও দুঃস্বপ্ন বলেই গণ্য হবে।

কিন্তু কাল বসে নেই। ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে অভিনয়-পালারও শেষ নেই। ভারতবর্ষের ইতিহাসে ইংরেজ-রাজত্বের পালা সদ্য শেষ হয়েছে। কিন্তু এখনও তার কিছু ছায়া, আর কিছু মায়া আমাদের জাতীয় চিত্তকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। তবে তাও ক্রমে-ক্রমে মিলিয়ে যাবে ভারতীয় জীবনের পটভূমি থেকে। তার বহু মূল্যবান ঐতিহাসিক ভগ্নাবশেষ অবশ্য সঞ্চিত হয়ে থাকবে জাতীয় স্মৃতির যাদুঘরে। কিন্তু বাঙালির জাতীয় জীবনে তার সক্রিয় প্রভাব একদিন নিঃশেষে বিলীন হয়ে যাবেই। তবু ইংরেজ-শাসনের উত্তরাধিকার হিসাবে এমন কিছু-কিছু ধ্যান-ধারণা ও অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানাদি থেকে যাবে যা আমাদের জীবন-ধারার সঙ্গে বেমালুম মিশে যাবে। ইংরেজের জাতীয় জীবনেও অনেক ফরাসি ধ্যানধারণাদি মিশে গেছে। তুরকি-পাঠান ও পোর্তুগীজদের কাছ থেকে আমরা এমন অনেক-কিছু পেয়েছি যা এখনও আমাদের প্রাত্যহিক জীবনচর্যা ও চিন্তা-ভাবনায় মিশে রয়েছে। তাতে আমাদের জাতীয় জীবন সমৃদ্ধই হয়েছে, হীনবল হয়নি। অনুরূপভাবে ইংরেজ-রাজত্বের উত্তরাধিকার হিসাবেও অনেক কিছুই আমাদের জীবনধারায় সম্পদ ও শক্তি যোগাবে, বহিরঙ্গের বোঝা হয়ে থাকবে না। এইসব উত্তরাধিকারের প্রধানতম হল ইংরেজিভাষা। আমাদের ভাবী জীবনে তার স্থান ও মান কি হবে তা ভেবে দেখা দরকার। বলা বাহুল্য, যতদিন যাবে আমাদের জাতীয় জীবনযাত্রার প্রত্যেক ক্ষেত্রেই —আইন-আদালতে, সরকারি ও বেসরকারি নানা কাজকর্মে বাংলাভাষা তার আপন অধিকার প্রতিষ্ঠিত করবেই। এ সব ক্ষেত্র থেকে ইংরেজিভাষাকে সরে যেতে হবে। কিন্তু জ্ঞানার্জনের এবং আন্তর্জাতিক যোগাযোগের উপায় হিসাবে ইংরেজির মর্যাদা বর্তমানের চেয়ে অনেক বেশি হবে। দেশে শিক্ষা-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজি-শিক্ষার্থীর সংখ্যাও স্বভাবতঃই অনেক বেড়ে যাবে। কারণ কালপ্রভাবে জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্র এবং আন্তর্জাতিক যোগাযোগের পরিধি যত বাড়বে বিদেশী ভাষা শেখার প্রয়োজনীয়তাও তত বাড়বে। তবে শুধু ইংরেজি নয়, তখন ফরাসি, জরমান, রুশীয় প্রভৃতি ইউরোপীয় ভাষা এবং চীনা জাপানি, আরবি, ফারসি প্রভৃতি এশীয় ভাষা শেখার প্রয়োজনীয়তাও দেখা দেবে। শুধু ইংরেজের চোখে দুনিয়াকে ঠিক মতো চেনা যাবে না। বিশ্বকে দেখতে হবে বিশ্বতোমুখী দৃষ্টি নিয়েই ; দুনিয়ার কোনো উন্নত বা বহুজন-কথিত ভাষাকেই উপেক্ষা করা চলবে না। তবে একথাও মানতে হবে যে, দুনিয়ার সব ভাষার পুরোভাগে থাকবে ইংরেজির স্থান। কারণ গুণের বিচারে না হলেও ব্যাপকতার বিচারে এখন ইংরেজি সর্বপ্রধান আন্তর্জাতিক ভাষার মর্যাদা লাভ

করেছে। ভবিষ্যতেও তার এই মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হবার কোনো সম্ভাবনা দেখা যায় না। বরং ক্রমবর্ধমান জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভাণ্ডার হিসাবে ইংরেজিভাষা আরও সমৃদ্ধ হবার সম্ভাবনাই দেখা যায়। ফলে ভারতবর্ষেও ইংরেজিশিক্ষার মান ও প্রসার বাড়াতেই হবে, কমাবার কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না। কমাবার চেষ্টামাত্রই হবে ক্ষতিকর। উন্নততর ও ব্যাপকতর ইংরেজি (ও অন্যান্য সমৃদ্ধ বিদেশী ভাষা) শিক্ষার একটি প্রধান লক্ষ্য হবে তার কল্যাণকর প্রভাবে বাংলা প্রভৃতি প্রাদেশিক ভাষা ও সাহিত্যের শক্তি ও সমৃদ্ধি উত্তরোত্তর বাড়ানো। তার সুফল ফলবে দুই উপায়ে —প্রথমতঃ সমস্ত ভারতবর্ষের জাতীয় চেতনায় ও প্রাদেশিক সাহিত্যগুলিতে দেখা দেবে চিন্তা ও ভাবগত সমতা এবং প্রাদেশিক চিন্তা ও ভাববিনিময়ের পথ হবে প্রশস্ত ও সুগম। তাতে প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্যবোধের উগ্রতা ঘুচে যাবে আর সব প্রাদেশিক সংস্কৃতির সমন্বয়ে বিকশিত হবে এক ও অভিন্ন ভারতীয় সংস্কৃতি-চেতনা এবং একজাতীয়তাবোধ। দ্বিতীয়তঃ, সর্বজনীন লোকশিক্ষার প্রভাবে এবং প্রত্যেকটি সমৃদ্ধ প্রাদেশিক সাহিত্যের যোগে একদিকে আধুনিক বিশ্বের সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান, আর অন্যদিকে সর্বত্র ভারতীয় জাতীয় চেতনা ও সাংস্কৃতিক ঐক্যবোধ সঞ্চারিত হবে প্রত্যেক প্রদেশের নীচুতলার সামাজিক জীবনে। ইউরোপের দেশগুলিতেও অধুনাপূর্বকালে ইতিহাসের প্রভাবে ও আধুনিক কালে পারস্পরিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্যের পারস্পরিক যোগাযোগ ও বিনিময়ের ফলে সর্ব-ইউরোপীয় সাংস্কৃতিক ঐক্যবোধ সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অথচ সেখানে রাষ্ট্রীয় ঐক্য-প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা এখনও কল্পনাতীত। এ বিষয়ে ভারতবর্ষের ভাগ্য অনেক ভাল। ভারতবর্ষের ভৌগোলিক ঐক্য, সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার ও ঐতিহাসিক প্রবণতা সর্ব যুগেই এখানে একটি দেশব্যাপী মহারাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আনুকূল্য করেছে। এখানে রাষ্ট্রীয় ঐক্য-প্রতিষ্ঠার কল্পনা, ইচ্ছা ও প্রয়াস ইতিহাসের প্রতি পর্বেই সক্রিয় ছিল। ভারতবাসীর মনের এই গভীর আকূতি এবং ইতিহাসের এই প্রবণতাই ইংরেজের ভারতব্যাপী সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠার সহায়তা করেছে। মধ্যযুগে তুরকি-পাঠানের আধিপত্য ও বিদেশী সংস্কৃতির প্রাধান্য একদিকে ভারতবর্ষের চিরাগত সংস্কৃতির স্বাভাবিক অগ্রগতি ও পরিণতিকে নিরস্ত করেছে, আর অপরদিকে সমগ্র ভারতবর্ষে একরাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠার ব্যর্থতা দেশের বিভিন্ন প্রান্তে সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিনিময়ের পথেও অন্তরায় ঘটিয়েছে। ইংরেজ-রাজত্বকালেও অনেক পরিমাণে তাই হয়েছে — ভারতীয় সংস্কৃতির স্বাভাবিক বিকাশের অগ্রগতি ব্যাহত হয়েছে এবং বিভিন্ন

প্রদেশের মধ্যে পারস্পরিক ভাব-বিনিময়ের পথ হয়েছে প্রায় রুদ্ধ। পক্ষান্তরে ইংরেজ-রাজত্বকালে ভারত-ইতিহাসের যে ঐক্যাভিমুখী গতি সমগ্র দেশকে তার চিরাভীষ্ট লক্ষ্যের কাছাকাছি নিয়ে যাচ্ছিল কূটবুদ্ধি শাসকবৃন্দ দেশ-বিভাগের দ্বারা সে গতিকে স্তব্ধ করে দিয়ে গেছে। তাছাড়া, একদিকে পূর্বাগত দেশীয় জনশিক্ষা-ব্যবস্থার বিলোপ ঘটিয়ে শিক্ষিত-অশিক্ষিতের ব্যবধানকে প্রায় দুর্লজ্ঘ্য করে গেল, আর অপরদিকে বিভিন্ন প্রদেশের সংস্কৃতি ও সাহিত্যের স্বাভাবিক যোগসূত্রগুলিকেও ছিন্ন করে দিল। ফলে পরাধীন ভারতবর্ষে একপ্রকার কৃত্রিম রাষ্ট্রীয় ঐক্য এবং বিদেশী শিক্ষালব্ধ একপ্রকার অগভীর সাংস্কৃতিক ঐক্য দেখা গেল জাতির বহিরঙ্গে। এই রাষ্ট্রীয় বা সাংস্কৃতিক ঐক্য কখনও জাতির অন্তরে মূল প্রবেশ করাতে বা জাতীয় ঐতিহ্য থেকে প্রাণরস আহরণ করতে পারেনি। তাই পরপ্রদত্ত স্বাধীনতা প্রাপ্তির পঁয়ত্রিশ বৎসর পরেও দেশের অভ্যন্তরীণ অশুভ অনৈক্যগুলির বীভৎস প্রকাশ দেখা যাচ্ছে প্রায় সর্বত্র ও সর্বদা। তবু এই ঠুনকো ঐক্যের মহিমাতেই যে আমরা পরিতৃপ্ত হয়ে আছি তার মূলে আছে বিদেশী প্রদত্ত ইংরেজি-শিক্ষার মোহ, যে শিক্ষা সম্পর্কে ভারতপ্রাণা ভগিনী নিবেদিতা একদা (১৯০১ খৃঃ, জুলাই) উচ্চারণ করেছিলেন এই কঠোর উক্তি—"তার ঘাড় ধরে ভারতকে আফিম-মেশানো মিষ্টি সরবত খাইয়ে তার নাম দিচ্ছে 'শিক্ষা'।" এই শিক্ষার মায়াতেই আমাদের শিক্ষিত সমাজের চিত্তে সাড়ে তিন দশক পূর্বে অপগত পরাধীনতার মলিন ছায়া এখনও অনড় হয়ে আছে। এই বিজাতীয় কৃত্রিম শিক্ষার মোহ আমাদের কাটাতেই হবে—একথা বারবার বলে গেছেন রবীন্দ্রনাথ, তাঁর নানা প্রবন্ধে, বিশেষতঃ 'বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ', 'শিক্ষার বিকিরণ' ও 'শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ' এই তিন প্রবন্ধে। তাই তিনি দেখে যেতে চেয়েছিলেন একটি বাংলা-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিশু মূর্তি, যে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার প্রতি স্তরে ও প্রতি বিষয়ে বিদ্যাচর্চার ও গবেষণার একমাত্র বাহন হবে বাংলাভাষা (অর্থাৎ মাতৃভাষা)। সেখান থেকে ইংরেজিভাষাকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করা হবে না। বরং ইংরেজি প্রভৃতি সব সমৃদ্ধ ভাষাকে বসানো হবে যথাযোগ্য মর্যাদার আসনে। কিন্তু এইসব ভাষার চর্চা হবে বাংলাভাষার যোগে।

ইস্কুল বা কলেজ থেকেও ইংরেজিভাষাকে অবশ্যই বিদায় করা হবে না; বরং সযত্নেই শেখানো হবে। বলা বাহুল্য, সব সভ্যদেশের মতোই আমাদের দেশেও ইংরেজি শেখাতে হবে মাতৃভাষার যোগেই। অর্থাৎ ইংরেজিভাষার ব্যাকরণও লিখতে হবে বাংলায় এবং শেখাতেও হবে বাংলাতেই। আশা করি

কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তিই ইংরেজি শেখাবার এই প্রণালী সম্পর্কে আপত্তি করবেন না। কিন্তু আসল সমস্যা হচ্ছে দুটি —এক, কোন্ স্তর থেকে ইংরেজি শেখানো শুরু হবে এবং দুই, ইংরেজি-শিক্ষার মান কি হবে? এ বিষয়ে আমার মত কি তা একে-একে জানাচ্ছি।

মাতৃভাষার ব্যাকরণ অর্থাৎ সে ভাষার গঠনরীতি ও কলাকৌশল মোটামুটি আয়ত্ত হবার পরেই (সাধারণত এগারো-বারো বছর বয়সে) আসে অন্য ভাষা শেখার যথার্থ সময়। এক ভাষার সহায়তায় অন্য ভাষা শেখা সহজ হয়। তখনই অন্য ভাষা শিক্ষা করা যায় বিনা ক্লেশে ও অল্প সময়ে। এজন্যই আমার অভিজ্ঞতাজাত সুচিন্তিত মত এই যে, শিক্ষার প্রাথমিক স্তরে মাতৃভাষা ব্যবহারের প্রাথমিক নিয়মকানুনগুলি শেখার পূর্বে শিশুদের উপরে অন্য ভাষা শেখার বোঝা চাপিয়ে না দেওয়াই সমীচীন। তাতেই তাদের বিদ্যা-অর্জনের পথ সুগম হয়। দ্বিতীয় ভাষা শেখাটাই তো বিদ্যা-অর্জন নয়, বিদ্যা-অর্জনের দ্বিতীয় (হয়তো প্রশস্ততর) পথ মাত্র। প্রথম থেকেই দুই পথে চলার অভ্যাস করতে গেলে বিদ্যালাভের সুসময়টাকেই পিছিয়ে দেওয়া হয়। একেই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'শিক্ষার হেরফের'। অধিকতর ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন।

তবে আমি স্বীকার করি, এই সাধারণ শিক্ষানীতির কিছু ব্যতিক্রম থাকতে পারে। যে-সব পরিবারে জীবিকার্জন বা জ্ঞানার্জনের প্রয়োজনে অথবা অন্য যে-কোনো কারণেই হোক ইংরেজি শেখার আগ্রহ নিত্যসচল, সে-সব ইচ্ছুক ছেলেমেয়েদের ইংরেজি শেখার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা অনুচিত মনে করি। কিন্তু একথাও মনে রাখতে হবে যে, দেশের বিপুল জনসংখ্যার তুলনায় ইংরেজি-হাওয়ায় প্রতিপালিত শিশুদের সংখ্যা অতি সামান্য। তাছাড়া সরকারি বা বেসরকারি কর্মক্ষেত্র এবং আমাদের সাধারণ জীবনচর্যা থেকে ইংরেজি ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা কালক্রমে যতই কমবে, প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে ইংরেজি-শিক্ষার্থীর সংখ্যাও ততই কমে যেতে থাকবে। বাকি থাকবে শুধু জ্ঞানার্জনের তথা আন্তর্জাতিক যোগাযোগের উপায় হিসাবে ইংরেজি (এবং অন্যান্য বিদেশী ভাষা) শেখার প্রয়োজনীয়তা। এ দুই ক্ষেত্রে আসবে শুধুই মেধাবী শিক্ষার্থীরা আর মেধাবী শিক্ষার্থীর সংখ্যা কোনো জাতির মোট জনসংখ্যার একটা ক্ষুদ্র ভগ্নাংশের বেশি হয় না। আমাদের দেশেও হবে না। অবশ্য এ-রকম মেধাবী শিক্ষার্থীর সংখ্যা যত বেশি হয় ততই ভাল। তবু সে-সংখ্যা মোট জনসংখ্যার একটা সামান্য ভগ্নাংশই থেকে যাবে। এই স্বল্পসংখ্যক মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য উঁচু মানের ইংরেজি প্রভৃতি বিদেশী ভাষা

শেখাবার সুবন্দোবস্ত রাখতেই হবে। শুধু তাই নয়, এই মেধাবীদের সংখ্যা ও শিক্ষার মান যাতে ক্রমেই বাড়ে সে-দিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে। নতুবা দেশের ক্রমাগ্রগতি অব্যাহত থাকবে না।

একটা কথা প্রায়ই বলতে শোনা যায় যে, অতি অল্প বয়সটাই অ-মাতৃভাষা শেখার সবচেয়ে ভাল সময়। তাই শিক্ষার প্রথম স্তরেই ইংরেজি শেখানো উচিত। এই থিওরিটা অর্ধসত্য মাত্র। কাঁচা বয়সে শিশুরা যা শোনে তাই বলতে শিখে যায়, উচ্চারণভঙ্গিটাও সহজে আয়ত্ত করে ফেলে। কিন্তু এ-শেখাটা অনেকটা তোতাপাখির ভাষা শেখার মতো। আমি এমন এক বাঙালি শিশুকে জানি যে চার থেকে ছয় বছর বয়সে বাংলা নিয়ে মোট পাঁচটা ভাষা বলতে পারে। থাকে বম্বে শহরে এক বহুভাষী পরিবেশে। ফলে পাড়ার সকলের সঙ্গে মেলামেশা করতে-করতে মারাঠি, গুজরাটি, হিন্দি এবং ইংরেজিভাষা অনর্গল বলতে পারে। কিন্তু একে ভাষা-শেখা বলা যায় না। বাঙালির ছেলে তো দেড় থেকে আড়াই বা তিন বছর বয়সে তার জ্ঞানবুদ্ধি বিকাশের সমানুপাতে সব বাংলা কথাই বোঝে ও বলতে পারে, সে-বাংলায় যদি ইংরেজি কথা মেশানো থাকে তবে সে সে-সব ইংরেজি কথাগুলিও বোঝে এবং বলেও। একেই যদি ভাষা-শেখা বলা হয় তবে একটা নির্দিষ্ট বয়সে তাকে আবার বাংলা শিখতে হয় কেন শিক্ষকের কাছে? ইংরেজ ছেলেকেও একটু বড় হয়ে আবার ইংরেজি শিখতে হয়। নতুবা সে অশিক্ষিতই থেকে যায়। বাল্যকালে পরিবেশের প্রভাবে স্বভাষা বা পরভাষা প্রায় আপনা থেকেই ছেলেমেয়েদের মনে মুদ্রিত হয়ে যায় তাকে যথার্থ ভাষা-শিক্ষা বলা যায় না। স্বভাষা বা পরভাষার ব্যাকরণগত কলাকৌশল বুঝে নিয়ে সে-ভাষা প্রয়োগ করতে (মৌখিক বা লিখিতভাবে) শিখলে তবেই তাকে বলা যায় ভাষা-শিক্ষা। স্বভাষার ব্যাকরণ-জ্ঞানের সহায়তাতেই পরভাষা আয়ত্ত করা সহজসাধ্য হয়। পরভাষার ব্যাকরণ আগে আয়ত্ত হলে স্বভাষাও স্বভাবতই শিখতে হয় সে-জ্ঞানের সহায়তায়। ইংরেজি-মিডিয়াম ইস্কুলে আজকাল আমাদের অনেক ছেলেমেয়েদেরই বাংলা শিখতে হয় ইংরেজি ভাষা-জ্ঞানের সহায়তায়, তাও আমি জানি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকেই। এই বিপরীত প্রণালীতে স্বভাষা শেখাবার ব্যবস্থা আমাদের শিক্ষা-নায়কদের রুচিবোধের পরিচায়ক কিনা সে-বিষয়ে আমি কিছু বলতে চাইনে। দুই ভাষা অল্প বয়সে শেখাতে গেলে যে বিচিত্র পরিণাম হয় তারও প্রত্যক্ষ জ্ঞান আমার আছে। আমার দিকে একটু lookও (look+তাকাও), ওটা আমার হাত থেকে

'গিরে' (পড়ে) গেছে, চিঠিটা 'ভেজে' (পাঠিয়ে) দিয়েছি, ইত্যাদি রকম অনেক দৃষ্টান্ত আমার জানা আছে। শুধু শব্দ নয়, এক ভাষার ইডিয়ম যখন অন্য ভাষায় চালানো হয় তখন সে আরও হাস্যকর হয়। প্রসঙ্গক্রমে বলা উচিত যে, বাংলা-ইংরেজির মিশ্রণের চেয়ে বাংলা-হিন্দির মিশ্রণ ঘটে অনেক বেশি। কারণ বাংলার সঙ্গে হিন্দির সম্পর্ক ইংরেজির চেয়ে নিকটতর। অল্প বয়সে দুই ভাষা একসঙ্গে বা প্রায় একসঙ্গে শেখালে আরও নানারকম গলদ ঘটে। এখানে তার বিশদ বিবরণ দেওয়া অনাবশ্যক। একটু বেশি বয়সে সচেতনভাবে পরভাষা শিখলে এসব বিভ্রাট ঘটতে পারে না, সে-ভাষা শেখাটাও হয় পাকা। যা-হোক, অল্প বয়সেই পরভাষা ভাল শেখা হয়, এই থিওরিটাকেই আমি ভ্রান্ত মনে করি। আমাদের দেশে রামমোহন, বিদ্যাসাগর প্রমুখ অনেকেই তো বেশি বয়সে ইংরেজি শিখেছিলেন। তাছাড়া, যাঁরা বহু ভাষা শেখেন তাঁরা তো বেশি বয়সেই শেখেন এবং অপেক্ষাকৃত কম আয়াসেই শেখেন। কারণ বেশি বয়সে মানুষের বিচার-বিশ্লেষণের শক্তি হয় পাকা এবং এক বা একাধিক ভাষার জ্ঞানই তখন নূতন ভাষা শেখার সহায়তা করে। রামমোহন, মধুসূদন, শ্যামাচরণ সরকার, অমূল্য বিদ্যাভূষণ, হরিনাথ দে প্রমুখ বহুভাষাবিৎ ব্যক্তিদের কথা স্মরণ করলেই এ-কথার সার্থকতা বোঝা যাবে। অর্থাৎ অল্প বয়সেই পরভাষা শেখা সহজ ও পাকা হয় একথা মেনে নেওয়া যায় না।

পূর্বেই বলেছি, যে-সব শিশু ইংরেজি-শিক্ষার হাওয়াতেই মানুষ হয় তারা প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে ইংরেজিভাষা শিখতে আগ্রহী হলে তাদের সে-ইচ্ছার প্রতিবন্ধকতা করা আমি অনুচিত মনে করি। তেমনি এই স্বল্পসংখ্যক অগ্রগামী ইংরেজি-শিক্ষার্থীর আগ্রহ মেটাবার প্রয়োজনে দেশের অগণিত পশ্চাদ্‌গত নিরক্ষর ও অনাগ্রহী জনগণকে প্রাথমিক পর্যায়েই সমস্তরের ইংরেজি শিখতে বাধ্য করাকেও আমি কম অনুচিত মনে করি না। বরং স্বল্পসংখ্যকের স্বার্থে বহুসংখ্যকের জীবন-বিকাশের অন্তরায় ঘটানোকে গুরুতর অপরাধ বলেই মনে করি। অনুন্নত জনগণের জন্য অভিপ্রেত লোকশিক্ষা আর অগ্রগামী উন্নত সমাজের জন্য পরিকল্পিত প্রাথমিক শিক্ষার প্রকৃতি ও মান অভিন্ন হতে পারে না, এ-কথা মানতেই হবে। শিক্ষাব্যবস্থাকে জীবনচর্যার অনুকূল করার নীতি সম্বন্ধে মতভেদ নেই। তাই জীবনচর্যার ক্ষেত্রে যার পক্ষে যতটুকু ইংরেজি জানা প্রয়োজন তার জন্য ততটুকু ইংরেজি শেখানোর নীতি মেনে নেওয়া উচিত। তাছাড়া, সকলের মেধা এবং বিদেশী ভাষা আয়ত্ত করার ক্ষমতাও

সমান নয়। ইংরেজি-শিক্ষার প্রকৃতি ও মান নির্ণয়ের সময়ে এই নীতিগুলি মেনে নেওয়াই উচিত মনে করি। এ-বিষয়ে অন্যত্র ('রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তা', দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৮২) সবিস্তারে আলোচনা করেছি। এখানে পুনরুক্তি অনাবশ্যক।

মোট কথা, বাংলাভাষাকে (অর্থাৎ মাতৃভাষাকে) শুধু সাহিত্যের বাহন হিসাবে ব্যবহার না করে যদি তাকে দৈনন্দিন জীবনযাত্রার ও জীবিকার ভাষায় পরিণত করা যায় তাহলেই শিক্ষায় বাংলা ও ইংরেজির স্থান ও মান কালক্রমে আপনা থেকেই স্থির হয়ে যাবে। আর তাতেই বর্তমানের অনাবশ্যক ভাষা-বিতর্কের কোলাহল থেমে যাবে। এজন্যে সর্বপ্রথম কর্তব্য সরকারি আফিস-আদালতের সমস্ত কাজকর্মে ও চিঠিপত্রে বাংলাভাষার ব্যবহার অবিলম্বে প্রবর্তন করা। নতুবা শিক্ষালয়ে ইংরেজি ও বাংলার আপেক্ষিক গুরুত্ব নিয়ে এই লক্ষ্যহীন তর্কবিতর্ক শুধু যে ব্যর্থ হবে তা নয়, তাতে দেশের কল্যাণও বিঘ্নিত হবে।

শ্রীযুক্ত কুমুদকুমার ভট্টাচার্যের 'আধুনিক শিক্ষা ও মাতৃভাষা' বইটি পরিকল্পিত ও লিখিত হয় প্রবল মতবিরোধ ও উত্তেজনার পরিবেশে। এই পরিবেশে লেখকের মনে যে আবেগ সঞ্চারিত হয়, তারই প্রেরণায় তিনি সমস্ত বিরুদ্ধ মতকে খণ্ডন করার অভিপ্রায়ে পরম নিষ্ঠা ও আগ্রহ সহকারে আমাদের শিক্ষাবিষয়ে ঐতিহাসিক তথ্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন। সেই উত্তেজনার প্রেরণা না থাকলে এমন একটি মূল্যবান গ্রন্থ হয়তো কখনও রচিত হত না। সুখের বিষয়, উত্তেজনার প্রেরণায় গ্রন্থ-রচনায় প্রবৃত্ত হলেও পরিণামে লেখকের মনে উত্তেজনার পরিবর্তে সত্যানুসন্ধানের আগ্রহই কাজ করেছে প্রবলতর রূপে। এই আগ্রহের সুফল ছড়িয়ে আছে গ্রন্থের সর্বত্র। আর তাতেই সার্থক হয়েছে লেখকের এই সাধু প্রচেষ্টা।

এই গ্রন্থের প্রত্যেক অধ্যায়ে এমন বহু তথ্য ও যুক্তির অবতারণা করা হয়েছে যা অনিবার্যরূপেই প্রত্যেক মননশীল পাঠকের মনে কিছু-না-কিছু নূতন চিন্তা উদ্রিক্ত করবে। এভাবে পারস্পরিক চিন্তা-বিনিময়ের ফলে আমাদের সর্বাঙ্গীণ শিক্ষাদর্শ উজ্জ্বলরূপে প্রকাশিত হতে পারে। সেই শিক্ষাদর্শের পরিসর বর্তমান তর্কবিতর্কের ক্ষুদ্র এলাকার বাইরে বহুদূর পর্যন্ত প্রসারিত হবে। সেটাই হবে দেশের পরম লাভ। বর্তমানের তুচ্ছ কোলাহল অচিরেই হাওয়ায় মিলিয়ে যাবে। কিন্তু এই গ্রন্থের সুপ্রভাব স্থায়ী হবে সুদীর্ঘকাল। এই গ্রন্থখানি শিক্ষাবিষয়ক তথ্য ও চিন্তার একটি বৃহৎ খনিস্বরূপ। এই গ্রন্থ-রচনায়

লেখকের যে সুগভীর ও সনিষ্ঠ অনুসন্ধান-প্রবৃত্তি এবং ক্লান্তিহীন শ্রমপরায়ণতার পরিচয় পাওয়া যায়, আমাদের দেশে তার তুলনা সুলভ নয়। শিক্ষা নিয়ে যাঁরা চিন্তা করে থাকেন এবং শিক্ষাদানই যাঁদের জীবনের ব্রত, তাঁরা সকলেই এই গ্রন্থ-পাঠে উপকৃত হবেন, তাতে সন্দেহ নেই। এই বই পড়ে আমি অনেক নূতন তথ্যের সন্ধান পেয়েছি এবং নূতন করে ভাববার প্রেরণাও পেয়েছি। আশা করি বইটি শিক্ষক-শিক্ষণ-বিদ্যালয়ে পাঠ্যপুস্তক হবার যোগ্য বলে স্বীকৃত হবে।

পরিশেষে একথা বলাও অবশ্য কর্তব্য যে, এরকম একখানি বৃহৎ বই কখনও নিখুঁত হতে পারে না। এই বইটিতেও এমন কোনো কোনো তথ্যের উল্লেখ আছে যা ইতিহাসের দৃষ্টিতে যথাযথ বলে স্বীকার করা যায় না; এমন কিছু অভিমত বা সিদ্ধান্ত আছে যা বিচারসহ নয় অথবা যা নিয়ে নিরপেক্ষ পাঠকদের মধ্যেও মতভেদ দেখা দিতে পারে। তাছাড়া, মাঝে-মাঝে এমন মন্তব্যও আছে যাতে কোনো-কোনো পাঠকের মন পীড়িত বা উত্তেজিত হতে পারে। আর কোনো-কোনো স্থানে যে বিরোধের সুর শোনা যায়, তা অদূর ভবিষ্যতেই যখন বর্তমানের কোলাহল থিতিয়ে যাবে তখন বড়ই বেসুরো বা অনাবশ্যক বলে বোধ হবে। কিন্তু এমন একটি অধ্যায়ও নেই এই গ্রন্থে, যা চিন্তাশীল পাঠককেও নূতন করে ভাবতে প্রণোদিত না করবে। তাছাড়া, আমার বিশ্বাস বিবেচক পাঠক মাত্রই একথাটুকুও মনে রাখবেন যে, মতভেদ ও উত্তেজিত বিতর্কের প্রেরণা না থাকলে এই মূল্যবান গ্রন্থ-পাঠের সুযোগই আমরা পেতাম না। তাই আশা করি, এই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশকালে বর্তমান বিতর্কের আবিলতাটুকু যখন থিতিয়ে যাবে তখন এই বইটির স্বচ্ছ চিন্তাময় রূপটি পক্ষাপক্ষ নির্বিশেষে সব পাঠককেই তৃপ্তিদান করবে।

এখানে জানিয়ে রাখছি, গ্রন্থকারের দুটি মন্তব্য বা সিদ্ধান্ত আমি সর্বতোভাবে স্বীকৃতিযোগ্য বলে মনে করি। প্রথমতঃ, গ্রন্থের ভূমিকায় লেখক বলেছেন, "১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন ও ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে ইংরেজি-ভাষায় শিক্ষাদানের সরকারি স্বীকৃতিদানের ফলে বাংলাদেশে নতুন শ্রেণীস্তর গড়ে উঠল। কৃষকেরা জমির অধিকার হারালেন, ···তাঁরা জমিদার-মহাজনের শিকারে পরিণত হলেন। অন্যদিকে যাঁরা ছিলেন করসংগ্রাহক মাত্র, তাঁরা জমির মালিক হয়ে ···বাংলাদেশের গ্রামগুলিকে শ্মশানে পরিণত করেছেন।" —শুধু তাই নয়, আমি মনে করি এই দুই কারণে সমগ্র বাঙালি জাতিরই সর্বনাশ সাধিত হয়েছে। এ-বিষয়ে সবিশেষ মতপ্রকাশের স্থান এটা নয়।

দ্বিতীয়তঃ, এই ভূমিকাতেই লেখক বাংলাভাষাকে (মাতৃভাষাকে) বাঙ্গালির জাতীয় জীবনে যথাযোগ্য মর্যাদায় সুপ্রতিষ্ঠিত করবার অভিপ্রায়ে যে ষোল দফা কর্মসূচির প্রস্তাব দিয়েছেন, তার সবগুলিই সুবিবেচিত এবং জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রয়োগযোগ্য। তবে আমি বলি এই তালিকার প্রথম চার-পাঁচটি দফা নিয়ে কাজ শুরু করে দিলেই বাকি দফাগুলি আপনা থেকেই এসে যাবে। কিন্তু ইংরেজির মোহাকর্ষণে আমরা তো পঁয়ত্রিশ বছরেও একাজে হাত দিতেই পারলাম না বারবার সদিচ্ছা প্রকাশ করা সত্ত্বেও। এখনই কি পারব? না-ও যদি পারি, তবু কালের প্রভাবে আমাদের জাতীয় ভাষা একদিন তার প্রাপ্য মর্যাদার আসনটি অধিকার করে নেবেই। কালপ্রভাবের অপেক্ষায় না থেকে নিজেদের অন্তরের প্রেরণায় কাজ করাতেই প্রকাশ পায় দূরদর্শিতা ও জাতীয় চিত্তের সক্রিয়তা। আর কালের প্রভাবে যে কাজ আপনা থেকেই নিষ্পন্ন হয়, তাতে মানবমনের সক্রিয়তা প্রকাশ পায় না, প্রকাশ পায় তার নির্জীব মনের জড়তা।

সবশেষে বঙ্কিমচন্দ্রের একটি আক্ষেপোক্তি উদ্ধৃত করেই নিবেদন করছি আমার মনের আসল কথাটুকু :

> "ছয় কোটি ষাট লক্ষ মানুষের দ্বারা সিদ্ধ না হইতে পারে, বুঝি পৃথিবীতে এমন কোনো কার্যই নাই। কিন্তু...বাঙ্গালার ছয় কোটি ষাট লক্ষ লোকের দ্বারা যে কোন কার্য হয় না, তাহার কারণ এই যে, —বাঙ্গালায় লোকশিক্ষা নাই।"
>
> —বঙ্গদর্শন, ১২৮৫, অগ্রহায়ণ। ইং ১৮৭৮

সেকালে বাংলা, বিহার ও ওড়িশা নিয়ে গঠিত 'বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি' নামক সরকারি প্রদেশের জনসংখ্যা ছিল ছয় কোটি ষাট লক্ষ। এখন শুধু পশ্চিম বাংলার জনসংখ্যা প্রায় তাই।

রুচিরা
শান্তিনিকেতন
১৮ জুলাই, ১৯৮২

প্রবোধচন্দ্র সেন

গ্রন্থ-প্রসঙ্গে

১৯৭৮ সাল। পশ্চিম বাংলার প্রথম বামপন্থী ফ্রন্ট সরকারের গণমুখী শিক্ষানীতি উচ্চতর শিক্ষাক্ষেত্রে রূপায়ণের উদ্দেশ্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালকমণ্ডলী স্নাতক-স্তরে ভাষা-সংস্কারের প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন। উচ্চশিক্ষার দরজা সকলের কাছে উন্মুক্ত করে দেবার জন্য তাঁদের এই প্রয়াস স্বার্থান্বেষী মহলকে আতঙ্কিত করে তুলেছে। শিক্ষা-ব্যবসায়ীরা বামফ্রন্টের রাজত্বে ভাষা, শিক্ষা ও সংস্কৃতি উচ্ছন্নে গেল বলে আওয়াজ তুলে বামফ্রন্ট-বিরোধী অভিযানে নেমে পড়েছেন। এবং বামপন্থী বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে কেউ কেউ তাঁদের কুৎসা প্রচারের ফাঁদে পা দিয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষা-সংস্কারের প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছেন। এই অবস্থায় অধ্যাপক সন্তোষকুমার মিত্র ইতিহাসের পটভূমিতে ভাষা-সংস্কারের প্রস্তাবের যৌক্তিকতা বিচারের জন্য আমাকে লিখতে অনুরোধ করেন। কিন্তু আমি বিজ্ঞ পণ্ডিত কিংবা সর্ববিদ্যায় পারদর্শী নই বলে অক্ষমতা প্রকাশ করি। তবে জ্ঞান-লাভের উদ্দেশ্যে শ্রোতা ও দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করে পক্ষে ও বিপক্ষের বক্তৃতা শুনেছি। বিপক্ষীয়দের সভায় বক্তারা শিক্ষা-আলোচনার চেয়ে তীব্র রাজনৈতিক বিষোদ্গার করেছেন। বস্তুত শিক্ষা-বিস্তারের দৃষ্টিতে ভাষা-সংস্কার প্রস্তাবটি আলোচনার জন্য বামফ্রন্ট সরকার ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আহ্বান জানালেও বিষয়টি আর শিক্ষা-বিষয়ক ছিল না; তা বামফ্রন্ট-বিরোধী রাজনৈতিক ইস্যুতে পরিণত হয়েছিল। দেওয়াল-লেখায়, সংবাদপত্রে, সভায়-সমাবেশে, মিছিলে-শোভাযাত্রায় শিক্ষাক্ষেত্রের একচেটিয়া কারবারীরা এবং তাঁদের অনুগৃহীত ব্যক্তিরা আক্রমণাত্মক ভূমিকা নিয়ে বামফ্রন্টকে শিক্ষাজগতে কালাপাহাড় রূপে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন এবং কুৎসা প্রচারের দ্বারা জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করতে সচেষ্ট হয়েছেন।

বামফ্রন্টের ভূমিকা ছিল তখন আত্মরক্ষামূলক। শত্রুপক্ষের প্রবল আক্রমণের সম্মুখে দাঁড়িয়ে তাঁরা প্রকৃত তথ্য উপস্থিত করে জনসাধারণের বিভ্রান্তি দূর করতে প্রয়াসী হয়েছেন। অথচ ঘোষিত কর্মসূচীর ভিত্তিতে বামফ্রন্টেরই আক্রমণাত্মক ভূমিকা গ্রহণ করা উচিত ছিল। ১৮৫১ ৫২ সালে কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলস বলেছিলেন, "শত্রু তোমার বিরুদ্ধে শক্তি জমায়েত করতে পারার পূর্বেই তুমি (আক্রমণ চালিয়ে) তাকে পশ্চাদপসরণে বাধ্য কর।" এই

উক্তির আলোকে বামফ্রন্টের ভাষা ও শিক্ষানীতিকে বাস্তবায়িত করার পূর্বে ঔপনিবেশিক শিক্ষাদর্শের প্রতি মধ্যবিত্তশ্রেণীর মানসিক দুর্বলতাকে দূর করার জন্য প্রয়োজন ছিল নিরবচ্ছিন্ন তথ্যভিত্তিক-সত্যানুগ প্রচার। জনসাধারণকে প্রকৃত তথ্যের ভিত্তিতে শিক্ষিত করেই শত্রুপক্ষের আক্রমণকে ভোঁতা করে দেওয়া যেতো। কিন্তু বামফ্রন্টের সতর্কতার অভাবে বামফ্রন্ট-বিরোধীরা প্রথম আক্রমণের সুযোগ নিয়ে সমস্ত রকমের হীন পন্থা গ্রহণ করে সাধারণ মানুষকে বিরোধী শিবিরে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। শিক্ষাক্ষেত্রে একচেটিয়া আধিপত্য বজায় রাখার জন্য তাঁরা সমস্ত রকমের মাধ্যম ব্যবহার করেছিলেন। এমনকি তাঁরা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের মতো একটি প্রাচীন প্রতিষ্ঠানকেও ব্যবহার করতে দ্বিধান্বিত হননি। অথচ সাহিত্য পরিষৎ কোনোদিন কখনো রাজনৈতিক ইস্যু নিয়ে মাথা ঘামায়নি, রাজনৈতিক বিরোধে অংশগ্রহণ করেনি। কিন্তু সাহিত্য পরিষদের কর্তাব্যক্তিরা সমস্ত রীতি-নীতি, ঐতিহ্য বিসর্জন দিয়ে বামফ্রন্ট সম্পর্কে কুৎসা প্রচারের জন্য সাহিত্য পরিষৎকে ব্যবহার করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে সাহিত্য পরিষদের কার্যনির্বাহক সমিতির কার্যবিবরণীতে লিপিবদ্ধ তথ্যের ভিত্তিতে তাঁদের কথাও একটু বলা প্রয়োজন।

১৩ মে, ১৯৭৮, শনিবার —বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কার্যনির্বাহক সমিতির দশম অধিবেশন। এই সভার সভাপতি ছিলেন দিল্লীর শাসকগোষ্ঠীর একনিষ্ঠ সমর্থক শ্রী জগদীশ ভট্টাচার্য। সভার আলোচ্য বিষয়সূচীতে না থাকলেও সভাপতির অনুমোদন নিয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষা-সংস্কার প্রস্তাবটিকে "বাঙ্গালীর মাতৃভাষার প্রতি চরম অমর্যাদাসূচক" বলে অভিহিত করে "এই অশুভ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করার" জন্য "প্রতিবাদ সভা আহ্বান করার" প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। এই প্রস্তাবের সমর্থনে জগদীশ ভট্টাচার্যের গোষ্ঠীভুক্ত ডঃ. সরোজমোহন মিত্র বলেছেন যে, বঙ্গজননীকে উলঙ্গ করার এই নির্লজ্জ অপপ্রয়াসকে সর্বশক্তি দিয়ে প্রতিহত করতে হবে। সাহিত্য পরিষদের কার্যনির্বাহক সমিতির উক্ত সভার বিবরণীতে বলা হয়েছে, "সকলেই তাঁহার প্রস্তাবের গুরুত্ব স্বীকার করেন। শ্রী কুমুদকুমার ভট্টাচার্য প্রতিবাদ সভার পরিবর্তে আলোচনা সভা আহ্বানের কথা বলেন। কিন্তু সদস্যগণ প্রতিবাদ সভা আহ্বানেরই পক্ষে মত প্রকাশ করেন।"

কেবলমাত্র এই সভাতেই নয়, কার্যনির্বাহক সমিতির পরবর্তী সভাতেও (একাদশ অধিবেশন —১৭ জুন, ১৯৭৮, শনিবার) একই দৃশ্যের অবতারণা ঘটে। ভাষা-সংস্কার বিষয়ে কোনো আলোচনার প্রস্তাব এই সভার আলোচ্য

বিষয়-সূচীতে ছিল না। তাসত্ত্বেও সভার সভাপতি শ্রী জগদীশ ভট্টাচার্যের "অনুমোদনক্রমে ডঃ. দেবীপদ ভট্টাচার্য প্রস্তাব করেন যে, স্নাতক-স্তরে বাংলা ভাষা ঐচ্ছিক করার যে প্রস্তাব কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাকাডেমিক (কাউন্সিল) কমিটি উত্থাপন করিয়াছেন তাহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভা ৭ই আষাঢ়, ১৩৮৫ (২২ জুন, ১৯৭৮) পরিষৎ মন্দিরে আহ্বান করা হউক।… শ্রী কুমুদকুমার ভট্টাচার্য বলেন যে, ইহা প্রতিবাদ সভা না হইয়া আলোচনা সভা হওয়া উচিত। সভাপতি বলেন, ইহা পূর্বেই কার্যনির্বাহক সমিতির সভায় আলোচিত হইয়া সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে যে, একটি প্রতিবাদ সভা পরিষৎ মন্দিরে আহূত হইবে। সুতরাং এই প্রশ্ন উত্থাপনের এখন আর কোনো সুযোগ নাই।" বলা বাহুল্য, এবারেও শ্রী সরোজমোহন মিত্র সোৎসাহে প্রস্তাবটি সমর্থন করেন (অবশ্য এই কাজের জন্য শ্রী মিত্র জগদীশ ভট্টাচার্যের দ্বারা পুরস্কৃত হয়েছেন—পরবর্তী বছরে শ্রী জগদীশ ভট্টাচার্যের দ্বারা মনোনীত হয়ে পরিষদের সহ-সম্পাদক হয়েছেন এবং তারপর থেকে প্রত্যেক বছরে শ্রী মিত্র নির্বাচনে না দাঁড়িয়ে শ্রী ভট্টাচার্য ও তাঁর গোষ্ঠীর দ্বারা মনোনীত হয়ে পরিষৎ-পত্রিকার পত্রিকাধ্যক্ষ হচ্ছেন)। ফলে ডঃ দেবীপদ ভট্টাচার্যের "এই প্রস্তাব গৃহীত হয়।"

মাতৃভাষা চর্চার অবলুপ্তির তথাকথিত অভিযোগ তুলে শিক্ষা-ব্যবসায়ীদের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে সাহিত্য পরিষৎকে ব্যবহার করার জন্য জগদীশ ভট্টাচার্য সহ এই সমস্ত জ্ঞানবান ভদ্রলোকদের প্রয়াস লক্ষ্য করলে মনে পড়ে যায়, বঙ্গ-বিহার সংযুক্তি প্রস্তাবের বিরুদ্ধে যখন সমগ্র দেশ বাংলার শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ভাষাকে রক্ষা করার জন্য গর্জে উঠেছিল, তখন শাসক-দলের স্বার্থে জগদীশ ভট্টাচার্য সজনীকান্ত দাশের সাহায্যে বঙ্গ-বিহার সংযুক্তি প্রস্তাবের অনুকূলে সাহিত্য পরিষৎকে ব্যবহারের চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তৎকালীন পরিষৎ-সম্পাদক প্রখ্যাত গান্ধীবাদী শ্রী নির্মলকুমার বসু কার্যনির্বাহক সমিতির সভায় সংযুক্তি প্রস্তাবের ফলে বাংলার সংস্কৃতি বিপন্ন হবে এরূপ আশঙ্কা প্রকাশ করে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন এবং দু'টি সভায় সেই প্রস্তাবের ওপরে আলোচনা-কালে যখন অধিকাংশ সদস্য শ্রী বসুর প্রস্তাবকে সমর্থন করেন, তখন অবস্থা বেগতিক দেখে জগদীশ ভট্টাচার্য সংযুক্তি প্রস্তাবটিকে রাজনৈতিক বিষয় বলে অভিহিত করেন এবং সে-বিষয়ে সাহিত্য পরিষদের অভিমত প্রকাশ করা অনুচিত বলে তীব্র বিরোধিতা করেন। সভার সভাপতি শ্রী সজনীকান্ত দাশ জগদীশ ভট্টাচার্যের বক্তব্যকে সমর্থন করে শ্রী বসুর প্রস্তাব পরিত্যক্ত বলে ঘোষণা

করেন। কিন্তু এই ঘোষণা করার কোনো আইনগত ক্ষমতা সভাপতির ছিল না কারণ প্রস্তাবক প্রস্তাব প্রত্যাহার করতে পারেন, সভাপতি নন। তাই সভাপতির এই ঘোষণায় নির্মলকুমার বসু, পুলিনবিহারী সেন, সোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী ও মনোজ বসু তীব্র আপত্তি জানিয়ে তাঁদের অভিমত নথিভুক্ত করেন। রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির অভিপ্রায়ে বাংলা ভাষা, শিক্ষা ও সংস্কৃতি রক্ষার প্রয়াসকে ব্যর্থ করার জন্য জগদীশ ভট্টাচার্য যেমন তৎকালে সজনীকান্ত দাশের সাহায্য গ্রহণ করেছিলেন, একালেও তেমনি তিনি ডঃ. সরোজমোহন মিত্র ও ডঃ. দেবীপদ ভট্টাচার্যের সাহায্য গ্রহণ করে বামফ্রন্টের গণমুখী শিক্ষানীতির বিরোধিতা করেছেন।

এবারে সাহিত্য পরিষৎ কর্তৃক আহুত প্রতিবাদ সভাটির বিবরণ দেওয়া যাক। ২২ জুন, ১৯৭৮, বৃহস্পতিবার—প্রতিবাদ সভার সভাপতি ডাঃ. বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল)। সভায় উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন ডঃ. রবীন্দ্র গুপ্ত, ডঃ. সরোজমোহন মিত্র, ডঃ. দেবীপদ ভট্টাচার্য, ডঃ. বিষ্ণু বসু, অধ্যাপক সুখরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, ডঃ. সুরেশ মৈত্র, ডঃ. অজিতকুমার ঘোষ, ডঃ. হরপ্রসাদ মিত্র, শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়, বিনয় সরকার, দিলীপকুমার বিশ্বাস, সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। বিজ্ঞ পণ্ডিতদের সভায় যুক্তিপূর্ণ ভাষণের পরিবর্তে বামফ্রন্টের বিরুদ্ধে কুৎসা প্রচার করা হবে বলে এই জ্ঞানহীন লেখক সেই প্রতিবাদ সভায় অনুপস্থিত ছিলেন। লেখকের আশঙ্কা অমূলক ছিল না। বামপন্থী-দক্ষিণপন্থী বিদ্যাবানদের এই সমাবেশে পণ্ডিত ব্যক্তিরা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষা-সংস্কার প্রস্তাবের বিরুদ্ধে অগ্নিবর্ষী ভাষায় বক্তৃতা করেছেন, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালকমণ্ডলীর বিরুদ্ধে সংগ্রামের আহ্বান জানিয়েছেন। সভায় উপস্থিত বিজ্ঞ শ্রোতারা হাততালি দিয়ে বক্তাদের অভিনন্দন জানালেও একজনের কণ্ঠ রুদ্ধ করতে পারেননি। তিনি হলেন শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়। প্রবল বিরোধিতাকে উপেক্ষা করে তিনি সভামঞ্চে দাঁড়িয়ে রাজনৈতিক বিরোধের মধ্যে সাহিত্য পরিষৎকে জড়ানোর প্রচেষ্টার তীব্র নিন্দা করেন। সভায় বামপন্থী বলে পরিচিত বুদ্ধিজীবীরা উপস্থিত থাকলেও কেউই শ্রী মুখোপাধ্যায়ের বক্তব্যকে সমর্থন করেননি। পক্ষান্তরে অনেকের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছেন। যেমন অধ্যাপক সুখরঞ্জন মুখোপাধ্যায় বক্তৃতাদানকালে নিজেকে বামপন্থী বলে পরিচয় দিয়ে শুভেন্দুশেখরকে তীব্র ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করেন।

এই ঘটনা আমাকে হতচকিত-বিহ্বল করে তোলে। মনে প্রশ্ন দেখা দেয়, আলোচনা সভার পরিবর্তে প্রতিবাদ সভা আহ্বানে বিজ্ঞ পণ্ডিতদের এত উৎসাহ

কেন? অধ্যাপক সন্তোষকুমার মিত্র, অধ্যাপক শম্ভু ঘোষ, শ্রীমতী অনিলা দেবী, অধ্যাপক পার্থ দে প্রমুখ শিক্ষাবিদেরা কি ভুল পথে চালিত হচ্ছেন? ভাষা-সংস্কার প্রস্তাব কার্যকরী হলে শিক্ষার্থীরা কি মাতৃভাষা ভুলে যাবেন? বামফ্রন্টের শিক্ষানীতির রূপকারেরা কি আত্মহননে নিমজ্জিত হয়েছেন? ফ্রন্টভুক্ত রাজনৈতিক নেতারা কি শিক্ষাজগতে কালাপাহাড়? এই সমস্ত প্রশ্নই আমাকে সমগ্র ভাষা-সমস্যাকে গভীরভাবে অনুশীলনে ও অধ্যয়নে অনুপ্রাণিত করে।

* * *

ভাগীরথীর উৎস সন্ধান করতে গিয়ে বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র বসু জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "গঙ্গা তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ?" প্রশ্নের উত্তর পেয়েছিলেন তিনি, "হিমালয়ের জটা হইতে।" বর্তমান ভাষা-দ্বন্দ্বের উৎপত্তিস্থল খুঁজতে গিয়ে আমিও উত্তর পেয়েছি. এই দ্বন্দ্ব আধুনিক কালের নয়, অনাধুনিক কালের—শ্রেণী ও বর্ণভিত্তিক সমাজরক্ষার জন্য যে সময়ে শিক্ষাকে ব্যবহার করা হয়েছে, সে সময় থেকেই শিক্ষাক্ষেত্রে একচেটিয়া আধিপত্য বজায় রাখার জন্য ভাষাকে হাতিয়ার রূপে প্রয়োগ করা হয়েছে। ভাষা প্রবহমানা নদীর ন্যায়। সুতরাং ভাষা-সমস্যার স্বরূপ উপলব্ধির জন্য তীর ধরে যাত্রা শুরু করেছি উৎপত্তিস্থলের দিকে অর্থাৎ একাল থেকে সেকালে। বর্তমান থেকে অতীতে ভ্রমণকালে সংগ্রহ করেছি বহু সাক্ষীর সাক্ষ্য ও নানান তথ্য। ইতিহাসের বুকে কান পেতে শুনেছি শিক্ষালাভে বঞ্চিতদের বেদনার কাহিনী। অবাক বিস্ময়ে পাঠ করেছি গোষ্ঠী বনাম সমষ্টির সংগ্রামের কাহিনী—একদিকে ভাষার প্রাচীর তুলে শিক্ষাকে মুষ্টিমেয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার প্রয়াস, অন্যদিকে ভাষার দেওয়াল ভেঙে শিক্ষাকে গোষ্ঠীর অনিচ্ছুক হাত থেকে ছিনিয়ে এনে সর্বস্তরে ছড়িয়ে দেবার অক্লান্ত প্রচেষ্টা। এই সংগ্রাম শুরু হয়েছিল বৌদ্ধ যুগে, সেই সংগ্রাম তীব্র হয়েছে বৃটিশ-যুগে, আর একালে তা তীব্রতর হয়েছে।

বৃটিশ-শক্তির পূর্বে যে মুসলিম-শাসকেরা এদেশ দখল করেছিলেন, তাঁরা কেউই হিন্দু-যুগের অর্থনৈতিক কাঠামো কিংবা শিক্ষা-কাঠামো পরিবর্তনের চেষ্টা করেননি। ফলে প্রাচীন ভূমিব্যবস্থা ও শিক্ষাব্যবস্থা অপরিবর্তিত ছিল। কৃষক ছিলেন জমির মালিক এবং পাঠশালায়-মক্তবে তাঁদের সন্তানেরা মাতৃ-ভাষায় জীবনধারণের উপযোগী শিক্ষালাভের সুযোগ পেতেন; যদিও টোল-মাদ্রাসায় উচ্চশিক্ষালাভের সুযোগ তাঁদের ছিল না। কিন্তু অবস্থার পরিবর্তন ঘটল ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে—ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃক এদেশ দখলের পরে।

এদেশের মাটিতে বৃটিশ-শাসনের ভিত্তিকে সুদৃঢ় করার জন্য তাঁরা ভূমিব্যবস্থা ও শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটালেন।

১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন ও ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে ইংরেজিভাষায় শিক্ষাদানে সরকারি স্বাকৃতিদানের ফলে বাংলাদেশে নতুন শ্রেণী-স্তর গড়ে উঠল। কৃষকেরা জমির অধিকার হারালেন, তাঁরা হলেন রায়ত-প্রজা; মাতৃভাষায় শিক্ষালাভের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে তাঁরা জমিদার-মহাজনের অসহায় শিকারে পরিণত হলেন। অন্যদিকে যাঁরা ছিলেন কর-সংগ্রাহক মাত্র, তাঁরা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দৌলতে জমির মালিক হয়ে বসলেন এবং বৃটিশ-শাসকশ্রেণীর করুণা-নির্ভর দেশীয় মুৎসুদ্দি-বণিকেরা নয়া জমিদার-রূপে বাংলাদেশের গ্রামগুলিকে শ্মশানে পরিণত করেছেন; বিপুল ধনসম্পদের অধিকারী হয়েছেন।

বিদেশী শাসকশক্তির সঙ্গে দেশীয় রাজা, মহারাজা ও বণিকদের যোগাযোগের ভাষা ছিল ইংরেজিভাষা। তাঁদের কাছে এই ভাষা ছিল সোনার হরিণ। ব্যক্তিগত স্বার্থে সোনার হরিণ ধরার নেশায় তাঁরা দেশের স্বার্থ বিসর্জন দিতেও কুণ্ঠিত হননি। 'হঠাৎ রাজা'রা দ্বিবিধ উদ্দেশ্য নিয়ে ইংরেজিভাষায় শিক্ষা-গ্রহণের পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন —জ্ঞানার্জন নয়, কেবলমাত্র ধনোপার্জন ও সমাজে আধিপত্য বিস্তার। ফলে কালক্রমে সৃষ্টি হয়েছিল একটি নতুন শ্রেণী — ভূমিস্বার্থজড়িত ইংরেজি-শিক্ষিত উচ্চবিত্তশ্রেণী এবং এই শ্রেণী অর্থনৈতিক সংকটের ধাক্কায় মধ্যবিত্তে পরিণত হলেও ভূমির সঙ্গে তাঁদের সম্পর্কচ্ছেদ ঘটেনি। এঁরা শোষণে-উৎপীড়নে ভূস্বামীশ্রেণীর সঙ্গেই থেকেছেন।

কিন্তু বাংলাদেশের রায়ত-কৃষকেরা ভূস্বামীশ্রেণীর অত্যাচার-উৎপীড়ন নীরবে সহ্য করেননি, তাঁরা বারে বারে সংগ্রাম ও বিদ্রোহ করেছেন। অন্যদিকে মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের দাবি প্রবলভাবে উত্থিত হয়েছে। কিন্তু এই দু'টি প্রশ্নে ভূমি-নির্ভর ইংরেজি-শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণী ভূম্যধিকারিশ্রেণীর পক্ষে দাঁড়িয়েছেন।

তারপরে গঙ্গা দিয়ে অনেক জল গড়িয়েছে; গণ আন্দোলনের দুর্বার আঘাতে ভারত স্বাধীন হয়েছে। চৌত্রিশটি গ্রীষ্ম পার হয়েছে; গ্রীষ্মের দাবদাহে ভূমিহীনদের সংখ্যা বেড়েছে, বসন্তের ফুল অকালে ঝরে পড়েছে। দাসত্ববন্ধন থেকে কৃষকের মুক্তি ঘটেনি। মধ্যবিত্তশ্রেণী ক্রমশ চাকরি-নির্ভর হলেও ভূমির সঙ্গে তাঁদের সম্পূর্ণ সম্পর্কচ্ছেদ ঘটেনি; ইংরেজ বিদায় নিলেও ইংরেজিভাষায় শিক্ষাগ্রহণের মোহান্ধতার অবসান ঘটেনি; এমনকি যাঁরা

ভূমিস্বার্থের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নন, কেবলমাত্র চাকরির ওপরে নির্ভরশীল, তাঁরাও ইংরেজিভাষার আধিপত্য হ্রাসের প্রয়াসে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়েছেন। তাই বিশ শতকের শেষভাগে 'বর্গা অপারেশান' হলে মধ্যবিত্তশ্রেণী ক্রুদ্ধ হন, মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের ওপরে গুরুত্ব আরোপ করা হলে তাঁরা ক্ষুব্ধ হন।

বর্ণ ও শ্রেণী-বিভক্ত সমাজে ভাষা-সংগ্রামের পরিসমাপ্তি ঘটতে পারে না — সমাজ-কাঠামো পরিবর্তনের সঙ্গে রয়েছে তার অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক। উৎপাদন-যন্ত্রের ওপরে সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠিত না হ'লে শিক্ষাক্ষেত্রে সমাজের আধিপত্য কায়েম হতে পারে না। সুতরাং আর্থনীতিক-সামাজিক কাঠামো পরিবর্তনের ওপরে নির্ভর করছে ভাষা-সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান ও সর্বস্তরে শিক্ষা-সম্প্রসারণ। এই কাঠামো-পরিবর্তন ভারতের বর্তমান বুর্জোয়া দলগুলির পক্ষে সম্ভব নয় বলেই স্বাধীনতা-লাভের চৌত্রিশ বছর পরেও অমৃতের পুত্ররা অমৃত-লাভের অধিকারী হননি। কেবলমাত্র শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের মধ্য দিয়ে বর্তমান আর্থনীতিক-সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তন হতে পারে এবং তখনই এই ভাষা-দ্বন্দ্বের অবসান ঘটতে পারে —বিজয়ী জাতির ভাষা-দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে সমস্ত জাতি-উপজাতির মাতৃভাষায় শিক্ষালাভের সুযোগ অবারিত হতে পারে। বর্তমান বিশ্বের দুই শিবিরের —ধনতান্ত্রিক ও ও সমাজতান্ত্রিক —ভাষা ও শিক্ষার চিত্র দেখলে এই সত্য উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। পক্ষান্তরে, সামন্ততান্ত্রিক ও আধা-সামন্ততান্ত্রিক দেশগুলিতে শিক্ষা সকলের জন্য নয়, মুষ্টিমেয়ের সেবায় শিক্ষা নিয়োজিত। যেমন ভারত —এখানে ধনতন্ত্রের পরিপূর্ণ বিকাশ না ঘটায় এবং সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতির অবশেষগুলি টিকে থাকায় জনশিক্ষা-লাভে বঞ্চিত হয়েছে আমাদের দেশের শ্রমজীবী-কৃষিজীবীশ্রেণী।

*　　*　　*

সামাজিক-আর্থনীতিক পটভূমিতে শিক্ষেতিহাস-পরিক্রমার ফসল হ'ল বক্ষ্যমাণ গ্রন্থ। এই গ্রন্থে কেবলমাত্র ভাষা-সমস্যা নয়, শিক্ষা-কাঠামো, শিক্ষণীয় বিষয়, বিষয়-নির্বাচন ইত্যাদি সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়েছে। উনিশ শতকের শেষ দশক পর্যন্ত শিক্ষালোচনা করে গ্রন্থটি প্রকাশের মনস্থ করি এবং পাণ্ডুলিপির কিছু অংশ পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ-এর মুখপত্র 'সংসদ পরিচিতি' পত্রিকায় (১৯৮০ সালের জুলাই-আগস্ট ও সেপ্টেম্বর-অক্টোবর) 'আধুনিক শিক্ষা-বিস্তারে ভাষা-সমস্যা' নামে প্রকাশিত হয় এবং আর একটি অংশ 'উনিশ শতকের প্রথম পর্বে মাতৃভাষা-চর্চা' নামে 'শিশুশিক্ষার ভাষা'

গ্রন্থে সঙ্কলিত হয়। রচনাগুলি পাঠকমহলে প্রশংসিত হওয়ায় অনেকেই আমাকে বর্তমান কাল পর্যন্ত আলোচনা করতে অনুরোধ করেন। তাঁদের উৎসাহে অনুপ্রাণিত হয়ে আমি প্রকাশিত রচনাগুলির সংশোধন ও সংযোজন সহ একাল পর্যন্ত শিক্ষা-বিস্তারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল বিষয় বর্তমান গ্রন্থে আলোচনা করেছি।

গ্রন্থটির নাম 'আধুনিক শিক্ষা ও মাতৃভাষা' হলেও শিক্ষা-সম্প্রসারণের সমস্যাকে সম্যক উপলব্ধির জন্য গ্রন্থটির প্রথম অধ্যায়ে হিন্দুযুগ ও মুসলমান যুগের শিক্ষা-চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এই অধ্যায়টি গ্রন্থের ভূমিকা স্বরূপ। এই তথ্যটি স্মরণে না রাখলে প্রথম অধ্যায়টি গ্রন্থের অপ্রাসঙ্গিক অংশ বলে পাঠকের বিভ্রান্তি ঘটতে পারে। তারপরের আটটি অধ্যায়ে (দ্বিতীয় থেকে নবম) গণ-আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে বৃটিশ-যুগের শিক্ষা-বিস্তারের ইতিহাস ও বিভিন্ন কমিশন-কমিটির প্রতিবেদন সহ ভারতীয় মনীষী শিক্ষাবিদদের অভিমত উপস্থিত করা হয়েছে। দশম অধ্যায়ে স্বাধীন ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের চৌত্রিশ বছরের শিক্ষা-বিস্তারের প্রচেষ্টা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

একাদশ ও দ্বাদশ অধ্যায়ে বামফ্রন্ট সরকারের ভাষা ও শিক্ষানীতি এবং বিরোধীদের বক্তব্য সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। আধুনিক শিক্ষার ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে বামফ্রন্ট সরকারের ভাষা ও শিক্ষানীতি বিচার করলে সত্যের খাতিরে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, ঐতিহাসিক দিক থেকে এই নীতি যুক্তিসঙ্গত ও বিজ্ঞানসম্মত। জনশিক্ষার জন্য সুদীর্ঘকালের জাতীয় দাবীকে রূপায়ণের আন্তরিকতা লক্ষ্য করা যায় বামফ্রন্ট সরকারের শিক্ষামূলক কর্মপ্রয়াসের মধ্যে। এই কর্মকাণ্ডের অন্যদিক হ'ল ভূমি-সংস্কার। বর্তমান ভূমি-ব্যবস্থার সংস্কার-সাধনের মধ্য দিয়ে তাঁরা শিক্ষা-সম্প্রসারণে ব্রতী হয়েছেন। তাঁরা জানেন, বর্তমান রাষ্ট্র-কাঠামো ও প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন না ঘটলে কেবলমাত্র প্রাথমিক স্তরে একটি ভাষা-শিক্ষা কিংবা স্নাতক স্তরে ভাষা-সংস্কারের দ্বারা দরিদ্র-বিত্তহীন শ্রমিক-কৃষকের কাছে উচ্চশিক্ষা তো দূরের কথা, প্রাথমিক শিক্ষার দরজাও উন্মুক্ত হবে না। কিন্তু অভাবের সংসারে মা যেমন দু'মুঠো খুদ-কুঁড়ো সংগ্রহ করে ক্ষুধার্ত সন্তানের মুখে তা তুলে দিয়ে তার ক্ষুধা নিরসনের চেষ্টা করেন, তেমনি বামফ্রন্ট সরকার সীমাবদ্ধ আর্থিক সঙ্গতি নিয়ে মানুষের শিক্ষালাভের আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য সচেষ্ট হয়েছেন। তাঁরা সীমাবদ্ধ ক্ষমতার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও জনগণের

সহযোগিতা নিয়ে শাসকশ্রেণী ও তাঁদের অনুগৃহীত ব্যক্তিদের বাধাদানকে অতিক্রম করে ভূমি-সংস্কারের দ্বারা শিক্ষা-সম্প্রসারণের কাজে প্রয়াসী হয়েছেন।

মধ্যবিত্তশ্রেণী বামফ্রন্ট সরকারের শিক্ষানীতিকে সমর্থন করলেও সরকারি ভাষানীতির প্রতি তাঁদের মনে একটা কিন্তু-কিন্তু ভাব রয়েছে। ইংরেজিভাষার প্রতি দুর্বলতা তাঁদের মনে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করলেও একথা কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না যে, চাকরিক্ষেত্রে এখনো ইংরেজিভাষার আধিপত্য রয়ে গেছে — শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে সরকারি-বেসরকারি সমস্ত অফিসে ইংরেজিভাষার প্রভুত্ব। স্কুলের প্রধান শিক্ষক, কলেজের অধ্যক্ষ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ইংরেজিভাষায় নোটিশ দেন, ইংরেজিভাষায় সরকারি চিঠির উত্তর লেখেন, শিক্ষক-অধ্যাপকেরা ইংরেজিতে ছুটির দরখাস্ত থেকে সমস্ত রকমের চিঠি লেখেন, সরকারি-বেসরকারি অফিসের সমস্ত রকমের কাজকর্ম ইংরেজিতে নির্বাহ হয়। ফলে প্রাথমিক স্তরে কেবলমাত্র মাতৃভাষা শিক্ষার নীতি কার্যকরী করার আদেশ দেওয়া হলেও শিক্ষকেরা ইংরেজিভাষায় শিক্ষাদান অব্যাহত রেখেছেন; স্নাতক-স্তরে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ আবশ্যিক-ঐচ্ছিক বিষয় রূপে বাংলার পরিবর্তে ইংরেজি গ্রহণ করছেন।

সুতরাং ইংরেজিভাষার প্রতি মধ্যবিত্তশ্রেণীর আত্যন্তিক দুর্বলতা দূর করার জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলিকে অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে কার্যকরী করা প্রয়োজন এবং এই কাজে সরকারের সঙ্গে সমস্ত শিক্ষক-সংগঠনকে সক্রিয় সহযোগিতা করতে হবে।

(১) সমস্ত স্কুল-কলেজে, মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদে, উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা ব্যবহার করতে হবে এবং একাজে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্তৃপক্ষের প্রধান উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

(২) সমস্ত সরকারি অফিসের অভ্যন্তরীণ কাজে বাংলা ব্যবহার করতে হবে। মন্ত্রীদের মাতৃভাষায় নির্দেশ দিতে হবে এবং সরকারি অফিসারদেরকে বাংলায় সমস্ত রকমের কাজ করার জন্য বাধ্য করতে হবে।

(৩) যাদের মাতৃভাষা বাংলা, তাঁদেরকে বাংলায় চিঠি লিখতে হবে; এমনকি বাঙালি পত্রলেখক ইংরেজিতে চিঠি লিখলেও চিঠির উত্তর বাংলায় দিতে হবে।

(৪) যেখানে বাংলা পরিভাষার অভাব ঘটবে সেখানে বাংলা অক্ষরে ইংরেজি শব্দ লিখতে হবে।

(৫) সরল, সহজ ও বোধগম্য বাংলা পরিভাষা তৈরি করার জন্য বিভিন্ন বিষয়ে পৃথক কমিটি গঠন করতে হবে এবং এক বছরের মধ্যে পরিভাষা তৈরির কাজ শেষ করতে হবে। এবিষয়ে বাংলাদেশে প্রকাশিত বিভিন্ন বিষয়ক পরিভাষা-পুস্তকগুলির সাহায্য গ্রহণ করা যেতে পারে এবং সেই সঙ্গে ত্রিপুরার অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা গ্রহণের প্রয়োজন।

(৬) বাংলা টাইপ মেশিন না কেনা পর্যন্ত হাতে লিখে সমস্ত সরকারি অফিসে ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কাজ করতে হবে।

(৭) সরকারি অফিসে ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বাংলা টাইপ মেশিন কেনার জন্য অর্থ বরাদ্দ করতে হবে।

(৮) বাংলায় টাইপ চালনা শেখার জন্য সরকারি অফিস ও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের ইংরেজি-টাইপিস্টদের উৎসাহ-ভাতা মঞ্জুর করতে হবে।

(৯) যে-সকল বেকার যুবক বাংলায় টাইপ করতে শিখেছেন, তাঁদেরকে অবিলম্বে চাকরিতে নিয়োগ করতে হবে।

(১০) জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষা সহ বিভিন্ন কেন্দ্রীয় পরীক্ষায় ইংরেজিভাষা বিষয়ক ১০০ নম্বরের একটি পত্র পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু ইংরেজির সঙ্গে বাংলাকে সমপর্যায়ভুক্ত করতে হলে ১০০ নম্বরের বাংলাভাষা বিষয়ক একটি পত্র পরীক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

(১১) বর্তমানে ইংরেজিতে চাকরির দরখাস্ত করার প্রথা বর্তমান। কিন্তু বাংলাতেও চাকরির দরখাস্ত করার আহ্বান জানাতে হবে এবং বিজ্ঞাপনে তা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে।

(১২) চাকরির ইন্টারভিউতে বাংলাভাষায় জ্ঞান ও হস্তাক্ষরের ওপরে বিশেষ মূল্য দিতে হবে।

(১৩) ইংরেজি শেখানোর জন্য রাজ্যের এডুকেশন ডাইরেক্টরেটের অধীনে 'ইনস্টিটিউট অব ইংলিশ' নামক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রয়েছে, কিন্তু বাংলাভাষা শেখানোর জন্য এধরণের কোনো প্রতিষ্ঠান নেই। অথচ বর্তমানে স্কুল-কলেজের অধিকাংশ বাংলা-শিক্ষকের ব্যাকরণ-জ্ঞান উচ্চ মানের নয়। ছাত্রদের দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত বাংলাভাষায় দক্ষ করে তুলতে হলে শিক্ষকদের বাংলা ব্যাকরণে পারঙ্গম হওয়া প্রয়োজন। সেজন্য 'বঙ্গভাষা-শিক্ষা শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়' গড়ে তুলতে হবে এবং এখানে পঠন-পাঠনের জন্য টেক্সট বুক বর্জিত কেবলমাত্র ভাষাবিষয়ক পাঠ্যসূচী প্রণয়ন করতে হবে। বাংলা-শিক্ষকেরা যাতে এই প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা-গ্রহণে উৎসাহ-বোধ করেন, সেজন্য সর্ববিধ ব্যবস্থা অবলম্বন

করতে হবে।

(১৪) ইংরেজি, ইতিহাস, দর্শন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থনীতি ইত্যাদি বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষাদানের জন্য বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে প্রত্যেক বছরে তিন সপ্তাহ থেকে এক মাস পর্যন্ত শিক্ষা-শিবির খোলা হয় এবং তার ব্যয় বহন করেন ইউ. জি. সি.। কিন্তু উচ্চতর বাংলা শিক্ষার জন্য এধরণের কোনো ব্যবস্থা নেই। সুতরাং বাংলায় উচ্চতর জ্ঞানের জন্য প্রত্যেক বছরে শিক্ষা-শিবির স্থাপন করতে হবে এবং ইউ. জি. সি. যাতে এই ব্যয় বহন করেন, সেজন্য বিশ্ববিদ্যালয় ও সরকারকে চেষ্টা করতে হবে।

(১৫) বাংলায় শিক্ষাগ্রহণের মানসিকতা গড়ে তুলতে হলে পশ্চিমবাংলার প্রত্যেকটি মহকুমা-শহরে সরকারি স্কুল স্থাপন করতে হবে। ইংরেজি-স্কুলে ছেলেমেয়েদের ভর্তি করানোর মানসিকতা দূর করতে হলে বেসরকারি আঞ্চলিক ভাষার স্কুলগুলিতে শিক্ষার আবহাওয়া গড়ে তুলতে হবে এবং ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত ভাষা-শিক্ষার (মাতৃভাষা ও ইংরেজিভাষা) ওপরে গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। কলেজগুলিতে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীতে সাহিত্য-অধ্যয়নের সঙ্গে ভাষা-শিক্ষাদানের প্রথা প্রবর্তন করতে হবে।

(১৬) জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে মাতৃভাষা ব্যবহারের জন্য নিরবচ্ছিন্ন প্রচারের প্রয়োজন। একাজে সফল হতে হলে রাজ্য সরকারের উদ্যোগে সমস্ত শিক্ষক সংগঠন ও গণসংগঠনের প্রতিনিধিদের নিয়ে জেলা-স্তরে ও রাজ্য-স্তরে কমিটি গঠন করতে হবে।

১৯৮২ সালের সাধারণ নির্বাচনে (১৯ মে) বামফ্রন্ট জনগণের বিপুল সমর্থন নিয়ে দ্বিতীয়বার রাজ্যের শাসনক্ষমতা লাভ করেছেন। এই নির্বাচনে মধ্যবিত্ত-শ্রেণীর মানসিকতা উপলব্ধি করে বামফ্রন্ট ভাষা-সংগ্রামে উপযুক্ত ১৬-দফা কার্যক্রম গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করবেন আশা করি। এবং তাঁরা যে মাতৃভাষা-শিক্ষা বিষয়ে গুরুত্বপ্রদানে সচেষ্ট, তার পরিচয় পাওয়া যায় উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের ভাষা-শিক্ষাদানের নীতির পরিবর্তনে।

এই প্রসঙ্গে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের ভাষা-শিক্ষা সম্পর্কে কিছু বলা প্রয়োজন। বর্তমানে মাতৃভাষাকে প্রথম ভাষা ও ইংরেজিভাষাকে দ্বিতীয় ভাষা বলা হলেও উচ্চ মাধ্যমিক পাঠক্রমে দু'টি ভাষাই কার্যত প্রথম ভাষা। দু'টি ভাষার পত্রসংখ্যা ও পূর্ণসংখ্যা একই—দু'টি পত্র এবং প্রত্যেকটি পত্রের পূর্ণসংখ্যা ১০০। এই দু'টি ভাষার পরীক্ষার প্রশ্নপত্র একই মানে তৈরি করা হয় এবং বিচার করাও হয় একই মানে। ফলে যাঁরা মাতৃভাষাকে প্রথম ও ইংরেজি-

ভাষাকে দ্বিতীয় ভাষা রূপে গ্রহণ করে মাধ্যমিক পরীক্ষায় ভাষা-বিভাগে (Language Group) উত্তীর্ণ হয়েছেন, উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষায় ইংরেজিভাষা কার্যত প্রথম ভাষা হওয়ায় তাঁদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ এই বিষয়ে সফলতা অর্জনে সক্ষম হন না। বিপরীত ক্ষেত্রেও একই চিত্র। মাধ্যমিক স্তরে ইংরেজিকে প্রথম ভাষা ও বাংলাকে দ্বিতীয় ভাষা রূপে গ্রহণ করে মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় যাঁরা প্রথম ভাষা রূপে বাংলা পরীক্ষা দেন, তাঁদের মধ্যে অধিকসংখ্যক পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেন না। ফলে হাজার-হাজার তরুণ শিক্ষার্থীর জীবনে অন্ধকার নেমে আসে।

এই অবস্থার পরিবর্তনের জন্য সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে পঃ বঃ উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের মুখপত্র 'সংসদ পরিচিতি' পত্রিকায় (৫ম-৬ষ্ঠ সংখ্যা ; নভেম্বর-ডিসেম্বর, ১৯৭৯) লিখেছিলাম, "যারা ইংরেজিকে প্রথম ভাষা রূপে গ্রহণ করবে তাদের ক্ষেত্রে বাংলা দ্বিতীয় ভাষা প্রবর্তন করা প্রয়োজন। ভিন্নভাষী ছাত্রছাত্রীরা যাতে বাংলাভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রেখে বাংলা দ্বিতীয় ভাষার পাঠক্রম নির্ধারণ করতে হবে। অনুরূপভাবে যারা মাতৃভাষাকে প্রথম ভাষা রূপে গ্রহণ করবে তাদের জন্যেও ইংরেজি দ্বিতীয় ভাষা প্রবর্তনের প্রয়োজন।" কিন্তু যে সমস্ত ডিগ্রীধারী বামপন্থী-দক্ষিণপন্থী অধ্যাপক-বিদ্যাবান স্নাতক স্তরের ভাষা-শিক্ষা সম্পর্কে সোচ্চার-সরব, তাঁরা উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের ভাষা-শিক্ষা বিষয়ে নিরুচ্চার-নীরব। আমার মত একজন 'অজ্ঞাত কুলশীল' লেখকের রচিত উক্ত প্রবন্ধ তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়নি। কিন্তু উক্ত রচনার প্রতি উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের বর্তমান কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় এবং ভাষাশিক্ষা-ক্ষেত্রের অব্যবস্থা দূর করার জন্য তাঁরা ১৯৮৩ সাল থেকে বাংলা —প্রথম ভাষা ও দ্বিতীয় ভাষা প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। ইংরেজির ক্ষেত্রেও একই নীতি অবলম্বিত হবে। পত্রসংখ্যা ও পূর্ণসংখ্যা একই থাকলেও দ্বিতীয় ভাষার জন্য পৃথক মানের পাঠক্রম তৈরি করা হবে এবং সেই মান অনুসারে দ্বিতীয় ভাষা-শিক্ষা বিচার করা হবে।

* * *

বর্তমান ভাষা-সংগ্রামে ভোরের শুকতারা হলেন রবীন্দ্রনাথের সাহচর্যধন্য জ্ঞানপ্রবীণ সত্যসন্ধ শিক্ষাগুরু ডঃ. প্রবোধচন্দ্র সেন, দেশিকোত্তম। খ্যাতনামা বুদ্ধিজীবী-বিদ্যাবানদের মত শাসকশ্রেণীর স্বার্থে তিনি বুদ্ধি ও বিদ্যাকে ব্যবহার না করে আজীবন জনশিক্ষার জন্য সংগ্রাম করেছেন ; শাসকশ্রেণীর প্রসাদ-

লাভেচ্ছুক সারিবদ্ধ বিদ্যাবানদের সঙ্গ পরিত্যাগ করে তিনি 'অজ্ঞাতকুলশীল'দের সঙ্গে মেঠো সুরে যে গান গেয়েছেন, সেই গানের কথায় ছিল না বুদ্ধি ও বিদ্যার মারপ্যাঁচ, তাতে ছিল পল্লীর বঞ্চিত-লাঞ্ছিত মানুষের জন্য হৃদয়-নিষিক্ত গভীর বেদনা, তা ছিল উষার আগমনী সঙ্গীত। জ্ঞানবৃদ্ধ শ্রী সেন ভাষা-সংগ্রামে জনগণের পাশে দাঁড়িয়ে জনশিক্ষার সমর্থনে অতুলনীয় সংগ্রাম করেছেন; সত্যাদর্শের প্রতি অনুগত থেকে তিনি রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শকে উর্দ্ধে তুলে ধরেছেন; ভীষ্মের মত তিনি শিক্ষা-ব্যবসায়ীদের নিক্ষিপ্ত সমস্ত শর প্রতিহত করেছেন; তাঁর অক্লান্ত-শাণিত লেখনী শাসকশ্রেণীর সেবাদাসদের সন্ত্রস্ত করে তুলেছে। বুদ্ধির বিনিময়ে জীবনধারণের পাথেয় সংগ্রহে অনিচ্ছুক জ্ঞানসাধকের জীবনাদর্শের আলোকে আত্মবিক্রীত পণ্ডিতসমাজের যথার্থ স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে।

জ্ঞানহীন ও অজ্ঞাতকুলশীল হওয়া সত্ত্বেও শিক্ষেতিহাসের তথ্য সংগ্রহে আমি অনুপ্রাণিত-উদ্দীপ্ত হয়েছিলাম সত্যোপাসক শিক্ষাচার্যের অকুতোভয়ী সংগ্রামে। তাই বর্তমান গ্রন্থ রচনা করে প্রথমেই গিয়েছিলাম জ্ঞানতাপসের আশীর্বাদ নিতে। কোনো-কোনো বিষয়ে মতবিরোধ থাকা সত্ত্বেও এই বুদ্ধিহীন লেখককে তিনি দোরগোড়া থেকে ফিরিয়ে দেননি। যড়শীতি বৎসর হওয়া সত্ত্বেও তিনি সানন্দে লিখে দিয়েছেন জ্ঞানসমৃদ্ধ ভূমিকা। তাঁর সুচিন্তিত ও সুলিখিত ভূমিকার জন্য এই অকিঞ্চিৎকর গ্রন্থের মূল্য অপরিসীম হয়ে উঠেছে। শিক্ষাগুরুর চরণে জানাই আমার অন্তরের সশ্রদ্ধ প্রণাম।

গ্রন্থ-রচনাকালে অধ্যাপক সন্তোষকুমার মিত্র, ডাঃ. জ্যোতির্ময় চট্টোপাধ্যায় ও শ্রী নিমাই চক্রবর্তী (প্রধান শিক্ষক, হেয়ার স্কুল) আমাকে নানা বিষয়ে মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছেন, পাণ্ডুলিপি সংশোধন করেছেন, দুরূহ কর্ম সম্পাদনে নিরন্তর উৎসাহ ও প্রেরণা দিয়েছেন। তাঁদের সহায়তা ভিন্ন আমার পক্ষে বর্তমান গ্রন্থ-রচনা সম্ভবপর হ'ত না। কেবলমাত্র কৃতজ্ঞতা প্রকাশের দ্বারা অগ্রজ-প্রতিমদের অকৃপণ স্নেহের ঋণ পরিশোধ করা সম্ভব নয়। তাঁদের প্রতি জানাই আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি।

তথ্য-সংগ্রহে নিজেদের অমূল্য সময় নষ্ট করে আমাকে সাহায্য করেছেন অধ্যাপক ডঃ. আশিসকুমার রায় (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়), অধ্যাপক ডঃ. পবিত্র সরকার (যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়), অধ্যক্ষ শ্রী কমলকুমার চট্টোপাধ্যায় (রাজ্য শিক্ষা সংস্থা, বাণীপুর) এবং অধ্যক্ষ শ্রী সুনীলকুমার রায় (বেহালা কলেজ অব কমার্স)। গ্রন্থ-প্রণয়নে তাঁদের সাগ্রহ সহযোগিতার জন্য আমি

তাঁদের কাছে চিরঋণী।

বিভিন্ন বিষয়ের দুর্লভ গ্রন্থ ও সাময়িকপত্র দিয়ে গ্রন্থ-রচনায় সাহায্য করেছেন অধ্যক্ষ শ্রী সুব্রত গুপ্ত (যোগমায়া দেবী কলেজ), অধ্যক্ষ শ্রী কার্তিক দেউটি (হরিমোহন ঘোষ কলেজ), অধ্যক্ষ শ্রী অজিত চট্টোপাধ্যায় (নিখিল বঙ্গ শিক্ষক শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়), অধ্যাপক ব্রজগোপাল নাগ চৌধুরী (বনগাঁ কলেজ), অধ্যাপক সচ্চিদানন্দ সরকার (বিদ্যানগর কলেজ), শ্রী প্রশান্ত সেনগুপ্ত ও শ্রীমতী অশোকা নাগচৌধুরী। গ্রন্থ-সংক্রান্ত নানাবিধ কাজে সাহায্য করেছেন অধ্যাপক দ্বিজদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (যোগমায়া দেবী কলেজ), অধ্যাপক নন্দদুলাল দাস (নিউ আলিপুর কলেজ), অধ্যাপিকা ডঃ. সঙ্ঘমিত্রা বন্দ্যোপাধ্যায় (যোগমায়া দেবী কলেজ), অধ্যাপক ডঃ. পল্লব সেনগুপ্ত (দেশবন্ধু গার্লস কলেজ), অধ্যাপক সাজাহান ঠাকুর (জগন্নাথ কলেজ, ঢাকা) ও কবি অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়। তাঁদের কাছে আমার ঋণ অপরিশোধ্য।

গ্রন্থের কিছু অংশ 'সংসদ পরিচিতি' পত্রিকায় প্রকাশের জন্য পঃ বঃ উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতি শ্রীমতী অনিলা দেবীর কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সর্বশ্রী অরুণ দত্ত, প্রশান্ত রায়, শঙ্কর ভট্টাচার্য, যামিনী আদক প্রমুখ কর্মীরা আমার উপদ্রব-অত্যাচার হাসিমুখে সহ্য করে অক্লান্ত ভাবে দুষ্প্রাপ্য বই সরবরাহ করেছেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের কর্মীরা একশো বছরের বিভিন্ন পরীক্ষার ফলাফল গ্রন্থনে আমাকে সাহায্য করেছেন। তাঁদের নিঃস্বার্থ সাহায্য আমি কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করছি।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বর্তমান সম্পাদক অধ্যাপক দিলীপকুমার বিশ্বাস কার্যনির্বাহক সমিতির কার্যবিবরণী নকল করার অনুমতি দিয়ে বিদ্যাবানদের যথার্থ স্বরূপ উন্মোচনে আমাকে সাহায্য করেছেন। সেজন্য আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।

সংসারের হাজারো কাজের ঝামেলার মধ্যে থেকেও আমার সহধর্মিনী শ্রীমতী অমলা ভট্টাচার্য চূড়ান্ত পাণ্ডুলিপি-রচনায় নিরলস সহযোগিতা করেছেন এবং পাণ্ডুলিপির অনুলেখন করেছে আমার জ্যেষ্ঠা কন্যা —অতসী ভট্টাচার্য। শিক্ষেতিহাস রচনাকালে কনিষ্ঠা কন্যা অঙ্গনা ছিল আমার কাছে ওয়েসিস-স্বরূপ —তার হাসি-হাসি মুখ আলোচ্য বিষয়টিকে সরস করে তুলেছে। তাদের প্রতি রইল আমার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা।

বিশাল গ্রন্থটির মুদ্রণে কোনো প্রকাশক রাজী না হওয়ায় নিজেই অর্থ সংগ্রহ করে মুদ্রণ-কার্যে অগ্রসর হয়েছিলাম। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থানুকূল্য সত্ত্বেও মধ্যপথে অর্থাভাবে গ্রন্থটির মুদ্রণ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় 'বর্ণ পরিচয়'-এর স্বত্বাধিকারী শ্রী ফণীভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রন্থ-প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর আন্তরিক সহায়তা ভিন্ন গ্রন্থ-মুদ্রণ সম্ভব ছিল না। মাতৃভাষার প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগের জন্য তাঁকে জানাই সশ্রদ্ধ অভিবাদন।

মুদ্রণ-সংক্রান্ত সর্ববিধ কাজে সাহায্য করেছেন বন্ধুবর শ্রী শিবব্রত গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রী বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায়, শ্রী অমল মুখার্জী ও শ্রী দেবব্রত বসু। প্রচ্ছদ এঁকেছেন বন্ধুশিল্পী শ্রী সজল রায় ও প্রচ্ছদ-মুদ্রণে সাহায্য করেছেন শ্রী সুধীর মুখোপাধ্যায়, শ্রী প্রসূন বসু ও শ্রী নিশীথ ঘোষ। তাঁদের নিঃস্বার্থ সহযোগিতা আমাকে চিরঋণী করে রেখেছে।

গ্রন্থের কিছু অংশ মুদ্রিত হয়েছে তিনটি ছাপাখানায়—নিউ নারায়ণী প্রেস (১/২, রামাকান্ত মিস্ত্রী লেন, কলিকাতা-১২), লক্ষ্মী-সরস্বতী প্রেস (২০৯ বি, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬) এবং বাণী মুদ্রণ (১২, নরেন সেন স্কোয়ার, কলিকাতা-৯)। প্রুফ সংশোধনের কাজে অনভিজ্ঞতা হেতু গ্রন্থ-মধ্যে কিছু মুদ্রণ-প্রমাদ রয়ে গেছে। এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য সংবেদনশীল পাঠকদের কাছে মার্জনা চাইছি।

সমকালীন সমাজের পটভূমিতে রচিত এই গ্রন্থ যদি মধ্যবিত্তশ্রেণীর ঔপনিবেশিক মানসিকতা দূরীকরণে ও ইংরেজিভাষার পরিবর্তে মাতৃভাষার প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ সঞ্চারে কিছুমাত্র সাহায্য করে, তবেই আমার সুদীর্ঘ চার বছরের সকল শ্রম সার্থক হবে।

১৫ আগস্ট, ১৯৮২
৬৩এ, রসা রোড ইস্ট
ফার্স্ট লেন
কলকাতা—৭০০,০৩৩

কুমুদকুমার ভট্টাচার্য

আধুনিক শিক্ষা
ও
মাতৃভাষা

প্রথম অধ্যায়

দাঁড়াও পথিকবর

ভাবপ্রকাশের বাহন ভাষা। সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনার অভিব্যক্তি ঘটে ভাষার মাধ্যমে। মানুষের ভাষা তার সাধারণ মনোভাব প্রকাশের প্রয়োজনেই সৃষ্টি হয়েছে। কেবলমাত্র এটুকু বললেই মানব-সভ্যতার বিকাশে ভাষার শক্তিশালী ভূমিকার সঠিক পরিমাপ করা যায় না। বর্বর-যুগে প্রকৃতির প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে ও হিংস্র জীবজন্তুর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য মানুষ যেমন লোহার ব্যবহার করতে শিখেছে, শস্য উৎপাদনের কৌশল আবিষ্কার করেছে, তেমনি ভাষা-সৃষ্টির মাধ্যমে গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনযাপন করতে অনুপ্রাণিত হয়েছে। আদিম যুগে শব্দে তৈরি কোনো ভাষা না থাকলেও আদিম যুগেই ভাষার ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল।[১] হাত যেমন আদিম যুগের মানুষকে বন্য জীবনের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করেছে, ভাষাও তেমনি তাকে উচ্চ পর্যায়ের বর্বর-যুগ থেকে সভ্যযুগে উত্তরণে সাহায্য করেছে। মানুষের শ্রমের দান যেমন সমাজ, তেমনি সমাজের দান হল ভাষা।[২] 'সমাজ এবং সমাজের লোকদের মধ্যে এই প্রাণগত মনোগত মিলনের ও আদান-প্রদানের উপায়স্বরূপ মানুষের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ যে সৃষ্টি সে হচ্ছে তার ভাষা। এই ভাষার নিরন্তর ক্রিয়ায় সমস্ত জাতকে এক করে তুলেছে ; নইলে মানুষ বিচ্ছিন্ন হয়ে মানবধর্ম থেকে বঞ্চিত হত।'[৩]

আজ থেকে দশ হাজার বছর আগে মেসোপটেমিয়ায় প্রাচীন জনগোষ্ঠী যখন কৃষি-ব্যবস্থা আবিষ্কার করে, তখন থেকেই শ্রেণীভিত্তিক সমাজব্যবস্থার সূচনা হয়। কৃষির উদ্ভবের ফলে যাযাবর শিকারী ও পশুচারণজীবীরা জনপদবাসী হয় এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভব ঘটে। ফলে সভ্যযুগে প্রবেশকালে সমাজে মাতৃসত্তার আধিপত্য বিলুপ্ত হয় এবং পিতৃসত্তা ও পুরুষ-প্রাধান্য স্থাপিত হয়। পিতৃসত্তা প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় সমাজে শ্রেণীভেদ আরম্ভ হয়, তার সঙ্গে সাম্যবাদী রীতিনীতিও সমাজ থেকে লুপ্ত হয়ে যায়।[৪] সমাজের জনতান্ত্রিক গঠন ভেঙে গিয়ে নতুন শ্রেণীবৈষম্য দেখা দেয় এবং শ্রেণী-আধিপত্য প্রতিষ্ঠার কাজে ভাষা প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে।

'ধ্বনিসমৃদ্ধ বর্ণমালা উদ্ভাবন ও সাহিত্য সৃষ্টির সাথে সভ্যতার'[৫] আবির্ভাব ঘটেছে

মেসোপটেমিয়া, মিশর ও সিন্ধুতীর —মানব সভ্যতার এই তিন প্রাচীন জন্মভূমিতে। মিশরের হিয়েরোগ্লিফিক লিপি বা চিত্রলিপি বিবর্তিত হয়ে যে বর্ণমালার উদ্ভব হয়, সভ্যতার বিকাশে তা বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে। ফিনিশীয়দের মাধ্যমে এই বর্ণমালা ইউরোপে এসে পৌঁছায়। আবার এ সময় থেকে শ্রেণীকাঠামো গড়ে ওঠে। কৃষি-সভ্যতা কিছুদূর অগ্রসর হবার সঙ্গে সঙ্গে কৃষিসম্পদ-মালিকদের হাতে নতুনতর হাতিয়ার সংযুক্ত হল —লিপি। কিন্তু তা রইল সাধারণের নাগালের বাইরে। সুতরাং এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, শ্রেণীবিভক্ত সমাজের সূচনা ও লিপির উদ্ভব একই সময়ে ঘটেছিল।

আদিম-যুগ থেকে বর্বর-যুগের মধ্য দিয়ে সভ্যযুগের দিকে মানুষের ক্রমিক অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সম্পত্তির ওপরে যৌথ মালিকানা কিংবা সামজিক অধিকারের অবসান ঘটে। পূর্বের সমানতা, সাংঘিকতা সমস্তই ধীরে ধীরে নষ্ট হয়ে যায় এবং ব্যক্তিগত মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় সমাজে দুই বিরোধী শ্রেণী শাসক ও শাসিতের সৃষ্টি হতে থাকে। ব্যক্তিক সম্পত্তির নিরাপত্তার স্বার্থে বিভিন্ন যুগে গড়ে উঠেছে বিভিন্ন শোষণমূলক সমাজ-কাঠামো। আদিম যুগের সাম্যব্যবস্থা থেকে শোষণমূলক সমাজব্যবস্থায় রূপান্তরকালে শাসকগোষ্ঠী ব্যক্তিক সম্পত্তির নিরাপত্তা ও শ্রীবৃদ্ধির জন্য উন্নত অস্ত্রাদি ব্যবহারের সঙ্গে ভাষাকেও ব্যবহার করেছিল। এঙ্গেল্স লিখেছেন, "সভ্যতার প্রথম দিন থেকে আজ পর্যন্ত বিচার করলে দেখি, লোভ চিরদিনই তাহার সহচর —ধন, আরও ধন, আরও অধিক ধন —তাহাও সামাজিক বা সামূহিক ধন নহে, —নীচ, মহানীচ ব্যক্তিক ধনই তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। এই নীচ লক্ষ্য পূর্ণ করিতে গিয়া সভ্যতার ঝুলিতে সময় সময় বিজ্ঞান, কিংবা কলার উচ্চবিকাশের ফল যদি আসিয়া পড়িয়া থাকে —তবে তাহাও শুধু এইজন্য যে, ইহা ছাড়া বর্তমানে ধনের উপর তাহার যে অধিকার আছে, সেই অধিকার লাভ সম্ভব হইত না।"[৬] অথচ যে ভাষার সাহায্যে তাঁরা বিজ্ঞান ও কলার উচ্চবিকাশের ফল-লাভের অধিকারী হয়েছেন, সেই 'ভাষা কোনো একটি বিশেষ শ্রেণী দ্বারা সৃষ্টি হয়নি ; বরং ভাষা হল গোটা সমাজের সৃষ্টি, সমাজের সকল শ্রেণীর সৃষ্টি, শত শত বংশপরম্পরার প্রচেষ্টার ফল। কোনো বিশেষ শ্রেণীর প্রয়োজন মেটানোর জন্য ভাষার সৃষ্টি হয়নি বরং সমগ্র সমাজের, —সমাজের সমস্ত শ্রেণীর জন্যই ভাষার উদ্ভব।'[৭]

অর্থাৎ যে ভাষা জীবনধারণের তাগিদে সকলের প্রয়োজনে সম্মিলিত প্রয়াসে গড়ে উঠেছিল, যা ছিল জনগণের মুখের ভাষা, সভ্যযুগে সেই লৌকিক ভাষাকে সংস্কার সাধনের দ্বারা শাসকশ্রেণীর সেবায় নিয়োগ করা হয়েছিল, অভিজাতশ্রেণীর স্বার্থরক্ষার্থে ও মনোরঞ্জনার্থে রচিত হয়েছিল দর্শন-কলা-সাহিত্য। মনু প্রভৃতি ধর্মশাস্ত্রকারেরা দেশের রাজা এবং প্রজার কর্তব্য সম্পর্কে বহু প্রকার বাগ্‌বিস্তার করেছেন। তাঁরা

শাসক ও রাজার জন্য প্রজার কায়িক শ্রম এবং জীবনের শ্রেষ্ঠাংশ উৎসর্গ করতে বলেছেন —কিন্তু প্রজার অধিকারের তালিকায় পরজন্ম বা পরলোকের স্বর্গস্বপ্ন ছাড়া আর কিছুরই নির্দেশ দেওয়া হয়নি।[৮] কারণ বৈদিককালের সমাজও তার আভ্যন্তরীণ স্বার্থ-সংঘাত এবং বর্গ ও বর্ণভেদজাত বিদ্বেষে জর্জর ছিল। তাই সমাজকে একদেহ পুরুষ কল্পনা করে সমাজের বিভিন্ন বর্গকে অর্থাৎ শ্রেণীকে তার প্রত্যঙ্গ কল্পনা করার উদ্দেশ্য ছিল বর্গবিদ্বেষকে নরম করা। এই চেষ্টায় বেদের পুরুষসূক্তে লেখা হয়েছে —'ব্রাহ্মণ ইহার মুখ, রাজন্য ভুজ, বৈশ্য জঙ্ঘা এবং শূদ্র ইহার পাদস্বরূপ।'[৯] এভাবে দাস ও শ্রমিকের শ্রমসৃষ্ট সমৃদ্ধির ওপরে জনজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন সংস্কৃত ভাষায় বৈদিক ধর্ম-দর্শন-সংস্কৃতির ভিত্তি স্থাপিত হয়।

ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর কয়েকটি উপজাতি আনুমানিক ১৫০০ খৃষ্টপূর্বাব্দের কাছাকাছি সময়ে ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলে পদার্পণ করেন এবং সেখান থেকে তাঁরা ধীরে ধীরে পঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, রাজপুতানা, বিহার ইত্যাদি রাজ্যে উপনিবেশ স্থাপন করেন। তাঁরাই 'আর্য' নামে এদেশে পরিচিত এবং তাঁদের ভাষা ছিল বৈদিক বা ছান্দস্। এই ভাষায় রচিত হয় আর্যজাতির প্রাচীনতম সাহিত্য ঋগ্‌বেদ। আর্যরা যখন ভারতে আদিম উপজাতিগুলির সঙ্গে সংঘর্ষে বিজয়ী হয়ে আধিপত্য বিস্তার করেন, তখন এদেশের বিভিন্ন উপজাতিগোষ্ঠী 'অনার্য' নামে পরিচিত হন। তাঁদের অনেকের নিজস্ব সভ্যতা ছিল, তার অন্যতম বাহন ভাষাও ছিল। কিন্তু বিজয়ী জাতির ভাষা ও সংস্কৃতির প্রভাবে কোথাও তাঁদের ভাষার বিলুপ্তি ঘটে, আবার কোথাও বিজয়ী ও বিজিত জাতির ভাষা ও সংস্কৃতির মিশ্রণ ঘটে। 'ভারতবর্ষে আগমন করিবার পূর্বে ভারতবর্ষে যে-ভাষাসমূহ প্রচলিত ছিল আর্যগণের ভাষা তাহাদের দ্বারা বহুলাংশে প্রভাবিত হইয়াছে।'[১০] ফলে বৈদিক ভাষার বদল হতে থাকে এবং প্রাকৃত ভাষার উদ্ভব হয়। 'প্রাকৃত ভাষা' কথাটির প্রকৃত তাৎপর্য হল 'প্রকৃতি'র অর্থাৎ জনগণের কথ্য ও বোধ্য ভাষা। সুতরাং বৈদিক ভাষার বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য পাণিনি ব্যাকরণের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে পরিবর্তিত আর্য ভাষাকে সংস্কারসাধন করেন এবং তার নাম হয় সংস্কৃত ভাষা। এই ভাষা মূলতঃ কৃত্রিম সাহিত্যিক ভাষা। সংস্কৃত ভাষা হল উচ্চবিত্ত বৈদগ্ধ্যের ভাষা, আর প্রাকৃত ভাষা জনগণের কথ্যভাষা।

সংস্কৃত ভাষা শুদ্ধ ভাষা রূপে শিষ্ট-সমাজে প্রচলিত হলেও জনসমাজের অন্য কেউ কখনো এই ভাষাকে কথ্যভাষা রূপে ব্যবহার করেননি। এ ভাষা তাঁদের কাছে ছিল দুর্বোধ্য। সংস্কৃত ভাষা আর্য সংস্কৃতি-সভ্যতা-ধর্ম-রাষ্ট্র-দর্শন-সাহিত্যের ভাষা রূপে গৃহীত হলেও তা সমাজ-সৃষ্ট না হওয়ায় জনজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল, তখন চলমান জীবন ও গতিশীল মনের ভাব বহন করতে এগিয়ে এল প্রাকৃত ভাষা। বর্ণশাসিত সমাজে

শাসকগোষ্ঠীর স্বার্থে সংস্কৃত ভাষাকে ব্যবহার করার জন্য বিধি-নিষেধের বেড়াজালে ভাষা-বিকাশের স্বাভাবিক গতিকে রুদ্ধ করা হল। প্রাকৃত ভাষা রইল জনগণের দৈনন্দিন কাজের জন্য, আর সংস্কৃত ভাষাকে ব্যবহার করা হল শোষণমূলক রাষ্ট্রকাঠামো টিকিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে রচিত শিক্ষাবিধির মাধ্যম রূপে এবং সাহিত্য-রচনায়। স্তালিনের উক্তি উদ্ধৃত করে বলা যায়, "বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠী, বিভিন্ন শ্রেণী আদৌ ভাষার প্রতি উদাসীন থাকে না। তারা ভাষাকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করতে, তাদের নিজস্ব বিশেষ দুর্বোধ্য ভাষা ও শব্দ এবং বাচনভঙ্গি তার ওপর চাপাতে চেষ্টা করে। বিত্তশালী শ্রেণীর ওপরের স্তরের যারা জনগণের কাছ থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে রাখে এবং জনগণকে ঘৃণা করে অর্থাৎ অভিজাত জমিদার ও ওপরের স্তরের বুর্জোয়ারা বিশেষভাবে এই ব্যাপারে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে চলে। সৃষ্টি হয় 'শ্রেণী' বাচন, দুর্বোধ্য কথাবার্তা, উচ্চ সমাজের 'ভাষা'।"[১১]

বৈদিক যুগে ছাত্ররা বুদ্ধি ও মেধা অনুসারে শিক্ষালাভের অধিকারী ছিল। কিন্তু শিক্ষার ক্ষেত্রে সকলের সমান অধিকার তত্ত্বগতভাবে স্বীকৃত হলেও বাস্তব চিত্র তার বিপরীত ছিল। বৈদিক যুগের ঘটনাবলী প্রমাণ করে যে, বর্ণশাসিত পিতৃতান্ত্রিক-সমাজে উচ্চবর্ণের পুরুষ-সন্তানরাই কেবলমাত্র শিক্ষার্জনের সুযোগ পেয়েছে —'শুধু ব্রাহ্মণের আছে অধিকার ব্রহ্মবিদ্যা লাভে।'[১২] বেদের নির্দেশানুযায়ী সর্বশ্রেষ্ঠ বর্ণ ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষা সীমাবদ্ধ ছিল। প্রধানত ধর্মীয় গুরুদের বংশধররাই শাস্ত্রীয় শিক্ষা-অর্জনের অধিকারী ছিলেন। ধর্মীয় শাস্ত্র অত্যন্ত পবিত্র ছিল এবং অব্রাহ্মণদের কাছ থেকে তা গোপন করে রাখা হত। স্মৃতিতে ধরে রাখার জন্য পবিত্র ধর্মশাস্ত্র, স্তোত্র-মন্ত্র মুখস্থ করতে হত। ব্রাহ্মণ্যযুগে হিন্দু-সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠতম বিকাশ ঘটলেও জনসমাজের বৃহত্তম অংশে জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে পড়েনি ; বরং তার দ্বারা একটি ক্ষুদ্র অংশ উপকৃত হয়েছিল।

বর্ণশাসনের কঠোরতা, বর্গ অর্থাৎ শ্রেণীশোষণের নির্মমতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা-জগতে এই প্রভেদ ও বৈষম্য প্রকট হয়েছে এবং ব্রাহ্মণেরা শিক্ষাকে একচেটিয়া করেছে ; শিক্ষার আঙ্গিনা থেকে বহু দূরে শূদ্রদের সরিয়ে রাখা হয়েছে। সামাজিক-আর্থনীতিক কাজের জন্য যেটুকু জ্ঞানের প্রয়োজন, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদের সেটুকু শিক্ষালাভের সুযোগ দেওয়া হয়েছে। অবশ্য ক্ষত্রিয় রাজারা তা মেনে নিয়েছেন, ব্রাহ্মণদের অধিকারে তাঁরা হস্তক্ষেপ করেননি কিংবা কোনো সংঘর্ষে লিপ্ত হননি। কারণ 'রাজ্যের সকল ঐশ্বর্য সেই সময় পার্থিব শাসক ক্ষত্রিয় এবং দৈবিক শাসক ব্রাহ্মণ —এই দুই সম্প্রদায়ের হস্তগত হইয়া পড়িত। ভারতবর্ষে এই দৈবিক শাসক অর্থাৎ পুরোহিত বা ব্রাহ্মণবর্গকে আমরা গঙ্গার উর্বর মৃত্তিকার উপজ বলিতে পারি। এই স্থানে আর্যদের মধ্যে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়

এই দুইটি পৃথক বর্গের সৃষ্টি হইয়াছিল —কিন্তু তখন উভয় বর্গই নিজেদের স্বার্থগত বিরোধের মধ্যে একটি স্থায়ী সমন্বয় করিয়া লইতে চেষ্টা করে। ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের এই স্বার্থ-সমন্বয় পরবর্তীকালেও প্রায় তিন, সাড়ে তিন হাজার বৎসর ধরিয়া অক্ষুণ্ণ ছিল।'[১৩] তাই দেখা যায়, সেকালে 'রাজারা দান-দক্ষিণা প্রভৃতি রূপে পুরোহিতকে তাহাদের ভোগবস্তুর একটা অংশ ছাড়িয়া দিতেন। ইহা প্রকৃতপক্ষে রাজন্যদের শোষণকে নির্বিরোধ ও ধর্মানুমোদিত রাখিবার জন্য পুরোহিতকে উৎকোচ দান ছাড়া কিছুই নহে। …এখানকার রাজারা পুরোহিতকে শুধুমাত্র ভোগসম্পত্তি দান করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন না, তাঁহারা স্ব-ইচ্ছায় সমাজে নিজেদের স্থানও ব্রাহ্মণের নীচে স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন।'[১৪]

বৈদিক সমাজে বর্ণাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য শিক্ষাকে একচেটিয়া সম্পত্তিতে পরিণত করার কাজে ব্রাহ্মণসম্প্রদায় ভাষাকে প্রধান অস্ত্র-রূপে ব্যবহার করেছিলেন। সংস্কৃত ভাষাকে উচ্চশিক্ষার মাধ্যম রূপে গ্রহণ করা হয়েছিল এবং তা জনগণের মাতৃভাষা ছিল না। 'ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণগণ বরাবরই ধর্মশাস্ত্রের ভাষাকে এবং শিক্ষিত শ্রেণীর ভাষাকে সাধারণের কথ্যভাষা হইতে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ফল এই দাঁড়াইয়াছিল যে শিক্ষিত শ্রেণীর ভাষা জনগণের কথ্যভাষা ছিল না।'[১৫] যাঁরা (ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়) সংস্কৃত ভাষায় দক্ষ ছিলেন তাঁরাই কেবলমাত্র উচ্চশিক্ষা-লাভের সুযোগ পেয়েছিলেন। এভাবে ভাষা-মাধ্যমকে সম্প্রদায়গত স্বার্থে ব্যবহার করে শিক্ষালাভের সুযোগকে সঙ্কুচিত করায় বৈদিক-যুগের প্রচারিত সাম্যতত্ত্বের পরিবর্তে সমগ্র সমাজে অসাম্য ও বৈষম্য প্রকট হয়ে উঠল এবং বিদ্রোহ দেখা দিল। বৌদ্ধধর্মের আবির্ভাবের মধ্য দিয়ে শোষণ ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের প্রকাশ ঘটেছিল।[১৬]

একই অভিমত ব্যক্ত হয়েছে বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনায় —"সংস্কৃত তখন কেবলমাত্র সাহিত্যের ভাষা, শিক্ষিতের ভাষা; রাজসভায় পণ্ডিতেরা বসিয়া তাহার আলোচনা করিতেন, চতুষ্পাঠীতে ছাত্রেরা মিলিয়া অধ্যাপকের নিকট তাহার ব্যাকরণ শিক্ষা করিত; এখন যেমন ইংরেজি না জানিলে সমাজে প্রতিপত্তি হয় না, তখন সেইরূপ সংস্কৃত না শিখিলে সম্ভ্রম রক্ষা করা কঠিন হইয়া উঠিত। সাধারণ লোকের সংস্কৃত ভাষার সহিত সুতরাং বড় একটা সংস্পর্শ ছিল না। তাহারা জ্ঞানরাজ্যের বাহিরে প্রচলিত ভাষায় তুচ্ছ প্রসঙ্গের মধ্যে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিত।

"কিন্তু বুদ্ধদেব আসিয়া যখন দেশের সর্বসাধারণকে বাহু প্রসারণপূর্বক আহ্বান করিলেন, সম্ভ্রান্ত সংস্কৃত ছাড়িয়া তাঁহাকে পালির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইল। ফল হইল যে, ব্রাহ্মণশাসনের সংস্কৃত বেড়া কাজে লাগিল না, এবং দেখিতে দেখিতে দেশের সর্ব-সাধারণের মধ্যে বৌদ্ধধর্ম ও ভাব বায়ুতাড়িত বহ্নিশিখার ন্যায় হু হু শব্দে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল।"[১৭]

বর্ণশাসিত হিন্দু সমাজ, ধর্ম, শিক্ষা ও সংস্কৃতির ওপরে প্রবল আঘাত হেনেছিল বৌদ্ধধর্ম ও জৈনধর্ম। খ্রীঃ. পূঃ. ষষ্ঠ শতকে বুদ্ধদেব আবির্ভূত হয়ে যেমন যজ্ঞাদি-প্রধান ব্রাহ্মণ্য ধর্মের ওপর আক্রমণ করলেন, বর্ণ-প্রাধান্যকে অগ্রাহ্য করলেন, তেমনি সংস্কৃত ভাষার শ্রেষ্ঠত্ব অস্বীকার করলেন। তাঁরা শিক্ষাকে একটি বর্ণের নিজস্ব সম্পত্তি বলে মনে করতেন না। পক্ষান্তরে তাঁরা বর্ণশাসন ও শিক্ষাকে একচেটিয়া করার জন্য ব্রাহ্মণদের প্রয়াসকে নিন্দা করেছেন। বুদ্ধদেব নিজে জনসাধারণের কথ্যভাষা মাগধী ও অর্ধ-মাগধী প্রাকৃতে তাঁর উপদেশাবলী প্রচার করেছিলেন এবং তাঁর শিষ্যদেরকে সংস্কৃত ভাষার পরিবর্তে নিজ নিজ মাতৃভাষায় তাঁর উপদেশামৃত প্রচার ও পঠন-পাঠনের নির্দেশ দিয়েছিলেন। শিক্ষাক্ষেত্রে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর মানুষকে শিক্ষাগ্রহণের অধিকার দেওয়া হয়েছিল এবং সংস্কৃত ভাষার পরিবর্তে মাতৃভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম রূপে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল। ফলে কেবলমাত্র মেয়েরা নয়, চণ্ডাল এবং শূদ্ররাও শিক্ষা-লাভের সুযোগ পেয়েছিলেন। 'মৌর্য যুগে বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের প্রভাবে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম বেশ কোণঠাসা হইয়া পড়িয়াছিল; তাহার সহিত ব্রাহ্মণ্য ভাষা সংস্কৃতও অনেকটা অপাংক্তেয় হইয়া আসিয়াছিল। অশোকও তাঁহার লিপিসমূহে সংস্কৃতকে আমল না দিয়া জনগণের ভাষাকেই গ্রহণ করিয়াছিলেন। এইভাবে প্রথম দিকে সংস্কৃতকে অবহেলিত হইয়াই টিকিয়া থাকিতে হইয়াছে। সংস্কৃতের অভ্যুদয় শুরু হয় যখন অশোকের মৃত্যুর মাত্র পঁয়তাল্লিশ বছর পরে শেষ মৌর্য রাজা বৃহদ্রথের ব্রাহ্মণ সেনাপতি পুষ্যমিত্র (খ্রীঃ. পূঃ. ১৮৭—১৫১) স্বীয় প্রভুকে নিহত করিয়া রাজশক্তি অধিকার করেন। পুষ্যমিত্রের সহিত ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও ব্রাহ্মণ্য ভাষারও অভ্যুদয় হয়'[১৮] এবং বর্ণ-শোষণকে টিকিয়ে রাখার জন্য পুনরায় সমাজে সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমে উচ্চশিক্ষা দেওয়া শুরু হল। এসময় থেকে ভারতে মুসলমান-আক্রমণের পূর্ব পর্যন্ত শিক্ষাক্ষেত্রে সংস্কৃত ভাষার একচেটিয়া আধিপত্য বজায় ছিল।

আর্য ধর্ম, শিক্ষা ও সংস্কৃতি ভারতের পূর্বাঞ্চলে অর্থাৎ বাংলাদেশে প্লাবিত হয়েছিল। ঐতিহাসিকদের মতে খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের মধ্যেই আর্যভাষা ও শিক্ষা-সংস্কৃতি বাংলাদেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে, স্থানীয় ভাষাকে দেশচ্যুত করে আর্যভাষা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। 'এই বিরাট ভূখণ্ডের ইতিবৃত্ত, বিশেষতঃ রাজনৈতিক ইতিবৃত্ত উত্তরপথের রাজ্যপ্রণালী ও রাজন্যবৃত্তের সঙ্গেই সম্পৃক্ত। মৌর্য ও কুষাণ যুগে উত্তরাপথের রাজনৈতিক ইতিহাস বাংলাদেশকেও কিছু স্পর্শ করেছিল বটে, কিন্তু এদেশ যথার্থ ইতিহাসের পটে স্থান পেল গুপ্ত-শাসনকালে —খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী থেকে।'[১৯] গুপ্ত-রাজত্বকালের প্রায় দু'শতকের (৫ম-ষষ্ঠ শতক) মধ্যে বাংলাদেশে আর্যদের ধর্ম, সংস্কার ও সামাজিক রীতিনীতি দৃঢ়প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল।

এদেশে আর্যদের আগমনের পূর্বে অষ্ট্রিকগোষ্ঠীভুক্ত নিষাদ জাতি বাস করতেন। তাঁদের নিজস্ব ভাষা, সভ্যতা ও সংস্কৃতি ছিল। কিন্তু আর্যভাষা অর্থাৎ সংস্কৃত ভাষার প্রভাবে প্রাচীন বাঙালীর নিজস্ব ভাষা একেবারে বিলুপ্ত হয়ে গেছে—অতীতের ইতিহাসকে বহন করে নিয়ে এখনো অস্তিত্ব বজায় রেখেছে কেবলমাত্র কিছু শব্দ। প্রাগার্য জাতির ধর্মমত, সংস্কার, পূজাপদ্ধতি প্রভৃতি রূপান্তরিত হয়ে আর্যধর্মের সঙ্গে একীভূত হয়ে গেছে। ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন, "আর্যগণের উপনিবেশের ফলে আর্যগণের ভাষা, ধর্ম, সামাজিক প্রথা ও সভ্যতার অন্যান্য অঙ্গ বাংলাদেশে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইল। প্রাচীন অনার্যভাষা লুপ্ত হইল, বৈদিক ও পৌরাণিক এবং বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম প্রচারিত হইল, বর্ণাশ্রমের নিয়মানুসারে সমাজ গঠিত হইল।"[২০]

আনুমানিক ৭৫০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১১৬০ খ্রীষ্টাব্দ—এই চারশো বছর বাংলাদেশে পাল-বংশের রাজত্ব ছিল। তাঁরা ছিলেন বৌদ্ধ। সুতরাং তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতায় এদেশে যেমন বৌদ্ধ ধর্মের প্রসার হয়েছিল, তেমনি মাগধী অপভ্রংশ থেকে বাংলা ভাষার উদ্ভব ঘটেছিল। খ্রীষ্টীয় দশম শতকে বাংলা ভাষার জন্ম হয় এবং প্রথম মহীপালের রাজত্বে 'বাংলা বর্ণমালার পূর্বাভাস পাওয়া যায়।'[২১] পাল-রাজাদের আনুকূল্যে বাঙালি কবিরা বাংলা কাব্য-রচনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তৎকালে বাংলাভাষায় ধর্মবিষয়ক বহু পদ রচিত হয়। পাল-রাজারা মাতৃভাষার মাধ্যমে বুদ্ধদেবের উপদেশাবলী প্রচারে উৎসাহ দিয়েছিলেন। কিন্তু মাতৃভাষা-চর্চার স্বর্ণযুগের অবসান ঘটে খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতকে—পাল-বংশের পতনে এবং সেন-রাজবংশের অভ্যুদয়ে। সেন-রাজারা ছিলেন ব্রাহ্মণ। সুতরাং তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলাদেশে সংস্কৃতভাষায় শিক্ষাদান শুরু হয়, সংস্কৃত সাহিত্য ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের নবজাগরণের সূত্রপাত হয়। পাল-বংশের 'সুদীর্ঘকাল-ব্যাপী শাসনকালে গৌড়বঙ্গে বঙ্গসংস্কৃতির প্রতিষ্ঠা ও বিকাশ হয়েছিল। কিন্তু ব্রাহ্মণ্যমতে ঘোরতর আস্থাযুক্ত বিদেশী সেনবংশের রাজসভাতে উচ্চসমাজের আনাগোনা বৃদ্ধি পেলেও, জনসাধারণের সঙ্গে এই শাসনের যোগাযোগ স্বাভাবিক কারণেই শিথিল হয়ে পড়েছিল। সংস্কৃত সাহিত্য, বৈদিক যাগযজ্ঞ ও স্মৃতিসংহিতার বিধিনিষেধের দ্বারা বৌদ্ধ-বাঙালিকে ব্রাহ্মণ্যমতাশ্রয়ী করার চেষ্টা চললেও তার সার্থকতা ঘটবার আগেই'[২২] দ্বাদশ শতকের শেষে অথবা ত্রয়োদশ শতকের প্রারম্ভে বাংলাদেশে মুসলমান-শাসনের সূচনা ঘটে।

খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকে ভারতে মুসলমান-শাসনের সূত্রপাত হয়। ইরাকের শাসক হজ্জাজ-এর জামাতা মহম্মদ বিন কাশিম ৭১২ খ্রীষ্টাব্দে সিন্ধুরাজ্যের হিন্দু রাজা দাহিরকে আক্রমণ করেন। যুদ্ধে রাজা দাহির পরাজিত ও নিহত হন। তাঁর সমগ্র রাজ্য কাশিমের অধিকারভুক্ত হয়। এভাবে অষ্টম শতাব্দীর প্রারম্ভে ভারতে প্রথম মুসলমান-রাজ্য গড়ে ওঠে, এবং পরবর্তীকালে বিভিন্ন বংশের মুসলমান-শাসকদের নেতৃত্বে সমগ্র ভারতে মুসলমান-সাম্রাজ্যের বিস্তার ঘটে। বিভিন্ন যুদ্ধে পরাজিত হয়ে হিন্দু-শাসকেরা

মুসলমান-সম্রাটদের অধীনতা স্বীকার করেন। মুসলিম-শাসকেরা হিন্দু-অভিজাতশ্রেণীকে উৎপীড়ন, হিন্দু-মন্দির লুণ্ঠন, তাঁদের ধর্মাচরণে হস্তক্ষেপ, বলপূর্বক ধর্মান্তর ইত্যাদি নানাবিধ অত্যাচার চালালেও আর্থনীতিক-সামাজিক কাঠামো পরিবর্তনের কোনো চেষ্টা করেননি। তাঁরা 'হিন্দুদের শিক্ষাব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করেননি। পঞ্চদশ শতকের শেষ পর্যন্ত বিদেশে নগররক্ষার্থে সশস্ত্র বাহিনীর ভূমিকার চেয়ে আর বেশি কিছু ভূমিকা তাঁদের ছিল না। একটা সুষ্ঠু মুসলিম-শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার কৃতিত্ব আকবরের প্রাপ্য। তিনি ধর্ম ও শিক্ষাকে একসূত্রে গেঁথে মুসলমানদের জন্য উচ্চশিক্ষার প্রবর্তন করেছিলেন এবং উচ্চশিক্ষার মাধ্যম রূপে কোরাণের আরবি ভাষাকে গ্রহণ করেছিলেন। রাজদরবারের ভাষা ফার্সি শেখার জন্য বহু হিন্দু ছাত্র মুসলমানদের বিদ্যালয়ে ভর্তি হত।'[২৩] অর্থাৎ সমাজের উপরিভাগ আলোড়িত হলেও তার ভিত্তিমূলে কোনো প্রতিক্রিয়া ঘটেনি। কার্ল মার্কস্ বলেছেন, "হিন্দুস্তানের সমস্ত ঘটনা পরম্পরা যতই বিচিত্র রকমের, জটিল, দ্রুত ও বিধ্বংসকারী বলে মনে হোক না কেন, এই সব কিছু গৃহযুদ্ধ, অভিযান, বিপ্লব, দিগ্বিজয় ও দুর্ভিক্ষ তার উপরিভাগের নীচে নামেনি।... ভারতীয় অতীতের রাজনৈতিক চেহারাটা যতই পরিবর্তনশীল বলে মনে হোক না কেন, সুদূর পুরাকাল থেকে উনিশ শতকের প্রথম দশক পর্যন্ত তার সামাজিক অবস্থা অপরিবর্তিত থেকেছে।"[২৪] তাই বর্ণবিভক্ত হিন্দুসমাজের রীতিনীতি মুসলমান-সমাজেও অনুসৃত হয়; সমাজের অভ্যন্তরে বিভিন্ন শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে। সৃষ্টি হয় উর্দু ভাষা। 'ভারতীয় ইসলামী তমদ্দুন বা সংস্কৃতির একটি শক্তিশালী প্রতীক হয়ে ওঠে উর্দু ভাষা। এ ভাষা তথাকথিত আর্যভাষার সন্তান, ভারতবর্ষেই এর জন্ম, কিন্তু ইসলামী সংস্কৃতির আশ্রয়ে লালিত হওয়ায় তা কালক্রমে প্রচুর আরবি-ফারসি শব্দ আত্মসাৎ করেছে, এবং আরবি লিপিকে গ্রহণ করে তা দেবনাগরী উদ্ভূত নানা লিপিবাহিত উত্তর ভারতীয় আর্যভাষাগুলি থেকে নিজেকে আলাদা করেছে।'[২৫]

বাংলাদেশে মুসলমান-সেনাদের পদধ্বনি শোনা যায় ১১৯৯ অথবা ১২০৪ খৃষ্টাব্দে। রাজা লক্ষণ সেনের রাজত্বকালে তুর্কী সেনানায়ক ইখতিয়ারুদ্দীন মহম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজী নদীয়া-জয়ের দ্বারা বাংলায় প্রথম মুসলমান-রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। ত্রয়োদশ শতক থেকে অষ্টাদশ শতকে ইংরেজ-আগমনের পূর্ব পর্যন্ত মুসলিম-শাসকদের সমগ্র রাজত্বকালে জনগণের আর্থনীতিক-সামাজিক অবস্থার কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। হিন্দু রাজাদের ন্যায় মুসলমান সুলতান-নবাবদের শাসনকালেও তাঁরা সমভাবে উৎপীড়িত-নিপীড়িত হয়েছেন। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সমস্ত প্রজাদের সামাজিক মর্যাদা স্বীকৃত না হওয়ায় মাতৃভাষা-চর্চা অবহেলিত হয়েছে। শিক্ষা ও সাহিত্য-চর্চার ক্ষেত্রে মুসলমান শাসনের প্রথম যুগে বহিরাগত সুলতান-নবাবেরা উর্দু ভাষার প্রতি আনুকূল্য প্রদর্শন

করায় হিন্দুসমাজের ভাষা-সমস্যার ন্যায় মুসলমান-সমাজেও ভাষা-দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়। সংস্কৃত বনাম বাংলাভাষার ন্যায় তাঁদের সমাজেও উর্দু বনাম বাংলা ভাষার প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। 'চতুর্দশ (?) শতাব্দী থেকে বাঙালি মুসলমান কবিদের মধ্যে বাংলা ভাষা বিষয়ে একটি সঙ্কট খুবই বড়ো হয়ে উঠছে দেখতে পাই। তাঁরা প্রায় সকলেই বাংলা ভাষা ও লিপি সম্বন্ধে তাঁদের সম্প্রদায়ের, বিশেষত সেই সম্প্রদায়ের রক্ষণশীল অংশের, নানা সংস্কারের সঙ্গে লড়াই করছেন —তার সাক্ষ্য অপ্রতুল নয়।'[১৬] যেমন—

(ক) কর্মদোষে বঙ্গেতে বাঙ্গালী উতপন।
না বুঝে বাঙ্গালী সবে আরবী বচন॥
জার জেই ভাষে প্রভু করিলা সৃজন।
সেই ভাষা হয় তার অমূল্য রতন॥
—সৈয়দ সুলতান রচিত 'নবী-বংশ' (১৫৮৪ খ্রীঃ.)

(খ) হিন্দুয়ানি অক্ষর দেখি না করিঅ হেলা॥
বাঙ্গালা অক্ষর পরে আঙ্গি মহাধন।
তাকে হেলা করিবে কিসের কারণ॥
—হাজী মুহম্মদ রচিত 'নূর-জামাল' (১৬শ শতক)

(গ) যে সব বঙ্গেত জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী।
সে সব কাহার জন্ম নির্ণয় না জানি॥
দেশী ভাষা বিদ্যা যার মনে না জুয়ায়।
নিজ দেশ ত্যাগী কেন বিদেশে না যায়॥
মাতা পিতামহ ক্রমে বঙ্গেত বসতি।
দেশী ভাষা উপদেশে মনে হিত অতি॥
—আবদুল হাকিম রচিত 'নূর-নামা' (১৭শ শতক)

হিন্দু-পণ্ডিতেরা যেমন শাস্ত্র-শিক্ষাদানে বাংলাভাষাকে পরিত্যাজ্য মনে করেছেন, হিন্দুকাব্য-পুরাণ সংস্কৃতে রচনা করেছেন, সংস্কৃতের মাধ্যমে শিক্ষাদান করে তাঁরা যেমন শিক্ষাকে সর্বত্রগামী হতে দেননি, তেমনি বাংলাদেশের মুসলিম-ধর্মনেতারাও শিক্ষাকে আরবি-ফারসি ভাষার গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রাখতে চেয়েছেন, উর্দু ভাষায় কাব্য-রচনার ফরমান জারী করেছেন। 'মধ্যযুগের ভাষাদ্বন্দ্ব, বাংলাভাষাকে হিন্দুয়ানি ভাষা আখ্যা দিয়ে তাকে ধর্মনিষ্ঠ মুসলমানের ত্যাজ্য বলে প্রচার করা —সব তাঁদেরই কাজ। মাতৃভাষা ও ইসলামী ভাষার মধ্যে প্রতীকমূল্যের হেরফেরের ধারণাটি তাঁদেরই দ্বারা প্রবর্তিত হয়। দ্বিতীয়ত, লিপির প্রত্যাখ্যান ছিল সম্ভবত আরো তীব্র। ভাষাকে প্রত্যাখ্যান করার উপায় তো নেই —যেখানে সে-ভাষা অধিকাংশ লোকের মাতৃভাষা, অধিকাংশ

বাঙালি মুসলমানের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত এই একটিমাত্র ভাষার সাহচর্য্য থাকে। সুতরাং লিপির প্রত্যাখ্যান বা প্রতিকূলতা আলাদা করে তৈরি হল। এই পটভূমিকায় যখন দেখি যে মুসলিম-শাসক 'এলিট'রা ধর্মনেতাদের এই ভাষাবিষয়ক দণ্ডনীতিতে কর্ণপাত করছেন না, বরং বাংলাভাষায় সংস্কৃত কাব্যকথা অনুবাদ বা পরিবেষণ করার জন্য উৎসাহ দিচ্ছেন তখন একটু আশ্চর্য লাগে। চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতকের পাঠান শাসকেরা যে বাংলাভাষায় কাব্যরচনায় নানরকম আনুকূল্য করেছেন—তার অজস্র প্রকট স্বীকৃতি আছে নানা কাব্যে। বিরুদ্ধতা বরং আরো ছিল ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের দিক থেকে,—তাঁরাই সংস্কৃত কাব্য-পুরাণ বাংলায় অনুবাদ করলে রৌরব নরকের বিধান দিতেন কবিকে। সুতরাং ব্রাহ্মন এবং মুসলিম-ধর্মনেতা—দুয়েরই রক্ষণশীলতা সক্রিয় ছিল বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে। তবু যে বাংলা ভাষায় কাব্য লেখা হতে লাগল তার কারণগুলি এইরকম—প্রথমত, এমন কিছু লোক ধর্মপ্রচারের জন্য কাব্যকবিতা রচনা করলেন যাঁরা হিন্দুধর্মের অন্তেবাসী—ব্রাহ্মণদের নিষেধাজ্ঞায় পরোয়া করতেন না তাঁরা। 'চর্যাপদ'-এর রচয়িতারা যেমন,—এঁরা লোক-ভাষায় আপন ধর্মের বিষয় ও নীতিগুলিকে বেঁধে রাখলেন। লোকবোধের জন্য না হোক, নিজেদের সুবিধার জন্য। দ্বিতীয়ত, লোকবোধ ('লোক-নিস্তারিতে')-এর সঙ্গে রাজানুকূল্য মিলিত হয়ে এই বিদ্রোহকে আরেকটু শক্তি দিল। যেখানে শাসক সহায়, সেখানে ব্রাহ্মণের অভিশাপ কী করতে পারে? তৃতীয়ত, ব্রাহ্মণদের চোখে ধুলো দেবারও একটা উপায় এঁরা বার করে ফেললেন। আমাদের ধারণা, মধ্যযুগের কবিদের গ্রন্থোৎপত্তির কারণ বর্ণনায় স্বপ্নাদেশ বা দৈবী আদেশের দোহাই পাড়াও ব্রাহ্মণদের সংস্কৃতমুখী রক্ষণশীলতাকে প্রতিহত করার অন্যতম একটা কূট উপায় ছিল, পরে তা রীতিবদ্ধ (Conventionalized) হয়। সুতরাং হিন্দু ও মুসলমান—উভয় সম্প্রদায়ের কবিকেই মধ্যযুগের প্রথম দিকে এক ধরণের নিষেধাজ্ঞার সম্মুখীন হতে হয়েছে বাংলা ভাষা লেখার বেলায়। হিন্দু কবিদের ক্ষেত্রে ঐ নিষেধাজ্ঞা ছিল সংস্কৃত ধর্মীয় সাহিত্য অনুবাদের উপর, মুসলমান কবিদের ক্ষেত্রে তা ছিল সাধারণভাবে বাংলাভাষায় লেখারই উপরে। এও লক্ষ্য করবার বিষয় যে, দুই সম্প্রদায়ের রক্ষণশীলরাই বাংলাকে তাঁদের ধর্মীয় ভাষা থেকে দূরবর্তী জ্ঞান করেছেন। হিন্দুরা তা লোকভাষা অর্থাৎ 'ব্রাত্য' অর্থাৎ 'দেবভাষা' সংস্কৃত থেকে ভ্রষ্ট বা অপভ্রষ্ট হওয়ার জন্য, আর মুসলমান ভাগ্য-বিধায়করা ঠিক তার উল্টো বিশ্বাসে অর্থাৎ সংস্কৃত বা হিন্দুর ধর্মীয় ভাষার সঙ্গে বাংলার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ ভেবে।"[১৪]

অষ্টম শতক থেকে অষ্টাদশ শতক—এই সুদীর্ঘ কালব্যাপী সমগ্র ভারতের মুসলমান-শাসনকালে হিন্দুরাজা ও সামন্তশ্রেণী আক্রান্ত হলেও কিংবা হিন্দু-মন্দির লুন্ঠিত হলেও হিন্দু

সমাজের বর্ণশাসনে তার কোনো প্রতিক্রিয়া ঘটেনি ; নিম্নবর্ণের ওপরে ব্রাহ্মণ্যসম্প্রদায়ের অত্যাচার কমেনি। পূর্বের মতই সমাজের অভ্যন্তরে হিন্দু-শিক্ষা ও সংস্কৃতির চর্চা অব্যাহত ছিল। টোল-চতুষ্পাঠীতে সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমে ব্রাহ্মণ-সন্তানদের উচ্চশিক্ষা-লাভের অধিকার সঙ্কুচিত হয়নি, আর শূদ্ররাও শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ পাননি —অমানিশার আঁধারে তাঁদের জীবন আচ্ছন্ন। 'আরবী, তুর্কী, তাতার, মোগল যারা একের পর এক ভারত প্লাবিত করেছে তারা অচিরেই হিন্দু-ভূত হয়ে গেছে ; ইতিহাসের এক চিরন্তন নিয়ম-অনুসারে বর্বর বিজয়ীরা নিজেরাই বিজিত হয়েছে তাদের প্রজাদের উন্নত সভ্যতায়।'[২৮] তাই মুসলমান-শাসকেরা হিন্দুদের শিক্ষা-কাঠামোকে ধ্বংস করেননি, তাঁদের আদর্শকেই অনুসরণ করেছেন। হিন্দু পণ্ডিত-পুরোহিতেরা টোল-চতুষ্পাঠীতে যেমন সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমে অভিজাতশ্রেণীর ব্রাহ্মণপুত্রদের ন্যায়-দর্শন-স্মৃতি ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষা দিতেন, তেমনি মুসলমান সম্রাট-সুলতানদের অনুগ্রহপুষ্ট মোল্লা-মৌলভীরা বংশ-মর্যাদায় ও অর্থকৌলীন্যে শ্রেষ্ঠতর-শ্রেণীর সন্তানদের মসজিদে-মক্তবে আরবি-ফারসি কিংবা উর্দু ভাষায় কোরাণ-শিক্ষাদানের নীতি গ্রহণ করেছেন ; সমাজের নিম্নশ্রেণীর মুসলমানদের জন্য কোনো চিন্তা তাঁদের ছিল না। এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, মধ্যযুগের ভারতে শিক্ষা বিশেষত উচ্চশিক্ষার জগৎ জনগণের জন্য উন্মুক্ত ছিল না। তা কেবল আলোকপ্রাপ্ত সমাজের একচেটিয়া ছিল। শিক্ষা ছিল শক্তি, মর্যাদা ও প্রতিপত্তির প্রতীক। সুতরাং হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের জনগণকে কিছুতেই সে-শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ দেওয়া হল না।

ভারতের মুসলমান-শাসনকালের ঘটনাবলীর অনুরূপ বাংলাদেশেও ঘটেছিল। 'খ্রীঃ. পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত বিস্তৃত বাঙালির সমাজ ও সাংস্কৃতিক জীবন আলোচনা করলে দেখা যাবে, প্রথম দিকে পাঠান-শাসন অত্যন্ত চণ্ডরূপ ধরে বাঙালি হিন্দুর ভীতি ও ঘৃণার কারণ হয়েছিল। পরে ইলিয়াসশাহী আমলে সেই শত্রুতার তিক্ত সম্পর্ক অনেকটা হ্রাস পেল। অনেক হিন্দু-রাজকর্মচারী পাঠান-রাজসভায় সম্মানের আসন লাভ করেছিলেন, কোনো কোনো সুলতান অসাম্প্রদায়িক উদার মনোভাবেরও পরিচয় দিয়ে-ছিলেন, বাঙালি কবি সুলতানের প্রশংসা ও পৃষ্ঠপোষকতাও লাভ করেছিলেন। অনেক পাঠান-সুলতান বাংলাভাষা বেশ বুঝতেন, বাংলা সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধিতে সাহায্যও করেছিলেন। ইসলাম ধর্মান্তরীকরণ কিছু চলেছিল, পাঠান-রাজকর্মচারিরা হিন্দুদের প্রতি সব সময় তামা-তুলসী হাতে করে সুবিচার করতেন না, সমাজে পীর-ফকির-গাজীদেরও যে কিছু উপদ্রব ছিল না তা নয়। কিন্তু তবু খ্রীঃ. চতুর্দশ শতকে বাংলার সমাজের ঘোলাজল সর্বপ্রথম স্বচ্ছ হতে আরম্ভ করে। সংস্কৃত সাহিত্য ও দর্শনের অনুচিন্তন আবার বিদ্বৎসমাজে যথাযোগ্য স্থান করে নেয়।'[২৯]

ব্রাহ্মণ-আধিপত্যের ফলে তীব্র বর্ণবিদ্বেষে সমগ্র সমাজ-জীবন জর্জরিত হয়। 'ব্রাহ্মণ উচ্চতম বর্ণ। কিন্তু অপর দুইটি দ্বিজবর্ণের অর্থাৎ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের তুলনায়ও শূদ্রের স্থান সমাজে অতিশয় হেয়। শূদ্রের বেদ-পাঠের অধিকার নাই এবং বিভিন্ন সংস্কারের মধ্যে এক বিবাহ ভিন্ন অন্য কোন সংস্কারে শূদ্র অধিকারী নহে। অপর সকল বর্ণেরই স্বকীয় গোত্র আছে, কিন্তু শূদ্রের নিজস্ব কোন গোত্র নাই।'[৩০] দুর্বলশ্রেণীর ওপরে বিত্তশালী শ্রেণীর সামাজিক পীড়ন ও আর্থনীতিক শোষণের ফলে হিন্দুসমাজের অভ্যন্তরে বিক্ষোভ ক্রমেই পুঞ্জীভূত হচ্ছিল। ষোড়শ শতকে এই বিক্ষোভ ধর্মীয় আকারে ফেটে পড়েছে —চৈতন্যদেবের আবির্ভাব তাঁদেরকে উৎসাহিত করেছে। তাই তাঁরা সামাজিক উৎপীড়ন থেকে মুক্তির আশায় তাঁর কাছে ছুটে গিয়েছেন। শোষিতশ্রেণীকে তিনি বরাভয় দিয়েছেন, জাতিভেদ না মেনে চৈতন্যদেব সকলকে কাছে টেনে নিয়েছেন। 'চৈতন্যও যখন বাঙ্গলা দেশের গৃহে গৃহে প্রেমের ধর্ম প্রচার করিতে বাহির হইলেন, প্রচলিত পদ্ধতি অনুসারে সংস্কৃতশাস্ত্র রচনা না করিয়া বঙ্গসন্তানকে তিনি তাহার মাতৃ-ভাষায় আহ্বান করিলেন —নির্জীব বঙ্গসমাজও আলোড়িত হইয়া উঠিল। এবং নবদ্বীপের সমস্ত শুষ্ক পাণ্ডিত্য সে-বৈষ্ণব প্রেমের প্রবাহ রোধ করিতে পারিল না।'[৩১] বুদ্ধদেবের মতো তিনিও মাতৃভাষায় গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করেন, এবং তাঁর শিষ্যরাও সংস্কৃত-চর্চার যুগে মাতৃভাষায় বৈষ্ণব দর্শন-রচনায় ব্রতী হয়েছেন।

হিন্দু-ভূস্বামীরা সংস্কৃত ভাষায় উচ্চশিক্ষা-দানের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। অষ্টাদশ শতকে নাটোরের রাণী ভবানী ও নদীয়ার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র টোল-চতুষ্পাঠীর ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও ছাত্রদের বার্ষিক বৃত্তি দিয়ে সংস্কৃত-শিক্ষা চর্চায় উৎসাহিত করেছেন। এখানে অব্রাহ্মণদের কোনো প্রবেশাধিকার ছিল না। সেকালে নবদ্বীপ ছিল সংস্কৃত-শিক্ষার প্রধান কেন্দ্র। তা'ছাড়া বাংলাদেশের নানাস্থানে সংস্কৃত-শিক্ষার জন্য বহু চতুষ্পাঠী ও টোল ছিল। উইলসন বলেছেন, একমাত্র নদীয়া জেলায় এই ধরণের টোলের সংখ্যা ছিল পঁচিশ। বিদেশীরা টোলগুলিকে 'হিন্দুদের অক্সফোর্ড' রূপে অভিহিত করেছেন। মধ্যযুগের শিক্ষা-কাঠামো দুটি শ্রেণীর উপরে ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছিল —(১) প্রাথমিক শ্রেণী; (২) উচ্চশ্রেণী। প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া হত পাঠশালা ও মক্তবে। উচ্চশিক্ষা-দানের জন্য ছিল টোল-চতুষ্পাঠী ও মাদ্রাসা।

গ্রাম্য পাঠশালায় বা মক্তবে যে-সব ছাত্র লেখাপড়া শিখতে আসতো, তারা সাধারণত স্বল্পবিত্ত জমিদার, ব্যবসায়ী এবং অবস্থাপন্ন মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে ছিল। 'গ্রামে খড়ের ঘরে, কোন বাড়ির চণ্ডীমণ্ডপে বা খোলা জায়গায় পাঠশালা বসিত। গুরুমহাশয়েরা খুব সামান্যই বেতন পাইতেন; কিন্তু ছাত্ররা বিদ্যা সাঙ্গ করিয়া গুরুদক্ষিণা দিত। গুরুমহাশয়েরা বেতের ব্যবহারে কোন কার্পণ্য করিতেন না। হাত পা বাঁধা,

বুকের উপর চাপিয়া বসা প্রভৃতি শাস্তির ব্যবস্থাও ছিল। সাধারণত গুরুমহাশয়দিগের বিদ্যাবুদ্ধি খুব সামান্যই থাকিত। ছাত্রেরা ছয় সাত বৎসর পাঠশালায় থাকিয়া বাংলা পড়িতে ও লিখিতে পারিত এবং কিছু কিছু গণিত শিখিত। কড়ি ও পাথরের কুচি দিয়া সংখ্যা-গণনা, যোগ বিয়োগ শিক্ষা দেওয়া হইত। হিসাব রাখা, চিঠিপত্র, দলিল ও দরখাস্ত লেখা প্রভৃতি প্রয়োজনীয় শিক্ষা পাঠশালাতেই হইত। শিশুরা প্রথমে বালির উপর খড়ের কুটা দিয়া লিখিত। তারপর খড়ি দিয়া মাটির মেঝেতে লিখিত। ক্রমে ক্রমে কলাপাতায়, তালপাতায়, খাগ বা বাঁশের কঞ্চি দিয়া লেখা অভ্যাস করিত। তুলা দিয়া কাগজ তৈরি হইত—যাহারা তৈরি করিত তাহাদিগকে কাগজী বলিত। এই তুলট কাগজ ছাড়া তালপাতা ও ভূর্জপত্রে পুঁথি লেখা হইত। হরিতকী ও বয়ড়ার রস প্রদীপের কাল ভূষায় মিশাইয়া কালী তৈরি হইত।'[৩২] মধ্যযুগের শেষে পাঠশালার সংখ্যা কত ছিল তার একটা হিসেব দিয়েছেন উইলিয়ম অ্যাডাম। তাঁর মতে বাংলাদেশের প্রতি গ্রামে একটি (এমন কি বড় বড় গ্রামে একাধিক) প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল। বাংলা ও বিহারের জনসংখ্যা ছিল ৪ কোটি, এবং তাঁদের সন্তানদের প্রাথমিক শিক্ষাদানের জন্য এক লক্ষ পাঠশালা ও মক্তব ছিল অর্থাৎ জনসংখ্যার প্রতি ৪০০ জনের ও বিদ্যালয়বয়সী (৫-১৪) প্রতি ৬৩ জন শিশুর জন্য একটি করে প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল; আর বাংলা ও বিহারে টোল-চতুষ্পাঠীর সংখ্যা ছিল ১৮০০ এবং তাতে শিক্ষাদানে রত পণ্ডিতদের সংখ্যা ছিল ১২,৬০০।

বাংলাদেশে হিন্দুসমাজের প্রত্যক্ষ প্রভাবে মুসলমান-সমাজেও জাতিভেদ গড়ে ওঠে। অভিজাতশ্রেণীগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল সৈয়দ, আলিম, শেখ বা পীর, কাজী, মোল্লা প্রভৃতি। তা'ছাড়া বংশানুক্রমিক বৃত্তি অনুসারে নিম্নশ্রেণীর মুসলমানদের মধ্যে জোলা, নিকিরি ইত্যাদি অনেকগুলি শ্রেণী ছিল। মুসলমান-সমাজের শ্রেণী-বিন্যাস সম্পর্কে একজন লেখক মন্তব্য করেছেন, "বাংলায় মুসলমান শাসন প্রবর্তনের কিছুকালের মধ্যেই সমাজে দুটি শ্রেণীর সৃষ্টি হয়েছিল—খানিকটা রোমের প্যাট্রিশিয়ান প্লিবিয়ানদের ধাঁচে। এক দলে ছিল ভারতের উত্তর বা পশ্চিমাঞ্চল থেকে বাংলায় বসবাস করতে আসা মুসলমান সিভিল সার্ভেন্ট, সৈন্য, শাসক আর ধর্মপ্রচারকেরা; অন্য দলে ছিল প্রাক্তন হিন্দু ও বৌদ্ধরা—যারা মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেছিল। অর্থাৎ প্রথম তফাৎ হল 'বুনিয়াদী' মুসলমান ও ধর্মান্তরিত মুসলমানের মধ্যে। ধর্মগত কৌলিন্যের স্তরভেদের জন্য এই প্রথম শ্রেণীভেদ। এরই সঙ্গে যুক্ত ছিল অর্থসঙ্গতি ও বংশগত আভিজাত্যের বোধ-গত শ্রেণীভেদ। যারাই বাংলায় বহিরাগত এবং অ-বাংলাভাষী, তারা সকলেই আরব, পারসিক, তুর্কী বা পাঠানদের বংশধর এইরকম একটা দাবি উঠত, এবং রাজকর্মের সূত্রে এ অঞ্চলে আসার দরুন তাদের পদমর্যাদা এবং সম্ভবত আর্থিক সংগতিও বেশি ছিল।

ফলে এরা এবং অন্যদের মধ্যে থেকে যারা এদের সমগোত্রীয় বলে নিজেদের জাহির করতে চায় তারা নিজেদের বলতে লাগল 'শরীফ' বা 'আশরাফ' শ্রেণী, আর বাকিরা হয়ে দাঁড়াল 'রাজিল', 'আজলাফ' বা 'আতরাফ' শ্রেণী। এই দ্বিতীয়রাই তখনকার দিনের মুসলিম প্রোলেতারিয়াত।…কিন্তু এই জাতপাতের ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত বিত্তের কৌলীন্যের উপর যে নির্ভর করত তার প্রমাণ পাই এদেশী ফারসিতে চালু প্রসিদ্ধ একটি উক্তিতে —গত বছর আমি ছিলাম 'জোলা', এ বছর হয়েছি 'শেখ'। যদি আমার জমিতে ফসল ভালো হয় তবে পরের বছর আমি সৈয়দ হব।"[৩৩] কিন্তু তাঁকে আরবি-ফারসি কিংবা উর্দু ভাষায় শিক্ষিত হতে হবে। ফারসি ভাষায় কবিতা আবৃত্তি করতে কিংবা গজল বা উর্দু কাওয়ালি গান উপভোগ করতে অক্ষম হলে তাঁকে অভিজাত মুসলমান বলে গণ্য করা হত না।

অভিজাত ও অনভিজাতশ্রেণীর মুসলমানদের শিক্ষাবিধি সম্পর্কে ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন, "মুসলমানদের মধ্যে উচ্চশিক্ষা সাধারণতঃ ফারসি ভাষার সাহায্যেই হইত। অনেকে আরবি ভাষারও চর্চা করিতেন। বিদ্যাশিক্ষার জন্য মক্তব ও মাদ্রাসা ছিল। অনেক সুলতান এইরূপ বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করিতেন। সুফীদের দরগাতেও শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। প্রাথমিক শিক্ষা বাংলা ভাষায় হইত। সাধারণতঃ বিদেশী ও স্বল্পসংখ্যক অভিজাত মুসলমান উর্দু ব্যবহার করিতেন। তাছাড়া সকলেই বাংলা ভাষায় কথাবার্তা বলিত। মুসলমান-সমাজে অবস্থাপন্ন লোকের ছেলেমেয়েদের শিক্ষা সম্বন্ধে বিশেষ যত্ন নেওয়া হইত। মসজিদেও শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। সকলেই কোরাণ শরীফ পড়িত এবং অন্য এক বা একাধিক বিষয় শিখিত।"[৩৪]

টোল-মাদ্রাসা থেকে অর্জিত শিক্ষার্থীদের শাস্ত্রীয় জ্ঞান প্রাচীন সামাজিক কাঠামো রক্ষার কাজে নিয়োজিত হয়েছিল; স্বার্থচেতনা তাঁদের শোষণমূলক সামন্ততান্ত্রিক অর্থনৈতিক কাঠামো অক্ষুণ্ণ রাখতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। তাঁরা শাস্ত্রের মধ্যে জগৎকে দেখতে চেয়েছেন, মানুষের মধ্যে বিশ্বপ্রকৃতির অনন্ত রূপকে উপলব্ধি করেননি। কিন্তু মানব-সভ্যতা প্রাচীনতার মধ্যে আবদ্ধ থাকেনি; দ্রুতগতিতে আধুনিকতার দিকে এগিয়ে গেছে। ইউরোপ আধুনিক চেতনায় সমৃদ্ধ হয়ে উন্নত শিল্প-সংস্কৃতি ও অস্ত্রসম্ভার নিয়ে দেশ-জয়ের অভিযানে বেরিয়ে পড়েছে; তারা উপস্থিত হয়েছে ভারতে। কিন্তু নিবিড় অরণ্যানীতে ঢাকা বহুবিচিত্র সম্পদে সমৃদ্ধ ভারত তার প্রাচীন সমাজ ও অর্থনীতি, সভ্যতা ও সংস্কৃতি নিয়ে অটল ও অনড় হয়ে রইল; শক্তিশালী শত্রুর উপস্থিতিতেও তার ঘুম ভাঙল না। প্রার্থনা ও নমাজের মধ্যেই মগ্ন হয়ে রইল প্রাচীন ভারত।

অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে ভারতের পূর্বদিগন্তে আবির্ভূত হয়েছে উন্নততর আধুনিক সভ্যতা নিয়ে এক নতুন বিদেশী শক্তি —সুদূর ইউরোপ থেকে বাণিজ্যের পতাকা নিয়ে

ভারতের মাটিতে পদার্পণ করেছেন তাঁরা। কিন্তু বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল রাজদণ্ড রূপে। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পলাশীর প্রান্তরে অভিনীত প্রহসনের কুশীলবরা বাংলার মাটিতে প্রোথিত করলেন গ্রেটবৃটেনের জয়-পতাকা —অপহৃত হল বাংলাদেশের স্বাধীনতা। বাংলার বুক থেকে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির জয়যাত্রা শুরু হল উত্তরে-দক্ষিণে, পূর্বে-পশ্চিমে। এক শ' বছরের মধ্যেই সমগ্র ভারত গ্রেটবৃটেনের উপনিবেশে পরিণত হল। কিন্তু এত সহজে 'ইংরেজ-প্রভুত্ব ভারতে প্রতিষ্ঠিত হল কি করে ? মহা মোগলদের একচ্ছত্র ক্ষমতা ভেঙে ফেলেছিল মোগল শাসনকর্তারা। শাসনকর্তাদের ক্ষমতা চূর্ণ করল মারাঠারা। মারাঠাদের ক্ষমতা ভাঙল আফগানরা ; এবং সবাই যখন সবার সঙ্গে সংগ্রামে লিপ্ত, তখন প্রবেশ করল বৃটন এবং সকলকেই অধীন করতে সক্ষম হল। দেশটা শুধু হিন্দু আর মুসলমানেই বিভক্ত নয়, বিভক্ত উপজাতিতে, বর্ণাশ্রম-জাতিভেদে ; এমন একটা স্থিতি-সাম্যের ভিত্তিতে সমাজটার কাঠামো গড়া যা এসেছে সমাজের সভ্যদের মধ্যস্থ একটা পারস্পরিক বিরাগ ও প্রথাবদ্ধ পরস্পর বিচ্ছিন্নতা থেকে ; —এমন একটা দেশ ও এমন একটা সমাজ, সে কি বিজয়ের এক অবধারিত শিকার হয়েই ছিল না ? হিন্দুস্তানের অতীত ইতিহাস না জানলেও অন্তত এই একটি মস্ত ও অবিসংবাদী তথ্য তো রয়েছে যে এমন কি এই মুহূর্তেও ভারত ইংরেজ রাজ্যভুক্ত হয়ে আছে ভারতেরই খরচে এক ভারতীয় সৈন্যবাহিনী দ্বারাই ? বিজিত হবার নিয়তি ভারত তাই এড়াতে পারত না ; এবং তার অতীত ইতিহাস বলতে যদি কিছু থাকে তো তার সবখানি হল পরপর বিজিত হবার ইতিহাস। ভারত-সমাজের কোনো ইতিহাসই নেই —অন্তত জানা কোনো ইতিহাস। ভারতের ইতিহাস বলে যা বলি, সে শুধু একের পর এক বহিরাক্রমণকারীর ইতিহাস, যারা ঐ অপ্রতিরোধী ও অপরিবর্তমান সমাজের নিষ্ক্রিয় ভিত্তিতে তাদের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে গেছে।'[৩৫] সুতরাং বিচ্ছিন্নতা, সংস্কারবদ্ধতা, নিয়তি-নির্ভরতা, নিষ্ক্রিয়তা ইত্যাদি থেকে ভারতকে মুক্ত করার জন্য দেশীয় ভাষার মাধ্যমে আধুনিক শিক্ষায় দীক্ষিত করতে হলে ভারত-বিজয়ী বৃটিশ-সরকারকে দু'টি কর্তব্য পালন করতে হবে— 'একটি ধ্বংসমূলক এবং অন্যটি উজ্জীবনমূলক —পুরাতন এশীয় সমাজের ধ্বংস এবং এশিয়ায় পাশ্চাত্য সমাজের বৈষয়িক ভিত্তির প্রতিষ্ঠা।'[৩৬] কিন্তু ইংরেজ-সরকার কি এই দ্বিবিধ কর্তব্য পালন করেছিলেন ? এর উত্তর নিহিত রয়েছে পরবর্তীকালের ইতিহাসে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বিষবৃক্ষের বীজ রোপণ

বিনা প্রতিরোধে নিরবচ্ছিন্ন ভারত-লুণ্ঠনই ছিল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির একমাত্র উদ্দেশ্য। দেশের সর্বত্র শোষণ, লুণ্ঠন, আর ধ্বংস—কোথাও উজ্জীবনের কোনো প্রয়াস নেই। পুরোনো সামাজিক-আর্থনীতিক কাঠামো ভেঙে ফেলা হয়েছে, কিন্তু নতুন কাঠামো গড়ে তোলা হয়নি। 'স্থানীয় গোষ্ঠীগুলিকে ভেঙে দিয়ে, স্থানীয় শিল্পকে উন্মূলিত করে এবং স্থানীয় সমাজে যা কিছু মহৎ ও উন্নত ছিল তাকে সমতল করে দিয়ে বৃটিশেরা সে সভ্যতাকে চূর্ণ করে। তাদের ভারত-শাসনের ঐতিহাসিক পাতাগুলো থেকে এই ধ্বংসের অতিরিক্ত কিছু পাওয়া যায় না বললেই হয়। স্তূপাকৃতি ধ্বংসের মধ্য থেকে উজ্জীবনের ক্রিয়া লক্ষ্যেই প্রায় পড়ে না।'[১] তাই উনিশ শতকের তৃতীয় দশকের পূর্ব পর্যন্ত কোম্পানি-সরকার দেশীয় জনসাধারণকে পাশ্চাত্য-শিক্ষাদানের কোনো পরিকল্পনা গ্রহণ করেননি। কারন যে অর্থনৈতিক কাঠামোর ওপরে ভিত্তি করে শিক্ষানীতি রচিত হয়, পুরোনো অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ভেঙে ফেলায় এবং তার পরিবর্তে ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে না তোলায় আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করা সম্ভব হয়নি।

সমাজকাঠামোর ভিত্তির ওপরে স্থাপিত উপরিসৌধ হল শিক্ষা ; আর 'ভিত্তি হল সমাজের বিকাশের নির্দিষ্ট স্তরে তার অর্থনৈতিক কাঠামো।'[২] অর্থাৎ অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী সমাজকাঠামো নির্মিত হয় এবং তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই উপরিসৌধ রূপে গড়ে তোলা হয় শিক্ষা, সংস্কৃতি, শিল্পকলা ইত্যাদি। 'প্রত্যেক ভিত্তিরই থাকে তার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নিজস্ব উপরিকাঠামো। সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার ভিত্তির আছে উপরিসৌধ, তার রাজনৈতিক, আইনগত ও অন্যান্য মত এবং এ সবের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ প্রতিষ্ঠানসমূহ। পুঁজিবাদী ভিত্তিরও আছে নিজস্ব উপরিকাঠামো। তেমনই রয়েছে সমাজতান্ত্রিক ভিত্তির। যদি ভিত্তি বদলে যায় বা বাতিল করা হয়, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে তার উপরিসৌধও বদলে যায় বা বাতিল করা হয়। আর যদি কোনো নতুন ভিত্তির উদ্ভব হয় তাহলে তাকে অনুসরণ করে তার উপযুক্ত উপরিকাঠামো সৃষ্টি হয়।'[৩] তাই লক্ষ্য করা যায়, উনিশ শতকের তৃতীয় দশকে বৃটিশ-সরকার যে-শিক্ষানীতি প্রবর্তন করেছেন,

তা ছিল তৎকালীন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও সামগ্রিক শাসননীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সুতরাং এ সময়কার বৃটিশ-শিক্ষানীতি নিয়ে আলোচনার পূর্বে ভারতে বৃটিশ-আগমনকাল-সহ পরবর্তীকালের রাজনীতিক-সামাজিক-আর্থনীতিক ইতিহাস বিশ্লেষণ ও অনুধাবনের প্রয়োজন।

১৭০৭ খৃষ্টাব্দে মোগল-সম্রাট আওরঙ্গজেবের মৃত্যু এবং তাঁর উত্তরাধিকারীদের শাসনকার্যে অপদার্থতা ও অক্ষমতা বিদেশী বৃটিশ-শক্তিকে ভারতে সাম্রাজ্য-স্থাপনের সুযোগ করে দিয়েছিল। কেন্দ্রীয় প্রশাসনের দুর্বলতা ও শিথিলতার সুযোগে যখন দেশীয় নৃপতিরা দিল্লীর নামমাত্র অধীনতা স্বীকার করে কিংবা তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে নিজ নিজ অঞ্চলে স্বাধীনভাবে রাজ্যশাসন করছিলেন এবং পারস্পরিক সংঘর্ষে লিপ্ত হচ্ছিলেন, তখন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি এদেশে ভবিষ্যতের পালা-বদলের নাটকে নাম-ভূমিকা গ্রহণের জন্য বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ক্রমাগত প্রভাব বিস্তার করছিল এবং ঢাকা-মুর্শিদাবাদের পরিবর্তে কলকাতাকে ভবিষ্যতের নিয়ামক-কেন্দ্র রূপে গড়ে তুলছিল। তাই সামন্ত-শক্তির প্রতিনিধি নবাব সিরাজদ্দৌলা যখন কলকাতা আক্রমণ করে বণিকশক্তির ক্ষমতার উৎস-স্থলকে নিশ্চিহ্ন করতে চেয়েছিলেন, তখন নবাবের পক্ষভুক্ত জগৎশেঠ-উমিচাঁদ, রাজবল্লভ-কৃষ্ণচন্দ্র, মীরজাফর-মীরণ প্রভৃতি দেশীয় বণিক, জমিদার ও নবাব-পরিবারের আত্মীয়-স্বজন পক্ষ পরিবর্তন করে ইংরেজ-বণিকদের সঙ্গে গোপনে ষড়যন্ত্র করেছিলেন। এই পক্ষ-ত্যাগের পশ্চাতে তাঁদের কোনো মহৎ আদর্শ কিংবা সামন্তবিরোধী রাজনৈতিক চেতনা ছিল না, দেশপ্রেমেও তাঁরা উদ্বুদ্ধ হননি ; অর্থনৈতিক স্বার্থসিদ্ধিই ছিল তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য। 'মাঝে মাঝে কিছু সংঘর্ষ দেখা দিলেও অর্ধ শতাব্দীর মধ্যেই বাংলার অর্থনীতি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ওপরে এত বেশী নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিল যে, এই প্রদেশের বিত্তবান ও বণিকশ্রেণীর সামনে যখন বেছে নেবার প্রশ্ন উঠল, তখন সর্বশক্তি দিয়ে ইংরেজদের পক্ষ অবলম্বন করতে তাঁরা সামান্য দ্বিধাও করলেন না।'[৪] তার ফলে ইংরেজ-কোম্পানি ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে পলাশীর রণক্ষেত্রে অভিনীত প্রহসনের মধ্য দিয়ে অবলীলাক্রমে বাংলার রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করল। শাসক-শোষকের পরিবর্তন ঘটল। দেশীয় সামন্তশক্তির বদলে বিদেশী বণিকশক্তি এদেশের শাসক-রূপে আবির্ভূত হ'ল ; কালো চামড়ার পরিবর্তে বিদেশী সাদা চামড়া সর্বাত্মক শোষণের ক্ষমতা লাভ করল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির শাসন-শোষণে এদেশের গ্রামীণ-জীবনে নেমে এল অমানিশার অন্ধকার।

১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে দেওয়ানি-সনদ লাভ করে কোম্পানি রাজস্ব-আদায়ের অধিকার পেয়ে পুরোনো রাজস্ব-ব্যবস্থার পরিবর্তে যে-নতুন রাজস্ব-ব্যবস্থা চালু করলেন, তার ফলে বহু পুরোনো বনেদী জমিদারের (যেমন নাটোর, নদীয়া, দিনাজপুর প্রভৃতি) জমিদারি

হাতছাড়া হ'ল; সর্বোচ্চ হারে খাজনা দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে সেই সমস্ত জমিদারি দখল করে আবির্ভূত হ'ল নয়া ইজারাদারেরা; এদের ভয়ঙ্কর শোষণ-অত্যাচারের ফলে বাংলার কৃষকসমাজ রক্তশূন্য হয়ে পড়লেন।

প্রাক্-বৃটিশযুগে প্রাচীন ভারতীয় গ্রামসমাজে জমির ওপর গ্রামের সমস্ত মানুষের যে-যৌথ অধিকার ছিল এবং যৌথ অধিকারভোগী কৃষকদের পক্ষ থেকে সমবেতভাবে উৎপন্ন মোট ফসলের একটা নির্দিষ্ট অংশ ভূমিকর (রাজস্ব) হিসাবে শাসক-প্রতিনিধি 'জমিদার'কে দেবার যে-ব্যবস্থা হিন্দু ও মুসলমান আমলে প্রচলিত ছিল, তা বাতিল করে ইংরেজ-বণিকেরা সর্বোচ্চ হারে মুদ্রায় কর দেবার ব্যবস্থা করলেন এবং জমিদারদের কাছ থেকে রাজস্ব আদায়ের জন্য 'সুপারভাইজার' বা 'নাজিম' নিযুক্ত করলেন। জমির মালিক হলেন কোম্পানি এবং কৃষকেরা হলেন রায়ত। জমিদারি ইজারা দেবার জন্য কোম্পানির পক্ষ থেকে প্রতি বছরে নীলাম ডাকা হত। নীলামে যে ব্যক্তি সর্বোচ্চ হারে খাজনা দেবার প্রতিশ্রুতি দিত, কোম্পানি তাকেই খাজনা আদায়ের ভার দিত। ফলে বৃটিশ-বণিকদের অনুগ্রহপুষ্ট হয়ে নাজিমেরা ও নয়া ইজারাদারেরা চাষীদের কাছ থেকে অবাধ লুণ্ঠনের অধিকার লাভ করল এবং জোরজুলুম করে প্রজাদের কাছ থেকে তাদের শেষ কানাকড়িটি পর্যন্ত কেড়ে নিতে আরম্ভ করল।

এই ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রথম বৎসরেই কোম্পানির কর্মচারিরা প্রায় দ্বিগুণ রাজস্ব আদায় করলেন। এভাবে একদিকে বলপূর্বক রাজস্ব আদায়, অন্যদিকে কর্মচারিদের বেআইনি উৎকোচ-গ্রহণ ও ব্যক্তিগত ব্যবসায়ের নামে লুণ্ঠন এবং কোম্পানির 'প্রকাশ্য' ব্যবসা অর্থাৎ রাজস্বের এক অংশ লগ্নি করে এদেশ থেকে 'ক্রয়ে'র নামে বলপূর্বক কেড়ে নিয়ে ইউরোপে চালান করে কোটি কোটি টাকা মুনাফা অর্জন বাংলার কৃষি-অর্থনীতিতে এক ভয়ঙ্কর বিপর্যয় সৃষ্টি করল। ফলে ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে বাংলা ও বিহারের বুকে এক অশ্রুতপূর্ব দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া নেমে এল। ইংরেজ-বণিকদের সৃষ্ট এই 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে' বাংলাদেশের এক-তৃতীয়াংশ মানুষ মৃত্যুর শিকারে পরিণত হ'ল। কিন্তু ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্তৃপক্ষ বিচলিত হলেন না। তাঁরা আগের বৎসরের (১৭৬৯ খৃঃ.) তুলনায় দুর্ভিক্ষের বৎসরেও (১৭৭০ খৃঃ.) ৯ লক্ষ টাকা বেশি রাজস্ব আদায় করলেন এবং তাঁদের ভয়াবহ শোষণের নগ্ন প্রকাশ ঘটল ১৭৭১ খৃষ্টাব্দের কর-আদায়ের মধ্যে — এই বৎসরে তাঁরা ১৭৭০ সালের তুলনায় ১৭ লক্ষ টাকা বেশি কর আদায় করলেন। এক-তৃতীয়াংশ মানুষের মৃত্যু সত্ত্বেও ইংরেজ-শাসকেরা 'নাজাই কর' নামে এক অকল্পনীয় জুলুমবাজীর মাধ্যমে এই অধিক খাজনা আদায় করেছিলেন। এই করের মর্মকথা হ'ল, যে-সব গ্রামে কৃষকেরা মারা গেছেন বা পালিয়ে গেছেন, তাঁদের বাকি খাজনা যাঁরা বেঁচে আছেন তাঁদের কাছ থেকে আদায় করতে হবে।

তখন চারদিকে এক অস্থির অর্থনৈতিক অবস্থা। ফলে কোম্পানির রাজস্ব খাতে আয়-হ্রাসের সম্ভাবনা দেখা দেওয়ায় হেষ্টিংস ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে পাঁচ-শালা ব্যবস্থা প্রবর্তন করে ইজারাদারদের পাঁচ বছরের জন্য জমি বন্দোবস্ত দিলেন এবং রাজস্ব আদায়ের জন্য প্রতি জেলায় কালেক্টর নিয়োগ করলেন। এই নতুন ইজরাদারেরা কৃষকদের ঠেঙিয়ে, ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে খাজনা ও আবয়াব আদায় করল বটে, কিন্তু কোম্পানির স্বার্থের চেয়েও তাদের নিজেদের আখের গুছোবার দিকেই নজর ছিল বেশি। ফলে কর্ণওয়ালিশ পুনরায় ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে দশ-শালা বন্দোবস্ত করলেন। এই বন্দোবস্তকে কোম্পানির লণ্ডনস্থ 'বোর্ড অব ডাইরেক্টর্‌স্'-এর নির্দেশে ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে 'চিরস্থায়ী' বলে ঘোষণা করা হ'ল।

ইউরোপের ভূমিব্যবস্থার অনুকরণে ইংরেজ-বণিকেরা এদেশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সাহায্যে নতুন ভূমিব্যবস্থা প্রবর্তন করলেন। ইতোপূর্বে জমিদারেরা কর-সংগ্রহকারী ছিলেন মাত্র, জমির ওপর তাঁদের কোনো স্বত্ব ছিল না। অথচ এবারে কোম্পানি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দ্বারা এই ইজারাদারদের জমির স্বত্ব দান করলেন অর্থাৎ ভূমির মূলস্বত্বভোগী হলেন জমিদারেরা। তাঁরা চিরস্থায়ী স্বত্বে তাঁদের ভূসম্পত্তি ভোগ করবেন, জমি থেকে কৃষকদের উচ্ছেদ করতে পারবেন, রায়তদের কাছ থেকে ইচ্ছামত খাজনা আদায় করবেন এবং সরকারকে স্থায়ীভাবে নির্দিষ্ট পরিমাণে রাজস্ব দেবেন, কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ের (চৈত্র সংক্রান্তির সূর্যাস্তের) মধ্যে রাজস্ব জমা দিতে না পারলে তাঁদের জমিদারি-সম্পত্তি নীলাম হবে।[৫] পরবর্তীকালে এই জমিদারেরা আবার শাসকগোষ্ঠীর সম্মতি নিয়ে তাঁদের সহকারীরূপে সৃষ্টি করেছিলেন তালুকদার, জোতদার প্রভৃতি উপস্বত্বভোগীদের একটা বিরাট শ্রেণী।

এদেশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের পশ্চাতে বৃটিশ-বেনিয়াদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল। তাঁরা অভিজ্ঞতায় দেখেছিলেন যে, বাৎসরিক বা পাঁচশালা বন্দোবস্তের দ্বারা ভূসম্পত্তিহীন রাজস্ব-আদায়কারী জমিদারদের মাধ্যমে যে-পরিমাণ রাজস্ব আদায় হয়, তা দিয়ে কোম্পানির ক্রমবর্ধমান ব্যয়-নির্বাহ সম্ভব নয়। অথচ কোম্পানির রাজস্ব বজায় রাখতে হলে কৃষক-বিদ্রোহ দমন করতে হবে, রাজস্ব বাড়াতে হলে ভারতের বিভিন্ন রাজ্য অধিকার করতে হবে এবং কোম্পানির অংশীদারদের ক্রমবর্ধমান লভ্যাংশের দাবি পূরণ করতে হবে। তাই তাঁরা 'মাছের তেল দিয়ে মাছ ভাজা'র নীতি গ্রহণ করলেন।

দখলীকৃত দেশে শোষণ-নিপীড়ন কিছু দেশীয় কর্মচারির সাহায্যে চালালেও কোম্পানির ব্যাপক সামাজিক ভিত্তি ছিল না। অথচ স্থায়ীভাবে শোষণকার্য চালাতে গেলে বিপুল সংখ্যক দেশীয় সমর্থক সংগ্রহের প্রয়োজন। তাই এমন কতকগুলি সামাজিক স্তর সৃষ্টি করতে হবে যা কোম্পানির শাসন-শোষণকে দীর্ঘস্থায়ী করতে সাহায্য করবে। বাৎসরিক

বন্দোবস্ত ও পাঁচশালা বন্দোবস্তের ফলে ধ্বংসোন্মুখ পুরোনো বনেদী জমিদারদের মধ্যে অনেকেই বৃটিশ-বিরোধী কৃষক-সংগ্রামে উৎসাহ-মদত-নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। এঁদের সম্পর্কে কোম্পানির কর্তৃপক্ষ গভীর সন্দেহ পোষণ করতেন। সুতরাং তাঁদের সামাজিক প্রভাব নষ্ট করার জন্য নতুন নতুন দেশীয় বন্ধু সৃষ্টি করতে হবে, যাঁরা সমস্ত রকমের বিদ্রোহ-বিক্ষোভের বিরুদ্ধে ইংরেজ-শাসনকে সমর্থন-সাহায্য করবেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের পশ্চাতে ছিল শাসকগোষ্ঠীর এই পরিকল্পনা। তাঁদের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়নি। তাই বেন্টিঙ্ক ১৮২৯ সালের ৮ নভেম্বর ঘোষণা করেছিলেন, "বহু দিকে এবং কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের যতই গলদ থাকুক না কেন, একটি বিষয়ে উহার অপরিসীম গুরুত্ব স্বীকার করিতেই হইবে। কোনো ব্যাপক গণবিক্ষোভ বা বিপ্লবের সম্ভাবনার বিরুদ্ধে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এমন এক বিপুলসংখ্যক ধনী জমিদারশ্রেণী সৃষ্টি করিয়াছে, যাঁহাদের স্বার্থ বৃটিশ-শাসন বজায় থাকার প্রশ্নের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত এবং জন সাধারণের উপর যাঁহাদের প্রভূত প্রভাব রহিয়াছে।"[৬]

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত অনুসারে দুর্দশাগ্রস্ত বহু বনেদী জমিদার তাঁদের দেয় অনাদায়ী বিপুল পরিমাণ রাজস্ব নির্দিষ্ট সময়ে রাজকোষে জমা দিতে অক্ষম হওয়ায় ইংরেজ-সরকার অনাদায়ী রাজস্বের জন্য তাঁদের কাছ থেকে জমিদারি কেড়ে নিয়ে বা প্রয়োজনীয় পরিমাণ জমি কেড়ে নিয়ে বিক্রি করে দিতেন এবং এইসব জমিদারি যাঁরা কেনেন, তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই হলেন কলকাতার মতো শহরের একশ্রেণীর একপুরুষের ধনিক —যাঁরা ইংরেজ-আমলে কলকাতা ও অন্যান্য বড় বড় শহরে দেওয়ানি-বেনিয়ানি-মুচ্ছুদ্দিগিরি করে, হাটবাজারের ইজারা নিয়ে, লবণের ব্যবসার ইজারাদারি করে প্রচুর ধন উপার্জন করেছিলেন। কিন্তু এই সঞ্চিত ধন লগ্নি করার মতো কোনো পথ তাঁদের সামনে খোলা ছিল না। তাই বৃটিশ-সরকার চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দ্বারা সাহেবানুগৃহীত দেওয়ান-বেনিয়ান-মুচ্ছুদ্দিদের জমিদারি কেনার সুযোগ করে দিয়েছিলেন। কার্ল মার্কসের ভাষায় বলা যায়, "ভূতপূর্ব-বংশানুক্রমিক উচ্ছন্ন ভূমিমালিকগণের উপর অপ্রশমিত ও অসংযত লুণ্ঠন চালানো সত্ত্বেও আদি জমিদারশ্রেণী কোম্পানির চাপে অচিরেই অন্তর্হিত হয় ও তার জায়গা নেয় ব্যবসায়ী দাঁওবাজেরা, সরকারের খাস তত্ত্বাবধানে দেওয়া মহাল ছাড়া বাংলার সমস্ত জমিই এখন এদের হাতে। এই দাঁওবাজেরা পত্তনি নামক বিভিন্ন প্রকারের জমিদারি প্রজাবিলির প্রবর্তন করেছে।"[৭] এই দাঁওবাজ ব্যবসায়ীরা গ্রামের জমিদারি ও শহরের ভূসম্পত্তি কিনে কলকাতা শহরের রাজা-মহারাজা অথবা ধনী জমিদার-রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করে উনিশ শতকে ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে ইংরেজি শিক্ষা বিস্তারের দাবিতে আন্দোলন করেছেন। এই আন্দোলনে তাঁদের সঙ্গে ছিলেন পত্তনিপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা অর্থাৎ মধ্যস্বত্বভোগী বা মধ্যশ্রেণী।

মধ্যশ্রেণী বা মধ্যস্বত্বাধিকারী-ব্যক্তিগণ ছিলেন ভারতে বৃটিশ-শোষণের প্রধান সামাজিক ভিত্তি। ভূস্বামীদের মতো এই মধ্যশ্রেণীও যাতে বিত্তশালী হয়ে সমাজে একটি বিশিষ্ট স্থান গ্রহণ করে বৃটিশ-সাম্রাজ্যবাদকে সাহায্য করতে পারে, সেদিকে ইংরেজ-সরকার লক্ষ্য রেখেছিলেন এবং বিভিন্ন বিষয়ে তাঁদের সাহায্য ও পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন। জমিদারশ্রেণীর মতো মধ্যশ্রেণীকেও যে বৃটিশ-সাম্রাজ্যবাদ পরিকল্পনানুসারে লালন-পালন করেছিলেন, তা ১৮৬২ সালের ভারতসচিবের নির্দেশনামায় জানা যায়, "বর্তমান ভূস্বামী ও জমিদারগণকে সম্পত্তিচ্যুত না করে ভূসম্পত্তির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত মধ্যশ্রেণীর ক্রমবিকাশের সকল সুযোগ দান করা বিশেষ বাঞ্ছনীয়। ...এই মধ্যশ্রেণীর লোকেরা যখন ভূসম্পত্তির অধিকার লাভ করে সম্পদশালী হয়ে ওঠে, তখন তারাও তাদের সুযোগদানকারী শাসন-ব্যবস্থার প্রতি অনুরক্ত না হয়ে পারে না। কৃষির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শ্রেণীর (অর্থাৎ জমিদার-শ্রেণীর —লেখক) অধিকাংশ এবং প্রধানত এদের (মধ্যশ্রেণীর) সন্তুষ্টি বিধানের ওপরেই সরকারের নিরাপত্তা নির্ভর করে। এই মধ্যশ্রেণীটি যদি সমৃদ্ধিশালী হয়ে ওঠে, তবে অন্য কোনো শ্রেণীর আকস্মিক বিদ্রোহ আরম্ভ হলে সেই বিদ্রোহ বিপজ্জনক হয়ে ওঠার সম্ভাবনা হ্রাস পায় এবং সেই অবস্থায় প্রয়োজনীয় সামরিক ব্যয় ভারও সেই অনুসারে নিয়ন্ত্রিত করা সম্ভব হয়।"[৮]

বৃটিশ-সাম্রাজ্যবাদের গূঢ় অভিসন্ধি ব্যর্থ হয়নি; নয়া ভূস্বামীশ্রেণী ও মধ্যশ্রেণী কোম্পানির শোষণ ও লুণ্ঠনে সহযোগী হয়েছেন। তাঁরা বিদেশী শাসকদের সহযোগিতায় নির্মমভাবে কৃষক-উৎপীড়ন করেছেন এবং কৃষক-সংগ্রামের ঘোরতর বিরোধিতায় অবতীর্ণ হয়েছেন; বৃটিশ শাসক-বিরোধী সংগ্রামকে তাঁরা সমর্থন করতে পারেননি। এ সম্পর্কে শ্রীমোহিত মৈত্র বলেছেন, "নিজেদের স্বার্থ ও প্রয়োজন-সাধনের জন্য বিদেশী কোম্পানির পৃষ্ঠপোষকতায় ভারতবর্ষে যে নতুন বুর্জোয়া-মধ্যশ্রেণীর সৃষ্টি হয়েছিল, তাঁরা বৃটিশ-শাসনকে 'আশীর্বাদ'-স্বরূপ মনে করতেন এবং সেইজন্যই দেশকে বিদেশী-শাসনমুক্ত করার জন্য কৃষক, তন্তুবায় ও অন্যান্য মেহনতী মানুষের সংগ্রামে তাঁরা সামিল হতে পারেননি।"[৯] তাই তাঁরা শ্রমজীবীদের স্বার্থে মাতৃভাষায় জনশিক্ষার দাবি না করে শ্রেণীস্বার্থে বিত্তশালী-শ্রেণীর জন্য ইংরেজি ভাষায় শিক্ষাদানের দাবি উত্থাপন করেছেন।

বণিক-সরকারের শোষণ-লুণ্ঠনের ফলে বাংলাদেশের প্রাচীন গ্রাম্যব্যবস্থা ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। নিশ্চিহ্ন হ'ল গ্রামীণ কৃষি ও শিল্প; ধ্বংস হ'ল প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থা। প্রাচীন অর্থনীতির পরিবর্তে এদেশে চালু করা হ'ল ঔপনিবেশিক অর্থনীতি; প্রাচীন দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তে ইউরোপীয় শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করা হ'ল। কিন্তু বৃটিশ-বেনিয়া ও দেশীয় জমিদারদের শোষণযন্ত্র যাতে অপ্রতিহত গতিতে চলতে পারে, সেদিকে লক্ষ্য রেখেই এই সমস্ত নতুন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছিল। তাই তাঁদের নতুন অর্থনৈতিক

ব্যবস্থার ওপর ভিত্তি করে যে-নতুন শিক্ষাব্যবস্থা তৈরি করা হ'ল, তাতে বাংলার কৃষক-ঘরের ছেলেমেয়েরা আধুনিক শিক্ষা-গ্রহণের সুযোগ-লাভে বঞ্চিত হ'ল। কারণ কৃষক লেখাপড়া শিখলে তাকে বঞ্চিত করা কঠিন।

কেবলমাত্র লুণ্ঠন ও শোষণের অভিপ্রায় থাকায় বিদেশী বণিক-শাসনের প্রথম যুগে এদেশে ইংরেজি-শিক্ষা প্রবর্তনের কোনো পরিকল্পনা ছিল না। কিন্তু দুয়ারে হাতি বেঁধে রাখার জন্য আঠারো শতকের নবোদ্ভূত জমিদার ও মধ্যশ্রেণীভুক্ত বাবুরা ইংরেজিভাষা শিখতে আগ্রহী হয়েছেন। 'বৎসরের পর বৎসর যতই ইংরাজ-রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিল, যতই ক্রমে শাসনকার্যের জন্য আইন-আদালত প্রভৃতি স্থাপিত হইতে লাগিল, যতই ইংরাজ বণিকগণ দলে দলে আসিয়া কলিকাতা শহরে আপনাদের বাণিজ্যাগার স্থাপন করিতে লাগিলেন, ততই এদেশীয়দিগের, এবং বিশেষভাবে কলিকাতার মধ্যবিত্ত গৃহস্থদিগের মধ্যে স্বীয় স্বীয় সন্তানগণকে ইংরেজি শিক্ষা দিবার আকাঙ্ক্ষা বর্ধিত হইতে লাগিল।'[১০]

ইংরেজদের কাছ থেকে কয়েকটা ইংরেজি শব্দ শিখে নিয়ে তাঁরা লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জন করেছেন। দেওয়ান, বেনিয়ান, মুচ্ছুদ্দি, সরকার, খাজাঞ্চী, মুন্‌শী প্রভৃতি বাবুদের প্রথম দিকে ইংরেজি-জ্ঞানের ভাণ্ডারে ছিল Yes, No, Very well ইত্যাদি কয়েকটা ইংরেজি শব্দ। এঁদের ইংরেজি-বিদ্যা সম্পর্কে মনোজ্ঞ বর্ণনা দিয়েছেন রাজনারায়ণ বসু—"ইংরাজদিগের যে সকল সরকার থাকিত, তাহাদের ভাষা ও কথোপকথন আরো চমৎকার ছিল। একজন সাহেব তাঁহার সরকারের উপর ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। সরকার বলিল—মাষ্টর ক্যান লিব, মাষ্টর ক্যান ডাই। (Master can live, master can die) অর্থাৎ মনিব আমাকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারেন, অথবা মারিয়া ফেলিতে পারেন। সাহেব "What, master can die ?" এই কথা বলিয়া সরকারকে মারিবার জন্য লাঠি উঠাইলেন। সরকারের তখন মনে পড়িল, "ডাই" শব্দের অন্য অর্থ আছে, তখন "ষ্টাপ্ দেয়ার" (Stop there) অর্থাৎ প্রহার করিতে লাঠি উঠাইও না, এই বলিয়া হাত উঁচু করিল, তৎপরে অঙ্গুলি দ্বারা আপনাকে দেখাইয়া বলিল, "ডাই মি" (Die me) অর্থাৎ আমাকে মারিয়া ফেলিতে পারেন। "ইফ মাষ্টর ডাই, দেন আই ডাই, মাই কো ডাই, মাই ব্লাক ষ্টোন ডাই, মাই ফোরটিন জেনারেষন ডাই।" "If master die, then I die, my cow die, my blackstone die, my fourteen generation die." "যদ্যপি মনিব মরেন, তবে আমি মরিব, আমার কো অর্থাৎ গরু মরিবে, আমার ব্লাকষ্টোন অর্থাৎ বাড়ীর শালগ্রাম ঠাকুর মরিবেন, আমার ফোরটিন জেনারেষন অর্থাৎ চৌদ্দ পুরুষ মরিবে।"[১১] এই অবস্থায় দেশীয় বণিক-জমিদারদের মনে ইংরেজি-শিক্ষার গভীর আগ্রহ দেখা দেয়; কারণ তাঁরা

বুঝেছিলেন যে বণিকের ভাষা কিছুকালের মধ্যে রাজভাষা হবে। সুতরাং রাজানুগ্রহ-লাভের আশায় রাজভাষা শেখার জন্য তাঁরা সচেষ্ট হন। প্রকৃতপক্ষে দেশীয় পরজীবী-শ্রেণীর কাছে আকর্ষণীয় আয় ও জাঁকজমকপূর্ণ পদমর্যাদা-লাভের প্রশস্ত রাজপথ হ'ল ইংরেজিভাষা-শিক্ষা। এই ভাষায় শিক্ষা-গ্রহণকে তাঁরা সর্বরোগহর দাওয়াই বলে মনে করেছেন।

১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে কলকাতায় সুপ্রীম কোর্ট স্থাপিত হবার পরে ইংরেজ-অ্যাটর্নি-অ্যাডভোকেটদের কোনো কোনো উৎসাহী বাঙ্গালি কেরানি নিজেরা কিছু ইংরেজি শব্দ শিখে নিয়ে অন্যদের শেখাতেন। তখনো ইংরেজি-স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়নি ; ধনী বাবুদের বাড়িতে গিয়ে তাঁরা পড়িয়ে আসতেন। ইংরেজি শব্দ নোটবুকে লিখে নিয়ে যাঁরা অন্যদের ইংরেজি শিক্ষা দিতেন এবং মাসিক চার টাকা থেকে ষোল টাকা পর্যন্ত বেতন নিতেন, তাঁদের মধ্যে রামরাম মিশ্র, রামনারায়ণ মিত্র, আনন্দীরাম দাস, রামলোচন নাপিত, কৃষ্ণমোহন বসু, ভবানী দত্ত, শিবু দত্ত, নিত্যানন্দ সেন, উদিতচরণ সেন ও আরো দু'চার জনকে কেউ কেউ 'celebrated as complete English scholars' বলে উল্লেখ করেছেন। এই 'scholar'-দের মধ্যে ইংরেজি-বিদ্যা একখানা Spelling Book ও Word Book-এর মধ্যে সীমিত ছিল।[১২] 'তখন লোকে ডিক্সনারি মুখস্থ করিত, তাঁহারা এক এক জনে Walking Dictionary অর্থাৎ সচল অভিধান ছিলেন।'[১৩] এঁরা ছাড়া কয়েকজন ফিরিঙ্গি ১৭৮০-১৮১৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ইংরেজিভাষা শেখাবার জন্য কলকাতা শহরে অন্তত কুড়িটি ইংরেজি-স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে শেরবোর্ণ একটি ইংরেজি-শিক্ষার স্কুল খুলেছিলেন জোড়াসাঁকোয়। এই স্কুলে দ্বারকানাথ ঠাকুর শিক্ষালাভ করেছিলেন। মার্টিন বৌলের স্কুল ছিল আমড়াতলায়, শীল-পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা এখানে শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। আরাতুন, পিত্রুশ, ড্রামণ্ড, হুটেম্যান, আর্চার, ব্রাউন, জজ ফার্লি, হোমস, গেনার্ড, ফ্যারেল, ইয়েট্স্, ক্যানিংহাম, হালিফাক্স, লিণ্ডষ্টেড, ড্রেপার প্রভৃতিদের স্কুলে কলকাতা শহরের উচ্চশ্রেণীর বিত্তশালী পরিবারের সন্তানেরাই ইংরেজি শেখার সুযোগ পেয়েছিলেন। 'সে সময়ে যে ইংরাজী শিক্ষা দেওয়া হইত, তাহার বিষয়ে কিছু বলা আবশ্যক। সে সময়ে বাক্য-রচনা-প্রণালী বা ব্যাকরণ প্রভৃতি শিক্ষা দিবার দিকে দৃষ্টি ছিল না। কেবল ইংরাজী শব্দ ও তাহার অর্থ শিখাইবার দিকে প্রধানতঃ মনোযোগ দেওয়া হইত। যে যত অধিক সংখ্যক ইংরাজী শব্দ ও তাহার অর্থ কণ্ঠস্থ করিত, ইংরাজী ভাষায় সুশিক্ষিত বলিয়া তাহার তত খ্যাতি প্রতিপত্তি হইত। এরূপ শোনা যায় শ্রীরামপুরের মিশনারীগণ সে সময়ে এই বলিয়া তাঁহাদের আশ্রিত ব্যক্তিদিগকে সার্টিফিকেট দিতেন যে, এ ব্যক্তি দুইশত বা তিনশত ইংরাজী শব্দ শিখিয়াছে। এই কারণে সে সময়ে কোন কোনও বালক ইংরাজী অভিধান মুখস্থ করিত।'[১৪]

বেনিয়া-শাসনের প্রথম যুগে এদেশে ইংরেজি-শিক্ষা বিস্তারের কোনো সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা কোম্পানি-শাসকদের ছিল না। ১৭৫৭ সালের পরবর্তী প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে ভারতের মাটিতে তাঁদের অবস্থানকে রাজনৈতিক ও সামরিক দিক থেকে সুদৃঢ় করতে তাঁরা সচেষ্ট ছিলেন। আদালতের কাজের সুবিধার জন্য পণ্ডিত-মৌলভীকে নিয়োগ করতে হ'ত বলে তাঁরা এদেশে সংস্কৃত ও ফার্সি ভাষা-চর্চায় উৎসাহ দিতেন। ওয়ারেন হেষ্টিংস রাজনৈতিক স্বার্থে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের গোঁড়া ধর্মাবলম্বীদের সন্তোষ-বিধানার্থে প্রাচ্য-শিক্ষার পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন। ১৭৮০ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে মুসলমান সমাজের অভিজাতশ্রেণীর আস্থাভাজন কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি হেষ্টিংসের কাছে মুসলমান-ছাত্রদের আরবি ও ফারসি ভাষায় উচ্চশিক্ষার জন্য মাদ্রাসা স্থাপনের আবেদন করেন। তিনি সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন। সুযোগ পাওয়া মাত্র তিনি কালবিলম্ব না করে অক্টোবর মাসে অভিজাত মুসলমান-ছাত্রদের ইসলামিক শিক্ষাদানের জন্য কলকাতায় মাদ্রাসা স্থাপন করেছেন। ছাত্রদের আকৃষ্ট করার জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে। এখানে প্রাচীন আরবি ও ফারসি রীতি অনুসারে কোরাণীয় ধর্মতত্ত্ব, পাটীগণিত, তর্কশাস্ত্র ও ব্যাকরণ পড়ানো হ'ত এবং এই প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন একজন মৌলভী। মুসলমানদের ন্যায় হিন্দু-সম্প্রদায়কে খুশি করার জন্য হেষ্টিংসের সমর্থনে জোনাথান ডানকানের উদ্যোগে বেনারসে ১৭৯১ সালে সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মনুর বিধানানুসারে এখানে শিক্ষা দেওয়া হ'ত এবং বৈদ্যশাস্ত্রের অধ্যাপক ব্যতীত অন্যান্য অধ্যাপকেরা ব্রাহ্মণ ছিলেন। কেবলমাত্র বেনারসে নয়, এদেশের বিভিন্ন স্থানে সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য সংস্কৃতজ্ঞ কোলব্রুক সুপারিশ করেছেন। এভাবে উচ্চপদস্থ কর্মচারিদের মধ্যে হেষ্টিংসের আনুকূল্যে 'প্রাচ্য' গোষ্ঠী গড়ে উঠেছে এবং ধীরে ধীরে শক্তিশালী হয়ে এদেশের শিক্ষাকাঠামো নির্মাণে প্রভাব-বিস্তারে সচেষ্ট হয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে প্রাচ্য শিক্ষা-চর্চার এই দুটি কলেজ-স্থাপন ছাড়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কোনো শিক্ষানীতি এসময়ে ছিল না। পক্ষান্তরে তাঁরা গুরুত্বপূর্ণ সাম্রাজ্য-শোষণের স্বার্থে নিস্পৃহ ছিলেন এবং 'তদানীন্তন রাজপুরুষগণ হিন্দু ও মুসলমানগণের প্রাচীন রীতিনীতির প্রতি হস্তার্পণ করিতে অতীব কুণ্ঠিত ছিলেন।'[১৫] সেকারণেই বৃটেনে চার্লস গ্রাণ্ট ও উইলিয়ম উইলবার ফোর্সের প্রয়াস ব্যর্থ হয়েছে। ভারতীয়দের খৃষ্টান করার পূর্বে বিজয়ী জাতির ভাষা ইংরেজির মাধ্যমে ইউরোপীয় জ্ঞানদানের দ্বারা সুশিক্ষিত করার জন্য অবৈতনিক ইংরেজি-স্কুল স্থাপনের পরামর্শ দিয়ে চার্লস গ্রাণ্ট যখন ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে 'Observations' নামক পুস্তিকা (বইটির পুরো নাম—'Observations on the state of society among the Asiatic subjects of Great Britain, particularly

with respect to their morals and on the means of improving them') লিখেছেন এবং গ্রান্টের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে উইলবার ফোর্স যখন ভারতীয়দের প্রয়োজনীয় জ্ঞান এবং ধর্মচেতনা ও নৈতিক চরিত্রের উন্নতির জন্য ইংলণ্ড থেকে একদল শিক্ষক ও মিশনারি ভারতে পাঠাবার জন্য বৃটিশ পার্লামেণ্টে প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন, তখন তা প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। আধুনিক শিক্ষা প্রবর্তনের দ্বারা এদেশীয় ধর্মপরায়ণ ব্যক্তির মনে আঘাত দানে তাঁরা অনিচ্ছুক ছিলেন বলেই ১৭৯৩ সালের কোম্পানির সনদে ভারতের শিক্ষাবিষয়ে কিছু উল্লেখ করা হ'ল না।

এদেশে বৃটিশ-সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব ও ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির স্বার্থ রক্ষার জন্য একদিকে কোম্পানি-সরকারের আনুকূল্যে ক্ল্যাসিক্যাল ভাষা-চর্চায় উৎসাহ দেওয়া হয়েছে, অন্যদিকে ওয়েলেসলীর উদ্যোগে কোম্পানির তরুণ ইউরোপীয় কর্মচারিদের দেশীয় ভাষায় শিক্ষা-দানের জন্য ১৮০০ খৃষ্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সঙ্কীর্ণ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রতিষ্ঠিত হলেও এই কলেজ বাংলা গদ্য-বিকাশের প্রথম পর্বে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে (এ বিষয়ে পরবর্তী অধ্যায়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে)। 'প্রাচ্য' গোষ্ঠীর পৃষ্ঠপোষক লর্ড মিণ্টো ১৮১১ সালে ৬ মার্চের 'মিনিটে' ভারতে প্রাচ্য-শিক্ষা গ্রহণে আগ্রহের অভাব ঘটায় উদ্বেগ প্রকাশ করে লিখেছেন যে, ভারতীয়দের মধ্যে প্রাচ্য বিজ্ঞান ও সাহিত্যের আলোচনা ক্রমশ কমে যাচ্ছে এবং তার ফলে শেষ পর্যন্ত মূল্যবান গ্রন্থগুলি ক্রমেই বিলুপ্ত হচ্ছে। সরকার যদি এ বিষয়ে অবিলম্বে সাহায্য না করেন, তবে পাঠ্যগ্রন্থ ও উপযুক্ত অধ্যাপকের অভাবে প্রাচ্য-বিদ্যাচর্চার সমাপ্তি ঘটবে।[১৬] সুতরাং তিনি প্রস্তাব করেছেন যে নদীয়ার নবদ্বীপে ও ত্রিহুতের অন্তর্গত ভাউর নামক স্থানে সংস্কৃত কলেজ এবং ভাগলপুর ও জৌনপুরে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন। মিণ্টোর প্রস্তাবে অবিলম্বে কোনো ফল না হলেও কোম্পানির পরিচালকমণ্ডলী ভারতের শিক্ষা-সমস্যার প্রতি আর উদাসীন থাকতে পারলেন না এবং তার ফলে ১৮১৩ খৃষ্টাব্দের সনদে ভারতের শিক্ষার জন্য এক লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হ'ল।

১৮১৩ সালের সনদ-আইনের (Charter Act) ৪৩নং ধারায় শিক্ষার জন্য বাৎসরিক এক লক্ষ টাকা মঞ্জুর করে বলা হয়, "প্রত্যেক বৎসরে ন্যূনতম এক লক্ষ টাকা স্বতন্ত্র রাখতে হবে এবং তা ভারতের শিক্ষিত অধিবাসীদের উৎসাহদান, সাহিত্যের উন্নয়ন ও পুনরুজ্জীবন এবং ভারতের বৃটিশ-শাসিত অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক শিক্ষার প্রবর্তন ও প্রসারের জন্য ব্যয় করা হবে।"[১৭] সনদ-আইনের শিক্ষা-বিষয়ক এই ধারাটি ছিল দ্ব্যর্থবোধক ও গভীর হতাশাব্যঞ্জক। কারণ তাঁরা কেবলমাত্র সমাজের অভিজাত-শ্রেণীর শিক্ষিত ব্যক্তিদের সম্পর্কেই চিন্তা করেছিলেন। 'শিক্ষিত অধিবাসীদের উৎসাহ-দান' ও 'বৈজ্ঞানিক শিক্ষার প্রবর্তন' —এই বাক্যাংশ দুটিকে একত্রে পাঠ করলে এই সত্য

উদ্ভাসিত হয়ে উঠে যে, যাঁরা অর্থ ও বর্ণকৌলীন্যের জোরে বৈদিক যুগ থেকে শিক্ষাকে নিজেদের শ্রেণীর মধ্যে আবদ্ধ করে রেখেছেন, তাঁদের জন্য কোম্পানি-সরকারের মাথাব্যথা —যাঁরা কোনোদিনই শিক্ষার অধিকার পাননি, তাঁরা বঞ্চিত হয়েই থাকলেন। তাঁদেরকে শিক্ষিত করার বিষয় নিয়ে দেশীয় ও ইউরোপীয় সমাজে কোনো প্রশ্ন উত্থাপিত হ'ল না; বিতর্ক হ'ল শিক্ষার ধরণ ও ভাষা-মাধ্যম নিয়ে। সনদ-আইনে দ্ব্যর্থবোধক ভাষা ব্যবহারের ফলে এই টাকা কি ধরনের শিক্ষার জন্য খরচ করা হবে এবং শিক্ষার ভাষা-মাধ্যম কি হবে তা নিয়ে প্রবল মতবিরোধ দেখা দেয়।

প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর, রাজা রাধাকান্ত দেববাহাদুর, রাজা রাধাকান্ত সিংহ, রাজা গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ, গোপীমোহন ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, গোবিন্দরাম মিত্র, রামকমল সেন, মহারাজা সুখময় রায়, রাজা কিষনচাঁদ রায়, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীনাথ মুন্‌শী, বৃন্দাবন মিত্র, বৈকুণ্ঠনাথ মুন্‌শী, কাশীনাথ মল্লিক, কালীশঙ্কর ঘোষাল, অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীনাথ রায়, রাজা বদনচন্দ্র রায়, বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ সেকালের প্রায় সকলেই ইংরেজদের অধীনে দেওয়ান, বেনিয়ান, মুন্‌শী, খাজাঞ্চী, সরকার ইত্যাদি পদে চাকরি করে ও সাহেবদের ঋণ দিয়ে, কোম্পানির কাগজ ও অন্যান্য দ্রব্য কেনাবেচা করে এবং ঠিকাদারি, ইজারাদারি ও তেজারতি ব্যবসা করে প্রচুর ধনোপার্জনের দ্বারা জমিদারি কিনেছেন এবং কোম্পানি-সরকারের সাহেবকর্মচারিদের মনোরঞ্জনার্থে আমোদ-প্রমোদের জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়ের দ্বারা তাঁদের কাছ থেকে রাজা-মহারাজা খেতাব লাভ করে কলকাতা শহরে সুপরিচিত হয়েছেন। এ সময়ে (১৮১৪ খৃঃ) কলকাতায় এসেছেন রাজা রামমোহন রায়।

রাজা রামমোহন ছিলেন নয়া জমিদার। অন্যান্যদের মতো তিনিও জন ডিগবীর দেওয়ানি করেছেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সুযোগে তিনি বিশাল ভূসম্পত্তির অধিকারী হয়েছেন। তেজারতি ব্যবসা ও জমিদারি ছিল তাঁর আয়ের একমাত্র উৎস। জন ডিগবীর দেওয়ান-রূপে রংপুরে থাকাকালে রামমোহন ইউরোপীয় ইতিহাস-বিজ্ঞান-দর্শনের বহু গ্রন্থ পাঠ করেন এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশসমূহের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিষয়-সম্পর্কিত বহু গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। বেন্থাম, হিউম, রিকার্ডো, জেমস মিল, জন ষ্টুয়ার্ট মিল প্রমুখ সেকালের ইউরোপীয় সমাজের শ্রেষ্ঠ বুর্জোয়া চিন্তাশীলদের রচনাবলী-পাঠে প্রভাবিত হয়ে কলকাতায় বসবাসকালে তিনি ধর্ম ও সমাজ-সংস্কার আন্দোলন গড়ে তুলেছেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'আত্মীয় সভা'য় (১৮১৫ খৃঃ) যোগ দিয়েছেন নয়া ভূস্বামী-শ্রেণীভুক্ত বিশিষ্ট রাজা-মহারাজা। 'লক্ষ লক্ষ কৃষকের লুণ্ঠিত সম্পদে ধনবান এই ভূস্বামীশ্রেণীই শহরে নিয়ে এল সাংস্কৃতিক নবজাগরণ। তাঁদের মুখপাত্র ছিলেন রাজা রামমোহন রায়।'[১৮] তাঁরা শ্রেণীস্বার্থে যেমন সমগ্র ভারতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের

দাবি করেছেন, তেমনি ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে আধুনিক শিক্ষার প্রচলনের দাবি উত্থাপনের দ্বারা শিক্ষাকে নিজেদের শ্রেণীর মধ্যে আবদ্ধ করে রাখতে প্রয়াসী হয়েছেন।

এসময়ে মিশনারীদের একাংশের উদ্যোগে মাতৃভাষার মাধ্যমে আধুনিক শিক্ষাদানের ব্যাপক প্রয়াস শুরু হলেও দেশীয় ধনিক-বণিকেরা নিজেদের শ্রেণীস্বার্থে এবং খৃষ্টান মিশনারীদের একাংশ নিজেদের ধর্মস্বার্থে ব্যক্তিগত প্রয়াসে কলকাতায় ও নিকটবর্তী বিভিন্ন নগরে ইংরেজি-শিক্ষা প্রসারের জন্য ইংরেজি-স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং কলেজ-স্থাপনে অগ্রণী হয়েছেন। পাশ্চাত্য-শিক্ষা বিস্তারের জন্য ভূকৈলাসের রাজা জয়নারায়ণ ঘোষাল ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে কুড়ি হাজার টাকা দান করেছেন। ১৮১৭ সালের ২০ জানুয়ারি রামমোহন-গোষ্ঠীর 'আত্মীয় সভা' ও রাধাকান্ত-গোষ্ঠীর 'ধর্মসভা'-র অন্তর্ভুক্ত বিশিষ্ট ধনী ব্যক্তিদের সম্মিলিত প্রয়াসে কলকাতায় হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁদের মধ্যেকার ধর্মগত বিভেদ কিংবা ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের ধর্মীয় গোঁড়ামী শ্রেণীস্বার্থ পূরণের জন্য কলেজ-স্থাপনের পথে কোনো বাধা সৃষ্টি করেনি। হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য ১৮১৬ সালের ১৪ মে যে-সভা অনুষ্ঠিত হয়, সেই সভার বিবরণ দিতে গিয়ে সভার আহ্বায়ক সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার এডোয়ার্ড হাইড ইষ্ট ১৮ মে তারিখে বিচারপতি হ্যারিংটনকে একটি চিঠিতে লিখেছেন, "এই সভার একটি বিশেষ লক্ষণীয় এই যে নানা জাতির লোক—যাঁহারা একত্রে বসিয়া ভোজন করিবেন না—তাঁহারাও তাঁহাদের শিশুদের একত্রে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থার জন্য এই সভায় সমবেত হইয়াছিলেন।"[১৯]

দশজন ইউরোপীয় ও উনিশ জন দেশীয় ধনী ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত হিন্দু কলেজের পরিচালকমণ্ডলীতে 'আত্মীয় সভা' ও 'ধর্মসভা'-র গোষ্ঠীভুক্ত ব্যক্তিরা ছিলেন। দেশীয় ব্যক্তিরা হলেন চতুর্ভুজ ন্যায়রত্ন, সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রী, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, রঘুমণি বিদ্যাভূষণ, গোপীমোহন ঠাকুর, হরিমোহন ঠাকুর, গোপীমোহন দেব, জয়কৃষ্ণ সিংহ, রামতনু মল্লিক, অভয়চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রামদুলাল দে, রাজা রামচাঁদ রায়, রামগোপাল মল্লিক, বৈষ্ণব-দাস মল্লিক, চৈতন্যচরণ শেঠ, শিবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, রাধাকান্ত দেব, রামরতন মল্লিক ও কালীশঙ্কর ঘোষাল। এই কলেজ-স্থাপনের উদ্দেশ্য ঘোষণা করে বলা হয়েছে—"বিশিষ্ট হিন্দু পরিবারের সন্তানদের ইউরোপ ও এশিয়ার সাহিত্য ও বিজ্ঞান বিষয়সমূহ ইংরেজি-ভাষায় ও ভারতীয় ভাষাসমূহের মাধ্যমে শিক্ষাদান হ'ল এই প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য।"[২০] তাই হিন্দু কলেজের ছাত্রদের মধ্যে প্রায় সকলে ধনিক পরিবারের সন্তান ছিলেন। ইংরেজিভাষার মাধ্যমে তাঁরা অর্থ, স্বাচ্ছন্দ্য, প্রতিষ্ঠা ও নিরাপত্তা লাভ করেছেন। হিন্দু কলেজের এক ছাত্র লিখেছেন, "সমস্ত দিক থেকেই আমরা নিরাপদ। সাহিত্য ও বিজ্ঞানে আমরা ক্রমেই উন্নতি করছি এবং করতে থাকব যতদিন বৃটিশ-পৃষ্ঠপোষকতা আমরা লাভ করব।"[২১]

রাজা রামমোহন ১৮২২ খৃষ্টাব্দে ইংরেজিভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান বিষয়ে শিক্ষা দেবার জন্য স্বীয় ব্যয়ে কলকাতায় হেদুয়ার দক্ষিণ-পূর্ব কোণে অ্যাংলো-হিন্দু স্কুল স্থাপন করেন। এখানেও বিত্তশালী ও সম্ভ্রান্তবংশীয় সন্তানেরাই কেবলমাত্র অধ্যয়নের সুযোগ পেয়েছেন। প্রিন্স দ্বারকানাথের পুত্র দেবেন্দ্রনাথ এই স্কুলে পড়েছেন। তাছাড়া রামমোহন রেঃ আলেকজাণ্ডার ডাফকে কলকাতায় ইংরেজি-স্কুল 'জেনারেল অ্যাসেম্বলিজ ইনস্টিটিউশন' স্থাপনে সাহায্য করেছেন। রাজা ইংরেজি ভাষায় উচ্চতর শিক্ষাদানের প্রভাবশালী সমর্থক ছিলেন।[২২] সুতরাং উনিশ শতকের প্রথম ভাগ থেকে ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে ইউরোপীয় শিক্ষা প্রবর্তনের যে-আন্দোলন আরম্ভ হয়, তার সুযোগ গ্রহণ করা বিত্তবান জমিদার ও মধ্যশ্রেণী ছাড়া অন্য কোনো শ্রেণীর পক্ষে সম্ভব ছিল না। ফলে রায়ত-কৃষকের সন্তানেরা পাশ্চাত্য শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত হলেন; তাঁরা রয়ে গেলেন চির-অন্ধকারে।

বিত্তশালীশ্রেণীর আগ্রহে যখন ব্যক্তিগত উদ্যোগে ইংরেজিভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার ঘটছে, তখনো বৃটিশ-সরকার শিক্ষাবিষয়ে কোনো সুনির্দিষ্ট নীতি গ্রহণ করেননি। ১৮১৩ সালের পূর্বে উচ্চপদস্থ ইংরেজ-কর্মচারিদের মধ্যে শিক্ষাবিষয়ে কোনো ঐক্যমত ছিল না। তাঁরা দু'টি গোষ্ঠীতে বিভক্ত ছিলেন —একদল আরবি, ফারসি, সংস্কৃত ইত্যাদি প্রাচ্যভাষার মাধ্যমে উচ্চতর প্রাচ্যবিদ্যা প্রসারের পক্ষপাতী ছিলেন; অন্যদল ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে ইউরোপীয় সাহিত্য-বিজ্ঞান-শিক্ষার সপক্ষে ছিলেন। তাঁদের অন্তর্বিরোধকে সনদ-আইন তীব্রতর করে তুলেছিল। এই আইনে 'শিক্ষিত অধিবাসীদের উৎসাহদান', 'সাহিত্যের উন্নয়ন ও পুনরুজ্জীবন', 'বৈজ্ঞানিক শিক্ষার প্রবর্তন ও বিস্তার' ইত্যাদি দ্ব্যর্থবোধক ভাষা ব্যবহৃত হওয়ায় উভয় পক্ষই নিজ নিজ মতানুযায়ী ব্যাখ্যা করেছেন। তবে প্রাচ্যপন্থীরা সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দের ১৭ জুলাই এক সরকারি নির্দেশের দ্বারা দশজন ইউরোপীয় সদস্য নিয়ে General Committee of Public Instruction নামে একটি কমিটি গঠন করে তাঁদের হাতে এদেশে শিক্ষাবিস্তারের দায়িত্ব দেওয়া হয়। কমিটির বিভিন্ন পদে ও সদস্যরূপে নিযুক্ত হয়েছেন: জে. এইচ. হ্যারিংটন —সভাপতি; জে. পি. লারকিন্স; ডবলিউ. বি. মার্টিন; ডবলিউ. বি. বেলি; এইচ. শেক্সপীয়ার; এইচ. ম্যাকেঞ্জী; এইচ. টি. প্রিন্সেপ; জে. সি. সি. সাদারল্যাণ্ড; এ. ষ্টার্লিং এবং এইচ. এইচ. উইলসন— সম্পাদক। পরবর্তীকালে অর্থাৎ ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে এই কমিটির সভাপতি-রূপে নিযুক্ত হয়েছিলেন লর্ড বেরিংটন মেকলে।

জেনারেল কমিটির সদস্যদের মধ্যে প্রাচ্য-ভাষা ও প্রাচ্য-শিক্ষা প্রশ্নে দ্বিমত থাকলেও পাশ্চাত্য শিক্ষাদানের বিষয়ে কোনো মতপার্থক্য ছিল না। তাছাড়া উভয় গোষ্ঠী

মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের বিরোধী ছিলেন। ১৮২৩ সালের এক সরকারি নির্দেশে জেনারেল কমিটিকে দেশীয় ব্যক্তিদের নৈতিক চরিত্রের উন্নয়নে উপযুক্ত শিক্ষাদানের জন্য প্রয়োজনীয় কর্মপন্থা গ্রহণ করতে বলা হ'ল। কমিটির মধ্যে প্রাচ্যপন্থী সদস্যরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ায় প্রাচ্য-শিক্ষানুরাগী উইলসন ও প্রিন্সেপের নেতৃত্বে ক্ল্যাসিক্যাল অর্থাৎ সংস্কৃত, আরবি ও ফারসি ভাষার মাধ্যমে প্রাচ্য-কলাবিদ্যা ও পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান বিস্তারের নীতি গ্রহণ করা হ'ল। বৃটিশ-পার্লামেণ্ট কর্তৃক শিক্ষাখাতে বাৎসরিক বরাদ্দ এক লক্ষ টাকা হিসাবে তিন বৎসরের (১৮২১-১৮২৩ খৃঃ.) তিন লক্ষ টাকার মধ্যে প্রাপ্ত ২,৬৬,৪০০ টাকা এই উদ্দেশ্যে ব্যয় করতে তাঁরা উদ্যোগী হলেন। উইলসন ও প্রিন্সেপ সংস্কৃত ও আরবি ভাষার মাধ্যমে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জ্ঞান-চর্চায় যত্নশীল হন। তাঁরা কলকাতার মাদ্রাসা ও কাশীর সংস্কৃত কলেজের সংস্কারসাধন করেন, কলকাতায় সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেন (সংস্কৃত কলেজ ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত)। পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান বিষয়ক বহু ইংরেজি-গ্রন্থ সংস্কৃত ও আরবি ভাষায় প্রকাশ করেন। তাছাড়া প্রাচীন সংস্কৃত ও আরবি গ্রন্থগুলি মুদ্রিত হ'ল। 'এই সকল কার্য্যের জন্য কিরূপ ব্যয় হইতে লাগিল তাহার নিদর্শন স্বরূপ এইমাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, আরবি 'আবিসেন্না' নামক গ্রন্থ পুনর্মুদ্রিত করিতে প্রায় ২০,০০০ বিশ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছিল এবং ছাত্রদিগের পাঠার্থ ফারসি ভাষাতে যে সকল প্রাচীন গ্রন্থের অনুবাদ করা হইয়াছিল, হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, তাহার প্রত্যেক পৃষ্ঠাতে প্রায় ১৬ টাকা করিয়া ব্যয় পড়িয়াছিল। সেই অনুবাদিত গ্রন্থ সকল আবার ছাত্রেরা বুঝিতে অসমর্থ হওয়াতে তাহাদের ব্যাখ্যা করিবার জন্য স্বয়ং অনুবাদককে মাসিক ৩০০ তিন শত টাকা বেতন দিয়া রাখিতে হইয়াছিল। অপরদিকে মুদ্রিত ও অনুবাদিত গ্রন্থ সকল ক্রেতার অভাবে স্তূপাকার হইয়া পড়িয়া রহিতে লাগিল। বহুকাল পরে কীটের মুখ হইতে যাহা বাঁচিল, তাহা কাগজের দরে বিক্রয় করিতে হইল।'[২৩]

এভাবে প্রাচ্যভাষায় বিদ্যাদানের জন্য প্রচুর অর্থব্যয় এবং ইংরেজিভাষায় শিক্ষাদানের প্রতি জেনারেল কমিটির অনীহা দেশীয় ভূস্বামী-বণিক-ধনিকশ্রেণীকে বিক্ষুব্ধ করেছিল। ফলে তাঁরা রাজা রামমোহনের নেতৃত্বে জেনারেল কমিটির প্রাচ্যবিদ্যা-প্রীতির বিরোধিতায় অবতীর্ণ হলেন। শিক্ষানীতির উদ্দেশ্য, শিক্ষার ভাষা-মাধ্যম, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও শিক্ষা-বিস্তারের পদ্ধতি প্রভৃতি প্রশ্ন নিয়ে কলকাতায় শিক্ষা-আন্দোলন দেখা দেয়। এই শিক্ষা-আন্দোলনে শিক্ষার ভাষা-মাধ্যম প্রশ্নটি সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব অর্জন করেছিল। এই প্রশ্নে তিনটি মত সৃষ্টি হয়েছিল। ইংরেজি ভাষায় শিক্ষাদানের পক্ষে ছিলেন মেকলে, বেন্টিঙ্ক, রামমোহন, দ্বারকানাথ, রাধাকান্ত, ভবানীচরণ প্রমুখ এবং খৃষ্টান মিশনারীরা। হেষ্টিংস, জোনাথান, কোলব্রুক, মিণ্টো, উইলসন, প্রিন্সেপ প্রমুখ ইউরোপীয় রাজকর্মচারি

সংস্কৃত ও আরবি ভাষার সপক্ষে ছিলেন। মন্‌রো, এলফিনষ্টোন, কেরি, মার্শম্যান, অ্যাডাম প্রমুখ তৃতীয় দল মাতৃভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য-শিক্ষাদানের পক্ষপাতী ছিলেন। প্রথম দু'টি দলের তুলনায় তৃতীয় দলটি দুর্বল হওয়ায় মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা-বিস্তারের দাবি উপেক্ষিত হ'ল। তবে এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা-প্রচলনে উক্ত তিন দলের মধ্যে কোনো মতভেদ ছিল না।

দেশীয় ভূস্বামী-শ্রেণীর দুই অংশ রামমোহন-দ্বারকানাথের 'আত্মীয় সভা' এবং রাধাকান্ত-ভবানীচরণের 'ধর্মসভা'র সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলেই ইংরেজিভাষায় ইউরোপীয় বিজ্ঞান, সাহিত্য, দর্শন অধ্যয়নের পক্ষপাতী ছিলেন। উভয় গোষ্ঠীর কাছে ইংরেজি-শেখার অর্থ ছিল চাকরি, অর্থ ও সামাজিক সম্মান-লাভ। 'ইংরাজি বিদ্যা দেশে প্রচলিত হইবামাত্র লোকে দেখিতে পাইল যে, ইংরাজেরা সমুদ্রপার হইতে নানাবিধ অদ্ভুত সামগ্রী আনিয়াছেন, তার মধ্যে এও একটা অত্যন্ত অপরূপ সামগ্রী। অতি সহজে এ একটা পেট ভরিবার উপায়। এই বিদ্যার উপার্জ্জনে প্রথমতঃ কিঞ্চিৎ কড়ি খরচ করিতে হয় বটে; কিন্তু তারপর ইহা বেচিয়া বা ইহার বিনিময়ে বা ইহার নামে যথেষ্ট কড়ি ঘরে আইসে। অর্থোপার্জ্জনের যত পন্থা দেশের মধ্যে প্রচলিত ছিল, তন্মধ্যে এইটাই সবচেয়ে সহজ পন্থা হইল। ইহাতে অধিক মূলধনের দরকার হয় না, ইহাতে অধিক ব্যবসায়বুদ্ধি আবশ্যক হয় না, এবং সবচেয়ে সুবিধা —ইহাতে দেউলিয়া হইবার কোনো আশঙ্কা থাকে না।'[২৪]

তাই ইংরেজিভাষায় পাশ্চাত্য-শিক্ষাদানের দাবি করে রাজা রামমোহন ১৮২৩ খৃষ্টাব্দের ১১ ডিসেম্বর তারিখে লর্ড আমহার্ষ্টকে এক চিঠিতে লিখেছেন, "যদি ইংরাজ জাতিকে প্রকৃত জ্ঞান বিষয়ে অজ্ঞ রাখা উদ্দেশ্য হইত তাহা হইলে প্রাচান স্কুলমেনদিগের অসার বিদ্যার পরিবর্ত্তে বেকনের প্রবর্ত্তিত জ্ঞানকে প্রতিষ্ঠিত হইতে না দিলেই হইত, কারণ প্রাচীন জ্ঞানই অজ্ঞতাকে বাহাল রাখিত। সেইরূপ এদেশীয়দিগকে অজ্ঞতার অন্ধকারে রাখা যদি গবর্ণমেণ্টের আকাঙ্ক্ষা ও নীতি হয়, তাহা হইলে প্রাচীন সংস্কৃত ভাষাতে শিক্ষা দেওয়ার ন্যায় তাহার উৎকৃষ্টতর উপায় আর নাই। তৎপরিবর্ত্তে এদেশীয়দিগের উন্নতিবিধান যখন গবর্ণমেণ্টের লক্ষ্য, তখন শিক্ষা বিষয়ে উন্নত ও উদার রীতি অবলম্বন করা আবশ্যক, যদ্দ্বারা অপরাপর বিষয়ের সহিত, গণিত, জড় ও জীব-বিজ্ঞান, রসায়নতত্ত্ব, শারীরস্থান-বিদ্যা ও অপরাপর প্রয়োজনীয় বিজ্ঞানাদির শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। যে অর্থ এখন প্রস্তাবিত কার্য্যে ব্যয় করিবার অভিপ্রায় করা হইয়াছে, তদ্দ্বারা ইউরোপে শিক্ষিত কতিপয় প্রতিভাশালী ও জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিলে ও ইংরাজী শিক্ষার জন্য একটি কালেজ স্থাপন করিলে ও তৎসঙ্গে পুস্তকালয়, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার যন্ত্রাদি, প্রয়োজনীয় পদার্থ সকল দিলেই পূর্ব্বোক্ত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে।"[২৫]

রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের প্রধানেরা অর্থাৎ 'ধর্মসভা'র নেতারা অর্থনৈতিক স্বার্থে

ইংরেজিভাষার মাধ্যমে ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রসারের প্রচেষ্টাকে সোচ্চারে সমর্থন করেছেন। সেকারণে অর্থকরী বিদ্যা-উপার্জনের আবশ্যকতাকেও তাঁরা শাস্ত্রসিদ্ধ বলেছেন। 'ধর্মসভা'র সম্পাদক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 'কলিকাতা কমলালয়' গ্রন্থে লিখেছেন, "অতএব অর্থকরী বিদ্যোপার্জ্জনের আবশ্যকতা আছে তাহা শাস্ত্রসিদ্ধি বটে এবং যখন যিনি দেশাধিপতি হয়েন তখন তাহাদিগের বিদ্যাভ্যাস না করিলে কি প্রকারে রাজকর্ম্ম নির্ব্বাহ হয় ইহাতে আমার মতে কোন দোষ দেখি না।"[২৬] তিলক-শোভিত হিন্দু পণ্ডিত ও হ্যাট-কোট-প্যাণ্ট পরিহিত কালো চামড়ার দিশি সাহেবরা অর্থকে পরমার্থ বলে মনে করেছেন। এবং সেকারণে মাতৃভাষাকে গঙ্গায় বিসর্জন দেবার ব্যবস্থায় তাঁরা একমত ছিলেন। তাঁদের কাছে ইংরেজি ভাষা ছিল রাজার ভাষা, আর বাংলা ভাষা ছিল লেংটি-পরা মানুষের লাঙলের ভাষা।

কেবলমাত্র ব্যক্তিগত উদ্যোগে ইংরেজিভাষায় ইংরেজি-শিক্ষার প্রসার নয়, শ্বেতাঙ্গ সরকার যাতে প্রাচ্য-শিক্ষাদানের নীতি পরিত্যাগ করে ইংরেজিভাষার মাধ্যমে আধুনিক শিক্ষা-বিস্তারের দায়িত্ব গ্রহণ করে সনদ-আইনে বরাদ্দ বার্ষিক এক লক্ষ টাকা ব্যয় করেন, সেজন্য রামমোহন পূর্বোক্ত চিঠিতে আমহার্স্টের কাছে আবেদন জানিয়ে লিখেছেন, "আমরা অবগত হয়েছি যে, ইংলণ্ডের সরকার ভারতীয় প্রজাদের শিক্ষার জন্য বেশ কিছু পরিমাণ অর্থ মঞ্জুর করেছিলেন। আমরা নিশ্চিতভাবে আশা করেছিলাম যে গণিত, জড় ও জীববিজ্ঞান, রসায়নতত্ত্ব, শারীরস্থান-বিদ্যা ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিজ্ঞানাদির শিক্ষাদানের কাজে প্রতিভাধর ইউরোপীয় ব্যক্তি ও শিক্ষাবিদকে এদেশে নিয়োগের জন্য এই অর্থ ব্যয় করা হবে; কারণ বিজ্ঞান-বিষয়সমূহে উৎকর্ষ সাধনের দ্বারা ইউরোপীয় জাতিসমূহ পৃথিবীর অন্যান্য অংশের অধিবাসী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছে।"[২৭] ইউরোপীয় শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য রামমোহন দাবি করলেও প্রাচ্য শিক্ষা-বিস্তারের জন্য জেনারেল কমিটির উদ্যোগে ১৮২৪ খৃষ্টাব্দের ২২ ফেব্রুয়ারি কলকাতায় মাদ্রাসার জন্য নতুন গৃহ নির্মিত হয়; সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং কিছুদিন পরে ইংরেজি ভাষা-শিক্ষা কলেজের পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কিন্তু অন্তর্ভুক্তির উদ্দেশ্য ব্যর্থ হ'ল; কারণ প্রাচ্যশিক্ষার অতিরিক্ত বিষয় পড়ার মতো সময় ছাত্রদের ছিল না।[২৮] তা সত্ত্বেও শিক্ষাখাতে বরাদ্দ টাকার অধিকাংশ প্রাচ্যশিক্ষার উন্নয়নে ব্যয় করা হয়েছে।

অথচ বাৎসরিক এক লক্ষ টাকা ব্যয়ে দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতির জন্য জেনারেল কমিটির কাছে কয়েকটি শিক্ষা-প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। মাতৃভাষায় আধুনিক শিক্ষার কাঠামো গড়ে তোলার জন্য জন. পি. শেক্সপীয়ার কর্তৃক উপস্থাপিত প্রথম প্রস্তাবে (৬. ৯. ১৮২৩ খৃঃ) বলা হয়েছিল যে, প্রথম স্তরে প্রত্যেকটি থানা-এলাকায় একটি বাংলা স্কুল, দ্বিতীয় স্তরে প্রত্যেকটি জেলার সদর-শহরে দুটি বাংলা স্কুল এবং প্রাদেশিক আদালত

অবস্থিত ছ'টি বড় শহরে ছ'টি বাংলা স্কুল স্থাপন করা হোক। রেভারেণ্ড উইলিয়ম কেরি কর্তৃক লিখিত দ্বিতীয় প্রস্তাবে (১৬. ৯. ১৮২৩ খৃঃ.) বলা হয়েছে যে, দরিদ্রশ্রেণীর জন্য জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন এবং দেশীয় ব্যক্তিদের মাতৃভাষায় উচ্চতর বিজ্ঞান-শিক্ষা দেওয়া হোক। কিন্তু জেনারেল কমিটির সভাপতি মিঃ হ্যারিংটন কেরির প্রস্তাবের বিরোধিতা করে লিখেছিলেন যে, প্রথমে কিছু নির্বাচিত ছাত্রকে ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে শিক্ষিত করা হোক এবং তারপরে তাঁরা বিভিন্ন বিষয়ক ইংরেজি গ্রন্থ থেকে মাতৃভাষায় অনুবাদ করবেন। এভাবেই এদেশের জনসাধারণ ইউরোপীয় বিজ্ঞান ও সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত হবেন। অর্থাৎ আধুনিক শিক্ষা সমাজের উচ্চ অভিজাতশ্রেণীর মাধ্যমে নিম্নগামী হয়ে দেশের দরিদ্রশ্রেণীর কাছে পৌঁছুবে।

হ্যারিংটন এভাবেই শিক্ষাক্ষেত্রে 'নিম্নমুখী পরিস্রুতি মতবাদ'-এর (Downward Filtration Theory) প্রবক্তা রূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তিনি এদেশে ইংরেজি-স্কুল স্থাপনের ও ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য সাহিত্য ও বিজ্ঞান-শিক্ষার প্রধান সমর্থক ছিলেন। হ্যারিংটনের অভিমতের পশ্চাতে ছিল শাসকশক্তির সমর্থন ও প্রেরণা। তাঁরা শিক্ষাখাতে বরাদ্দ অর্থ ইংরেজিভাষায় শিক্ষাদানে ব্যয়ের পক্ষপাতী ছিলেন। দেশের মানুষকে মাতৃভাষায় বিদ্যাদানের সমস্যাটি তাঁদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল না। ইংরেজিভাষায় অভিজাতশ্রেণীকে শিক্ষিত করাই ছিল তাঁদের কাছে প্রধান সমস্যা। হ্যারিংটনের ভাবনা-চিন্তা জেনারেল কমিটির সদস্যদের প্রভাবান্বিত করেছিল। তাই কমিটির সম্পাদক এইচ. এইচ. উইলসন কমিটির সদস্যদের কাছে যে 'নোট' দিয়েছিলেন, তা 'নিম্নমুখী পরিস্রুতি' নীতির সমর্থনে রচিত।

জেনারেল কমিটির একজন প্রভাবশালী সদস্য হোল্ট ম্যাকেঞ্জী চুঁচুড়ার মিশনারি পরিচালিত বাংলা-স্কুলগুলিকে সরকারি অর্থ-সাহায্যের বিরোধী ছিলেন। তাঁর মতে এই স্কুলগুলির ছাত্ররা কিছুই শেখেনি। সুতরাং অবিলম্বে এই স্কুলগুলিকে অর্থসাহায্য বন্ধ করা উচিত। কমিটির আর একজন বিশিষ্ট সদস্য ডবলিউ. বি. বেলি লিখেছেন, "গ্রাম্য স্কুলগুলিকে অর্থসাহায্যের প্রশ্নে আমি মনে করি যে, আমাদের করার কিছু নেই।"[২৯] শাসকগোষ্ঠীর প্রভাবশালী সদস্য ম্যাকেঞ্জী ও বেলির দৃষ্টিভঙ্গিতে ইংরেজ-সরকারের জনশিক্ষার প্রতি সহানুভূতিহীন মনোভাবের প্রকাশ ঘটেছে।

জেনারেল কমিটির কাছে প্রদত্ত শিক্ষাপ্রস্তাবগুলিতে দু'টি চিন্তাধারার অভিব্যক্তি ঘটেছে। একদিকে জে. পি. শেক্সপীয়ার, রেঃ. কেরি প্রমুখ মনে করেছেন যে জাতীয় শিক্ষার ভিত্তিস্বরূপ গ্রামের পাঠশালাগুলির মানোন্নয়নের দ্বারা মাতৃভাষায় আধুনিক শিক্ষাদানে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে। অন্যদিকে হ্যারিংটন, ম্যাকেঞ্জী প্রমুখ সুপারিশ করেছেন যে, সমাজের বিত্তশালীশ্রেণীর মধ্যে ইংরেজিভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য জ্ঞান

বিস্তার করতে হবে। গ্রামের পাঠশালাগুলিকে উন্নত করে গ্রামীণ মানুষের জন্য একটা সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলতে হ্যারিংটন, ম্যাকেঞ্জী, বেলি প্রমুখ সকলেই একান্তভাবে অনিচ্ছুক ছিলেন। গ্রাম্য স্কুলগুলিকে কিছু পাঠ্যবই ও শিক্ষার সরঞ্জাম দিয়ে সাহায্য করলেও তাঁরা মাতৃভাষায় জনশিক্ষা প্রবর্তনের বিরোধী ছিলেন। 'নিম্নমুখী পরিস্রুতি' তত্ত্বের আড়ালে জেনারেল কমিটি জনশিক্ষার প্রতি তাঁদের বিরূপ মনোভাব গোপন করতে চেয়েছেন। তাই তাঁরা কেবলমাত্র কোম্পানি-সরকারের আনুকূল্যের ওপরে নির্ভরশীল ভূস্বামী ও অভিজাতশ্রেণীর মধ্যে তাঁদের শিক্ষা-প্রয়াস সীমাবদ্ধ করে রাখতে চেয়েছেন। ফলে লর্ড ময়রার উদারনৈতিক নীতির জন্য যে-কয়টি আঞ্চলিক ভাষার স্কুলকে অর্থ সাহায্য দেওয়া হচ্ছিল, তা বন্ধ করে দেওয়া হ'ল এবং এই উদারনীতিক নীতি পরিত্যক্ত হ'ল। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, রাজস্ব বোর্ডের সদস্য ডবলিউ. এইচ. ফ্রেসার. দিল্লী-অঞ্চলে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের জন্য কয়েকটি প্রাথমিক স্কুল স্থাপন করে সরকারি অর্থ-সাহায্যের আবেদন করেছিলেন। কিন্তু দেশীয় সমাজের উচ্চশ্রেণীর মধ্যে শিক্ষা-বিস্তারের প্রয়াসকে অগ্রাধিকার দেবার জন্য তাঁর প্রার্থনা নামঞ্জুর করা হ'ল। পার্বত্য-এলাকায় প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারের জন্য কয়েকটি স্কুল-স্থাপনের প্রস্তাব দিয়েছিলেন মিঃ জিরার্ড। কিন্তু অর্থাভাবের অজুহাতে তাঁর প্রস্তাব অগ্রাহ্য করা হ'ল। ঢাকা স্কুল সোসাইটি ২৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। অর্থাভাবের জন্য তাঁরা ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে সাহায্যের আবেদন করেছিলেন। তাঁদের আবেদনও নাকচ করা হ'ল। প্রকৃতপক্ষে জেনারেল কমিটির উনিশ বৎসরের কার্যকালে (১৮২৩-১৮৪২ খৃঃ.) একমাত্র দুটি ক্ষেত্রে (এলাহাবাদ ও সাগর) মাসিক ২০০ টাকা সাহায্য ব্যতীত শিক্ষা-তহবিলের সম্পূর্ণ অর্থ ১৮৩৫ খৃঃ. পর্যন্ত প্রধানতঃ প্রাচ্যশিক্ষা-বিস্তারে এবং তার পরবর্তীকালে ইংরেজি-শিক্ষার প্রসারে ব্যয় করেছেন।

জনশিক্ষার প্রতি অবহেলা-প্রদর্শন ও উচ্চশ্রেণীর মধ্যে শিক্ষা-বিস্তারের যে-নীতি জেনারেল কমিটি গ্রহণ করেছিলেন, তা ইংলণ্ডের কোর্ট অব ডিরেক্টর্স কর্তৃক সর্বাংশে সমর্থিত হয়েছিল। ১৮২৭ সালের ৫ সেপ্টেম্বরের 'ডেসপ্যাচে' তাঁরা মিঃ ফ্রেসার ও মিঃ জিরার্ডের আবেদন নাকচ করার সিদ্ধান্তকে সঠিক বলে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন এবং প্রসঙ্গক্রমে তাঁরা লিখেছেন যে, অগ্রাধিকারের প্রশ্ন উত্থাপিত হলে দেশীয় উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্তশ্রেণীর মধ্যে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাকে অধিকতর গুরুত্ব দিতে হবে ; কারণ সমাজের সাধারণ মানুষের ওপরে এই শ্রেণীর প্রভাব রয়েছে এবং এদেরকেই সরকারি কাজে নিয়োগ করতে হবে।

এই 'ডেসপ্যাচে' তাঁরা ইংরেজিভাষায় শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য বর্ণনা করে লিখেছেন, "কোম্পানির ব্যবসায়ে ও সরকারের গুরুত্বপূর্ণ বিভাগে দেশীয়দের নিয়োগের জন্য

ক্রমবর্ধমান চাহিদার প্রতি মনোযোগ দিতে হলে প্রশাসনিক দায়িত্ব পালনের জন্য সর্বপ্রথম উচ্চশিক্ষার দ্বারা একদল মানুষকে শিক্ষিত করতে হবে। আমরা বিশ্বাস করি যে, পরিকল্পিত পাঠক্রম কেবলমাত্র তাঁদের বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশে সাহায্য করবে না, তাঁদের নৈতিক চরিত্র উন্নয়নেরও সহায়ক হবে। তারফলে সৎ ও বিশ্বস্ত প্রভুভক্ত পাওয়া যাবে যারা সততার সঙ্গে প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করবে।"[৩০] অর্থাৎ দরিদ্র-শ্রেণীর মানুষের ওপরে বিত্তশালীশ্রেণীর প্রভাব এবং সরকারি কাজে চাহিদার জন্য তাঁদের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেই বৃটিশ-সরকার এদেশে কিছু সংখ্যক ইংরেজিতে শিক্ষিত ইংরেজ-অনুগত প্রাণী সৃষ্টির জন্য উচ্চতর শিক্ষার সীমাবদ্ধ বিস্তারে প্রয়াসী হয়েছিলেন।

১৮৩০ সালের ২৯ সেপ্টেম্বরে কোর্ট অব ডিরেক্টর্স-এর 'ডেসপ্যাচে' আঞ্চলিক ভাষায় শিক্ষাদানের প্রতি তাঁদের সহানুভূতিহীন মনোভাবের সুস্পষ্ট প্রকাশ ঘটেছে। এই ডেসপ্যাচে বলা হয়েছে, "জেনারেল কমিটি নিয়োগের পূর্বে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে সরকারি সাহায্যে যে-সকল আঞ্চলিক ভাষার প্রাথমিক স্কুল স্থাপিত হয়েছে, সেগুলি আমাদের মতে মূল্যহীন।"[৩১] তারপরে তাঁরা শিক্ষা সম্পর্কে তাঁদের পুরোনো অভিমত ব্যক্ত করে লিখেছেন, "ভারতের প্রশাসন-যন্ত্রের উচ্চপদে দেশীয়দের নিয়োগকল্পে নৈতিক মান ও বুদ্ধিগত উৎকর্ষতা বৃদ্ধির জন্য একশ্রেণীর মানুষকে পরিকল্পিত শিক্ষাদান প্রয়োজন।"[৩২] সুতরাং ইংলণ্ডের কর্তৃপক্ষের পৃষ্ঠপোষকতায় জেনারেল কমিটি এদেশে আঞ্চলিক ভাষার প্রাথমিক স্কুলগুলি বন্ধ করে দিয়ে কেবলমাত্র ইংরেজিভাষায় শিক্ষাদানে প্রয়াসী হয়েছিলেন। জনহিতৈষণা নয়, তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল সাম্রাজ্যের স্বার্থরক্ষা। এদেশে শিক্ষা-বিস্তারে তাঁরা যে-অর্থ ব্যয় করেছিলেন, তা সাম্রাজ্যের নিরাপত্তার দিকে লক্ষ্য রেখেই ব্যয় করা হয়েছিল। মাতৃভাষায় শিক্ষা দিলে সাম্রাজ্য-শোষণে বিঘ্ন ঘটবার সম্ভাবনা। তাই তাঁরা শিক্ষার মাধ্যম রূপে মাতৃভাষাকে গ্রহণের বিরোধিতা করেছেন।

জনসাধারণের মধ্যে প্রয়োজনীয় জ্ঞান-বিস্তারে আঞ্চলিক ভাষার গুরুত্ব স্বীকার করলেও তাঁরা কোনো পদক্ষেপ গ্রহণের সুপারিশ করেননি; কেবলমাত্র তাঁরা ওপর থেকে নীচে শিক্ষা চুঁইয়ে পড়ার নীতির প্রতি জোরালো সমর্থন জানিয়েছেন। সদ্যোক্ত ডেসপ্যাচে তাঁরা বলেছেন, "ইংরেজিভাষায় বিস্তৃত চর্চার মাধ্যমে জ্ঞান-অর্জনের সুযোগ কেবলমাত্র স্বল্পসংখ্যক দেশীয় ব্যক্তিদের জন্য রাখতে হবে এবং যাঁরা ইংরেজিতে শিক্ষিত হবেন, তাঁরা স্কুল-কলেজের শিক্ষক-রূপে অথবা লেখক ও অনুবাদক-রূপে তাঁদের অর্জিত জ্ঞানের দ্বারা জনসাধারণকে সুশিক্ষিত করতে সক্ষম হবেন।"[৩৩] এবং এই কাজে দেশীয় অভিজাতদের অর্থ সাহায্য দিয়ে উৎসাহ দেবার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। অথচ প্রাচ্য-পন্থীদের প্রভাবে জেনারেল কমিটি প্রাচ্যশিক্ষা-চর্চায় অধিকতর মনোযোগী হয়েছেন। ১৮৩১ সালের ২৭ অক্টোবরের কমিটির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, শিক্ষাখাতে বার্ষিক

বরাদ্দ ২ লক্ষ ২১ হাজার টাকার মধ্যে তাঁরা মাত্র প্রতি বৎসরে কয়েকটি আঞ্চলিক ভাষার স্কুলের জন্য ১৬,৮০০ টাকা ব্যয় করেছিলেন এবং বাকি অর্থ কলকাতা, দিল্লী, আগ্রা ও অন্যান্য প্রাচ্যবিদ্যার কলেজ-স্থাপনে ও প্রাচ্য ভাষা-শিক্ষায় ব্যয় করেছেন। প্রাচ্য-শিক্ষার প্রতি তাঁদের 'ভালোবাসা' অকৃত্রিম ছিল না। সমাজের অভিজাতদের মধ্যে প্রীতি ও আনুগত্যের মনোভাব গড়ে তোলাই ছিল প্রাচ্য-সংস্কৃতির প্রতি তাঁদের অনুরাগের কারণ।

কিন্তু দেশীয় বিত্তশালীশ্রেণীর মধ্যে ইংরেজি শেখার বিপুল আগ্রহকে জেনারেল কমিটি বেশী দিন অগ্রাহ্য করতে পারেননি। তাই তাঁরা পাশ্চাত্য শিক্ষাদানের জন্য প্রাচ্যভাষা ও ইংরেজিভাষা —দু'টিকেই মাধ্যম করেছিলেন। ১৮২৭ খৃষ্টাব্দ থেকে প্রাচ্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে তাঁরা ইংরেজির ক্লাস খুলতে বাধ্য হয়েছিলেন। তাছাড়া দিল্লী, বেনারস ও অন্যান্য অঞ্চলে তাঁদের উদ্যোগে অনেকগুলি ইংরেজি-স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু তা প্রাচ্য-শিক্ষার বিরোধী ইংরেজি-অনুগত ব্যক্তিদের খুশী করতে পারেননি। ফলে জেনারেল কমিটিতে প্রাচ্যভাষা বনাম ইংরেজিভাষার বিতর্ক অত্যন্ত তীব্র হয়ে উঠেছিল এবং কমিটির দশজন সদস্য সমানভাবে দু'টি গোষ্ঠীতে (প্রাচ্য-ভাষাপন্থী ও ইংরেজি-ভাষাপন্থী) বিভক্ত হয়ে পড়েছিলেন। পাঁচজন সদস্য ইংরেজি ভাষার পক্ষে —বার্ড, স্যাণ্ডার্স, বুশবি, কলভিন ও ট্রেভেলিয়ান ; এবং সংস্কৃত ও আরবি ভাষার পক্ষে ছিলেন —শেক্সপীয়ার, ম্যাকনাটেন, এইচ. টি. প্রিন্সেপ, জে. প্রিন্সেপ. ও কমিটির সম্পাদক জে. সি. সি. সাদারল্যাণ্ড। অবস্থা এমন চরম পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে কমিটির কাজ কার্যত বন্ধ হয়ে গেল। 'তাঁহাদের বিতর্ক সংবাদপত্রের স্তম্ভেও আত্মপ্রকাশ করিল। একটি বিতর্কের বিষয় মাত্র এখানে উল্লেখ করিব। ১৮৩৪ সনে হিন্দু কলেজের ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক ডক্টর টাইট্‌লারের সঙ্গে কলেজের প্রাক্তন ছাত্র কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের তীব্র বাদানুবাদ হয় 'ক্যালকাটা ক্যুরিয়র' সংবাদপত্রে। টাইট্‌লার প্রাচ্যের প্রাচীন ভাষাসমূহকে বাহন রাখার পক্ষপাতী, আর কৃষ্ণমোহন ইংরেজির সমর্থক। তবে কৃষ্ণমোহন বিতর্ক শেষে ইহাও স্বীকার করিয়াছিলেন যে, শিক্ষার বাহন হইবার দাবি বাংলাদেশে স্বাভাবিকভাবে বাংলাভাষারই, আর সেদিন সুদূরে নয় যখন বাংলার মাধ্যমেই শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা চালু হইবে। তখন শিক্ষা-সভার সমুদয় সদস্যই ইংরেজ। তাঁহারা কিন্তু দল-নির্বিশেষে কেহই বাংলাভাষার বাহন হইবার কথা আদৌ ভাবেন নাই।'[৩৪]

ভাষা-প্রশ্নে জেনারেল কমিটির বিতর্ক ও অচলাবস্থার অবসান ঘটালেন কমিটির নবনিযুক্ত সভাপতি লর্ড মেকলে। সাম্রাজ্যের নিরাপত্তার স্বার্থে দেশীয় ভূস্বামী ও অভিজাতশ্রেণীর সঙ্গে মৈত্রীবন্ধন সুদৃঢ় করতে তিনি এদেশে ইংরেজিভাষার মাধ্যমে

ইংরেজি-শিক্ষা প্রবর্তনের সুপারিশ করেছেন। বিত্তশালী সামন্তশ্রেণীর নেতৃবর্গ (রামমোহন-ভবানীচরণ প্রমুখ) মাতৃভাষায় আধুনিক জ্ঞান-চর্চার পরিবর্তে ইংরেজিতে জ্ঞানার্জনের জন্য 'জনসাধারণের' নামে শিক্ষা-আন্দোলন গড়ে তোলায় মেকলে ও তাঁর সহযোগীদের পক্ষে মাতৃঅঙ্গন থেকে মাতৃভাষাকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করা সহজসাধ্য হয়েছিল। এদেশীয় ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি অবজ্ঞাপূর্ণ মনোভাব প্রকাশ করে মেকলে তাঁর বিখ্যাত 'মিনিটে' (২ ফেব্রুয়ারি, ১৮৩৫ খৃঃ) লিখেছেন, "সকলেই একটি বিষয়ে একমত হবেন যে, ভারতের এই অঞ্চলের দেশীয় ব্যক্তিদের স্থানীয় ভাষায় কোনো সাহিত্য কিংবা বিজ্ঞান-বিষয়ক গ্রন্থ নেই। উপরন্তু এই ভাষাগুলি এত দুর্বল ও অমার্জিত যে, এই ভাষাগুলি উন্নত ও শক্তিশালী না হলে কোনো মূলব্যান গ্রন্থ অনুবাদ করা সম্ভব হবে না। এ কথা সকলেই স্বীকার করবেন বলে মনে হয় যে, দেশীয় ব্যক্তিদের মধ্যে যাঁদের উচ্চতর শিক্ষাগ্রহণের আর্থিক সঙ্গতি আছে, তাঁদের জ্ঞান-উন্নয়ন অন্য ভাষার মাধ্যমে করতে হবে, মাতৃভাষায় নয়।"[৩৫]

শ্বেতাঙ্গ-সরকার লক্ষ্য করেছিলেন দেশীয় ভূস্বামীশ্রেণী ও বণিকসম্প্রদায় ধনোপার্জনের আশায় ইংরেজি ভাষা-শিক্ষায় সচেষ্ট এবং ইংরেজ-শাসনকে তাঁরা 'পরম সৌভাগ্য' বলে মনে করতেন। মেকলে লিখেছেন, "ভারতবর্ষে শাসকশ্রেণীর ভাষা ইংরেজি। দেশীয় অভিজাতশ্রেণী এই ভাষায় সরকারের সঙ্গে কথা বলেন। ইংরেজি সমগ্র প্রাচ্যের বাণিজ্যজগতের ভাষা হবে। ...এই শহরের শিক্ষিত অধিবাসীরা রাজনীতি কিংবা বিজ্ঞান-বিষয়ে ইংরেজিভাষার মাধ্যমে আলোচনায় যথেষ্ট দক্ষ।"[৩৬]

এদেশে ইংরেজিভাষায় ইউরোপীয় শিক্ষাদানের প্রস্তাবের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মেকলে বলেছেন, "আমাদের এখন যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে এমন একটি শ্রেণী সৃষ্টি করতে —যারা হবে আমাদের এবং আমরা যে লক্ষ লক্ষ লোককে শাসন করছি সেই শাসিতদের মধ্যে ভাবের আদানপ্রদানকারী। এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিরা হবে রক্তে রঙে ভারতীয়, আর রুচিতে, মতে, নীতিতে ও বুদ্ধিতে ইংরেজ।"[৩৭] অর্থাৎ অন্ধকার থেকে আলোর জগতে নিয়ে আসা কোনো মহৎ পরিকল্পনা নয়, ঔপনিবেশিক স্বার্থে একদল হ্যাট-কোট-প্যান্ট পরিহিত দেশীয় ইংরেজ-ভক্ত কেরাণী-দোভাষী সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই এদেশে ইংরেজি-শিক্ষার প্রস্তাবনা। মেকলে এমন একদল শাসক-সমর্থক দেশীয় শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী সৃষ্টি করতে চেয়েছেন যাঁরা বৃটিশ-সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থের সঙ্গে নিজেদের সম্পর্ক অটুট রাখবেন। সেকথা স্পষ্ট করে বলেছেন মেকলের নিকটাত্মীয় চার্লস ট্রেভেলিয়ান, "আমাদের সংরক্ষণে থাকলেই তাঁদের দেশের উন্নয়ন ঘটতে পারে —একথা জানেন বলেই শিক্ষিত ব্যক্তিরা আমাদের অনুরক্ত থাকবেন।"[৩৮] তাছাড়া তাঁর মতে, "এই ইংরেজি ছাঁচে গড়ে-ওঠা মানুষগুলো স্বাধীন কোন দেশীয় সরকার

প্রতিষ্ঠিত হবার সম্ভাবনায় ভীত-সন্ত্রস্ত। কারণ যে বিদেশী শিক্ষা তাঁদের শাসকের কাছ থেকে সুযোগ, অর্থপ্রতিষ্ঠা এনে দিচ্ছে সেই বিদেশী শিক্ষাই ভবিষ্যতে জনগণের শত্রু হিসাবে তাঁদের চিহ্নিত করে কাঠগড়ায় দাঁড় করাবে।"[৩৯] তাই ভারতের প্রথম স্বাধীনতা-যুদ্ধে (১৮৫৭ খৃঃ) আতঙ্কিত হয়ে বৃটিশ-শক্তির জয়গান ধ্বনিত হয় কবির কণ্ঠে—

"চিরকাল হয় যেন ব্রিটিসের জয়।
ব্রিটিসের রাজলক্ষ্মী, স্থির যেন রয়॥
এমন সুখের রাজ্য, আর নাকি হয়।
শাস্ত্র মতে এই রাজ্য, রাম রাজ্য কয়॥"[৪০]

কেবলমাত্র কবি নন, উনিশ শতকের তথাকথিত 'নবজাগরণ'-এর নায়করাও ইংরেজ-স্তুতিতে পঞ্চমুখ ছিলেন। বৃটিশ-শাসকদের প্রতি অচলা ভক্তি ছিল বলেই রাজা রামমোহন তাঁদের প্রতি 'অবিচলিত আনুগত্য ও অসীম আস্থা'[৪১] প্রকাশ করে বলেছেন, এদেশে "বৃটিশ-শাসনের ন্যায় তাঁদের আনুগত্য চিরস্থায়ী হবে।"[৪২] তিনি আরো বলেছেন, "তাঁদের (অর্থাৎ ভারতবাসীদের —লেখক) পরম সৌভাগ্য যে তাঁরা পরমেশ্বরের করুণায় সমগ্র ইংরেজ-জাতির রক্ষণাবেক্ষণে রয়েছে এবং ইংলণ্ডের রাজা, তার লর্ডগণ ও কমন্স সভা তাঁদের জন্য আইন-প্রণয়নের কর্তা।"[৪৩]

'অন্তরানুভূতি ও স্বার্থের দিক দিয়ে ইংলণ্ড এবং ভারতবর্ষের ভূস্বামীরা অতি নিকট-সম্পর্কে সম্পর্কিত'[৪৪] বলে প্রিন্স দ্বারকানাথ ইংরেজ-সরকারের গুণকীর্তন করে বলেছেন, "বিধাতার অভিপ্রায়ে যে লক্ষ লক্ষ লোকের রক্ষার দায়িত্ব এসরকারের (অর্থাৎ বৃটিশ-সরকারের —লেখক) উপর এসে পড়েছে, তাদের কল্যাণ এবং প্রগতির জন্যে সরকারের অকৃত্রিম উদার আকাঙ্ক্ষা ও মহৎ প্রচেষ্টা সমস্ত পৃথিবীর কাছেই প্রশংসাযোগ্য বলে বিবেচিত হবে।"[৪৫]

রাজা রামমোহনের সংস্কার-আন্দোলনের আর একজন সহকর্মী প্রসন্নকুমার ঠাকুর ইংরেজের অধীনস্থ হয়ে থাকতে চেয়েছেন। তিনি বলেছেন, "ভগবান যদি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন তুমি স্বাধীনতা চাও, না, ইংরেজের অধীন হয়ে থাকতে চাও, আমি মুক্ত কণ্ঠে ইংরেজের অধীনতাই বড় বলে গ্রহণ করব।"[৪৬]

এদেশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের জন্য চিরকৃতজ্ঞ নেতৃস্থানীয় শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীরা স্বাধীনতার পরিবর্তে 'মুক্তকণ্ঠে ইংরেজের অধীনতা' কামনা করে ইংরেজিতে শিক্ষাদানের যে দাবি উথাপন করেছেন, তাকে সমর্থন করেছেন, সেকালের কোনো কোনো সংবাদপত্র। এদেশের প্রত্যেকে যাতে ইংরেজিতে পাশ্চাত্য বিদ্যালাভের সুযোগ গ্রহণ করতে পারেন, সেজন্য প্রত্যেক গ্রামে ইংরেজি-বিদ্যালয়-স্থাপনের দাবি করে 'সুধাকর' পত্রিকা লিখেছেন,

"ভারতবর্ষের মধ্যে বিস্তীর্ণরূপে বিদ্যা প্রচারের নিমিত্তে সমাচার পত্রসম্পাদকেরা যতই লিখেন বোধহয় গবর্ণমেন্ট তাহাতে শ্রুতিপাতই করেন না কেন না তিনি শ্রুতিপাত করিলে এতদিনে ভারতবর্ষ পরিপূর্ণ বিদ্যার ভাণ্ডার হইতে পারিত কিন্তু তাহা না হওয়াতেই ভারতবর্ষের মধ্যে ইউরোপীয় রাজার অধিকারের প্রায়াংশ অরণ্যময় রহিয়াছে আমরা এমত কহিতে পারি না যে গবর্ণমেন্ট ভারতবর্ষের রাজস্ব হইতে এতদ্দেশীয় লোকের বিদ্যাশিক্ষার্থ প্রতি বৎসর কিছু না দিতেছেন যেহেতুক এডুকেশন সোসৈটিই তাহার প্রমাণ রহিয়াছেন কিন্তু আমারদিগের উপর গবর্ণমেন্ট এমত কোন আজ্ঞা দেন নাই যে প্রতি বৎসর লক্ষ টাকা কি কর্ম্মে ব্যয় হইতেছে তাহার জিজ্ঞাসা করিতে পারি অতএব সুতরাং পূর্ব্বোক্ত সোসৈটির বিবেচনাতে যে বিদ্যায় খরচ করা উচিত বুঝেন তদর্থেই খরচ করিতেছেন কিন্তু এইমাত্র কহিতে পারি ঐ খরচের দ্বারা ভারতবর্ষের সর্ব্বসাধারণের কি উপকার দর্শিতেছে আমরা এ পর্য্যন্ত তাহার কিছু জানিতে পারি নাই ঐ কমিটির দ্বারা এতদ্দেশের কতক বিদ্যালয় চলিতেছে ইহা আমরা অস্বীকার করি না কিন্তু তাহাতে শহরসম্পর্কীয় কতক লোকেরই উপকার দর্শে এবং এখনও পল্লীগ্রামের দুর্ভাগ্য প্রজারা যেরূপান্ধকারে ছিলেন সেইরূপই রহিয়াছেন আর সংস্কৃত বিদ্যালয়েতে গবর্ণমেন্টের খরচ সত্য বটে কিন্তু তদ্দারা সর্ব্বসাধারণের বিশেষ উপকার নাই কেননা সেখানে কেবল ব্রাহ্মন ভিন্ন অন্য জাতির বিদ্যাভ্যাস হয় না যখন গবর্ণমেন্ট সংস্কৃত বিদ্যালয় স্থাপিত না করিয়াছিলেন তখনও স্থানে২ চতুষ্পাঠী ছিল এবং তাহাতেই ব্রাহ্মণ সন্তানের বিদ্যাভ্যাস নির্ব্বাহ হইত আর এখনও দেশের সংস্কৃত বিদ্যাভ্যাসের চতুষ্পাঠী আছে অতএব গবর্ণমেন্টের আনুকূল্যব্যতিরেকেও সংস্কৃত বিদ্যাভ্যাসের বড় ক্ষতি হয় না এবং সে বিদ্যার দ্বারা কেবল ব্যবস্থাদি দানভিন্ন শাসনাদি কর্ম্মেরও কোন উপকার নাই অতএব যে বিদ্যা শিক্ষাতে লোকের অন্ধকার দূর হইয়া রাজশাসনাদিতে নৈপুণ্য জন্মে তাবদ্দেশ ব্যাপিয়া সেই বিদ্যার বীজ রোপণ করাই ধার্মিক দয়ালু রাজার উচিত কর্ম্ম কিন্তু গবর্ণমেন্টের অধিকার ভিন্ন কোন অন্য দেশীয় লোক যদ্যপি আমারদিগকে জিজ্ঞাসা করেন যে তোমারদের রাজা দেশে২ গ্রামে২ নানাবিধ বিদ্যা সংস্থাপিত করিয়াছেন কিনা তাহার উত্তরে লজ্জায় অধোমুখ হইয়া আমারদিগকে অবশ্যই কহিতে হইবেক যে না, অতএব আমারদিগের রাজার এই অখ্যাতি দূর করা অত্যাবশ্যক কিন্তু গ্রামে২ বিদ্যালয় স্থাপিত না করিলেও তাহা দূর হইবেক না।"[৪৭]

পক্ষান্তরে মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের দাবি জোরালো কণ্ঠে উপস্থিত করেছেন তৎকালীন সংবাদপত্র। দেশ ও সমাজের সঙ্গে সম্পর্কবিহীন ইংরেজিভাষায় শিক্ষাদানের বিষময় ফল লক্ষ্য করে 'সমাচার চন্দ্রিকা' লিখেছেন (১৪ আশ্বিন, ১২৪১), "এতদ্দেশীয় বালকবর্গকে ইঙ্গরেজী বিতরণে অনেকেই যত্নবান হইয়াছেন যেহেতুক শ্রীশ্রীযুতের এবং এতদ্দেশীয় ও

বিদেশীয় সুশিক্ষিত সাধারণজনগণের আনুকূল্যে ও মনোযোগে উক্ত বিদ্যোপার্জ্জনার্থ অনেক বিদ্যালয় স্থানে২ স্থাপিত হইয়াছে এবং মধ্যে২ মিসিনরিরাও আছেন। তৎপ্রমাণ হিন্দুকালেজ ওরিএণ্টেল সিমিনরি হের সাহেবের স্কুল বেনিবোলেণ্ট ইনইসটিটিউসন ভবানীপুর সিমিনরি হিন্দু ফ্রি স্কুল গরানহাটা একিডিমি এবং কবরডাঙ্গা ও মির্জ্জাপুর ইঙ্গলিস স্কুল ইত্যাদি অনেক পাঠশালা ভদ্রসন্তানের ও দীন দরিদ্রের বালকগণের বিদ্যোপার্জ্জনার্থ হইয়াছে মধ্যে২ স্থানবিশেষেও এক২ জন ইঙ্গরেজী পড়িয়া ইঙ্গরেজ হইতেছেন। অস্মদ্দেশে এমত কোন বাঙ্গালা পাঠশালা নাই যে তাহাতে পাঠার্থিগণের স্বদেশীয় ভাষায় প্রচুর বিদ্যা ব্যুৎপত্তি হয় কারণ যে এক২ বিদ্যালয় ও টোল কোন২ স্থলে আছে তাহাও অতি ম্রিয়মাণ এবং তাহাতে সাধারণের সাহায্য প্রায় দেখিতে পাই না কেবল এক২ ভট্টাচার্য্য ও গুরুমহাশয় যাঁহারা স্বীয় ভরণপোষণার্থ উক্ত ব্যবসায় করেন মাত্র তাহাতে গুরুমহাশয়ের নিকট বর্ণমালা অক্ষর পরিচয় এবং শুভঙ্করকৃত কিছু অঙ্কাদি শিক্ষা হয় মাত্র টোলের ভট্টাচার্য্য মহাশয়দিগের নিকট ব্যাকরণ স্মৃতি ইত্যাদি কএক খান শিক্ষা হয় কিন্তু ইহাতে অনুবাদাদি করাইতে এবং অস্মদাদির পূর্ব্ব বিবরণ ইত্যাদি শিক্ষাইতে প্রায় দেখিতে পাই না কারণ কোন২ বালক কিছু দিবস গুরু মহাশয়ের নিকট শিক্ষা পাইয়া ইঙ্গরেজী বিদ্যালয়ে সমর্পিত হন তাহাতে প্রথমতঃ ইঙ্গরেজী বর্ণমালা ও ব্যাকরণ পাঠ হইয়া পরে উক্ত দেশীয় ইতিহাস খগোল ভূগোল রেখা গণিত ও তর্জ্জমাদি এবং অক্ষরাদি কষামাজা সকল শিক্ষা হইয়া থাকে তাহাতে পূর্ব্বোক্ত বালকেরা প্রায় কর্ম্ম চালাইতে পারে এবং কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেও তাহার সদুত্তর করিতে পারে। যথা ইঙ্গলণ্ড হইতে বৃষ্টল কত দূর গৃগনগরের মধ্যে প্রধান যোদ্ধা কে ছিল রুমনগরের মধ্যে প্রধান অস্ত্রধারী কোন্ জন ইত্যাদি প্রশ্নের সদুত্তর করিতে সক্ষম এবং অঙ্কাদি কষিতে ও দরখাস্ত এবং চিঠি পত্রাদিও লিখিতে পারেন কিন্তু বাঙ্গালা পাঠার্থি বালকগণকে যদ্যপি জিজ্ঞাসা করা যায় যে কটক হইতে ত্রিহুত কতদূর পাণ্ডব বংশের মধ্যে প্রধান যোদ্ধা কে ছিলেন বানর মধ্যে প্রধান বলবান কে ছিল শ্রীশ্রীরামচন্দ্র কি নিমিত্ত ১৪ বৎসর বনে বাস করেন দশরথ রাজা কি নিমিত্তে জ্যেষ্ঠ পুত্রকে রাজ্যাভিষেক না করেন এবং চারি পুত্র বর্ত্তমানে দশরথ রাজা কি নিমিত্তে মৃত্যু হইয়া বাসি শব হন ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর করিতে পারেন না ইহা প্রায় দেখিয়াছি। কোন২ বালক যাঁহারা ইঙ্গরেজী পড়িয়া পারদর্শী হইয়াছেন তাঁহারদিগকে কাগ ক্রান্তিসম্বলিত অঙ্কাদি জিজ্ঞাসা করিলে কহেন ওয়াট নানসেন্স ইজ কাগ ক্রান্তি কম ডিকটেট বায় রুপিস এনেস এণ্ড পায়স এটসেটরা আর এলস ইন সিলিং এণ্ড পেন্স ইহা হইলেই সূক্ষ্মমতে হিসাব করিয়া দেন নতুবা অগ্রাহ্য করেন সুতরাং ইহাতে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবেক যে বাঙ্গালা শিক্ষাতে সর্ব্বসাধারণের অনুরাগ নাই এই নিমিত্তেই এমত হইয়াছে কেন না

যদ্যপি কোন বালক স্বভাষায় পরিপক্ক হইয়া পরে অন্য ভাষা শিক্ষা করেন তবে স্বভাষাস্থিত প্রশ্নাদির সদুত্তর করিতে পারেন আর কোন বিষয় হউক না কেন সর্ব্বসাধারণের যত্ন না হইলে তাহা কদাচ সিদ্ধ হয় না কারণ দেখুন ইঙ্গরেজী বিদ্যার চর্চ্চা পূর্ব্বে এত অধিক ছিল না লোকের অনুরাগ হওয়াতেই উত্তর২ বৃদ্ধি হইতেছে।"[৪৮]

মাতৃভাষায় শিক্ষাদানে বণিক-সরকারের অনিচ্ছা লক্ষ্য করে 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকায় 'W. C. G.' ছদ্মনামে একজন পত্রলেখক লিখেছেন (২ সেপ্টেম্বর, ১৮৩৭ খৃঃ), "আমারদের খেদের বিষয় এই যে বঙ্গভাষার অনুশীলনবিষয়ে গবর্ণমেণ্টের কিঞ্চিন্মাত্র মনোযোগ নাই ঐ ভাষা এইক্ষণে প্রায় লোপ পাইল। হুগলি প্রভৃতি নানা স্থানে গবর্ণমেণ্ট বহুতর পাঠশালা (অর্থাৎ ইংরেজি স্কুল —লেখক) স্থাপন করিয়াছেন তাহাতে আমারদের মহোপকার হইতেছে বটে কিন্তু যদ্যপি এতদ্দেশীয় বালকেরদের নিমিত্ত কতিপয় বঙ্গ বিদ্যালয় স্থাপন করেন তবে আরো উত্তম হয়। বালকেরদের নিয়ত ইঙ্গরেজী পুস্তক পাঠ করাতে প্রায় বঙ্গভাষাভ্যাসবিষয়ে অনুরাগ গত হইয়াছে বঙ্গভাষা কিছুমাত্র না জানিয়াই ইঙ্গরেজী ভাষা শিক্ষা করে অতএব যদি গবর্ণমেণ্ট অনুগ্রহপূর্ব্বক নানা স্থানে বঙ্গভাষার বিদ্যামন্দির স্থাপন করেন তবে বঙ্গদেশীয় বালকেরা বঙ্গভাষা কিঞ্চিৎ জানিতে পারেন।"[৪৯]

সংস্কৃতভাষায় প্রাচ্য-শিক্ষা কিংবা ইংরেজিভাষায় পাশ্চাত্যশিক্ষা নয়, মাতৃভাষায় দেশ ও সমাজকেন্দ্রিক আধুনিক শিক্ষা চাই, 'ইঙ্গরেজী পড়িয়া ইঙ্গরেজ' হওয়া নয়, 'স্বদেশীয় ভাষায় প্রচুর বিদ্যা ব্যুৎপত্তি' অর্জনের জন্য বাংলা-স্কুলের প্রয়োজন —এই দাবির মধ্যে গ্রাম-বাংলার নিপীড়িত মানুষের মুক্তির আকাঙ্ক্ষা নিহিত ছিল। কেবলমাত্র বাংলা সংবাদপত্র নয়, মার্শম্যানের সম্পাদনায় প্রকাশিত 'Friend of India' পত্রিকাও এদেশে মাতৃভাষায় শিক্ষা-প্রচারে উৎসাহী ছিলেন। এই পত্রিকা নানা নিবন্ধে, চিঠিপত্রে ও সম্পাদকীয় মন্তব্যের মাধ্যমে ইংরেজিভাষা-মাধ্যমের বিরুদ্ধে দেশীয় ভাষা-মাধ্যমের পক্ষে নিরন্তর প্রচার চালিয়েছিলেন। ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দের ২৪ সেপ্টেম্বর তারিখের সম্পাদকীয় মন্তব্যে বলা হয়েছে যে, জেনারেল কমিটি এখনো পর্যন্ত মাতৃভাষায় শিক্ষাদান বিষয়ে কোনো কার্যকরী পন্থা গ্রহণ করেননি।

কিন্তু সর্বসাধারণের জন্য মাতৃভাষায় শিক্ষার দাবিকে অগ্রাহ্য করে হারিংটনের 'নিম্নমুখী পরিস্রুতি' তত্ত্বের সমর্থনে মেকলে লিখেছেন, "স্থানীয় ভাষাগুলিকে মার্জিত করা, পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের পরিভাষা সৃষ্টির দ্বারা এই ভাষাগুলিকে উন্নত করা এবং জনসাধারণের কাছে অর্জিত পাশ্চাত্য জ্ঞান পৌঁছে দেবার জন্য তাঁদের নিয়োগ করা ইত্যাদি কাজের জন্য আমরা এই শ্রেণীর (অর্থাৎ শিক্ষিত বাবুশ্রেণী —লেখক) উপরে নির্ভর করতে পারি।"[৫০]

গ্রামের প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা তদন্তের জন্য লণ্ডনের কোর্ট অব ডিরেক্টর্স ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে নির্দেশ দিয়েছিলেন। সেই নির্দেশানুসারে ১৮২২ সালে মাদ্রাজের গভর্ণর স্যার টমাস মন্‌রো কর্তৃক মাদ্রাজ-অঞ্চলের তথ্য সংগৃহীত হয়। ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই প্রেসিডেন্সীতেও তদন্ত হয়। কিন্তু বাংলাদেশে কোনো শিক্ষা-তদন্ত হয়নি। উইলিয়ম অ্যাডামের বারংবার তাগাদায় বাধ্য হয়ে লর্ড বেন্টিঙ্ক ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের ২০ জানুয়ারি অ্যাডামকে বাংলাদেশের দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে তথ্য-সংগ্রহের জন্য নিযুক্ত করেন। তিন খণ্ডের রিপোর্টের শেষে অ্যাডাম 'নিম্নমুখী পরিস্রুতি' তত্ত্বের তীব্র বিরোধিতা করে লিখেছেন যে, প্রাথমিক পাঠশালাসমূহে শিক্ষাদানের মানোন্নয়ন এবং মাতৃভাষার মাধ্যমে আধুনিক শিক্ষাদানের নীতিই এদেশের সকল শ্রেণীর মানুষকে শিক্ষিত ও উন্নত করতে পারে।

কিন্তু অ্যাডামের রিপোর্টের জন্য অপেক্ষা না করে লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক এদেশে বিষবৃক্ষের বীজ রোপণ করেছেন এবং ভাষার যূপকাষ্ঠে মাতৃভাষাকে বলি দিয়েছেন। মেকলের প্রস্তাবে বেন্টিঙ্ক সরকারি স্বীকৃতি দেওয়ায় (৭ মার্চ, ১৮৩৫ খৃঃ.) মাতৃভাষা শহর থেকে হঠে গিয়ে গ্রাম-বাংলার ঘরের কোনে গিয়ে ঠাঁই নিল, আর শিক্ষা ধনীগৃহকে আলোকিত করল। গ্রাম্য পাঠশালাগুলিকে উন্নত না করে ধ্বংস করা হ'ল। ফলে কৃষক-সাধারণ লেখাপড়ার সুযোগ থেকে চিরতরে বঞ্চিত হলেন।

সরকারি শিক্ষানীতি ঘোষণা করে বেন্টিঙ্কের প্রস্তাবে বলা হ'ল, —প্রথমত, সরকারের মতে ভারতের দেশীয় ব্যক্তিদের ইউরোপীয় সাহিত্য ও বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা করাই হ'ল বৃটিশ-সরকারের লক্ষ্য এবং শিক্ষার জন্য বরাদ্দ সমগ্র অর্থ কেবলমাত্র ইংরেজি-শিক্ষার জন্য ব্যয় করলে তা সার্থক হবে।

দ্বিতীয়ত, দেশীয় ব্যক্তিদের প্রাচ্য-শিক্ষাদানে রত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিকে বন্ধ করার কোনো অভিপ্রায় সরকারের নেই এবং সরকার নির্দেশ দিচ্ছে যে, জেনারেল কমিটির পরিচালনাধীন প্রাচ্য-শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির শিক্ষকদের ও ছাত্রদের বৃত্তি পূর্বের মতই দিতে হবে। ...তবে এই নির্দেশ-জারির পরে যে-সকল ছাত্র এই জাতীয় বিদ্যালয়ে ভর্তি হবে, তাদের কোনো বৃত্তি দেওয়া হবে না এবং কোনো শিক্ষকের পদ শূন্য হলে সরকারকে তা বিস্তৃতভাবে জানাতে হবে, যাতে সরকার নতুন শিক্ষক নিয়োগের গুরুত্ব বিবেচনা করতে সক্ষম হয়।

তৃতীয়ত, সরকার জানতে পেরেছে যে, কমিটি প্রাচ্য-গ্রন্থ মুদ্রণের জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করেছে। সুতরাং সরকার নির্দেশ দিচ্ছে যে, এই খাতে শিক্ষা-তহবিলের অর্থ আর ব্যয় করা চলবে না।

চতুর্থত, সরকার নির্দেশ দিচ্ছে যে, শিক্ষা-সংস্কারের জন্য জেনারেল কমিটিকে প্রদত্ত সমগ্র অর্থ দেশীয় ব্যক্তিদের ইংরেজিভাষার মাধ্যমে ইউরোপীয় সাহিত্য ও বিজ্ঞান-

শিক্ষার জন্য ব্যয় করতে হবে এবং সরকার কমিটিকে অনুরোধ করছে যে, তারা যেন অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে পাশ্চাত্য শিক্ষা-বিস্তারের একটি পরিকল্পনা তৈরি করে সরকারের কাছে পেশ করে।[৫১]

১৮৩৫ খৃষ্টাব্দ থেকে ইংরেজ-সরকারের প্রত্যক্ষ নির্দেশে ভারত বিদেশী ভাষার শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত হ'ল —আরম্ভ হ'ল সরকারি প্রয়াসে ইংরেজি ভাষা-শিক্ষার যুগ। বৃটিশ-শক্তি এদেশে জনশিক্ষা-প্রসারের জন্য আসেনি; শোষণ-সাম্রাজ্যকে অব্যাহত রাখার জন্য যতটুকু প্রয়োজন, ততটুকু শিক্ষা-বিস্তারে তাঁরা আগ্রহী। শোষকশ্রেণী ততটুকু শিক্ষার সুযোগ দেয়, যতটুকু তাঁদের নিজেদের স্বার্থে প্রয়োজন। তাই তাঁরা মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা-প্রসারের পরিবর্তে ইংরেজিভাষায় উচ্চশিক্ষা প্রবর্তনে আগ্রহী ছিলেন। আর দেশীয় বণিক-জমিদারেরা সম্পদ ও প্রতিষ্ঠা-লাভের আশায় ইংরেজি-শিক্ষা গ্রহণে উৎসুক ছিলেন। তাঁরাও শ্রেণীস্বার্থে প্রাথমিক শিক্ষা-বিস্তারের বিরোধী ছিলেন। বৃটিশ-বণিক ও দেশীয় ভূস্বামীদের স্বার্থ একসূত্রে গাঁথা ছিল বলে অ্যাডামের সুপারিশসমূহ অগ্রাহ্য করা হ'ল। শিক্ষার দ্বার জনসাধারণের কাছে রুদ্ধ হ'ল এবং ইংরেজি শিক্ষা দেশীয় ভূস্বামী-বণিক-অভিজাতশ্রেণীর কাছে সৌভাগ্যের প্রতীক হয়ে উঠল। ঔপনিবেশিক স্বার্থে একদল শিক্ষিত তল্পীবাহক তৈরি করার জন্য ইংরেজি-শিক্ষাকে বিত্তশালী ও ধনিকসম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রাখা হ'ল; দেশের জনসমাজের বৃহত্তম অংশ কৃষক-সাধারণ নির্বাসিত হলেন জ্ঞানহীন রাজ্যে। আজো তাঁরা অক্ষর-জ্ঞান থেকে বঞ্চিত। প্রাথমিক শিক্ষা তাঁদের কাছে দুর্লভ, উচ্চশিক্ষা বা ইংরেজি-শিক্ষা তাঁদের কাছে কল্পনা-বিলাস মাত্র। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে তাঁরা হারিয়েছেন জমির মালিকানা, আর ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে তাঁরা হারালেন মুখের ভাষায় শিক্ষাগ্রহণের অধিকার।

তৃতীয় অধ্যায়

শিবরাত্রির সলতে

মেকলের অভিমত অনুযায়ী তৎকালে বাংলা গদ্য অর্থাৎ মাতৃভাষা এত দুর্বল ও লালিত্যবর্জিত ছিল যে, তার দ্বারা কোনো গ্রন্থ-রচনা কিংবা অনুবাদ সম্ভব নয়। সেকারণে তিনি মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের বিরোধিতা করেছেন। বেন্টিঙ্কের ঘোষণায় মাতৃভাষার মাধ্যমে জ্ঞান-বিজ্ঞান-চর্চার বিষয়ে কোনো উল্লেখ না থাকায় দেশীয় ভাষাগুলির প্রতি তাঁদের অবজ্ঞাপূর্ণ মনোভাব প্রকাশিত হয়েছে। অথচ কে. এম. পানিক্কর মেকলের কাজের সমর্থনে বলেছেন, "মেকলের 'মিনিটে' যে অতিশয়োক্তি রয়েছে, তা এখন আমাদের বিচার্য বিষয় নয়। কিন্তু বিকল্প নীতি অর্থাৎ মাতৃভাষায় গুরুত্ব প্রদানের বিষয় বিবেচনা করে ইংরেজ-সরকার যে-নীতি গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিল, তার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক বিবেচনা করা যেতে পারে। মাতৃভাষার উপরে অধিক গুরুত্ব প্রদান ভারতের ঐক্যের ধারণাকে ব্যাহত করতে পারত। ভারতের মুক্তি যে নতুন শিক্ষার ওপরে নির্ভর করছিল, তা আমাদের কাছে এসে পৌঁছুত না। এবিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, অনুবাদের মাধ্যমে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান আমাদের কাছে পৌঁছুত, কিন্তু বিশ্বের বৈজ্ঞানিক গবেষণায় অংশগ্রহণ করা সুদূর কল্পনাই থেকে যেত। ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাগ্রহণের দ্বারা ভারতবর্ষ সমগ্র বিশ্বের সঙ্গে ঐক্যসূত্রে গ্রথিত হয়েছিল। এছাড়া বিকল্পই বা কি ছিল? সে-সময়ে সংস্কৃত ও ফার্সি ভাষা ব্যতীত সবচেয়ে উন্নত ভারতীয় ভাষাগুলি মাধ্যমিক শিক্ষাদানের স্তরে পৌঁছুতে পারেনি। কয়েক দশকের প্রস্তুতি ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়-স্তর পর্যন্ত শিক্ষদান অসম্ভব হত —যে শিক্ষাদানের জন্য ইংরেজিভাষায় সুশিক্ষিত ও পাশ্চাত্য চেতনায় সমৃদ্ধ বহুসংখ্যক ব্যক্তির প্রয়োজন ছিল। মেকলে এই কাজই করেছেন। মেকলের সিদ্ধান্ত ভারতীয় ভাষাগুলিকে এমন এক পর্যায়ে উন্নীত করেছে, যার ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাদান সম্ভব হয়েছে। কিন্তু ইংরেজিভাষার মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাদান এবং ইংরেজিতে বহুসংখ্যক দক্ষ ব্যক্তি সৃষ্টি করা ছাড়া বর্তমানের এই উন্নতি প্রায় অসম্ভব ছিল। ভারতের বড় বড় স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় যেগুলি শিক্ষাজগতে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছে, সেগুলি মেকলের সিদ্ধান্তের প্রত্যক্ষ ফসল।"[২]

এই উক্তি কি ইতিহাসসম্মত? মাতৃভাষায় শিক্ষাবিস্তার কি আঞ্চলিকতা ও বিচ্ছিন্নতাবোধের জন্ম দেয়? ইংরেজিভাষা কি ভারতের কৃষিজীবীশ্রেণীকে ঐক্যবদ্ধ ও সংহত করেছে? ইংরেজিভাষায় শিক্ষিত শ্রেণী কি দেশ ও জাতির সেবায় আত্মনিয়োগ করেছেন, মাতৃভাষার উন্নতির জন্য তাঁরা কি তাঁদের শিক্ষা ও চেতনাকে নিয়োগ করেছেন? সেকারণেই কি রাজা রামমোহন সেকালে ইংরেজিভাষার মাধ্যমে ইংরেজি-শিক্ষাবিস্তারের দাবি উত্থাপন করেছিলেন? প্রকৃতই কি পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভার-বহনে মাতৃভাষা একান্তই অক্ষম ও দুর্বল ছিল? সে-সময়ে কেউ কি মাতৃভাষায় পাশ্চাত্য সাহিত্য-দর্শন-ইতিহাস-ভূগোল-বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ-রচনায় ব্রতী হননি? এ প্রশ্নে ইতিহাস নীরব নয়, মুখর। তার সাক্ষ্য নিষ্করুণ, নির্মম। ইতিহাস বলে, শিক্ষাক্ষেত্রে শ্রেণী-আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্যই তাঁরা ইংরেজিভাষার পক্ষে সওয়াল করেছেন, 'নিম্নমুখী পরিস্রুতি তত্ত্ব'-এর ধুয়ো তুলেছেন। ইতিহাসের পাতা খুললেই দেখা যায়, ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের পূর্বেই মাতৃভাষা দ্রুত গতিতে ক্রমোন্নত হচ্ছিল, মাতৃভাষায় জ্ঞানবিজ্ঞান বিষয়ক বহু গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল, শিক্ষাদানের আধুনিক পদ্ধতি গ্রহণ করে মাতৃভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের আলো ক্রমেই বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ছিল। তারফলে বৈদিক যুগ থেকে শিক্ষাক্ষেত্রে সমাজের উচ্চবর্ণের যে-আধিপত্য বজায় ছিল, তা লুপ্ত হবার সম্ভাবনা দেখে মাতৃভাষা-বিকাশের প্রয়াসকে ব্যর্থ করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল। সুতরাং উনিশ শতকের প্রথম পর্বে মাতৃভাষায় শিক্ষাদান সম্পর্কে ইতিহাসের সাক্ষ্য গ্রহণ করলে ইংরেজি-প্রেমিকদের অনৃতভাষণের অভিসন্ধি উদ্ঘাটিত হবে।

অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির নিরঙ্কুশ শোষণ-পীড়নে যেমন বাংলাদেশের গ্রামীণ শিল্পগুলি ধ্বংস হয়েছিল, গ্রামীণ অর্থনীতি ভেঙ্গে পড়েছিল, বিকল্প নতুন অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে না তোলায় বাংলার গ্রামগুলি শ্মশানে পরিণত হয়েছিল, তেমনি নিশ্চিহ্নপ্রায় হয়েছিল পাঠশালা টোল, মক্তব্, মাদ্রাসা ইত্যাদি প্রাচীন দেশীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের (১৭৭০ খৃঃ.) জন্য বহু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান লুপ্ত হলেও কিছু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রাণশক্তির জোরে টিকে ছিল। ডঃ. ফ্রান্সিস বুকানন কোম্পানির কোর্ট অব ডিরেক্টর্স-এর নির্দেশে দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য ১৮০৭ খৃঃ. থেকে ১৮১৪ খৃঃ. পর্যন্ত বাংলা, বিহার ও আসামের ধ্বংসপ্রাপ্ত গ্রামগুলি ভ্রমণ করে যে প্রতিবেদন উপস্থিত করেছেন তা থেকে জানা যায় যে, দিনাজপুর জেলার ১৩টি মহকুমায় যেখানে লোকসংখ্যা ছিল ৩০ লক্ষ, সেখানে ১১৯টি পাঠশালা ও ৯টি মক্তব্ ছিল। শিক্ষারম্ভের বয়স ছিল ৫ বছর। ছ'মাসের মধ্যে প্রত্যেকটি ছাত্র লিখতে ও পড়তে সক্ষম হত। কিন্তু মাতৃভাষায় রচিত পুস্তকের অভাব ছিল। বুকানন রংপুর

জেলায় ৫৮৯ জন গুরু এবং ১৮৫ জন মুসলমান শিক্ষককে দেখেছেন যাঁরা মাতৃভাষায় শিক্ষা দিতেন। গুরুদের কাছে ৩৫০০ থেকে ৪০০০ ছাত্র শিক্ষা গ্রহণ করতেন। এই লোকসংখ্যা ছিল ২৭,২৫,০০০। বুকানন তাঁদের মধ্যে ২,২২,৭৫০ জনকে শিক্ষিত দেখেছেন, যাঁরা নাম সই করতে পারতেন, হিসাব রাখতে পারতেন এবং বাংলা কবিতার অর্থ বুঝতেন। প্রতিবেদনের শেষে ডঃ. বুকানন বলেছেন, "সাধারণ মানুষকে শিক্ষিত করার জন্য মাতৃভাষায় পুস্তক রচনা প্রয়োজন। তা না হওয়া পর্যন্ত ছাত্রদের জ্ঞানের উন্নতি সাধন সম্ভব নয়।"[২] তাসত্ত্বেও ইংরেজ-সরকার মাতৃভাষা উন্নয়নের জন্য কোনো পরিকল্পনা গ্রহণ করেননি।

১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের ২০ জানুয়ারি লর্ড বেন্টিঙ্কের দ্বারা নিযুক্ত হয়ে উইলিয়ম অ্যাডাম তিন বৎসর ধরে বাংলা ও বিহারের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে অনুসন্ধান করেছেন এবং তিন দফায় তিনটি প্রতিবেদন সরকারের কাছে পেশ করেছেন —প্রথম প্রতিবেদন ১ জুলাই, ১৮৩৫ খৃঃ., দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রতিবেদন যথাক্রমে ২৩ ডিসেম্বর, ১৮৩৫ খৃঃ. ও ২৮ এপ্রিল, ১৮৩৮ খৃ.। অ্যাডাম দেশীয় পাঠশালার সংখ্যা নির্ধারণ করতে গিয়ে জেনারেল কমিটি অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশান-এর একজন সদস্যের উক্তি উদ্ধৃত করেছেন। উক্ত সদস্য বলেছেন, "বর্তমানে নিম্নপ্রদেশে (অর্থাৎ বাংলাদেশে) প্রতিটি গ্রাম্য বিদ্যালয়কে যদি মাসে এক টাকা করে সাহায্য দেওয়া হয়, তাহলে বৎসরে প্রায় ১২ লক্ষ টাকা ব্যয় হবে।"[৩] অর্থাৎ অ্যাডামের সময়ে বাংলা ও বিহারে ১ লক্ষ দেশীয় বিদ্যালয় ছিল। এই সময়ে লোকসংখ্যা এক কোটি ছিল। সুতরাং প্রতি ৪০০ জন পিছু গড়ে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল। প্রায় সমস্ত গ্রামে ৫ থেকে ১৪ বৎসর বয়সের প্রতি ৩১টি বালকের জন্য একটি করে বিদ্যালয় ছিল। শিক্ষারম্ভের বয়স ছিল ৫ থেকে ১০ বৎসর এবং শিক্ষার কাল ছিল ৬ থেকে ৯ বৎসর।

অ্যাডাম বীরভূম, বর্ধমান ও মুর্শিদাবাদ —এই তিনটি জেলার শিক্ষাবিষয়ক যে-বিস্তৃত তথ্য উপস্থিত করেছেন তাতে দেখা যায়, এই তিনটি জেলার লোকসংখ্যা ছিল ২৬,৪১,৪৮৮ এবং তাঁদের ছেলেদের শিক্ষার জন্য ১০৯৮টি বাংলা স্কুল ও ১০টি হিন্দি স্কুল ছিল অর্থাৎ সে-সময়ে মাতৃভাষার মাধ্যমে ১১০৮টি দেশীয় বিদ্যালয়ে শিক্ষা দেওয়া হত। ছাত্রসংখ্যা ছিল ২০,৬৫৩। ছাত্রদের মধ্যে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্যের মোট সংখ্যা ছিল ৮,১৩৫ এবং বাকি ছাত্রদের মধ্যে ৩,৩১৯ জন ছিল হাড়ি, বাগ্দী, ডোম, কেওট, চণ্ডাল, ধোবা, শুঁড়ি, কলু ইত্যাদি তথাকথিত নিম্নতর শ্রেণীভুক্ত।[৪] পাঠশালার শিক্ষকদের অধিকাংশই ছিলেন কায়স্থ। শিক্ষাদান ছিল তাঁদের বংশগত পেশা। তবে কলু, ধোবা, বাগদী, চণ্ডাল, ডোম, হাড়ি, শুঁড়ি ইত্যাদি তথাকথিত নিম্নশ্রেণী থেকে আগত ব্যক্তিরাও শিক্ষকতার পেশা গ্রহণ করতেন। এমন কি ব্রাহ্মণরাও গ্রাম্য

পাঠশালার শিক্ষক ছিলেন। শিক্ষাক্ষেত্রে কোনো বর্ণভেদ কিংবা জাতিভেদ ছিল না। অ্যাডাম লিখেছেন, "নিম্নতর জাতের, এমন কি অন্য ধর্মের শিক্ষকের কাছে শিক্ষাগ্রহণের জন্য উচ্চবর্ণের অভিভাবকেরা তাঁদের ছেলেদের পাঠাতে ইতস্তত: করতেন না। যেমন মুসলমান শিক্ষকের বহু উচ্চবর্ণের হিন্দু ছাত্র ছিল। একথা চণ্ডাল ও অন্যান্য নিম্নতর শ্রেণীর ক্ষেত্রেও সত্য।"[৫] হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি লক্ষ্য করে তিনি পুনরায় বলেছেন, "মুসলমান-শিক্ষকদের হিন্দু ও মুসলমান ছাত্র ছিল এবং তারা ও অন্যান্য নিম্নতর জাতের ছাত্ররা একসঙ্গে স্কুল-গৃহে সমবেত হত। সেই শিক্ষকের কাছে তারা শিক্ষাগ্রহণ করত এবং একসঙ্গে খেলাধূলায় ও বিভিন্ন আমোদ-প্রমোদে যোগ দিত।"[৬] শিক্ষার মাধ্যম ছিল মাতৃভাষা। শিক্ষকেরা মুখে মুখে পড়াতেন, তখনো মুদ্রিত পুস্তক গ্রামের অধিকাংশ স্কুলে জনপ্রিয় হয়নি। শিক্ষকদের বেতন ছিল অত্যন্ত কম, কোথাও ছাত্রদের এক আনা থেকে চার আনা বেতনে, কোথাও মাসিক বৃত্তি, আবার কোথাও সিধার উপরে তাঁদের নির্ভর করতে হত।

ফ্রান্সিস বুকানন ও উইলিয়ম অ্যাডাম যে শিক্ষাচিত্রটি তুলে ধরেছেন কিংবা যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন তা বহু পূর্বেই উপলব্ধি করে মিশনারীরা ইউরোপীয় শিক্ষাদর্শে দেশীয় শিক্ষাদানের পদ্ধতিকে সংস্কার করতে ব্রতী হয়েছেন, মাতৃভাষায় শিক্ষা বিস্তারের জন্য বহু প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করেছেন, আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতিতে শিক্ষাদানের জন্য শিক্ষক-শিক্ষণ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং সর্বোপরি অক্লান্ত পরিশ্রমে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান-বিষয়ক বহু গ্রন্থ মাতৃভাষায় রচনা ও অনুবাদ করেছেন। এই কাজে সর্বপ্রথম এগিয়ে এসেছিলেন উইলিয়ম কেরির নেতৃত্বে শ্রীরামপুরের মিশনারিরা। উনিশ শতকের প্রথম পর্বে মাতৃভাষা-চর্চায় প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন বিদেশী মিশনারীরা।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপন বাংলা গদ্যের প্রবর্তনে একটি স্মরণীয় ঘটনা। অবশ্য বাংলা গদ্য উন্নয়নের প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য নিয়ে এই কলেজ স্থাপিত হয়নি। বিরাট ভারত-ভূখণ্ডকে বৃটিশ-সাম্রাজ্যের শাসনাধীনে রাখতে হলে ইংরেজ-কর্মচারিদের পক্ষে এদেশীয় ভাষা, আচার-আচরণ ও রীতি-নীতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় থাকা প্রয়োজন। তাই দেশীয় ভাষায় তরুণ সিভিলিয়ানদের শিক্ষাদানের জন্য লর্ড ওয়েলেসলির উদ্যোগে ১৮০০ খৃষ্টাব্দের ৪ মে ফোর্টউইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং শ্রীরামপুর মিশনের প্রাচ্য-ভাষাবিদ্ উইলিয়ম কেরি এই কলেজের প্রাচ্যভাষা-বিভাগের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। বাংলা গদ্যগ্রন্থের অভাব দেখে তিনি সহকর্মীদের বাংলা পাঠ্যপুস্তক রচনায় উৎসাহ দিয়েছিলেন এবং নিজেও বাংলা-পুস্তক রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন। তাঁর রচিত 'কথোপকথন' (১৮০১ খৃঃ) পুস্তকে সাধু ও চলিত ভাষা উভয় রূপের সন্ধান পাওয়া যায়। মেয়েলি কোন্দল, ঘটক বিদায় ইত্যাদি নিতান্ত ঘরোয়াবিষয়ক কথাবার্তাও কিছু আছে।

এই গ্রন্থের একদিকে বিষয়-বৈচিত্র্য এবং অন্যদিকে রীতির প্রাঞ্জলতাও আছে। কেরির দ্বিতীয় গ্রন্থ 'ইতিহাসমালায়' (১৮১২ খৃঃ) ১৫০টি প্রস্তাব ও ১৪৮টি গল্প আছে। রচনারীতি সুষম ও প্রাঞ্জল। তিনি বাংলা-ইংরেজি অভিধান (১৮১৮ খৃঃ) ও নব ধারাপাত (১৮২০ খৃঃ) রচনা করেছেন।

কেরির সহকর্মী রামরাম বসু রচিত 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' (১৮০১ খৃঃ) 'বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত বাঙ্গালী রচিত প্রথম মৌলিক গদ্য গ্রন্থ'। এই পুস্তকে ফারসি ও আরবি শব্দের প্রচুর মিশ্রণ থাকা সত্ত্বেও রচনার প্রসাদগুণ অব্যাহত। তাঁর দ্বিতীয় পুস্তক 'লিপিমালা'য় (১৮০২ খৃঃ) পত্রলিখনের পদ্ধতিতে তিনি যে সকল কাহিনী বর্ণনা করেছেন, তা সরল ও সুগম বাক্‌ভঙ্গি ও লোকপ্রচলিত শব্দের ব্যবহারে চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠেছে।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের লেখকদের মধ্যে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ছিলেন প্রাক্‌-রামমোহন যুগের বাংলা গদ্যের প্রথম যথার্থ শিল্পী। তাঁর রচিত পুস্তকগুলি ('বত্রিশ সিংহাসন' —১৮০২ খৃঃ, 'হিতোপদেশ' —১৮০৮ খৃঃ, 'রাজাবলী' —১৮০৮ খৃঃ, 'বেদান্ত চন্দ্রিকা' —১৮১৭ খৃঃ, 'প্রবোধ চন্দ্রিকা' —১৮৩৩ খৃঃ) তাঁর প্রকৃত শিল্প-ব্যক্তিত্বের পরিচয় বহন করছে। কলেজের অন্যান্য লেখকদের মধ্যে গোলোকনাথ শর্মার 'হিতোপদেশ' (১৮০২ খৃঃ), তারিণীচরণ মিত্রের 'ওরিয়েন্টাল ফেবুলিষ্ট' (১৮০৩ খৃঃ), চণ্ডীচরণ মুন্সীর 'তোতা ইতিহাস' (১৮০৫ খৃঃ), রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়ের 'মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রম্' (১৮০৫ খৃঃ), হরপ্রসাদ রায়ের 'পুরুষ পরীক্ষা' (১৮১৫ খৃঃ), কাশীনাথ তর্কপঞ্চাননের 'পদার্থ-কৌমুদী' (১৮২১ খৃঃ) ও 'আত্মতত্ত্ব কৌমুদী' (১৮২২ খৃঃ) প্রভৃতি গ্রন্থগুলি উল্লেখযোগ্য।

ইংরেজ-ছাত্রদের জন্য কেরির উৎসাহে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের শিক্ষকেরা যখন বাংলা পাঠ্য-পুস্তক রচনা করেছেন, তখন শ্রীরামপুরের মিশনারিরা (শ্রীরামপুর মিশনের প্রতিষ্ঠাকাল ১০ জানুয়ারি, ১৮০০ খৃঃ) উইলিয়ম কেরির অধিনায়কত্বে মাতৃভাষার মাধ্যমে জনশিক্ষা বিস্তারের সর্বাত্মক পরিকল্পনা গ্রহণ করে তাকে বাস্তবায়িত করতে এগিয়ে এসেছেন। তাঁরা একদিকে আঞ্চলিক ভাষার প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছেন, আধুনিক শিক্ষাদানের পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন, অন্যদিকে মাতৃভাষায় পুস্তক প্রকাশের জন্য ১৮০০ খৃষ্টাব্দে বাংলা হরফের ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করেছেন। আধুনিক জ্ঞানের আলো দেশীয় সমাজের সর্বস্তরে ছড়িয়ে দিতে হলে মাতৃভাষার মাধ্যম ছাড়া অন্য কোনো বিদেশী ভাষায় সম্ভব নয় —এই অভিমত ব্যক্ত করে ডাঃ. জোশুয়া মার্শম্যান ইংলণ্ডের মিশনারি কর্তৃপক্ষের কাছে 'মিনিট' পাঠিয়েছিলেন এবং এই 'মিনিটের' উপর ভিত্তি করে ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে 'Hints relative to the Native Schools together

with the outline of an Institution for their expansion and management' নামক পুস্তিকা প্রকাশ করেন। মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা-বিস্তারের ইতিহাসে এই 'মিনিট' ও পুস্তিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ১৮১৩ খৃষ্টাব্দের সনদ আইন গৃহীত হবার পরে এদেশে প্রাথমিক শিক্ষা-প্রসারের একটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা সর্বপ্রথম মার্শম্যান তাঁর 'মিনিটে' উপস্থিত করেছিলেন। এখানে জনশিক্ষার জন্য যে সব সুপারিশ করা হয়েছিল তার অনেকগুলিই পরবর্তীকালে ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের 'উডের ডেসপ্যাচ'-এ গ্রহণ করা হয়েছিল। অবশ্য মার্শম্যানের এই পরিকল্পনার পশ্চাতে মাতৃভাষার মাধ্যমে খৃষ্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্য থাকলেও এই 'মিনিটে'র ঐতিহাসিক মূল্য কোনোরকমেই অস্বীকার করা যায় না। কারণ কৃষিজীবী মানুষদের স্বার্থে প্রাথমিক শিক্ষা-বিস্তারের জন্য একটি সুচিন্তিত পরিকল্পনা এইবারই সর্বপ্রথম তাঁর 'মিনিট'-এ উপস্থিত করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত একটি ঘটনা উল্লেখ করা প্রয়োজন। যখন মার্শম্যানের মাতৃভাষার মাধ্যমে জনশিক্ষার পরিকল্পনা এদেশ থেকে ইংলণ্ডের মিশনারি-কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো হয়েছিল, তখন দেশীয় অভিজাতশ্রেণীকে উচ্চতর শিক্ষাগ্রহণে সুযোগ-সুবিধা দানের জন্য রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক স্বার্থ-প্রণোদিত পরিকল্পনা বৃটিশ-কর্তৃপক্ষ ইংলণ্ড থেকে এদেশে পাঠিয়েছিলেন।

'Hints' নামক পুস্তিকায় মার্শম্যান ইংরেজি ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম করার জন্য কিছু ব্যক্তির প্রয়াসের তীব্র বিরোধিতা করে লিখেছেন, "প্রথমেই একথা বলা অযৌক্তিক হবে না যে জনসাধারণকে শিক্ষিত করতে হলে তাঁদের নিজেদের ভাষার মাধ্যমেই করতে হবে। ভারতবর্ষের অথবা যে কোনো দেশের অধিবাসীদের মাতৃভাষা ভিন্ন অন্য কোনো ভাষার অথবা ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেবার প্রয়াস করলে তা প্রতারণামূলক হবে।" সুতরাং তাঁর মতে "এমনভাবে শিক্ষার মাধ্যম নির্বাচন করা উচিত যাতে দেশের মানুষ পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন না হয়ে সামাজিক পরিমণ্ডলের মধ্যে থেকে সুখী হতে পারে।"[৭] তাই তিনি দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলেছেন যে, এদেশের মানুষের প্রয়োজন জাতীয় শিক্ষা এবং তা মাতৃভাষার মাধ্যমেই সার্থক হতে পারে ; বিদেশী ভাষার মাধ্যমে নয়। প্রাথমিক শিক্ষাক্রমের জন্য তিনি সরল অঙ্ক, মাতৃভাষার ব্যাকরণ ও বিশুদ্ধ বানান শেখার বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করেছেন এবং উচ্চশিক্ষার জন্য ইতিহাস, ভূগোল ও বিজ্ঞান শেখার পরামর্শ দিয়েছেন। 'এদেশীয়দের উপযোগী করে ল্যাঙ্‌কাষ্টার প্রবর্তিত প্রণালীকে এঁরা গ্রহণ করেছিলেন। এই প্রণালীতে সারণী ও বই উভয়কে কাজে লাগাবার নির্দেশ আছে। ছাত্রদের বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করার কথা আছে এবং শিক্ষকদের সাহায্য করার জন্য মনিটর গ্রহণেরও সুপারিশ আছে। কম খরচে বেশি

ছাত্রকে তাড়াতাড়ি শিক্ষা দেবার কাজে বড় আকারের সারণী খুবই উপযোগী ছিল। তাছাড়া বানানের শুদ্ধতায় ও সঠিক গণনায় এই সারণীর কার্যকারিতাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শিক্ষার বিষয়গুলি ছিল নিম্নরূপ : (১) দেশীয় ভাষা শিক্ষার জন্য বর্ণ, শব্দ, বাক্য ও প্রাথমিক ব্যাকরণ ; (২) প্রাথমিক গণনা ও গণিত ; (৩) সৌরজগত, সেই সঙ্গে গতি, বল, আকর্ষণ, অভিকর্ষণ প্রভৃতি ; (৪) প্রাথমিক ভূগোল (স্থানীয় অঞ্চলের উপরে গুরুত্ব দিয়ে) ; (৫) আলো, তাপ, বায়ু, জল, আবহাওয়া তত্ত্ব, ধাতুবিদ্যা, রসায়ন, জীববিদ্যা প্রভৃতি বিজ্ঞান-বিষয় ; (৬) ইতিহাস ; (৭) নীতিশিক্ষা। বিদ্যালয়-পরিচালনার ব্যাপারে তিনটি বিষয়ের ওপরে গুরুত্ব আরোপ করেন : (১) মুদ্রিত পাঠ্যপুস্তক, (২) বিদ্যালয়-পরিচালনা ও শিক্ষা-তত্ত্বাবধান করা এবং (৩) ছাত্রদের আর্থিক সঙ্গতি ও বিদ্যালয়ে যোগদানের সুযোগ-সুবিধা। মুদ্রিত পুস্তকের অভাব এদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় অসুবিধা ছিল। মিশন বিদ্যালয়-স্থাপনের পরিকল্পনার সঙ্গে সারণী, বিজ্ঞানের কপিবুক, ভাষা-শিক্ষার প্রাথমিক বই, ব্যাকরণ, ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ের পুস্তক প্রণয়ন, মুদ্রণ ও প্রকাশের ব্যবস্থা করে। শিক্ষাবিস্তারে মিশনের সাফল্য অনেকাংশে এই মুদ্রিত পাঠ্যপুস্তকের জন্যই হয়েছিল। পাঠ্যপুস্তক-প্রকাশে মিশন ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে প্রায় পাঁচশ' টাকা খরচ করে। মিশন কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তকগুলি সে-যুগে বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করে।'[৮]

পাঠ্যপুস্তক রচনার কাজে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন ফেলিকস্ কেরি, জন ক্লার্ক মার্শম্যান প্রমুখ। তাঁদের উদ্যোগে, '১৮২০ খৃষ্টাব্দের মধ্যেই ভূগোল, জ্যোতির্বিজ্ঞান, ইতিহাস, অভিধান, বর্ণমালা, শব্দকোষ প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ের ২৭ খানি পুস্তক শ্রীরামপুর হতে প্রকাশিত হয়।'[৯]

বাংলায় বিশ্বকোষ গ্রন্থমালা সিরিজ প্রকাশের জন্য ফেলিকস কেরি অ্যানাটমি বা শারীর-ব্যবচ্ছেদ বিষয়ক গ্রন্থ 'বিদ্যাহারাবলী' (১ম খণ্ড, ১৮২০) রচনা করেন। 'ইহা যে কতবড় দুরূহ কাজ, এই পুস্তকটি যিনি চোখে দেখিবার সুযোগ পাইবেন, তিনিই বুঝিতে পারিবেন। পরিভাষার অভাব, দুরূহ এবং অভিনব বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির বর্ণনায় ভাবের অভাব, কিছুতেই তাঁহাকে দমাইতে পারে নাই।[১০] এসময়ে ইংলণ্ডের ইতিহাস অবলম্বনে রচিত তাঁর দ্বিতীয় গ্রন্থ 'ব্রিটন দেশীয় বিবরণ সঞ্চয়' (১৮২০) প্রকাশিত হয়। 'বিদ্যাহারাবলী' (২য় খণ্ড —স্মৃতিশাস্ত্র বিষয়ক) প্রকাশিত হয় ১৮২১ খৃষ্টাব্দে। তাছাড়া তিনি 'যাত্রীরদের অগ্রেসরণ বিবরণ' (দুই খণ্ড—১৮২১, ১৮২২) নামক গ্রন্থ রচনা করেন। জন ক্লার্ক মার্শম্যান বিবিধ বিষয়ে বাংলা গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর রচিত 'জ্যোতিষ ও গোলাধ্যায়' (১৮১৯), 'সদ্গুণ ও বীর্য্য' (১৮২৯), 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' (দুই খণ্ড —১৮৩১), 'ক্ষেত্রবাগান বিবরণ' (১ম —১৮৩১ ; ২য় —১৮৩৬ ;

—৩য় ১৮৩৭), 'পুরাবৃত্তের সংক্ষেপ বিবরণ' (১৮৩৩), 'মারের ইংরাজী ব্যাকরণের সংক্ষিপ্ত অনুবাদ' (১৮৩৩), 'ঈশপের গল্প' (দুই খণ্ড —১৮৩৪), 'আগ্রা ও বঙ্গরাজধানীর রাজসভা সম্পর্কীয় আইন' (দুই খণ্ড —১৮৩৬), 'বাংলার ইতিহাস' (১৮৪০), 'দেওয়ানী আইন সার' (১৮৪২), 'দারোগাদের কর্ম্মপ্রদর্শক গ্রন্থ' (১৮৫১), 'ব্যবস্থা বিধান' (১৮৫১) ইত্যাদি গ্রন্থগুলি তৎকালীন ছাত্রদের মাতৃভাষার মাধ্যমে জ্ঞান অর্জনে প্রভূত সাহায্য করেছিল।

তাঁরা মাতৃভাষার জানালা দিয়ে দেখেছিলেন পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের আলো; মাতৃভাষায় পদার্থ বিদ্যা, রসায়ন শাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ের সঙ্গে তাঁরা পরিচিত হয়েছিলেন। উইলিয়ম ইয়েটস রচনা করেছিলেন 'পদার্থ বিদ্যাসার' (১৮২৫), 'জ্যোতির্বিদ্যা' (১৮৩০) ও 'সারসংগ্রহ' (১৮৪৪)। রসায়নশাস্ত্র-বিষয়ক 'কিমিয়াবিদ্যাসার' (১৮৩৪) রচনা করেছেন রেঃ. জন. ম্যাক। বিজ্ঞান-বিষয়ক দুটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে —'বিজ্ঞান সেবধি' (১৮৩২) এবং 'বিজ্ঞানসার সংগ্রহ' (১৮৩৪)।

সেকালে বাংলা গদ্য কতখানি সহজবোধ্য ও প্রাঞ্জল হয়ে উঠেছিল এবং বিজ্ঞানের ভারবহনে ক্ষমতা অর্জন করেছিল, তা জ্যোতির্বিজ্ঞান-বিষয়ক গ্রন্থ 'জ্যোতিষ ও গোলাধ্যায়' গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দিলে উপলব্ধি করা যাবে: "কেহ বলেন যে পৃথিবী চতুষ্কোণা ও কেহ বলেন ত্রিকোণা কিন্তু সূর্য্যসিদ্ধান্ত ও সিদ্ধান্তশিরোমণি প্রভৃতি গ্রন্থেতে কহেন যে পৃথিবী কদম্ব পুষ্পের মত গোলাকৃতি। এই প্রকার জ্যোতির্বেত্তাদের কথা আমাদের কথার সহিত মিলে ও প্রমাণসিদ্ধও বটে।"[১১]

পুস্তক প্রকাশের ন্যায় আঞ্চলিক ভাষার আধুনিক বিদ্যালয় স্থাপনেও শ্রীরামপুরের মিশনারিরা অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের উদ্যোগে শ্রীরামপুরে প্রথম অবৈতনিক বাংলা স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮০০ খৃষ্টাব্দের ১লা জুন। স্কুলের নাম 'শ্রীরামপুর নেটিভ ইনস্টিটিউসন'। কিছুদিনের মধ্যে জনপ্রিয়তা অর্জন করায় এই বছরের শেষে ছাত্রসংখ্যা হয় ৫০। এই স্কুল ছিল দেশীয় পাঠশালার মতো। এখানে বাংলা লেখা, পড়া ও কিছু অঙ্ক শেখানো হত। দেশীয় খৃষ্টান ছেলেমেয়েদের জন্য মার্শম্যান ও কেরির উদ্যোগে সর্বপ্রথম পাশ্চাত্য আদর্শে 'ক্যালকাটা বেনেভোলেন্ট ইনস্টিটিউসন' ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হয়। এখানে ইংরেজিভাষা শেখানো হলেও শিক্ষার মাধ্যম ছিল বাংলা। স্কুলের ছাত্রসংখ্যা ২০০ এবং ছাত্রীসংখ্যা ৮০। ছাত্রদের শিক্ষণীয় বিষয় ছিল সরল ও মিশ্র অঙ্ক, ইংরেজি, ব্যাকরণ, ভূগোল, মানচিত্র অঙ্কন, বাইবেল ইত্যাদি। ছাত্রীদের শিখতে হত পড়া, লেখা, বানান, ব্যাকরণ, সেলাই ও বাইবেল। প্রত্যেক শ্রেণীর জন্য নির্দিষ্ট পাঠক্রম, মনিটরি প্রথা, নিয়মিত ক্লাস, পনেরো দিন অন্তর পরীক্ষা গ্রহণ, সুনির্দিষ্ট নীতি অনুসারে স্কুলে ভর্তি ও উচ্চতর শ্রেণীতে উন্নীত করার নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ ইত্যাদি ছিল এই স্কুলের বৈশিষ্ট্য।

'Hints'-এ প্রকাশিত পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৮১৬ খৃষ্টাব্দ থেকে শ্রীরামপুর সহ বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে মিশনের উদ্যোগে আঞ্চলিক ভাষার বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে এবং তিন বৎসরের মধ্যে ১০৯টি বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ছাত্রসংখ্যা ছিল ৭১৬৫। জেলাওয়ারি হিসাব নিম্নরূপ[১২] :

জেলার নাম	বিদ্যালয়-সংখ্যা	ছাত্র-সংখ্যা
হুগলী জেলা (শ্রীরামপুর সমেত)	৫৪	৩৬৮৪
চব্বিশ পরগণা	২২	১৩৭০
হাওড়া	১৮	১০৭৭
বর্ধমান	৭	৬৫৬
ঢাকা	৫	২৭৮
মুর্শিদাবাদ	৩	১০০
মোট—	১০৯	৭১৬৫

লোকশিক্ষায় ও ভাষাবিকাশে সংবাদপত্রের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তাই শ্রীরামপুরের মিশনারিরা সংবাদপত্র প্রকাশে উদ্যোগী হলেন। তাঁরা ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে বাংলা ভাষায় 'দিগ্‌দর্শন' নামক মাসিক পত্রিকা এবং মে মাসে 'সমাচার দর্পণ' নামক সাপ্তাহিক পত্রিকা ও ইংরেজী ভাষায় 'Friend of India' (ত্রৈমাসিক, মাসিক ও সাপ্তাহিক) প্রকাশ করেছেন। সর্বপ্রথম প্রকাশিত সাময়িক পত্রিকা 'দিগ্‌দর্শন'। 'ইহাতে ভূগোল, ইতিহাস, দেশ-বিদেশের জ্ঞাতব্য তথ্য, কৌতুককর অথবা বিস্ময়জনক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাহিনী ইত্যাদি প্রকাশিত হইত। দিগ্‌দর্শনের ভাষা এবং বিষয়বস্তু উভয়ই ছিল বিদ্যালয়ের ব্যবহারের উপযোগী। সেই জন্য স্কুল বুক সোসাইটির বিদ্যালয়সমূহে দিগ্‌দর্শন পাঠ্যপুস্তকরূপে চলিত ছিল।'[১৩] আর 'সমাচার দর্পণ' ও 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' বাংলাদেশের শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' এদেশে মাতৃভাষায় শিক্ষাপ্রচারের একনিষ্ঠ সমর্থক ছিল। নানা নিবন্ধে, চিঠিপত্রে ও সম্পাদকীয় মন্তব্যের মাধ্যমে ইংরেজী ভাষা-মাধ্যমের বিরুদ্ধে দেশীয় ভাষা-মাধ্যমের পক্ষে এই পত্রিকা সুদীর্ঘকাল প্রচার করেছিল।

শ্রীরামপুর মিশনের ন্যায় চুঁচুড়ায় অবস্থিত লণ্ডন মিশনারি সোসাইটির রেভারেণ্ড মে ২৫ বৎসর বয়সে এদেশে মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রাথমিক স্তরে আধুনিক শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য ১৮১৪ খৃষ্টাব্দের ৪ জুলাই চুঁচুড়া সেন্ট্রাল স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। এই স্কুল-স্থাপনের পশ্চাতে শ্রীরামপুরের মিশনারীদের মতো রেভারেণ্ড মে-র খৃষ্টান ধর্মপ্রচারের কোনো উদ্দেশ্য ছিল না —কেবলমাত্র মাতৃভাষায় শিক্ষাদানই ছিল তাঁর লক্ষ্য। তাই তাঁর নির্দিষ্ট পাঠ্যসূচিতে

বাইবেল পাঠ বা ধর্মবিষয়ক পাঠ্যবই ছিল না। ধর্মনিরপেক্ষতা ছিল এই স্কুলের প্রধান বৈশিষ্ট্য। এখানে মাতৃভাষায় পড়া, লেখা ও অঙ্ক শেখানো হত। প্রথম শ্রেণীতে বর্ণমালা, দ্বিতীয় শ্রেণীতে শব্দ, বানান ও বাক্য-গঠন, তৃতীয় শ্রেণীতে নামতা ও যোগ-বিয়োগ, চতুর্থ শ্রেণীতে গদ্য-পাঠ এবং পঞ্চম শ্রেণীতে পিয়ার্সনের বাংলায় রচিত 'ইংরেজি ব্যাকরণ', 'পত্রকৌমুদী' ও 'বাক্যাবলী' পড়ানো হত। পাঠ্যসূচি লক্ষ্য করলে বুঝা যায় যে, মাতৃভাষায় দক্ষতা অর্জনের জন্য মে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। মাত্র ১৪ জন ছাত্র নিয়ে তিনি শিক্ষাদানের কাজ শুরু করেন এবং নানাবিধ বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও তিনি হতাশ হননি। শিক্ষকসুলভ আচরণের দ্বারা মে গ্রামীণ মানুষের মন জয় করতে সক্ষম হন এবং এক বৎসরের মধ্যে তাঁর ছাত্রসংখ্যা হয় ১১০। এই সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে মে পরবর্তীকালে অনেকগুলি শাখা-স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে ১৫টি (ছাত্রসংখ্যা ১০৮০), ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে ৩০টি (ছাত্রসংখ্যা ২,৬৬২), ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে ৩৫টি (ছাত্রসংখ্যা ২,০৯৫), ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে ৩৬টি (ছাত্রসংখ্যা ৩,২৫৫) বাংলা-স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। ছাত্রদের মধ্যে শতকরা ৭৫ জন ছিল দরিদ্রশ্রেণী থেকে আগত। সচ্ছল পরিবারের অভিভাবকেরা তাঁদের সন্তানদের বাংলা-স্কুলে পাঠাতে অনিচ্ছুক ছিলেন।

১৮১৫ খৃষ্টাব্দে ১৫টি স্কুলের ১৫ জন শিক্ষক ছিলেন। তাঁদের মধ্যে ৮ জন ছিলেন এদেশীয় শিক্ষক। এঁরা পূর্বে পাঠশালায় শিক্ষকতা করতেন। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত শিক্ষকের প্রয়োজনে মে ১৮১৬ সালে শিক্ষক-শিক্ষণ বিদ্যালয় স্থাপন করেছেন। শিক্ষা, খাদ্য ও বস্ত্রের জন্য শিক্ষকদের কোনো অর্থ ব্যয় করতে হত না। কিন্তু শিক্ষক-শিক্ষণের কর্মসূচি আশানুরূপ সফল হ'ল না। কারণ শিক্ষকেরা ইংরেজি শেখার প্রলোভনে শিক্ষাসূচির মূল অংশ মাতৃভাষা-চর্চার প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করায় ইংরেজি-শিক্ষার পাঠ্যসূচি পরিত্যক্ত হ'ল এবং পরিবর্তে তাঁদেরকে শিশুদের শিক্ষার মাধ্যম মাতৃভাষা শিখতে নির্দেশ দেওয়া হ'ল।

দেশীয় ধর্মমতের বিরুদ্ধাচরণ না করায় মে-র প্রতি গ্রামীণ দরিদ্র মানুষের গভীর আস্থা গড়ে উঠেছিল। জনশিক্ষা প্রসারে তাঁর আন্তরিক নিষ্ঠা তাঁদেরকে এমনভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল যে, তাঁরা নিজেদের অঞ্চলেও ঐ প্রকার অবৈতনিক স্কুল-প্রতিষ্ঠার জন্য মে-র কাছে আবেদন করেছিলেন। কিন্তু স্থানীয় স্বার্থান্বেষীমহল তাঁর শিক্ষাপ্রয়াসকে বাধাদানের জন্য নানাবিধ ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত করেছিল। মে-র অবৈতনিক স্কুলগুলিকে ক্ষতিগ্রস্ত করার জন্য কিছু জমিদার পাল্টা স্কুল স্থাপন করেছিল। এমন কি ইংরেজির পৃষ্ঠপোষক একজন জমিদার স্কুলের জন্য তাঁর আঙ্গিনা ব্যবহার করতে দিতে অস্বীকার করেছিলেন এই অজুহাতে যে উচ্চতর জাতের ছাত্রদের সঙ্গে নিম্নবর্ণের ছাত্রদের একাসনে বসার বিরোধী তিনি। তবুও মে নিরুদ্যম হননি। কিন্তু বাংলাদেশের

দুর্ভাগ্য, মাত্র ২৯ বৎসর বয়সে ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের ১১ আগষ্ট-এ আকস্মিকভাবে মে-র দেহাবসান ঘটে।

ইংরেজ-সরকার তখনো পর্যন্ত ভাষা-বিষয়ে কোনো সুস্পষ্ট নীতি গ্রহণ না করায় মে-র আবেদনক্রমে ১৮১৫ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাস থেকে মাসিক ৬০০ টাকা সরকারি অনুদান মঞ্জুর করেছিলেন। কিন্তু ১৮৩১ খৃষ্টাব্দের ২ সেপ্টেম্বর উইলসন একটি 'নোটে' সরকারি অর্থে আঞ্চলিক ভাষার স্কুল পরিচালনার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করে অবিলম্বে স্কুলগুলি বন্ধ করার কথা বলেন এবং তার পরিবর্তে ইংরেজি-শিক্ষার জন্য কলেজ-স্থাপনের কথা বলেন। বৃটিশ-সরকার সুযোগের জন্য অপেক্ষা করছিলেন এবং সুযোগ পাওয়া মাত্র তাঁরা স্কুল বন্ধ করতে ইতস্তত করলেন না। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দের ১৫ আগস্ট হুগলীর ম্যাজিষ্ট্রেটকে একটি চিঠি লিখে জেনারেল কমিটি জানালেন যে, চুঁচুড়া-স্কুলগুলির জন্য সমস্ত রকমের সরকারি অর্থ সাহায্য বন্ধ করে দেওয়া হ'ল। যে স্কুলগুলি দেশীয় ভাষা-মাধ্যমে ইউরোপীয় শিক্ষা-দানের নীতিকে কার্যকরী করে ধর্মনিরপেক্ষ জনশিক্ষা প্রসারে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিল, সাম্রাজ্যরক্ষার স্বার্থে সেই স্কুলগুলির অস্তিত্ব মুছে ফেলবার ব্যবস্থা করা হ'ল। স্কুলগুলির দরজা বন্ধ হয়ে গেল। শিক্ষাদানে কোনো ত্রুটি না থাকা সত্ত্বেও শিক্ষকেরা ছাঁটাই হলেন। উচ্চবিত্তশ্রেণীর মধ্যে ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের স্বার্থে জনশিক্ষা গ্রহণের সুযোগ থেকে দরিদ্রশ্রেণীকে বঞ্চিত করে শোষণের জাঁতাকলে নিষ্পিষ্ট করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হ'ল। ইংরেজ-সরকারের ঔপনিবেশিক শিক্ষানীতির তীব্র সমালোচনা করে একজন শিক্ষাবিদ লিখেছেন, "জেনারেল কমিটি এবং ইংলণ্ডের কর্তৃপক্ষ এদেশীয় জনসাধারণকে শিক্ষিত করার বিষয়ে আগ্রহী ছিলেন না। তাঁরা কেবলমাত্র সাম্রাজ্য-সেবায় পারদর্শী অভিজাতশ্রেণীকে ইংরেজিতে শিক্ষিত করার জন্য সচেষ্ট ছিলেন।"[১৪]

বর্ধমানের সামরিক বাহিনীর জুনিয়ার অফিসার ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্ট সামরিক বাহিনীর চাকরি ত্যাগ করে চার্চ মিশনারি সোসাইটিতে যোগ দিয়ে চুঁচুড়ার মিশনারিদের ন্যায় বর্ধমানে দেশীয় স্কুল-প্রতিষ্ঠার কাজে এগিয়ে এসেছিলেন। তবে রেঃ. মে-র মতো ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা-বিস্তারের কোনো উদ্দেশ্য স্টুয়ার্টের ছিল না। মাতৃভাষার মাধ্যমে দেশীয় যুব-সমাজের মনে বিদেশী শাসকশ্রেণীর প্রতি অনুকূল ও প্রীতিপূর্ণ মনোভাব গড়ে তোলার জন্য তিনি স্কুল-স্থাপনে প্রয়াসী হয়েছিলেন। ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে বর্ধমান শহরে স্টুয়ার্ট দুটি বাংলা-স্কুল স্থাপন করেন। এই কাজে সফলতা অর্জন করায় তিনি অধিকতর উৎসাহী হন এবং তিন বৎসরের মধ্যে তাঁর প্রয়াসে ১২টি স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রত্যেক স্কুলে গড়ে ছাত্রসংখ্যা ছিল ১০০।

স্কুলগুলিতে ইতিহাস, ভূগোল, জ্যোতির্বিজ্ঞান ও 'ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আইনের ভূমিকা' নামক ইংরেজি-গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ ইত্যাদি পাঠ্যবিষয়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

কোম্পানি-সরকার দেশীয় ব্যক্তিদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি ও আরামদায়ক অবস্থা সৃষ্টির জন্য সচেষ্ট এই ধারণা দরিদ্রশ্রেণীর মনে দৃঢ়মূল করার উদ্দেশ্য নিয়েই শেষোক্ত পুস্তকটিকে পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। স্কুলে মনিটরি প্রথা সার্থকভাবে অনুসৃত হওয়ায় স্টুয়ার্টের খ্যাতি বর্ধমানের সীমানা অতিক্রম করে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। রেঃ. মে স্টুয়ার্টের স্কুল পরিদর্শন করে প্রভাবিত হন এবং তিনি চুঁচুড়া সেন্ট্রাল স্কুলে স্টুয়ার্টের মনিটরি পদ্ধতি অনুসরণ করেন। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের প্রথম দিকে 'কলিকাতা স্কুল সোসাইটি' নয়া পদ্ধতিতে কয়েকটি বাংলা-স্কুল স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তাঁদের নির্বাচিত সুপারিন্টেণ্ডেন্ট ও পাঁচজন বাঙ্গালি শিক্ষককে স্টুয়ার্টের অধীনে ৫ মাসের শিক্ষা গ্রহণের জন্য তাঁর স্কুলে পাঠিয়েছিলেন।

মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রাথমিক স্তরে শিক্ষাদানের জন্য ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দে 'বেঙ্গল অক্সিলিয়ারি মিশনারি সোসাইটি' কর্তৃক স্থাপিত স্কুলের সংখ্যা ছিল ৩০ এবং ছাত্রসংখ্যা ৩০০০ ছিল। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে লর্ড বিশপের সভাপতিত্বে গঠিত 'ডায়োসেশন কমিটি' একই উদ্দেশ্য নিয়ে কলকাতার টালিগঞ্জ অঞ্চলে ৬টি এবং হাওড়ায় ৫টি বাংলা-স্কুল স্থাপন করেন।

১৮১৮ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত 'ক্যালকাটা স্কুল সোসাইটি' কলকাতার দেশীয় প্রাথমিক স্কুলগুলির মানোন্নয়নের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের ১ সেপ্টেম্বর সদর দেওয়ানি আদালতের বিচারক জে. এইচ. হ্যারিংটনের সভাপতিত্বে টাউন হলের জনসভায় গৃহীত প্রস্তাবানুসারে গঠিত 'ক্যালকাটা স্কুল সোসাইটি'র লক্ষ্য ছিল : (১) দেশীয় বিদ্যালয়গুলির মানোন্নয়ন ও সহায়তা দান ; (২) দেশীয় নাগরিকদের আধুনিক জ্ঞান-অর্জনে সাহায্য করার জন্য নতুন স্কুল প্রতিষ্ঠা। স্কুল সোসাইটির পরিচালকমণ্ডলীর সদস্য ছিলেন ১৬ জন ইউরোপীয় ও ৮ জন দেশীয় ব্যক্তি। ৪ জন সম্পাদকের মধ্যে ২ জন ইউরোপীয় এবং ২ জন দেশীয় —লেঃ. আরভিন ও ই. এস. মন্টেগু এবং রাধাকান্ত দেব ও মীর্জা কাজিম উলি খান। কিন্তু ১৮২০ খৃষ্টাব্দে ৪ জন সম্পাদকের পরিবর্তে দুজন সম্পাদক নির্বাচিত করা হয় এবং তাঁরা হলেন ডেভিড হেয়ার ও রাধাকান্ত দেব। পরিচালক-মণ্ডলীর সদস্যগণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন জে. এইচ. হ্যারিংটন, স্যার এডওয়ার্ড হাইড ইষ্ট, স্যার অ্যান্টনি বুলার, জে. পি. লার্কিন্‌স্‌, গর্ডন ফর্বস, রেঃ. কেরি, রেঃ. ইয়েটস, লেঃ. আরভিন, ই. এস. মন্টেগু, ডেভিড হেয়ার, মীর্জা কাজিম উলি খান, মৌলভী বিলায়েত হোসেন, রাধাকান্ত দেব এবং উমানন্দন ঠাকুর প্রমুখ।

ধর্মনিরপেক্ষ আধুনিক শিক্ষাদান লক্ষ্য হওয়ায় স্কুল সোসাইটি জনসমর্থন লাভ করে এবং তিন মাসের মধ্যে ২০,০৩৭ টাকা সংগৃহীত হয়। কিন্তু বাংলা-স্কুলের শিক্ষার মানোন্নয়নের ক্ষেত্রে সোসাইটিকে প্রধানত দুটি অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল —

(১) যোগ্য শিক্ষকের অভাব, (২) উন্নতমানের পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষার সরঞ্জাম ইত্যাদির অপ্রতুলতা। সুতরাং সোসাইটি একজন তরুণ ও উৎসাহী ইউরোপীয় মেজর নিকোলাস উইলার্ডকে সুপারিন্টেণ্ডেন্ট পদে নিযুক্ত করে পাঁচজন বাঙ্গালী শিক্ষক সহ বর্ধমানের ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্টের স্কুলে স্কুল-পরিচালনা ও শিক্ষাদানের পদ্ধতি সম্পর্কে পাঁচ মাসের শিক্ষা-গ্রহণের জন্য পাঠানো হয় এবং তাঁদের সাহায্যে ১৮২০ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে স্কুল সোসাইটি দেশীয় স্কুলগুলি যাতে আদর্শ স্কুলের শিক্ষাপদ্ধতি অনুসরণ করে সেজন্য কলকাতার পাঁচটি অঞ্চলে পাঁচটি 'মডেল স্কুল' স্থাপন করেন। এই স্কুলগুলি ছিল অবৈতনিক। কিন্তু অর্থাভাবে এই স্কুলগুলি চালানো সম্ভব হ'ল না। আরপুলি লেনে অবস্থিত মডেল স্কুলটি ডেভিড হেয়ারের পরিচালনায় ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত টিকে ছিল। এই স্কুলটি ইংরেজী-স্কুলের আদর্শে পরিচালিত হত।

১৮২৯ খৃষ্টাব্দে সোসাইটির একটি প্রতিবেদনে দেখা যায় যে, এই স্কুলে ২২৫ জন ছাত্র, একজন পণ্ডিত ও চারজন দেশীয় শিক্ষক ছিলেন। বাংলা ভাষার মাধ্যমে পড়া, লেখা, বানান, ব্যাকরণ, অঙ্ক ইত্যাদি পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা ছিল। স্কুলে ভর্তি হওয়ার পূর্বে শিশুরা পরিবারে ও সমাজে বাংলায় কথা বলার মাধ্যমে যাতে কিছুটা জ্ঞান অর্জন করতে পারে, সেজন্য স্কুলে ভর্তির ন্যূনতম বয়স ৮ বৎসর নির্ধারিত হয়েছিল। কিন্তু ইংরেজি-শিক্ষার ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের জন্য তাঁরা স্কুলে একটি পৃথক ইংরেজি-শ্রেণী প্রবর্তন করেছেন। অবশ্য এই শ্রেণীতে শিক্ষালাভ ছিল সর্তসাপেক্ষ। যারা বাংলাভাষায় দক্ষতা প্রদর্শনে সক্ষম হবে, তারাই কেবলমাত্র এই সুযোগ-লাভের অধিকারী। এমন কি ইংরেজি শ্রেণীতে ভর্তি হলেও বাংলাভাষায় উপযুক্ত বলে বিবেচিত না হওয়া পর্যন্ত অধ্যয়নের জন্য দিনে দু'বার তাকে বাংলা-স্কুলে উপস্থিত থাকতে হবে। বাংলা ভাষা-চর্চায় উৎসাহ দেবার জন্য স্কুল সোসাইটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন যে, বাংলায় যারা পারদর্শিতা প্রমাণ করতে সক্ষম হবে, ইংরেজিতে উচ্চতর শিক্ষাগ্রহণের জন্য পটলডাঙ্গার ইংরেজি-স্কুলে অথবা হিন্দু কলেজে তাদের অধ্যয়নের ব্যয় সোসাইটি বহন করবেন। এইভাবে স্কুল সোসাইটি ইংরেজি-প্রাসাদ নির্মাণের পূর্বে মাতৃভাষার কঠিন ভিত্তি গড়তে প্রয়াসী হয়েছিলেন। উইলিয়ম অ্যাডাম স্কুল সোসাইটির বৈজ্ঞানিক ভাষা-নীতির ভূয়সী প্রশংসা করে লিখেছেন, "দেশের ভাষা-শিক্ষার প্রতি তাঁদের মনোযোগ, জনসাধারণের কাছে শিক্ষা পৌঁছে দেওয়ার জন্য দেশীয় ভাষাকে প্রধান মাধ্যম রূপে গ্রহণ দেশীয় সমাজ-উন্নয়নের ক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল।"[১৫]

এসময়ে (১৮১৮-১৮১৯) কলকাতায় দেশীয় স্কুলের সঠিক সংখ্যা পাওয়া কঠিন। স্কুল সোসাইটির নির্দেশে গৌরমোহন আড্ডি ১৬৬টি দেশীয় পাঠশালার (ছাত্রসংখ্যা ৩,৪৮৬) একটি তালিকা প্রণয়ন করেন। সোসাইটির আর একজন সদস্য ষ্টিফেন লাম্রিমোদে

কর্তৃক প্রদত্ত তালিকায় ২০০ বাংলা স্কুল ও ৪,২০০ ছাত্র উল্লিখিত হয়েছে। ক্যালকাটা স্কুল সোসাইটির এক সমীক্ষায় দেখা যায় যে, কলকাতায় দেশীয় স্কুলের সংখ্যা ছিল ২১১ এবং ছাত্রসংখ্যা ৪,৯০৮। 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকা লিখেছেন (১৩. ৩. ১৮১৯) যে, এ সময়ে বাংলা-স্কুলের সংখ্যা ছিল ২৩২। এই স্কুলগুলিতে পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা ছিল অত্যন্ত নিম্নমানের। গুরুমশায়রা কেবলমাত্র স্মৃতিশক্তির ওপরে নির্ভর করে মৌখিক পদ্ধতিতে শিক্ষা দিতেন। এই অবস্থার পরিবর্তনকল্পে স্কুল সোসাইটি বাংলা স্কুলগুলিতে মুদ্রিত পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষার বিভিন্ন সরঞ্জাম বিনামূল্যে সরবরাহ করেছে। স্কুল সোসাইটির সম্পাদক রাধাকান্ত দেব ৪২টি স্কুলের ৮৯৭ জন ছাত্রকে স্কুল বুক সোসাইটির বিভিন্ন বাংলা পাঠ্যপুস্তক বিনামূল্যে দিয়েছেন। এক বৎসরের মধ্যে স্কুল সোসাইটি ৯৫টি স্কুলের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। পরবর্তীকালে এই সংখ্যার বৃদ্ধি ঘটে; ১১৫টি স্কুল তাঁদের পরিচালনাধীন হয়।

ক্যালকাটা স্কুল সোসাইটি ছাড়া আরো দুটি প্রতিষ্ঠান মফস্বল অঞ্চলে মাতৃভাষায় শিক্ষা বিস্তারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। ঢাকা স্কুল সোসাইটি এবং বহরমপুর-মুর্শিদাবাদ নেটিভ স্কুল সোসাইটি ধর্মনিরপেক্ষ আধুনিক শিক্ষাপ্রচারে ব্রতী হয়েছিল।

কেবলমাত্র ছেলেরা নয়, মেয়েরাও যাতে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ পায়, সেবিষয়ে মিশনারিরা সচেষ্ট ছিলেন। ডাঃ. জে. মার্শম্যান এবং তাঁর স্ত্রী শ্রীমতী হানা মার্শম্যানের উদ্যোগে ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে গঠিত 'ক্যালকাটা ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি' স্ত্রীশিক্ষা-প্রসারে প্রয়াসী হন। দু' বৎসরের চেষ্টায় তাঁরা কলকাতার নন্দনবাগান, গৌরী-বেড়িয়া, জানবাজার ও চীৎপুরে চারটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন।

এসময়ে চার্চ মিশনারি সোসাইটি 'ক্যালকাটা লেডিজ সোসাইটি' গঠন করে স্ত্রীশিক্ষা-প্রসারে সচেষ্ট হয়েছিলেন। তাঁরা মিস্ কুকের (পরবর্তীকালে মিসেস উইলসন নামে খ্যাত) তত্ত্বাবধানে চব্বিশটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। ছাত্রী-সংখ্যা ছিল ৪০০। ১৮২৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে তাঁরা মোট ৩০টি বালিকা বিদ্যালয় (ছাত্রীসংখ্যা ৬০০) প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তারপর থেকে লেডিস সোসাইটির নীতির পরিবর্তন ঘটে। স্কুলের সংখ্যা-বৃদ্ধি না করে তাঁরা ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে উত্তর কলকাতায় একটি কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় স্থাপন করেন এবং সেই স্কুলের উন্নতির জন্য তাঁদের সামগ্রিক প্রয়াস নিয়োজিত হয়, কিন্তু তাঁদের শিক্ষাদানের লক্ষ্য ধর্মনিরপেক্ষ ছিল না। খৃষ্টান ধর্মপ্রচার শিক্ষার অঙ্গ হওয়ায় উচ্চবর্ণের রক্ষণশীল হিন্দুরা তাঁদের মেয়েদেরকে শিক্ষাগ্রহণের জন্য এই স্কুলে পাঠাননি। 'লেডিস অ্যাসোসিয়েসন ফর নেটিভ ফিমেল এডুকেশন' নামে আর একটি প্রতিষ্ঠান ১০টি বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করেন। পরবর্তীকালে সার্কুলার রোডে এই স্কুলগুলি একটি কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ে সংগঠিত হয়েছিল। এই স্কুলে মুসলমান ছাত্রীরাই ছিল সংখ্যায় অধিক।

এই পর্বে একদিকে মাতৃভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বহু নতুন বাংলা-স্কুল স্থাপিত হয়েছে, অন্যদিকে আধুনিক পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে প্রাচীন দেশীয় পাঠশালাগুলিকে সংস্কার করা হয়েছে। এই দ্বিবিধ উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য মাতৃভাষায় আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান-বিষয়ক পাঠ্যগ্রন্থ ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটির উদ্যোগে রচিত ও প্রকাশিত হয়েছিল। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দের ৬ মে প্রতিষ্ঠিত ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটির পরিচালকমণ্ডলীর সদস্য ছিলেন ১৬ জন ইউরোপীয় ও ৮ জন দেশীয় ব্যক্তি: (১) স্যার. হাইড ইষ্ট, (২) জে. এম. হ্যারিংটন, (৩) ডবলিউ. বি. বেলি —সভাপতি, (৪) রেঃ. কেরি, (৫) রেঃ. জে. পিয়ার্সন, (৬) রেঃ. টি. টমসন, (৭) মেজর জে. ডবলিউ. টেলর, (৮) ক্যাপ্টেন টি. রোবাক, (৯) ক্যাপ্টেন এ. লকেট, (১০) ডবলিউ. এইচ. ম্যাকনাটেন, (১১) জি. জে. গর্ডন, (১২) জে. রবিনসন, (১৩) জে. ক্যালডের —কোষাধ্যক্ষ, (১৪) লেঃ. পি. আরভিন —সম্পাদক, (১৫) ই. এস. মণ্টেগু —সম্পাদক, (১৬) লেঃ. ডি. ব্রাইস, (১৭) মৌলভী আবদুল ওয়াইদ —সম্পাদক, (১৮) তারিণীচরণ মিত্র —সম্পাদক, (১৯) মৌলভী করম হোসেন, (২০) মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, (২১) মৌলভী আব্‌দুল হামিদ, (২২) রাধাকান্ত দেব, (২৩) মৌলভী মহম্মদ রসিদ এবং (২৪) রামকমল সেন।

ধর্মনিরপেক্ষতা ছিল স্কুল বুক সোসাইটির প্রধান বৈশিষ্ট্য। ধর্মনিরপেক্ষতা বজায় রাখার জন্য তাঁরা বলেছেন, "ধর্মমূলক পুস্তক প্রকাশে কোনো ইচ্ছা সোসাইটির নেই।"[১৬] তবে এই নিষেধাজ্ঞা 'কোন ব্যক্তির ধর্মীয় মতকে আঘাত না করে দেশীয় সমাজের চরিত্র ও নৈতিক মান উন্নয়নের জন্য নীতিকথা-বিষয়ক পুস্তক প্রকাশের ক্ষেত্রে'[১৭] প্রযুক্ত হবে না। দেশীয় ছাত্রদের নৈতিক মান ও বোধশক্তি বৃদ্ধিকল্পে তাঁরা মাতৃভাষায় পুস্তক প্রকাশ করবেন এবং সস্তাদরে কিংবা বিনামূল্যে পুস্তক বিতরণে প্রয়াসী হবেন।

ধর্মনিরপেক্ষ মনোভাবের প্রকাশ ঘটেছে তাঁদের প্রকাশিত ইতিহাস, ভূগোল, অঙ্ক, জ্যোতির্বিজ্ঞান, বর্ণমালা, নীতিকথা ইত্যাদি বিষয়ক পুস্তকাবলীতে। প্রকাশিত পুস্তক-গুলির মধ্যে রাধাকান্ত দেবের রচিত 'বাঙ্গালা শিক্ষাগ্রন্থ' (১৮২১) মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষাপ্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। বাংলা বর্ণমালা ও সংখ্যা শেখার জন্য এই গ্রন্থটি হ'ল বাঙ্গালি রচিত প্রথম মুদ্রিত শিশুশিক্ষা-গ্রন্থ। ২৮৮ পৃষ্ঠার এই বইতে স্বরবর্ণ, ব্যঞ্জনবর্ণ এবং দুই, তিন, চার, পাঁচ, ছয় কিংবা তার বেশী অক্ষর সমন্বয়ে গঠিত শব্দ, বাক্য, ছোট ছোট অনুচ্ছেদ দেওয়া হয়েছে। তারপরে আছে ব্যাকরণ —বিশুদ্ধ বানান, সন্ধি ও বাক্য-গঠনের নিয়মাবলী বর্ণিত হয়েছে। ভূগোল ও ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হয়েছে। গ্রন্থের শেষে আছে ওজন, মাপ ও নামতা। আলোচ্য গ্রন্থ থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, রাধাকান্ত দেব মাতৃভাষায় শিক্ষা গ্রহণের বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ

করেছিলেন। 'তিনি মাতৃভাষার মাধ্যমেই জনসাধারণকে সুশিক্ষিত করতে চেয়েছিলেন। ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে জ্ঞান অর্জনের বিষয়টি তিনি সতর্কতার সঙ্গে প্রয়োগ করার পক্ষপাতী ছিলেন। কারণ স্বল্প ইংরেজি-জ্ঞান যুবকদের কৃষি ও শিল্প থেকে দূরে টেনে নিয়ে যাবে এবং তাদের সরকারি ও সওদাগরি অফিসে কেরাণী হতে প্রলুব্ধ করবে। তাতে বেশির ভাগ যুবকেরা হতাশায় ভুগবে এবং ইংরেজি ভাষায় স্বল্পজ্ঞান তাদের অহঙ্কারী করে তুলবে। তারা আর নিজেদের ব্যবসা-বাণিজ্যে ফিরে আসতে পারবে না এবং ভবঘুরেতে পরিণত হবে।'[১৮] রাধাকান্তের আশঙ্কা সত্য প্রমাণিত হয়েছে। ইংরেজি-ভাষা কিছুসংখ্যক মানুষকে কেরাণী করেছে, শিল্পপতি করেনি, তাঁরা আত্মকেন্দ্রিক হয়েছেন, দেশ ও জাতির সঙ্গে অপরিচয়ের দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর গড়ে উঠেছে। শিক্ষার মাশুল গুনেছে সমাজ, বিনিময়ে ইংরেজি ভাষায় শিক্ষিত ব্যক্তিরা বিত্তশালী হয়ে উঠেছেন।

১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে স্কুল বুক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত গ্রন্থগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল : গণিত (১৮১৭) —রেঃ. মে ; পাঠশালার বিবরণ (১৮১৭) —জে. ডি. পিয়ার্সন ; জ্যোতিষসার সংগ্রহ (১৮১৭) —রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ; নীতি কথা (১৮১৮) —তারিণী-চরণ মিত্র, রাধাকান্ত দেব ও রামকমল সেন ; মনোরঞ্জনেতিহাস (১৮১৯) —তারাচাঁদ দত্ত ; ঔষধসার সংগ্রহ (১৮১৯) —রামকমল সেন ; গণিতাঙ্ক (১৮১৯) —রেঃ. হার্লে ; পত্রকৌমুদী (১৮২০) —জে. ডি. পিয়ার্সন ; ইংরেজি ভাষার ব্যাকরণ (১৮২০) — জে. ডি. পিয়ার্সন ; বাক্যাবলী (১৮২০) —জে. ডি. পিয়ার্সন ; হিতোপদেশ (১৮২০) —রামকমল সেন ; পশ্বাবলী (১৮২২) —ডবলিউ. এইচ. পিয়ার্স ; ব্যাকরণসার : (১৮২৪) —মাধবচন্দ্র ভট্টাচার্য ; ভূগোল এবং জ্যোতিষ বিষয়ক কথোপকথন (১৮২৭) —জে. ডি. পিয়ার্সন ; ভূগোল বৃত্তান্ত—ডবলিউ. এইচ. পিয়ার্স ; সত্য ইতিহাস্ সার (১৮৩০) —উইলিয়ম ইয়েটস ; প্রাচীন ইতিহাস সমুচ্চয় (১৮৩০) —উইলিয়ম ইয়েটস ; সংক্ষিপ্ত সদ্বিদ্যাবলী (১৮৩৩) —কালীকৃষ্ণ দেব ; গ্রীকদেশের ইতিহাস (১৮৩৩) — ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায় ; গৌড়ীয় ব্যাকরণ (১৮৩৩) —রামমোহন রায় ইত্যাদি।

১৮১৭ খৃঃ. থেকে ১৮৩৫ খৃঃ. পর্যন্ত স্কুল বুক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তকগুলিকে দুটি পর্যায়ে ভাগ করা প্রয়োজন। প্রথম পর্যায় : ১৮১৭ খৃঃ. থেকে ১৮২১ খৃঃ. এবং দ্বিতীয় পর্যায় : ১৮২১ খৃঃ. থেকে ১৮৩৫ খৃঃ.। প্রথম পর্যায়ের চার বৎসরে ৩২টি পুস্তক (মোট কপি ৭৮,৫০০) বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় মুদ্রিত হয়। তদুপরি সোসাইটির পক্ষ থেকে শ্রীরামপুর মিশন ১২টি পুস্তক (মোট কপি ৪৭,৯৪৬) প্রকাশ করেন। তাছাড়া ১০টি পুস্তকের ২৪,৫২৫ কপি মুদ্রিত হতে থাকে এবং আরো ৮টি পুস্তকের পাণ্ডুলিপি মুদ্রণের জন্য প্রস্তুত করা হয়। নিম্নলিখিত তিনটি সারণীতে[১৯] লিপিবদ্ধ সোসাইটির চার বছরের কর্মপ্রয়াসের বিপুল সাফল্য উপলব্ধি করা যায় :

প্রথম সারণী

[স্কুল বুক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত]

ভাষা	পুস্তকের সংখ্যা	কপির সংখ্যা
বাংলা	১৬	৪৮,৭৫০
ইংরেজি-বাংলা (দ্বিভাষিক)	৩	২,৮০০
হিন্দুস্তানি	৫	১০,১৫০
ফার্সি	৫	১২,৩০০
সংস্কৃত	১	১,০০০
ইংরেজি	২	৩,৫০০
মোট	৩২	৭৮,৫০০

দ্বিতীয় সারণী

[স্কুল বুক সোসাইটির পক্ষে শ্রীরামপুর মিশন কর্তৃক মুদ্রিত]

ভাষা	পুস্তকের সংখ্যা	কপির সংখ্যা
বাংলা	৩	৩১,০০০
ইংরেজি-বাংলা (দ্বিভাষিক)	১	১৫,০০০
ফার্সি	১	১০০
সংস্কৃত	২	৩১০
আরবি	৩	২১৪
ইংরেজি	২	১,৩২২
মোট	১২	৪৭,৯৪৬

তৃতীয় সারণী

[মুদ্রণ চলছে—২৫.৯.১৮২১]

ভাষা	পুস্তকের সংখ্যা	কপির সংখ্যা
বাংলা (ভূ-চিত্র সহ)	৫	১৮,৫০০
ইংরেজি-বাংলা (দ্বিভাষিক)	১	৫
হিন্দি	১	২,০০০
ফার্সি	১	২,০০০
আরবি	১	২,০০০
সংস্কৃত	১	২০
মোট	১০	২৪,৫২৫

প্রথম ও দ্বিতীয় সারণী থেকে এই তথ্য পাওয়া যায় যে, স্কুল বুক সোসাইটি নিজেরা এবং শ্রীরামপুর মিশনের সাহায্যে চার বছরে (১৮১৭ খৃঃ. থেকে ১৮২১ খৃঃ.) বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় ৪৪টি পুস্তকের ১,২৬,৪৪৬ কপি প্রকাশ করেছেন। এগুলির মধ্যে বাংলা ভাষায় মুদ্রিত হয়েছিল ১৯টি পুস্তক (মোট কপি ৭৯,৭৫০) এবং ইংরেজিতে মুদ্রিত পুস্তকের সংখ্যা মাত্র ৪টি (মোট কপি ৪,৮২২)। দেশের মানুষের মনে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষিত হওয়ার আগ্রহ কী বিপুল পরিমাণে ছিল তা বাংলা ও ইংরেজিতে মুদ্রিত পুস্তকের সংখ্যা থেকে উপলব্ধি করা যায়। সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত বাংলা পুস্তকের চাহিদার বিপুলতা চতুর্থ সারণীতে[২০] পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে :

চতুর্থ সারণী

গ্রন্থের নাম	মুদ্রিত কপির সংখ্যা	সংস্করণ-সংখ্যা	মন্তব্য
১। প্রাথমিক নামতা —স্টুয়ার্ট	৩৮৫০	৩	মাত্র ৭৩৫ কপি অবশিষ্ট
২। গণিত —রেঃ. মে	২০০০	৩	নিঃশেষিত
৩। প্রাথমিক পাঠ —পিয়ার্সন	৩০০০	২	ঐ
৪। গণিতাঙ্ক —রেঃ. হার্লে	১০০০	১	ঐ
৫। পাঠশালার বিবরণ —পিয়ার্সন	৫০০	১	ঐ
৬। নীতিকথা —প্রথম খণ্ড	৭,০০০	৩	ঐ
৭। ঐ —দ্বিতীয় খণ্ড	৪,০০০	১	ঐ
৮। পত্রকৌমুদী —পিয়ার্সন	১,০০০	১	মাত্র ৩৮৪ কপি অবশিষ্ট
৯। মনোরঞ্জনেতিহাস —তারাচাঁদ দত্ত	২,০০০	১	মাত্র ৪৭১ কপি অবশিষ্ট
১০। সিংহের বিবরণ —লসন	২,০০০	১	মাত্র ৬৪৬ " "
১১। ভূগোল বৃত্তান্ত —পিয়ার্স	১০,০০০	২	মাত্র ২৭৮ " "
১২। দিগদর্শন (১৫টি সংখ্যা একত্রে) (বাংলা)	৩০,০০০	২	১৬,২১২ " "
১৩। লিখন পাঠ	১,০০০	১	নিঃশেষিত
১৪। বিশ্বের মানচিত্র —মণ্টেগু	১,০০০	১	ঐ
১৫। দিগদর্শন (ইংরেজি-বাংলা ১৫টি সংখ্যা একত্রে)	১৫,০০০	১	৯,৮২৩ কপি অবশিষ্ট
১৬। মনোরঞ্জনেতিহাস (ইংরেজি বাংলা)	১,০০০	১	মাত্র ১২১ " "

উপরের সারণীতে দেখা যাচ্ছে, ৮টি গ্রন্থ নিঃশেষিত ; সোসাইটির সম্পাদক জানিয়েছেন যে, অর্থাভাবের জন্য নিঃশেষিত বইগুলির পুনর্মুদ্রণ সম্ভব নয়।

দ্বিতীয় পর্যায়ে (১৮২১-১৮৩৫) স্কুল বুক সোসাইটির উদ্যোগে ১,৯৫,০৪৩ কপি পুস্তক মুদ্রিত হয়েছিল অর্থাৎ প্রতি বৎসরে গড়ে মুদ্রণ-সংখ্যা হ'ল ১৩,৯৩১। ১৮২২ ও ১৮২৩ এবং ১৮৩৪ ও ১৮৩৫ —এই চার বৎসরে বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত পুস্তক ও তার কপি-সংখ্যা পঞ্চম সরণীতে[২১] উপস্থিত করা হ'ল :

পঞ্চম সারণী

	১৮২২ ও ১৮২৩	১৮৩৪ ও ১৮৩৫	
ভাষা	কপির সংখ্যা	কপির সংখ্যা	গ্রন্থ সংখ্যা
সংস্কৃত	—	—	—
বাংলা	২৬,৪৫১	৯,৭৫০	৭
হিন্দি	২,২৪২	৭৫০	১
ফার্সি	—	১৫০০	৩
হিন্দুস্তানি	—	১৫,০০০	৩
ইংরেজি	১,৫০০	২৯,০০০	১৬
ইংরেজি-বাংলা (দ্বিভাষিক)	১,৫০০	৪,০০০	৭
ইংরেজি-ফার্সি („)	—	৫০০	১
ইংরেজি-হিন্দি („)	—	১,৫০০	২
মোট	৩১,৬৯৩	৬২,০০০	৪০

উপরের সারণীগুলি (প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং পঞ্চম) থেকে একটা মর্মান্তিক সত্য উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে যে, ইংরেজিভাষার তুলনায় বাংলাভাষায় মুদ্রিত পুস্তকের সংখ্যা ক্রমশ নিম্নগামী হয়েছে।

প্রথম চারটি বছরে (১৮১৭-১৮২১) বাংলা-গ্রন্থের মুদ্রিত কপির সংখ্যা ছিল ৯৮,২৫০ এবং ইংরেজি-গ্রন্থের মুদ্রিত কপির সংখ্যা ছিল ৪,৮২২ ; ১৮২২ ও ১৮২৩ খৃঃ. বাংলা-গ্রন্থ ও ইংরেজি-গ্রন্থের মুদ্রিত কপির সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ২৬,৪৫১ ও ১,৫০০ ; কিন্তু সেখানে ১৮৩৪ ও ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের চিত্র ভয়াবহ —মাত্র ৭টি বাংলা-গ্রন্থের মুদ্রিত কপির সংখ্যা ৯,৭৫০, আর ১৬টি ইংরেজি-গ্রন্থের মুদ্রিত কপির সংখ্যা ২৯,০০০। বাংলা-গ্রন্থের মুদ্রণ-সংখ্যা হ্রাস এবং ইংরেজি-গ্রন্থের মুদ্রণ-সংখ্যা বৃদ্ধির কারণ হ'ল, উচ্চবিত্ত-মধ্যবিত্ত সমাজে মাতৃভাষায় শিক্ষাগ্রহণের পরিবর্তে ইংরিজিভাষায় শিক্ষা-অর্জনের ঝোঁক ক্রমেই বৃদ্ধি পেয়েছে। অর্থোপার্জন মাতৃভাষায় সম্ভব নয়, ইংরেজিভাষাতেই সম্পদবৃদ্ধি ও প্রভাব-বিস্তার সম্ভব। তাই ইংরেজি ভাষার জন্য মাতৃভাষাকে শীর্ষস্থান ত্যাগ করতে হ'ল। ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দের ৩০ এপ্রিলের কমিটির রিপোর্টে বলা হ'ল, "দীর্ঘদিন ধরে এটাই

প্রথা ছিল যে প্রথমে ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত পুস্তক এবং তারপরে ইংরেজিভাষায় মুদ্রিত পুস্তক সম্পর্কে প্রতিবেদন উপস্থিত করতে হত। কিন্তু বর্তমানে ইংরেজির চাহিদা বৃদ্ধি হওয়ার জন্য এখন থেকে বিপরীত পন্থা অবলম্বন করা সঠিক হবে।"[২২]

১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের শেষ থেকে স্কুল বুক সোসাইটির পুস্তক-মুদ্রণের নীতিতে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটল। ১৮২২-২৩ খ্রীষ্টাব্দে সোসাইটির উদ্যোগে বিভিন্ন বাংলা-গ্রন্থের ২৬,৪৫১ কপি মুদ্রিত হয়েছিল এবং বিতরণ কিংবা বিক্রি হয়েছিল ১১,৭০৪ কপি ; কিন্তু ১৮৩৪-১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে মুদ্রণ ও বিতরণের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৯,৭৫০ এবং ৫,৭৫৪ কপি। অথচ ১৮২২-২৩ খৃষ্টাব্দে ইংরেজি বইয়ের মুদ্রণ ও বিতরণের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১,৫০০ এবং ৮৯৩, কিন্তু ১৮৩৪-৩৫ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত হয়েছিল ২৯,০০০ কপি এবং বিতরণ কিংবা বিক্রি করা হয়েছিল ৩১,৬৪৯ কপি। ষষ্ঠ সারণীতে[২৩] প্রদত্ত বাংলা ও ইংরেজি পুস্তক বিক্রি ও বিতরণের হিসাব দেখলে বুঝা যায় যে, বাংলাদেশ থেকে ধীরে ধীরে বাংলাভাষা পিছু হঠছে ; ময়ূর পুচ্ছধারী দাঁড়কাকে দেশ ক্রমেই ভরে উঠছে :

ষষ্ঠ সারণী

[পুস্তক বিতরণ ও বিক্রির হিসাব]

বৎসর	বাংলা	ইংরেজি
১৮২২-২৩ (দু' বৎসর)	১১,৭০৪	৮৯৩
১৮২৪-২৫ (১৫ মাস)	৭,৩২৬	৭৫৫
১৮২৬-২৭ (দু' বৎসর)	১২,৬৫৪	৪,৩২৭
১৮২৮-২৯ (দু' বৎসর)	১০,০৭৪	৯,৬১৬
১৮৩০-৩১ (দু' বৎসর)	৮,২৮১	১১,০৬৩
১৮৩২-৩৩ (দু' বৎসর)	৪,৮৯৬	১৪,৭৯২
১৮৩৪-৩৫ (দু' বৎসর)	৫,৭৫৪	৩১,৬৪৯

অর্থাৎ একদিকে মাতৃভাষা-চর্চার অবনতি, অন্যদিকে ইংরেজি ভাষা-শিক্ষার বিপুল আগ্রহ একটি নিষ্করুণ সত্যকেই প্রমাণিত করে। তা হ'ল, একদিকে যেমন মাতৃভাষার অঙ্গন থেকে দরিদ্রশ্রেণীকে ক্রমেই সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে, অন্যদিকে ইংরেজিভাষার বাগানে সাহেবী পোশাকপরা অভিজাত-সন্তানদের ভিড় বাড়ছে।

ইংরেজিভাষা-শিক্ষার দমকা হাওয়ায় শিবরাত্রির সলতেগুলি নিভতে শুরু করল। শ্রীরামপুরের মিশনারিরা মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা-প্রসারের নীতি পরিত্যাগ করে অভিজাতশ্রেণীর মধ্যে ইংরেজি-শিক্ষা প্রসারে উদ্যোগী হলেন এবং অনেকগুলি বাংলা-স্কুল তাঁরা বন্ধ করে দিলেন। সরকারি নির্দেশে মে-র স্কুলগুলি বন্ধ হ'ল। স্টুয়ার্টের স্কুলগুলি, ক্যালকাটা স্কুল সোসাইটি ও ডায়েসেশন কমিটির বাংলা-স্কুলগুলি ইংরেজি-স্কুলের সঙ্গে

প্রতিদ্বন্দ্বিতায় টিকতে পারল না। ইংরেজিভাষা-শিক্ষার মোহান্ধতার জন্য মাতৃভাষা-চর্চার অগ্রগতি ব্যাহত হওয়ায় অ্যাডাম গভীর দুঃখের সঙ্গে মন্তব্য করেছেন, "ইংরেজি-ভাষায় শিক্ষিত হওয়ার প্রবণতা দেখা দেওয়ায় মাতৃভাষা-চর্চা অবহেলিত হয়েছে এবং তার ফলশ্রুতি হ'ল প্রাথমিক-স্তরে মাতৃভাষার অবলুপ্তি।"[১৪]

আধুনিক পদ্ধতিতে মাতৃভাষার মাধ্যমে সমগ্র দেশে যখন প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার ঘটছিল, তখন শিক্ষাক্ষেত্রে শ্রেণী-আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য সচেষ্ট হয়েছে দেশীয় ভূম্যধিকারীশ্রেণী এবং তাঁদের আবেদনে সাড়া দিয়ে লর্ড বেন্টিঙ্ক বিদেশী-দেশী বণিক-ভূস্বামীশ্রেণীর নিরঙ্কুশ শোষণের রাজত্ব বজায় রাখার জন্য ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের ৭ মার্চ এদেশে ইংরেজিভাষার মাধ্যমে শিক্ষাবিস্তারের আদেশ ঘোষণা করেছেন। ফলে মাতৃভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সঞ্জীবনী স্পর্শে যে-জাতি সামন্ততান্ত্রিক ধ্যান-ধারণা থেকে ধীরে ধীরে জেগে উঠছিল, ইংরেজিভাষার সঙ্কোচন-যন্ত্রে সে-জাতির অগ্রগতির পথে বাধা সৃষ্টি করা হ'ল; জ্ঞানরাজ্যের বহু বিচিত্র সম্ভারে যে-সমাজ সমৃদ্ধ হয়ে উঠছিল, চারদিকে ইংরেজি ভাষার দেওয়াল তুলে সে-সমাজকে জ্ঞানরাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হ'ল। বিত্তহীন-শ্রেণীকে ঠেলে দেওয়া হ'ল নিশ্ছিদ্র ও নীরন্ধ্র অন্ধকারের জগতে। শ্রেণী-শোষণের জোয়াল চেপে বসল তাঁদের কাঁধে।

কিন্তু মরিয়া না মরে রাম। পরবর্তী যুগে সহস্র প্রতিবন্ধকতা ও প্রতিকূলতার মধ্যে মাতৃভাষা-চর্চা স্তিমিত গতিতে হলেও অব্যাহত থাকল; মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের দাবিতে এদেশের সংবাদপত্রগুলি সোচ্চার হয়ে উঠল। বিভিন্ন কৃষক-বিদ্রোহ, শিক্ষিতশ্রেণীর একাংশের চাকরি-লাভে ব্যর্থতা, মধ্যবিত্তশ্রেণীর রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক অধিকার-দানের দাবি উত্থাপন ইত্যাদি বিভিন্ন ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে ইংরেজি-শিক্ষিতদের একাংশের মোহভঙ্গ ঘটল। সরকারি প্রচেষ্টায় গড়া কৃত্রিম জগতের গর্ভে আর একটি উন্মেষকামী জগতের লক্ষ-কোটি বীজ প্রাণরস সংগ্রহ করছিল, তাঁদের আত্মপ্রকাশ বৃটিশ-সাম্রাজ্যের ভিত্‌কে কাঁপিয়ে তুলেছিল। তবে তা অনেক পরের ঘটনা।

চতুর্থ অধ্যায়
নিজভূমে পরবাসী

সামন্ততান্ত্রিক সমাজ-কাঠামোর মধ্যে বৃটিশ-প্রশাসন-যন্ত্রের সহায়করূপে চাকরি-নির্ভর শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীসম্প্রদায় গড়ে তোলার উদ্দেশ্য নিয়েই বেন্টিঙ্কের প্রস্তাব ঘোষণার দ্বারা এদেশের ভূম্যধিকারী-ধনিক-সম্প্রদায়ের সন্তান-সন্ততির মধ্যে ইংরেজি-শিক্ষাকে সীমাবদ্ধ করে রাখা হ'ল। দেশীয় অভিজাতশ্রেণী মেকলে-বেন্টিঙ্কের প্রচেষ্টাকে সোল্লাসে স্বাগত জানিয়েছেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মতো ইংরেজিভাষায় শিক্ষা তাঁদের কাছে আভিজাত্যের প্রতীক ছিল। 'বলা বাহুল্য, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, রামগোপাল ঘোষ, তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী, শিবচন্দ্র দেব, প্যারীচাঁদ মিত্র, রামতনু লাহিড়ী প্রভৃতি হিন্দুকলেজ হইতে নবোত্তীর্ণ যুবকদল সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত মেকলের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। তাঁহারা যে কেবল ইংরাজী শিক্ষার পক্ষপাতী হইয়া সর্ব্বত্র ইংরাজী শিক্ষা প্রচলনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন তাহা নহে, তাঁহারাও মেকলের ধুয়া ধরিলেন। বলিতে লাগিলেন যে, —এক সেল্‌ফ ইংরাজী গ্রন্থে যে জ্ঞানের কথা আছে, সমগ্র ভারতবর্ষ বা আরবদেশের সাহিত্যে তাহা নাই। তদবধি ইঁহাদের দল হইতে কালিদাস সরিয়া পড়িলেন, সেক্সপিয়ার সে স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইলেন; মহাভারত, রামায়ণাদির নীতির উপদেশ অধঃকৃত হইয়া Edgeworth's Tales সেই স্থানে আসিল; বাইবেলের সমক্ষে বেদ বেদান্ত গীতা প্রভৃতি দাঁড়াইতে পারিল না।"[১] অবশ্য পরবর্তীকালে এঁদের মধ্যে অনেকেই উন্নাসিকতার মনোভাব পরিত্যাগ করে প্রাথমিক-স্তরে মাতৃভাষায় শিক্ষাবিস্তারে প্রয়াসী হয়েছিলেন। তাঁরা মনে করেছেন যে, প্রাথমিক শিক্ষা মাতৃভাষায় গ্রহণ করলে ইংরেজি ভাষায় উচ্চশিক্ষা গ্রহন সহজ হবে এবং এভাবেই শিক্ষার্থীদের ভাষা-শিক্ষার ভিত্তি সুদৃঢ় রূপে গড়ে উঠবে। কিন্তু সাম্রাজ্য-স্বার্থে ভাষা-শিক্ষার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি পরিত্যক্ত হয়েছে।

এদেশে ইংরেজি ভাষায় শিক্ষাবিস্তারের পরিকল্পনাকে কার্যকরী করার জন্য জেনারেল কমিটি ১৮৩৫ সালের ১১ এপ্রিলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন যে ইংরেজিভাষার মাধ্যমে ইউরোপীয় সাহিত্য ও বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য প্রধান প্রধান শহরগুলিতে ইংরেজি-স্কুল স্থাপন

করা হবে। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে তাঁরা সদর শহরে জেলা-স্কুল প্রতিষ্ঠার জন্য সমগ্র শক্তি ও অর্থ নিয়োগ করেছেন। ফলে '১৮৩৫ সন হইতে সরকার পক্ষে এবং বেসরকারিভাবে স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠার ধূম পড়িয়া গেল। এই বৎসরই সরকার ঢাকায় ইংরেজি-স্কুল স্থাপন করেন (জুলাই, ১৮৩৫)। এই বিদ্যালয়টি ১৮৪১ সনের ২০শে নভেম্বর কলেজে উন্নীত হয়। কোথাও সরকারি কর্মচারিদের কোথাও বেবসরকারি ব্যক্তিদের চেষ্টা-যত্নে মেদিনীপুর (সেপ্টেম্বর, ১৮৩৫), বরিশাল (১৮৩৫), রামপুর বোয়ালিয়া (২৭ জুন, ১৮৩৬), গৌহাটি (১৮৩৫), ব্যারাকপুর (৬ মার্চ, ১৮৩৭), চট্টগ্রাম (জানুয়ারি, ১৮৩৭), বারাসত (১৮৩৯) প্রভৃতি শাসন-কেন্দ্রে ইংরেজি বিদ্যালয় খোলা হইল। কলিকাতার রোমান ক্যাথলিক জেসুইট সম্প্রদায় কর্তৃক ১৮৩৫, ১ জুন সেণ্ট জেভিয়ার্স স্কুল স্থাপিত হয়। যেসব বিদ্যালয়ে ইংরেজি-শিক্ষা ইতিপূর্বেই আরম্ভ হইয়াছিল তাহার কার্য্য আরও ব্যাপকতর হইল। চুঁচুড়ার বাংলা-স্কুলগুলি এতদিন সরকারের চক্ষুশূল হইয়া ছিল। মহম্মদ মহসীনের দান হইতে হুগলীতে ১৮৩৬ সনের ১লা আগষ্ট মহম্মদ মহসীন কলেজ প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহারা এ সকলের দায় হইতে নিজেদের মুক্ত করিলেন। কলেজের জন্য ছাত্র প্রস্তুতকল্পে একটি ব্রাঞ্চ স্কুল বা শাখা-বিদ্যালয়ও স্থাপিত হইল। এই কলেজের অপর একটি শাখা-বিদ্যালয় স্থাপিত হয় হুগলী হইতে ষোল মাইল দূরে সীতাপুরে।

'এ তো গেল সাধারণ শিক্ষার কথা। ১৮৩৫ সনে সরকার কলিকাতায় মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন করিলেন। এখানকার ছাত্রদের ইংরেজির মাধ্যমে শারীরবিদ্যা, ব্যবচ্ছেদবিদ্যা, ভেষজবিদ্যা, রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা প্রতিটি বিষয় অধ্যয়ন করিতে হইত। একারণেও ইংরেজি শিক্ষা দ্রুত প্রসারের সুযোগ লাভ করিল।'[২] ইংরেজি ভাষায় শিক্ষাগ্রহণে যে কতখানি গুরুত্ব আরোপ করা হত কাউন্সিল অব এডুকেশন-এর সেক্রেটারি ফ্রেড. জে. মোয়াটের একটি নির্দেশে তার পরিচয় পাওয়া যায়। ১৮৪৮ সনের ২২ ফেব্রুয়ারি তিনি মেডিক্যাল কলেজে ভর্তির প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য ইংরেজিভাষায় পর্যাপ্ত জ্ঞানকে আবশ্যিক সর্ত রূপে নির্দেশ জারি করেছেন, "সমস্ত প্রার্থীর ইংরেজি ভাষায় পর্যাপ্ত জ্ঞান থাকা প্রয়োজন, যাতে তাঁরা পড়তে, লিখতে এবং সুস্পষ্ট উচ্চারণে স্বচ্ছন্দ গতিসম্পন্ন হয়। মিল্‌টনের প্যারাডাইস লস্ট, রবার্টসনের প্রাচীন রচনাসমূহের ইতিহাস বিশ্লেষণে অবশ্যই সক্ষম হতে হবে।"[৩]

এই নির্দেশের ফলে মেডিক্যাল শিক্ষা-গ্রহণেচ্ছুক ছাত্রদের মধ্যে মাতৃভাষা-চর্চা একেবারে লোপ পায়। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে মেডিক্যাল কলেজে ভর্তির জন্য

৩২০ জন ছাত্র প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়েছেন, উত্তীর্ণ হয়েছেন মাত্র ২১ জন ছাত্র। পরীক্ষায় বাংলা-রচনা লিখতে দেওয়া হয়েছিল —'মিথ্যা কথনের ফল কি?' বাংলা-চর্চা ভুলে গিয়ে তাঁরা কি বাংলায় এই রচনা লিখতে সক্ষম হয়েছিলেন? এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকার তীব্র শ্লেষোক্তিতে। টেস্ট পরীক্ষার বিবরণ দিতে গিয়ে এই পত্রিকা লিখেছেন (১৭. ৬. ১৮৫২), "আমরা প্রার্থি লোকের সংখ্যাদৃষ্টে মনে করিয়াছিলাম, ন্যূনকল্পে ১৫০ জন পরীক্ষা দিয়া অনায়াসে কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন, কিন্তু কি পরিতাপ! পরিশেষে পর্ব্বতের ইন্দুর প্রসবের ন্যায় এককালে সমুদয় মিথ্যা হইল, পাঠক মহাশয়েরা বিবেচনা করুন। বাঙ্গালা রচনার নিমিত্ত পরীক্ষকেরা এই প্রশ্ন দিয়াছিলেন যে, "মিথ্যা কথনের ফল কি" এই সহজ প্রস্তাব লিখিতেই যখন অক্ষম হইয়া পাল পাল যুবা মেষপালের ন্যায় পলায়ন করিল, এবং অনেকেই যখন শ্রীকাঁদিতে হতশ্রী হইল, আর অন্নদামঙ্গলের কবিতার উত্তরে "নামতা জিজ্ঞাসু বালকের ন্যায় আমতা মুখে ফ্যা ফ্যা করিয়া ঠোঁট মুখ চাটিতে লাগিল", তখন এদেশের কল্যাণ ও দেশীয় ভাষার উন্নতি কোথায়।"[৪]

সংবাদপত্রের সমালোচনা সত্ত্বেও ইংরেজ-সরকার ইংরেজিভাষায় ইংরেজি শিক্ষাদানের নীতি অব্যাহত রেখেছেন। '১৮৩৭ সনে শিক্ষা-সভা শুধু বঙ্গ প্রদেশের স্কুল ও কলেজের জন্য উচ্চশিক্ষা খাতে ব্যয় করিয়াছিলেন তাহার একটি হিসাব এখানে দেওয়া হইল। প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানের ছাত্রসংখ্যাও ইহা হইতে জানা যাইতেছে। বলা বাহুল্য, শিক্ষা-সভা এসময়েও সমগ্র উত্তর ভারতের শিক্ষার উপর কর্তৃত্ব করিতেন।

প্রতিষ্ঠান	ছাত্রসংখ্যা ॥ ১৮৩৭ খৃঃ.		বার্ষিক ব্যয় (টাকা)
হিন্দু কলেজ	৪৫১	...	৪০৫৯
মহম্মদ মহসীন কলেজ ইং বিঃ	৭৫০	...	৩০০০
হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুল	২২৭	...	২২৫
মাদ্রাসা ইং স্কুল	১৫১	...	৬৫০
ঢাকা স্কুল	৩১৪	...	৫৩৬
গৌহাটি স্কুল	১৫৪	...	২৭৯
চট্টগ্রাম স্কুল	৮০	...	১৫০
মেদিনীপুর স্কুল	৭৯	...	৩০৫
নিজামৎ কলেজ, ইং বিঃ	১০৯	...	৫০০
বোয়ালিয়া (রাজশাহী) স্কুল	৮০	...	১৭৭
কুমিল্লা স্কুল	৮৮	...	৩০০'[৫]
মোট:	২,৪৮৩		১০,১৮১ টাকা

ইংরেজিভাষায় আধুনিক শিক্ষাদানের নীতি কার্যকরী হ'লেও প্রথমদিকে এই শিক্ষাবিস্তারের কোনো সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ছিল না। তাসত্ত্বেও অফিস আদালতের ভাষা ইংরেজি হওয়ায় শহরবাসী বিত্তশালীশ্রেণীর মধ্যে অর্থোপার্জনের জন্য ইংরেজি শেখার বিপুল আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়। তাঁদের ইংরেজি শেখার চাহিদা পূরণের জন্য জেলা-স্কুলগুলিতে শিক্ষাদানের মাধ্যম রূপে ইংরেজিভাষাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। নিম্নের সারণীতে[৬] লিপিবদ্ধ এক বৎসরের (১৮৪২ খৃঃ.) সরকারি স্কুল ও কলেজের ছাত্রসংখ্যার সঙ্গে পূর্বোক্ত সারণীর ছাত্রসংখ্যা (১৮৩৭ খৃঃ.) তুলনা করলে ইংরেজি শেখার আগ্রহের বিপুলতা উপলব্ধি করা যায়। নিম্নলিখিত সারণীতে উড়িষ্যা, আসাম, বিহার ও অন্যান্য অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত স্কুলগুলি উল্লিখিত হয়নি, এখানে কেবলমাত্র বর্তমান ভৌগলিক মানচিত্র অনুযায়ী দুই বাংলার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির উল্লেখ করা হয়েছে :

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	ছাত্রসংখ্যা
হিন্দু কলেজ	৫২০
মেডিক্যাল কলেজ	৮৮
মাদ্রাসা	২৫৩
সংস্কৃত কলেজ	১১৮
মহম্মদ মহসীন কলেজ	৯৬৪
হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুল	৩৬৮
হুগলী ইনফ্যাণ্ট স্কুল	৫৪
সীতাপুর ব্রাঞ্চ স্কুল	১৪১
ত্রিবেণী স্কুল	৬৮
উমরপুর স্কুল	১০০
বাঁকুড়া স্কুল	১৯৯
যশোহর স্কুল	১৫৮
ঢাকা কলেজ	৩৪২
কুমিল্লা স্কুল	৮৩
চট্টগ্রাম স্কুল	১০৫
বাউলিয়া স্কুল	১৭৯
বরিশাল স্কুল	৬১
শ্রীহট্ট স্কুল	১৫১
মেদিনীপুর স্কুল	১৪৯
মোট :	৪,১০০

সরকারি স্কুলের ছাত্রসংখ্যার সঙ্গে বেসরকারি ইংরেজি-স্কুলের ছাত্রসংখ্যা যোগ করলে ইংরেজী-শিক্ষার্থীদের সংখ্যার সামগ্রিক চিত্র পাওয়া যায় এবং সেই সংখ্যার সঙ্গে দেশীয় ভাষা-শিক্ষার্থীর সংখ্যা তুলনা করে 'Friend of India' পত্রিকা ১৮৩৯ সালের ২৮ মার্চ তারিখে লিখেছেন, বেণ্টিঙ্কের প্রস্তাব "এদেশের মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের পদ্ধতিকে সীমাতিরিক্ত ক্ষতিসাধন করেছে।"[৭] পত্রিকায় প্রকাশিত বিবরণ অনুসারে ১৮৩৫ সালের আঞ্চলিক ভাষার স্কুলে ছাত্রসংখ্যা ছিল ৮,৫৪৪, কিন্তু ১৮৩৯ সালের মার্চে ছাত্রসংখ্যা হ'ল ৫,০০০। ফলে মিশনারিরাও মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের কাজ বন্ধ করে দিয়ে সমাজের উচ্চশ্রেণীর স্বার্থে ইংরেজি-শিক্ষা বিস্তারে প্রয়াসী হয়েছেন। এদেশে জনশিক্ষা-প্রসারে তাঁরা যে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন, তা বেণ্টিঙ্কের প্রস্তাবের প্রতিক্রিয়ায় পরিত্যক্ত হয়েছিল।

বিভিন্ন মহল থেকে জনসাধারণের মধ্যে দেশীয় ভাষায় আধুনিক শিক্ষাদানের দাবি উত্থাপিত হলেও বেণ্টিঙ্কের স্থলাভিষিক্ত লর্ড অকল্যাণ্ড সে-দাবিকে অগ্রাহ্য করে ১৮৩৯ সালের ২৪ নভেম্বরের 'মিনিটে'[৮] সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন, "ইউরোপীয় সাহিত্য, দর্শন ও বিজ্ঞান-শিক্ষা ইংরেজির মাধ্যমে গ্রহণেচ্ছুক ছাত্রদের অধিকসংখ্যায় শিক্ষিত করাই হ'ল সরকারি শিক্ষানীতির মূল লক্ষ্য।" তাই অভিজাতশ্রেণীকে আশ্বাস দিয়ে তিনি বলেছেন, "সমাজের উচ্চশ্রেণীর মধ্যে উচ্চতর শিক্ষা-বিস্তারের জন্য সরকারি প্রয়াস অবশ্যই সীমাবদ্ধ থাকবে।" বিনিময়ে সাম্রাজ্য-শক্তিও লাভবান হবে। অকল্যাণ্ডের মতে, "উচ্চশ্রেণীর মধ্যে শিক্ষাদানের মান উন্নয়নের দ্বারা উক্ত শ্রেণীর মনোভাবে লাভজনক পরিবর্তন ঘটবে, যা বহুসংখ্যক স্কুল-স্থাপনের দ্বারা সম্ভব নয়।" সুতরাং উচ্চশ্রেণীকে ইংরেজি-শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ দেবার জন্য কোম্পানি-সরকার 'নিজস্ব জিলা স্কুল এবং কলেজগুলির জন্য ১৮৪১ সন হইতে জুনিয়র ও সিনিয়র বৃত্তির ব্যবস্থা করিলেন। প্রতিটি জুনিয়র বৃত্তির পরিমাণ মাসে আট টাকা এবং প্রত্যেক সিনিয়র বৃত্তির পরিমাণ প্রথম দুই বৎসরের জন্য মাসে ত্রিশ টাকা এবং পরবর্তী চারি বৎসরের জন্য মাসে চল্লিশ টাকা। জুনিয়র বৃত্তি অন্যূন চারি বৎসর কাল পাওয়া যাইবে স্থির হয়। তবে ইহাও ধার্য হয় যে, জুনিয়র বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্রগণ এই সময়মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে সিনিয়র বৃত্তির অধিকারী হইতে পারিবে। এক-একটি সরকারি কলেজের জন্য ছয়টি জুনিয়র ও আটটি সিনিয়র বৃত্তি নির্দিষ্ট হইল। প্রত্যেক জিলা স্কুলের জন্য একটি জুনিয়র বৃত্তি নির্দিষ্ট হয়'[৯]। তাছাড়া ইংরেজি-শিক্ষা বিস্তারের কাজ সুষ্ঠুভাবে নির্বাহের

জন্য ১৮৪২ সালের ১০ জানুয়ারি এক সরকারি আদেশের দ্বারা 'জেনারেল কমিটি অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশনের' পরিবর্তে 'কাউন্সিল অব এডুকেশন' গঠিত হ'ল।

ইংরেজিভাষা মাধ্যম বিষয়ে তীব্র সমালোচনা হলেও কোর্ট অব ডিরেক্টর্সের সমর্থনলাভের ফলে কোম্পানি-সরকার পুরোনো নীতি রূপায়ণে সচেষ্ট হয়েছেন। কোম্পানির লণ্ডনস্থ কর্তৃপক্ষ ১৮৪২ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারির ডেসপ্যাচে 'প্রাথমিক শিক্ষা-প্রসারের চেয়ে সমাজের উচ্চ ও মধ্যবিত্তশ্রেণীর শিক্ষার চাহিদা পূরণের উদ্দেশ্যে ব্যবস্থা গ্রহণের'[১০] জন্য জেনারেল কমিটির অনুসৃত নীতিকে সমর্থন করেছেন। সুতরাং লর্ড হার্ডিঞ্জ ইংরেজিভাষায় শিক্ষাগ্রহণে আরো উৎসাহ দেবার জন্য ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে জেলা-স্কুল থেকে পাশ করা ছেলেদের চাকরি দেবার নীতি ঘোষণা করেছেন, "সরকারি চাকরিতে নিয়োগের জন্য প্রতি ক্ষেত্রে প্রার্থী নির্বাচনকালে তাঁদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে, যাঁরা ইংরেজি-স্কুলে শিক্ষাগ্রহণ করেছেন এবং বিশেষভাবে যাঁরা সাধারণ ছাত্রের তুলনায় অধিকতর দক্ষতা প্রদর্শন করেছেন।"[১১] এসময়ে (১৮৪৫ খৃঃ) সরকারি অর্থে ছয়টি কলেজ ও আঠারোটি ইংরেজি-স্কুল পরিচালিত হচ্ছিল। ছাত্রসংখ্যা ছিল যথাক্রমে ২,১১৭ ও ২,৪৩৪। এঁদের মধ্যে থেকে বাছাই করে সাম্রাজ্যরক্ষার পাহারাদার-পদে নিয়োগ করা হয়েছিল।

কিন্তু বাংলাদেশের ছাত্ররা আধুনিক জ্ঞানভাণ্ডার মন্থনের জন্য ইংরেজিভাষা সমুদ্রে অবগাহনে কি যথার্থই আগ্রহী ছিলেন? তাঁদের ইংরেজিভাষা-চর্চার লক্ষ্য ছিল কি কেবলমাত্র জ্ঞান-আহরণ? প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় সরকারি স্কুলসমূহের তৎকালীন বার্ষিক প্রতিবেদনে—"পৃথিবীর আকৃতি কি তা জেনে কি লাভটা যে হতে পারে সে-কথা একটি বাঙ্গালী ছেলে (কিছুতেই) বুঝে উঠতে পারে না।...তার মন আগ্রহশূন্য।"[১২] বিদ্যার্থীদের মধ্যে শতকরা 'নিরানব্বুই জনের কাছে শিক্ষা হ'ল এক নিছক ব্যবসায়িক বিনিয়োগের (merely a commercial investment) ক্ষেত্র, যার মুনাফা প্রথমে আসে স্কলারশিপের আকারে (in the form of a scholarship) এবং তারপরে দ্বিতীয়বার তা আসে সরকারি চাকুরি হিসেবে।'[১৩] সুতরাং আশ্চর্য হবার কিছু নেই যদি তাঁরা সর্বরোগহর দাওয়াই-রূপে ইংরেজি-শিক্ষাকে গ্রহণ করেন। প্রকৃতপক্ষে এদেশীয় উচ্চ ও মধ্যবিত্তশ্রেণীর কাছে ইংরেজি-শিক্ষার অর্থ হ'ল লোভনীয় আয় ও সামাজিক প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠার রাজপথ।[১৪] তাই বৃটিশ-সরকার প্রাথমিক শিক্ষার জন্য অর্থ ব্যয় না করে কেবলমাত্র স্বল্পসংখ্যক মানুষের উচ্চশিক্ষার জন্য ব্যয় করেছেন।

বৃত্তি ও চাকরির টোপ দিয়ে ইংরেজিভাষা-রূপ কাঁটা গেলাবার চেষ্টাকে অনেকেই তীব্র সমালোচনা করেছেন। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দের ৫ জুলাই হাউস অব কমন্সে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে হোরেস উইলসন বলেছেন, "প্রকৃত পক্ষে আমরা ইংরেজি-শিক্ষিতদের একটি পৃথক শ্রেণী সৃষ্টি করেছি, যাঁদের দেশের মানুষের প্রতি কোনো সহানুভূতি নেই।"[১৫] এ.পি. হয়েল প্রশ্ন করেছেন, "এই মুষ্টিমেয়কে উচ্চশিক্ষিত করে ব্যাপক জনগণকে অশিক্ষিত রাখার পন্থাটি শ্রেণীতে শ্রেণীতে ব্যবধান বাড়াবে না কমাবে?"[১৬] মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের দাবিকে সমর্থন করে নেপালের বৃটিশ রেসিডেন্ট বি. এইচ. হজসন লিখেছেন, ইংরেজিভাষায় শিক্ষাদান শিক্ষাকে একচেটিয়া করে রাখতে সাহায্য করবে এবং পরিণতিতে মুষ্টিমেয়ের দ্বারা জনসমাজের বৃহত্তম অংশ নিপীড়িত হবে। তাঁর মতে যাঁরা ইংরেজিভাষার পক্ষাবলম্বী তাঁরা শিক্ষাকে একচেটিয়া করতে ও উৎপীড়নের সহায়ক হতে সাহায্য করছেন।[১৭]

ইংরেজিভাষা ও দেশীয় ভাষার পক্ষাবলম্বীদের মতবিরোধের কারণ হ'ল ইংরেজিভাষার মাধ্যমে সমাজের অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে উচ্চশিক্ষা-বিস্তার অথবা দরিদ্রশ্রেণীর মধ্যে মাতৃভাষায় জনশিক্ষা প্রসার। সমালোচনার জবাবে বৃটিশ সরকারের শিক্ষাবিভাগের কর্মকর্তারা ইংরেজিভাষার পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করতে গিয়ে 'নিম্নমুখী পরিস্রুতি তত্ত্ব' (Downward Filtration Theory)-কে সজোরে আঁকড়ে ধরেছেন। এদেশে 'নিম্নমুখী পরিস্রুতি তত্ত্বের' প্রবক্তা হলেন জেনারেল কমিটির সভাপতি জে. এইচ. হ্যারিংটন এবং তাঁকে সমর্থন করেছেন কমিটির সম্পাদক এইচ. এইচ উইলসন। তাঁদের অনুসৃত নীতির প্রতি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় সমর্থন জ্ঞাপন করে লণ্ডনের কোর্ট অব ডিরেক্টর্স ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের ২৯ সেপ্টেম্বরের ডেসপ্যাচে বলেছেন, "ইংরেজিভাষায় বিস্তৃত চর্চার মাধ্যমে জ্ঞান-অর্জনের সুযোগ কেবলমাত্র স্বল্পসংখ্যক দেশীয় ব্যক্তিদের জন্য রাখতে হবে এবং যাঁরা ইংরেজিতে শিক্ষিত হবেন, তাঁরা স্কুল-কলেজের শিক্ষক রূপে অথবা লেখক ও অনুবাদক রূপে তাঁদের অর্জিত জ্ঞানের দ্বারা জনসাধারণকে সুশিক্ষিত করতে সক্ষম হবেন।"[১৮]

শিক্ষা ওপর থেকে নীচে চুঁইয়ে নামবে—জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করার জন্য এই তত্ত্ব বারবার উচ্চারণ করেছেন ইংরেজিভাষার সমর্থনকারীরা। তাঁদের মতে সমাজের উচ্চশ্রেণীর মধ্যে সর্বপ্রথমে ইউরোপীয় শিক্ষা ইংরেজিভাষায় দেওয়া উচিত। তারপর তাঁদের মাধ্যমে শিক্ষার আলো জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়বে। জেলার ইংরেজি-স্কুলে ও প্রাদেশিক কলেজে ইংরেজিতে শিক্ষা

গ্রহণের শেষে শিক্ষিত ব্যক্তিরা মাতৃভাষায় শিক্ষা-বিস্তারের কাজে আত্মনিয়োগ করবেন। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দের ৩১ জুলাই মেকলে তাঁর 'মিনিটে' লিখেছেন, "এদেশের দরিদ্রশ্রেণীর মানুষকে শিক্ষিত করা বর্তমানে আমাদের লক্ষ্য নয়; কারণ আমাদের অর্থাভাব। তাই আমরা কেবলমাত্র কিছু ব্যক্তিকে ইংরেজিতে শিক্ষিত করতে চাই। যাঁরা তাঁদের অর্জিত জ্ঞানের দ্বারা দেশের মানুষকে শিক্ষিত করবেন।"[১৯] তিনি ১৮৩৭ সালের ৩০ আগষ্টের 'মিনিটে' পুনরায় বলেছেন, "আমার মতে আমরা বর্তমানে এমন এক নীতি গ্রহণ করেছি যা ধীরগতিসম্পন্ন হলেও দেশীয় ভাষায় সৎ পুস্তক প্রণয়নে সাহায্য করবে। সেকারণে আমরা আলোকপ্রাপ্ত দেশীয় ব্যক্তি গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয়েছি।"[২০]

ট্র্যাভেলিয়ান বলেছেন, "ইরেজি-শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ইংরেজি-শিক্ষা প্রবাহের দ্বারা সমগ্র দেশ নবশক্তিতে উজ্জীবিত হবে। ধনী, ব্যবসায়ী ও শিক্ষিত ব্যক্তিরা প্রথমে উপকৃত হবেন; একদল শিক্ষককে শিক্ষণ-কাজে অভিজ্ঞ করার শিক্ষা দেওয়া হবে; আঞ্চলিক ভাষায় রচনার সংখ্যা দ্বিগুণ হবে এবং এই সকল কাজের দ্বারা আমরা যথাসময়ে শহর থেকে গ্রামে, স্বল্পসংখ্যক থেকে বহু-সংখ্যক ব্যক্তির কাছে শিক্ষা পৌঁছে দিতে সক্ষম হবো।"[২১] ট্র্যাভেলিয়ান অন্যত্র বলেছেন, "আমাদের লক্ষ্য হ'ল একদল ব্যক্তিকে শিক্ষিত করা যাঁরা ইউরোপীয় জ্ঞানের আলো মাতৃভাষার মাধ্যমে এশিয়ার মানুষের কাছে পৌঁছে দেবে।"[২২] জেনারেল কমিটির একজন প্রভাবশালী বাঙালি সদস্য প্রসন্ন কুমার ঠাকুর 'নিম্নমুখী পরিস্রুতি তত্ত্ব'কে সমর্থন করে বলেছেন যে, "ভারতের জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থা গড়ে তোলার পক্ষে এই পদ্ধতি ভিন্ন অন্য কোনো পদ্ধতি নেই।"[২৩]

একই কথা শুনিয়েছেন লর্ড অকল্যাণ্ড। তাঁর মতে, "যাঁদের লেখাপড়ার সুযোগ রয়েছে এবং যাঁরা জনসাধারণের কাছে শিক্ষা পৌঁছে দেবেন, সমাজের কেবলমাত্র সেই উচ্চশ্রেণীর মধ্যে উচ্চতর শিক্ষা বিস্তারের জন্য সরকারি প্রয়াস অবশ্যই সীমাবদ্ধ রাখতে হবে।"[২৪] এই তত্ত্বের কট্টর সমর্থক লর্ড এলেনবরো তাঁর 'মিনিটে' লিখেছেন, "শিক্ষা ও সভ্যতা উচ্চশ্রেণী থেকে নিম্নশ্রেণীতে নেমে আসতে পারে। ...কিন্তু কখনো তা নিম্নশ্রেণী থেকে উচ্চশ্রণীতে যাবে না। এবং শুধু যদি নিম্নশ্রেণীকেই শিক্ষিত করে তোলা হয়, তাহলে তা ভয়ঙ্কর আলোড়ন সৃষ্টি করবে যার প্রথম শিকার হবে বিদেশীরা। সুতরাং শিক্ষা-প্রসারের বাসনা যদি থাকে, তাহলে উচ্চশ্রেণীকে শিক্ষিত করে তোলার চেষ্টাই প্রথমে করা উচিত।"[২৫] অর্থাৎ নিম্নশ্রেণী শিক্ষিত হলে শোষণ-বঞ্চনা, অধিকার-মর্যাদা

সম্পর্কে সচেতন হবেন এবং তাঁদের উত্তোলিত হাতের আঘাতে সাম্রাজ্যবাদের ভিত্তিমূল নড়ে উঠবে। সুতরাং তাঁদের বিদ্রোহ থেকে ভারত-উপনিবেশকে রক্ষা করতে হলে নিম্নশ্রেণীকে শিক্ষাদান নৈব নৈব চ। বরং ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণ বজায় রাখতে হলে ইংরেজ-সরকারের সহযোগী শক্তি এদেশীয় অভিজাতশ্রেণীকে শিক্ষিত করা প্রয়োজন।

তাই এলেনবরো অভিযোগ করেছেন যে, সরকার উচ্চশ্রেণীকে অবহেলা করে নিম্নশ্রেণীর কাছে শিক্ষার আলো পৌঁছে দেবার চেষ্টা করছেন। কিন্তু এই ভিত্তিহীন অভিযোগের জবাব দিতে গিয়ে ডি. পি. আই. গর্ডন ইয়ং বলেছেন, "সরকারের বিরুদ্ধে এধরণের অভিযোগ সবিস্ময়ে এই প্রথম আমি শুনছি।… বস্তুত এর বিপরীত অভিযোগটিই বেশি পরিচিত।…মধ্য ও ধনবান শ্রেণীর শিক্ষায় আগ্রহ-সঞ্চার ও তাঁদের সুযোগ-সুবিধা-দানের প্রচেষ্টা সম্প্রতি কয়েক বছর বহুগুণ বেড়ে গেছে। সরকার বহু নতুন ইংরেজি-বিদ্যালয়, বেশ কয়েকটি নতুন কলেজ ও একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেছেন —সবগুলিই অশ্রমজীবী শ্রেণীগুলির সুবিধার্থে (···all for the benefit of the non-labouring class)।"[২৬] ইয়ং নিজেও ছিলেন 'নিম্নমুখী পরিস্রুতি তত্ত্বের' সমর্থক। তাই তিনি এলেনবরোকে আশ্বস্ত করে বলেছেন, "যাঁরা দেশী বিদ্যালয়ের (অর্থাৎ মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার) সমর্থক, তাঁরা এর মধ্য দিয়ে শিক্ষা ও সভ্যতা নীচু শ্রেণী থেকে ওপরের শ্রেণীতে উঠুক এমন কিছু একটা ঘটাতে চায় বলে আমি মনে করি না। বরং উচ্চশ্রেণীর জন্য যেসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ইতিমধ্যে চালু হয়েছে তাদের কার্যকলাপের গণ্ডি প্রসারিত করে ক্রমশ নীচের দিকে নিয়ে গিয়ে জনসাধারণকে মানুষেতর বা ইয়াহুর অবস্থা থেকে কিছুটা উন্নত করাই উদ্দেশ্য।"[২৭]

মাতৃভাষায় অজ্ঞ থেকে ইংরেজিভাষায় দক্ষতা অর্জন করে এদেশীয় ইংরেজি শিক্ষিত ব্যক্তিরা মাতৃভাষায় শিক্ষকতা করবেন ও গ্রন্থ রচনা করবেন —এই উদ্ভট যুক্তিজালকে ছিন্ন করে উইলিয়ম অ্যাডাম লিখেছেন, "একথা বলা হতে পারে, এদেশীয় সমাজের নিম্নশ্রেণীদের জন্য পাঠশালায় শিক্ষাদানের পরিবর্তে উচ্চশ্রেণীর জন্য প্রথমে সরকারি স্কুল স্থাপন করা হোক; কারণ জ্ঞান উঁচু থেকে নীচে নামে নীচ থেকে ওপরে ওঠে না; কাজেই এই মত অনুসারে আমাদের জেলার সদরে বর্তমানে স্কুল প্রতিষ্ঠা করতে হবে, তারপর পরগণায় ও শেষ পর্যন্ত গ্রামের স্কুল, যাতে এই পদ্ধতিতে ক্রমশ উন্নত স্কুল-স্থাপনের দ্বারা শিক্ষার সম্প্রসারণ সম্ভব হয়। এই পদ্ধতির বিরুদ্ধে প্রথম আপত্তি হ'ল

যে, এতে হিন্দু ও মুসলমানের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা যা আমাদের শাসনের বহু পূর্ব থেকেই ছিল ও আমাদের শাসনাধীনে থেকে স্বাধীনভাবে পুরুষানুক্রমে দেশীয় চরিত্র গঠন করছিল তাকেই অগ্রাহ্য করা। এই বাস্তব ঘটনা সত্ত্বেও এটা ধরে নেওয়া হয়েছিল যে স্কুল, শিক্ষক, বই অর্থাৎ নৈতিক ও মানসিক উন্নতির সমস্ত কিছুর জন্য সমগ্র দেশকে আমাদের কাছে কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। এবং এই মতানুসারে এঁদের উন্নতিতে স্থানীয় প্রাচীন ব্যবস্থার যা কিছু দান আছে তা আমরা অস্বীকার করছি। এদেশে আমাদের হিন্দু ও মুসলমানদের নিয়ে চলতে হবে। প্রথমোক্তরা পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্য জাতি আর শেষোক্তদের ইতিহাসের উজ্জ্বলতম দিনে তাঁরা ছিলেন বিজ্ঞানের উদ্যোক্তা; আর উভয়েই তাঁদের সভ্যতার বর্তমান ক্ষীয়মান অবস্থায় যে-শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি থেকে তাঁরা জ্ঞান অর্জন করছেন, সেগুলির প্রতি তাঁদের ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা বজায় রেখেছে। এই স্কুলগুলির সম্পর্কে আমি আলোচনা করেছি এবং এগুলির প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করা আমাদের পক্ষে অবিবেচনার কাজ হবে।"[২৮]

যাঁরা মনে করেন যে, এদেশে জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলতে হলে শিক্ষা ওপর থেকে নীচে নিয়ে যাওয়া প্রয়োজন এবং সেকারণে প্রথমে জেলা-স্কুল, তারপরে পরগণা-স্কুল ও সর্বশেষে গ্রামে স্কুল স্থাপন করতে হবে, তাঁদের অ্যাডাম ব্যঙ্গ করে বলেছেন, "তাহলে এই সিদ্ধান্ত করতে হয় যে, প্রাদেশিক কলেজ প্রতিষ্ঠা না করে আমাদের জেলা-স্কুল স্থাপন করা উচিত নয়, সেরকম জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় না গড়ে প্রাদেশিক কলেজ প্রতিষ্ঠা করা উচিত নয় এবং আন্তর্জাতিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কথা চিন্তা না করে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকল্পনা করা অর্থহীন হবে।"[২৯] সুতরাং সমাজের ওপরতলায় শিক্ষা প্রবর্তন করলে কালক্রমে সেই শিক্ষা নীচের তলার মানুষের কাছে পৌঁছুবে — এই চিন্তাকে তিনি হাস্যকর মনে করে সুপারিশ করেছেন, "উন্নতির শুরু ব্যক্তিকে নিয়ে, পরে তা জনগণের মধ্যে প্রসারিত হয়। জনগণকে যাঁরা প্রেরণা দেন, তাঁরা সাধারণত উচ্চশ্রেণীর অর্থাৎ সমাজের চিন্তাশীল-শ্রেণীর লোক, আর তাঁরা অন্তত এদেশে উচ্চ-অবস্থার কিংবা ধনাঢ্য সম্প্রদায়ের নয়। এটা সত্য নয় যে, উচ্চতর পর্যায় থেকে নীচে নামতে হবে। বরং নিম্নতর স্তর থেকে শিক্ষিত ছাত্র ওপরে তুলে না আনা পর্যন্ত উচ্চতর পর্যায়ের সাফল্য নিশ্চিত হয় না। সেকারণে তাদের ওপরে আগে থেকে দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। শিশুরা তো আর বর্ণমালা শেখার জন্য কলেজে যাবে না। শিক্ষা-কাঠামোটাকে উঁচু ও

শক্ত করতে হলে ভিত্‌টা হতে হবে চওড়া ও গভীর ; সকল শ্রেণীর শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ও সকল পর্যায়ের শিক্ষার সমন্বয়েই লাভ হবে প্রকৃত ফল।"[৩০] কিন্তু অ্যাডামের সুপারিশ অগ্রাহ্য করে নিম্নমুখী পরিস্রুতি তত্ত্বের সমর্থনে ১৮৩৮-৩৯ সালের জেনারেল কমিটির বার্ষিক রিপোর্টে বলা হ'ল, "এদেশীয় শিক্ষা সম্পর্কে আমাদের অভিজ্ঞতা ও সতর্ক বিবেচনা আমাদের কার্যক্রমকেই সমর্থন করে। তা হ'ল এই যে, জেলার সদর শহরে উচ্চ ও মধ্যবিত্তশ্রেণীর মধ্যে শিক্ষা-বিস্তারের জন্য আমাদের সমগ্র প্রয়াস সর্বপ্রথমে কেন্দ্রীভূত করতে হবে এবং তাঁদের দ্বারা গ্রামস্থ আঞ্চলিক ভাষার স্কুল সমৃদ্ধ হবে।"[৩১]

গভর্নর জেনারেল জন ফরেন্সের উপস্থিতিতে রেঃ. লালবিহারী দে নিম্নমুখী পরিস্রুতি তত্ত্বের বিরোধিতা করে বেথুন সোসাইটির ভাষণে বলেছিলেন, "পৃথিবীর কোনো দেশে জ্ঞান কখনো স্বাভাবিকভাবে উঁচু থেকে নীচু শ্রেণীতে পরিস্রুত হয়ে নেমে আসে না। ভারতবর্ষের উচ্চশ্রেণীগুলি, অথবা উচ্চতম শ্রেণী অর্থাৎ ব্রাহ্মণেরা খ্রীষ্টীয় অব্দের হাজার বছর আগে থেকেই শিক্ষিত, তথাপি গত শত প্রজন্মেও এক ফোঁটা জ্ঞান নেমে আসেনি 'to thirty millions' [৩২] রেঃ. দে আরো বলেছেন, "অগভীর রাজনীতিবিদরা যাই ভাবুন না কেন, রেললাইনের জাল কখনও ভারতবর্ষকে ইংলণ্ডের সঙ্গে সংযুক্ত করে রাখতে পারবে না। অথচ আর এক ধরণের জাল আছে যা অনেক বেশি কার্যকরী হবে—তা হ'ল, এই উপমহাদেশের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত বিদ্যালয়ের জাল। অসংখ্য বিদ্যা-প্রতিষ্ঠানকে এইভাবে জালের মতন সারা দেশ জুড়ে বিছিয়ে দিতে পারলে ভারতবর্ষের হৃদয় চিরকালের জন্য ইংলণ্ডের সঙ্গে বাঁধা পড়ে যাবে।"[৩৩] অর্থাৎ রেঃ. দে অ্যাডামের ন্যায় শাসক-শাসিতের মধ্যে প্রীতিপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনকল্পে জনশিক্ষার পক্ষে সওয়াল করেছেন। কারণ জনশিক্ষার প্রতি অবহেলা প্রদর্শন 'বিলাস ও দারিদ্র্যের মধ্যে বিরোধ তীব্রতর করে একসময় সমাজতন্ত্রের দিকের পথকে নিশ্চিত করে তুলবে।'[৩৪] তাই রেঃ. জেমস লঙ সরকারকে জনশিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণের অনুরোধ করেছেন। তিনি লিখেছেন, "সমাজের উচ্চস্তরের মানুষেরা যখন জনগণের শিক্ষার প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন তখন এই বোবা জন্তু—অর্থাৎ রায়তদের দায়িত্ব রাষ্ট্রের উপরই এসে পড়ে।"[৩৫]

কিন্তু রায়ত-কৃষকদের শিক্ষিত করার চিন্তা-ভাবনা তদানীন্তন সরকারের ছিল না। কেবলমাত্র জন্মগত অধিকারের দ্বারা মাতৃভাষায় শিক্ষাদানে রত হওয়া যায় না কিংবা গ্রন্থ-রচনা করা যায় না। সেজন্য মাতৃভাষায় একাগ্র অনুশীলনের প্রয়োজন। অথচ বৃটিশ সরকার দেশীয় ভাষা-চর্চার প্রয়াসকে নানা

ভাবে প্রতিহত করে বিদেশী ভাষা শিক্ষার মাধ্যমে দেশীয় ভাষায় বিদ্যাদানের কথা সাড়ম্বরে প্রচার করেছেন এবং দেশীয় যুবকেরা মাতৃভাষায় অজ্ঞ থেকে ইংরেজি-ভাষায় জ্ঞান অর্জনের দ্বারা সুখ ও সমৃদ্ধির স্বপ্ন দেখেছেন। কিন্তু এর বিষময় ফল জাতীয় জীবনে লক্ষ্য করা যায়। এসময়কার একটি ঘটনা উল্লেখ করলে নিম্নমুখী পরিস্রুতি তত্ত্ব কিভাবে সমাজজীবনে ঘুণ ধরিয়েছিল. তা উপলব্ধি করা যাবে। হুগলী মহসীন কলেজের অধ্যক্ষ মিঃ. সাদারল্যাণ্ডের সুপারিশে কমিশনার মিঃ. ডোন্‌লি দারোগার পদে হিন্দু কলেজের প্রাক্তন ছাত্র রাজেন্দ্রনাথ মিত্রকে নিয়োগ করেন। কিন্তু তিনি ভালোভাবে বাংলা পড়তে জানতেন না। মিঃ. ডোনলি মাতৃভাষায় লজ্জাকর অজ্ঞতার জন্য রাজেন্দ্রনাথকে উচ্চতর পদে উন্নীত করেননি। ফলে ইংরেজি ভাষায় দক্ষ হওয়া সত্ত্বেও অর্থাগমের পথ সুগম না হওয়ায় শ্রী মিত্র মাতৃ-ভাষাচর্চায় মনোযোগী হন এবং কিছুদিনের মধ্যে বাংলায় লেখা ও পড়ায় দক্ষতালাভের দ্বারা সেরেস্তাদারের পদে উন্নীত হন। এই লজ্জাজনক ঘটনার প্রতিক্রিয়া ঘটেছে তৎকালীন সংবাদপত্রে। 'Friend of India' পত্রিকায় 'জনৈক ইংরেজ' ছদ্মনামে মন্তব্য করা হয়েছে (২৯. ২. ১৮৪৪) যে, দেশীয় যুবকদের একথা চিন্তা করা ভুল যে সম্পদ ও প্রতিষ্ঠা-লাভের সোপান হ'ল ইংরেজিভাষা শিক্ষা।[৩৬] সুতরাং 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকা পরামর্শ দিয়েছেন (২২. ৮. ১৮৫০), "ইংলণ্ডীয় বিদ্যাভাসে এতাধিক উপকার কিন্তু স্বীয় ভাষাতে সর্বাগ্রে নিপুণ হইয়া তদনন্তরে ইংলণ্ডীয় ও আরও অপর দেশীয় ভাষাভ্যাস করত সাধ্যানুসারে জ্ঞানোন্নতি করিয়া পারদর্শি হইতে চেষ্টা করা উচিত, কারণ স্বদেশীয় বিদ্যা অগ্রে না শিখিয়া পরদেশীয় ভাষাভ্যাস করিলে দেশীয় ও বিদেশীয় নর সমূহের সমীপে নিন্দনীয় ও উপহাসের যোগ্য ও লজ্জিত হইতে হয়।"[৩৭]

সেকালের শিক্ষা-চিত্র অঙ্কনকালে এদেশীয় ইংরেজি-শিক্ষিত ব্যক্তিদের বাংলা-ভাষায় পাণ্ডিত্য, জ্ঞান ও দক্ষতার আরো কয়েকটি নমুনা উপস্থিত করেছেন রাজনারায়ণ বসু —"আমরা যখন কালেজে পড়িতাম, তখন বাঙ্গালা পড়ার প্রতি কাহারো মনোযোগ ছিল না। যিনি আমাদের পণ্ডিত ছিলেন, তাঁহার সঙ্গে আমরা কেবল গল্প করে সময় কাটিয়ে দিতাম। সুতরাং যখন আমরা কালেজ থেকে বেরুলেম, তখন আমাদের বাঙ্গালা ভাষায় কিছু ব্যুৎপত্তি জন্মে নাই। সে-সময়কার ছাত্রদিগের পক্ষে বাঙ্গালা ভাষা অতি ভীষণ পদার্থ ছিল। আমাদিগের সময়ের কালেজের প্রথম শ্রেণীর একটি ছাত্রকে একদিন কালেজে যাইবার সময়

রাস্তায় একজন সামান্য লোক একটি বাঙ্গালা লেখা পড়িয়া তাহার মর্ম্ম তাহাকে বুঝাইতে অনুরোধ করে। তিনি সে লেখাটি বুঝিতে না পারিয়া তাঁহার এত দূর লজ্জা উপস্থিত হইল যে, ললাটে স্বেদবিন্দু নিঃসৃত হইতে লাগিল। ইহাতে উল্লিখিত ব্যক্তি তাঁহার নিকট হইতে কাগজ ফিরাইয়া লইয়া বলিল, "বাবু! এ ইডিবিডি করা নয়, বাঙ্গালার ঘানি।" একবার এই সময়ের শিক্ষিত আমার একটি বন্ধু বয়স্ক অবস্থায় আমার বাসায় এক দিন আসিয়া বলিলেন, "আজ একটা বড় শুভ সমাচার শুনিলাম।" আমরা আস্তে ব্যস্তে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি সমাচার?" তিনি বলিলেন, "সোমপ্রকাশাদি সম্বাদপত্রে নাকি আন্দোলন হচ্ছে যে তিনটা 'স' উঠে গিয়ে একটা 'স' হবে, তা হলেই আমার বাঙ্গালা লেখার সুবিধা হবে।" তিনি একবার এক সভায় "অভিনন্দন-পত্র" শব্দের পরিবর্তে "রঘুনন্দন-পত্র" বলে ফেলেছিলেন। ঐ সময়ে কালেজে শিক্ষিত কোন ব্যক্তি কোন প্রধান বিদ্যালয়ের বাঙ্গালা ভাষার অধ্যাপকদের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি তাহার সহকারী পণ্ডিতকে ব্যাঘ্র শব্দ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "পণ্ডিত মহাশয়! এই শব্দের উচ্চারণ ব্র্যাঘ্‌ঘ না?" পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন, "উহার উচ্চারণ ব্যাঘ্র।" অধ্যাপক মহাশয় বলিলেন, "আমি তাই ত বলছি—ব্র্যাঘ্‌ঘ ব্র্যাঘ্‌ঘ।" উল্লিখিত সময়ের আর এক ব্যক্তিকে কোন প্রয়োজন উপলক্ষে বক্‌সু খানসামা নামক কোন খানসামার নাম লিখিবার প্রয়োজন হইয়াছিল; তিনি "বক্‌সু" শব্দ কি প্রকারে লিখিবেন ভাবিয়া আকুল। যদি "বক্‌সু" লিখেন, তাহা হইলে লোকে মনে করিবে যে, কি মূর্খ! "কষ" এইরূপ না লিখিয়া "ক্ষ" লিখিলেই হইত, আর যদি "বক্ষু" লিখেন তাহা হইলে লোকে "বক্‌খু" উচ্চারণ করিবার সম্ভাবনা। এইরূপ সাত পাঁচ ভাবিয়া তিনি ইংরাজী অক্ষর X এর সাহায্য লইয়া "বXু" এইরূপ লিখিলেন।"[৩৮]

ইংরেজি-শিক্ষিত ব্যক্তিদের বাংলা-জ্ঞানের বহর দেখে 'সংবাদ ভাস্কর' পত্রিকা তীক্ষ্ণ ক্ষুরধার লেখনী দিয়ে তাঁদের আক্রমণ করেছেন (১৫.১.১৮৫৬), "বিশেষত রীতি ব্যবহারে এমত ঘৃণিত হইয়া পড়িয়াছেন ভদ্র বাঙ্গালিরা তাঁহারদিগের সহিত আলাপ করিতেও চাহেন না, আর আলাপ করিলেই বা সুখ কি? দশটা বাঙ্গালা কহিতে হইলে তাহার মধ্যে সাতটা ইংরাজী শব্দ না দিয়া কথা কহিতে পারেন না, কি দুঃখের বিষয়, যে স্থলে পিতা মাতা বলিতে হইবেক সে স্থলেও "ফাদর, মাদর," বলিয়া বক্তব্য সমাধা করেন, আধুনিক ইংরাজী শিক্ষিত ব্যক্তিগণের ইচ্ছা হয় বাঙ্গালা ভাষায় কোন২ বিষয় লিখিয়া সমাচার পত্রে প্রচার করিবেন কিন্তু লিখিতে বসিলেই দুই চক্ষু ললাট পানে

উঠিয়া যায় অতি ক্লেশে যাহা লিখিয়া পাঠান তাহা পাঠ করিতে পাঠকদিগের শিরোঘর্ম্ম পাদস্পর্শ করে এই ক্ষণে আমরা আধুনিক ছাত্রদিগের যে সকল পত্র পাইতেছি তাহা পাঠ করিতে অত্যন্ত ক্লেশ জ্ঞান হয়, অক্ষরগুলিন যাহা লেখেন তাহা যেন কাক বকের নখ চিহ্ন সাজাইয়া যান, সে সকল অক্ষর পাঠ করা যায় না এবং অনেক চিন্তায় মর্ম্ম গ্রহণ করিতেও সম্পাদকেরা গলদঘর্ম্ম হন অতএব আমরা এইক্ষণে ঐ প্রকার পত্র সকল প্রায় ফেলিয়া দেই কিন্তু যাঁহারা ঐ প্রকার লেখেন তাঁহারদিগের লজ্জা জ্ঞান হয় না ইহাও এক আশ্চর্য্য বিষয়, অনুমান করি তাঁহারা লজ্জাকে জলাঞ্জলি দিয়েছেন।"[৩৯]

তা সত্ত্বেও দেশীয় অভিজাতশ্রেণী মাতৃভাষা-চর্চায় আগ্রহান্বিত হননি, বিদেশী বণিক-শক্তি নিম্নমুখী পরিস্রুতি তত্ত্ব পরিত্যাগ করেননি। অথচ দেশকে যথার্থ শিক্ষিত করতে হলে ওপর থেকে নীচে করুণা-বিতরণ নয়, নীচের মহলকে শিক্ষার আলোয় উজ্জ্বল করতে হলে শিক্ষার ভিত নীচের কঠিন মর্মমূলে প্রোথিত করে তার ওপরে শিক্ষার প্রাসাদ নির্মাণ করতে হবে এবং সেজন্য অ্যাডামের মতে ইউরোপীয় শিক্ষাদর্শে দেশীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির সংস্কার-সাধন ও মাতৃ-ভাষার মাধ্যমে জনশিক্ষার প্রয়োজন। কিন্তু মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ বিদেশী শাসকগোষ্ঠী ও দেশীয় ভূস্বামীশ্রেণী অ্যাডামের প্রস্তাবের মধ্যে সর্বনাশের পদধ্বনি শুনতে পেয়েছিলেন। তাই তাঁর প্রস্তাব অগ্রাহ্য করা হ'ল। সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে অবহেলিত হ'ল জনশিক্ষা। মাতৃভাষা হ'ল 'নিজ ভূমে পরবাসী'। ধীরে ধীরে গড়ে উঠল ইংরেজিভাষার মাধ্যমে উচ্চশিক্ষার প্রাসাদ। তাতে প্রবেশাধিকার ছিল না গ্রামীণ মানুষের। উচ্চশিক্ষার ক্রয়মূল্য দেবার মত আর্থিক ক্ষমতা তাঁদের ছিল না। বৃটিশ-শাসকেরা কিংবা তাঁদের করুণা-নির্ভর বুদ্ধিজীবীরা শ্রেণীস্বার্থে তাঁদের জন্য শিক্ষাকে মাতৃভাষার মাধ্যমে সহজলভ্য করার কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করেননি। তাঁরা শিক্ষাকে 'দেশ-শাসনের বিশেষ অধিকার, তাঁদের আধিপত্য বজায় রাখার এবং যেসব মূল্যবোধের ওপর এটি প্রতিষ্ঠিত সেগুলিকে স্থায়ী করার হাতিয়ার হিসেবে'[৪০] ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন।

তাই পরাশ্রয়ী বুদ্ধিজীবীরা শিক্ষাকে সমাজের একটি সংকীর্ণ অংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রাখতে প্রয়াসী হয়ে নিম্নমুখী পরিস্রুতি তত্ত্বকে সমর্থন করেছিলেন। এমন কি প্রাতঃস্মরণীয় স্বাধীনচেতা শিক্ষাবিদ্ বিদ্যাসাগরও সমকালীন বুদ্ধিজীবীদের সংকীর্ণ স্বার্থ-চেতনাকে অতিক্রম করতে পারেননি। শহরকেন্দ্রিক আধুনিক শিক্ষাকে সম্প্রসারণ করার জন্য তৎকালে তিনি প্রধান ভূমিকা গ্রহণ

করলেও সামন্ততান্ত্রিক সমাজ-কাঠামো পরিবর্তনে জনশিক্ষার গুরুত্ব তাঁর প্রাগ্রসর চেতনায় ধরা পড়েনি। সেকারণে নিম্নমুখী পরিস্রুতি তত্ত্বের সমর্থনে বাংলা-সরকারের কাছে লিখিত এক চিঠিতে (২৯.৯.১৮৫৯) বিদ্যাসাগর বলেছেন, "আমার বিনীত নিবেদন এই যে, বঙ্গদেশে শিক্ষা-বিস্তারের সর্বোত্তম না হলেও একমাত্র কার্যকর উপায় হ'ল দেশের উচ্চশ্রেণীর জনগণের মধ্যে ব্যাপকভাবে শিক্ষার প্রসার। একশত শিশুকে সামান্য লেখাপড়া ও গণিত শেখানোর চেয়ে একটিমাত্র বালককে ঠিকমতো শিক্ষিত করে তুলতে পারলে তা জনগণের প্রকৃত শিক্ষার সহায়ক হবে।"[৪১] হায়! এই সামান্য শিক্ষাই যে গ্রামীণ শোষকদের শোষণ থেকে দরিদ্র কৃষকদের রক্ষা করতে পারতো, তা করুণাসাগর বিদ্যাসাগর দুর্ভাগ্যবশত উপলব্ধি করতে পারলেন না।

বিদ্যাসাগর যে-আশা নিয়ে নিম্নমুখী পরিস্রুতি তত্ত্ব সমর্থন করেছিলেন, তা সার্থক হ'ল না। ওপর থেকে শিক্ষার স্রোত প্রবাহিত হ'ল না নীচের দিকে; গ্রামের মাটি সিক্ত হয়ে নব কিশলয়ে ছেয়ে গেল না গ্রাম-বাংলা। স্বল্পসংখ্যক ইংরেজি-শিক্ষিত ব্যক্তির মাধ্যমে শ্রমিক-কৃষকের সন্তান-সন্ততির কাছে ইউরোপীয় শিক্ষার আলো পৌঁছুলো না। তাই বঙ্কিমচন্দ্র নিম্নমুখী পরিস্রুতি তত্ত্বের তীব্র সমালোচনা করে বলেছিলেন, "এ কথার তাৎপর্য্য এই যে, কেবল উচ্চশ্রেণীর লোকেরা সুশিক্ষিত হইলেই হইল, অধঃশ্রেণীর লোকদিগকে পৃথক শিখাইবার প্রয়োজন নাই; তাহারা কাজে কাজেই বিদ্বান হইয়া উঠিবে। যেমন শোষক পদার্থের উপরিভাগে জলসেচ করিলেই নিম্নস্তর পর্য্যন্ত সিক্ত হয়, তেমনি বিদ্যারূপ জল, বাঙ্গালী জাতিরূপ শোষক মৃত্তিকার উপরিস্তরে ঢালিলে, নিম্নস্তর অর্থাৎ ইতর লোক পর্য্যন্ত ভিজিয়া উঠিবে। জল থাকাতে কথাটা একটু সরস হইয়াছে বটে। ইংরাজি শিক্ষার সঙ্গে এরূপ জলযোগ না হইলে আমাদের দেশের উন্নতির এত ভরসা থাকিত না। জল ও অগাধ, শোষকও অসংখ্য। এতকাল শুষ্ক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা দেশ উৎসন্ন দিতেছিল, এক্ষণে নব্য সম্প্রদায় জলযোগ করিয়া দেশ উদ্ধার করিবেন। কেন না তাঁহাদিগের ছিদ্রগুণে ইতর লোক পর্য্যন্ত রসার্দ্র হইয়া উঠিবে। ...সে যাই হউক, আমাদিগের দেশের লোকের এই জলময় বিদ্যা যে এতদূর গড়াইবে, এমত ভরসা আমরা করি না। বিদ্যা, জল বা দুগ্ধ নহে যে উপরে ঢালিলে নীচে শোষিবে।"[৪২]

১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে বাংলাদেশে যখন শিক্ষার বাহনরূপে মাতৃভাষার পরিবর্তে ইংরেজিভাষাকে সরকারি স্বীকৃতি দিয়ে রায়ত-কৃষকদের শিক্ষালাভের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করার জন্য নিম্নমুখী পরিস্রুতি তত্ত্ব উপস্থিত করা হয়, তখন ইষ্ট

ইণ্ডিয়া কোম্পানি শাসিত বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে বোম্বাই নেটিভ এডুকেশন সোসাইটি প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন যে, এদেশীয় ছাত্রদের প্রথমে মাতৃভাষায়, ব্যাকরণে ও গণিতে জ্ঞান অর্জন করতে হবে এবং মাতৃভাষায় পরীক্ষা দিয়ে উত্তীর্ণ হলে তাঁরা ইংরেজি-স্কুলে ভর্তি হতে পারবেন।[৪৩] তাঁদের মতে জনসাধারণের মধ্যে কেবলমাত্র ইংরেজিভাষায় পাশ্চাত্য শিক্ষা-বিস্তার সম্ভব নয়। সুতরাং এদেশীয়দের নৈতিক ও মানসিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে ইংরেজিভাষার স্থান দ্বিতীয়।[৪৪] তাই ইংরেজিভাষায় জ্ঞান অর্জন করতে হলে প্রথমে মাতৃভাষায় শিক্ষাগ্রহণ করতে হবে।

এডুকেশন সোসাইটির রিপোর্টে (১৮২৫-২৬ খৃঃ) বলা হয়েছে, পাশ্চাত্য সাহিত্য ও বিজ্ঞান সম্পর্কিত জ্ঞান "মাতৃভাষায় প্রত্যেকটি ছাত্রকে সহজেই বোধগম্য করা যায়। সুতরাং এবিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, তারফলে ছাত্র ও শিক্ষকের উভয়েরই সময় ও শ্রম বাঁচে।...এবং এটাও স্পষ্ট প্রতীয়মান যে, ইংরেজিভাষা কিছুতেই এদেশীয়দের শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে সাবলীল মাধ্যম রূপে গৃহীত হতে পারে না।[৪৫] এর সমর্থনে ক্যাপ্টেন ক্যাণ্ডি বলেছেন, "ভারতবাসীদের বুদ্ধিবৃত্তি ও নৈতিক মান উন্নয়নকালে ইংরেজিভাষা-চর্চায় উৎসাহদান কিংবা অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করা যুক্তিসঙ্গত নয়। আমার মতে এই ভাষা শিক্ষার মাধ্যম হওয়া উচিত নয়। যে-ভাষায় জনসাধারণকে শিক্ষিত করা হবে, আমার মতে তা অবশ্যই মাতৃভাষা হওয়া উচিত, ইংরেজি কিংবা সংস্কৃত নয়।"[৪৬]

১৮৪০ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই নেটিভ এডুকেশন সোসাইটির পরিবর্তে বোর্ড অব এডুকেশন সমগ্র রাজ্যের শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করে ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সেই দায়িত্ব পালন করেছেন এবং সোসাইটির ভাষা-নীতি অব্যাহত রেখেছেন। কিন্তু ১৮৪৫ খৃঃ থেকে ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে ভাষা-বিতর্ক সৃষ্টি হয়। এই রাজ্যের জনসাধারণ মেকলের অভিমতকে গ্রহণ করতে রাজি ছিলেন না। তাঁরা মনে করতেন যে, মাতৃভাষায় শিক্ষাবিস্তারের জন্য সরকারের সমগ্র শক্তি নিয়োজিত হওয়া উচিত। এমন কি তাঁদের মধ্যে একজনও প্রাচ্য-ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম করার কোনো পরামর্শ দেননি। তার ফলে যে ভাষা-বিতর্ক সৃষ্টি হ'ল, তা মাতৃভাষা বনাম ইংরেজিভাষা, বাংলাদেশের ন্যায় প্রাচ্যভাষা বনাম ইংরেজিভাষা নয়। এই ভাষা-বিতর্কে মাতৃভাষার জয়লাভ যে বোম্বাই রাজ্যের জনসাধারণের পক্ষে কল্যাণকর হয়েছিল, তা পরের পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ সারণী[৪৭] থেকে উপলব্ধি করা যায় :

১৮৪৫ খৃঃ	বাংলা	বোম্বাই
জনসংখ্যা	৩৭,০০০,০০০	১০,৫০০,০০০
শিক্ষাখাতে ব্যয়	৪,৭৭,৫৯৩ টাকা	১,৬৮,২২৬ টাকা
সরকারি দেশীয় ভাষার স্কুলে ছাত্রসংখ্যা	৫,৪৭০	১০,৬১৬
ইংরেজি স্কুলে ছাত্রসংখ্যা	৩,৯৫৩	৭৬১

স্থতরাং শিক্ষার মাধ্যম রূপে মাতৃভাষা গ্রহণের দ্বারা বোম্বাই লাভবান হয়েছে, আর বাংলাদেশ বিদেশী ভাষা গ্রহণের ফলে চলৎ শক্তি হারিয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হ'ল, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির লণ্ডনস্থ কোর্ট অব ডিরেক্টর্স বাংলাদেশে ও বোম্বাইতে দুই ভিন্ন নীতি গ্রহণ করেছিলেন কেন? এই প্রশ্নের উত্তর নিহিত রয়েছে দুই অঞ্চলের ভূমি-ব্যবস্থার মধ্যে। বোম্বাই রাজ্যে রায়তওয়ারি বন্দোবস্তের জন্য সমগ্র রাজ্যের জমি রাজা-মহারাজারা কুক্ষিগত করতে পারেননি, সেখানে জমির মালিক ছিলেন আইনত রায়তেরা। কিন্তু বাংলাদেশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের জন্য এদেশের জমির মালিক হয়েছিলেন নয়া ভূস্বামী শ্রেণী এবং তার ফলে কৃষক-বিদ্রোহ।

বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে জমিদার-মহাজন ও কোম্পানির শোষণ-অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময়ে বারে বারে দেখা দিয়েছে কৃষকদের সশস্ত্র বিদ্রোহ। মেদিনীপুর, ত্রিপুরা, সন্দীপ, পার্বত্য চট্টগ্রাম, রংপুর, যশোহর, খুলনা, বীরভূম, বাঁকুড়া, বাখরগঞ্জ, ময়মনসিংহ, সিরাজগঞ্জ প্রভৃতি অঞ্চলের কৃষকেরা শোষণ-শৃঙ্খলকে ভেঙে ফেলার জন্য কখনো সংগঠিতভাবে, কখনো অসংগঠিতভাবে আধুনিক মারণাস্ত্রে সুসজ্জিত ও যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী সুসংগঠিত শক্রর সম্মুখীন হয়েছেন; তাঁদের মৃত্যুপণ-সংগ্রামে অদম্য উৎসাহ-প্রেরণা দিয়েছে সন্ন্যাসী-বিদ্রোহ, চোয়াড়-বিদ্রোহ, ওয়াহাবী-বিদ্রোহ, ফরাজী-বিদ্রোহ, সাঁওতাল-বিদ্রোহ, নীল-বিদ্রোহ ও ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ। অত্যাচার-উৎপীড়নের অবসানের জন্য তাঁত-শিল্পী, রেশম-শিল্পী, লবণ-কারিগর, আফিম-চাষী প্রভৃতি সকলেই রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম করেছেন। এই সব বিদ্রোহ-সংগ্রামকে রক্তের বন্যায় ডুবিয়ে দেবার জন্য বিদেশী শাসক ও দেশীয় জমিদারেরা চরম অত্যাচারের ষ্টীম-রোলার চালিয়েছেন। তাঁদের সঙ্গে সহযোগিতা করেছেন মধ্যস্বত্বাধিকারীরা বা মধ্যশ্রেণী। কিন্তু বাংলার কৃষক ভীত হলেন না। শোষক-গোষ্ঠীর পশু শক্তির কাছে তাঁরা পরাজিত হলেও আন্দোলন, সংগ্রাম ও বিদ্রোহের পথ পরিত্যাগ করলেন না। তাই অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে উনিশ শতকের প্রায় শেষ পর্যন্ত মুক্তিকামী কৃষকের বন্ধন-মুক্তির আকাঙ্ক্ষা

ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়েছে বাংলাদেশের আকাশে-বাতাসে; তাঁদের পদভারে কম্পিত হয়েছে বাংলার মাটি। সুতরাং বিদ্রোহী কৃষক-সন্তানদের মাতৃভাষায় শিক্ষিত করে এদেশকে দ্বিতীয় আমেরিকা তৈরি করার কোনো সদিচ্ছা বাংলাদেশের কোম্পানি-সরকারের ছিল না; আর তাঁদের সহযোগী দেশীয় ভূস্বামী শ্রেণীও একই কারণে জনশিক্ষার বিরোধী ছিলেন।

সুতরাং বেনিয়া-সরকার সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কায় বাংলাদেশে জনশিক্ষার জন্য অর্থব্যয়ে কুণ্ঠিত ছিলেন। ফলে আঞ্চলিক ভাষার স্কুলের দরজা ক্রমশ বন্ধ হতে থাকে এবং ছাত্রসংখ্যাও সেই অনুপাতে কমতে থাকে; অন্যদিকে বোম্বাই রাজ্যে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য অর্থব্যয়ের পরিমাণ বর্দ্ধিত হওয়ায় সেখানে প্রাথমিক স্কুলের ছাত্রসংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি হয়। ১৮৫৪ সালে যেখানে বোম্বাইতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা ছিল ১২,০০০, সেখানে বাংলাদেশে প্রাথমিক স্কুলের ছাত্রসংখ্যা ছিল ১,৪০০। এই স্কুলগুলির প্রতি সরকারি সাহায্যের কৃপণতা লক্ষ্য করে Calcutta Review পত্রিকা মন্তব্য করেছেন (জুন, ১৮৫৪), "বাংলাদেশের জনসংখ্যা যেখানে ৩ কোটি ৭০ লক্ষ, সেখানে মাতৃভাষায় শিক্ষার জন্য সরকার বার্ষিক ৮,০০০ টাকা মাত্র বরাদ্দ করেছেন। এই অর্থ রাজস্ব বিভাগের কালেক্টারের বেতনের এক-তৃতীয়াংশ মাত্র! ২০০ কারাবন্দীর জন্য ব্যয়ের সমতুল্য।"[৪৮] মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের কথা প্রায়শ বলা হলেও তা শূন্যে মিলিয়ে গেল। 'শাসন-যন্ত্রের দায়িত্বশীল পদে অধিষ্ঠিত প্রায় প্রত্যেক ব্যক্তি দেশীয় ভাষা-শিক্ষাকে বাঞ্ছনীয় বলে মত প্রকাশ করলেও ১৮৪৪ সালের পরে ক্রমে ক্রমে ইংরেজি সরকারি কাজকর্মের ভাষা হয়ে উঠল।'[৪৯]

ইংরেজি-শিক্ষিতদের সরকারি চাকরি-লাভ সম্পর্কে হার্ডিঞ্জের ঘোষণায় আনন্দিত হয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের ১৪ ডিসেম্বর রাজা কালীকৃষ্ণ দেবের নেতৃত্বে লর্ড হার্ডিঞ্জকে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। এই স্মারকলিপিতে স্বাক্ষর করেছেন দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রমানাথ ঠাকুর, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রেঃ. কে. এম. ব্যানার্জী, প্যারীচাঁদ মিত্র, কাশীপ্রসাদ ঘোষ, রামগোপাল ঘোষ, রাধাকান্ত দেব প্রমুখ ৫০০ জন বিশিষ্ট নাগরিক।[৫০] সরকারি চাকরি পাওয়ার মানদণ্ড ইংরেজি-শিক্ষা হওয়ায় দেশের অধিকাংশ বাংলা স্কুলের দরজা বন্ধ হয়ে গেল, বেসরকারি উদ্যোগ স্তিমিত হ'ল। এমন কি হার্ডিঞ্জের প্রশাসনকালে প্রতিষ্ঠিত বাংলা-স্কুলগুলি উঠে গেল। 'বাংলা ইতিমধ্যে পাশ্চাত্য-শিক্ষার কাছে তার হৃদয় বিকিয়ে দিয়ে বসে আছে।

ফলে লর্ড হার্ডিঞ্জের শাসনকালে যে-বহুসংখ্যক বাংলা পাঠশালা গড়ে উঠেছিল, জনসমর্থনের অভাবে সেগুলির নাভিশ্বাস উঠল।"[৫১]

অনুগত দেশীয় ভূস্বামী-বণিক ও অভিজাত শ্রেণীকে ইংরেজিভাষায় শিক্ষা-দানের সুফল পেলেন বণিক-সরকার। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় সৈনিকদের মহাবিদ্রোহে যখন বৃটিশ-সাম্রাজ্যবাদের ভিত্ কেঁপে উঠেছিল, তখন ইংরেজি শিক্ষিত ব্যক্তিরা তীব্র ভাষায় বিদ্রোহী সৈনিকদের নিন্দা করেছেন এবং ইংরেজদের জয়লাভে আনন্দোল্লাস প্রকাশ করেছেন। 'জয় জয় ব্রিটিসের জয়'[৫২] বলে গান গেয়ে 'প্রভুভক্তিতা, কৃতজ্ঞতা, সুশীলতা, মনের অখলতা, নির্ম্মলতা এবং সচ্চরিত্রতা'[৫৩] প্রদর্শনের জন্য হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজে অনুষ্ঠিত বিশিষ্ট নাগরিকদের সভায় (২৫.৫.১৮৫৭) 'শ্রীযুত রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর, শ্রীযুত রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুর, শ্রীযুত বাবু রাজেন্দ্র দত্ত, শ্রীযুত রায় হরচন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রভৃতি অনেকানেক মহাশয়েরা উপস্থিত হইয়াছিলেন'[৫৪] এবং রাধাকান্ত দেবের সভাপতিত্বে প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন, "এই বিদ্রোহ সময়ে দেশের শান্তিরক্ষা নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টের প্রতি যদ্যপি কোন প্রকার সাহায্য প্রদান করিতে হয় তবে এই সভা এরূপ অবধার্য্য করিতেছেন যে মহারাণীর এতদ্দেশীয় সমুদয় প্রজা তজ্জন্য প্রাণপণে সাহায্য করা আপনার-দিগের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কার্য্য বোধ করিবেন।"[৫৫] এই সিদ্ধান্ত অনুসারে তাঁরা সরকারকে প্রয়োজনীয় সাহায্য করার জন্য প্রয়াসী হয়েছেন। 'সম্বাদ ভাস্কর' পত্রিকা ১৮৫৭ সালের ১৮ জুন 'কলিকাতা নগরীয় ধনি লোক-দিগের সমর সজ্জা' শীর্ষক সংবাদে বেনিয়া-সরকারের অনুগ্রহপুষ্ট অভিজাত-শ্রেণীর কর্মপ্রয়াসের পরিচয় পাওয়া যায়।

কেবলমাত্র অভিজাত নাগরিকরা নন, বাংলাদেশের পত্রিকাগুলিও 'প্রজাবৎসল সুধার্ম্মিক সুবিচারক ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের জয়-পতাকা চিরকাল সমভাবে উড্ডীয়মান'[৫৬] রাখার জন্য ঈশ্বরের কাছে আকুল আবেদন করেছেন। 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকা লিখেছেন (২০.৬.১৮৫৭), "এই রাজ্যই তো রাম রাজ্যের ন্যায় সুখের রাজ্য হইয়াছে, আমরা যথার্থরূপ স্বাধীনতা সহযোগে পদ, মান, বিদ্যা এবং ধর্ম্ম-কর্ম্মাদি সকল প্রকার সাংসারিক সুখে সুখি হইয়াছি; কোন বিষয়েই ক্লেশের লেশমাত্র জানিতে পারি না, ...আমরাও ...ইংলণ্ডেশ্বরী জননীর নিকটে পুত্রের ন্যায় প্রতিপালিত হইয়া সর্ব্বমতে চরিতার্থ হইতেছি।"[৫৭] এই 'প্রভুভক্তরূপে বিখ্যাত'[৫৮] শিক্ষিত ব্যক্তিরা 'করুণাময়ের' কাছে কাতর কণ্ঠে নিবেদন করেছেন :

"হে নাথ করুণাময়, নিবেদন তাই।
তব পদে ইংরাজের, জয় ভিক্ষা চাই॥
এই ভাবে রক্ষা কর, এই অধিকার।
ভারতে বিভ্রাট যেন, নাহি ঘটে আর॥"[৫৯]

'করুণাময়' 'রক্ষা' করেছেন; শ্বেতাঙ্গ সৈনিকদের জয়লাভ ঘটেছে। বিদ্রোহী সৈনিকদের পরাজয়ের সংবাদে উল্লসিত হয়ে 'সম্বাদ ভাস্কর' পত্রিকা লিখেছেন (২০.৬.১৮৫৭), "হে পাঠক সকল, উর্দ্ধবাহু হইয়া পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়া জয়ধ্বনি করিতে২ নৃত্য কর,...আমারদিগের প্রধান সেনাপতি মহাশয় সসজ্জ হইয়া দিল্লী প্রদেশে প্রবেশ করিয়াছেন, শত্রুদিগের মোর্চ্চা সিবিরাদি ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিয়াছেন ...কি মঙ্গল সমাচার, পাঠক সকল জয়২ বলিয়া নৃত্য কর, হিন্দু প্রজাসকল দেবালয় সকলে পূজা দেও, আমারদিগের রাজ্যেশ্বর শত্রু জয়ী হইলেন।"[৬০]

ভারতের প্রথম স্বাধীনতা-যুদ্ধে ইংরেজি-শিক্ষিত ব্যক্তিদের প্রভুভক্তির পরিচয় পেয়ে খুশি হয়েছেন শাসক গোষ্ঠী। ইংরেজিতে শিক্ষাদানের সার্থকতা দেখে জেনারেল কমিটি মন্তব্য করেছেন, "আমার বোঝার কোনো ভুল না থাকলে বলতে পারি, সাম্প্রতিক গোলমালগুলো (অর্থাৎ সিপাহী বিদ্রোহ) থেকে একটি শিক্ষা আমরা পেয়েছি, অন্তত প্রমাণিত হয়েছে যে ভালো ইংরেজি-বিদ্যালয়ে কিছু পরিমাণ শিক্ষা যাঁরা পেয়েছেন, তাঁরা অনেক বেশি বিশ্বস্ত এবং সরকারের সঙ্গে প্রীতিবন্ধনে আবদ্ধ। যারা এমন শিক্ষা পাবার সুযোগ পায়নি, প্রমাণ হয়েছে যে তাদের তুলনায় এঁরা প্রকৃত অর্থে অনেক ভালো প্রজা।"[৬১] একই কথা লিখেছেন রেঃ. কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, "বাঙ্গালীরাই ...একমাত্র ভারতীয় প্রজা যারা ১৮৫৭ সনের বিদ্রোহের ছোঁয়াচে-রোগের শিকার হয়নি। (আসলে) লোকে যত বুদ্ধিমান হয় ততই তারা প্রকৃত লাভ কিসে সেটা বেশী বুঝতে পারে···যে-সরকার অরাজকতা ও বিপদ থেকে রক্ষা করেছে সেই সরকারকেই দুর্বল করে তোলার মতন পাগলামি কি কোনো বুদ্ধিমান লোক কখনও করবে?"[৬২] অবশ্য এই সকল শিক্ষিত-বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা বাংলাদেশের কোনো কৃষক-বিদ্রোহ সমর্থন করে 'পাগলামি'র পরিচয় দেননি।

কৃষ্ণমোহন যাঁদের ইংরেজি-শিক্ষার জন্য বুদ্ধিমান বলে উচ্চ প্রশংসা করেছেন, 'Friend of India' পত্রিকা তাঁদের 'অর্দ্ধমানব' রূপে অভিহিত করেছেন। এই পত্রিকা ১৮৩৫ খৃস্টাব্দের ২৩ এপ্রিল সংখ্যায় মন্তব্য করেছেন, যে-দেশীয় ব্যক্তি

মাতৃভাষার প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করে ইংরেজিভাষা-চর্চা করেন, তিনি 'অর্ধ মানব'।[৬৩] 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকা ইংরেজ-শাসনের সমর্থক হলেও ইংরেজিতে শিক্ষাদানের নীতি সমর্থন করেননি। এই পত্রিকা লিখেছেন (২০. ৪. ১৮৪৯), "আমারদিগের ভূপতিরা যে দেশীয় ভাষার প্রতি এরূপ অনাদর করিবেন তাহা তখন বড় আশ্চর্য্য জ্ঞান হয় না যখন আমরা দেখি আমারদিগের দেশীয় ভ্রাতারাই ইহার উচ্ছেদে সংপূর্ণ সচেষ্ট আছেন, তাঁহারদিগের ইচ্ছা ইংরাজী ভাষাই এদেশের ভাষা হইলে সুখের কারণ হয়, ইহারদিগের এ কথার উত্তর আর কি দিব, "পাগল নয়, ক্ষেপা নয়, তেঁদড় এক জাতি" তাঁহারা একাল পর্য্যন্ত নানা দেশের নানা ইতিহাস দেখিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা কি কোন ইতিহাসে এমত পাঠ করিয়াছেন যে কোন কোন জয়যুক্ত রাজা অধিকৃত দেশে তাঁহারদিগের স্বভাষা প্রচলনে কি ক্ষমতাবান হইয়াছিলেন ?"[৬৪]

ইংরেজ-শাসনকর্তাদের শিক্ষানীতি সমালোচনা করে 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকা আরো বলেছেন, "রাজপুরুষেরা ঐ অর্থ দ্বারা যদ্যপি এতদ্দেশীয় ভাষানুশীলনের পথ পরিষ্কার করিতেন এবং ঐ ভাষায় এতদ্দেশীয় ব্যক্তিদিগ্যে জ্ঞান শিক্ষা প্রদান করণে অনুরাগি হইতেন তবে আমরা তাহাদিগ্যে এই বঙ্গদেশের যথার্থ উপকারি বন্ধু বলিয়া গণ্য করিতাম…কিন্তু কি আক্ষেপ ইংরাজ জাতি সুসভ্য ও বহুদর্শি হইয়াও…বাঙ্গালিদিগ্যে মনুষ্য বলিয়া গণ্য করেন না, বঙ্গভাষার প্রতি তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করিয়া থাকেন…তাঁহারা জাতীয় ভাষার মূলোৎপাটনেই যত্ন করিতেছেন অপিচ তাঁহারদিগের ঐ দুরাশা কোন মতেই সিদ্ধ হইবেক না।"[৬৫]

নেপালের বৃটিশ-রেসিডেণ্ট বি. এইচ. হজসন মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের দাবি উত্থাপন করায় 'সংবাদ প্রভাকর' তাঁর সমর্থনে লিখেছেন (৩১. ৩. ১৮৪৮), "ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট একাল পর্য্যন্ত স্বজাতীয় ভাষার বিস্তার জন্য বিস্তর টাকা ব্যয় করিলেন, কিন্তু তাহাতে বিশেষোপকার কি হইয়াছে তাহা আমরা বলিতে পারি না. ঐ টাকা যদ্যপি এতদ্দেশীয় ভাষানুশীলনার্থে ব্যয় করিতেন তবে এতদিনে এই দেশের ভাষার লাবণ্য বিকীর্ণ হইত, দেশীয় ভাষার পুস্তকাদির কিছুমাত্র অভাব থাকিত না, শিক্ষকও অনেক প্রাপ্ত হওয়া যাইত, এবং ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট এতদ্দেশীয় ব্যক্তিদিগের যথার্থ উপকারক বন্ধু বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হইতেন।"[৬৬] এই পত্রিকা পুনরায় লিখেছেন (৫. ৪. ১৮৪৮), "কি চমৎকার, এই দেশের মনুষ্যেরা জাতীয় শিক্ষা বিষয়ে কিছুমাত্র মনোযোগ করেন না, ইংরাজী ভাষা অনুশীলনার্থ অধিক পরিশ্রম করিয়া থাকেন, সুতরাং তাঁহারদিগের অননুরাগ ও অযত্ন দ্বারা

বঙ্গভাষার উন্নতির পথ রুদ্ধ হইয়াছে, ...ইহারদিগের কি একপ্রকার স্বভাব দোষ ও কুপ্রবোধ হইয়াছে যে বঙ্গভাষাতে উপযুক্তরূপে শিক্ষিত হওয়া আবশ্যক জ্ঞান করেন না, আর কুতর্ক করেন যে দেশীয় লোকের পক্ষে দেশ ভাষা অযত্ন সুলভ; তাহা আর পুস্তকাদি পাঠ করিয়া শিক্ষার আবশ্যক কি, কেন আমরা যে বাঙ্গালা ব্যাকরণ পড়ি নাই এবং বর্ণ বিচারাদি কিছু জানি না তাহাতে কি কার্য্য চলিতেছে না ইত্যাদি।"[৬৭]

'সম্বাদ ভাস্কর' পত্রিকায় একজন পত্রলেখক লিখেছেন, যত দিবস পর্য্যন্ত এ প্রদেশে বঙ্গ ভাষার অনুশীলন না হয় ও যত দিবস পর্য্যন্ত ঐ ভাষার উন্নতি হইয়া সর্ব্ব সাধারণের চিত্ত ভূমি বিরাজিত না হয় তত দিবস পর্য্যন্ত এ দেশের সৌভাগ্যোদয় হইতে পারিবেক না, এ প্রযুক্ত বঙ্গভাষা বহুল প্রচার পক্ষে সর্ব্ব সাধারণের সর্ব্বতোভাবে সযত্ন হওয়া কর্ত্তব্য কিন্তু অনেকে কহিয়া থাকেন অস্মদ্ভাষা বিরচিত উত্তম তাৎপর্য্যশালী গ্রন্থাদির অভাব প্রযুক্ত বাঙ্গালা বিদ্যা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর ও তাহাতে পরিশ্রম করা কেবল ব্যর্থ কালহরণ করা মাত্র যদিও ইহা প্রামাণিক বটে, তথাপি অপক্ষপাতিত্ব রূপে বিবেচনা করিলে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবেক বঙ্গভাষা অতি সুমধুর ও তদ্দ্বারা সর্ব্ব প্রকার অভিপ্রায় ব্যক্ত করা যাইতে পারে তবে যে এ পর্য্যন্ত জ্ঞানোপযোগি বহু সংখ্যক গ্রন্থ তদ্ভাষায় সংকলিত হয় নাই সে কেবল মদ্দেশীয় বিদ্বানগণের অবহেলা বশতই বিবেচনা করিতে হইবেক, তাহাতে ভাষার অপরাধ কিছু মাত্র নাই, যদ্রূপ উর্ব্বরা ভূমি কৃষি কর্ম্ম বিরহে কুবৃক্ষে পরিপূর্ণ থাকিলে কর্ষকের অবজ্ঞা মাত্র ব্যক্ত করে তাহাতে ভূমির অপরাধ কিছু নাই পরন্তু অধুনা যে সকল গ্রন্থাদি সংকলিত হইয়াছে ও হইতেছে ইহাতে নিঃসন্দেহে পূর্ব্বাপেক্ষা মদ্দেশীয় ভাষার অনেক উন্নতি হইয়াছে ও এইরূপ শিক্ষোপযোগি সর্ব্ব বিষয়ক গ্রন্থ এ ভাষায় অনুবাদিত হইলে বঙ্গভাষা ইউরোপীয় নানা ভাষার ন্যায় সাতিশয় মনোহারিণী হইবেক, তদভ্যাস জন্য শিক্ষা প্রণালী পূর্ব্বাপেক্ষা সংশোধিত না হইলে আমার এ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে না।"[৬৮]

আর একজন পত্রলেখক লিখেছেন (১২. ১. ১৮৫৬), "জাতীয় ভাষা ব্যতীত জাতীয় বিদ্যোপার্জ্জনের আর কোন উপায় নাই। ইহা স্বীকার্য্য বটে যে, অন্য জাতীয় বিদ্যায় সবিশেষ ব্যুৎপন্ন হইলে অনুবাদ সহযোগে তাহাতে স্বজাতির বিদ্যার যাহা কিছু গৃহীত হইয়াছে তন্মাত্রই জানিতে পারা যায়। কিন্তু এরূপে স্বদেশের বিদ্যা শিক্ষা যেরূপ পরিশ্রম সাপেক্ষ তাহার সহস্রাংশের একাংশও ফল-দায়ক নহে, তথাচ, আক্ষেপ রাখিবার স্থান কোথায় পাইব, প্রাগুক্ত উপায়াবলম্বন

পূর্ব্বক অনেক বঙ্গদেশীয় ইংরাজী বিদ্যায় কৃতবিদ্য যুবক আপনাদিগের জাতীয় বিদ্যার সহিত পরিচয় করিতে লজ্জা বোধ করেন না। ···অন্য কোন দেশের ভাষা সহযোগে যদি বিদ্যা শিক্ষার নিয়ম থাকে তাহা হইলে অপর সাধারণে কখনই ভদ্র রসাস্বাদনে শক্য হইতে পারে না। ভিন্ন দেশীয় ভাষা শিখিতে যাইলে ন্যূন কল্পে যে সময় ও অর্থ ব্যয় স্বীকার করিতে হয় সর্ব্বসাধারণে কখনই তাহা করিতে পারে না, এজন্য হয় দেশীয় ভাষা দ্বারা সাধারণের মনে জ্ঞানালোক বিকীর্ণ হইবে; নতুবা কতিপয় ভাগ্যবান ধনশালি ব্যতীত সকলকেই বিদ্যাধনে বঞ্চিত থাকিতে হইবে।”[৬৯] কিন্তু এই ‘ভাগ্যবান ধনশালি’ ব্যক্তিদের জন্য ইংরেজিভাষায় শিক্ষাদানের নীতি গ্রহণ করা হয়েছে; ‘দেশীয় ভাষা দ্বারা সাধারণের মনে জ্ঞানালোক’ ছড়িয়ে দেবার কোনো ইচ্ছা না থাকায় দরিদ্র সাধারণ ‘বিদ্যাধনে বঞ্চিত’ হয়েছেন।

সরকারি শিক্ষানীতি পরিবর্তিত না হওয়ায় ও ইংরেজিভাষায় শিক্ষাগ্রহণে অত্যধিক গুরুত্ব আরোপিত হওয়ায় শিক্ষার্থীদের মানসিকতার দ্রুত পরিবর্তন ঘটেছিল এবং ইংরেজিভাষায় জ্ঞানার্জনে তাঁরা ক্রমেই অধিক থেকে অধিকতর সংখ্যায় আগ্রহান্বিত হয়েছিলেন। তাঁদের প্রবল আগ্রহের পরিচয় পাওয়া যায় সংস্কৃত কলেজের ঘটনায়। এই কলেজ-প্রতিষ্ঠার কিছুকাল পরে এখানে ইংরেজিভাষা-শিক্ষা প্রবর্তিত হয়। কিন্তু ইংরেজি শিক্ষার প্রতি এখানকার ছাত্রদের তীব্র বিতৃষ্ণার জন্য ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে এখানে ইংরেজি-শিক্ষা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। তাতে কলকাতার হিন্দু রক্ষণশীলদের পত্রিকা ‘সমাচার চন্দ্রিকা’ আনন্দ প্রকাশ করেছিলেন। সংস্কৃতের সঙ্গে ইংরেজির চর্চাকে তাঁরা অত্যন্ত অন্যায় ও অসংগত বলে মনে করেছেন এবং বলেছেন, “কোন ব্যক্তি পবিত্র শাস্ত্র-শিক্ষার সঙ্গে ইংরেজি-চর্চা করলে নিজেকে অপবিত্র করবে।”[৭০] মাত্র সাত বছরের মধ্যে অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। অন্যান্য সরকারি কলেজের ইংরেজি-শিক্ষিত ছাত্রদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় সাফল্যলাভ করে সরকারি চাকরি পাওয়ার জন্য সংস্কৃত কলেজের ছাত্ররাও ইংরেজিভাষা-পাঠে আগ্রহী হয়েছেন। তাঁদের অনুরোধে ও বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টায় সংস্কৃত কলেজে পুনরায় ইংরেজি-শিক্ষা প্রবর্তিত হয়েছে। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দ থেকে এখানে ইংরেজি-শিক্ষাদান শুরু হয় এবং দু’ মাসের মধ্যে ১৬৪ জন ছাত্রের মধ্যে ১০৮ জন ছাত্র ইংরেজি ক্লাসে ভর্তি হয়। ইংরেজি শেখার জন্য উৎসাহের প্রবল বন্যা দেখে কর্তৃপক্ষ ভীত হয়ে ছাত্রদের প্রতি সতর্কবাণী উচ্চারণ করে নির্দেশনামা জারি করেছেন যে, কোনো ছাত্র যদি সংস্কৃত-শিক্ষায় অবহেলা প্রদর্শন করেন, তাহলে তাঁকে কলেজ

থেকে বহিষ্কৃত করা হবে। এই ঘটনায় 'Friend of India' মন্তব্য করেছেন (১৬.২.১৮৪৩), "এখানে একটা পরিবর্তন হয়েছে এবং পরিবর্তনশীল যুগে একটা বিরাট পরিবর্তন ঘটেছে।"[৭১]

কেবলমাত্র সংস্কৃত কলেজে নয়, সমাজের উচ্চ ও মধ্যবিত্তশ্রেণীর মধ্যে ইংরেজি শেখার প্রবল জোয়ার দেখা যায়; ইংরেজি শিক্ষার চাহিদা ক্রমশ বৃদ্ধি পায়। ১৮৫৪ সালে মেডিক্যাল কলেজ বাদে ৫টি কলেজ এবং ৪টি স্কুলের ছাত্রসংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১৯২ ও ৭৪১২ জন অর্থাৎ সর্বমোট ৭৬০৪ জন। ১৮৫০ ও ১৮৫২ সালে যেখানে যথাক্রমে ৪০২১ ও ৪৮২২ জন ছাত্র ইংরেজি শিখেছিল সেখানে দু'বছর পরে যথেষ্ট পরিমাণে বর্দ্ধিত ছাত্রসংখ্যা ইংরেজি-শেখার আগ্রহকে প্রমাণ করে।[৭২]

ইংরোজ-শিক্ষা প্রসারে ইংরেজ-সরকারের প্রবল আগ্রহ থাকলেও এসময় পর্যন্ত শিক্ষাকাঠামোকে আধুনিকীকরণের কোনো প্রচেষ্টা তাঁদের ছিল না। প্রাচীন শিক্ষাকাঠামোকে অক্ষুণ্ণ রেখেই তাঁরা ইংরেজি-শিক্ষাদানে ব্রতী হয়েছিলেন। দুটি স্তরকে ভিত্তি করে এই কাঠামো গড়ে উঠেছিল —প্রাথমিক ও উচ্চশিক্ষা। শিক্ষা-ব্যবস্থাকে তিনটি স্তরে বিন্যস্ত করার সর্বপ্রথম সযত্ন প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় স্যার চার্লস উডের ডেসপ্যাচে (১৯ জুলাই, ১৮৫৪)। তিনি সমগ্র শিক্ষা-ব্যবস্থাকে ত্রিস্তরে বিভক্ত করার পরামর্শ দিয়েছেন —প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চতর শিক্ষা। উডের ডেসপ্যাচে কেবলমাত্র শিক্ষা-কাঠামো নয়, ভাষা মাধ্যম ও বিশ্ববিদ্যালয়-স্থাপনের বিষয়েও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ভাষা-প্রসঙ্গে ডেসপ্যাচে বলা হয়েছে, "এদেশীয় ভাষাসমূহের বিকল্প রূপে ইংরেজিভাষাকে প্রতিষ্ঠা করার কোনো ইচ্ছা কিংবা লক্ষ্য আমাদের নেই। এদেশের জনসাধারণ যে ভাষা বুঝেন সেই ভাষা-ব্যবহারের গুরুত্ব সম্পর্কে আমরা সচেতন। আমরা জনসাধারণের সঙ্গে সরকারের যোগাযোগের ভাষা ও আদালতের ভাষা রূপে ফারসিভাষার পরিবর্তে ইংরেজিভাষা গ্রহণ না করে এদেশীয় ভাষা-ব্যবহারের স্বীকৃতি দিয়েছি। সুতরাং এটি অত্যাবশ্যক যে কোনো প্রকারের সাধারণ শিক্ষা-ব্যবস্থায় এগুলির (এই ভাষাগুলির = মাতৃভাষাগুলির —লেখক) চর্চা বিশেষ অধ্যবসায়ের সঙ্গে করা দরকার এবং উন্নত ইউরোপীয় জ্ঞানের সঙ্গে বিপুল সংখ্যক জনসাধারণের পরিচয় স্থাপন প্রয়োজন; কারণ এঁরা অবস্থাবিপাকে উচ্চপর্যায়ের শিক্ষা থেকে বঞ্চিত এবং এঁদের বিদেশী ভাষার বাধা অতিক্রমণের ক্ষমতা নেই। যে কোনো একটি মাতৃভাষার মাধ্যমে এঁদের এ-পরিচয় ঘটা সম্ভব।"[৭৩]

ডেসপ্যাচে আরো বলা হয়েছে, "যে কোনো সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থায় ইংরেজি ভাষার যেখানে চাহিদা আছে, সেখানে সেই ভাষায় শিক্ষা দিতে হবে; কিন্তু সকল সময়েই এই ভাষার সঙ্গে থাকবে জেলার আঞ্চলিক ভাষা —যে ভাষা-চর্চায় বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে এবং সেই শিক্ষাই দিতে হবে যা মাতৃভাষায় দেওয়া যেতে পারে। যাঁরা ইংরেজিভাষায় যথেষ্ট জ্ঞান লাভ করেছেন, তাঁদের সেই ভাষায় শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে; কিন্তু ইংরেজিতে যাঁরা অজ্ঞ বা অল্প-শিক্ষিত, তাঁদের জন্য মাতৃভাষাই ব্যবহার করতে হবে। সেই সব শিক্ষক বা অধ্যাপকের মাধ্যমে একাজ করা সম্ভব যাঁরা ইংরেজিভাষায় জ্ঞানের অধুনাতন দিকগুলির সঙ্গে এমন পরিচিত যে তাঁরা যে-জ্ঞান অর্জন করেছেন তা তাঁরা দেশবাসীকে তাঁদের মাতৃভাষায় দিতে পারেন। সেই সঙ্গে মাতৃভাষার মূল্য ক্রমশ স্বীকৃত হবে যখন ভারতের ভাষাগুলি ক্রমশ ইউরোপীয় পুস্তকগুলির অনুবাদের দ্বারা অথবা ইউরোপীয় ক্রমোন্নতিতে যাঁরা প্রভাবিত তাঁদের মৌলিক রচনার দ্বারা সমৃদ্ধ হবে। এভাবে ইউরোপীয় জ্ঞান সর্বশ্রেণীর মানুষের আয়ত্বাধীন হবে। সেজন্য আমরা দেখতে চাই যে, ইংরেজি ও ভারতীয় ভাষাগুলি একই সঙ্গে ইউরোপীয় জ্ঞান-দানের মাধ্যম হোক এবং আমরা এটাই দেখতে চাই, ভারতের স্কুলগুলিতে একসঙ্গে দু'টি ভাষার অনুশীলন উচ্চস্তরের হোক। এজন্য শিক্ষকদেরও উপযুক্ত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা থাকা চাই।"[১৪]

উডের ডেসপ্যাচেও হ্যারিংটন-মেকলে-অকল্যাণ্ড প্রমুখের 'নিম্নমুখী পরিস্রুতি তত্ত্ব' কে সমর্থন করা হয়েছে —ইংরেজিভাষায় শিক্ষিত ব্যক্তিরা এদেশীয়দের মাতৃভাষায় শিক্ষাদান ও পুস্তকাদি রচনা করবেন। মাতৃভাষা-চর্চার কথা বলা হলেও মাতৃভাষার প্রতি বিমাতৃসুলভ আচরণ পূর্বের ন্যায় প্রদর্শিত হ'ল। প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে গুরুত্ব আরোপের সুপারিশ করা হলেও বাস্তবে বিপরীত নীতি অনুসৃত হ'ল। কেবলমাত্র উচ্চতর শিক্ষা-বিস্তারের ক্ষেত্রে উডের সুপারিশ কার্যকর করতে বৃটিশ-সরকার সচেষ্ট হয়েছেন। বহুসংখ্যক ভারতীয়কে ইংরেজিতে শিক্ষিত করার জন্য মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজ-স্থাপনের প্রয়োজন ছিল, যাতে শাসক ও শাসিতদের মধ্যে তাঁরা দোভাষী-রূপে কাজ করতে পারেন এবং তাঁদের ওপরে ন্যস্ত প্রশাসনিক দায়িত্ব পালনে সক্ষম হন। সুতরাং ইংরেজ-সরকার শিক্ষার অন্যান্য শাখার বিনিময়ে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এদেশীয়দের মধ্যে অনেকেই সরকারি নীতি সমর্থন করেছেন; কারণ উচ্চতর শিক্ষা তাঁদেরকে সরকারি চাকরি লাভের সুযোগ

করে দেবে এবং ফলে তাঁরা সামাজিক সম্মান ও আর্থনীতিক নিরাপত্তা লাভ করবেন।[৭৫]

উচ্চতর শিক্ষা-প্রসারের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়-স্থাপনের গুরুত্ব উল্লেখ করে তার লক্ষ্য নির্ণয় করতে গিয়ে চার্লস উড লিখেছেন, "বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি ও ডিস্টিংশনকে বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত করার ফলে উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিদের জ্ঞানানুশীলন-প্রয়াস ভবিষ্যতে সেইসব বিষয়কে অবলম্বন করবে যা জীবনের নানা সক্রিয় বৃত্তির ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জনের পক্ষে প্রয়োজনীয়। একটি সরকারের পক্ষে যতটা সম্ভব শিক্ষার লাভজনক দিকগুলি ভারতের উচ্চশ্রেণীর মানুষের কাছে সহজ ও বাস্তবসম্মত ভাবে আমাদের ততটা উপস্থিত করতে হবে।"[৭৬] অর্থাৎ হার্ডিঞ্জের ঘোষণানুযায়ী সরকারি চাকরি লাভে সাফল্য অর্জনে সাহায্য করাই হ'ল বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ডিগ্রি' ও 'ডিস্টিংশন' প্রদানের উদ্দেশ্য। শুধু তাই নয়, কোনো সন্দেহের অবকাশ না রেখে উড পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন যে, কেবলমাত্র উচ্চশ্রেণীভুক্ত ব্যক্তিরাই উচ্চশিক্ষার সুযোগ-সুবিধা পাবেন। উডের সুপারিশের ভিত্তিতে বৃটিশ-সরকারের উচ্চতর শিক্ষানীতি গঠিত হ'ল—যে নীতির লক্ষ্য হ'ল জ্ঞানোপার্জনের জন্য শিক্ষা নয়, অর্থোপার্জনের জন্য শিক্ষা। এই লক্ষ্য নিয়েই সুনির্দিষ্টভাবে চাকরি-নির্ভর ইংরেজি-শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় গড়ে তোলার জন্য স্থাপিত হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়। বৃটিশ-প্রশাসন যন্ত্রের বিভিন্ন স্তরের চাকরির জন্য বিভিন্ন স্তরের বিদ্যার 'ডিগ্রি'র ছাপ দেওয়াই হ'ল বিশ্ববিদ্যালয়ের একমাত্র কর্তব্য —"সমগ্র ব্যবস্থাটাই এই ঘটনার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত যে, সরকারি চাকরি-লাভের ছাড়পত্র হ'ল ডিগ্রি।"[৭৭]

সেকারণে উচ্চতর বিদ্যাদানের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠার কথা বলা হলেও উচ্চতর জ্ঞানদানের কোনো লক্ষ্য কিংবা পরিকল্পনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছিল না। উডের ডেসপ্যাচে বলা হয়েছে, "বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হবে জ্ঞানদানের উদ্দেশ্যে নয়, অন্যত্র লব্ধ শিক্ষার পরীক্ষা এখানে করা হবে।"[৭৮] যে-আইনে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেই আইনের ভূমিকায় বলা হয়েছে, "এই উদ্দেশ্য নিয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে, যাঁরা সাহিত্য, বিজ্ঞান ও কলা বিভাগে জ্ঞান অর্জন করেছেন, বিভিন্ন পরীক্ষার দ্বারা তাঁদের অর্জিত বিদ্যা যাচাই করে শিক্ষা-বিষয়ক ডিগ্রি দেওয়া হবে।"[৭৯] অর্থাৎ শিক্ষাদানের কোনো দায়িত্ব বিশ্ববিদ্যালয়ের থাকবে না; কোনো মূর্খ যেন ফাঁকি দিয়ে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে পণ্ডিত রূপে পরিচিত হতে না পারে, সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। 'বিশ্ববিদ্যালয়ের মোহরের

উপর Advancement of Learning যতই চকচক করুক,বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে Advancement of Learning-এর কোনই উপায় নাই।'[৮০]

হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠাকাল (১৮১৭ খৃঃ.) থেকে এদেশে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের বিকাশ শুরু হয়। নবলব্ধ পাশ্চাত্য শিক্ষার সাহায্যে তাঁরা সমাজের বিভিন্ন স্তরে প্রাধান্য বিস্তার করে বৃটিশ-শোষণযন্ত্রের অংশীদার হয়ে পড়েন। 'ভুস্বামী ও পেশাদারদের এমন একটি নতুন শ্রেণী, প্রকৃতপক্ষে এমন একটি নতুন মধ্যবিত্তশ্রেণীর বিকাশ হচ্ছিল, দেশের নতুন সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে যার ক্রমবর্ধমান স্বার্থ নিহিত ছিল। এই শ্রেণী প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহার করার জন্য রীতিমত আগ্রহী ছিলেন।'[৮১] দুধের সরে যাতে কেউ ভাগ বসাতে না পারে, সে-বিষয়ে তাঁরা যত্নশীল ছিলেন। তাঁরা শ্রেণীস্বার্থে শিক্ষা-সম্প্রসারণের বিরোধী ছিলেন। তাঁরা বুঝেছিলেন, জনশিক্ষা সামন্তসমাজকে ভেঙে ফেলতে কৃষকশ্রেণীকে উদ্বুদ্ধ করবে ; কারণ শিক্ষা মানুষকে আত্মসচেতন করে তোলে, শোষণ-বঞ্চনা থেকে মুক্ত হবার আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি করে। ফরাসি দার্শনিক ডিডেরো বলেছেন, যে-কৃষক পড়তে পারে, তাকে ঠকানো যে কোনো অন্য ব্যক্তিকে ঠকানো অপেক্ষা কঠিন। তাই দেশীয় ভূস্বামীশ্রেণী, নবসৃষ্ট মধ্যবিত্তশ্রেণী কিংবা বৃটিশ-বুর্জোয়াশ্রেণী এদেশে মাতৃভাষার মাধ্যমে জনশিক্ষা-বিস্তারে আগ্রহী ছিল না। যদিও নিজেদের অপরাধ ক্ষালনের জন্য এদেশীয় ধনিকদের দায়ী করে বৃটিশ-সরকারের সেক্রেটারি অব স্টেট-এর ডেসপ্যাচে (১৮৫৯ খৃঃ.) বলা হয়েছে, "যারা ধনী তারা ইংরেজি-স্কুল চায়, প্রাথমিক পাঠশালার প্রয়োজন বোধ করে না এবং যারা গরীব তারা স্কুলের বেতন দিতে পারে না।"[৮২]

'যারা ধনী তারা ইংরেজি স্কুল চায়' বলেই তাদের জন্য উডের পরামর্শানুযায়ী ইংরেজি-শিক্ষার কাঠামো তৈরি করা হয়। সরকারি চাকরি-লাভের যোগ্যতার নিদর্শন স্বরূপ সার্টিফিকেট বিতরণের প্রতিষ্ঠান-রূপে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ১৮৪৪ সালের হার্ডিঞ্জের ঘোষণানুসারে ইংরেজিভাষায় ব্যুৎপত্তি সরকারি চাকরি-লাভের মানদণ্ড হওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা-পাশের সার্টিফিকেট সংগ্রহের জন্য দেশীয় উচ্চবিত্ত-মধ্যবিত্তসমাজে বিপুল আগ্রহ সঞ্চারিত হয়। জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হবার আশায় তাঁরা কোনো রকমে একটা সার্টিফিকেট সংগ্রহ করে অফিসের দরজায় গিয়ে উপস্থিত হন ; জ্ঞানার্জনের কোনো স্পৃহা তাঁদের ছিল না। 'এদেশের শিক্ষার্থীর মধ্যে পৌনে ষোল আনার পক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারস্থ হইবার একমাত্র উদ্দেশ্য কোনরূপে জীবিকার

সংস্থান। ইহা অত্যন্ত সত্য কথা, ইহা লুকাইবার কোন প্রয়োজন নাই। আমাদের দেশের বিদ্যার্থীরা সাহিত্য চাহে না, দর্শন চাহে না, তাহারা চাহে কেবল উদরান্ন। পৃথিবী গোলই হউক, আর ত্রিকোণই হউক, পৃথিবী স্থিরই থাকুক, আর বন্ বন্ করিয়াই ঘুরুক, চন্দ্র মৃৎপিণ্ড হউন বা সুধাভাণ্ড হউন, ম্যাকবেথের রচনাকর্ত্তা সেকস্পীয়র হউন আর নেপোলিয়ন বোনাপার্ট হউন, পলাশী যুদ্ধের বিজেতা ক্লাইবই হউন, আর চৈতন্য লাইব্রেরির সম্পাদকই হউন, তাহাদের তাহাতে কিছুই যায় আসে না। তাহাদিগকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপের প্রত্যাশায় দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য, যাহাই গলাধঃকরণ করিতে বলিবে, তাহাই করিতে সর্বদা প্রস্তুত আছে।'[৮৩]

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় সসম্মানে কিংবা কোনো রকমে উত্তীর্ণ হয়ে যাঁরা চাকরি-প্রার্থী হয়েছেন, তাঁদের সম্পর্কে লর্ড লিটন ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন-ভাষণে মন্তব্য করেছেন, "কার্যত সে একহাতে এম. এ. ডিগ্রী এবং অপর হাতে সরকারি চাকরির দাবি নিয়ে আসেন।"[৮৪] কিন্তু তাঁরা কি সেদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা-পাশের সার্টিফিকেট দেখিয়ে সকলে চাকরি পেয়েছিলেন? চাকরি কি সেকালে সহজলভ্য ছিল? উত্তর দিয়েছেন রিচার্ড টেম্পল। তিনি লিখেছেন, "এটা খুবই দুঃখজনক যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্মানিক উপাধিতে ভূষিত ব্যক্তিরা অফিসের দরজায় দরজায়, এক দপ্তর থেকে অন্য দপ্তরে সামান্য মাইনের চাকরির জন্য হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। কেউ কেউ আবার স্বাধীনবৃত্তিতে আত্মনিয়োগ করার বিফল চেষ্টার পর ব্যর্থ এবং হতাশ হয়ে দারিদ্র্যপীড়িত গৃহে ফিরে আসছেন।"[৮৫]

১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলার লর্ড ল্যান্সডাউন বলেছেন, "আমার আশঙ্কা, আমরা যেন নিজেদের কাছে গোপন না করি যে, যদি আমাদের স্কুল ও কলেজগুলি বর্তমান হারে ভারতীয় যুবকদের শিক্ষিত করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখে, তাহলে এখনকার চেয়ে বেশি করে সেই অভিযোগ আমাদের শুনতে হবে যে, প্রতি বছরে শিক্ষিত যুবকদের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটছে এবং আমরা যাদের শিক্ষার দ্বারা বুদ্ধিদীপ্ত করে তুলছি, তা প্রশংসিত হলেও কার্যত অপ্রয়োজনীয়; কারণ চাকরির সংখ্যা খুবই অল্প যা অনুরূপ শিক্ষিত ভদ্রলোকেরা পেতে পারেন।"[৮৬]

সেকালের চাকরি-সমস্যার একটি চিত্র এঁকেছেন বিনয় ঘোষ। তিনি লিখেছেন, "গ্র্যাজুয়েটদের যদি উচ্চ-শিক্ষিত ধরা যায়, তাহলে ১৮৫৮ থেকে ১৮৮১ সাল পর্যন্ত চব্বিশ বছরে ১৭১২ জন বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়।

পরবর্তী উনিশ বছরে এই হারে গ্র্যাজুয়েটের সংখ্যা যোগ করলে ১৯০০ সাল পর্যন্ত মোট গ্র্যাজুয়েটের সংখ্যা হয় ৩০০০-এর কিছু বেশী (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক রিপোর্ট অনুসারে ১৮৫৮ থেকে ১৯০০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত মোট গ্র্যাজুয়েটের সংখ্যা ৮,৬৪৪ —লেখক)। এই ইংরেজি-শিক্ষিত বাঙ্গালীর প্রধান কর্মক্ষেত্র ছিল চাকরি, এখনো তাই আছে। ১৮৮১ সালে মাত্র ১৭০০ গ্র্যাজুয়েটের পক্ষে এই চাকরির ক্ষেত্রে কি ধরণের সমস্যা দেখা দিয়েছিল, তা এই হিসেব থেকে বোঝা যায়:

[গ্র্যাজুয়েট]

গবর্ণমেণ্ট সার্ভিস :	৫২৮
প্রাইভেট সার্ভিস :	১৮৭
বেকার :	৬৩৫
খবর জানা নেই :	৩২০
মৃত :	৪২

এই হ'ল ১৮৮১ সালে গ্র্যাজুয়েটদের চাকরির অবস্থা, প্রায় অর্ধেক বেকার।"[৮৭]

তৎকালীন ছোটগল্পেও বেকার-জীবনের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। ব্যোমকেশ মুস্তফী রচিত 'হরিদাস' (সাহিত্য কল্পদ্রুম, পৌষ, ১২৯৯ বঙ্গাব্দ) গল্পে কেরাণী-সম্প্রদায়ের দারিদ্র্য ও অর্থহীনতা এবং বেকার জীবনের অসহ যন্ত্রণার পটভূমিতে গড়ে উঠেছে এই গল্প। এই গল্পের নায়ক উনিশ শতকের কলকাতাবাসী 'দুটো পাশ করা' শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বেকার যুবক। বৃদ্ধা মাতা, স্ত্রী, পুত্র ও দাসী তার ওপরে নির্ভরশীল। চাকরির সন্ধানে সে অফিসের দোরে দোরে ঘোরে। কিন্তু 'কোথাও গিয়া শুনে, এখন খালি নাই। কোথাও গিয়া শুনে, ২৫ বৎসরের কম বয়স না হইলে হইবে না। কোথাও গিয়া শুনে, বড়বাবুর আপনার লোক আছে। কোথাও গিয়া শুনে, সাহেবের মেমকে কে মা বলিয়াছে, তাহারই হইবে। কোথাও গিয়া শুনে, আপিসের মধ্যে যারা অ্যাপ্রেন্টিস আছে, তাহাদের কাহারও হইবে। কোথাও শুনে, ক্লার্কশিপ পাশ করা চাই ইত্যাদি, কেহ বা আশা দিয়া মধ্যে মধ্যে খোঁজ রাখিতে বলিলেন, কেহ বা বলিলেন, খালি হলেই —আমি যখন এখানে তখন First chance তোমার ইত্যাদি; কিন্তু হরিদাসের ঘরে সিকি পয়সাও আসিল না। তাহার যে কষ্টে দিন যাইত, তাহাই যাইতে লাগিল। মুদিখানায় দেনা যথেষ্ট, তেলটা নুনটা ধারে পাওয়া যাইত, তাহাও আজ কয়েক মাস হইতে বন্ধ করিয়াছে।

সে দোকানী বেচারীরই বা অপরাধ কি? হরিদাস আজ ৩ বৎসর বেকার।' তবুও তার চাকরি জুটলো না। একটা যে-কোনো ধরণের চাকরির অভাবে তার জীবন কিভাবে বিড়ম্বিত হয়েছিল এবং বেঁচে থাকার জন্য নায়কের আত্যন্তিক প্রয়াস ও উপায়হীন পিতার রূঢ় আচরণ ইত্যাদির বস্তুনিষ্ঠ চিত্র তৎকালীন সামাজিক পটভূমিতে লেখক গভীর সহানুভূতির সঙ্গে এঁকেছেন। উনিশ শতকের ইংরেজি-শিক্ষিত বেকার নায়কের জীবন-বিড়ম্বনার মধ্যে পাঠক দেখতে পান উনিশ শতকের বণিক-ভূস্বামী-শোষিত সমাজ-জীবনকে।[৮৮] 'প্রকৃত পক্ষে চাকুরীর এখন যে রূপ দুরবস্থা তাহার অপেক্ষা সামান্য মুদির দোকান করিয়া দিনাতিপাত করা ভাল। ...কর্ম্ম অপেক্ষা প্রার্থী অধিক সুতরাং কর্ম্মের মূল্য বাড়িতেছে, কাজেই দশ পনর টাকা বেতনের চাকুরীর জন্য দশ হাজার প্রার্থী পাওয়া যাইতেছে।'[৮৯]

'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকা লিখেছেন, "যখন ছাত্রেরা পাঠ সাঙ্গ করিয়া কলেজ-গৃহ হইতে বহির্গত হয়েন, এবং সংসারে প্রবেশ পূর্ব্বক ধনোপায়ের চেষ্টা করেন, তখন তাঁহারদিগকে চতুর্দ্দিক শূন্য দেখিতে হয়। দুই এক ব্যক্তির ভাগ্যক্রমে কোন রাজ সংক্রান্ত কর্ম্ম মিলিলেও মিলিতে পারে। কিন্তু অনেককেই, বিশেষতঃ মধ্যবর্ত্তি শ্রেণীস্থ যুবকদিগকে জীবিকা লাভের উপায় প্রাপ্ত না হইয়া উৎকণ্ঠায় আকুল হইতে হয়। তখন অপার্য্যমানে অন্যান্য অশিক্ষিত ব্যক্তির ন্যায় লিপিকর ব্যবসায় অবলম্বন করাই ধার্য্য করেন, এবং তদর্থে ব্যস্ত সমস্ত হইয়া পথ পর্য্যটন আরম্ভ করেন, ও স্বার্থ লাভার্থে ব্যক্তি বিশেষের তুষ্টি সাধন ব্রত গ্রহণ করিয়া যত্ন পূর্ব্বক পালন করেন। কিন্তু একমাত্র লিপিকর ব্যবসায় কত লোকের অন্ন হইতে পারে? কর্ম্ম অপেক্ষা করিয়া কর্ম্মচারির সংখ্যা অধিক হওয়াতে তাহারও যোগাযোগ হওয়া অতি দুর্ঘট হইয়া ওঠে। যেমন একটি শব দৃষ্টি করিলে শত শত শকুনি তদুপরি আক্রমণ করে, সেইরূপ কোন স্থানে একটি পদ শূন্য হইলে ভূরি ভূরি ব্যক্তি তদর্থে লালায়িত হইয়া প্রাণপণে চেষ্টা করে।"[৯০]

কিন্তু ইংরেজিতে শিক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও যাঁরা বিভিন্ন অফিসে চাকরির জন্য হন্যে হয়ে ঘুরছেন এবং দিনের শেষে হতাশা নিয়ে দারিদ্র্যপীড়িত সংসারে ফিরছেন, জীবনযাত্রার ক্লেশ যাঁদের স্বপ্নকে ভেঙে দিয়েছে, তাঁদের মনোভাব ইংরেজ-সরকারের প্রতি অনুকূল ছিল না। ১৮৮০ সালে জেম্স্ জনষ্টোন লিখেছেন, "বর্তমান ব্যবস্থায় ক্ষুব্ধ এবং অবাধ্য প্রজার সংখ্যা বাড়ছে।"[৯১]

তবুও চাকরি পাবার আশায় ব্যয়বহুল ইংরেজি-শিক্ষা গ্রহণের জন্য ছুটে আসেন মধ্যবিত্ত-ঘরের ছেলেরা; দু'চোখে তাঁদের সোনার হরিণ ধরার আকুলতা। মুষ্টিমেয় ব্যক্তি পুরস্কৃত হলেও বহু সহস্র ব্যক্তি যেমন পুরস্কার-লাভের আশায় লটারীর টিকিট কাটেন, তেমনি মধ্যবিত্তশ্রেণী চাকরির দ্বারা অর্থোপার্জন ও সমাজে প্রভাব-প্রতিপত্তি বিস্তারের আকাঙ্ক্ষায় ইংরেজিভাষার মাধ্যমে ইউরোপীয় শিক্ষা গ্রহণ করেন। মধ্যবিত্ত-মনোভাব ব্যাখ্যা করতে গিয়ে 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকা লিখেছেন (২১ বৈশাখ, ১২৮৮ বঙ্গাব্দ), "আমাদিগের দেশের লোকেরা পুত্রকে যে লেখাপড়া শিখান, মূলে চাকুরীই তাহার উদ্দেশ্য। পুত্র লেখাপড়া শিখিয়া কৃতি হইবেন, তাঁহার দ্বারা দেশের উপকার হইবে, স্বাধীন প্রবৃত্তি ও মত হইবে, এচেষ্টা আমাদিগের দেশের লোকের অন্তঃকরণে এক মুহূর্তের জন্যও বোধ হয় স্থান প্রাপ্ত হয় না। সমাজে বল, সভায় বল, পিতা মাতা গুরুজনের নিকট বল, চাকুরীর যত সমাদর এমন কিছুরই নহে।...যিনি বড় চাকুরী করেন, মোটা বেতন পান, তাঁহার পিতা মাতা, বড় চাকুরের পিতা মাতা মনে করিয়া সুখানুভব করিয়া থাকেন।"[১২]

ইংরেজিভাষার প্রতি মধ্যবিত্তশ্রেণীর তীব্র আকর্ষণ ও মাতৃভাষার প্রতি একান্ত অনীহা লক্ষ্য করে 'সম্বাদ ভাস্কর' পত্রিকা লিখেছেন (১৫.১,১৮৫৬), "যুব বাঙ্গালিরা আর কবে বাঙ্গালা ভাষায় পরিশ্রম করিবেন? ধনাশায় অপর ভাষায় অমূল্য বয়স কাটাইয়া দেখিলেন তাহাতে কি লভ্য করিয়াছেন?"[১৩] কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তিন বৎসরের কর্মকাণ্ড বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকা লিখেছেন (১২.২.১৮৬০),[১৪] "প্রায় তিন বৎসর অতীত হইল, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। এই বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিয়া তিন বৎসরকালের মধ্যে দেশীয়দের কতদূর উপকার হইয়াছে, তাহা বিবেচনা করা উচিত। এই তিন বৎসরের মধ্যে বাঙ্গালা দেশে প্রায় ২১০ জন ইঙ্গরেজী ছাত্র প্রবেশ পরীক্ষায় এবং প্রায় ২২ জন কৃতবিদ্য ছাত্র বি.এ. উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের এই ত্রৈবাৎসরিক ফল দেখিয়া বিবেচনা করা উচিত, ইহাতে দেশীয়দের সামাজিক কোন উপকার দর্শিয়াছে কিনা?" এই প্রশ্নের উত্তরে 'সংবাদ প্রভাকর' উক্ত প্রবন্ধে লিখেছেন, "আমরা মনে করিয়াছিলাম রাজধানীতে ইঙ্গলণ্ডীয়রীতিমতে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইলে আমাদের দেশীয় ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সহকারে তাহার আদর ও গৌরব বৃদ্ধি হইবে, সকলেই পূর্ব্ববৎ ঘৃণা পরিত্যাগ করিয়া আদর পূর্ব্বক দেশীয় ভাষার অনুশীলন আরম্ভ করিবে এবং অবিলম্বেই দেশীয় ভাষা ও বিদ্যা সুসংস্কৃত ও সুসম্পন্ন হইয়া

উঠিবে। কৈ এক্ষণে তাহার কিছুই দেখিতে পাই না বরং দিন দিন দেশীয় ভাষার শ্রীহ্রাস সহকারে তাহার সঞ্চিত গৌরবের হানি হইতেছে ইহা সাধারণ দুঃখের বিষয় নহে।" কারণ বিশ্লেষণ করে 'সংবাদ প্রভাকর' আরো লিখেছেন, "কলিকাতা রাজধানীতে এই বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনাবধি বিদ্যালয়ের সমুদায় ছাত্রগণেরই মন ইঙ্গরেজী ভাষার প্রতি আসক্ত হইয়াছে। ইঙ্গরেজী ভাষায় বুৎপত্তি লাভ করিয়া উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইব, ইহাই সকল ছাত্রের ইচ্ছা" এবং সেই ইচ্ছাপূরণের কল্পতরু হ'ল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

পঞ্চম অধ্যায়

মরিয়া না মরে রাম

শহরের রাজপথে বিলিতি বাজনার আওয়াজে মেঠো পথের বাঁশির সুর ঢাকা পড়েনি, কাঁটাগাছের অরণ্যে মেঠো ফুলের সৌন্দর্য আচ্ছন্ন হয়নি, ময়ূর-পুচ্ছধারী দাঁড়কাকের কর্কশ কণ্ঠ কোকিল-কণ্ঠকে রুদ্ধ করতে পারেনি। ইংরেজি-ভাষার দাপটে মাতৃভাষার প্রাণশক্তি নিঃশেষিত হয়নি, ইংরেজিভাষা-চর্চার প্রবল জোয়ারে মাতৃভাষা ভেসে যায়নি, বাংলার মাটি থেকে তাকে নির্মূল করা যায়নি। ভাষা-দ্বন্দ্বে মাতৃভাষা-শিক্ষা সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা লাভ না করলেও অদম্য প্রাণশক্তির জোরে নিজের অস্তিত্ব বজায় রেখেছিল। ভূস্বামী-বণিক-অভিজাতশ্রেণীর গৃহশীর্ষে ইংরেজিভাষার জয়ধ্বজা উড়লেও দরিদ্রের পর্ণকুটীর থেকে মাতৃভাষার শ্রুতিমধুর সঙ্গীত শোনা যাচ্ছিল :

"মোদের গরব মোদের আশা —আ-মরি বাঙলা ভাষা !
তোমার কোলে তোমার বোলে কতই শান্তি ভালোবাসা ॥
কী যাদু বাঙলা গানে, গান গেয়ে দাঁড় মাঝি টানে,
গেয়ে গান নাচে বাউল, গান গেয়ে ধান কাটে চাষা ॥
ওই ভাষাতেই নিতাই গোরা, আনলে দেশে ভক্তি ধারা ;
আছে কই এমন ভাষা, এমন দুঃখ ক্লান্তি-নাশা ॥"[১]

সে-কারণে কবি বিহারীলাল চক্রবর্তী বঙ্গভারতীর 'রাঙ্গা চরণতলে' আশ্রয় কামনা করেছেন :

"তুমিই মনের তৃপ্তি,
তুমি নয়নের দীপ্তি,
তোমা-হারা হ'লে আমি প্রাণ-হারা হই ;
করুণা-কটাক্ষে তব
পাই প্রাণ অভিনব,
অভিনব শান্তি-রসে মগ্ন হ'য়ে রই।

যে ক'দিন আছে প্রাণ,
করিব তোমায় ধ্যান,
আনন্দে ত্যাজিব তনু ও-রাঙ্গা চরণতলে।"[২]

মাতৃভাষার প্রতি কবি-সাহিত্যিকদের অনুরাগ-প্রীতি-ভালোবাসার প্রকাশ ঘটেছিল সেকালের সাময়িকপত্রে। ইংরেজি-স্রোতের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে তাঁরা সোচ্চার কণ্ঠে দাবি করেছেন —মাতৃভাষায় শিক্ষা দাও। অন্যদিকে তাঁরা মাতৃভাষা-চর্চার দ্বারা মাতৃভাষার উন্নয়নে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁদের প্রচেষ্টায় বাংলা গদ্য দ্রুততালে প্রকাশক্ষম, বাহুল্যবর্জিত, ব্যবহারোপযোগী, সাবলীল ও প্রসাদগুণ-বিশিষ্ট হয়ে উঠেছিল। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতদের রচনায় বাংলা গদ্যের যে দুর্বোধ্যতা ও আড়ষ্টতা ছিল, সাময়িকপত্রের নিরলস প্রয়াসে তা দূরীভূত হয়ে সহজসাধ্য, সাবলীল, প্রাঞ্জল, মননশীল ও সৌন্দর্য-লালিত্যে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

শ্রীরামপুর মিশন থেকে মার্শম্যানের সম্পাদনায় ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম 'দিগদর্শন' পত্রিকা প্রকাশিত হয়। তারপর থেকে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে ১৩৬টি পত্রিকা। সময়ানুসারে এর তালিকা[৩] নিম্নরূপ :

১৮১৮-২২ খৃঃ	৯
১৮২৩-৩৫ ,,	২০
১৮৩৬-৩৯ ,,	৮
১৮৪০-৪৬ ,,	২২
১৮৪৭-৪৮ ,,	২০
১৮৪৯-৫০ ,,	১৯
১৮৫১-৫৫ ,,	২৬
১৮৫৬-৫৭ ,,	১২
মোট	১৩৬

তারপরেও বাংলাভাষায় পত্রিকার সংখ্যা প্রত্যেক বৎসরে ক্রমশ বেড়েছে। ১৮৯২ সালে বাংলা-পত্রিকার সংখ্যা ছিল ৭৪ এবং গ্রাহক সংখ্যা ছিল ৬৬,০০০-এর বেশি।[৪]

ইংরেজি-অনুকরণের যুগেও বিপুল সংখ্যক বাংলাপত্রিকার আত্মপ্রকাশ মাতৃভাষার সঞ্জীবনী শক্তির পরিচয় বহন করছে। পত্রিকাগুলির মধ্যে উল্লেখ-যোগ্য হ'ল সমাচার দর্পণ, সংবাদ কৌমুদী, সমাচার চন্দ্রিকা, পশ্বাবলী, সংবাদ

প্রভাকর, সংবাদ ভাস্কর, জ্ঞানান্বেষণ, বেঙ্গল স্পেক্টেটর, বিজ্ঞান সেবধি, বিজ্ঞানসার সংগ্রহ, তত্ত্ববোধিনী, বিবিধার্থ সংগ্রহ, মাসিক পত্রিকা, এডুকেশন গেজেট, সোমপ্রকাশ, বিজ্ঞান কৌমুদী, গ্রামবার্তা প্রকাশিকা, অবোধবন্ধু, বঙ্গদর্শন, জ্ঞানাঙ্কুর, সাধারণী, ভারতী, সাধনা প্রভৃতি। রামমোহন রায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, প্যারীচাঁদ মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখের রচনা সাময়িক পত্রিকাগুলিতে প্রকাশিত হয়েছিল।

ঈশ্বরগুপ্ত সম্পাদিত 'সংবাদ প্রভাকর' ছিল 'উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যের সূতিকাগার।' এতে অনেক খ্যাতনামা কবি ও সাহিত্যিকের প্রথম উদ্যম প্রকাশিত হয় এবং এই পত্রিকাই বাংলাভাষায় সর্বপ্রথম দৈনিক পত্রিকা-রূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল। অক্ষয়কুমার দত্ত, বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রনাথ, রাজনারায়ণ বসু প্রমুখ সে-যুগের শ্রেষ্ঠ গদ্যলেখকগণের রচনা-সম্ভারে সমৃদ্ধ হয়ে 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকা বাংলা সাহিত্যের ভাণ্ডারে নব নব ঐশ্বর্যের যোগান দিয়ে বিশুদ্ধ প্রজ্ঞার আবহাওয়া সৃষ্টি করেছিল এবং সমাজের অন্তঃস্থল থেকে প্রাচীন কদাচারগুলি নির্মূল করে নতুন আদর্শের পত্তন করেছিল। অক্ষয়দত্ত সম্পাদিত উন্নত মানের এই পত্রিকার গ্রাহক সংখ্যা ছিল ৭০০। বাংলাভাষার প্রতি সংস্কৃত পণ্ডিতদের উন্নাসিক মনোভাবকে আক্রমণ করে প্যারীচাঁদ মিত্র ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে রাধানাথ শিকদারের সহযোগিতায় 'মাসিক পত্রিকা' প্রকাশ করেছেন। কথ্যভাষায় রচনা-প্রকাশের দ্বারা অল্প-শিক্ষিত জনসাধারণকে বিশেষত মেয়েদের শিক্ষাচ্ছলে সাহিত্য-রসের যোগান দেওয়া ছিল এই পত্রিকার আদর্শ। পত্রিকাটির প্রত্যেক সংখ্যায় লেখা থাকত—"এই পত্রিকা সাধারণের বিশেষতঃ স্ত্রীলোকেরই জন্য ছাপা হইতেছে, যে ভাষায় আমাদিগের সচরাচর কথাবার্তা হয়, তাহাতেই প্রস্তাব সকল রচনা হইবেক। বিজ্ঞ পণ্ডিতেরা পড়িতে চান পড়িবেন, কিন্তু তাঁহাদিগের নিমিত্তে এই পত্রিকা লিখিত হয় নাই।"[৫] সামন্তশাসিত গ্রাম-বাংলার উৎপীড়িত-লাঞ্ছিত রায়ত-কৃষকের রক্তক্ষরণে কাঙাল হরিনাথ মজুমদার বিচলিত হয়ে প্রকাশ করেছেন 'গ্রামবার্তা প্রকাশিকা।' পত্রিকা প্রকাশের উদ্দেশ্য বর্ণনা করে কাঙাল হরিনাথ লিখেছেন, "গ্রামবার্তা প্রকাশিকা সংবাদ পত্রিকার দ্বারা গ্রামের অত্যাচার নিবারিত ও নানা প্রকারে গ্রামবাসীদের উপকার সাধিত হইবে এবং তৎসঙ্গে মাতা বঙ্গভাষাও সেবিতা হইবেন।"[৬] ইংরেজি-শিক্ষিত বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা প্রকাশের দ্বারা বঙ্গভারতীর সেবায় আত্মনিয়োগ করেছেন।

দিশি সাহেব ও সংস্কৃত পণ্ডিতদের কাছে অচ্ছুৎ বাংলাভাষাকে তিনি সাদরে বরণ করে নিয়েছেন।

সাময়িকপত্র-প্রকাশের প্রথম পর্বে কিংবা পরবর্তীকালে প্রায় সমস্ত পত্রিকা বৃটিশ-সরকারের শিক্ষানীতির তীব্র সমালোচনা করেছিলেন। ইংরেজি-শিক্ষিত বাঙালিদের মাতৃভাষায় অজ্ঞানতা, ইংরেজি-শেখার আকুলতা ও ইংরেজ-চাটুকারিতাকে পত্রিকাগুলি ক্ষমা করেননি। ক্ষোভ-বিরক্তি-দুঃখ-বিদ্রূপ তাঁদের লেখনীতে ঝরে পড়েছিল। তবুও উচ্চ ও মধ্যশ্রেণীর ইংরেজি-আসক্তি কমেনি। ইংরেজি ভাষায় পরীক্ষা দিয়ে অধিকাংশের উরুভঙ্গ ঘটলেও তাঁরা নিরুৎসাহিত হননি।

মাতৃভাষা অথবা বিদেশী ভাষা—কোন্ ভাষায় শিক্ষা দেওয়া হবে এই প্রশ্ন উত্থাপন করে 'সংবাদ প্রভাকর' ১৮৪৮ সালে লিখেছেন, "বাঙালা ও ইংরাজী এই উভয় ভাষার মধ্যে কোন্ ভাষার দ্বারা এতদ্দেশীয় ব্যক্তিদিগ্যে জ্ঞানশিক্ষা প্রদান করা কর্ত্তব্য? অধুনা এই প্রস্তাব বিষয়ে সংবাদপত্রে ভারি বাদানুবাদ উপস্থিত হইয়াছে, বিশেষতঃ বিজ্ঞবর শ্রীযুত মেং হাজসন সাহেব বঙ্গভাষার অনুকূলে স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করাতে অনেকানেক সাহেব তাঁহার বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করিয়াছেন, কিন্তু হাজসন সাহেব আপন লেখায় যে সকল যুক্তি ও প্রমাণ প্রয়োগ করিয়াছেন, তাঁহার বিপক্ষেরা তাহার কোন কথার উত্তর করিতে পারেন নাই কেবল বাহুল্যরূপে ইংরাজী ভাষার প্রশংসাই লিখিয়াছেন ফলতঃ বিশিষ্টরূপে বিবেচনা করিলে তাঁহারদিগের সেই লেখা বিচক্ষণ ও বিবেচক সমাজে কোনক্রমেই আদর যোগ্য হইবেক না, কারণ একজাতির ভাষার মূল ছেদ করা সামান্য মানসিক সাধ্যের কার্য্য নহে, ঐশ্বরিক কোন অনির্ব্বচনীয় ঘটনা ব্যতীত ঐ অভাবনীয় কার্য্য কোন ক্রমেই সম্পন্ন হইতে পারিবেক না…যে যে জাত অন্য জাতীয় ভাষা লোপ করিয়া স্বজাতীয় ভাষা প্রচলিত করণের অভিপ্রায় করেন তাঁহারদিগের অভিলাষ কোনমতে সম্পন্ন হইতে পারে না…যবনেরা এই রাজ্য মধ্যে স্বজাতীয় ভাষার প্রচার নিমিত্ত যে পরিশ্রম ও অর্থব্যয় করিয়াছেন, তাহাতে আমারদিগের কোন উপকার হয় নাই, কাল সহকারে বর্ত্তমান ইংরাজ জাতি এই দেশ পরিত্যাগ করণে বাধ্য হইলে তাঁহারদিগের ইংরাজী ভাষা প্রচার করণের যত্ন ও অর্থব্যয়ও অবিকল তদ্রূপ হইবেক, অতএব ঐতিহাসিক প্রমাণ সকল বিবেচনা করিয়া এতদ্দেশ মধ্যে ইংরাজী ভাষা বাহুল্য রূপে প্রচলিত করণের নিয়ম করিলে সর্ব্ব বিধায়ে উত্তম হয়।"[৭]

'বেঙ্গল স্পেকটেটর' পত্রিকা লিখেছেন (৯ আগষ্ট, ১৮৪৩), "এদেশের

লোকদিগকে সভ্য করিতে হইলে এদেশের ভাষা আলোচনা করা অতি কর্ত্তব্য ...ছাত্রেরা মাতৃক্রোড়াবধি যে ভাষা ব্যবহার করিয়া আসিতেছে এবং যদ্বারা মনের তাবৎ ভাব অনায়াসে প্রকাশ করিতে পারে সেই ভাষায় শিক্ষা-দানের নিয়ম করিলেই তাহাদিগের মানসান্ধকার দূর হইবেক।"[৮]

'সংবাদ ভাস্কর' পত্রিকা লিখেছেন (১৬ মার্চ, ১৮৫৪), "যত দিবস পর্য্যন্ত এ-প্রদেশে বঙ্গ ভাষার অনুশীলন না হয় ও যত দিবস পর্য্যন্ত ঐ ভাষার উন্নতি হইয়া সর্ব্ব সাধারণের চিত্ত ভূমি বিরাজিত না হয় তত দিবস পর্য্যন্ত এদেশের সৌভাগ্যোদয় হইতে পারিবেক না, এ প্রযুক্ত বঙ্গ ভাষা বহুল প্রচার পক্ষে সর্ব্ব সাধারণের সর্ব্বতোভাবে সযত্ন হওয়া কর্ত্তব্য কিন্তু অনেকে কহিয়া থাকেন অস্মদ্ভাষা বিরচিত উত্তম তাৎপর্যশালী গ্রন্থাদির অভাব প্রযুক্ত বাঙ্গালা বিদ্যা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর ও তাহাতে পরিশ্রম করা কেবল ব্যর্থ কালহরণ করা মাত্র যদিও ইহা প্রামাণিক বটে, তথাপি অপক্ষপাতিত্ব রূপে বিবেচনা করিলে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবেক বঙ্গভাষা অতি সুমধুর ও তদ্দ্বারা সর্ব্ব প্রকার অভিপ্রায় ব্যক্ত করা যাইতে পারে তবে যে এ পর্য্যন্ত জ্ঞানোপযোগী বহু সংখ্যক গ্রন্থ তদ্ভাষায় সংকলিত হয় নাই সে কেবল মদ্দেশীয় বিদ্বানগণের অবহেলা বশতঃই বিবেচনা করিতে হইবেক, তাহাতে ভাষার অপরাধ কিছু মাত্র নাই, যদ্রূপ উর্ব্বরা ভূমি কৃষি কর্ম্ম বিরহে কুবৃক্ষে পরিপূর্ণ থাকিলে কর্ষকের অবজ্ঞা মাত্র ব্যক্ত করে তাহাতে ভূমির অপরাধ কিছু নাই পরন্ত অধুনা যে সকল গ্রন্থাদি সংকলিত হইয়াছে ও হইতেছে ইহাতে নিঃসন্দেহে পূর্ব্বাপেক্ষা মদ্দেশীয় ভাষার অনেক উন্নতি হইয়াছে ও এইরূপ শিক্ষোপযোগী সর্ব্ব বিষয়ক গ্রন্থ এ ভাষায় অনুবাদিত হইলে বঙ্গভাষা ইউরোপীয় নানা ভাষার ন্যায় সাতিশয় মনোহারিণী হইবেক, তদভ্যাস জন্য শিক্ষা প্রণালী পূর্ব্বাপেক্ষা সংশোধিত না হইলে আমার এ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে না।"[৯]

'সোমপ্রকাশ' পত্রিকা লিখেছেন (আগষ্ট, ১৮৭৮), "ভাষার উন্নতি ব্যতিরেকে কখন কোন জাতির উন্নতি হয় না। ভাষার উন্নতিই মানুষের শরীর, মন ও বুদ্ধি প্রভৃতি যাবতীয় বিষয়ের উন্নতির মূল। ভাষার উন্নতি ব্যতিরেকে ধর্ম্ম, ধর্ম্মনীতি, স্বদেশানুরাগ প্রভৃতি কোন গুণই বিশুদ্ধি লাভ করিতে পারে না। ভাষার যে এত গুণ আছে, সাধারণ লোকে তাহা বুঝিতে পারেন না। তাঁহারা আপাতফল দর্শনে মোহিত হন। মোহিত হইয়াই অনেকে বাঙ্গালা ভাষায় একান্ত উপেক্ষা করিয়া স্ব-স্ব সন্তানদিগকে এককালে ইংরাজীতে হাতেখড়ি দিয়া থাকেন। এটি বাঙ্গালাদেশের অদৃষ্টের সামান্য বিড়ম্বনা নয়। এই

বিড়ম্বনা দোষেই আমরা সচরাচর দেখিতে পাই, অনেকে বাঙ্গালা ভাষার প্রতি নিতান্ত অনুরাগ শূন্য হন।”[১০] এই অবস্থার প্রতিকারের জন্য ‘সোমপ্রকাশ’ পরামর্শ দিয়েছেন, “কি সাহায্যকৃত বিদ্যালয়, কি গভর্ণমেণ্ট বিদ্যালয় সকল স্থানের নিমিত্তই গবর্ণমেণ্ট এই নিয়ম করুন, যে বালক ১২ বৎসর বয়স পর্যন্ত কোন বিদ্যালয়ে বাঙ্গালা শিক্ষা না করিবে, তাহাকে ইংরাজী স্কুলে প্রবেশিত করা হইবে না। এক্ষণে বাঙ্গালা প্রবেশিকা পরীক্ষার্থ যে সমস্ত পুস্তক নির্দ্দিষ্ট আছে তাহার কতক কমাইয়া দিয়া পাঠ্যপুস্তক নির্ণয় করিয়া দিলেই চলিবে। এই নিয়ম হইলে বালকেরা যদি ১২ বৎসর পর্য্যন্ত বাঙ্গালা শিক্ষা করে, তাহার প্রতি মায়া ও অনুরাগ জন্মিবে সন্দেহ নাই। বয়োবৃদ্ধি সহকারে সেই অনুরাগের হ্রাস না হইয়া যে উত্তরোত্তর তাহার বৃদ্ধি হইবে, মানুষের স্বভাব দেখিয়া স্পষ্ট বোধ হইতেছে। শৈশবকালে যে বিষয়ের সহিত অধিকতর ঘনিষ্টতা হয়, তাহার প্রতি দৃঢ়তর মমতা জন্মে। সে মমতা সহজে বিস্মৃত হওয়া যায় না।

“এই নিয়ম হইলে আরো দুটি মহৎ ইষ্টলাভ হইবে ; দ্বিতীয়, অল্পে অধিক ও উৎকৃষ্ট শিক্ষা হইতে পারিবে। পঞ্চমবর্ষবয়স্ক বাঙ্গালি শিশুকে ইংরাজী শিখিতে দিলে বিদেশীয় ভাষা বলিয়া তাহার শিখিতে যেরূপ কষ্ট হয়, বাঙ্গালা শিক্ষায় মাতৃভাষা বলিয়া তাহার অর্দ্ধেক কষ্ট হওয়া সম্ভাবিত নহে। আমরা সচরাচর দেখিতে পাই, যে সকল বালক বাঙ্গালা বিদ্যালয় হইতে ভাল করিয়া বাঙ্গালা শিখিয়া আইসে, তাহারা ইংরাজী অথবা সংস্কৃত বিদ্যালয়ে অন্য অন্য বালকদিগকে অনেক পশ্চাতে নিক্ষেপ করে। পশ্চাতে ফেলিবার বিশিষ্ট কারণও আছে। যাহাকে প্রকৃত বিদ্যা বলে, যে ভাষায় শিক্ষা কর, তাহা সর্ব্বত্র সমান। অঙ্ক, ভূগোল ও পদার্থবিদ্যা প্রভৃতি যে ভাষায় শিক্ষা করা যাইবে, সকলেতেই সমান ফলোপধায়িনী হইবে। যাহারা বাঙ্গালা বিদ্যালয়ে ঐগুলি শিখিয়া আইসে, তাহাদিগের আর ঐ সকল নূতন শিখিতে হয় না। তাহাদিগের কেবল ভাষা মুখস্থ করিতে পারিলেই হইল। পক্ষান্তরে, যাহাদিগকে ঐ সকল বিষয় ও ভাষা উভয় শিক্ষা করিতে হয়, তাহারা উহাদিগের তুল্যকক্ষ হইবে তাহা কোন ক্রমেই সম্ভাবিত নহে।”[১১]

কিন্তু ‘গবর্ণমেণ্ট হইতে এ পর্য্যন্ত বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষার কোন উপায় হইল না। সংবাদ-পত্র-সম্পাদকেরা যত চীৎকার করুন, আর অন্য ব্যক্তিই বা ইহার কর্ত্তব্যতা পক্ষে যত যুক্তি প্রদান করুন, কিছুতেই তাঁহারা সচেতন হয়েন না। তাঁহারা বধির হইয়া রহিয়াছেন।’[১২] কেবলমাত্র সরকার নন, ইংরেজি-শিক্ষিত

ব্যক্তিরা মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষায় ব্রতী হননি। 'বর্ত্তমান সময়ে যাঁহারা শিক্ষিত বলিয়া পরিচিত তাঁহারা প্রায় সমস্ত জীবন ইংরাজী ভাষানুশীলনে, ইংরাজী পুস্তক অধ্যয়নে, ও ইংরাজী বিদ্যা পর্য্যালোচনায় অতিবাহিত করেন। বঙ্গ-ভাষার বিশেষ অনুশীলনে তাঁহাদিগের মধ্যে অতি অল্প লোককেই তৎপর দেখা যায়। তাঁহারা ইংরাজী ভাষায় পুস্তক লিখেন, ইংরাজী ভাষায় বক্তৃতা করেন, বন্ধুবান্ধবদের সহিত একত্রিত হইলে ইংরাজী ভাষায় সামান্য পত্রাদি লিখেন।'[১৩]

এই হীন অনুকরণ প্রয়াস লক্ষ্য করে রাজনারায়ন বসু লিখেছেন; "কথোপকথনে এই হীন অনুকরণ আরো স্পষ্ট দেখা যায়। তার প্রধান চিহ্ন ইংরাজী বাঙ্গালা শব্দ একত্র মিশাইয়া বলা। আমরা এক্ষণে যেরূপ কথা কহি, তাহা শুনিলে ইংরাজেরা কিম্বা অন্য কোন বিদেশীয় লোক হাস্য না করিয়া থাকিতে পারেন না। সে কালের লোক কৌতুকের জন্য ইংরাজী বাঙ্গালা শব্দ মিশাইয়া ছড়া প্রস্তুত করিতেন। যথা :—

"শ্যাম going মথুরায়, গোপীগণ পশ্চাৎ ধায়,
বলে your Okroor uncle is a great rascal."

"আমরা কৌতুকের জন্য নহে, গম্ভীরভাবে ঐরূপ ভাষায় কথা কহি। কিন্তু আমরা নিজে বুঝিতে পারি না যে, তাহা কত হাস্যস্পদ। "আমার father yesterday কিছু unwell হওয়াতে Doctor-কে call করা গেল, তিনি একটি physic দিলেন। Physic বেস্ operate করেছিল, four five times motion হলো, অদ্য কিছু better বোধ কচ্চেন।" এ বিড়ম্বনা কেন? ... ইংরাজী গ্রন্থকর্ত্তা সদি (Southey) বলিয়াছেন, "আমাদিগের ভাষা অতি মহৎ ভাষা, অতি সুন্দর ভাষা। ইংরাজী ও জর্ম্মাণ ভাষার পরস্পর জ্ঞাতিত্ব অনুরোধে জর্ম্মাণ ভাষোৎপন্ন শব্দ ব্যবহার আমি ক্ষমা করিতে পারি, কিন্তু যেখানে একটি খাঁটি ইংরাজী শব্দ ব্যবহার করা যাইতে পারে, সেখানে যে ব্যক্তি ল্যাটিন অথবা ফ্রেঞ্চ শব্দ ব্যবহার করে, মাতৃভাষার প্রতি বিদ্রোহাচরণ জন্য তাঁহাকে ফাঁসি দিয়া তাহার শরীর খণ্ড খণ্ড করা উচিত।" যাঁহারা বাঙ্গালা কথোপকথনের সময় ইংরাজী শব্দ ব্যবহার করেন, তাঁহাদিগকে একবারে এরূপ উৎকট দণ্ড না করিয়া একটি ভদ্র উপায় প্রথম অবলম্বন করিলে ভাল হয়। যদি দেখা গেল, ভদ্রতায় কিছু হইল না, শেষে সদি-বিহিত দণ্ড আছে।"[১৪]

এ অবস্থায় বিজয়ী জাতির ভাষার সঙ্গে বিজিত জাতির ভাষার যে-অসম সংগ্রাম চলছিল তাতে পরাধীন জাতির ভাষার পরাভবের আশঙ্কায়

'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকা বিচলিত হয়ে মন্তব্য করেছেন, "এক্ষণে বঙ্গদেশে ইংরাজী ও বঙ্গভাষার সহিত সংগ্রাম চলিতেছে, কিন্তু ইংরাজী ভাষা যেরূপ প্রবল হইয়া উঠিতেছে তাহাতে স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে যদ্যপি কৃতবিদ্য লোকে বঙ্গভাষার প্রতি অধিকতর মনোযোগ প্রদান না করেন তাহা হইলে বঙ্গভাষা উক্ত সংগ্রামে পরাভূত হইবে এবং উহার উন্নতির আশা ভরসা একেবারে বিনষ্ট হইবে। যদ্যপি আমাদিগের দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিগণ কাল-বিলম্ব না করিয়া ইংরাজীতে পুস্তক লেখা, ইংরাজীতে বক্তৃতা করা, ইংরাজীতে পত্রাদি লেখা এবং ইংরাজীতে কথোপকথন করা, প্রভৃতি স্বদেশানুরাগবিরুদ্ধ, স্বদেশ-বিদ্বেষীদিগের পক্ষে উপযুক্ত অন্যায় অভ্যাস সকল পরিত্যাগ না করেন এবং তাঁহারা বিশিষ্ট রূপে বঙ্গভাষার চর্চ্চা ও অনুশীলন বৃদ্ধি না করেন তাহা হইলে কখনই বঙ্গভাষা উন্নতি লাভ করিবে না।...কিন্তু কৃতবিদ্য বঙ্গবাসিগণ যদ্যপি ইংরাজী ভাষার চর্চ্চা ও অনুশীলনের সহিত বঙ্গভাষার সবিশেষ চর্চ্চা ও অনুশীলন করেন তাহা হইলে বঙ্গভাষার উন্নতি পক্ষে উল্লিখিত প্রতিবন্ধক সকল অনেক পরিমাণে নিরাকৃত হইতে পারে। ইংরাজী ভাষাভিজ্ঞ বঙ্গদেশীয় সুশিক্ষিত ব্যক্তিগণ ইংরাজী ভাষায় সাহিত্য, ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, রাজনীতি, পুরাতত্ত্ব, বার্ত্তাশাস্ত্র, বিজ্ঞান ও দর্শন বিষয়ক পুস্তক না লিখিয়া এবং বক্তৃতা না করিয়া যদ্যপি তাঁহারা বাঙ্গালা ভাষায় ঐ সকল বিষয়ে পুস্তক লিখেন ও বক্তৃতা করেন তাহা হইলে, তাঁহারা বঙ্গভাষার বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতে সমর্থ হইবেন। আমাদিগের দেশের সুশিক্ষিত ও কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণ যতকাল বঙ্গভাষা বিশিষ্ট রূপে চর্চ্চা ও অনুশীলন করিতে আরম্ভ না করিবেন তত কাল বঙ্গভাষা প্রকৃত উন্নতি লাভ করিতে পারিবে না।"[১৫]

কিন্তু জাতি স্বাধীন না হলে তার ভাষা উন্নত ও বিকাশিত হতে পারে না। বিজয়ী জাতি সর্বপ্রথমে বিজিত জাতির ভাষা-শিক্ষা-সংস্কৃতিকে নির্মূল করার জন্য সচেষ্ট হয়। সেজন্য তাঁরা পরাধীন জাতির চেতনাকে দাসত্বশৃঙ্খলে বেঁধে তাঁদের গৌরবময় ঐতিহ্য ও ইতিহাসের ওপরে কলঙ্ক-কালিমা লেপন করেন। সুতরাং মাতৃভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আবশ্যিক সর্ত হ'ল দেশ ও জাতির স্বাধীনতা। 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার সম্পাদক এই ঐতিহাসিক সত্য উপলব্ধি করেছেন। তিনি লিখেছেন, "স্বাধীনতা ভাষার উন্নতি সাধনের পক্ষে একটি অত্যাবশ্যক উপকরণ। স্বাধীনতাশূন্যতা ভাষার উন্নতিপক্ষে একটি মহান ও প্রধান প্রতিবন্ধক।...যে জাতির স্বাধীনতা আছে, সেই জাতির ভাষা মুক্ত, সুতরাং উন্নত। আর যে জাতির স্বাধীনতা নাই সেই জাতির ভাষা বদ্ধ।

সুতরাং অনুন্নত ও অপরিমার্জ্জিত। ...ইতিহাস পাঠে আমরা অবগত হই যে প্রায় যখন যে জাতি সম্যক স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইয়াছে তখনই তাহাদের ভাষা সুমার্জ্জিত ও উন্নত হইয়াছে, এবং যখন যে জাতির স্বাধীনতা অপহৃত হইয়াছে তখনই তাহাদের ভাষা অবনতি প্রাপ্ত হইয়াছে। ...বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গবাসীরা সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন নহেন। ...আমাদিগের এই স্বাধীনতাশূন্যতা আমাদিগের মাতৃভাষা বঙ্গভাষার উন্নতির একটি প্রধান প্রতিবন্ধক।"[১৬]

এই উক্তির মধ্য দিয়ে ইংরেজ-সরকারের ভাষানীতির স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। স্বাধীনতা হীনতাই দেশ, জাতি ও মাতৃভাষার অবনতির কারণ। সেজন্য বেন্টিঙ্ক এদেশীয় শিক্ষাবিষয়ে তদন্তের জন্য উইলিয়ম অ্যাডামকে নিযুক্ত করতে বাধ্য হলেও (২০.১.১৮৩৫) তাঁর রিপোর্টের জন্য অপেক্ষা না করে ঔপনিবেশিক স্বার্থে মাত্র দু'মাসের মধ্যে মেকলের সুপারিশ গ্রহণ করে ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের জন্য সরকারি শিক্ষানীতি ঘোষণা করেছেন (৭.৩.১৮৩৫)। বেন্টিঙ্কের এই অদ্ভুত আচরণের কারণ কি? ইংরেজি-শিক্ষা-দানের নীতি ঘোষণার দ্বারা তিনি কি তদন্তের কাজ থেকে নিরস্ত হবার জন্য অ্যাডামকে নিরুৎসাহিত করতে চেয়েছিলেন? বেন্টিঙ্কের সেই অভিপ্রায় থাকলেও অ্যাডাম তাঁকে খুশী করেননি। তিনি তিন বছর ধরে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার বিভিন্ন অঞ্চলে দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে ব্যাপকভাবে তদন্ত করেছেন এবং তিন দফায় তিনটি পৃথক রিপোর্ট দিয়েছেন :—প্রথম রিপোর্ট ১ জুলাই, ১৮৩৫ ; দ্বিতীয় রিপোর্ট —২৩ ডিসেম্বর, ১৮৩৫ ; তৃতীয় রিপোর্ট—২৮ এপ্রিল, ১৮৩৮ খৃঃ। 'রিপোর্টের প্রথম খণ্ডে পূর্ব-প্রকাশিত শিক্ষা ও রাজস্ব সংক্রান্ত রিপোর্ট ও পুস্তক-পুস্তিকার উপর নির্ভর করিয়া এদেশের হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান যাবতীয় প্রাচীন ও আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার একটি আনুপূর্বিক বিবরণ প্রদান করেন। দ্বিতীয় খণ্ডে রাজসাহীর নাটোর মহকুমার শিক্ষাপদ্ধতির খুঁটিনাটি তথ্য প্রদত্ত হয়। তৃতীয় খণ্ডে বঙ্গের বিভিন্ন জেলায় গমনান্তর সেই সেই স্থানের শিক্ষাপ্রচেষ্টা সম্বন্ধে অ্যাডাম যেসব প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করেন তাহা লিপিবদ্ধ হইল। প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার ও উন্নতি সাধনের একটি পরিকল্পনাও ইহাতে তিনি সন্নিবিষ্ট করিলেন।'[১৭]

উইলিয়ম অ্যাডাম এদেশের জাতীয় শিক্ষা-কাঠামো গঠনের সময়ে দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থার কথা স্মরণে রাখতে বলেছেন। তিনি লিখেছেন, "দেশীয় ব্যক্তিদের চরিত্রের উন্নতির প্রচেষ্টাকালে ওপর থেকে নীচে পর্যন্ত সমস্ত রকমের দেশীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিকে এমন ভাবে দেশীয় ব্যক্তিদের শিক্ষার কাজে ব্যবহার

করতে হবে যা হবে সরল, নিরাপদ, জনপ্রিয়, মিতব্যয়ী ও ফলপ্রসূ। এতে জনসাধারণের শিক্ষার জন্য যা প্রয়োজন, তা দেওয়া সম্ভব। ফলে স্থানীয় অধিবাসীরা নিজেদের উন্নতিকল্পে যা প্রয়োজন তা করতে পারবেন। এছাড়া অন্য সব কিছুই অনুপযুক্ত।"[১৮] অ্যাডাম প্রাচীনকাল থেকে অনুসৃত শিক্ষা-দানের পদ্ধতিকে সংস্কার সাধনের কথা বলেছেন। এদেশে জনশিক্ষার প্রসার সম্বন্ধে লর্ড ময়রার অভিমতের (২.১০.১৮১৫) সঙ্গে একমত হয়ে তিনি মনে করেছেন, প্রথমে গ্রামের স্কুল-শিক্ষকদের বিদ্যাদানের পদ্ধতিকে উন্নত ও আধুনিক করতে হবে এবং তারপরে তাঁরা অর্জিত জ্ঞান দিয়ে শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত গ্রামগুলিকে আলোকিত করবে।[১৯]

প্রাচীন বিদ্যালয়গুলির উন্নতির জন্য অ্যাডাম নিম্নলিখিত সাত-দফা পদক্ষেপ গ্রহণের পরামর্শ দিয়েছেন :

(ক) প্রথম ধাপ হ'ল, এই প্রকল্প পরীক্ষার জন্য এক বা একাধিক জেলা বেছে নেওয়া ;

(খ) দ্বিতীয় ধাপ হ'ল, বাছাই করা জেলা বা জেলাগুলিতে শিক্ষা-সমীক্ষা সেই ভিত্তিতেই করা হবে যে ভিত্তিতে তিনি সমীক্ষা করেছেন ;

(গ) তৃতীয় ধাপ হ'ল, শিক্ষক ও ছাত্রদের ব্যবহারযোগ্য বই আধুনিক ভারতীয় ভাষায় লেখা ;

(ঘ) চতুর্থ ধাপ হ'ল, প্রত্যেক জেলার জন্য একজন পরীক্ষক নির্বাচন করা, যিনি হবেন এই প্রকল্পের প্রধান কর্মচারি। তাঁর কাজ হবে এলাকাটি সমীক্ষা করা, শিক্ষকদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা, বইপত্র বুঝিয়ে দেওয়া, পরীক্ষা গ্রহণ ও পুরস্কৃত করা এবং সাধারণভাবে এই প্রকল্প সফল করা।

(ঙ) পঞ্চম ধাপ হ'ল, শিক্ষকদের মধ্যে পুস্তক বণ্টন এবং পরীক্ষা গ্রহণের দ্বারা উত্তীর্ণ ব্যক্তিদের পুরস্কৃত করে তাঁদের উৎসাহ দেওয়া। অ্যাডাম নর্মাল স্কুল স্থাপনেরও সুপারিশ করেছিলেন, যেখানে এদেশীয় স্কুলের শিক্ষকেরা বছরে এক থেকে তিন মাস পর্যন্ত শিক্ষা গ্রহণে উৎসাহিত হবেন। এই শিক্ষণকাল হবে প্রায় চার বছরের এমনভাবে যাতে ছাত্রদের কোনো অসুবিধা সৃষ্টি না করে শিক্ষকেরা তাঁদের গুণগত যোগ্যতার উন্নতি ঘটাতে পারেন।

(চ) ষষ্ঠ ধাপ হ'ল, শিক্ষকদের উৎসাহ দেওয়া যাতে তাঁরা নবলব্ধ জ্ঞান ছাত্রদের মধ্যে সঞ্চার করেন এবং পরীক্ষা গ্রহণ ও পুরস্কার দেন।

(ছ) সপ্তম ধাপ হ'ল, গ্রামের স্কুলকে জমি দেওয়া, যাতে শিক্ষকেরা গ্রামে বসবাস করতে ও গ্রামের ছেলেদের শিক্ষা দিতে উৎসাহিত হন।[২০]

অ্যাডামের মতে জাতীয় শিক্ষার সুদৃঢ় ভিত্তি হ'ল আঞ্চলিক ভাষার স্কুল অর্থাৎ গ্রামের পাঠশালা। দেশীয় মানুষকে শিক্ষিত করতে হলে প্রথমে গ্রামকে 'ইউনিট' বা মূল একক বলে ধরতে হবে এবং গ্রাম থেকে থানা; থানা থেকে মহকুমা, মহকুমা থেকে জেলা, জেলা থেকে বিভাগ, বিভাগ থেকে প্রদেশ—এভাবে নীচ থেকে ক্রমে ওপরের দিকে লক্ষ্য রেখে শিক্ষাবিস্তারের পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে। দেশীয় পাঠশালায় চার শ্রেণীর ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রস্তাব দিয়ে তিনি আধুনিক পাঠক্রম গ্রহণের সুপারিশ করেছেন। তাঁর প্রস্তাবিত পাঠক্রমে বর্ণপরিচয়, শুভঙ্কর, গণিত, ভূগোল, ইতিহাস, বিজ্ঞান, বাংলা শুদ্ধ লিখন, পত্রদলিল, দেশীয় আইন, স্থানীয় শিল্প-সম্বন্ধে জ্ঞান ও উৎপাদন প্রক্রিয়া ইত্যাদি বিষয়সমূহ নির্দিষ্ট করা হয়েছে। জনশিক্ষার প্রসারকল্পে প্রাচীন শিক্ষা-ব্যবস্থার সংস্কার ও উন্নয়নের জন্য অ্যাডাম চার-দফা প্রস্তাব দিয়েছেন —(১) পাঠশালার পাঠ্যপুস্তকের জন্য মাতৃভাষায় আধুনিক জ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে পুস্তক রচনা ও প্রকাশ; (২) দেশীয় বিদ্যালয়গুলিতে আধুনিক পাঠ্যপুস্তকসমূহের প্রচলন; (৩) পাঠ্যপুস্তক থেকে লব্ধ জ্ঞানের পাক্ষিক পরীক্ষা; (৪) ছাত্রদের উৎসাহদানের জন্য পরীক্ষার ফলের ভিত্তিতে পুরস্কার-বিতরণের ব্যবস্থা।

ভাষা-মাধ্যম বিষয়ে অ্যাডাম মনে করেছেন, একমাত্র মাতৃভাষার মাধ্যমেই জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার কাঠামো গড়ে তোলা উচিত। এবিষয়ে তাঁর সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব হ'ল, "জাতীয় শিক্ষার ভিত্তি নির্মাণের জন্য আঞ্চলিক ভাষায় শিক্ষাদানের পদ্ধতিকে উন্নত ও সম্প্রসারিত করতে হবে। কিন্তু তা নতুন ও স্বতন্ত্র স্কুল তৈরি করে নয়, দেশীয় সুপ্রাচীন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিকে একাজে নিয়োগ করতে হবে।"[২১]

সেকারণে অ্যাডাম ইংরেজিভাষায় শিক্ষাদানের প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করে লিখেছেন, "যদি এমন কেউ থাকেন যাঁরা মনে করেন যে, দেশীয় জনগণের মধ্যে জ্ঞান বিস্তারে ইংরেজিভাষাকেই একমাত্র বা প্রধান মাধ্যম রূপে ব্যবহার করা উচিত তবে তাঁদের এই দৃষ্টিভঙ্গির চরম অবাস্তবতা সম্বন্ধে আমার যে স্থির প্রত্যয় তাকে পুরোপুরি ব্যক্ত করা আমার পক্ষে অসম্ভব।...একথা বিশ্বাস করা কঠিন যে, উচ্চতর সভ্যতায় উত্তরণ, বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ, নৈতিক নিয়ন্ত্রণ ও জীবনযাপনে স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য যে-সকল জ্ঞানের অনুশীলন প্রয়োজন, একটি বিদেশী ভাষার মাধ্যমে তার সবটুকু এই বিপুল জনসমষ্টির মধ্যে প্রচার করার প্রস্তাব উত্থাপিত হতে পারে।"[২২] অ্যাডাম মনে করেন যে, আঞ্চলিক ভাষায় শিক্ষা-গ্রহণের শেষে ইংরেজিভাষায় শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। তাই তিনি

দেশীয় আঞ্চলিক ভাষার বিদ্যালয়গুলিতে চতুর্থ শ্রেণীর বার্ষিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রদের ইংরেজিভাষায় অবৈতনিক শিক্ষাগ্রহণের সুযোগদানের প্রস্তাব দিয়েছেন। অ্যাডাম লক্ষ্য করেছেন, সামাজিক সম্মান, প্রতিপত্তি ও সম্পদ অর্জনের প্রলোভনে ইংরেজিভাষায় শিক্ষাগ্রহণের জন্য দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের অভিজাত ও মধ্যবিত্তশ্রেণীর ছাত্ররা শহরে ছুটে এসেছেন এবং শাসকগোষ্ঠী কেবলমাত্র তাঁদেরকে ইংরেজিভাষায় শিক্ষাদানের পক্ষপাতী ছিলেন।

অ্যাডাম মনে করেন, জনশিক্ষার দায়িত্ব সরকারকেই গ্রহণ করতে হবে। তিনি পাঁচটি জেলাকে বেছে নিয়ে তাঁর শিক্ষা-পরিকল্পনাকে কার্যকরী করার সুপারিশ করেছিলেন। এই পাঁচটি জেলা হ'ল —কৃষ্ণনগর, ফরিদপুর, যশোহর, বাখরগঞ্জ ও ২৪ পরগণা। এই জেলাগুলিতে পাঠশালার সংখ্যা ছিল ৩৮৫। তাঁর মতে শিক্ষা-কর প্রবর্তনের দ্বারা জনশিক্ষার জন্য অর্থ সংগ্রহ করতে হবে। অন্য কোনো ভাবে অর্থ সংগৃহীত না হলে রাজস্ব থেকে ব্যয় করতে হবে। অ্যাডাম লিখেছেন, "কোনো উপায়েই যদি অর্থের সংস্থান না হয় তবে সরকারের রাজস্ব থেকেই তা ব্যয় করতে হবে। কারণ রাজস্বখাতে সংগৃহীত অর্থের ওপরে লক্ষ লক্ষ রিক্ত-নিঃস্ব, অজ্ঞ লোকের দাবি সবচেয়ে বেশি। তাঁরাই তো মাথার ঘাম পায়ে ফেলে হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খেটে তাঁদের রাজস্ব-উৎপাদনের পন্থা করে দেয়। দশ কোটি লোকের শিক্ষার জন্য বার্ষিক রাজস্ব কুড়ি কোটি টাকা থেকে মাত্র এক লক্ষ টাকা ব্যয়-বরাদ্দ আর কতকাল চলবে ?"[২৩]

কিন্তু এই জলন্ত প্রশ্নের উত্তর দেবার ক্ষমতা ছিল না বিদেশী শাসকদের। এদেশের নরম-মাটিতে শোষণ-সাম্রাজ্যকে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্য নিয়েই তাঁরা একদল দেশীয় সহযোগীকে পেতে চেয়েছিলেন। তাই অ্যাডামের বস্তুনিষ্ঠ প্রস্তাব অগ্রাহ্যের দ্বারা ইংরেজ-বণিক ও দেশীয় ভূম্যধিকারিদের রাখী-বন্ধনের প্রতি গভীর প্রত্যয়-আস্থা ঘোষিত হ'ল। অজুহাত অর্থাভাব। ১৮৩৮-৩৯ সালের জেনারেল কমিটির বার্ষিক রিপোর্টে অ্যাডামের পরিকল্পনা সম্পর্কে বলা হয়েছে, "আঞ্চলিক ভাষায় শিক্ষাদান ও গ্রামের পাঠশালাগুলির উন্নয়নের বিষয়ে অ্যাডামের পরিকল্পনা সম্পর্কে সতর্কতার সঙ্গে বিবেচনার পরে আমরা মনে করি যে, তা কার্যকরী করা সম্ভব নয় ; কারণ এই পরিকল্পনা বিস্তর খুঁটিনাটি-সমন্বিত অত্যন্ত জটিল প্রকৃতির ও প্রচুর ব্যয়-সাপেক্ষ। এই পরিকল্পনাকে রূপায়িত করার পক্ষে যে কতদূর অসুবিধা ও ব্যয়বাহুল্য হবে তা অ্যাডামও ভাবতে পারেন নি।"[২৪] কিন্তু এই যুক্তি উত্থাপন যে একটা অজুহাত মাত্র তা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে উপরোক্ত প্রতিবেদনের শেষাংশে —"এদেশীয় শিক্ষা-সম্পর্কে আমাদের অভিজ্ঞতা

ও সতর্ক বিবেচনা আমাদের কার্যক্রমকেই সমর্থন করে। তা হ'ল এই যে, জেলার সদর-শহরে উচ্চ ও মধ্যবিত্তশ্রেণীর মধ্যে শিক্ষা-বিস্তারের জন্য আমাদের সমগ্র প্রয়াস সর্বপ্রথমে কেন্দ্রীভূত করতে হবে এবং তাঁদের দ্বারা গ্রামস্থ দেশীয় ভাষার স্কুলগুলি সমৃদ্ধ হবে।"[২৫]

যেখানে জেনারেল কমিটি ইংরেজিভাষার মাধ্যমে কেবলমাত্র উচ্চ ও মধ্যবিত্তশ্রেণীর মধ্যে শিক্ষা-প্রসারের চিন্তা করেছেন, সেখানে অ্যাডামের লক্ষ্য ছিল মাতৃভাষার মাধ্যমে দেশের মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি ও চিত্তবৃত্তির উন্নয়ন। কিন্তু তা হ'ল না। ইংরেজিভাষায় শিক্ষাদানের দ্বারা দেশের জনসমাজের ক্ষুদ্রতম অংশ আলোকিত হলেও বৃহত্তম অংশ গ্রামের কৃষক-সাধারণ রইলেন অজ্ঞতার অন্ধকারে —বহুপুরুষ লালিত অন্ধ বিশ্বাস ও কুসংস্কারের মাঝে —নিয়তি নির্ভরতা ও আত্মশক্তি সম্পর্কে আস্থাহীনতা থেকে মুক্তি পেলেন না তাঁরা। সাম্রাজ্যিক-সামন্ততান্ত্রিক শোষণের দৃঢ় বেড়াজাল ঘিরে রইল তাঁদের চারদিকে। 'এই বিদেশী শিক্ষাবিধি রেল কামরার দীপের মতো। কামরাটা উজ্জ্বল, কিন্তু যে যোজন যোজন পথ গাড়ি চলেছে ছুটে সেটা অন্ধকারে লুপ্ত। কারখানার গাড়িটাই যেন সত্য, আর প্রাণবেদনায় পূর্ণ সমস্ত দেশটাই যেন অবাস্তব।"[২৬]

তবে একথাও এখানে বলা প্রয়োজন যে, সাম্রাজ্য-রক্ষার স্বার্থে শাসক-শোষকের সঙ্গে শাসিত-শোষিতদের মেল-বন্ধনের বিষয়ে জেনারেল কমিটির সঙ্গে অ্যাডামের কোনো মতবিরোধ ছিল না। জেনারেল কমিটি চেয়েছিলেন সমাজের প্রভাবশালী ব্যক্তিদের শিক্ষিত করে তাঁদের মাধ্যমে নিপীড়িত শ্রেণীর ওপরে প্রভাব-বিস্তারের দ্বারা সমগ্র ভারতভূখণ্ডকে শাসন করা ; আর অ্যাডাম শোষিত শ্রেণীর মধ্যে বিদেশী শাসকদের সামাজিক ভিত্তি গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। অর্থাৎ সাম্রাজ্য-রক্ষার পদ্ধতিগত প্রশ্নে অ্যাডাম ও জেনারেল কমিটি ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। অ্যাডাম বলেছেন, "জনশিক্ষার একটি বিচক্ষণ ব্যবস্থা দেশের মানুষকে সরকারের আরো কাছে টেনে আনতে সাহায্য করবে, দেশবাসীর মনের ওপর সরকারের প্রভাব বাড়িয়ে দেবে এবং ব্যাপক প্রজাসাধারণ ও মুষ্টিমেয় শাসকের মধ্যে পারস্পরিক এক সহানুভূতির সম্পর্ক গড়ে তুলবে।"[২৭] সাম্রাজ্যরক্ষার বিষয়ে শাসনকর্তাদের সঙ্গে অভিন্ন মত পোষণ করলেও অ্যাডাম এদেশে জনশিক্ষা প্রসারকল্পে যেসব পরামর্শ দিয়েছেন, তা যদি গৃহীত হত, তাহলে বাংলাদেশের কৃষকসমাজ সামন্ততান্ত্রিক শোষণের জাল ছিন্ন করে মুক্তিলাভের সুযোগ পেতেন।

কেবলমাত্র অ্যাডাম নন, কলকাতা স্কুল বুক সোসাইটিও এদেশে বৃটিশ

প্রভাব বিস্তারের উদ্দেশ্য নিয়ে মাতৃভাষায় পুস্তক প্রকাশে উদ্যোগী হয়েছিলেন। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের ২৪ ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিত সোসাইটির অষ্টম সাধারণ সভায় সোসাইটির প্রভাবশালী সদস্য মিঃ. হোল্ট ম্যাকেঞ্জী তাঁর ভাষণে বলেছেন, দেশীয় ভাষাগুলির চর্চার জন্য সোসাইটির তৎপরতায় তিনি আনন্দিত। কেননা, সোসাইটির যা প্রধান এবং প্রান্তিক লক্ষ্য হওয়া উচিত, সেই ইংরেজি-চর্চার পথ এতেই প্রশস্ত হবে। ভিন্ন ভিন্ন ভাষার দৌত্যেই যে পরস্পর ভিন্ন ভিন্ন অনুভূতি ও স্বার্থের সঙ্গে পরিচিত হতে পারে, এই সত্যের ওপরেও তিনি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। ম্যাকেঞ্জী আরো বলেছেন, ইউরোপীয় জ্ঞানবিজ্ঞানের মূল সূত্রগুলি সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে দেশীয় ভাষায় রচিত পুস্তকসমূহে। সেই পুস্তকগুলিই ইংরেজি ভাষা, সাহিত্য এবং বিজ্ঞানের ভূমিকা রচনা করেছে। যেসব ভাবধারার আশ্রয়ে ভাষা পুষ্ট, সেই ভাবধারাগুলি যদি একবার পরিচিত হয়ে পড়ে তাহলে সেই ভাষার সঙ্গে আত্মীয়তা-স্থাপনের পথ আর দুর্গম থাকে না —ঝর্ণার উৎস থেকে দূরবর্তী জলে যাঁরা তৃষ্ণা মিটিয়েছেন, তাঁদের স্বভাবতই তখন আগ্রহ থাকে উৎসমুখের পবিত্র গভীর ধারার স্বাদ নিতে। অভিজ্ঞতা একথা আমাদের কাছে স্পষ্ট করে তুলেছে যে, বাংলা-রচনার চাহিদা এবং সমাদর যেমন বেড়েছে, ইংরেজি-চর্চার আকাঙ্ক্ষাও ঠিক সেই পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে।[২৮] অর্থাৎ ইংরেজিভাষা-চর্চার পথ প্রস্তুত করাই হ'ল সোসাইটির দেশীয় ভাষায় কর্মপ্রয়াসের প্রধান লক্ষ্য ; কারণ, তারফলে ইংরেজিভাষা এদেশের সাধারণের ভাষা রূপে গড়ে উঠবে এবং তা শাসক ও শাসিতের মধ্যে সেতুবন্ধনের কাজ করবে। ইংরেজিভাষা ও দেশীয় ভাষার শিবিরের মধ্যে মতবিরোধ ঘটলেও ঔপনিবেশিক স্বার্থের বিষয়ে এই দুই শিবিরের মধ্যে কোনো অমিল ছিল না। দুই পক্ষ ভিন্ন পথ অবলম্বন করলেও দুই শিবিরের মূল লক্ষ্য ছিল ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের স্বার্থরক্ষা।

একই লক্ষ্য হলেও ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কোর্ট অব ডিরেক্টর্স সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবার আশঙ্কায় এদেশে মাতৃভাষায় জনশিক্ষা-প্রসারের প্রস্তাবকে সমর্থন করতে পারেননি। তাই তাঁরা শিক্ষাখাতে বরাদ্দ অর্থ ইংরেজিভাষায় শিক্ষাদানে ব্যয় করার জন্য উৎসাহ-প্রেরণা দিয়েছিলেন। বিষবৃক্ষের বীজ তাঁরা ছড়িয়ে দিয়েছেন সমাজের উপরিভাগে। ক্ষেত্র প্রস্তুত ছিল ; সুতরাং অঙ্কুরোদ্গমে দেরি হ'ল না। ইংরেজি শেখার জন্য উচ্চ ও মধ্য-শ্রেণীর বিপুল আগ্রহ লক্ষ্য করে স্কুল বুক সোসাইটি দেশীয় ভাষায় পুস্তক-প্রকাশের তুলনায় ইংরেজিভাষায় অধিকতর সংখ্যক পুস্তক-প্রকাশে উদ্যোগী

হলেন। তাঁরা মনে করেছিলেন যে, ইংরেজি-শিক্ষিত ব্যক্তিরা মাতৃভাষায় পুস্তক-রচনায় উৎসাহী হবেন। অর্থাৎ তাঁরা নিম্নমুখী পরিস্রুতি তত্ত্বকে গ্রহণ করে সোসাইটির পুস্তক-প্রকাশের নীতি নির্ধারণ করেছিলেন। সোসাইটির দশম প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, "পূর্বে দেশীয় ভাষায় পুস্তক-প্রকাশে কমিটির সমগ্র প্রয়াস নিয়োজিত হত। কিন্তু বর্তমানে অন্যান্য ভাষার তুলনায় ইংরেজি ভাষায় পুস্তক-প্রকাশে অধিকতর দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে।"[২৯] তার পরিচয় পাওয়া যায় নিম্নলিখিত সারণীতে[৩০] :

ভাষা	১৮১৭-১৮২১ (৪ বৎসর)		১৮৩৪-১৮৩৫ (২ বৎসর)	
	মুদ্রণ-সংখ্যা	বিতরণ ও বিক্রি-সংখ্যা	মুদ্রণ-সংখ্যা	বিতরণ ও বিক্রি-সংখ্যা
দেশীয় ভাষাসমূহ	৫৯,০০০	৫২,০০০	২৫,৫০০	১৩,৬৯৩
ইংরেজিভাষা	৪,২৫০	৩,৩৩৮	২৯,০০০	৩১,৬৪৯

সোসাইটি লক্ষ্য করেছেন, এদেশে ইংরেজি-শেখার আগ্রহ ক্রমবর্ধমান। নিম্নলিখিত সারণী[৩১] তার পরিচয় বহন করেছে :

সাত বৎসরের (১৮২৮-১৮৩৪) বই বিক্রি ও বিতরণ সংখ্যা			
১৮২৮-১৮২৯	১৮৩০-১৮৩১	১৮৩২-১৮৩৩	১৮৩৩-১৮৩৪
৯,৬১৬	১১,০৬৩	১৪,৭৯২	৩১,৬৪৯

সুতরাং সোসাইটি উপযুক্ত প্রতিবেদনে নিজেদের কাজের জন্য নিজেদেরকে অভিনন্দন জানিয়েছেন; কারণ মাতৃভাষায় পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ ও বিতরণের ফলে এদেশে ইংরেজি-শেখার আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে যা তাঁদের চূড়ান্ত লক্ষ্য ছিল।

স্কুল বুক সোসাইটি ঘোষণা করেছেন, "ইংরেজি-শেখার আগ্রহ প্রবল হওয়ায় সোসাইটির প্রশ্নাতীত কর্তব্য হ'ল ইংরেজিভাষায় রচিত পুস্তক-প্রকাশের জন্য একান্তভাবে মনোযোগী হওয়া।" যদিও তাঁরা দশম প্রতিবেদনে বলেছেন, "ভবিষ্যতে তাঁরা প্রধানতঃ ইংরেজি, বাংলা, হিন্দি, হিন্দুস্থানি ভাষায় গ্রন্থ প্রকাশ করবেন।" তাসত্ত্বেও তাঁরা আঞ্চলিক ভাষার তুলনায় ইংরেজিভাষার উপরে ক্রমশ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। কারণ তাঁদের মতে 'ইংরেজিভাষায় পরিণত জ্ঞান ভারতবর্ষের উন্নতির পথে অনেকখানি সহায়তা করবে।'[৩২]

দেশীয় যুবকদের উদারনৈতিক শিক্ষাদানের পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করার

জন্য সোসাইটি ইংরেজি ও আঞ্চলিক ভাষায় শিক্ষার উন্নয়নে সমন্বয়-সাধনের চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তাঁদের প্রয়াস বৃহদংশে ফলপ্রসূ হয়নি। তাঁদের আশা ছিল যে, ইংরেজি-শিক্ষিত এদেশীয় ছাত্ররা আঞ্চলিক ভাষায় শিক্ষাদানে ব্রতী হবেন ও পুস্তক রচনা করবেন এবং এভাবেই শিক্ষা সমাজের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়বে। কিন্তু তাঁদের আশা পূর্ণ হ'ল না। কারণ ইংরেজি-শিক্ষিত ব্যক্তিদের মাতৃভাষার জ্ঞান ছিল খুবই দুর্বল। ইংরেজি শিখতে গিয়ে তাঁরা মাতৃভাষায় বাক্যগঠনের প্রণালী ভুলে গিয়েছেন। ফলে তাঁরা মাতৃভাষায় গ্রন্থ-রচনায় ব্রতী হলেন না। তাছাড়া ইংরেজি-শিক্ষিত ব্যক্তিদের সরকারি চাকরি-লাভের সুযোগ থাকায় তাঁরা দেশীয় ভাষায় শিক্ষাকার্যে আত্মনিয়োগ করলেন না।

স্কুল বুক সোসাইটি যখন ইংরেজি-চাহিদা পূরণের জন্য তাঁদের পুস্তক প্রকাশের নীতি পরিবর্তন করেছেন, তখন ইংরেজি থেকে বাংলায় অনূদিত পুস্তক প্রকাশের জন্য ১৮৫০ সালের ডিসেম্বর মাসে 'বঙ্গ ভাষানুবাদক সমাজ' বা 'ভার্ণাকুলার লিটারেচার সোসাইটি' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এর উদ্দেশ্য ছিল, 'ট্রাক্ট সোসাইটি কিম্বা খৃষ্টান নলেজ সোসাইটি কি স্কুল বুক সোসাইটি অথবা আসিয়াটিক সোসাইটি চতুষ্টয় সভার সাহেবেরা সভার নিয়মমতে সর্বসাধারণের পাঠ্য উত্তম যে সকল পুস্তক প্রকাশ করিতে পারেন না তাহা উক্ত কমিটির সাহেবেরা প্রকাশ করিবেন।'[৩৩] অর্থাৎ স্কুল বুক সোসাইটি কিংবা মিশনারি প্রতিষ্ঠানগুলির লক্ষ্যের সঙ্গে 'বঙ্গ ভাষানুবাদক সমাজ'-এর লক্ষ্য এক ছিল না। তাঁরা সেই সমস্ত ইংরেজি-পুস্তক বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশের সংকল্প করেছিলেন, যে বইগুলি এসময়কার ধর্মীয় কিংবা অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি কর্তৃক প্রকাশের কোনো পরিকল্পনা ছিল না। অর্থহীন ও অনিষ্টকর সাহিত্যের ক্ষতিকর প্রভাবের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য লিটারেচার সোসাইটি সুস্থ ও নৈতিক মানোন্নয়নকারী আকর্ষণীয় বাংলা-গ্রন্থ প্রকাশের সংকল্প গ্রহণ করেছিলেন।

বঙ্গভাষানুবাদক সমাজের নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপন থেকে তাঁদের গ্রন্থ-প্রকাশের উদ্দেশ্য অনেকটা জানা যাবে :

"১ম। পুস্তকখানি সুনীতি সম্পন্ন বা চরিত্রশোধক হইবেক।

২য়। নিম্নলিখিত বিষয়ে অথবা অন্য কোন বিষয়ে লিখিত হইবেক।

১. প্রাকৃতিক ইতিবৃত্ত এবং বিজ্ঞান শাস্ত্র।
২. দেশ প্রদেশের বিবরণ ও ভূগোল বৃত্তান্ত।
৩. বাণিজ্য এবং লোকযাত্রা বিধান।
৪. লোকপ্রিয় ও উপকারক বিজ্ঞান শাস্ত্র।

৫. শিল্পবিদ্যা।
৬. শিক্ষাবিধান।
৭. জীবনচরিত।
৮. নীতিগর্ভ গল্প।

৩য়। বঙ্গভাষার যথার্থ রীত্যনুসারে অথচ সরল ভাষায় গ্রন্থের রচনা হইবেক ; বিশেষতঃ ঐ রচনা ও উহার ভাব এরূপ হওয়া আবশ্যক, যে এতদ্দেশীয় লোকের অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে।"[৩৪]

সোসাইটির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা মিঃ. এইচ. প্র্যাট বলেছেন, ইংরেজিভাষায় শিক্ষাদানের ওপরে অত্যধিক গুরুত্ব আরোপের দ্বারা এদেশীয় জনসাধারণকে ইউরোপের জ্ঞানসম্পদ থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। সুতরাং প্র্যাটের মতে বিজ্ঞানের সাহায্যে মানবজীবনকে উন্নত করার জন্য মাতৃভাষার মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও জনপ্রিয় সাহিত্য সস্তায় সকলের কাছে পৌঁছে দিলেই এই অন্যায়-অবিচার বন্ধ করা সম্ভব হবে।[৩৫] সোসাইটির প্রভাবশালী দেশীয় সদস্যদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাধাকান্ত দেব, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রমুখ। ইউরোপীয়দের মধ্যে ছিলেন বেথুন, হজসন প্র্যাট, মেরিডিথ টাউনশেণ্ড, মার্শম্যান, সিটনকার, হেনরি উডরো প্রমুখ।

'বঙ্গ ভাষানুবাদক সমাজ'-এর প্রতিষ্ঠাকাল থেকে পরবর্তী আট বছরের মধ্যে (১৮৫১-১৮৫৮) তাঁদের দ্বারা প্রকাশিত ২২টি বাংলা-গ্রন্থের মধ্যে ১৭টি ছিল ইংরেজি থেকে অনূদিত। এগুলির অধিকাংশই ছিল ঐতিহাসিক জীবনী ও জনপ্রিয় লোককাহিনী। অনুবাদ ছাড়াও মৌলিক রচনায় উৎসাহদান ছিল তাঁদের লক্ষ্য। জীবতত্ত্ব ও বিজ্ঞান, ভূগোল, বাণিজ্য, অর্থনীতি, ব্যবহারিক বিজ্ঞান, শিল্পকলা, শিক্ষা, শিক্ষামূলক গল্প ইত্যাদি বিষয়ে মৌলিক রচনার জন্য তাঁরা ২০০ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছিলেন। এই ঘোষণার ফলে প্রাপ্ত ১০টি রচনার মধ্যে তাঁরা মধুসূদন মুখার্জী রচিত 'সুশীলোপাখ্যান' এবং রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মিনী উপাখ্যান' কাব্যগ্রন্থকে শ্রেষ্ঠ বলে ঘোষণা করেছিলেন।

প্রথম পাঁচ বৎসরে (১৮৫১-১৮৫৬) 'বঙ্গ ভাষানুবাদক সমাজ' ২টি পঞ্জিকা-সহ ১০টি গ্রন্থের ৫, ৬৭৯ কপি বিনামূল্যে বিতরণ করেছেন। ১৮৫৬ সাল থেকে তাঁরা সরকারের কাছ থেকে মাসিক ১৫০ টাকা মাত্র সাহায্য পেয়েছেন। ফলে পরবর্তী দু'বছরে ১২টি পুস্তকের ২৫০০০ কপি

মুদ্রিত হয়েছে এবং তাঁরা ৯,৩০৫ কপি বিতরণ করেছেন। এসময়ে ব্যক্তিগত উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত অন্যান্য মুদ্রণযন্ত্র থেকে যে-সকল গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল, সেগুলির তুলনায় সমাজ-এর অধিকাংশ গ্রন্থ ছিল নীরস ও বৈশিষ্ট্য-বর্জিত। এই পুস্তকগুলির সমালোচনা করে 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকা লিখেছেন (২৭ চৈত্র, ১২৬৬), "ভদ্র লোকের ও বালকবালিকাদের পাঠোপযোগী সুপ্রণালীসিদ্ধ গ্রন্থ প্রচারই বঙ্গভাষানুবাদক সমাজের প্রধান উদ্দেশ্য। যদি এরূপ উদ্দেশ্যই হয় তবে সামাজিকদের এতদ্বিষয়ে গুটিকত উপদেশ লওয়া কর্ত্তব্য। সমাজ সংস্থাপনাবধি সামাজিকেরা যতগুলি গ্রন্থ ও পুস্তক প্রচার করিয়াছেন, তাহার অধিকাংশই নিষ্প্রয়োজন ও অকিঞ্চিৎকর হইয়াছে। আপনার দোষগুণ আপনার হৃদয়ঙ্গম হয় না। এ নিমিত্তে বঙ্গভাষানুবাদক সমাজ তাহা বুঝিতে পারেন নাই।"[৩৬] ফলে গ্রন্থগুলি জনপ্রিয় না হওয়ায় বঙ্গ ভাষানুবাদক সমাজ ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে স্কুল বুক সোসাইটির সঙ্গে মিশে যায়।

এসময়ে বঙ্গ ভাষানুবাদক সমাজ, স্কুল বুক সোসাইটি, শ্রীরামপুর মিশন ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান মাতৃভাষায় যে সকল পুস্তক প্রকাশ করেছেন, সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল:

জ্ঞানাঞ্জন (১৮৩৮) —গৌরীকান্ত ভট্টাচার্য; আরব্য ইতিহাসের সার সংগ্রহ (১ম —১৮৩৮) —অনুবাদকের নাম নেই ; শিশুসেবধি (১৮৪০) — ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায় ; ভারতবর্ষের ইতিহাস (১ম —১৮৪০) —গোপাললাল মিত্র ; বাঙ্গালার ইতিহাস (১৮৪০) —গোবিন্দচন্দ্র সেন ; সন্দেশাবলি (১৮৪০) —স্বরূপচন্দ্র দাস ; ভূগোল (১৮৪১) —অক্ষয়কুমার দত্ত ; জ্ঞানার্ণব (১৮৪২) — প্রেমচাঁদ রায়; সর্ব্বার্থ সংগ্রহ (১৮৪৫) —কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়; তেরো খণ্ডে বিদ্যাকল্পদ্রুম (১৮৪৬) —কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়; বেতাল পঞ্চবিংশতি (১৮৪৭) —বিদ্যাসাগর ; পঞ্জাবেতিহাস (১৮৪৭) —রাজনারায়ণ ভট্টাচার্য ; শাহনামা (১৮৪৭) —বিশ্বেশ্বর দত্ত; বাঙ্গালার ইতিহাস (২য় ভাগ—১৮৪৮)—বিদ্যাসাগর; ভারতবর্ষীয়েতিহাস সার সংগ্রহ (১ম —১৮৪৮ ; ২য় —১৮৪৯) —বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়; জীবনচরিত (১৮৪৯) —বিদ্যাসাগর ; আরব্য উপন্যাস (১৮৫০) —নীলমণি বসাক ; শিশুশিক্ষা (১৮৫১) —রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ; বোধোদয় (১৮৫১) —বিদ্যাসাগর ; নবনারী (১৮৫২) —নীলমণি বসাক; লর্ড ক্লাইব (১৮৫২) —হরচন্দ্র দত্ত; রাবিনসন ক্রুসোর জীবনচরিত (১৮৫২) —জন রবিনসন; বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার (১ম —১৮৫২ ; ২য় —১৮৫৩) — অক্ষয়কুমার দত্ত ; চারুপাঠ (১ম —১৮৫২ ; ২য় —১৮৫৪ ; ৩য় —১৮৫৯) —

অক্ষয়কুমার দত্ত; জ্ঞানপ্রদীপ (১৮৫৩) —গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ; শকুন্তলা (১৮৫৪) — বিদ্যাসাগর; প্রাকৃত ভূগোল (১৮৫৪) —রাজেন্দ্রলাল মিত্র; কাদম্বরী (১৮৫৪) —তারাশঙ্কর তর্করত্ন; বত্রিশ সিংহাসন (১৮৫৪) —নীলমণি বসাক; গঙ্গার খালের সংক্ষেপ বিবরণ (১৮৫৫) —জন রবিনসন; ধর্মনীতি (১৮৫৫) — অক্ষয়কুমার দত্ত; দশকুমার (১৮৫৬) —গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন; পারস্য উপন্যাস (১৮৫৬)—নীলমণি বসাক; ভারতবর্ষের ইতিহাস (তিন ভাগ ১৮৫৬-১৮৫৮) — নীলমনি বসাক পদার্থ বিদ্যা (১৮৫৬) – অক্ষয়কুমার দত্ত; কথামালা (১৮৫৬) — বিদ্যাসাগর; চরিতাবলী (১৮৫৬) —বিদ্যাসাগর; রাসেলাস (১৮৫৭) —তারাশঙ্কর তর্করত্ন; অন্ধকূপ হত্যার ইতিহাস (১৮৫৮) —রামগতি ন্যায়রত্ন; টেলিমেকস্ (১৮৫৮; ১৮৬০) —রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়; পুরাবৃত্তসার (১৮৫৮) —ভূদেব মুগোপাধ্যায়; প্রাকৃতিক বিজ্ঞান (১ম ও ২য়, ১৮৫৮-১৮৫৯) —ভূদেব মুখোপাধ্যায়; সীতার বনবাস (১৮৬০) —বিদ্যাসাগর; শিল্পিক দর্শন (১৮৬০) —রাজেন্দ্রলাল মিত্র; শিবাজীর চরিত্র (১৮৬০) —রাজেন্দ্রলাল মিত্র; মেবারের রাজেতিবৃত্ত (১৮৬১) —রাজেন্দ্রলাল মিত্র; ব্যাকরণ প্রবেশ (১৮৬২) —রাজেন্দ্রলাল মিত্র; পত্রকৌমুদী (১৮৬৩) —রাজেন্দ্রলাল মিত্র; আখ্যানমঞ্জরী (১৮৬৩) —বিদ্যাসাগর; ভ্রান্তিবিলাস (১৮৬৯) —বিদ্যাসাগর ইত্যাদি।

একদিকে মাতৃভাষায় পাঠ্যপুস্তক-রচনা, অন্যদিকে মাতৃভাষায় শিক্ষাদান ও দেশীয় ভাষায় শিক্ষিত ব্যক্তিদের চাকরির দাবি যখন ক্রমশ প্রবল হয়ে উঠেছিল, তখন ১৮৩৭ ও ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে আইনানুসারে বাংলাদেশের জেলা আদালতগুলিতে ফারসি ভাষার পরিবর্তে বাংলাভাষা প্রবর্তিত হয়। এই দুটি আদালতের আদেশ, বিজ্ঞাপন, নোটিশ, সমন ইত্যাদি জনগণের সুবিধার জন্য আইনের দ্বারা বাংলায় লিখে প্রচার করার নির্দেশ দেওয়া হয়। 'আদালতের কাজে যখন ফারসীর বদলে বাংলার প্রচলন হ'ল (১৮৩৭ সালের ২৯ আইন) তখন ফারসী-শিক্ষিত বাঙ্গালী বিন্দুমাত্র উল্লসিত হননি। বরং দুঃখই পেয়েছিলেন।'[৩৭] দেওয়ান কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায় তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন, "ইহার কয়েকদিন পরেই গবর্ণমেণ্ট গেজেটে প্রকাশ হইল যে এদেশের সমস্ত রাজকার্য দেশীয় ভাষায় চলিবেক। বাঙ্গালীর পক্ষে পারস্য একরূপ অকর্ম্মণ্য হইল, এবং ইহার আদর এককালে উঠিয়া গেল। বহু যত্নের ও শ্রমের ধন অপহৃত হইলে, অথবা উপার্জ্জনক্ষম পুত্র হারাইলে যেরূপ দুঃখ হয়, সেইরূপ দুঃখ এই সংবাদে আমাদের মনে উপস্থিত হইল। অনেক পরিশ্রমপূর্ব্বক যে-কিছু শিখিয়াছিলাম, তাহা মিথ্যা হইল, এবং বিদ্বান বলিয়া যে খ্যাতি লাভের আশা ছিল, তাহা

নির্ম্মূল হইয়া গেল। পূর্ব্বে আমার পিসতুতো ভ্রাতা শ্রীপ্রসাদকে আমি পারস্য শিখাইতাম, তিনি আমাকে ইংরাজী পড়াইতেন। কিন্তু এ বিদ্যাশিক্ষায় আমার বিশেষ মনোযোগ ছিল না। এক্ষণে পারস্যবিদ্যার আলোচনায় এককালে বিরত হইয়া ইংরাজীবিদ্যা শিক্ষায় মনোনিবেশ করিলাম।"[৩৮]

দেওয়ান কার্তিকেয় একা নন, আদালতে দেশীয় ভাষা প্রবর্তনের আইন গৃহীত হওয়ায় অনেকেরই শিরে সংক্রান্তি হয়েছিল। তাঁদের আর্তনাদ প্রকাশিত হয়েছে সংবাদপত্রে। অনেকে চিঠি লিখে আপত্তি প্রকাশ করেছেন। 'কতিপয় জনানাং' নামে কয়েকজন চিঠি লিখেছেন, 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকায় (৭ জুলাই, ১৮৩৮), "ঐ সকল বাবুরা সাহেবলোকের সমীপে জানান যে পারস্য প্রচলিত থাকাতে দেশের অনেক অনিষ্ট হইতেছে ঐ কথার প্রামাণ্যতায় যদি গবর্ণমেণ্ট আদালত হইতে পারসী পরিবর্তন করেন নিতান্তই দুঃখের বিষয় আমরা নিশ্চিত কহিতে পারি যে এদেশস্থ ব্যক্তিদিগের মধ্যে পারস্য ভাষা লিখন পড়নের কিঞ্চিন্মাত্র রসজ্ঞ যিনি হবেন তেঁহ ঐ ভাষা পরিবর্ত্তনে কদাচ সম্মত হইবেন না ···আমরা গবর্ণমেণ্টকে বিনয়পূর্ব্বক নিবেদন করিতেছি যে পারস্য পরিবর্ত্তনের পূর্ব্বে তাবত জিলার জজ সাহেবেরদের নামে হুকুম প্রকাশ করেন যে তাঁহারা মফঃস্বলের তাবৎ জমিদার ও তালুকদার ইত্যাদি ব্যক্তিকে বিশেষরূপে জিজ্ঞাসা করেন যে তাঁহারা আদালতে কোন ভাষা প্রচলিত থাকিতে সম্মত আছেন।"[৩৯]

অবশ্য আদালতে দেশীয় ভাষা প্রবর্তনের পক্ষে চিঠিপত্র প্রকাশিত হয়েছে এবং 'সমাচার দর্পণ', 'জ্ঞানান্বেষণ' ইত্যাদি পত্রিকাগুলি আদালতে দেশীয় ভাষা প্রচলনের জন্য সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। কিন্তু প্রশ্ন হ'ল, বৃটিশ-সরকার কি প্রকৃতই আদালতে দেশীয় ভাষা প্রচলনের জন্য সচেষ্ট হয়েছিলেন? আইনকে কার্যকরী করার জন্য তাঁরা কি সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করেছিলেন? তাছাড়া দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্রের মতন পারস্যশিক্ষিত ব্যক্তিরা আদালতের কাজের জন্য দেশীয় ভাষা না শিখে কেন ইংরেজিভাষা শিখতে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন? এই দুটি প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় তৎকালীন সংবাদপত্রের পাতায়।

'ফোর্ট উইলিয়ম রাজধানীর অন্তঃপাতি বঙ্গাদি তাবৎ প্রদেশে আদালত ও রাজস্ব সম্পর্কীয় কার্য্যে পারস্য ভাষার পরিবর্ত্তে দেশীয় ভাষার চলন হইবে এবং এইরূপ পরিবর্ত্তনকরণার্থ ১ জানুয়ারি তারিখ অবধি ১২ মাস নির্দ্দিষ্ট হইল'[৪০] বলে সুস্পষ্ট ভাষায় সরকারি ঘোষণা সত্ত্বেও আদালতে দেশীয় ভাষা প্রবর্তনের জন্য তাঁদের কোনো আন্তরিক প্রয়াস ছিল না এবং তারফলে ফারসি ভাষার ছাত্ররা মাতৃভাষা না শিখে ইংরেজিভাষা শিখতে উৎসাহ

বোধ করেছেন। দশ বছরের সরকারি প্রয়াসের ফলাফল বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকা মন্তব্য করেছেন (৫.৪.১৮৪৮), "বহুদিন হইল ব্রিটিস রাজপুরুষেরা এই রাজ্যের সমুদয় বিচারালয়ে বঙ্গভাষা ব্যবহৃত হইবার অনুমতি দিয়াছেন, কিন্তু আমলারূপে যে সকল ব্যক্তি নিযুক্ত হইয়াছেন, তাঁহারদিগের মধ্যে প্রায় তাবতেই —বঙ্গভাষা লিখন পঠনে অনভিজ্ঞ তাঁহারা মোকদ্দমা সম্বন্ধীয় যে সকল দরখাস্ত অথবা পত্র লিখিয়া থাকেন, তাহাতে কতক বাঙ্গালা, কতক পারস্য, কতক ইংরাজী ও কতক ওলন্দাজী শব্দ ব্যবহার করেন, এ কারণ তাঁহারা ব্যতীত বঙ্গভাষায় সুনিপুণ অন্য কোন ব্যক্তি ঐ সকল কাগজপত্রের মর্ম্ম অবধারণ করিতে পারেন না, গবর্ণমেণ্ট ঐ সকল আমলাদিগের শিক্ষার পরীক্ষা গ্রহণ না করাতেই রাজবিচারে অশুদ্ধ বাঙ্গালা ভাষা ব্যবহার হইয়া আসিতেছে, এবং দেশীয় লোকেরাও বঙ্গভাষানুশীলনে অমনোযোগি হইয়াছেন, যেহেতু বিচারালয়ের কর্ম্মার্থিরা জানিয়াছেন যে বাঙ্গালা ভাষার প্রতি রাজার দৃষ্টি নাই, যেরূপে লিখিতে পারিলেই বিচারপতিরা সন্তুষ্ট হয়েন, এজন্য তাঁহারাও বঙ্গভাষার প্রতি অযত্ন করিয়া কেবল আইনের ধারা সকল কণ্ঠস্থ করত রাজকার্য্যে মনোনীত হইয়া থাকেন, অতএব আমারদিগ্যে অবশ্য বলিতে হইবেক যে রাজপুরুষেরা সমুদয় বিচারালয়ে বঙ্গভাষা ব্যবহৃত হইবার অনুমতি দিয়াছেন বটে, কিন্তু বঙ্গভাষার উন্নতি বিষয়ে তাঁহারদিগের কিছুমাত্র যত্ন দেখি না, তাঁহারা এই দেশে ইংরাজী ভাষা প্রচারের নিমিত্ত বিবিধ প্রকার বিদ্যালয় ও পুস্তকালয় স্থাপিত করিয়াছেন, কিন্তু বঙ্গভাষার প্রাচুর্য্যার্থ অল্পব্যয়ও করিতে পারেন না।"[৪১]

একই অভিযোগ উত্থাপন করেছেন রাজনারায়ণ বসু। তিনি ১৮৪৮ সালের ১ জুন বলেছেন, "বঙ্গদেশীয় বিচারালয় সকলে বঙ্গভাষা ব্যবহারের নিয়ম প্রচার করিয়া তাহা সফল করিবার জন্য কি উপযুক্ত উপায় চেষ্টা করিয়াছেন? তাঁহারা কি তৎপরে অনুসন্ধান করিয়াছেন যে সে নিয়ম বলবৎ হইতেছে কি না? এইক্ষণে যে ভাষাতে সেই সকল বিচারালয়ের কার্য্য নির্ব্বাহ হয় সে ভাষা বাঙ্গালা নহে, ইংরাজী নহে, হিন্দী নহে, পারসীক নহে, কিন্তু তাহা এই সমুদয় ভাষার সন্নিপাত স্বরূপ হইয়াছে। বিচারালয়ের কোন লিপি এ পর্য্যন্ত শুদ্ধ দেখি নাই, যাহারা কোন কালে ভাষা রচনা শিক্ষা করে নাই, তাহারাই বিচারাগারের লিপি কর্মচারী। জ্ঞানাপন্ন রাজাদিগের রাজকার্য্যের যে এইরূপ বিকৃতি হয়, ইহা অতি দুঃখের বিষয়। নিয়ম আছে অথচ তদনুযায়ী কর্ম্মানুষ্ঠান হয় না, ইহা কদাপি ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের যোগ্য নহে।"[৪২]

আদালতে দেশীয় ভাষা প্রচলনের পূর্বে প্রয়োজন ছিল দেশীয় ভাষায় শিক্ষাবিস্তার। কিন্তু সে বিষয়ে ইংরেজ-সরকারের আন্তরিকতার অভাব লক্ষ্য করে তৎকালে অনেকেই ইংরেজি-শিক্ষার তীব্র সমালোচনা করেছেন। তাঁদের সমালোচনা বন্ধ করার জন্য ১৮৪৪ সালে ১৮ ডিসেম্বরে লর্ড হেনরি হার্ডিঞ্জ কর্তৃক গৃহীত সরকারি প্রস্তাবে বলা হয় যে, বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার বিভিন্ন জেলায় আঞ্চলিক ভাষার ১০১টি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা হবে। বাংলা প্রেসিডেন্সীর অন্তর্ভুক্ত নিম্নলিখিত সাতটি ডিভিসনে ১০১টি স্কুল-প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয়:

বিভাগ	জেলা	প্রাথমিক বিদ্যালয়
পাটনা	৫	১৪
ভাগলপুর	৬	১৭
মুর্শিদাবাদ (রাজসাহী)	৬	১৭
ঢাকা	৫	১৫
যশোহর	৭	১৯
কটক	৪	১১
চট্টগ্রাম	৩	৮
৭টি বিভাগ	৩৬টি জেলা	১০১টি বিদ্যালয়

বাংলাদেশের চারটি ডিভিসনের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন জেলায় বরাদ্দ স্কুলের সংখ্যা:

(১) মুর্শিদাবাদ ডিভিসন:

জেলা	বিদ্যালয়
মুর্শিদাবাদ	৩
বীরভূম	৩
রংপুর	৩
রাজশাহী	৩
পাবনা	৩
বগুড়া	২
	১৭

(২) যশোহর ডিভিসন:

জেলা	বিদ্যালয়
যশোহর	৩
নদীয়া	৩
২৪ পরগণা	৩
হুগলী	৩
বর্ধমান	৩
বারাসত	২
বাঁকুড়া	২
	১৯

(৩) ঢাকা ডিভিসন :

জেলা	বিদ্যালয়
ঢাকা	৩
শ্রীহট্ট	৩
ময়মনসিংহ	৩
বাখরগঞ্জ	৩
ফরিদপুর	৩
	১৫

(৪) চট্টগ্রাম ডিভিসন :

জেলা	বিদ্যালয়
চট্টগ্রাম	৩
ত্রিপুরা	৩
ভুলুয়া	২
	৮

বাংলাদেশের ২১টি জেলায় বাংলাভাষায় শিক্ষাদানের জন্য ৫৯টি প্রাথমিক স্কুল মঞ্জুর করা হয়। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় এই স্কুলের সংখ্যা ছিল খুবই সামান্য। প্রকৃতপক্ষে আঞ্চলিক ভাষার স্কুলের মাধ্যমে জনশিক্ষা প্রসারের কোনো পরিকল্পনা হার্ডিঞ্জের ছিল না। তিনি এই স্কুলগুলিকে 'মডেল' স্কুল-রূপে গড়তে চেয়েছিলেন। কোম্পানি-সরকার প্রত্যেকটি স্কুলের জন্য একজন শিক্ষক নিয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন এবং শিক্ষকদের তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করে তাঁদের জন্য নিম্নলিখিত হারে[৪৩] বেতন ধার্য করেছেন :

শ্রেণী	শিক্ষক	প্রতি শিক্ষকের মাসিক বেতন	মোট
প্রথম	২০	২৫ টাকা	৫০০ টাকা
দ্বিতীয়	৩০	২০ টাকা	৬০০ টাকা
তৃতীয়	৫১	১৫ টাকা	৭৬৫ টাকা

এই তিন শ্রেণীর ১০১ জন শিক্ষককে নিম্নলিখিত সংখ্যায়[৪৪] চারটি ডিভিসনে নিযুক্ত করার সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয়েছে :

ডিভিসন	প্রথম শ্রেণীর শিক্ষক	দ্বিতীয় শ্রেণীর শিক্ষক	তৃতীয় শ্রেণীর শিক্ষক	মোট শিক্ষক
মুর্শিদাবাদ	৩	৫	৯	১৭
ঢাকা	৩	৪	৮	১৫
যশোহর	৪	৬	৯	১৯
চট্টগ্রাম	২	২	৪	৮
	১২	১৭	৩০	৫৯

বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার ১০১ জন শিক্ষকের মধ্যে ৫১ জন অথবা কেবলমাত্র বাংলাদেশের জন্য নির্দিষ্ট ৫৯ জন শিক্ষকের মধ্যে ৩০ জন শিক্ষকের অর্থাৎ অধিকাংশ শিক্ষকের মাসিক বেতন ১৫ টাকা ধার্য করা হয়েছে। স্বাভাবিক ভাবে অত্যন্ত স্বল্প বেতনে অধিকাংশ স্কুলে উপযুক্ত শিক্ষক পাওয়া গেল না। তাছাড়া প্রত্যেকটি স্কুলে একজন শিক্ষক ছাড়া অতিরিক্ত শিক্ষক-নিয়োগের কোনো ব্যবস্থা করা হ'ল না। স্কুল-গৃহ নির্মাণ, আসবাবপত্র, শিক্ষার সরঞ্জাম এবং অন্যান্য বিষয়ের ব্যয়ভার বহন করবেন স্থানীয় জনসাধারণ। সরকার কেবলমাত্র ১০১ জন শিক্ষকের বেতন বাবদ বার্ষিক ২২,৩৮০ টাকা অর্থাৎ মাসিক ১৮৬৫ টাকা ব্যয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।

কিন্তু যোগ্য শিক্ষক না পাওয়ায় হার্ডিঞ্জের প্রস্তাব রূপায়ণের পথে বাধা সৃষ্টি হয়েছিল এরকম বহু উদাহরণ আছে। স্থানীয় জনসাধারণের উদ্যোগে স্কুল গৃহ নির্মিত হলেও শিক্ষক-নিয়োগ করতে Council of Education ব্যর্থ হয়েছেন। ১৮৪৫ সালের ২৪ অক্টোবর কাউন্সিলের প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, তাঁরা বাংলাদেশের পাঁচটি জেলায় মাত্র ১৪জন শিক্ষক নিয়োগ করতে সক্ষম হয়েছেন : (ক) বারাসত —২ ; (খ) নদীয়া —৩ ; (গ) চট্টগ্রাম —৫ ; (ঘ) ২৪ পরগণা —৩ ; (ঙ) দিনাজপুর —১। সাতটি জেলায় তাঁদের মনোনীত ১৫ জন শিক্ষক স্বল্প বেতনে শিক্ষক-পদে যোগদানে অস্বীকৃত হয়েছেন : (ক) মালদহ —২ ; (খ) শ্রীহট্ট —২ ; (গ) বগুড়া —১ ; (ঘ) ত্রিপুরা —৩ ; (ঙ) রংপুর —১ ; (চ) বাখরগঞ্জ —৩ ; (ছ) ময়মনসিংহ —৩।

শিক্ষকদের অনুল্লেখযোগ্য বেতনদানে 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকা গভীর অসন্তোষ প্রকাশ করে লিখেছেন (৬. ১. ১২৭২), "এদেশীয় মুন্সেফদিগের ন্যায় এদেশীয় শিক্ষকেরা পর্য্যাপ্ত বেতন পান না। অথচ তাঁহাদিগের খাটুনী ও পরিশ্রমের ত্রুটি নাই। ইহা কি বেতন বৃদ্ধির শ্রেণীবিভাগ না থাকিলে ভাল শিক্ষক পাওয়া যায় না, ইউরোপীয় শিক্ষকের বিষয়ে এ কারণ যেমন বলবান এদেশীয় অন্যত্র সুবিধা হইলে কেহ শিক্ষকতা স্বীকারে সম্মত হন না।"[৪৫] সুতরাং "যখন কেরাণীদিগের শ্রেণী বন্ধন হইয়াছে এবং গবর্ণমেণ্ট কৃতবিদ্য ও উপযুক্ত কেরাণী পাইবার আশায় অধিকতর বেতন-দান স্বীকার করিয়াছেন, তখন যে ব্যক্তিদিগের উপরে সেই কৃতবিদ্য লোক প্রস্তুত করিবার ভার সমর্পিত হয়, তাঁহাদিগের বেতন বৃদ্ধি করা যে অবশ্য কর্ত্তব্য, তদ্বিষয়ে অনুমান সংশয় নাই।"[৪৬]

অথচ স্থানীয় জনসাধারণের অর্থে বাংলা-স্কুলের জন্য গৃহ-নির্মাণ করা হচ্ছিল

কারণ বাংলায় শিক্ষা-গ্রহণের সুযোগলাভের জন্য জনসাধারণের প্রবল আগ্রহ ছিল। নিম্নলিখিত সারণী[৪৭] তারই পরিচয় বহন করছে :

বৎসর	স্কুলের সংখ্যা
১৮৪৫	৩৪
১৮৪৬	৭১
১৮৪৭	৬৯
১৮৪৮	৭৩
১৮৪৯	৫৮
১৮৫০	৪৩
১৮৫১	৩৪

উপর্যুক্ত সারণীতে দেখা যায় যে, জনসাধারণের বিপুল আগ্রহে ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে সর্বাধিক স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। স্কুলের সংখ্যা ছিল ৭৩। ছাত্রসংখ্যা ছিল ২,৮২৪ এবং দৈনিক উপস্থিতির গড় সংখ্যা ছিল ২,০৯৫। অর্থাৎ প্রতিটি স্কুলের ছাত্রসংখ্যা ৩৯ ও উপস্থিতির গড় সংখ্যা ছিল ২৯। প্রতি ছাত্র পিছু মাসিক এক আনা বেতন বাবদ আয় হয়েছিল ৩,৭২৩৷৵৮ পাই এবং বই বিক্রি বাবদ আয় হয়েছিল ১০১৩৷৷৮ পাই।[৪৮] কিন্তু অর্থব্যয়ে সরকারের অনীহা, উন্নত-মানের পাঠ্যবই ও যোগ্য শিক্ষকের অভাব, বেতনদানে অনিয়ম ও দেশীয় স্কুলগুলিকে উন্নত করার প্রয়াস না থাকায় ১৮৪৯ সাল থেকে ক্রমশ স্কুলগুলির অবলুপ্তি ঘটতে থাকে এবং ১৮৫৫ সালে স্কুলের সংখ্যা হয় ২৬।

মিশনারি স্কুলের মতো সরকারি বাংলা-স্কুলগুলি অবৈতনিক ছিল না এবং বিনামূল্যে ছাত্রদের পাঠ্যবই দেওয়া হ'ত না। কারণ হিসাবে বলা হয়েছে যে, বেতনদানের নিয়ম থাকার ফলে অভিজাতশ্রেণী তাঁদের সন্তানদের সরকারি বাংলা-স্কুলে ভর্তি করতে উৎসাহী হবেন, অন্যথায় অবৈতনিক হলে দরিদ্রশ্রেণীর ছেলেরা ভর্তি হবেন। ১৮৪৯ সালের ৮ মার্চ সরকারি প্রস্তাবে বেতনদানের নির্দেশ প্রত্যাহারের দাবির বিরোধিতা করে বলা হ'ল, "অবৈতনিক দেশীয় পাঠশালাগুলির সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা সরকারি বাংলা স্কুলের লক্ষ্য নহে। দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থাকে উন্নত করা ও প্রভাবশালী অভিভাবকদের সন্তানদের উপস্থিতিকে সুনিশ্চিত করাই সরকারের একমাত্র উদ্দেশ্য। সুতরাং এই পরিকল্পনা-অনুসারে যে-সকল সরকারি স্কুল স্থাপিত হয়েছে, তাতে বেতন দানের নিয়ম অবশ্যই থাকা উচিত।"[৪৯]

সরকারের এই ঘোষণা থেকে সুস্পষ্ট হয় যে, হার্ডিঞ্জের বাংলা-স্কুল স্থাপনের

পরিকল্পনায় জনগণের জন্য মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তারের কোনো উদ্দেশ্য ছিল না। কেবলমাত্র সমাজের বিশিষ্ট অভিভাবকদের সন্তানদের মাতৃভাষায় উন্নত শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যেই এই পরিকল্পনা রচিত হয়েছিল। সেকারণে এই যুক্তি প্রদর্শন করা হয়েছিল যে, 'সকলেই শিক্ষালাভ করতে চায়, কিন্তু তাঁদের মধ্যেই শিক্ষা-বিস্তার করা উচিত যাঁরা কেবলমাত্র মাতৃভাষায় শিক্ষাপ্রসারে আত্মনিয়োগ করবেন না; তাঁরা অন্যান্যদেরকেও এই কাজে ব্রতী হওয়ার জন্য প্রভাব বিস্তার করবেন।'[৫০] অর্থাৎ ইংরেজি-শিক্ষার মতো বাংলা শিক্ষার ক্ষেত্রেও 'নিম্নমুখী পরিস্রুতি তত্ত্ব'কে কার্যকরী করার চেষ্টা হয়েছিল। বণিক সরকার এদেশীয় অনভিজাতশ্রেণীর সন্তানদের শিক্ষাদানের বিরোধী ছিলেন। তাই সরকারি বাংলা-স্কুলগুলিতে কৃষিজীবীশ্রেণীর কোনো প্রবেশাধিকার ছিল না, বেতন দিয়ে পড়ার অধিকার ছিল কেবলমাত্র প্রভাবশালী-বিত্তশালী শ্রেণীর সন্তানদের।

ভাষা-প্রশ্নে ইংরেজির পৃষ্ঠপোষকতা করার জন্য সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে মাতৃভাষা বিকাশের যে সুযোগ ছিল তাও অব্যাহত রাখতে ইংরেজ-সরকার অনিচ্ছুক ছিলেন। তাই এই পরিকল্পনাকে কার্যকরী করার জন্য তাঁরা ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করেননি। পরিকল্পনানুযায়ী ১০১টি স্কুল-স্থাপন কিংবা বন্ধ স্কুল উপযুক্ত স্থানে পুনরায় খোলার বিষয়ে অর্থাভাবের অজুহাত দেখিয়ে ১৮৪৯ সালের ৮ মার্চের সরকারি ঘোষণায় বলা হ'ল, সরকারকে পূর্বাহ্নে অবহিত না করে কোনো নতুন স্কুল খোলা যাবে না। এমন কি বন্ধ স্কুলের পরিবর্তে নতুন স্কুলও অন্যত্র খোলা যাবে না। তাছাড়া তাঁরা যে কোনো স্কুল প্রয়োজনে বন্ধ করে দিতে পারবেন। ঘোষণা জারির পর থেকে তাঁরা সচেতন ভাবে অর্থসঙ্কটের অজুহাতে একটার পর একটা স্কুল বন্ধ করার কৌশল অবলম্বন করেছেন। অথচ সরকারকে প্রতি ছাত্র পিছু মাসিক মাত্র ১০ আনা ব্যয় করতে হচ্ছিল।

মাতৃভাষায় শিক্ষার জন্য অর্থব্যয়ে সরকারের অনুদারতা লক্ষ্য করে 'সোমপ্রকাশ' লিখেছেন, "১৮৬০।৬১ অব্দে এই বঙ্গদেশে গবর্ণমেণ্টের ১৩ কোটি টাকা লাভ হইয়াছে, তন্মধ্যে শিক্ষাকার্য্যে কেবল ৮ লক্ষ মাত্র ব্যয়িত হইয়াছে। হিসাব করিয়া দেখিলে প্রতি ব্যক্তিতে ॥৵ দশ আনা পড়ে না। ইংলণ্ডের লোকেরা এত যে সভ্য, সেখানেও গবর্ণমেণ্টকে প্রতি ছাত্রে ১৸৹ দিতে হয়। বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট শিক্ষা বিষয়ে এত কৃপণতা করিতেছেন কেন? আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। প্রজারা বিদ্বান হইলে গবর্ণমেণ্ট কি তাহাতে লাভ-জ্ঞান করেন না?"[৫১]

রাজস্ব-বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মচারিদের ওপরে হার্ডিঞ্জের শত স্কুলের পর্যবেক্ষণের দায়িত্ব দেওয়া হলেও তারা এই স্কুলগুলি সম্পর্কে অত্যন্ত উদাসীন ছিলেন। পক্ষান্তরে তাঁরা জেলার সদর-শহরে ইংরেজি-স্কুল স্থাপনে অত্যন্ত উৎসাহী ছিলেন। তাঁরা সরকারি মনোভাব বুঝেছিলেন বলে বাংলা-স্কুলগুলি সম্পর্কে কোনো ভাবনা-চিন্তা করতেন না। বাংলা-স্কুলগুলিকে সামগ্রিকভাবে কিংবা অংশত ইংরেজি-স্কুলে পরিণত করার প্রস্তাব সম্পর্কে ১৮৪৯ সালের ২০ ডিসেম্বর সরকারি ঘোষণায় বলা হয় যে, এটা সরকারের লক্ষ্য নয়, কিংবা এটা সম্ভব নয়, অথবা সম্ভব হলেও সমগ্র বাংলাদেশের জনসাধারণকে ইংরেজিতে শিক্ষিত করার কোনো প্রয়োজন নেই।[৫২] তাসত্ত্বেও এধরণের প্রয়াসের ওপরে কোনো নিষেধাজ্ঞা জারি না হওয়ায় বাংলা-স্কুলগুলির অধিকাংশই ধীরে ধীরে ইংরেজি স্কুলে পরিণত হয় এবং বাকিগুলি বন্ধ হয়ে যায়।

দেশীয় পাঠশালাগুলিকে উন্নত না করে কেবলমাত্র কয়েকটি 'মডেল' স্কুল স্থাপনের দ্বারা মাতৃভাষার মাধ্যমে জনশিক্ষার প্রসার সম্ভব নয়। এ সত্য উপলব্ধি করে যশোহর ডিভিসনের কমিশনার সঠিকভাবেই বলেছিলেন যে, জনশিক্ষা-বিস্তারের জন্য সরকার কি সমগ্র দেশের জনসাধারণের জন্য যথেষ্ট সংখ্যক আঞ্চলিক ভাষায় স্কুল-স্থাপনের দায়িত্ব গ্রহণ ও ব্যয় বহন করতে প্রস্তুত? কিন্তু ইংরেজ-সরকারের সে ধরণের কোনো সাধু উদ্দেশ্য ছিল না।

তাহলে বাংলা-স্কুল স্থাপনের জন্য হার্ডিঞ্জের প্রস্তাবের প্রকৃত উদ্দেশ্য কি ছিল? এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় তৎকালীন নথিপত্রে। ১৮৫৩ সালের ২৫ জুলাই বৃটিশ পার্লামেন্টের সিলেক্ট কমিটির এক প্রশ্নের উত্তরে স্যার ফ্রেডারিক হ্যালিডে বলেছেন, "সাধারণত এই অভিযোগ করা হয় যে, মাতৃ-ভাষায় শিক্ষাদানের প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করা হয়েছে এবং মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের জন্য সরকারের কাছে বারে বারে দাবি উত্থাপন করা হয়। সেকারণে গভর্ণর-জেনারেলের কাছে যে অর্থ ছিল, লর্ড হার্ডিঞ্জ সেই অর্থের দ্বারা বাংলা-স্কুল স্থাপন করেছেন।"[৫৩]

১৮৫৩ সালের ১৪ জুন রেঃ. জে. সি. মার্শম্যান উক্ত সিলেক্ট কমিটির সামনে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে বলেছেন, "সরকারি নীতির সমালোচকদের মুখ বন্ধ করার জন্য হার্ডিঞ্জের প্রস্তাবে সরকারি বাংলা স্কুল স্থাপন করা হয়েছিল। যদিও এটা সকলেরই জানা ছিল যে এই স্কুলগুলি বেশিদিন চলবে না।"[৫৪] অর্থাৎ এই মন্তব্যগুলি থেকে হার্ডিঞ্জের প্রস্তাবের প্রকৃত উদ্দেশ্য উপলব্ধি করা যায়। জনশিক্ষা প্রসারে তাঁদের কোনো আন্তরিক উদ্যোগ ছিল না। কেবলমাত্র

সরকারি শিক্ষানীতির সমালোচনা বন্ধ করার জন্যই এই প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছিল। তাতে কি জনসাধারণের সমালোচনা বন্ধ হয়েছিল? উত্তরের জন্য অতীতের দিকে তাকাতে হবে।

১৮৪৮ সালের ১ জুন ডেভিড হেয়ারের স্মৃতিসভায় রাজনারায়ণ বসু সরকারি শিক্ষানীতির তীব্র সমালোচনা করে বলেছেন, "হা! যৎপরিমাণে এই মহা কার্য্য সাধনের প্রয়োজন, তাহার প্রতি তৎপরিমাণে রাজা কি প্রজা সকলেরই অবহেলা। আমারদিগের দেশ অজ্ঞান তিমির দ্বারা যেরূপ আচ্ছন্ন রহিয়াছে, তাহা চিন্তা করিলে চিত্ত ব্যাকুল হয়। চতুর্দ্দিকে কি মহাশূন্য দেখিতেছি। অসীম সম বিস্তারিত মরুভূমি ঘোরতর রজনীচ্ছায়াতে আবৃত রহিয়াছে। কুত্রাপি কোন ইংলণ্ডীয় বিদ্যালয় স্বরূপ ক্ষুদ্র দীপ প্রকাশে পার্শ্ববর্ত্তী অন্ধকার আরও প্রগাঢ় বোধ হইতেছে। বিশেষতঃ সর্ব্বসাধারণের শিক্ষাস্থান যে আমারদিগের দেশীয় ভাষার পাঠশালা, তাহাও সেই অন্ধকারের আলয়।...

"আমারদিগের যে সকল দেশীয় পাঠশালা সর্ব্বসাধারণের শিক্ষাস্থান, তাহা যখন এপ্রকার অচিন্ত্য বিষম দুর্দ্দশা গ্রস্ত, তখন দেশ মধ্যে বিদ্যার আলোক বিকীর্ণ হইবার কি সম্ভাবনা? কিন্তু এই সকল পাঠশালাতেও কত লোক শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়? ইহা চিন্তা করিলে বিস্ময়ার্ণবে মগ্ন হইতে হয় যে বাঙ্গলা ও বেহারের প্রত্যেক শত বালকের মধ্যে কেবল আটজন মাত্র বালক বিদ্যাভ্যাসে প্রবৃত্ত হয়, এবং প্রত্যেক শত প্রৌঢ় ব্যক্তির মধ্যে ছয়জন মাত্র অল্প লেখন পঠনে সমর্থ হয় —প্রত্যেক শতে ৯২ বা ৯৪ ব্যক্তি যৎ কিঞ্চিৎ অতি সামান্য প্রকার বিদ্যার্জ্জনেও বঞ্চিত রহিয়াছে। বাঙ্গলা ও বেহারের ৬০,০০০০০ যষ্টি লক্ষ শিক্ষনীয় বালক এবং ২১০,০০০০০ দুই কোটী দশ লক্ষ প্রৌঢ় ব্যক্তি কিরণ শূন্য প্রগাঢ় অন্ধকারে মূর্চ্ছিত রহিয়াছে। দেশীয় লোকের একপ্রকার বিস্তারিত অজ্ঞান চিন্তা করিলে কাহার চিত্ত প্রদীপ্ত দুঃখানলে দগ্ধ না হয়? নিরাশায় ম্লান ও অবসন্ন না হয়?...

"এ অসাধারণ অজ্ঞান নিরাকরণ না হইলে এদেশের মঙ্গলোন্নতি জন্য অন্য কোন চেষ্টা সফল হইবে না। কিন্তু ইহার উপায় করা কি বিস্তীর্ণ কার্য্য! ক্রোশ বা দ্বিক্রোশান্তে পাঠশালা স্থাপন ব্যতীত সাধারণ রূপে বিদ্যাজ্যোতি ব্যাপ্ত হওয়া সম্ভব নহে। কিন্তু বাঙ্গলা পাঠশালা সকলের বর্ত্তমান অবস্থা যতকাল থাকিবে, ততকাল এ আশা অতি ক্ষুদ্র পরিমাণেও সার্থক হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। অতএব তৎপরিবর্ত্তে উৎকৃষ্ট বিদ্যালয় সকল সংস্থাপন করা, বঙ্গ ভাষায় বিবিধ বিদ্যা বিষয়ক উত্তমোত্তম গ্রন্থ সকল প্রস্তুত করা, এবং

ছাত্রদিগকে তাহার উপদেশ প্রদানের নিমিত্তে সুযোগ্য কৃতবিদ্য শিক্ষক সকল নিযুক্ত করা ইহার আবশ্যক উপায় হইয়াছে।

"কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে ইংলণ্ডীয় ভাষায় নানাবিধ পুস্তক প্রস্তুত আছে ও তাহার সুনিপুণ শিক্ষক সকল অনায়াসে প্রাপ্ত হয়, অতএব এদেশীয় লোককে বাঙ্গালার পরিবর্ত্তে সাধারণ রূপে ইংলণ্ডীয় ভাষার উপদেশ করা উচিত। অনেক ইংলণ্ডীয় পুরুষ এবং আমারদিগের স্বদেশস্থ কোন কোন ইংলণ্ডীয় ভাষাভিজ্ঞ যুবাও এই মত প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু ইহার পর অলীক মতও আর নাই। এ ভ্রম খণ্ডনের নিমিত্তে এই মাত্র বিবেচনা করা উচিত যে আত্ম ভাষায় কি পর ভাষায় জ্ঞান উপার্জ্জন সুলভ হয়? এবিষয়ে আমারদিগের কোন সংশয় স্থলই বোধ হয় না—ইহা প্রশ্নেরও যোগ্য নহে। **শিশুর রসনা মাতৃদুগ্ধ পানের সহিত যে ভাষার অনুশীলন করে, বিদ্যারম্ভের পূর্ব্বকালেই যে ভাষার অর্দ্ধভাগ তাহার কণ্ঠগত হয়, এবং তরুণ বা প্রৌঢ় কালে সাধ্যপর যত্নেও যাহা বিস্মৃত হইতে লোক অসমর্থ হয়, সেই পৈতৃক ভাষা অভ্যাস করা সুলভ নহে, আর পৃথিবীর ভিন্ন প্রান্তবাসী পরজাতীয় ভাষা শিক্ষা সুলভ, ইহা কি প্রকারে মনুষ্যের মনোগত হয়?** (বর্তমানকালের ভাষা-বিতর্কে ইংরেজি-সমর্থনকারিদের মোটা হরফে চিহ্নিত অংশটি স্মরণে রাখতে অনুরোধ করি। মোটা হরফ লেখকের।) পরদেশী ও ভাষা মাত্র অভ্যাসে যে কাল ব্যয় হয়, সে কাল মধ্যে স্বদেশীয় ভাষায় বিবিধ বিদ্যার সংস্কার হইতে পারে। যে অল্প ব্যক্তির স্বচ্ছন্দ অবস্থা, সুতরাং জ্ঞানার্জ্জনের যথেষ্ট কাল প্রাপ্তির উপায় আছে, তাহারা যদিও বহু অংশে কৃতার্থ হইতে পারে, কিন্তু দেশময় যে লক্ষ লক্ষ দরিদ্র সন্তান অন্নাভাবে শীর্ণ, বা যে সকল মধ্যবর্ত্তী গৃহস্থ বালকেরা দুরবস্থ হইয়া ক্ষুণ্ণ ভাবে কাল যাপন করে, যাহারদিগের পিতা মাতা কেবল আপন পুত্রদিগের ভাবী উপার্জ্জনের প্রত্যাশায় প্রাণ ধারণ করেন, সে সকল বালকের পরের ভাষায় ব্যুৎপন্ন হইয়া বিদ্যা লাভের সময় নাই, তাদৃশ বহু মূল্যে জ্ঞানার্জ্জন করিবার উপায়ও নাই। (একালের চিত্রও অনুরূপ। অথচ এঁদের শিক্ষা না দিলে শিক্ষা-বিস্তার ঘটে না; শিক্ষার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয় —লেখক)। সকল দেশেরই এই প্রকার ভাব, এ নিমিত্তে ইংলণ্ড দেশে উপায়ক্ষম ব্যক্তিদিগের নানা ভাষা শিক্ষার জন্য নগর বিশেষে যেরূপ মহা মহা বিদ্যাগার বর্ত্তমান আছে, তদ্রূপ সর্ব্বসাধারণের বিদ্যাভ্যাস নিমিত্তে গ্রামমধ্যে দেশ ভাষার পাঠশালা সকল স্থাপিত আছে। এ দেশের বিষয়েও রাজপুরুষদিগের সেই নিয়মের অনুবর্ত্তী হওয়া আবশ্যক।

দ্বিতীয়তঃ ইহাও বিবেচনার যোগ্য যে আত্ম ভাষা অপেক্ষা পরভাষা শিক্ষার নিমিত্তে চতুর্গুণ ধনের প্রয়োজন। ইংরাজী-বিদ্যালয়ের সাধারণ ছাত্রদিগের জ্ঞানাভ্যাসে যে ব্যয় হয় স্বভাষায় বালকেরা তাহার চতুর্থ অংশের এক অংশ ব্যয়ে তুল্য জ্ঞান উপার্জ্জন করিতে পারে। তৃতীয়তঃ স্বদেশের বিদ্যা যতকাল স্বদেশের ভাষা স্বরূপ সুচারু পরিচ্ছদ পরিধানে সজ্জীভূত না হয়, ততকাল সর্ব্বসাধারণের হৃদয়গত কখনই হইতে পারে না।...**স্বদেশোৎপন্ন শস্য যে রূপে সকলের সুলভ হইয়া সর্ব্বসাধারণের বল বৃদ্ধি করে, তদ্রূপ স্বদেশের ভাষা দ্বারা সকলে জ্ঞান তৃপ্ত হইয়া তৎ ফল সুখ সম্ভোগ করিতে পারে।** (মোটা হরফ লেখকের।)

"এদেশে পঞ্চবিংশতি বৎসরাবধি যে ইংরাজী ভাষার অনুশীলন যত্নের সহিত আরম্ভ হইয়াছে, ইহাতে কি ফল লব্ধ হইল ? এমত কি আশাই বা সঞ্চার হইয়াছে যে ভবিষ্যতে এদেশীয় লোক কেবল ইংলণ্ডীয় ভাষা দ্বারা জ্ঞানোপার্জ্জনে সমর্থ হইবে। ইহা সত্য যে এতাবৎ কাল পর্য্যন্ত ন্যূনাধিক দুই সহস্র ব্যক্তি ইংরাজী ভাষায় সুশিক্ষিত হইয়াছেন, এবং বিদ্যার প্রভাবে তাঁহারদিগের সংস্কৃত চিত্ত অজ্ঞান ঘনাম্বুদোপরি উত্থিত হইয়া অতি প্রসারিত নির্ম্মল জ্ঞানাকাশে বিচরণ করিতেছে, কিন্তু তাঁহারদিগেরও মধ্যে কয় ব্যক্তি সে ভাষাতে বিনা সংশয়ে রচনা করিতে পারেন ? আর সমস্ত দেশস্থ লোকের তুলনায় সেই দুই সহস্র সংখ্যাই বা কত ?...

"ইংলণ্ডীয় ভাষার প্রেমমুগ্ধ কোন কোন ব্যক্তির পরম প্রিয় বাসনা এই যে ইংলণ্ডীয় ভাষা এই মহা বিস্তীর্ণ ভারতবর্ষের দেশ ভাষা হইবে, এবং এই ক্ষণকার দেশ ভাষা সকল ঐ পরভাষা বলে লুপ্ত হইবে। (একালেও ইংরেজি 'ভাষার প্রেমমুগ্ধ' ব্যক্তিরা একই মনোভাব পোষণ করেন —লেখক)। কিন্তু ইহার পর অলীক কথা আর নাই। যাঁহারা একথা কহেন, তাঁহারা ইহাও বলিতে পারেন যে ভারতবর্ষের তাবৎ ভূমি খনন করিয়া ইংলণ্ড ভূমির দ্বারা তাহা পূর্ণ করিবেন। কোন দেশের ভাষা যে এককালে উচ্ছিন্ন হয় ইহা যুক্তি সিদ্ধ নহে, ইতিহাসেও ইহার উদাহরণ প্রাপ্ত হয় না।...

"কিন্তু ব্যক্ত করিতে লজ্জা উপস্থিত হইতেছে যে আমারদিগের স্বদেশস্থ ইংলণ্ডীয় ভাষাভিজ্ঞ কতিপয় যুবা পুরুষ অম্লান বদনে কহিয়া থাকেন যে, "সেই বাঞ্ছিত কাল কোন্ দিন আগমন করিবে যখন কেবল ইংরাজী ভাষা এই দেশের জাতীয় ভাষা হইবে।" হা! ইংলণ্ডীয় ভাষার বিদ্যাভ্যাসে ছাত্রদিগের বুদ্ধির প্রাখর্য্য হইতেছে বটে, কিন্তু কি বিষময় বিপরীত ফলেরও উৎপত্তি হইতেছে।

তাঁহারদিগের মধ্যে অনেকেই অন্য অন্য বিদ্যা শিক্ষার সহিত স্বদেশের ভাষা, স্বদেশের বিদ্যা ও স্বদেশের লোককে তুচ্ছ করিতে নিয়মিত শিক্ষা করেন। (একালেও একই মনোভাব বর্তমান। ইংরেজি ভাষার প্রতি অহেতুক আনুরক্তি ও দেশীয় ভাষার প্রতি অবজ্ঞার মনোভাব বর্তমান ভাষা-বিতর্কের কারণ —লেখক)।…

"অতএব হে স্বদেশস্থ বিজ্ঞ যুবকগণ। আমারদিগের দেশ ভাষা অনুষ্ঠানের বিপক্ষে পরদেশীয় কোন লোক যাহা বলুক, কিন্তু তাহারদিগের সঙ্গী হইয়া তোমারদিগের হাস্যাস্পদ হওয়া উচিত নহে। পরন্তু অনেক ইংরাজেরও এই একান্ত মত যে সামান্য প্রকার বিদ্যাভ্যাস করা যাহারদিগের প্রয়োজন, তাহারদিগের আপন ভাষা শিক্ষাই কর্তব্য।"[৫৫]

বক্তৃতার শেষাংশে রাজনারায়ণ বসু হার্ডিঞ্জের বাংলা-স্কুলের দুরবস্থা সম্পর্কে বলেছেন, "পূর্ব্বোক্ত এক শত বিদ্যালয়ের কথা কি কহিব ? তাহার দুরবস্থা আলোচনা করিলে ইহাই স্পষ্ট বোধ হয় যে সে বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের লেশ মাত্রও যত্ন নাই, তাহার প্রয়োজন সিদ্ধি করা তাঁহারদিগের অভিপ্রায় নহে। এই সকল পাঠশালা অপেক্ষা ইংলণ্ডীয় ভাষার বিদ্যালয়ের প্রতি তাঁহারদিগের যেরূপ উৎসাহ, তাহা চিন্তা করিলেই তাঁহারদিগের আন্তরিক অভিপ্রায় সুন্দর প্রকাশ পায়। তাঁহারা ইংরাজী বিদ্যালয়ের নিমিত্তে প্রচুর ধন ব্যয় করেন, তাহার তত্ত্বাবধারণ বিষয়ে বহু মনোযোগ করেন, উপযুক্ত শিক্ষক প্রস্তুতির জন্য পৃথক বিদ্যাগারও স্থাপন করিয়াছেন* কিন্তু পূর্ব্বোক্ত ঐ এক শত বাঙ্গলা পাঠশালার প্রতি তাঁহারদিগের যত্নের কি চিহ্ন প্রকাশ হইয়াছে ? গ্রন্থ নাই, শিক্ষক নাই, এবং তাহার তত্ত্বাবধারণেরও নিয়ম নাই, অথচ তাহার কার্য্য সফল হইবেক, ইহা অপেক্ষা অলীক কথা আর কি হইতে পারে ? একজন সাহেব যথার্থ কহিয়াছেন যে ইংরাজী পাঠশালা সকল গবর্ণমেণ্টের আপন আপন সন্তান, আর বাঙ্গলা পাঠশালা সকল সপত্নী সন্তান। আত্ম সন্তানের ন্যায় সপত্নী সন্তানকে কে স্নেহ করিয়া থাকে ? অতএব এদেশে দেশ ভাষা প্রচারের জন্য গবর্ণমেণ্টের যে চেষ্টা সে কেবল নাম মাত্র। ইংরাজ রাজা যদি এদেশীয় প্রজাদিগের কিঞ্চিৎ প্রত্যুপকার করিতে স্বীকৃত হয়েন —আমারদিগের সর্ব্বস্বের পরিবর্ত্তে যদি কিঞ্চিৎ বিদ্যা দান করা উচিত বোধ করেন, তবে ভারতবর্ষের

* বাঙ্গালা পাঠশালা অপেক্ষা ইংরাজী পাঠশালার নিমিত্তে তাঁহারদিগের কিঞ্চিৎ যতন দৃষ্ট হইতেছে, বাস্তবিক প্রজাদিগের বিদ্যানুশীলনের জন্য রাজার যদ্রূপ চেষ্টা কর্ত্তব্য, তাঁহারা তাহার সহস্র অংশের এক অংশও করিতেছেন না।

সর্ব্বস্থানে দেশ ভাষার পাঠশালা সকল সংস্থাপন করিয়া উৎকৃষ্ট নিয়মে শিক্ষাদান করুন। অনুরাগ, উৎসাহ ও উদ্যমের সহিত ইহাতে সচেষ্ট হউন।"[৫৬]

কিন্তু আদালতে দেশীয় ভাষা প্রচলন এবং হার্ডিঞ্জের বাংলা-স্কুল স্থাপন কেন করা হয়েছিল —এ প্রশ্নের উত্তরে রাজনারায়ণ বসু উক্ত বক্তৃতায় বলেছেন, "এই উভয় বিষয়েই তাঁহারদিগের যদ্রূপ অবহেলা তাহাতে সকলে অনায়াসে মনে করিতে পারেন যে, তাঁহারা কেবল এ বিষয়ে আপনারদিগের অনুৎসাহ গোপন করিবার নিমিত্তে এই উভয় নিয়ম প্রচার করিয়াছেন।"[৫৭]

একই অভিযোগ উত্থাপন করেছেন 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার সম্পাদক। তিনি লিখেছেন (এপ্রিল, ১৮৪৯), "যদিও এক্ষণে অনেকানেক বিজ্ঞলোক ইহা অঙ্গীকার করেন, যে স্বদেশীয় ভাষার অনুশীলন ব্যতিরেকে কোন দেশের আপামর সাধারণ সকল লোকের বিদ্যোপার্জ্জন হওয়া সম্ভাবিত নহে, কিন্তু আমারদিগের রাজপুরুষেরা তাহা শুনিয়াও শুনেন না। ইহা যে তাঁহারদিগের একটা কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া বোধ আছে, একাল পর্য্যন্ত তাহার কি চিহ্ন প্রকাশ পাইয়াছে? স্থানে স্থানে যে একশত বাঙ্গলা পাঠশালা স্থাপিত হইয়াছে, তাহার প্রতি তাঁহারদিগের যেমন যত্ন, তদনুযায়ী ফলোৎপত্তিও হইতেছে। বস্তুতঃ তদ্বিষয়ে তাঁহারা যে প্রকার ব্যবহার করিয়া আসিয়াছেন, তাহা আলোচনা করিয়া দেখিলে ইহা কখনই বোধ হয় না, যে তাঁহারা প্রজাগণের বিদ্যাশিক্ষার অভিপ্রায়ে এ বিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ···উপযুক্ত গ্রন্থ নাই, শিক্ষক নাই, ও তত্ত্বাবধারণেরও নিয়ম নাই, অথচ ঐ সকল বিদ্যালয়ের প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে, ইহার পর অলীক কথা আর কি আছে? সম্প্রতি শ্রীরামপুর-নিবাসী সংবাদপত্র-সম্পাদক এ বিষয়ে তাঁহারদিগকে যে প্রকার তিরস্কার করিয়াছেন, তাহা অতি গ্রাহ্য। ইহা কাহার অবিদিত আছে, যে এইক্ষণে যে সকল শিক্ষক ঐ সমস্ত পাঠশালার অধ্যাপকতা কর্ম্মে নিযুক্ত আছে, তাহারদিগের দ্বারা তৎকার্য্য কোনপ্রকারে যথা বিধানে সম্পাদিত হইবার নহে? তাঁহারা যদি অবিশ্রামে শত বৎসর উপদেশ দিতে থাকেন, তথাপি কিছুই উপকার দর্শিবে না। দেখ, ইংরাজি ভাষায় শিক্ষকতা কার্য্যের উপদেশ নিমিত্ত পৃথক বিদ্যাগার সংস্থাপিত হইয়াছে, এবং তজ্জন্য মাসে মাসে ন্যূনাধিক সহস্র টাকা ব্যয় হইতেছে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত উপযুক্ত বাঙ্গলা শিক্ষক প্রাপ্তির কোন উপায় হইল না, অথচ ইহা প্রসিদ্ধই আছে যে তাহা না পাইলেও বাঙ্গলা ভাষার উপদেশ করিবার যত চেষ্টা সকলই বিফল হইবে। জেলার ইংরাজি বিদ্যালয় সমুদায়ের তত্ত্বাবধারণ নিমিত্ত বহু বেতনভোগী তত্ত্বাবধারক নিযুক্ত আছে, কিন্তু ঐ একশত বাঙ্গলা পাঠশালার

বিষয়ে তদনুরূপ কি নিয়ম আছে ? বরঞ্চ এ প্রকার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, যে ইংরাজি বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধারক তাহাতে বঙ্গ ভাষা শিক্ষার ন্যূনতা করিতে পারিলে ত্রুটি করেন না। …বস্তুতঃ ঐ সমুদয় পাঠশালার কার্য্যের কোন শৃঙ্খলা নাই, তাহাতে রাজপুরুষদিগের কিছু অনুরাগ নাই, এবং তাহা ভগ্ন হইলেও যে তাঁহারদের কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি বোধ হইবে এমত অনুমান হয় না। তাঁহারদিগের যত্নাভাবে তাহার প্রয়োজন সফল হইতেছে না, ইহাতে শঙ্কা হয় কি জানি যদি তাঁহারা এককালে বলিয়া বসেন, যে এদেশীয় লোকের বাঙ্গলা ভাষার বিদ্যানুশীলনের চেষ্টা করা নিরর্থক হইল। কিন্তু এ কথাতে তাঁহারদিগের অন্তঃকরণের নিগূঢ় ভাবই প্রকাশ পাইবে, কারণ যে কার্য্যের যেমন উপায় আবশ্যক, তদ্ব্যতিরেকে তাহা কখনই সিদ্ধ হইতে পারে না। যাহা হউক, প্রজাদিগের বিদ্যানুশীলন বিষয়ে রাজ-পুরুষদিগের এ প্রকার অনুৎসাহ ও অবহেলা দেখিয়া অন্তঃকরণে বড়ই অসন্তোষ জন্মিয়াছে।"[৫৮]

'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকাও ক্ষুব্ধ চিত্তে মন্তব্য করেছেন (২০. ৪. ১৮৪৯), "তাঁহারদিগের নিয়ম আছে বিচারালয়ে বঙ্গভাষা চলিত হইবে, কিন্তু কোথায় বঙ্গভাষা চলিতেছে ? তাঁহারদিগের নিয়ম আছে স্থানে২ বঙ্গভাষার পাঠশালা প্রতিষ্ঠিত হইবেক এবং তাহাও হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে কি পাঠ নিয়ম মত পাঠ হয় ? এবং যাঁহারদিগের প্রতি পাঠশালা সকলের তত্ত্বাবধারণের ভার দিয়াছেন তাঁহারা কি কখনো বাঙ্গালা পাঠশালা চক্ষে দেখিয়াছেন ? কিন্তু রাজপুরুষদিগের রাজস্বের নিয়মের কোন অংশ নিস্তেজঃ হইলে তাঁহারা কি এইরূপ নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতেন ?"[৫৯] প্রভাকর সম্পাদক পুনরায় লিখেছেন (১৬. ৭. ১৮৫২), "মফঃস্বলের বাঙ্গালা পাঠশালার বর্ত্তমান দশা স্মরণ করিলে যুগপৎ মনস্তাপ ও বিস্ময় উদয় হয়। প্রায় অনেকগুলিই উঠিয়া গিয়াছে তবে অদ্যাপিও যে কয়েকটা টামটুম করিতেছে তাহারও দশমী দশা মাত্র অবশিষ্ট আছে। আমরা এতদ্বিষয়ে অনেক স্থান হইতে অনেক পত্র পাইয়া নিতান্তই খিন্ন হইয়া আছি। …যে সমুদয় রাজস্বের কমিশ্যনর ও কালেক্টরের প্রতি ইহার তত্ত্বাবধারণের ভারার্পিত আছে, তাঁহারা আপন কর্ম্মই নির্ব্বাহ করার সময় পায়েন না, ইহার মধ্যে পাঠশালা সকলের প্রতি মনোযোগ কি প্রকারে দিবেন, তাঁহারা বর্ষমধ্যে একবার যাইয়া দেখিতেও মহাকষ্ট, কার্য্য নষ্ট স্বীকার বোধ করেন। আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি যশোহর জিলার অন্তঃপাতি কোন বাঙ্গালা পাঠশালার তিন বৎসর মধ্যেও ছাত্রগণ বর্ণমালা ও নীতিকথা শেষ করিতে পারে নাই। যে স্থলে এইরূপ পাঠোন্নতি হইল সে স্থানে রাজপুরুষেরদের অমনোযোগ

যে কত দোষ সম্ভূত হইল তাহা বিবেচনা মাত্রই সার হইতেছে।"[৬০]

মাতৃভাষায় শিক্ষার প্রসারে সরকারি উদ্যোগের অভাব দেখা গেলেও বেসরকারি প্রয়াস অব্যাহত ছিল। এসময়ে যাঁরা মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা-বিস্তারে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছেন, তাঁরা ইংরেজিভাষায় উচ্চশিক্ষার পক্ষপাতী হলেও ভাষাশিক্ষার ভিত্তি সুদৃঢ় রূপে গঠনের জন্য প্রাথমিক স্তরে মাতৃভাষায় শিক্ষাদানে ব্রতী হয়েছেন। স্কুল সোসাইটির স্কুলসমূহের ও হিন্দু কলেজের এই নিয়ম ছিল যে, বাঙ্গালী ছেলেরা আট বৎসরের পূর্বে কেহ ইংরেজি শিখিতে পারিবে না। এই বয়সে ছেলেদের একান্তভাবে বাংলা শিক্ষায়ই নিবিষ্ট থাকিতে হইত। আবার, আট বৎসরের পরও যদি দেখা যাইত তাহাদের বাংলা শিক্ষা আশানুরূপ হয় নাই তাহা হইলে উহাও ইংরেজির সঙ্গে সঙ্গে শিখাইয়া লইবার ব্যবস্থা ছিল। এইরূপ ব্যবস্থার ফলে শিক্ষার ভিত্তি পাকা হওয়ায় ইংরেজি শিক্ষায় তাহারা দ্রুত উন্নতি করিতে পারিত।'[৬১] সেকারণে অনেক ইংরেজি-স্কুলের প্রাথমিক শ্রেণীতে ইংরেজিভাষার পরিবর্তে মাতৃভাষাকে মাধ্যম রূপে গ্রহণ করা হয়েছে। ১৮৩৫ সালে প্রতিষ্ঠিত জেনারেল অ্যাসেম্বলিজ স্কুলে ছাত্রদের প্রথমে মাতৃভাষায় শিক্ষাগ্রহণ করতে হ'ত; তারপরে তাঁরা ইংরেজির মাধ্যমে পাশ্চাত্য জগতের সঙ্গে পরিচিত হতেন। কলকাতা স্কুল সোসাইটির যে প্রিপ্যারেটরি ইংরেজি-বিদ্যালয়টি ('পটলডাঙ্গা স্কুল নামে' পরিচিত) ছিল তাতে ভর্তি হতে গেলে একটি শর্ত পালন করতে হ'ত। বাংলায় যে সমস্ত ছাত্রের যথেষ্ট জ্ঞান হয়নি বলে বিবেচিত হ'ত, নিয়ম ছিল যে, তাঁদের প্রতিদিন অন্তত দু' ঘন্টার জন্য অবশ্যই যে কোন একটি দেশীয় বিদ্যালয়ে বাংলা শেখার জন্য পড়তে যেতে হবে।

প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রাধাকান্ত দেব, রামকমল সেন, ডেভিড হেয়ার, রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ প্রমুখের উদ্যোগে হিন্দু কলেজের অধীনে একটি বাংলা-পাঠশালা স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তাঁদের পাঠশালা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ছিল — "একটা জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলা এবং হিন্দু যুবকদের বাংলাভাষার মাধ্যমে ভারত ও ইউরোপের সাহিত্য-বিজ্ঞান-বিষয়ে শিক্ষাদান করাই হ'ল পাঠশালা-স্থাপনের মূল লক্ষ্য।"[৬২]

হিন্দু কলেজের সংলগ্ন পশ্চিম দিকের জমিতে ১৮৩৯ সালের ১৪ জুন ডেভিড হেয়ার বাংলা-পাঠশালার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন এবং ছয় মাসের মধ্যে পাঠশালার গৃহ নির্মিত হয়। ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ জানুয়ারি পাঠশালার উদ্বোধন দিবস উপলক্ষে আয়োজিত সভায় শহরের বিশিষ্ট দেশীয় ও ইউরোপীয়

ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। এই সভায় রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ মাতৃভাষার সপক্ষে যে জোরালো ভাষণ দিয়েছিলেন, ইংরেজিভাষার সমর্থক 'বেঙ্গল হেরাল্ড' পত্রিকা তার সমালোচনা করায় (৫ এপ্রিল, ১৮৪০) 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' পত্রিকা প্রত্যুত্তরে লিখেছেন (৭ মে, ১৮৪০) যে, তাঁরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে, জনশিক্ষার ক্ষেত্রে ইংরেজি কিছুতেই মাতৃভাষার স্থান দখল করতে পারে না। জনসমাজের বৃহত্তম অংশ কেবলমাত্র মাতৃভাষার মাধ্যমেই শিক্ষিত হতে পারেন।

ইংরেজি-স্কুলের আদর্শে গঠিত 'হিন্দু কলেজ পাঠশালা'তে (এই নামেই সুপরিচিত) বারোটি শ্রেণী ছিল এবং প্রত্যেক শ্রেণীর জন্য একজন শিক্ষক অর্থাৎ ১২ জন শিক্ষক ছিলেন। পাঠক্রম সম্পর্কে বলা হয়েছে, "ঐ পাঠশালায় তিন সম্প্রদায় ছাত্র থাকিবে। তাহার প্রথম সম্প্রদায় অতি শিশু বালকেরা নীচে লিখিত বিদ্যা শিক্ষা পাইবে। বিশেষতঃ অক্ষর বানান হিতোপদেশক ইতিহাস ব্যাকরণের মূল বিষয় অঙ্ক শাস্ত্রের মূল বিবরণ গোলাধ্যায়ের মূল প্রকরণ এবং ভারতবর্ষের সংক্ষেপ বিবরণ। দ্বিতীয় সম্প্রদায় ছাত্রেরা এই সকল বিষয় শিক্ষা প্রাপ্ত হইবে যথা ব্যাকরণ অঙ্ক বিদ্যা ক্ষেত্র পরিমাপক বিদ্যা গোলাধ্যায় জ্যোতির্বিদ্যা এবং শুদ্ধরূপে ভাষা কথনের বিধি এবং ইঙ্গলণ্ডীয় ও ভারতবর্ষীয় ইতিহাস এবং পত্র লিখনীয় রীতি। তৃতীয় সম্প্রদায় সুশিক্ষিত ছাত্রেরা এই সকল বিষয় শিক্ষা করিবেন যথা শুদ্ধরূপে ভাষা কথনের নিয়ম ও জমীদারী ও বাণিজ্য সম্পর্কীয় ব্যবহার এবং অতি পূর্ব্বকালীন ও ইদানীন্তন ইতিহাস ও জ্যোতির্বিদ্যা বীজগণিত বিদ্যা এবং রাজনীতি বিষয়ক বিদ্যা এবং নীতি বিদ্যা ও ক্ষেত্র পরিমাপক বিদ্যা ও গবর্ণমেণ্টের আইন ও আদালতের রীতি ব্যবহার এবং হিন্দু ও মোছলমানদের ব্যবস্থা।"[৬৩]

হিন্দু কলেজ-পাঠশালায় বাংলায় পাঠক্রম কলকাতা শহরের অভিভাবকদের মনে প্রভাব বিস্তার করেছিল এবং তাঁরা ছেলেদের পাঠশালায় ভর্তি করতে আগ্রহী হয়েছিলেন। ফলে প্রথম বছরে ছাত্রসংখ্যা হ'ল ৪৬০। এদের জন্য হিন্দু কলেজের কর্তৃপক্ষ বাংলায় 'শিশু সেবধি', 'ভূগোল সূত্র', 'নীতি দর্শক' ইত্যাদি পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ করেছিলেন। বাংলাভাষায় জ্ঞান অর্জনের জন্য এখানে ন্যূনতম ৫ বৎসর শিক্ষা গ্রহণ করতে হ'ত। কিন্তু পাঠশালার শিক্ষাকাল পূর্ণ করে বয়সীমার বাধার জন্য ইংরেজি-শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিন্দু কলেজে ভর্তি হওয়া সম্ভব ছিল না। তাই অভিভাবকেরা দু' বছর পাঠশালায় পড়িয়ে নাম প্রত্যাহার করে নিয়ে হিন্দু কলেজে ভর্তি করে দিতেন। সেজন্য হিন্দু কলেজের

কর্তৃপক্ষ নিয়মাবলী সংশোধন করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন যে, বয়ঃসীমা শিথিল করা হবে এবং প্রত্যেক বৎসরে পাঠশালার ৫ জন শ্রেষ্ঠ ছাত্রকে হিন্দু কলেজে অবৈতনিক শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ দেওয়া হবে। ফলে, ছাত্রসংখ্যা ক্রমশ বাড়তে থাকে। ১৮৪১ সালে ছাত্রসংখ্যা হ'ল ৪৮১। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এই পাঠশালায় ভর্তি হওয়া দরিদ্রশ্রেণীর সন্তানদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। এখানে মাসিক বেতন ছিল ৮ আনা। 'ছাত্রেরদের পাঠ্যপুস্তক সকল পাঠশালার খরচে ক্রয় করা যাইবে বালকেরদের তদ্বিষয়ে কিছু খরচ লাগিবে না কিন্তু তাহারদের শিক্ষার্থ ব্যয় আগাম দিতে হইবে।'[৬৪] একসঙ্গে আগাম বেতন দিতে পারতেন কেবলমাত্র উচ্চ ও মধ্যবিত্তশ্রেণী।

১৮৪২ সালে Council of Education পাঠশালা-পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। জীর্ণ স্কুল-গৃহ মেরামতের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ মঞ্জুর না করলেও তাঁরা পাঠশালার ৫ জন শ্রেষ্ঠ ছাত্রের হিন্দু কলেজে অবৈতনিক শিক্ষা-গ্রহণের সুযোগ বন্ধ করে দিয়েছেন। 'কলেজ-কর্তৃপক্ষ বাঙলা পাঠশালার জন্য উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তক রচনা ও প্রকাশের আয়োজন করছিল, সরকারি ব্যবস্থাপনায় সেদিকেও নিরস্ত হতে হ'ল। বাঙলা পাঠশালার জন্য পাঠ্যপুস্তক রচনার দায়িত্ব নিল কাউন্সিল অব এডুকেশন। এজন্য একটা সাব-কমিটি হ'ল। ঐ কমিটিতে একমাত্র বাঙালি সদস্য প্রসন্নকুমার ঠাকুর। কাউন্সিল অব এডুকেশনের নির্দেশ : পাঠ্যপুস্তক প্রথমে ইংরেজিতে লেখা হবে, সাব-কমিটি অনুমোদন করে দিলে পাঠ্যপুস্তক ইংরেজি থেকে বাংলা ও অন্যান্য দেশীয় ভাষায় অনূদিত হবে।'[৬৫] এই সিদ্ধান্ত বাংলা গদ্যের স্বাভাবিক বিকাশে বাধা সৃষ্টি করেছে।

কাউন্সিল অব এডুকেশন কর্তৃক বিবিধ ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে পাঠশালার ছাত্রসংখ্যা ক্রমেই কমতে থাকে। প্রথম বছরে—অর্থাৎ '১৮৪০ সালে ছিল ৪৬০; ১৮৪১ সালে ৪৮১; ১৮৪২ সালে ৪৭২; ১৮৪৩ সালে ২৫২; এবং ১৮৪৩-৪৪ সালে দেড়শোর কিছু বেশি। পাঠশালার ছাত্র-সংখ্যা কমে গেল, শ্রেণী-সংখ্যা বারো ছিল, কমে সাত হয়ে গেল; শিক্ষক-সংখ্যা কমে গেল। বাংলা পাঠশালার অবস্থা ক্রমশঃ শোচনীয় হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু কাউন্সিল অব এডুকেশন বধির। আবেদন-নিবেদনে কোন ফল হ'ল না।'[৬৬] সংবাদপত্রের সমালোচনা সত্ত্বেও তাঁরা সংযত হননি।

'বেঙ্গল স্পেক্টেটর' পত্রিকায় তীব্র মন্তব্য করা হয়েছে (২৪ জুলাই, ১৮৪৩), "এক্ষণে আমরা খেদপূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি যে আমাদিগের ঐ আশাতে নিরাশ হইতে হইল, এখন কলেজের অধ্যক্ষ মহাশয়েরা পাঠশালায় নিয়মপূর্ব্বক

গমনাগমন স্থগিত করিয়াছেন এবং তাহার কার্য্যাদি মনোযোগপূর্ব্বক অবলোকন করেন না, ছাত্রগণের বিদ্যাবৃদ্ধির বিষয়ের কোন অনুসন্ধান নাই, আর বর্ত্তমান পাঠের রীতি ভাল কি মন্দ ও তাহা উৎকৃষ্ট হইতে পারে কিনা এবং ভিন্ন২ শ্রেণীস্থ বালকদের পাঠ্যপুস্তকের পরিবর্ত্ত করা কর্ত্তব্য কি অকর্ত্তব্য এ সকল বিষয়ে কাহারো কিছু মনোযোগ নাই এবং শিক্ষকেরা স্ব২ কর্ম্মে পারগ কিনা তাহারও অনুসন্ধান কেহ করেন না, আর বৎসরের মধ্যে নির্দ্ধারিত সময়ে নিম্ন শ্রেণীস্থ বালকদিগের উচ্চ শ্রেণী প্রাপণ ও উৎসাহ প্রদান নিমিত্ত পরীক্ষা নাই। পূর্ব্বে এই পাঠশালায় প্রায় পঞ্চশত বিদ্যার্থী ছিল কিন্তু এক্ষণে বালকদিগের পিতা-মাতা ও অভিভাবকেরা অনেকে পাঠশালা হইতে স্ব ২ বালকদিগকে বাহির করিয়া লইতেছেন।"[৬৭]

'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকা লিখেছেন (এপ্রিল, ১৮৪৯), "পূর্ব্বে এ প্রকার নিয়ম ছিল, যে যে বালক বাঙ্গলা শিক্ষায় সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইবে তাহাকে ইংরাজি অধ্যয়নের নিমিত্ত বিনা বেতনে বিদ্যালয় বিশেষে নিযুক্ত করা যাইবেক। কিন্তু কি আক্ষেপের বিষয়! তাঁহারা এই যৎকিঞ্চিৎ কৃপা বিতরণ করাও গুরু ভার বোধ করিলেন। বাঙলা ভাষায় তাঁহারদিগের যে প্রসিদ্ধ অনাদর আছে তাহা আর গোপন রাখিতেও যত্ন করিলেন না।"[৬৮]

কাউন্সিল অব এডুকেশনের সিদ্ধান্ত অনুসারে ১৮৫৪ সালের ১৫ মে হিন্দু কলেজের নাম পরিবর্তন করে নতুন নাম হ'ল প্রেসিডেন্সি কলেজ এবং হিন্দু কলেজ পাঠশালার পরিবর্তিত নাম হ'ল হিন্দু স্কুল। এই স্কুলটিকে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের পরিচালনাধীন করা হ'ল। এসময়ে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। ১৮৫৪-৫৫ সালে পাঠশালার নীচের শ্রেণীগুলিতে ছাত্র সংখ্যা বেশি হলেও উপরের দিকে খুবই কম ছিল। কারণ নীচের ক্লাসে বাংলায় কিছু লিখতে ও পড়তে সক্ষম হলেই অভিভাবকেরা পাঠশালা থেকে তাদের ছাড়িয়ে নিয়ে ইংরেজি-স্কুলে ভর্তি করে দিতেন। ইংরেজি-শিক্ষার চাহিদার চাপে এখানেও ইংরেজি-শিক্ষা প্রচলিত হওয়ায় মাতৃভাষার আদর্শ স্কুল-রূপে এই পাঠশালার যে বৈশিষ্ট্য ছিল তা বর্জিত হ'ল।

হিন্দু কলেজ পাঠশালার আদর্শে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৪০ সালের ১৩ জুন তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা প্রতিষ্ঠা করেছেন। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি ছিল অবৈতনিক। অবশ্য এই পাঠশালাতে বাংলাভাষায় বিজ্ঞান-শিক্ষা দেওয়া হলেও ধর্ম-নিরপেক্ষ ছিল না। হিন্দু ধর্মের শাস্ত্রীয় শিক্ষা-বিস্তারের দ্বারা খৃস্টান ধর্মপ্রচারকে প্রতিহত

করাই ছিল এই পাঠশালার লক্ষ্য। এবং এই লক্ষ্য পূরণের জন্য তাঁদের মতে মাতৃভাষাই হ'ল শ্রেষ্ঠ মাধ্যম, কারণ ছাত্রেরা ইংরেজিভাষার মাধ্যমে উচ্চতর জ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম হয় না।

তত্ত্ববোধিনী পাঠশালার জন্য অক্ষয়কুমার দত্ত যে পুস্তকগুলি রচনা করেছিলেন সেগুলি মিশনারীদের তুলনায় অনেক উৎকৃষ্ট ছিল। তিনি ছিলেন এ স্কুলের প্রধান শিক্ষক। শহরের ইংরেজিভাষার আবহাওয়ার মধ্যে মাতৃ-ভাষায় শিক্ষাদানের প্রচেষ্টা বেশিদিন সফল হতে পারে না, তাই তিন বৎসরের মধ্যে এই প্রতিষ্ঠানের ছাত্র সংখ্যা কমতে শুরু করল। অভিভাবকদের অনুরোধে ইংরেজি বিষয়কে ঐচ্ছিক বিষয় রূপে প্রবর্তন করা হ'ল। তবুও ছাত্রসংখ্যার বৃদ্ধি ঘটল না। ফলে দেবেন্দ্রনাথ কলকাতা থেকে বাঁশবেড়িয়ায় তত্ত্ববোধিনী পাঠশালাকে ১৮৪৩ খৃস্টাব্দের ৩০ এপ্রিল স্থানান্তর করতে বাধ্য হলেন। এক বছরে ছাত্রসংখ্যা হয়েছে ১২৭ জন —প্রথম শ্রেণীতে ৪ জন, দ্বিতীয় শ্রেণীতে ১৪ জন, তৃতীয় শ্রেণীতে ২৪ জন, চতুর্থ শ্রেণীতে ২০ জন, পঞ্চম শ্রেণীতে ২৯ জন, ষষ্ঠ শ্রেণীতে ৩৬ জন। এখানে সংস্কৃত কঠোপনিষদ পাঠের সঙ্গে বাংলায় ভূগোল, পদার্থবিদ্যা, ইতিহাস, ব্যাকরণ শিক্ষা গ্রহণ করতে হ'ত।

এই পাঠশালার ভাষা-মাধ্যম বিষয়ে 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকা লিখেছেন (১ মাঘ, ১৭৬৬ শক), "এই পাঠশালাতে পদার্থবিদ্যা এবং ভূগোলের উপদেশ বঙ্গ ভাষাতে প্রদান করিবার তাৎপর্য্য এই যে বঙ্গ ভাষা স্বদেশীয় ভাষা, অতএব তাহাতে উক্ত শাস্ত্র সকল প্রচলিত হইলে ক্রমশঃ তাহার জ্ঞান সাধারণ লোকের মধ্যে বিস্তারিত হইতে পারিবেক। দ্বিতীয়তঃ ছাত্রেরা অতি অল্প বয়স্ক, অদ্যাপি ইংলণ্ডীয় ভাষাতে এরূপ সুশিক্ষিত হয় নাই যাহাতে উক্ত শাস্ত্রসকল উক্ত ভাষাতে অধ্যয়ন করিতে সমর্থ হয়। যখন তাহারা সুশিক্ষিত হইবে তখন বঙ্গ ভাষাতে উক্ত শাস্ত্র সকলের প্রধান প্রধান গ্রন্থ অপ্রাপ্ত হইলে ইংলণ্ডীয় ভাষাতে অধ্যাপন করা যাইতে পারিবেক।"[৬৯]

এসময়ে বাংলা-শিক্ষা বিস্তারে বিদ্যাসাগর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আদর্শ বঙ্গ-বিদ্যালয়। '১৮৫৫ সালের ২২ আগস্ট থেকে ১৮৫৬ সালের ১৪ জানুয়ারি —এই সময়ের মধ্যে বিদ্যাসাগর স্থাপন করেছেন সাকুল্যে কুড়িটি আদর্শ বিদ্যালয়। চার জেলা নিয়ে এলাকা : নদীয়া, বর্ধমান, হুগলী, মেদিনীপুর। প্রত্যেক জেলায় পাঁচটি বিদ্যালয়।'[৭০] এই স্কুলগুলির জন্য যোগ্য শিক্ষক গড়ে তোলার প্রয়োজন ছিল। সুতরাং '১৮৫৫ সালের ১৭ জুলাই বিদ্যাসাগরের

তত্ত্বাবধানে একটি নর্মাল স্কুল খোলা হ'ল। নর্মাল স্কুল বসত সকালে, দু-ঘণ্টা, সংস্কৃত কলেজে। নর্মাল স্কুলে দুই শ্রেণী : উচ্চশ্রেণী আর নিম্নশ্রেণী। উচ্চশ্রেণীর দায়িত্ব নিয়েছেন প্রধান শিক্ষক অক্ষয়কুমার দত্ত। নিম্নশ্রেণীর দায়িত্ব নিয়েছেন দ্বিতীয় শিক্ষক মধুসূদন বাচস্পতি। পঁয়তাল্লিশ বছরের বেশি কিংবা সতেরো বছরের কম বয়সী কোনো ছাত্রকে ভর্তি করা হত না নর্মাল স্কুলে। জাতিবিচারে উচ্চস্থ না হলে গোড়ার দিকে কেউ নর্মাল স্কুলে ভর্তি হতে পারেনি। ৭১টি ছাত্র নিয়ে প্রথম নর্মাল স্কুল খোলা হয় ; ৬০ জনের জন্য ছিল মাসিক পাঁচ টাকা বৃত্তির ব্যবস্থা। মাসে-মাসে পরীক্ষা দিতে হয়। অমনোযোগী ছাত্রদের নর্মাল স্কুল ছেড়ে চলে যেতে হয়। আর যারা যোগ্যতা প্রমাণ করতে পারেন তাঁরা শিক্ষকের কাজ পেয়ে যান।'[৭১]

এসময়ে কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে আধুনিক আদর্শে নতুন পাঠশালা গড়ে উঠেছিল। এই পাঠশালাগুলির ভাষা-মাধ্যম ছিল মাতৃভাষা। নেবুতলায় জ্ঞানপ্রদায়িনী পাঠশালার (৩১ ডিসেম্বর, ১৮৪৯) মাসিক বেতন ছিল নীচের শ্রেণীতে ৪ আনা ও উঁচু শ্রেণীতে ছিল ৬ আনা। প্রাচীন পাঠশালার চেয়ে উন্নত মানের বাংলা-শিক্ষাদানই ছিল এই পাঠশালার লক্ষ্য। শিশুশ্রেণীর পাঠ্য বিষয় ছিল হিতোপদেশ, অঙ্কপুস্তক, ব্যাকরণ, মনোরঞ্জনেতিহাস, শিশুশিক্ষা।

অন্যান্য পাঠশালার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল ওরিয়েণ্টাল সেমিনারি পাঠশালা, মলঙ্গা লেনের বঙ্গবিদ্যা প্রকাশিকা পাঠশালা এবং গরাণহাটা, কলুটোলা, বাগবাজার, সুকিয়া স্ট্রীট ইত্যাদি অঞ্চলের পাঠশালা। ওরিয়েণ্টাল সেমিনারির কর্তৃপক্ষ তাঁদের ইংরেজি-স্কুলের ছাত্রদের মাতৃভাষায় দক্ষতা অর্জনের জন্য পাঠশালা স্থাপন করেছেন। এই পাঠশালাতে ৫টি শ্রেণী ছিল। মলঙ্গা লেনের বঙ্গবিদ্যা প্রকাশিকা পাঠশালা বেণীমাধব মল্লিকের উদ্যোগে বাংলাভাষায় শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

কলকাতায় যখন বেসরকারি উদ্যোগে মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের প্রয়াস চলছিল, তখন মফস্বল শহরেও মাতৃভাষা-চর্চার আগ্রহ দেখা গিয়েছিল। মহিষাদলের অবৈতনিক জ্ঞানদাত্রী পাঠশালা, কুমারহাট অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়, জনাই ট্রেনিং স্কুল, আড়িয়াদহের মতিলাল শীলের অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রভৃতি সেকালের উল্লেখযোগ্য পাঠশালাগুলি মফস্বল অঞ্চলে বাংলা-শিক্ষা বিস্তারে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। উত্তরপাড়ার রাজা রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বাংলা ভাষায় শিক্ষা-প্রসারের

উদ্দেশ্যে 'বঙ্গভাষা উপকারিণী সভা' নামে এক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন এবং এই প্রতিষ্ঠানের অধীনে হুগলী ও বর্ধমান অঞ্চলে ১২টি বাংলা-স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়।

জোড়াসাঁকোর বিদ্যোৎসাহিনী সভা, বেহালার নিত্যজ্ঞান সঞ্চারিণী সভা, ভবানীপুরের সর্বশুভকরী সভা, বড়িষার দেশহিতৈষিণী সভা, বড়ালের বিদ্বান মনোরঞ্জিনী সভা, টাকীর হিতকরী সভা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানগুলি মাতৃভাষার মাধ্যমে আধুনিক শিক্ষা-বিস্তারে উদ্যোগী হয়েছিল।

বাংলায় কেবলমাত্র ছেলেদের নয়, মেয়েদেরও শিক্ষিত করার প্রচেষ্টা হয়েছিল। এবং এবিষয়ে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন। তিনি ইংরেজি-শিক্ষার পক্ষপাতী হলেও মাতৃভাষা-চর্চায় উৎসাহ দিয়েছেন। দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় ও অন্যান্য দেশহিতৈষী ব্যক্তিদের সহায়তায় বেথুন কলকাতার অভিজাত ও উচ্চশ্রেণীর মেয়েদের জন্য ১৮৪৯ সালের ২৩ এপ্রিল 'ভিক্টোরিয়া বাংলা স্কুল' স্থাপন করেন। ধর্মনিরপেক্ষতা বজায় রেখে এই স্কুলের শিক্ষণীয় বিষয় নির্দিষ্ট করা হয়েছিল। এই অবৈতনিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার মাধ্যম ছিল মাতৃভাষা ও ইংরেজি ছিল ঐচ্ছিক। ১১টি মেয়ে নিয়ে স্কুল উদ্বোধনের সময়ে কলকাতার গোঁড়া ও সংকীর্ণ মনোভাবাপন্ন প্রভাবশালী ব্যক্তিরা তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন। কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রাধাকান্ত দেব, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামগোপাল ঘোষ রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রমুখের সাহায্যে বেথুন স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারে বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু বেথুনের আকস্মিক মৃত্যুর (১৮৫১) ফলে বৃটিশ-সরকার ভিক্টোরিয়া বাংলা-স্কুলের পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং এখানেও ইংরেজিভাষায় শিক্ষাদানের নীতি গ্রহণ করায় এই বাংলা-স্কুলটিও তার বিশেষত্ব হারিয়ে ইংরেজি-স্কুলে পরিণত হয়।

বেথুনের স্কুল প্রতিষ্ঠার দুই দশক পূর্বে মিস কুকের প্রচেষ্টায় মাতৃভাষায় স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারকল্পে কলকাতা লেডিজ সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সমাজের দরিদ্রশ্রেণী ও নিম্নবর্ণের মেয়েদের জন্য কয়েকটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। কিন্তু নানাবিধ কারণে এদের অস্তিত্ব বেশি দিন ছিল না।

বণিক-সরকার বাণিজ্যিক স্বার্থে এদেশে মাতৃভাষায় শিক্ষার বিরোধী ছিলেন। ইংল্যাণ্ডে তখনো বাণিজ্য-পুঁজির প্রাধান্য। সুতরাং এদেশে কেবলমাত্র লুণ্ঠন-শোষণই ছিল তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য। এবং সেই লক্ষ্য-সাধনের জন্য তাঁরা প্রথমে ইংরেজি-শিক্ষা বিস্তারের বিরোধী ছিলেন। পরে এদেশের ভূম্যধিকারিশ্রেণীকে শাসন-শোষণের সহযোগীরূপে পাওয়ার জন্য তাঁরা

ইংরেজি-শিক্ষা প্রসারে উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। কিন্তু 'ইতিহাসের অচেতন অস্ত্র'[৭২] রূপে তাঁরা এমন একটি নতুন শ্রেণী গড়ে তুলেছেন যাঁরা বণিক-সরকারের মাতৃভাষা-বিরোধী মনোভাবের তীব্র নিন্দা করেছেন এবং মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের পক্ষে জনমত গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয়েছেন। যখন ইংরেজ-আনুগত্যের মধ্যেই এদেশের শিক্ষিত-সম্প্রদায় মোক্ষলাভের সন্ধান পেয়েছেন, তখন সংবাদপত্র-সম্পাদকেরা ইংরেজ-সরকারের শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে যে তীক্ষ্ণ ভাষায় সমালোচনা করেছেন, তা রীতিমত বিস্ময়কর। ভূম্যধিকারিশ্রেণীর যে-অংশ মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষাদানের পক্ষপাতী ছিলেন, তাঁদের চিন্তা-কর্ম সব-কিছুই ছিল সমাজের উচ্চ ও মধ্য শ্রেণীকে কেন্দ্র করে। এই শ্রেণীকে ইংরেজি ভাষায় উচ্চশিক্ষিত করার জন্য মাতৃভাষায় প্রাথমিক স্তরের ভিত্তি গঠনের উদ্দেশ্যে তাঁরা বিভিন্ন শহরে বাংলা পাঠশালা, আদর্শ বঙ্গ বিদ্যালয় স্থাপন করেছেন ; কিন্তু সকলের জন্য মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের দাবিতে তাঁরা সোচ্চার হননি ; কিংবা বৃটিশ-সরকারের ইংরেজি-ভাষায় শিক্ষাদানের নীতিকে তীব্র ভাষায় সমালোচনা করেননি। পক্ষান্তরে সে-দায়িত্ব পালন করেছেন এযুগের সংবাদপত্র-সম্পাদকেরা।

ষষ্ঠ অধ্যায়

উচিত কি তব এ কাজ

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে এদেশে কোনো শিক্ষাকাঠামো গড়ে ওঠেনি; প্রাক্-বৃটিশ যুগের শিক্ষাকাঠামোকে এই পর্বে অক্ষত রাখা হয়েছিল। সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থা দু'টি স্তরে বিভক্ত ছিল—প্রাথমিক ও প্রাথমিকোত্তর; কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে একটা সুনির্দিষ্ট শিক্ষা-কাঠামো গড়ে উঠেছে এবং প্রাথমিক-স্তরে মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের প্রতি ইংরেজ-সরকার দৃষ্টি দিতে বাধ্য হয়েছেন। এসময়ের সরকারি শিক্ষানীতিকে বুঝতে হলে বৃটেন ও ভারতের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক অবস্থাকে অনুধাবনের প্রয়োজন।

শিল্পবিপ্লবের ফলে বৃটেনের অর্থনৈতিক জীবনে দু'টি বিরোধী স্বার্থের সংঘর্ষ ঘটল—একদিকে বাণিজ্যপতি, অন্যদিকে শিল্পপতি। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি যখন উৎকৃষ্ট ভারতীয় বস্ত্র ইংলণ্ডের বাজারে রপ্তানি করে প্রচুর মুনাফা লুটছিলেন, তখন নবজাত বস্ত্রশিল্পের মালিকেরা ইংলণ্ডের বাজারে ভারতীয় বস্ত্র বিক্রয় নিষিদ্ধ করার দাবিতে শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তুলেছেন এবং সেই আন্দোলন সফল হয়েছে; ইংলণ্ডের বাজারে ভারতের বস্ত্র আমদানি নিষিদ্ধ হয়েছে।

এভাবে ইংলণ্ডের শিল্পপতিরা ক্রমাগত শক্তিশালী হয়ে বৃটিশ-সরকারের ওপরে প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হন। ভারতের বাজারের ওপরে ইংলণ্ডের শিল্পপতিদের লোভ অনেক আগে থেকেই পড়েছিল। তাঁদের কাছে ভারতের বাজার ছিল 'এক খাঁটি স্বর্ণখনি' তাই তাঁদের স্বার্থে বৃটিশ-পার্লামেণ্ট ভারতের শিল্প ধ্বংস করার জন্য নানাবিধ আইনগত ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। বাণিজ্য-পুঁজিকে শিল্প-পুঁজি ক্রমশ কোণঠাসা করতে থাকে; বাণিজ্যপতিদের বিরুদ্ধে শিল্পপতিরা ক্রমাগত জয়লাভ করে; বণিকতন্ত্রের পরিবর্তে শিল্পতন্ত্রের প্রসার ঘটতে থাকে। এই যুগ ছিল শিল্পপতিদের আত্মবিস্তারের যুগ। আত্মরক্ষা ও আত্মবিস্তার—এই উভয় উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য শিল্পপতিরা ভারতে

বাণিজ্যপতিদের একচেটিয়া বাণিজ্যাধিকারের পরিবর্তে অবাধ-বাণিজ্যের অধিকার দাবি করেছিলেন।[১] কারণ শিল্পবিপ্লবের পরে ইংলণ্ডে বহু কল-কারখানা গড়ে উঠেছিল এবং নিত্যব্যবহার্য বিভিন্ন দ্রব্য বিপুল পরিমাণে উৎপাদিত হ'চ্ছিল। ভারতের বাজার ছাড়া ইউরোপের বিভিন্ন বাজার তাঁদের কাছে বন্ধ ছিল। ফলে ইংলণ্ডের শিল্পজগতে সংকট দেখা দেয়। এই সংকট থেকে পরিত্রাণলাভের উদ্দেশ্যে তাঁরা ভারতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির একচেটিয়া অধিকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছেন।

বৃটিশ-শিল্পপতিদের চাপে ইংলণ্ডীয় সরকার ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সনদ পুনর্ণবীকরণের সময়ে ভারতে কোম্পানির একচেটিয়া ব্যবসা করার অধিকার সংকুচিত করে কতকগুলি শর্তে ইংলণ্ডের শিল্পপতিদের ভারতে বাণিজ্য করার অধিকার দিলেন। ফলে বাংলাদেশ ও ভারতের অন্যান্য অংশ বৃটিশ-পণ্যের অসহায় শিকারে পরিণত হ'ল। 'কিছু কালের মধ্যেই বাণিজ্যের গোটা চরিত্রই বদলে যায়। ১৮১২ সাল পর্যন্ত ভারত ছিল প্রধানত রপ্তানিকারী দেশ আর এখন সে হয়ে দাঁড়াল আমদানিকারক।'[২]

তবে ১৮১৩ সালের সনদে কোম্পানির ভারত-বাণিজ্যের অধিকার সম্পূর্ণ-ভাবে কেড়ে নেওয়া হয়নি; কিন্তু কিছুটা সীমাবদ্ধ হওয়ায় কোম্পানির ব্যবসা ক্রমাগত কমে যায় এবং ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে তা আরো সংকুচিত হয়। এই বৎসরে সনদ পুনর্ণবীকরণের সময়ে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ভারতে বাণিজ্য করার অধিকার নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। এ সময়ে অর্থাৎ '১৮৩০ সালে বৃটেনে অর্থনৈতিক সংকট চরমে পৌঁছেছিল। কল-কারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল। বেকারের সংখ্যা দ্রুতহারে ক্রমবর্ধমান এবং চাকরিরত ব্যক্তিদের বেতন ক্রমশঃ নিম্নগামী। দক্ষিণাঞ্চলে বিদ্রোহ, উত্তরাঞ্চলে অসংখ্য ট্রেড ইউনিয়ন সৃষ্টি, শ্রমিকদের অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হওয়ার গুজব, জুলাইতে প্যারিসে ও আগষ্টে বেলজিয়ামে বিপ্লব ইত্যাদি বিবিধ ঘটনায় ইংলণ্ড উত্তেজনায় কম্পমান।'[৩] এই সংকট থেকে উদ্ধার লাভের আশায় বৃটেনের শিল্পপতিরা ভারত-ইংলণ্ড বাণিজ্য-বিষয়ে কোম্পানির সঙ্গে অসম প্রতিযোগিতার পরিবর্তে সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তিগত বাণিজ্যের পক্ষপাতী ছিলেন। সেজন্য তাঁরা কোম্পানির বাণিজ্যের অধিকার প্রত্যাহারের দাবিতে ইংলণ্ডে পুনরায় আন্দোলন করেছেন এবং তাঁদের প্রতিনিধিরা ভারতবর্ষে তাঁদের দাবির সমর্থনে জনমত গড়ে তোলার জন্য ভারতবাসীর সাহায্য নিতে কুণ্ঠাবোধ করেননি। তাঁদের সমর্থনে এগিয়ে এসেছেন রামমোহন-দ্বারকানাথ প্রমুখ।

১৮৩৩ সালের সনদে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির হাত থেকে ভারত-বাণিজ্য সম্পূর্ণভাবে কেড়ে নেওয়া হ'ল এবং ইংলণ্ডের শিল্পপতিদের অবাধ-বাণিজ্যের নামে অবাধ-শোষণের অধিকার দেওয়া হ'ল। কিন্তু 'শিল্প-স্বার্থ যতই ভারতীয় বাজারের ওপর নির্ভরশীল হতে থাকে, ততই ভারতের দেশীয় শিল্প ধ্বংস করার পর ভারতে নতুন উৎপাদনী শক্তি সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা সে অনুভব করতে শুরু করে। তৈরি মাল দিয়ে একটা দেশকে ক্রমাগত প্লাবিত করে চলা যায় না, যদি না পরিবর্তে কিছু উৎপন্ন বিনিময় করার সামর্থ্য সে দেশকে দেওয়া যায়। শিল্প-স্বার্থ দেখল, বাড়ার বদলে বাণিজ্য তাদের কমছে।·· তাছাড়া তারা দেখল ভারতে পুঁজি ঢালার চেষ্টা করলেই ভারতীয় কর্তৃপক্ষের প্রতিবন্ধকতা ও ঘোর প্যাঁচের সম্মুখীন হতে হয়। এইভাবে একদিকে শিল্প-স্বার্থ এবং অন্যদিকে টাকাওয়ালা ও চক্রতন্ত্রের দ্বন্দ্বে ভারত পরিণত হ'ল রণক্ষেত্রে। কারখানা মালিকেরা ইংলণ্ডে তাদের ক্রমবর্ধমান আধিপত্যের সচেতনতায় এবার দাবি করছে ভারতে এই প্রতিবন্ধক শক্তিগুলির ধ্বংস, ভারত-শাসনের গোটা সাবেকি ব্যবস্থাটার বিনাশ ও ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির চূড়ান্ত বিলোপ।'[৪]

কার্ল মার্কস এই মন্তব্য করেছেন ২৪ জুন, ১০৫৩ সালে, যখন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে পুনরায় সনদ দেবার বিল বৃটিশ পার্লামেণ্টে উত্থাপিত হয়। এই বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি উক্ত প্রবন্ধের প্রথমেই লিখেছেন, "ভারত বিষয়ে বিধান প্রণয়ন স্থগিত রাখার জন্য লর্ড স্ট্যানলির মোশনের ওপর বিতর্ক আজ সন্ধ্যা পর্যন্ত মুলতুবী রাখা হয়েছে। ১৭৮৩ সালের পরে ইংলণ্ডে এই প্রথম ভারত প্রশ্ন মন্ত্রিসভা টেকা-না-টেকার প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। কেন হল?"[৫] প্রশ্নের উত্তর নিহিত রয়েছে বৃটেনের তৎকালীন ইতিহাসে।

সে সময়ে বৃটেনে প্রধান রাজনৈতিক দল —টোরি ও হুইগ। প্রথম দল বৃহৎ ভূস্বামী ও বাণিজ্যপতিদের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করে, দ্বিতীয় দল ছিল শিল্পপতিদের রাজনৈতিক দল। অর্থনৈতিক সংকটের ধাক্কায় এ সময়ের রাজনীতি ছিল জটিল ও অস্থির। পার্টিগুলির মতবাদ ছিল পরিবর্তনশীল, তরল ও অনিশ্চিত। রাষ্ট্রীয় নেতাদের মধ্যে অনেকে প্রায়ই দল পরিবর্তন করেছেন —আজ এ-দলে, কাল ও-দলে। ১৮৩০ সালে লর্ড গ্রের হুইগ মন্ত্রিসভায় লর্ড স্ট্যানলি উচ্চপদের মন্ত্রি ছিলেন; কিন্তু পরবর্তীকালে টোরি দলের আর্ল অব ডার্বি যখন তিনটি মন্ত্রিসভা গঠন করেন, তখন সেই মন্ত্রিসভাগুলিতেও লর্ড স্ট্যানলি গুরুত্বপূর্ণ পদের মন্ত্রি ছিলেন। লর্ড মেলবোর্ন ১৮২৮ সালে ওয়েলিংটনের টোরি মন্ত্রিসভায় ছিলেন; কিন্তু কয়েক বছর পরে তিনি হুইগ-মন্ত্রিসভার প্রধানমন্ত্রি হয়েছেন।

গ্ল্যাডস্টোন অদম্য ও অনমনীয় টোরি-রূপে রাজনৈতিক জীবন শুরু করেছিলেন; কিন্তু শেষ করেছেন উদারনৈতিক নেতারূপে। পিল টোরি দলের প্রথম সারির শ্রেষ্ঠ নেতা ছিলেন; কিন্তু তাঁর প্রধান সংস্কারগুলিকে টোরি দল সবসময়ে তীব্র বাধা দিয়েছে। মেকলে বলেছেন, বৃটেনের দুটি রাজনৈতিক দলের মধ্যে যেখানে ভয়ানক বিরোধ ছিল, সেখানে সামনের সারির মধ্যে প্রায়শ মিশ্রণ ঘটত। এসময়ে খ্যাতনামা রাষ্ট্রীয় নেতাদের মধ্যে অনেকে সম্মুখ-সারিতে ছিলেন এবং তাঁরা সহজেই দলত্যাগ করতেন। কিন্তু দু'দলের উগ্রপন্থীরা কিছুতেই দলত্যাগ করতেন না। অবশ্য তাঁরা যথেষ্ট প্রভাবশালী ছিলেন না।[৬]

অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক স্বার্থের দ্বন্দ্ব যত তীব্র হয়ে ওঠে, ততই দল-বদল ঘটে এবং মন্ত্রি-সভার পতন হয়। ১৮৪৬ সালে হুইগ-দল লর্ড জন রাসেলের নেতৃত্বে মন্ত্রিসভা গঠন করেন। কিন্তু রাসেলের সঙ্গে পামারস্টোনের মত-বিরোধের ফলে দলে ভাঙন ধরে এবং ১৮৫২ সালে রাসেল পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। টোরি দল মন্ত্রিসভা গঠনে ব্যর্থ হওয়ায় টোরি ও হুইগ দলের কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা লর্ড অ্যাবারডিনের নেতৃত্বে গঠিত হয়। হুইগ দলের রাসেল ও পামারস্টোন এই মন্ত্রিসভার সদস্য হন। কিন্তু ১৮৫৫ সাল পর্যন্ত লর্ড অ্যাবারডিনের মন্ত্রিসভা টিকে থাকে।

এই অস্থির ও টলোমলো অবস্থার পটভূমিতে কোম্পানির ভারত-শাসনের বিলটি ১৮৫৩ সালের ৯ জুন পার্লামেণ্টে উত্থাপিত হয়। উত্থাপনের পূর্বে উভয় কক্ষের দ্বারা গঠিত তদন্ত-কমিটি কোম্পানির ভারত-শাসন বিষয়ে তদন্ত করেছেন। ভারত-শোষণের বহু তথ্য অনেকে কমিটির সামনে উপস্থিত করেন। কোম্পানির একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা মিঃ হ্যালিডে বলেছেন, "ভারতের দেশীয়গণ মনে করেন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে আরো ২০ বছরের মেয়াদ দিলে তাদের ভক্ষকের হাতে তুলে দেওয়া হবে।"[৭] ভারতে শিক্ষার অগ্রগতি সম্পর্কে হোরেস উইলসন বলেছেন, "নিজেদের ভাষায় শিক্ষিত হওয়ার জন্য তাঁদের প্রবল আগ্রহ রয়েছে। বাঙ্গালিদের মধ্যে অত্যন্ত অল্পসংখ্যক ব্যক্তি সঠিকভাবে বাংলায় লিখতে ও পড়তে সক্ষম। সুতরাং প্রথম প্রয়োজন, বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষকে মাতৃভাষায় শিক্ষিত করার জন্য দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থাকে উন্নত করা এবং শিক্ষাকে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রের উপযোগী করে তোলা।"[৮]

বিলটি দফায় দফায় সাতটি রাত সুদীর্ঘ আলোচনায় ব্যয় করা হয়। এবং আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছেন মেকলে, কবডেন, ব্রাইট, ডিজরেলি, লর্ড জন রাসেল, বোর্ড অব কণ্টোলের সভাপতি স্যার চার্লস উড ও কোর্ট অব

ডিরেক্টর্সএর সভাপতি স্যার জেমস হগ প্রমুখ। বিলটি তিনবার পাঠ করা হয়, প্রত্যেকবার আলোচনা হয় এবং ২৯ জুলাই বিলটি ভোটাধিক্যে গৃহীত হয়। এই আলোচনা সম্পর্কে কাল মার্কস মন্তব্য করেছেন, "বিষয়টির বিপুল আয়তনের প্রতি সুবিচারের জন্য কমন্স সভা এক অস্বাভাবিক দৈর্ঘ্যে প্রস্থে ফেনিয়ে তুলেছে ভারত বিতর্ককে, যদিও গভীর ও বিরাট কোন কৌতূহল তা মোটেই জাগাতে পারেনি। ভোটগ্রহণে মন্ত্রিসভা পায় ১৪২-এর বিরুদ্ধে ৩২২-এর সংখ্যাধিক্য এবং এটি ঘটেছে আলোচনার ঠিক বিপরীত অনুপাতে। আলোচনা কালে মন্ত্রিসভার পক্ষে সবই কুশকণ্টক হয়ে ফুটেছিল এবং সে কুশ ভক্ষণের ভার সরকারিভাবে যে গাধার ওপর চাপানো হয়েছিল তিনি স্যার চার্লস উড। ভোট গ্রহণে সবই হয়ে দাঁড়াল গোলাপ এবং স্যার চার্লস উড পেলেন দ্বিতীয় মনুর মুকুট। মন্ত্রিসভার পরিকল্পনাকে যে ব্যক্তিরা নাকচ করেছিল যুক্তি দিয়ে, তারাই তাকে মঞ্জুর করলে ভোট দিয়ে। সরাসরি বিলটির পক্ষ নিতে কোন সমর্থকই সাহস পায়নি, বরং বিল সমর্থনের জন্যই সকলে কৈফিয়ৎ দেয়। একদল দেয় এই জন্য যে সঠিক ব্যবস্থার এটি একটি অসীম ক্ষুদ্র অংশ। অন্যদল এই জন্য যে এটা কোনো ব্যবস্থাই নয়। প্রথমোক্তদের বক্তব্য তারা এবার এ বিলটিকে মেরামত করবে কমিটিতে, দ্বিতীয়দের উক্তি, তারা বিলটির সৌখীন সংস্কারপনার সব কুসুমই ঝরিয়ে দেবে।

"টোরি বিরোধীদের অর্ধেকের বেশির পলায়ন এবং বাকিদের বহুলাংশের হেরিস ও ইংলিসের সঙ্গে অ্যাবারডিন শিবিরে ভেড়ায় মন্ত্রিসভা টিকে থাকে আর ১৪২টি বিরোধী ভোটের মধ্যে ১০০টি হ'ল ডিজরেলি উপদলের ও ৪২টি ম্যাঞ্চেস্টার স্কুলের, আইরিশ অসন্তুষ্ট ও অনির্দিষ্ট কিছু সভ্যের সমর্থন সহ। বিরোধীদের মধ্যেকার বিরোধিতা মন্ত্রিসভাকে আবার বাঁচাল।"[৯]

এবারে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে পূর্বেরমতো কুড়ি বছরের ভারত-শাসনের সনদ দেওয়া হয়নি। তাঁদের শাসনকালের স্থায়িত্ব পার্লামেণ্টের ইচ্ছাধীন ছিল। "পার্লামেণ্ট ইচ্ছা করলেই তা নাকচ করে দিতে পারবে। সুতরাং মৌরসী প্রজার বনেদী অবস্থা থেকে কোম্পানি নেমে আসবে উঠবন্দী প্রজার অনিশ্চিত অবস্থায়। তদ্দেশীয়গণের জন্য সেইটুকু লাভ। অন্য সমস্ত সমস্যার মতো ভারত শাসনের প্রশ্নকেও একটি অমীমাংসিত প্রশ্নে পরিণত করতে সমর্থ হয়েছে কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা। অন্যদিকে, কমন্স সভা ঐ ভোটাভুটি মারফৎ বিধান প্রণয়নে তার অক্ষমতা ও বিধান-বিলম্বে অনিচ্ছার স্বীকারোক্তি দিয়ে আত্মদৈন্যের আর একটা নতুন সাক্ষ্য দিয়েছে।'[১০]

একদিকে যখন বৃটেন ট্র্যাপিজে ব্যালেন্সের খেলা দেখিয়ে কোয়ালিশন-মন্ত্রিসভার অস্তিত্ব বজায় রাখতে ব্যস্ত, অন্যদিকে অবাধ-বাণিজ্যের স্রোতে তখন 'রপ্তানিকারী দেশ' ভারতবর্ষ 'আমদানিকারক' হয়ে দাঁড়িয়েছে। তার ফলে কেবলমাত্র শিল্পপ্রধান শহর ও গ্রামকেন্দ্রগুলিই ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়নি, সর্বোপরি প্রাচীন গ্রামীণ অর্থনীতির ভিত্তিমূল, অর্থাৎ কৃষির সঙ্গে কুটীরশিল্পের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধও প্রচণ্ড আঘাতে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। শহর ও গ্রামাঞ্চলের লক্ষ লক্ষ সর্বস্বান্ত কারিগর ও হস্তশিল্পী, কাটুনি, তন্তুবায়, কুম্ভকার, চর্মকার, কর্মকার প্রভৃতির কেবলমাত্র কৃষির ওপর নির্ভর করা ব্যতীত জীবিকার অন্য কোনো উপায় খুঁজে পায়নি। এভাবে কৃষি ও হস্তশিল্পের দেশ ভারতবর্ষকে বলপূর্বক যন্ত্রশিল্পের দ্বারা পণ্যোৎপাদনকারী বৃটিশ-ধনতন্ত্রের কৃষি উপনিবেশে পরিণত করা হয়। 'প্রাক্-বৃটিশ-যুগের কৃষি ও শিল্পের মধ্যে যে ভারসাম্য ছিল সেই প্রাচীন ব্যবস্থা ভাঙিয়া গিয়া ভারতবর্ষ হইয়া দাঁড়াইল সাম্রাজ্যবাদের এক কৃষিসম্বল লেজুড়।...পূর্বের জনবহুল কেন্দ্রগুলি বিলুপ্ত হইল। মজুর ও কারিগররা শহর ছাড়িয়া গ্রামাঞ্চলে চলিয়া যাইতে বাধ্য হন। গ্রামেরও লক্ষ লক্ষ কারিগরের উপায়ের পথ বন্ধ হইয়া গেল।'[১১] অনাহার-অনশন ছাড়া তাঁদের আর কোনো অবলম্বন ছিল না। ভারতীয়দের জীবনে অবাধ বাণিজ্য কী ভয়ঙ্কর সর্বনাশ ডেকে এনেছিল তা দুর্ভিক্ষের ক্রমবর্ধমান সংখ্যাগুলির দিকে তাকালে উপলব্ধি করা যায়: উনিশ শতকের প্রথমার্ধে হয় ৭টি দুর্ভিক্ষ ও মৃত্যুর সংখ্যা ১৫ লক্ষ; দ্বিতীয়ার্ধে হয় ২৪টি দুর্ভিক্ষ ও মৃত্যুর সংখ্যা ২ কোটি।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রতিক্রিয়ায় ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষ বৃটিশ-সম্রাজ্ঞীর প্রত্যক্ষ শাসনের অধীনে এলেও এদেশে আধুনিক শিল্প স্থাপনের কোনো পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়নি। বৃটিশ-বাণিজ্যপতিদের হটিয়ে দিয়ে ইংরেজ-শিল্পপতিরা এদেশের রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করলেও ভারতের সামন্ততান্ত্রিক চরিত্রের বদল ঘটেনি; কেবলমাত্র শোষণ-পদ্ধতির পরিবর্তন ঘটেছে। ইংলণ্ডের বাণিজ্যপতিদের পরিবর্তে শিল্প-বুর্জোয়ারা ভারতে যে শিল্প-নীতি গ্রহণ করেছিলেন, তা ছিল তাঁদের স্বার্থের একান্ত অনুকূল। 'উৎপাদনশীল দেশ-রূপে ভারতের রূপান্তর তাদের কাছে একান্ত জরুরী এবং সেইজন্যে সর্বাগ্রে সেচ ও আভ্যন্তরীণ পরিবহন ব্যবস্থা তাকে দিতে হবে। এখন তাদের অভিপ্রায় ভারতের ওপর রেলওয়ের এক জাল বিস্তার করা এবং সে কাজ তারা করবেই। তার ফল অপরিমেয় হতে বাধ্য।'[১২]

বৃটিশ-সরকারের ঔপনিবেশিক শিল্প-নীতি সম্পর্কে সংক্ষেপে বলা যায় যে, তাঁরা 'উপনিবেশকে—

(১) তাঁদের নিজেদের দেশের শিল্পজাত দ্রব্যের একচেটে বাজারে পরিণত করতে চান, ("using the dependent country as a market for the products of its own manufacturing industry"—Gunnar Myrdal)

(২) প্রাথমিক দ্রব্য বা কাঁচামালের প্রধান উৎপাদনকেন্দ্রে পরিণত করেন, ("procuring primary goods from its dependent territory, and even in investing so as to produce them in plenty and at low cost"—Myrdal)

(৩) রপ্তানি ও আমদানি দু'রকমেরই বাজার করে তোলেন ("monopolising the dependent country as far as possible for its own business interests. both as an export and import market"—Myrdal)। ভারতবর্ষকেও এইভাবে বৃটিশ-সাম্রাজ্যবাদী-শাসকরা তাঁদের শিল্পজাত দ্রব্যের রপ্তানি-আমদানির বাজার এবং কাঁচামালের উৎপাদনকেন্দ্রে পরিণত করেছিলেন।'[১৩] এবং সেজন্যই তাঁরা সর্বপ্রথমে ভারতের তুলা-উৎপাদনকেন্দ্রের নিকটতম অঞ্চলে বোম্বাইতে ১৮৫৩ সালে রেলপথ প্রতিষ্ঠা করেছেন (মাত্র ২৫ বছর পূর্বে ১৮২৯ সালে ইংলণ্ডের বস্ত্র-উৎপাদনের কেন্দ্র ম্যাঞ্চেস্টার ও লিভারপুলের মধ্যে সংযোগ-সাধনের জন্য রেলওয়ে স্থাপিত হয়)।

এদেশকে আধুনিক শিল্পোন্নত দেশ-রূপে গড়ে তোলা ছিল বৃটিশ-স্বার্থবিরোধী। সেকারণেই তাঁরা দেশীয় সামন্ত-নির্ভর ঔপনিবেশিক অর্থনীতি গড়ে তুলেছিলেন। দেওয়ানি-বেনিয়ানি-মুচ্ছুদ্দিগিরি করে যাঁরা প্রচুর ধনোপার্জন করেছিলেন, তাঁরা যাতে শিল্প-স্থাপনের পরিবর্তে জমিতে অর্থ লগ্নি করেন, সেজন্য ইংরেজ-সরকার এদেশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন করেছেন। লর্ড কর্ণওয়ালিশ একটি চিঠিতে (৬ মার্চ, ১৭৯৩ খৃঃ.) লিখেছিলেন, "এদেশীয়দের দ্বারা সঞ্চিত বিপুল অর্থ বিনিয়োগের কোন উপায় নেই ···চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে ভূসম্পত্তি ক্রয়ের জন্য সেই অর্থ ব্যবহৃত হবে।"[১৪] কর্ণওয়ালিশের উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের দ্বারা জমিতে অর্থ লগ্নি করার সুযোগ করে দেওয়ায় বাংলাদেশের বড় বড় ধনিক ব্যবসায়ীরা, দেওয়ান-বেনিয়ানরা শিল্পস্থাপনের পরিবর্তে জমিতে অর্থ লগ্নি করে জমিদার হয়েছেন, শিল্পপতি হননি। কিন্তু ভারতের পশ্চিমাঞ্চলে চিত্রটি ছিল

অন্যরকম। বোম্বাই প্রভৃতি অঞ্চলে রায়তওয়ারি ব্যবস্থা চালু থাকার জন্য প্রত্যক্ষভাবে জমি কিনে জমিদার হয়ে বসার কোনো সুযোগ সেখানকার ধনিক ব্যবসায়ীদের ছিল না (যদিও ঐ অঞ্চলের মহাজনরা ঋণগ্রস্ত রায়তদের জমি হস্তগত করে ভূস্বামী হয়েছিলেন) বলে তাঁরা নানারকম প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও বস্ত্রশিল্প-স্থাপনে উদ্যোগী হয়েছিলেন। সুতরাং চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বাংলাদেশের গ্রামগুলিকেই যে কেবল শ্মশান-ভূমিতে পরিণত করেছে তা নয়, এদেশে শিল্প-স্থাপনের পথও রুদ্ধ করেছে।[১৫]

এদেশে আধুনিক শিল্পের অভাবের কারণ নির্দেশ করে শরৎচন্দ্র বলেছেন, "Permanent Settlement-এর জন্যেই জমিদার। তালুকদার ও অসংখ্য মধ্যবিত্ত middlemen সমস্ত সমাজের economic অবস্থাকে বাড়তে দেয়নি — কেবলমাত্র জমি আঁকড়ে থেকে শুধু কৃষকরাই যা কিছু দেশের wealth সৃষ্টি করছে। বোম্বাই প্রভৃতি অঞ্চলে Permanent Settlement না থাকার জন্যই ওদেশে industry-র উন্নতি হচ্ছে। জমি কেনা ও বেশি সুদে লগ্নি কারবার করা এই হচ্ছে বাঙলার ধনী হবার একমাত্র পন্থা।"[১৬] সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরও একই অভিমত ব্যক্ত করেছেন, "বোম্বায়ের লোকেরা বাঙ্গালীদের অপেক্ষা বাণিজ্য-ব্যবসা কার্য্যে সুদক্ষ। বাঙ্গলার ধনসম্পত্তি ভূমিতে আবদ্ধ। বোম্বাই অঞ্চলে ভূমির তেমন মূল্য নাই, কেননা এ প্রদেশে ভূমি সম্পর্কীয় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রচলিত নাই।"[১৭]

তুলা উৎপাদন-কেন্দ্রের দিকে লক্ষ্য রেখে ১৮৫৩ সালে সর্বপ্রথম বোম্বে অঞ্চলে ২০ মাইল রেলপথ স্থাপিত হয়েছে। পরবর্তী বছরে রাণীগঞ্জের কয়লা খনিগুলির জন্য বাংলাদেশে রেলপথের বিস্তার ঘটেছে। ১৮৫৭ সালের মধ্যে সারা ভারতে রেলপথ স্থাপিত হয়েছে ২৮৮ মাইল। কাঁচামাল ও খাদ্যশস্য চালান দেবার অভিপ্রায়েই বৃটিশ-শাসকগোষ্ঠী সমগ্র ভারত জুড়ে রেলপথের প্রসার ঘটিয়েছে। রেলপথ-বিস্তারের পশ্চাতে তাঁদের কোনো মঙ্গলেচ্ছা ছিল না, ছিল কেবল শোষণ-লুণ্ঠনের হীন মতলব। 'শ্রীকান্ত' (৩য় পর্ব) উপন্যাসে শরৎচন্দ্র জনৈক বৃদ্ধ ভদ্রলোকের জবানীতে তীব্র মন্তব্য করেছেন, "কি দরকার ছিল মশাই, দেশের বুক চিরে আবার একটা রেললাইন পাতবার? ...কর্তারা আছেন শুধু রেলগাড়ী চালিয়ে কোথায় কার ঘরে কি শস্য জন্মেচে শুষে চালান করে নিয়ে যেতে। শুধুমাত্র এই হেতুই ভারতের দিকে দিকে রন্ধ্রে রন্ধ্রে রেলপথ বিস্তারের আর বিরাম নাই। বাণিজ্যের নাম দিয়া ধনীর ধনভাণ্ডার বিপুল হইতে বিপুলতর করিবার এই অবিরাম চেষ্টায় দুর্ব্বলের সুখ গেল, শান্তি

গেল, অন্ন গেল. ধর্ম গেল—তাহার বাঁচিবার পথ দিনের পর দিন সঙ্কীর্ণ ও নিরন্তর বোঝা দুর্ব্বিসহ হইয়া উঠিতেছে—এ সত্য ত কাহারও চক্ষু হইতে গোপন রাখিবার যো নাই।"[১৮]

লুণ্ঠন-শোষণের অভিপ্রায়ে ভারতে রেলপথ প্রবর্তিত হলেও এদেশের পক্ষে তার পরোক্ষ ফল ছিল শুভ। এসম্পর্কে ১৮৫৩ সালে কার্ল মার্কস বলেছেন, "ইংরেজ মিল-তন্ত্রীরা ভারতকে রেলপথ বিভূষিত করতে ইচ্ছুক শুধু এই লক্ষ্য নিয়ে যাতে তাদের কলকারখানার জন্যে কম দামে তুলা ও অন্যান্য কাঁচামাল নিষ্কাশিত করা যায়। কিন্তু যে দেশটায় লোহা আর কয়লা বর্তমান সে দেশের যাত্রায় (locomotion) যদি একবার যন্ত্রের প্রবর্তন করা যায় তাহলে, যন্ত্র তৈরির ব্যবস্থা থেকে তাকে সরিয়ে রাখা অসম্ভব। রেল চলাচলের আশু ও চলতি প্রয়োজন মেটাবার জন্যে যা দরকার সে সব শিল্পকারখানার ব্যবস্থা না করে বিপুল এক দেশের ওপর রেলপথের জাল-বিস্তার চালু রাখা যাবে না এবং তার মধ্য থেকেই গড়ে উঠবে শিল্পের এমন সব শাখায় যন্ত্রশিল্পের প্রয়োগ, রেলপথের সঙ্গে যার আশু সম্পর্ক নেই। তাই এই রেলপথই হবে ভারতে সত্যকার আধুনিক শিল্পের অগ্রদূত।"[১৯]

মার্কসের ভবিষ্যদ্বাণী সফল হ'ল। রেলপথ-স্থাপনের ফলে ব্যাপকভাবে গড়ে উঠল বৃটিশ স্বার্থোপযোগী চা-কফি-রবারের বাগিচা কয়লাখনি ও চটকল। চা-বাগান ১৮৫৩ সালে ছিল ১০টি, ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে হ'ল ২৯৫টি, চটকল ১৮৫৪ সালে ছিল ১টি, ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে হ'ল ২০টি; কোলিয়ারী ১৮৫৪ সালে ছিল ৩টি, ১৮৮০ সালে হ'ল ৬০টি। এই সব শিল্প গড়ে উঠেছে বৃটিশ-মূলধনে (অবশ্য এই মূলধনের অধিকাংশই সংগৃহীত হয়েছে ভারত-শোষণ থেকে) এবং ইংরেজ-মালিকানায় পরিচালিত হয়েছে; কোনো ভারতীয় ব্যবসাদারকে এগুলির অংশীদার করা হয়নি।[২০]

তবুও বোম্বাই-এর তুলা-ব্যবসায়ীরা বহু বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করে বস্ত্রশিল্প স্থাপন করেছেন। ভারতীয় মূলধনে ১৮৫৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ভারতের প্রথম বস্ত্রশিল্প। ১৮৬৬ সনে বস্ত্রশিল্প ছিল ১৩টি, ১৮৭৯-৮০ সালে ৫৮টি এবং ১৯০০ খৃষ্টাব্দে হ'ল ১৯৩টি। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের পর থেকে ভারতীয় শিল্পপতিদের আত্ম-বিকাশ ধীরে ধীরে ঘটতে থাকে এবং সীমাবদ্ধতার মধ্যে তাঁদের আত্মপ্রসারে আতঙ্কিত হয়ে বৃটিশ-শিল্পপতিরা ভারতীয় শিল্পের বিকাশকে রুদ্ধ করার জন্য ভারত-সরকারের ওপরে প্রবল চাপ সৃষ্টি করেছেন। ফলে ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে ভারত সরকার বিলিতি কাপড়ের ওপর থেকে আমদানি শুল্ক প্রত্যাহার করেন এবং

১৮৯৪ সালে ভারতীয় বস্ত্রের ওপরে নতুন কর আরোপ করে ভারতীয় বস্ত্র-শিল্প সম্প্রসারণের সীমাবদ্ধ সুযোগকে আরো সঙ্কুচিত করেছিলেন।

এই হ'ল উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ভারতের অর্থনৈতিক চিত্র। সামন্ত-তান্ত্রিক ভূমি-ব্যবস্থার উচ্ছেদ-সাধন না করে বৃটিশ-শিল্পপতিরা এদেশকে কাঁচামালের উৎপাদনকারী দেশ-রূপে গড়ে তুলতে চেয়েছেন। কিন্তু ভারতের বিভিন্ন অংশে ভূমিব্যবস্থার বিভিন্নতার জন্য এদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে শিল্পের যেমন অসম বিকাশ ঘটেছে, তেমনি সমগ্র ভারতের শিক্ষা-চিত্রও এক নয়। বোম্বাই ও বাংলার জনশিক্ষার চিত্র এই অভিমতকেই সমর্থন করে। জনশিক্ষা যেহেতু ভূমি-ব্যবস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, সেহেতু বাংলাদেশে ও বোম্বাইয়ের ভিন্ন ভূমি-ব্যবস্থার জন্য জনশিক্ষার চিত্রও ভিন্নরূপ। বোম্বাইয়ে শিক্ষার মাধ্যম রূপে মাতৃভাষা গৃহীত হওয়ায় জনশিক্ষার বিস্তার ঘটেছে, বাংলাদেশে ইংরেজি মাধ্যম হওয়ায় জনশিক্ষার অগ্রগতি ঘটেনি। বোম্বাইয়ে প্রাথমিক-স্তরে মেকলের নীতি পরিত্যক্ত হয়েছে, আর বাংলাদেশে ভূমিনির্ভর বুদ্ধিজীবীরা তা সাদরে বরণ করেছেন। বোম্বাইয়ের শিল্পপতিরা শিল্পবিকাশের প্রয়োজনে জনশিক্ষা বিস্তারের প্রয়াসকে সমর্থন করেছেন, বাংলার ভূস্বামীশ্রেণী সামন্ত-স্বার্থে জনশিক্ষার বিরুদ্ধাচরণ করেছেন। তাই দেখা যায়, ১৮৫৩ সালে বাংলাদেশে সরকারি পরিচালনায় মাত্র ৩৩টি দেশীয় ভাষার স্কুল ছিল, অথচ বোম্বাইতে দেশীয় ভাষার স্কুল ছিল ২৩৩।[২১]

'অবাধ বাণিজ্যের দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত ভারতের'[২২] শিক্ষাব্যবস্থার সামগ্রিক উন্নয়নকল্পে একটি পরিকল্পনা স্যার চার্লস উডের ডেসপ্যাচে (১৮৫৪ সালের ১৯ জুলাই, ৪৯ সংখ্যক) উপস্থিত করা হয়। এই পরিকল্পনা আলোচনার পূর্বে উড সম্পর্কে মার্কসের উক্তি স্মরণে রাখা প্রয়োজন। ১৮৫৩ সালের ৩ জুন বৃটিশ-পার্লামেন্টে কোম্পানিকে ভারত-শাসনের অনুমোদন-দানের বিলটি চার্লস উড কর্তৃক উত্থাপনের সময়ে মার্কস মন্তব্য করেছিলেন, "কণ্ট্রোল বোর্ডের সভাপতি হিসাবে এই বিচক্ষণ সংস্কারটিকে যিনি হাজির করবেন সেই "স্যার চার্লস উড" হলেন সেই একই মাল যিনি-আগের হুইগ শাসনের আমলে এমনি বিশিষ্ট মানস-ক্ষমতা প্রদর্শন করেন, যে কোয়ালিশন তাঁকে কী করবে কিছুতেই ভেবে না পেয়ে শেষ পর্যন্ত ভারত দপ্তরে পাচার করার মতলব করে। একটা ঘোড়ার জন্য তৃতীয় রিচার্ড একটা রাজ্য দিতে চেয়েছিলেন ; একটা রাজ্যের জন্য কোয়ালিশন দিলেন একটা গাধাকে।"[২৩] সুতরাং এই শিক্ষা-পরিকল্পনা উডের নামে প্রচারিত হলেও প্রকৃত রচয়িতা হলেন ইংলণ্ডের শিল্পপতিরা। তাঁরা

এদেশে পণ্যোৎপাদনের স্বার্থে প্রাথমিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন। তবে বৃটেনের আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে যেমন গোঁজামিল দিয়ে টোরি-হুইগ কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা রক্ষা করা হচ্ছিল, তেমনি এই পরিকল্পনাতে প্রাথমিক শিক্ষার কথা বলা হলেও বাস্তবক্ষেত্রে ইংরেজ-সরকার উচ্চশিক্ষা-বিস্তারে মনোযোগী হয়েছিলেন।

অর্থাৎ প্রথমার্ধের ইতিহাস দ্বিতীয়ার্ধে পুনরাবৃত্তি ঘটেছিল। ১৮১৩ সালের সনদে শিক্ষাখাতে একলক্ষ টাকা মঞ্জুর হওয়ায় গভর্নর-জেনারেল লর্ড ময়রা সেই টাকা জনশিক্ষায় ব্যয়ের পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি মনে করতেন, 'জনসাধারণের অজ্ঞতার ওপরে নয়, তাঁদের শিক্ষার ওপরেই সরকারের শক্তি নির্ভর করে।'[২৪] ময়রা ছিলেন উদারনীতিক। জনসাধারণের শিক্ষার জন্য গ্রাম্য পাঠশালাগুলির প্রয়োজনীয়তা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। তার মতে সরকারি সাহায্যে অথবা সরকারি পরিচালনায় পাঠশালার মানোন্নয়ন ও উন্নত শিক্ষাদান একই সঙ্গে করা প্রয়োজন। তিনি ১৮১৫ সনের ২ অক্টোবর 'মিনিটে' লিখেছেন, "এই আলোচনায় প্রথমে ওঠে স্কুল-শিক্ষকশ্রেণীর কথা, যাঁরা স্বল্পবিত্ত হলেও সম্মানিত। তাঁরা পড়া, লেখা ও অঙ্কের প্রাথমিক পাঠ নামমাত্র পারিশ্রমিকের বিনিময়ে শেখান। এই শিক্ষা যে কোনো মানুষের সাধ্যের মধ্যে এবং তাঁরা যে-শিক্ষা দিতে সক্ষম তাতে গ্রামের জমিদার, সেরেস্তাদার ও দোকানদারের কাজ চলে যায়।

"যে শিক্ষা বর্তমানে দেওয়া হচ্ছে তার জন্য জনসাধারণের অর্থ ব্যয় করা, পরিদর্শন অথবা সাহায্যের অজুহাতে তার ওপর সরকারের হস্তক্ষেপ করা অত্যন্ত অন্যায় হবে। বরং সেটা প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নের দিকে চালিত হওয়া উচিত এবং সেই সকল স্থানের লোকদের শিক্ষিত করা প্রয়োজন, শিক্ষা যাঁদের নাগালের বাইরে। উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ একই সঙ্গে চলতে পারে। তবে শেষোক্তটি সম্পর্কে চিন্তা ও বিবেচনার অবকাশ থাকলেও প্রথমটি আবশ্যিক।"[২৫] কিন্তু ময়রার প্রস্তাব লণ্ডনের কোর্ট অব ডিরেক্টর্‌স্ 'সময়োচিত নয়' বলে অগ্রাহ্য করেছেন। পরিবর্তে তাঁরা যে-নীতি গ্রহণ করেছেন, সেই নীতি কেবলমাত্র প্রথমার্ধে নয়, দ্বিতীয়ার্ধেও অনুসৃত হয়েছে। তার ফলে সরকারি তহবিলের বেশির ভাগ অর্থ উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যয় হ'ল এবং অবহেলিত হ'ল জনশিক্ষা। এমনকি প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে বেসরকারি প্রয়াসকে নিরুৎসাহিত ও সংকুচিত করা হ'ল। শিক্ষাবিষয়ক তিনটি দলিলে তার স্বীকৃতি রয়েছে।[২৬]

চার্লস উডের ডেসপ্যাচকে ঐতিহাসিক জেমস ভারতীয় শিক্ষার 'ম্যাগনা কার্টা'

বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু কাদের জন্য এই ম্যাগনা কার্টা —শোষিত শ্রেণীর অথবা শোষকশ্রেণীর? সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থরক্ষক প্রকৃতই কি এই প্রস্তাবে ঔপনিবেশিক দেশের উৎপীড়িত-লাঞ্ছিত মানুষের মুক্তির সন্ধান পেয়েছিলেন? অথবা সুচতুর বাক্য-বিন্যাসের আড়ালে লুকায়িত সাম্রাজ্যবাদের অভিসন্ধি যাতে ফাঁস না হয়ে যায় সেজন্যই কি জেমস এই প্রস্তাবে জয়ঢাক বাজিয়েছিলেন? উডের ডেসপ্যাচে ব্যবহৃত দ্ব্যর্থবোধক শব্দাবলী ও বাক্যের অন্তর্নিহিত কূট অর্থ অনুধাবন করতে হলে খুব সতর্ক বিশ্লেষণের প্রয়োজন। এবং তখনই উপলব্ধি করা যাবে, এদেশে ইংরেজিভাষায় শিক্ষাদানে মেকলে-বেন্টিঙ্কের প্রয়াসকে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে আরো সুসংগঠিত, সুসংহত ও সুবিন্যস্ত করার প্রচেষ্টা হয়েছে উডের ডেসপ্যাচে —উদ্দেশ্য, এদেশে বৃটিশ-পণ্যের বাজার তৈরি করা।

এদেশে শিক্ষা-বিস্তারের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে ডেসপ্যাচের প্রথমেই বলা হয়েছে, "শিক্ষার উন্নয়নে আমাদের প্রচেষ্টার সার্থকতা ইংলণ্ডের **চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের** সঙ্গে গভীরভাবে সংশ্লিষ্ট। ভারতে ইউরোপীয় শিক্ষার অগ্রগতিতে **তার বাস্তব স্বার্থের হেরফের হচ্ছে না।** পাশ্চাত্যের এই জ্ঞানই, মূলধন ও শ্রমের যথোপযুক্ত প্রযুক্তির অপরিমেয় ফল সম্পর্কে ভারতীয়দের শিক্ষা দেবে; তাদের দেশের অসীম সম্পদ ব্যবহারে আমাদের সমকক্ষ হতে তাদের উৎসাহিত করবে; তাদের প্রচেষ্টাকে সঠিক পথে চালিত করবে; এবং ক্রমশ, কিন্তু নিশ্চিতভাবে তাদের সমস্ত রকমের সুযোগ দেবে, যাতে অর্থ ও সম্পদ বৃদ্ধি হয়; এবং সেইসঙ্গে **আমাদের উৎপাদনের পক্ষে প্রয়োজনীয় বস্তুর অধিক পরিমাণে সরবরাহকেও নিশ্চিন্ত করবে। বৃটিশ-শ্রমিকদের উৎপাদনের অফুরন্ত চাহিদাকে এবং সমস্ত শ্রেণীর মানুষের তা ব্যাপক ব্যবহারকে নিশ্চিত করবে।**"[২৭] [মোটা হরফ লেখকের]

'ইংলণ্ডের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য' নির্ণয় করতে গিয়ে বিবেকানন্দ বলেছেন, "ইংরেজ-চরিত্রে ব্যবসা-বুদ্ধি, আদান-প্রদান প্রধান।"[২৮] সুতরাং তাঁদের 'ব্যবসা-বুদ্ধির' স্বার্থের সঙ্গে এদেশে 'শিক্ষার উন্নয়ন' 'গভীরভাবে সংশ্লিষ্ট'। সেকারণেই তাঁরা ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষা-বিস্তারকে তাঁদের 'বাস্তব স্বার্থের' পরিপন্থী বলে মনে করছেন না। এদেশীয়দের সামনে ভবিষ্যৎ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের যে লোভনীয় চিত্র তুলে ধরা হয়েছে, তার পশ্চাতে রয়েছে কাঁচামাল ও শিল্পজাত দ্রব্যের বিনিময়কামী সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব। এদেশে প্রতীচ্য-শিক্ষা বৃটেনের 'উৎপাদনের পক্ষে প্রয়োজনীয় বস্তুর' অর্থাৎ কাঁচামালের

'সরবরাহকে নিশ্চিন্ত করবে' এবং বিনিময়ে ভারতবর্ষে বৃটেনের শিল্প-পণ্য রপ্তানির দ্বারা 'বৃটিশ-শ্রমিকের উৎপাদনের অফুরন্ত চাহিদা' ঘটবে। বৃটেনে শিল্প-সম্প্রসারণ, শিল্পোন্নয়ন ও দেশের অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার প্রয়োজনে ভারতে কৃষিপণ্য উৎপাদন এবং তৎউদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় ছোট ছোট শিল্প-স্থাপনের জন্য যাঁরা নিযুক্ত হবেন তাঁদের সাধারণ মানের সামান্য লেখাপড়া জানা প্রয়োজন। সেকারণেই ডেসপ্যাচ-রচয়িতারা প্রাথমিক স্তরে মাতৃভাষায় শিক্ষার ওপরে গুরুত্ব আরোপ করেছেন। অর্থাৎ অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এদেশের লুণ্ঠিত অর্থের দ্বারাই ইংলণ্ডে শিল্প-বিপ্লবের গতি দ্রুততর হয়েছিল, এবারে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ভারতবর্ষ থেকে কাঁচামাল আমদানি ও ভারতে বৃটিশ-পণ্য রপ্তানির দ্বারা সেদেশের অর্থনৈতিক সংকট থেকে বৃটিশ-শিল্পপতিদের পরিত্রাণ-লাভের উদ্দেশ্যে রচিত হয়েছে উডের ডেসপ্যাচ।

ভাষা-মাধ্যম বিষয়ে এই পরিকল্পনায় বলা হয়েছে, "দেশীয় ভাষাগুলির বিকল্প ভাষা হিসাবে ইংরেজি প্রচলন করা আমাদের লক্ষ্য বা আকাঙ্ক্ষা নয়। জনসমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ যে-ভাষা বোঝে, সেই ভাষা ব্যবহারের গুরুত্ব সম্পর্কে আমরা সবসময়ে সচেতন। আদালতের প্রশাসনে এবং জনসাধারণের সঙ্গে সরকারি অফিসারদের যোগাযোগের ক্ষেত্রে ফার্সিভাষার পরিবর্তে ইংরেজি ভাষা প্রবর্তন না করে আমরা দেশীয় ভাষা প্রবর্তন করেছি। তাছাড়া এটা অপরিহার্য যে, যে-কোনো শিক্ষা-পদ্ধতিতে ভাষা-চর্চার অক্লান্ত সাধনার প্রয়োজন। জনসাধারণকে ইউরোপীয় জ্ঞানে সমৃদ্ধ করতে হলে যে পারিপার্শ্বিক অবস্থা তাদের উচ্চশিক্ষা-গ্রহণে বাধা সৃষ্টি করে, সেই অবস্থার জন্যই বিদেশী ভাষা শিক্ষার অসুবিধা অতিক্রম করার আশা করা যায় না। ফলে কেবলমাত্র দেশীয় ভাষার মাধ্যমে সেই শিক্ষাদান সম্ভব।

"যে কোনো সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থায় যেখানে ইংরেজিভাষার চাহিদা আছে, সেখানে ইংরেজি শিক্ষা দেওয়া হবে। কিন্তু তা অবশ্যই জেলার আঞ্চলিক ভাষার সঙ্গে দেওয়া হবে এবং সাধারণ শিক্ষা সেই ভাষায় দিতে হবে। যারা ইংরেজিভাষায় যথেষ্ট জ্ঞান অর্জন করেছে, তাদের জন্য সেখানে ইংরেজি ভাষা প্রচলিত থাকবে, যাতে তারা সেই ভাষায় শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। জনসমষ্টির বৃহত্তর অংশ যারা অজ্ঞান কিংবা ইংরেজি জানে না, তাদের জন্য মাতৃভাষাই থাকবে। এ কাজ সেইসব শিক্ষক ও অধ্যাপকদের পক্ষেই সম্ভব, যাঁরা ইংরেজি জানেন ও সর্বপ্রকার জ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে পরিচিত। দেশবাসীকে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দিয়ে নিজেদের

জ্ঞান তাদের মধ্যে সঞ্চারিত করতে তাঁরাই পারবেন। সেইসঙ্গে মাতৃভাষার গুরুত্ব যতই বোঝা যাবে, ইউরোপীয় বইয়ের অনুবাদ কিংবা ইউরোপীয় ভাবধারায় মৌলিক রচনা করা সম্ভব হবে, যাতে ইউরোপীয় জ্ঞান ক্রমশ সকল শ্রেণীর জনসাধারণের নাগালে আসে। সেইজন্য আমরা ইংরেজি ও মাতৃভাষা দুটি মাধ্যমকেই ইউরোপীয় জ্ঞান-বিস্তারের জন্য ব্যবহারে ইচ্ছুক। আমাদের ইচ্ছা, ভারতের স্কুলগুলিতে এ দু'য়ের চর্চা একসঙ্গে এমন উচ্চ পর্যায়ে হোক, যাতে স্কুল-শিক্ষকরা উপযুক্ত রকম শিক্ষিত হয়ে ওঠেন।"[২৯] [মোটা হরফ লেখকের]

নয়া ভাষা-প্রস্তাবে অনেক কথা বলা হলেও মোটা হরফের দুটি পৃথক বাক্য একসঙ্গে পাঠ করলে বুঝতে কষ্ট হয় না যে, পূর্বের অনুসৃত নীতিকে নতুন মোড়কে উপস্থিত করা হয়েছে। তাই তাঁরা মেকলে-বেন্টিঙ্কের ইংরেজিভাষায় শিক্ষাদানের নীতির বিরুদ্ধাচরণ করেননি ; বরং পুরানো নীতির সমর্থনে তাঁদের অপরাধ ক্ষালনের জন্য বলা হয়েছে, 'ভারতবর্ষে দেশীয় ভাষায় ইংরেজি রচনার অনুবাদের অভাব ও প্রাচ্য ভাষায় অনূদিত ইউরোপীয় গ্রন্থগুলির অসম্পূর্ণতার জন্য'[৩০] এদেশে প্রতীচ্য বিদ্যাদানের প্রয়োজন হয়েছিল। তা ছাড়া 'নিম্নমুখী পরিস্রুতি তত্ত্বের' প্রবক্তা হ্যারিংটন-মেকলের প্রদর্শিত যুক্তি অনুসরণ করে এখানেও বলা হয়েছে, ইংরেজি-শিক্ষিত ব্যক্তিরা মাতৃভাষায় এদেশীয় মানুষকে শিক্ষিত করছেন, অর্থাৎ শিক্ষা ওপর থেকে নীচে চুঁইয়ে নামছে। কিন্তু তাঁদের মাতৃভাষায় জ্ঞানের নমুনা গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়ে (পৃঃ ৭৫—৭৭) প্রদর্শিত হয়েছে।

অবশ্য ডেসপ্যাচে স্বীকার করা হয়েছে, অতীতে শিক্ষাখাতে বরাদ্দ অর্থের অধিকাংশ সরকারের উদ্যোগে কলেজ-স্থাপনে ব্যয় করা হয়েছে এবং 'নিম্নমুখী পরিশ্রুতি তত্ত্ব' প্রয়োগের জন্য দুঃখ প্রকাশ করে বলা হয়েছে, এই নীতির ফলে দেশীয়দের অত্যন্ত ক্ষুদ্র অংশ, যাঁরা অভিজাতশ্রেণী থেকে আগত, তাঁদের উচ্চশিক্ষা-দানের জন্য সরকারি প্রয়াস নিয়োজিত হয়েছে। সুতরাং ডেসপ্যাচের নির্দেশ হ'ল, "সম্ভব হ'লে আমাদের মনোযোগ আরো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নিয়োগ করতে হবে ; আমাদের অবশ্যই স্বীকার করতে হবে, সেগুলি অতিমাত্রায় অবহেলিত হয়েছে। যেমন প্রয়োজনীয় ও কার্যকরী জ্ঞান, যা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে উপযুক্ত, তা অধিকাংশ মানুষের মধ্যে সঞ্চারিত করা, যাঁরা নিজেদের চেষ্টায় যে-কোনো শিক্ষাগ্রহণে একেবারে অক্ষম। আমরা দেখতে চাই যে, সরকারের সক্রিয় প্রচেষ্টা ভবিষ্যতে এই উদ্দেশ্যে যেন নিয়োজিত হয়। আমরা এর জন্য বর্ধিত হারে ব্যয়

মঞ্জুর করতে প্রস্তুত।"[৩১] তারপরে দু'ধরণের স্কুল সম্পর্কে বলা হয়েছে, "ইংরেজি-মাতৃভাষা ও মাতৃভাষার স্কুলগুলিকে আমরা এক পর্যায়ভুক্ত করতে চাই। কারণ বর্তমানে বিভিন্ন মাধ্যমে শিক্ষা দেবার পদ্ধতির জন্য স্কুলগুলির মধ্যে তারতম্য করা হয় এবং আমরা তা বজায় রাখতে অনিচ্ছুক। অবশ্য **সন্দেহ নেই যে, বর্তমানে ইংরেজি-মাতৃভাষার স্কুলগুলি মাতৃভাষার স্কুলগুলির তুলনায় অনেক উচ্চপর্যায়ের।** কিন্তু এই তারতম্য কমে যাবে ও শেষোক্তগুলির ক্রমোন্নতি ঘটবে, যখন মাতৃভাষায় শিক্ষাদান উন্নত হবে ও প্রচুর সংখ্যক শিক্ষক উচ্চ পর্যায়ে শিক্ষা দেবার জন্য সক্ষম হবে।"[৩২]

এই অংশে মোটা হরফে চিহ্নিত বাক্যের দ্বারা অ্যাংলো-ভার্নাকুলার (ইংরেজি-মাতৃভাষা) স্কুলের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করা হয়েছে, অথচ প্রথমার্ধের স্টুয়ার্ট, মে, কলকাতা স্কুল সোসাইটি ও শ্রীরামপুরের মিশনারিদের দ্বারা পরিচালিত দেশীয় ভাষার স্কুলগুলিতে শিক্ষাদানের পদ্ধতি, মান ও পরিচালনা ইত্যাদি সকল দিক থেকে ইংরেজি-স্কুলের সমকক্ষ ছিল, কোনো অংশেই ন্যূন ছিল না। প্রকৃতপক্ষে তাঁরা এই ঘোষণার দ্বারা মাতৃভাষার তুলনায় ইংরেজির শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে চেয়েছেন। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল, দেশের উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী যাতে তাঁদের সন্তানদের ইংরেজি-স্কুলে অথবা ইংরেজি-মাতৃভাষা স্কুলে শিক্ষাগ্রহণের জন্য প্রেরণ করেন। তাই তাঁরা দেশীয় ভাষায় দেশের সর্বত্র শিক্ষাবিস্তারের কথা বলেননি। পক্ষান্তরে, তাঁরা মাতৃ-ভাষার সঙ্গে ইংরেজিভাষায় শিক্ষাদানের নীতি বজায় রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন।

তাছাড়া তাঁরা দ্বিভাষা-সূত্র অনুসরণের প্রস্তাব দিলেও এদেশীয়দের সরকারি চাকরিলাভের জন্য যে-নির্দেশ দিয়েছেন, তাতে এদেশের ইংরেজিভাষায় শিক্ষা-বিস্তারের কর্মপ্রয়াসকে উৎসাহিত করা হয়েছে। ডেসপ্যাচে বলা হয়েছে, "আমরা সর্বদা এই অভিমতই পোষণ করেছি যে, **ভারতে শিক্ষা-বিস্তার ঘটলে শাসনব্যবস্থার প্রতিটি শাখায় উন্নতি ঘটবে।** কারণ **তখনই সরকারের প্রতিটি দপ্তরে বিশ্বস্ত ও বুদ্ধিমান ব্যক্তির সাহায্য পাওয়া যাবে।** আর অন্যদিকে, আমাদের বিশ্বাস, বিভিন্ন রকমের প্রচুর সংখ্যক শূন্যপদে এদেশীয়দের নিরন্তর নিয়োগের দ্বারা শিক্ষাগ্রহণে উৎসাহ সৃষ্টি হবে।

"আমাদের অভিলাষ যে, **সরকারি চাকরিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে সমযোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীদের মধ্যে যে ব্যক্তির শিক্ষা অধিকতর, সেই শিক্ষা সে যেখানেই লাভ করে থাক না কেন, অশিক্ষিতের**

পরিবর্তে তাকেই নির্বাচিত করতে হবে। এমনকি নিম্নতম পর্যায়েও যে লিখতে ও পড়তে পারে অন্যান্য যোগ্যতা থাকলে তাকেই নিয়োগ করা হবে, যে পারে না তাকে নয়।

"সরকারের অধীনস্থ কর্মসংস্থানের সংখ্যা যত বেশিই হোক না কেন, যে উদার শিক্ষা তারা পেয়েছে তাকে ভিত্তি করে **উচ্চতর এবং প্রয়োজন ও সুবিধানুসারে আবশ্যক ক্ষেত্রে স্থানীয় অধিবাসীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হবে, যাদের দ্বারা উন্নত জ্ঞানের প্রত্যক্ষ সুবিধাগুলির কথা অন্যান্যদের ক্রমাগত বুঝিয়ে দিতে হবে এবং তাদের অনুভূতির সঙ্গে যারা পরিচিত ও তাদের ওপরে যাদের প্রভাব অথবা নির্দেশ-দানের কর্তৃত্ব অথবা তাদের প্রচেষ্টা পরিচালনার ক্ষমতা রয়েছে।**"৩৩ (মোটা হরফ লেখকের)

উপর্যুক্ত উদ্ধৃতির মোটা হরফের বাক্যগুলিতে মেকলের কণ্ঠ ধ্বনিত হয়েছে। মেকলে এদেশে শাসন-শোষণের সুবিধার্থে কিছু কেরাণী-দোভাষী সৃষ্টির জন্য ইংরেজিভাষায় শিক্ষা প্রবর্তনের সুপারিশ করেছিলেন। উডের ডেসপ্যাচেও অনুরূপ মনোভাবের প্রকাশ ঘটেছে ; এখানে ঔপনিবেশিক দেশে সাম্রাজ্যবাদের স্তম্ভ গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তাই অভিব্যক্ত হয়েছে। সেকারণেই প্রশাসন-কার্যে ইংরেজি-জানা সেই সকল ব্যক্তিদের নিয়োগ করা হবে যাদের সামাজিক ভিত্তি আছে এবং যারা সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থ রক্ষা করবে। অর্থাৎ ইংরেজি-শিক্ষিত প্রভাবশালী অভিজাত-সন্তানদের সরকারি চাকরিতে নিয়োগের জন্য অকল্যাণ্ডের নির্দেশিত নীতি উডের প্রস্তাবে পরিত্যক্ত না হওয়ায় দেশের মানুষ ইংরেজি শিখতে আগ্রহান্বিত হবেন ; ইংরেজি-অজ্ঞ ব্যক্তিদের চাকরি-লাভের সম্ভাবনা না থাকায় মাতৃভাষায় শিক্ষাগ্রহণের আগ্রহ হ্রাস পাবে। এবং বাস্তবে তাই ঘটেছিল। পরবর্তী একশ' বছরে সচ্ছল পরিবারের সন্তানদের কাছে ইংরেজিভাষা ছিল প্যাণ্ডোরা-বাক্সের চাবিকাঠি।

বিভিন্ন রাজ্যের শিক্ষাপ্রয়াস বিশ্লেষণের পরে উডের ডেসপ্যাচে সর্বশেষে বলা হয়েছে, "আমরা ঘোষণা করেছি যে, সর্বশ্রেণীর জনসাধারণের মধ্যে ইউরোপীয় জ্ঞান-বিস্তার করাই হ'ল আমাদের লক্ষ্য। ইংরেজিভাষায় উচ্চতর শিক্ষা এবং মাতৃভাষায় জনসাধারণের মধ্যে বিদ্যাদানের দ্বারা এই লক্ষ্যে পৌছানো সম্ভব। এখন থেকে উচ্চতর শ্রেণীকে স্বনির্ভর হতে হবে। মধ্য ও নিম্নশ্রেণীর মধ্যে শিক্ষা-প্রসারে আপনাদের বিশেষভাবে মনোযোগী হতে হবে। সেই উদ্দেশ্য পূরণের জন্য উপযুক্ত স্কুল স্থাপন করতে হবে এবং **যে-স্কুলগুলি**

গ্রামে গ্রামে আবহমানকাল চলছে, সেগুলিকে সতর্কভাবে উৎসাহ দিতে হবে। এগুলির মধ্যে সম্ভবত কোনোটিই আমাদের উদ্দেশ্যের পক্ষে উপযুক্ত হয়ে উঠবে না।"[৩৪] (মোটা হরফ লেখকের)

কিন্তু উড-সাহেবদের কেন এই সন্দেহ প্রকাশ? কি তাঁদের উদ্দেশ্য? গ্রামের প্রাথমিক স্কুলগুলিকে উৎসাহদানের সময়ে কেন সতর্কতা অবলম্বনের নির্দেশ? প্রশ্নগুলির উত্তর নিহিত রয়েছে তৎকালীন কৃষক-বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রামগুলির মধ্যে। শ্রমজীবী-কৃষিজীবী-সমাজ সামান্য লেখাপড়া শিখে বাস্তব অভিজ্ঞতার নিরিখে যদি তাঁদের শ্রেণীশত্রুকে চিনতে পারেন এবং জমি ও ভাষা হারানোর বেদনায় উদ্বেলিত হয়ে যদি তাঁরা সুসংগঠিত বিদ্রোহের দ্বারা জমি ও ভাষার অধিকার দাবি করেন, তাহলে সাম্রাজ্যতন্ত্র ও সামন্ততন্ত্রের সর্বনাশ। তাই প্রাথমিক শিক্ষা-বিস্তারে তাঁদের এত আতঙ্ক, এত সতর্কতা অবলম্বনের উপদেশ।

সুদীর্ঘকাল ধরে এদেশের শিক্ষাজগতে যে-নৈরাজ্য চলছিল, যে-শিক্ষাব্যবস্থা দু'টি স্তরে বিভক্ত ছিল, উডের ডেসপ্যাচে তাকে একটা সুনির্দিষ্ট রূপ দেবার প্রয়াস করা হয়েছে। তাঁদের সুপারিশ-অনুসারে তিনটি স্তরে বিন্যস্ত একটি সামগ্রিক শিক্ষাকাঠামোর শীর্ষস্থানে থাকবে বিশ্ববিদ্যালয়। তার অনুমোদিত কলেজগুলি উচ্চতর শিক্ষাদানে রত থাকবে এবং বিশ্ববিদ্যালয় কলেজীয় শিক্ষা ও স্কুল-শিক্ষার পরীক্ষা গ্রহণ করবে। কলেজের নীচের ধাপে উচ্চ ও মধ্য বিদ্যালয়ে মাধ্যমিক শিক্ষা দেওয়া হবে এবং সর্বনিম্ন স্তরে প্রাথমিক শিক্ষার বিদ্যালয়গুলি থাকবে। রাজ্যের শিক্ষা পরিচালনার জন্য কাউন্সিল অব এডুকেশনের পরিবর্তে সরকারের অধীনে জনশিক্ষা বিভাগ (Department of Public Instruction) স্থাপন করতে হবে এবং সেই বিভাগ শিক্ষা-অধিকর্তার (Director of Public Instruction) অধীনে থাকবে। ধনতান্ত্রিক আদর্শে এই শিক্ষা-কাঠামো গড়ে তোলা হলেও যে অর্থনৈতিক ভিত্তির ওপরে নির্মিত হয়েছিল, তা ছিল সামন্ততান্ত্রিক। সামন্ততন্ত্রের ঔরসে ও ধনতন্ত্রের গর্ভে যে সন্তান জন্ম নিল, তা হ'ল বিকলাঙ্গ, পঙ্গু। সুস্থ সবল দেহ নিয়ে সে গড়ে উঠল না। দেহের একটি অংশই স্ফীত হ'ল। সেই অংশেই দেহের সমস্ত রক্ত এসে জমা হ'ল, সমগ্র দেহে তা ছড়িয়ে পড়ল না। অথচ ধনতান্ত্রিক শিক্ষার সার্থকতা নির্ভর করে ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির পূর্ণ বিকাশে এবং সামন্ততন্ত্রের সম্পূর্ণ ধ্বংসসাধনের ওপরেই তার ভিত্তি গড়ে ওঠে। বৃটেন, ফ্রান্স, জার্মানিতে যে-ধনতান্ত্রিক কাঠামোকে অবলম্বন করে জনশিক্ষার প্রসার ঘটেছিল, তা তখনই সম্ভব

হয়েছিল যখন সে দেশগুলিতে সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতিকে ধ্বংস করে শিল্পবিপ্লব ঘটেছিল। কিন্তু উনিশ শতকের বৃটিশ-শাসনাধীন ভারতে সামন্ততান্ত্রিক অর্থনৈতিক কাঠামোকে ভেঙে না ফেলায় শিল্পবিপ্লব ঘটল না, বৃটেনের ধনতন্ত্র এখানে সামন্ততন্ত্রের শত্রু না হয়ে তাকে মিত্ররূপে গ্রহণ করায় শিক্ষা সর্বস্তরে ছড়িয়ে পড়ল না, একটি অংশে সীমাবদ্ধ হয়ে থাকল। শ্রমজীবী-কৃষিজীবী সমাজে জনশিক্ষা সম্প্রসারিত হ'ল না : তাই উনিশ শতকে মাতৃভাষায় শিক্ষা-দানের দাবি উত্থাপিত হলেও ভূমি-নির্ভর উচ্চ ও মধ্যশ্রেণীর কেউ তাঁদের জন্য প্রাথমিক শিক্ষার দাবি করেননি।

উডের ডেসপ্যাচের প্রস্তাবক্রমে নতুন শিক্ষা-কাঠামো গঠনের সঙ্গে যে-শিক্ষণীয় বিষয় নির্ধারিত হ'ল, তাতে স্বদেশ, স্বজাতি ও স্বভাষা রইল একান্ত-ভাবেই অনুপস্থিত। কবিগুরুর ভাষায় বলা যায়, "যখন আমরা একবার ভালো করিয়া ভাবিয়া দেখি যে, আমরা যেভাবে জীবন নির্বাহ করিব আমাদের শিক্ষা তাহার আনুপাতিক নহে, আমরা যে গৃহে আমৃত্যুকাল বাস করিব সে গৃহের উন্নত চিত্র আমাদের পাঠ্য-পুস্তকে নাই, যে সমাজের মধ্যে আমাদিগকে জন্ম-যাপন করিতেই হইবে সেই সমাজের কোনো উচ্চ আদর্শ আমাদের নূতনশিক্ষিত সাহিত্যের মধ্যে লাভ করি না, আমাদের পিতা মাতা — আমাদের সুহৃৎ বন্ধু — আমাদের ভ্রাতা ভগ্নীকে তাহার মধ্যে প্রত্যক্ষ দেখি না, আমাদের দৈনিক জীবনের কার্য-কলাপ তাহার বর্ণনার মধ্যে কোন স্থান পায় না, আমাদের আকাশ এবং পৃথিবী — আমাদের নির্মল প্রভাত এবং সুন্দর সন্ধ্যা — আমাদের পরিপূর্ণ শস্যক্ষেত্র এবং দেশলক্ষ্মী স্রোতস্বিনীর কোনো সঙ্গীত তাহার মধ্যে ধ্বনিত হয় না, তখন বুঝিতে পারি, আমাদের শিক্ষার সহিত আমাদের জীবনের তেমন নিবিড় মিলন হইবার কোনো স্বাভাবিক সম্ভাবনা নাই ; উভয়ের মাঝখানে একটা ব্যবধান থাকিবেই থাকিবে. আমাদের শিক্ষা হইতে আমাদের জীবনের সমস্ত আবশ্যক অভাবের পূরণ হইতে পারিবেই না। আমাদের সমস্ত জীবনের শিকড় যেখানে সেখান হইতে শত হস্ত দূরে আমাদের শিক্ষার বৃষ্টিধারা বর্ষিত হইতেছে, বাধা ভেদ করিয়া যেটুকু রস নিকটে আসিয়া পৌছিতেছে সেটুকু আমাদের জীবনের শুষ্কতা দূর করিবার পক্ষে যথেষ্ট নহে।"[৩৫] তাই 'আজ দেশে যে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তিত হয়েছে মাটিকে সে দান করেছে অতি সামান্য, ভূমিকে সে আপন উপাদানে উর্বরা করে তুলছে না। জাপান প্রভৃতি দেশের সঙ্গে আমাদের এই প্রভেদটাই লজ্জাজনক এবং শোকাবহ।'[৩৬] দেশের স্বার্থের পক্ষে শোকাবহ বলে কবিগুরু মনে করলেও সাম্রাজ্য-শাসকদের ও তাঁদের

এদেশীয় সহযোগীদের কাছে প্রবর্তিত শিক্ষণীয় বিষয়গুলি ছিল শ্রেণীস্বার্থ রক্ষার নিরাপদ হাতিয়ার।

শিক্ষার মাধ্যম-রূপে দেশীয় ভাষাগুলিকে মর্যাদা-দানের কথা বলা হলেও কার্যত তার প্রতি অবহেলাই প্রদর্শিত হয়েছে এবং বাস্তবে তার প্রয়োগ ঘটেনি। 'মাতৃভাষা ভালো করে শেখাবার আগে, প্রথম থেকে, তার পাশাপাশি ইংরেজিভাষা একটি বিষয় রূপে শেখানো হ'ত অ্যাংলো-ভার্ণাকুলার বিদ্যালয়ে ইংরেজিভাষা ভিন্ন অন্যান্য বিষয় মাতৃভাষায় পড়ানো হ'ত আর উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ে ষষ্ঠ শ্রেণী অবধি ইংরেজি ভিন্ন অন্যান্য বিষয় বাংলায় পড়ানো হ'ত এবং সপ্তম শ্রেণী থেকে বাংলা ভিন্ন অন্যান্য বিষয় ইংরেজিতে পড়ানো হ'ত। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রবেশিকা পরীক্ষায় ভূগোল, ইতিহাস ও অঙ্কের প্রশ্নপত্রের বাংলা বা ইংরেজিতে দেওয়ার বিকল্প ছিল, কিন্তু ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের পরীক্ষায় সব প্রশ্নের উত্তর ইংরেজিতে লিখতে বলা হ'ল। এরপর আর অ্যাংলো-ভার্ণাকুলার বিদ্যালয়গুলির আত্মরক্ষার উপায় রইল না।'[৩৭] ইংরেজি-স্কুলের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অ্যাংলো-ভার্ণাকুলার স্কুল যেখানে টিকতে পারছে না, সেখানে ভার্ণাকুলার স্কুলের অবস্থা সহজেই অনুমেয়।

প্রাথমিক শিক্ষাকেও সর্বজনীন করার কোনো আন্তরিক প্রচেষ্টা তাঁদের ছিল না। প্রাথমিক শিক্ষাখাতে কিছু ব্যয়বৃদ্ধি ঘটলেও তা শিক্ষাখাতে বরাদ্দ অর্থের সামান্য অংশ ছিল; অধিকাংশ অর্থ মাধ্যমিক ও কলেজীয় শিক্ষার জন্য ব্যয় হ'ত। অথচ বোম্বাইয়ে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য সরকারের অর্থব্যয় সবচেয়ে বেশি হ'ত। সেখানে উন্নত প্রাথমিক শিক্ষাদানের জন্য শিক্ষক-শিক্ষণ বিদ্যালয় এবং নতুন ধরণের প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল। এই স্কুলগুলির লক্ষ্য ছিল দেশীয় ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিস্তার। দশ শ্রেণী বিশিষ্ট প্রাথমিক স্কুলগুলিতে শিক্ষণীয় বিষয় ছিল লেখা, পড়া, অঙ্ক, ভারত ও ইংলণ্ডের ইতিহাস, ভূগোল, জ্যোতির্বিদ্যা, বীজগণিত, প্রকৃতিবিজ্ঞান, ইউক্লিডিয় জ্যামিতি, ত্রিকোণমিতি। এই প্রাথমিক স্কুলগুলি ছিল উচ্চ বিদ্যালয়ের মতো যেখানে মাতৃ-ভাষায় সব বিষয় শেখানো হ'ত। এখানে শিক্ষকদের বেতন ছিল ভালো ও শিক্ষার মান ছিল উঁচু। অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষা চিত্র ছিল অতীব লজ্জাকর। ১৮৫৫-৫৬ সালে বোম্বাই রাজ্যে সরকারি প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা ছিল ২২০ এবং ছাত্রসংখ্যা ১৭,৬৬২। ১৮৫৬-৫৭ সনে পঞ্জাবে ৫৭৯টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল। ১৮৫৪-৫৫ সালে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে

৮৩০টি বিদ্যালয়ে ১৭,০০০ জন ছাত্র ছিল। কিন্তু বাংলাদেশে ১৮৫৪ সালে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ৬৯ এবং ছাত্রসংখ্যা ৩২৭৯।[৩৮]

১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহে আতঙ্কিত হয়ে ইংলণ্ডের কোম্পানির কর্তৃপক্ষের মধ্যে শিক্ষা-বিষয়ে উডের ডেসপ্যাচের প্রস্তাবিত কার্যক্রমের বিরোধী মনোভাব গড়ে উঠেছিল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বোর্ড অব কণ্ট্রোলের সভাপতি লর্ড এলেনবরো ১৮৫৮ সালের ২৮ এপ্রিলের ডেসপ্যাচে ভারতীয়দের বিদ্রোহের জন্য প্রচলিত শিক্ষাকে দায়ী করে বিপরীত নীতি গ্রহণ করতে বলেছেন। সৌভাগ্যক্রমে তাঁর নির্দেশ কার্যকরী হয়নি।

১৮৫৮ সালে কোম্পানি-শাসনের অবসান ঘটল এবং ভারতবর্ষ বৃটিশ পার্লামেন্টের প্রত্যক্ষ শাসনের অধীন হ'ল। ১৮৫৯ সনে ভারত-সচিব লর্ড স্টানলি এদেশে শিক্ষার অগ্রগতি সম্পর্কে পর্যালোচনা করে তাঁর শিক্ষা-ডেসপ্যাচে বলেছেন যে, ১৮৫৪ সাল থেকে এদেশে প্রাথমিক শিক্ষা-বিস্তারের জন্য কিছু করা হয়নি। সুতরাং 'সাধারণ মানুষের ক্ষমতার মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব নিজের বলে যদি সরকার মনে করেন, তাহলে এর থেকে বেশি শিক্ষা গ্রহণের প্রয়োজন বলে যে সমস্ত ব্যক্তি বা শ্রেণী মনে করবেন, তাঁরা সরকারি সাহায্যে অথবা সাহায্য ছাড়া নিজেদের ক্ষমতায় সেই উচ্চশিক্ষা অর্জন করতে পারেন।'[৩৯] সেকারণে ভারতসচিব সরকারি স্কুলগুলির পরিচালনার দায়িত্ব ত্যাগ করা কিংবা সেই স্কুলগুলিকে স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলির পরিচালকদের হাতে অর্পণ করার বিষয়ে কোনো নির্দেশ দেননি। পক্ষান্তরে তিনি ১৮৫৪ সালের ডেসপ্যাচের সেই বিষয়টির দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, যেখানে বলা হয়েছে, প্রয়োজনানুযায়ী সরকারি কলেজ ও স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হবে।

কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয় নির্বাহের জন্য এই ডেসপ্যাচে বলা হয়েছে, 'বারংবার আবেদনের দ্বারা বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহের মতো কষ্টদায়ক ও ঘৃণ্য কাজ থেকে শিক্ষা-বিভাগের অফিসারদের অব্যাহতি দেওয়া হোক' (যে কাজ তাঁদের গ্র্যাণ্ট-ইন-এড-এর নিয়মানুসারে অবশ্যই করতে হয়)। 'প্রাথমিক শিক্ষা-বিস্তারে সরকারি অফিসারদের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের ব্যবস্থা করতে হবে' এবং সেকারণে প্রাথমিক স্কুলগুলির সাহায্যের জন্য স্থানীয় শিক্ষাকর প্রবর্তনের প্রয়োজন। কারণ 'জমির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের শিক্ষার জন্য বার্ষিক ভূমি-রাজস্বের অনুপাতে একটি নির্দিষ্ট অংশ এই কাজে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে পৃথক রাখতে হবে এবং এর অংশবিশেষ রাস্তাঘাট নির্মাণের কাজে ব্যবহৃত হলে এই কর-আরোপে কারোর আপত্তি হবে না।'[৪০]

এই প্রস্তাবের পশ্চাতে ছিল উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের ছোটলাট মিঃ জেমস টমসনের বাস্তব অভিজ্ঞতা। তিনি সেখানে প্রাথমিক শিক্ষা-প্রসারের জন্য ১৮৪৮ সালে ভূমি-রাজস্বের শতকরা ১½ ভাগ শিক্ষাকর ধার্য করে সফলতা অর্জন করেছিলেন। স্টানলির নির্দেশে বিভিন্ন প্রদেশে ভূমিকরের ১½% থেকে ৭½% পর্যন্ত অনুপাতে বিভিন্ন হারে শিক্ষাকর প্রবর্তিত হয়। ১৮৪৮ সালে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে (উত্তরপ্রদেশে) ১½%, ১৮৫৬-৫৭ সনে পঞ্জাবে ১%, ১৮৬১ সালে অযোধ্যায় ২½%, ১৮৬২-৬৩ সনে মধ্যপ্রদেশে ১% (দু'বছর পর থেকে ২%), ১৮৬৩ সালে বোম্বাইয়ে ৬¼%, ১৮৬৫ সনে সিন্ধুরাজ্যে ৬¼%, ১৮৬৫ সালে বেরারে ৭½%, ১৮৭১ সনে মাদ্রাজে ৬¼% এবং ১৮৭৯ সালে আসামে শিক্ষাকর প্রবর্তিত হয়েছিল।[৪১] কিন্তু বাংলাদেশে ভূস্বামীশ্রেণীর প্রবল বাধাদানের ফলে তা চালু করা যায়নি। কারণ রায়ত-কৃষকেরা লেখাপড়া শিখলে বঞ্চনা-প্রতারণা করা কঠিন হবে। তাই তাঁদের শিক্ষাদানে এদেশের ভূস্বামীশ্রেণীর প্রবল আতঙ্ক।—তীব্র আপত্তি। এদের আশঙ্কার অভিব্যক্তি ঘটেছে 'পল্লীসমাজ'-এর জমিদার বেণী ঘোষালের উক্তিতে—"এই যে নূতন একটা স্কুল করেচে, এ নিয়ে আমাদের অনেক কষ্ট পেতে হবে। এমনিই ত মোচলমান প্রজারা জমিদার বলে মানতে চায় না, তার ওপর যদি লেখাপড়া শেখে তাহলে জমিদারী থাকা না-থাকা সমান হবে তা এখন থেকে বলে রাখচি।"[৪২]

প্রস্তাবিত শিক্ষাকরের বিরুদ্ধে জমিদাররা যুক্তি প্রদর্শন করেছিলেন যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দ্বারা চিরস্থায়ীভাবে ভূমিকর নির্ধারিত হয়ে যাবার পরে সরকারের তদুপরি অন্য কোনো কর গ্রহণের অধিকার নেই। প্রকৃতপক্ষে রায়ত-কৃষকের সন্তানদের সামান্য লেখাপড়া শেখাতেও জমিদাররা রাজী ছিলেন না। এমনকি যাঁরা মাতৃভাষায় শিক্ষা-বিস্তারের জন্য চেষ্টা করেছিলেন, তাঁরাও সমাজের নিম্নশ্রেণীর সন্তানদের সাধারণ লেখাপড়া শেখানোর বিরোধী ছিলেন। যেমন মাতৃভাষার অন্যতম সমর্থক 'সংবাদ ভাস্কর' পত্রিকার সম্পাদক লিখেছেন (১১.৯.১৮৫৬), "ব্রিটিস গভর্ণমেণ্ট মনে করুন পৃথিবীর সকল জাতিকেই তুল্যস্বরূপে সম্মান দিলেন, কেন্যো মেথর পর্য্যন্তও বিদ্যালাভে উচ্চ হইয়া উঠিল, গভর্ণমেণ্ট হৌসে কোন পর্ব্বোপলক্ষে সকল প্রজাকে নিমন্ত্রণ করিতে হইল, কালিদাস মেথর বিদ্বান হইয়াছে মণিমুক্তাদি খচিত বসন ভূষণাদি পরিয়া চতুরশ্বযোজিত শকটারোহণে ভ্রমণ করে তাহাকে কি বলিয়া নিমন্ত্রণ করিবেন না? আপনারাই বিদ্যাদান দ্বারা সম্মান দিয়াছেন, আপনারাই কি তাহার সে সম্মানে অসম্মান করিতে পারেন? কালিদাস মেথর গভর্ণমেণ্টের অট্টালিকার

মহাসভায় গেল এবং রাজা রাধাকান্ত বাহাদুর ও রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুরাদি সম্ভ্রান্ত মহামহিমদিগের সহিত একত্র বসিল, মেথর পর্য্যন্ত যদি এত সম্মানিত হইয়া উঠিল তবে কলিকাতা নগরীর সকল পায়খানার কর্ম্ম কে করিবে? আর যদি কেল্যো মেথর গবর্ণমেণ্টকে দুই তিন লক্ষ টাকা দান করিয়া রাজ্যোপাধি চাহে তবে দ্বাবিংশতি প্রকার ভূপতি চিহ্ন দিয়া তাহাকেও রাজা করিবেন। এইরূপে যদি নীচ জাতীয় সকলেই রাজা হইয়া উঠিল তবে লাঙ্গল ঘাড়ে করিয়া মাঠে যাইয়া কে হলযোগ করিবে?"[৪৩]

'সংবাদ ভাস্কর'-সম্পাদক পণ্ডিত গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ তৎকালীন প্রত্যেকটি প্রগতিশীল আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে গতিশীল মনের পরিচয় দিয়েছেন, অথচ জনশিক্ষার প্রশ্নে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি জনমুখীন ছিল না। তাঁর সেই জনশিক্ষা-বিরোধী মনোভাবের পুনরায় প্রকাশ ঘটেছে (২০. ৯. ১৮৫৬), "কিন্তু এই সুখের কালেও এক অসুখ হইয়া উঠিতেছে ইতর সাধারণ সকলে বিদ্যারসে রসিক হইতেছে, তাহারা আর নীচ কর্ম্ম করিতে চাহেন না। ইহাতেই নিত্য কর্ম্ম সম্পাদক ভৃত্যগণের প্রায় অভাব হইয়া উঠিয়াছে। লিখন পঠন ঘটিত একটি সামান্য কর্ম্মে কোন লোকের প্রয়োজন হইলে একশত জন বিদ্বান লোক আসিয়া উপাসনা করিলেন কিন্তু তৈল মাখাইতে, কাপড় কোঁচাইতে, হাট বাজার করিতে, পান, তামাক সাজিতে, ইত্যাদি গৃহ কর্ম্ম করিতে জানে এমত ভৃত্যের প্রয়োজন হইলে এক ব্যক্তিও আইসে না ইহাতে সম্ভ্রান্ত গৃহস্থ লোকদিগের নিত্য কর্ম্মে ভৃত্যাভাবে অশেষ ক্লেশ হইতেছে, পূর্ব্বে যে সকল নীচ লোকেরা এদেশে রাজ মজুরী করিত এইক্ষণে তাহারা কর্ণিকাদি পরিত্যাগ করিয়া কাগজ কলম ধরিয়া বসিয়াছে। ধোপা, নাপিত, ছুতার, মেথরাদিও কেরানি, বিল সরকার, মেট দালালাদির কর্ম্মে গিয়াছে। নীচ কর্ম্মের লোকের অত্যন্ত অপ্রতুল হইয়াছে।"[৪৪] এই মনোভাব কেবলমাত্র পণ্ডিত গৌরীশঙ্করের নয়, এই মনোভাব ছিল সেকালের উচ্চ ও মধ্যশ্রেণীর অধিকাংশ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের। তাই 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকার খ্যাতনামা সম্পাদক দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ ভূস্বামীশ্রেণীর ওপরে শিক্ষাকর প্রবর্তনের বিরোধিতা করেছেন। তাঁর মতে "প্রতি কার্য্যে যদি তাহাদিগের নিকট হইতে নূতন নূতন কর গ্রহণ করা হয়, তাহাদিগের সহিত যে স্থায়ী বন্দোবস্ত করা হইয়াছে তাহার অন্বর্থতা থাকে না।"[৪৫]

বিভিন্ন রাজ্যে শিক্ষাকর প্রবর্তনের ফলে সমগ্র ভারতে প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার ঘটতে থাকে। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে বিভিন্ন ধরণের প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা

ছিল ২৮১০ এবং ছাত্রসংখ্যা ৯৬,৯২৩। এই হিসাবের মধ্যে গ্রামের পাঠশালার সংখ্যা ধরা হয়নি। এসময়ে পাঠশালার সংখ্যা ছিল ৪৭,৮৮৬ এবং ছাত্রসংখ্যা ৭৮৮,৭০১। ১৮৮১-৮২ সনে প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা হ'ল ৮২,৯১৬ এবং ছাত্রসংখ্যা ২,০৬১,৫৪১। কিন্তু গ্রামের পাঠশালার সংখ্যা কমেছে —পাঠশালার সংখ্যা ২৫,২২৩ এবং ছাত্রসংখ্যা ৩১৮,২০৩। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, শিক্ষাকর কেবলমাত্র গ্রাম-এলাকা থেকে আদায় করা হ'ত, শহর কিংবা শহরতলী এলাকায় এই জাতীয় কোনো কর না থাকায় গ্রাম থেকে সংগৃহীত শিক্ষাকর সমগ্র রাজ্যের প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ব্যয় করা হ'ত। ফলে গ্রামের টাকায় শহরে প্রাথমিক শিক্ষা-বিস্তার ঘটেছিল।[৪৬]

১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের স্টানলির ডেসপ্যাচের পশ্চাতে ছিল বৃটেনের ঘটনাবলী। এসময়ে সে-দেশের শিক্ষা-চিত্রও সুখকর নয়। ১৮৪০ সালে ইংলণ্ড ও ওয়েলসের জনসাধারণের অজ্ঞতা ছিল আতঙ্কজনক। লণ্ডন অথবা আমেরিকার নাম তাঁরা কখনো শোনেননি। অভ্যন্তরীণ দুটি বিরোধী স্বার্থের দ্বন্দ্বের জন্য তাঁদের শিক্ষিত করার প্রয়াসে বিঘ্ন ঘটেছিল। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত শিক্ষা-প্রশ্নে ধর্ম-স্বার্থ ও ভূমি-স্বার্থের সঙ্গে শিল্প-স্বার্থের বিরোধ তীব্র ছিল। হুইগ দলের শাসন-কালেই ইংলণ্ডে শিক্ষাবিস্তারের প্রয়াস সর্বপ্রথমে শুরু হয়। যে-সব শিশু আংশিক সময়ের জন্য কাজ করত, তারা যাতে দিনে অন্তত দু'ঘণ্টা স্কুলে পড়ে, ১৮৩৩ সালে সে-ব্যবস্থা গ্রহণ করা হ'ল; শিক্ষাকার্যে রত দু'টি প্রতিষ্ঠানকে সাহায্যের জন্য অর্থ বরাদ্দ হ'ল। এসময়ের শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রধানত চার্চের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিল। ১৮৬৮ সালে শ্রমিকশ্রেণীর ভোটে নির্বাচিত হয়ে উদারনৈতিক দলের নেতা উইলিয়ম এওয়ার্ট গ্ল্যাডস্টোন বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন। শাসনক্ষমতা হাতে নিয়ে তিনি বলেছিলেন, "এখন আমাদের প্রভুদের শিক্ষিত করতে হবে।" তিনি সংস্কারমূলক কাজের মধ্যে শিক্ষা-সংস্কারকে অগ্রাধিকার দিলেন। শিক্ষামন্ত্রী ডবলিউ. ই. ফর্সটার-এর উদ্যোগে ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে প্রাথমিক শিক্ষা আইন গৃহীত হয়। কিন্তু বহু সংখ্যক নতুন স্কুল তৈরি না হওয়া পর্যন্ত শিশুশিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা হয়নি। দশ বছর পরে ১৮৮০ সালে নতুন আইনের দ্বারা ১৩ বছর বয়সের ছেলেমেয়েদের স্কুলে যাওয়া বাধ্যতামূলক করা হ'ল। অভিভাবকদের বেতন দিয়ে ছেলেমেয়েদের পড়াতে হলেও ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের আইনে শিক্ষা অবৈতনিক ঘোষিত হ'ল।[৪৭]

১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে ভারতের গভর্ণর-জেনারেল বা বড়লাট নিযুক্ত হয়েছেন গ্ল্যাডস্টোনিয়ান লর্ড মেয়ো। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিরোধী তিনি। ইংলণ্ডে

থাকাকালে তিনি সমগ্র ভারতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথা প্রবর্তনের বিরোধিতা করেছেন। ১৮৬২ সালের জুলাই মাসে ভারত-সচিব স্যার চার্লস উড (যিনি ছিলেন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বোর্ড অব কণ্ট্রোলের সভাপতি) ঘোষণা করেছিলেন যে, বৃটিশ মন্ত্রিসভা সারাভারতের ভূস্বামীশ্রেণীর সঙ্গে ভূমি-রাজস্বের বিষয়ে চিরস্থায়ী চুক্তি করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। লর্ড মেয়ো এবং তাঁর সমমতাবলম্বী ব্যক্তিরা প্রবল আপত্তি জ্ঞাপন করায় এই সিদ্ধান্ত কার্যকরী হয়নি। স্বাভাবিকভাবে লর্ড মেয়ো ভারতবর্ষে তাঁর উদারনৈতিক চিন্তাধারাকে বাস্তবায়িত করার জন্য সচেষ্ট হয়েছেন এবং শিক্ষা-বিষয়ে ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে ঘোষণা করেছেন যে, উডের ডেসপ্যাচের প্রস্তাব-অনুসারে সরকার উচ্চশিক্ষার জন্য আর্থিক দায়িত্ব বহন করবেন না, প্রাথমিক শিক্ষা-বিস্তারে প্রয়াসী হবেন এবং মাতৃভাষা নিম্নতম স্তর থেকে উচ্চতম স্তর পর্যন্ত শিক্ষার বাহন হবে। মেয়োর ঘোষণায় উত্তেজিত-বিক্ষুব্ধ হয়েছেন ভূস্বামী ও অভিজাতশ্রেণী, উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্তশ্রেণী। এই বিক্ষোভের নেতৃত্ব দিয়েছেন বৃটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন বা ভারতবর্ষীয় সভা।

ভারতবর্ষীয় সভা রাজা-মহারাজা, জমিদার ও অভিজাতশ্রেণীর প্রতিষ্ঠান। 'রক্ষণশীল এবং প্রগতি পন্থী উভয় দলের নেতৃবৃন্দই এখানে সমবেত'[৪৮] হয়েছেন। প্রতিষ্ঠানটি গঠিত হয় ১৮৫১ সালের ২৯ অক্টোবর। সভ্য হওয়ার চাঁদা মাথাপিছু বার্ষিক পঞ্চাশ টাকা। সভাপতি —রাজা রাধাকান্ত দেব, সহ-সভাপতি —রাজা কালীকৃষ্ণ, সম্পাদক —দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সহ-সম্পাদক —রাজা দিগম্বর মিত্র ; সভ্যবৃন্দ হলেন রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ, রাজা সত্যচরণ ঘোষাল, হরকুমার ঠাকুর, রমানাথ ঠাকুর, দুর্গাচরণ দত্ত, জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, হরিমোহন সেন, আশুতোষ দেব, রামগোপাল ঘোষ।[৪৯]

১৮৫৩ সালে বৃটিশ-পার্লামেন্টে যখন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ভারত-শাসনের সনদ-দানের বিষয়টি উত্থাপিত হ'ল, তখন ভারতবর্ষীয় সভা কয়েক হাজার বিশিষ্ট ব্যক্তির স্বাক্ষর সম্বলিত একটি আবেদনপত্র ইংলণ্ডের সরকারের কাছে পাঠিয়েছিলেন। এই আবেদনপত্রে তাঁরা বিভিন্ন বিষয়ের সঙ্গে শিক্ষা-বিষয়েও নিজেদের অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন। সুতরাং লর্ড মেয়োর প্রস্তাব তাঁদের শ্রেণীস্বার্থে আঘাত করায় পূর্বের শিক্ষাকরের বিরুদ্ধাচরণের মতো এবারেও তাঁরা সংঘবদ্ধ প্রতিবাদে অগ্রসর হলেন। তাঁদের অসন্তোষ বিক্ষোভের প্রকাশ ঘটল সংবাদপত্রে ও জনসভায়। 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকা কয়েকটি সম্পাদকীয়তে (১২৭৭ বঙ্গাব্দের ১০ জ্যৈষ্ঠ, ১৭ জ্যৈষ্ঠ, ৩১ জ্যৈষ্ঠ, ১৪ আষাঢ়, ২৮ আষাঢ়,

৩ শ্রাবণ এবং ১২৭৮ বঙ্গাব্দের ১৫ ফাল্গুন) তীব্র ভাষায় মেয়োর শিক্ষা-প্রস্তাবকে আক্রমণ করেছেন। ঐ পত্রিকার কয়েকটি মন্তব্য এখানে উদ্ধৃত হ'ল :

(১) "প্রজারা এতকাল যে সকল স্বত্ব ভোগ করিয়া আসিতেছিলেন, ইঁহারা এক্ষণে সেই সকল স্বত্ব লোপের চেষ্টায় আছেন।"[৫০]

(২) "লার্ড মেয়ের গবর্ণমেণ্ট এই সকল লোককে শত্রুজ্ঞান করিয়া ইংরাজী শিক্ষা এককালে বন্ধ করিবার চেষ্টায় আছেন। লার্ড লরেন্সের উচ্চশিক্ষা বন্ধ করিবার সম্পূর্ণ ইচ্ছা ছিল। বর্ত্তমান গবর্ণর জেনেরলেরও এই মত।…দেশীয় ভাষা ভিন্ন অন্য ভাষায় শিক্ষা দেওয়া না হয়, তিনি এই প্রস্তাব করিয়াছেন।… আমাদিগকে পশুবৎ করিয়া রাখিয়া শাসন করা তাঁহাদিগের অভীষ্ট।…আমরা কি এই জঘন্য রাজনীতি দর্শন করিয়াও চুপ করিয়া থাকিব ?…অতএব আমরা প্রস্তাব করিতেছি প্রতি নগরে প্রতি গ্রামে এক এক সভা হইয়া প্রতিবাদ প্রেরিত হউক।"[৫১]

(৩) "লার্ড মেয় যে গবর্ণমেণ্টের শীর্ষস্থানে ধ্রুব নক্ষত্রের ন্যায় শোভা পাইতেছেন, সেই গবর্ণমেণ্টের মত এই যে দেশীয় ভাষায় বিদ্যাশিক্ষা দিয়া এদেশীয়দিগকে উচ্চতম শিক্ষাগুণ সম্পন্ন করিয়া তুলিবেন। এই মতটাকে যে কিরূপে ভ্রমাত্মক বলিয়া আমরা আদর করিব তাহা স্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। দেশীয় ভাষা রাজভাষা নয়। দেশীয় ভাষায় রাজকার্য্য নির্ব্বাহ হয় না। সুতরাং ইহাতে অর্থাগম হইবার সম্ভাবনা অল্প।…দেশীয় ভাষায় এদেশীয়দিগকে পণ্ডিত করিয়া তুলিবার মত আর মূর্খ অথবা কিঞ্চিদজ্ঞ করিয়া রাখিবার মত উভয় তুল্য। কিঞ্চিদজ্ঞতা অপেক্ষা মূর্খতা বরং ভাল।"[৫২]

(৪) "আমরা চতুর্দ্দিক হইতে সমাচার পাইতেছি, স্থানে স্থানে গবর্ণমেণ্টের উল্লিখিত গর্হিত রাজনীতির প্রতিবাদার্থ সভা হইতেছে।…সংবাদ আসিয়াছে লার্ড আর্গাইল (ভারত-সচিব) চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ভঙ্গ করিয়া শিক্ষার নামে ভূমির উপরে কর করিবার আজ্ঞা দিয়াছেন। কেবল জমিদার নহেন, যে ব্যক্তির কোন প্রকারে ভূমির সহিত সংশ্রব আছে তাঁহাকে 'শিক্ষাকর' দিয়া বিলক্ষণ শিক্ষা পাইতে হইবে।…পৃথিবীর কোন শাসনকর্ত্তা উদারপ্রণালী স্বেচ্ছাপূর্ব্বক স্থাপন করেন নাই। সর্ব্বত্রই প্রজাগণ শাসনকর্ত্তার নিকট হইতে বলপূর্ব্বক স্বত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। আমাদিগের দেশেও সেই স্বাভাবিক নিয়মানুসারে কাজ করিবার সময় আসিয়াছে।"[৫৩]

(৫) ভারতবর্ষীয় সভার উদ্যোগে ১৮৭০ সালের ২ জুলাই অনুষ্ঠিত টাউন হলের জনসভায় বিভিন্ন বক্তা :

(ক) রাজা নরেন্দ্রকৃষ্ণ বাহাদুর —"উচ্চতর ইংরাজি শিক্ষা বন্ধ করিয়া দেওয়া বিধেয় নহে। কেবল বাংলায় শিক্ষা দেওয়া সাধ্যায়ত্ত নহে। কারণ বঙ্গভাষার প্রয়োজনানুরূপ গ্রন্থ নাই। আর গবর্ণমেণ্ট যে শিক্ষা দিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন, সে শিক্ষা শিক্ষাই নহে। সামান্য লিখন পঠন ও অঙ্ক শিক্ষায় কি ইষ্টলাভ হইবে, ইংরাজি শিক্ষাদানে দেশবাসী ও গবর্ণমেণ্ট উভয়েরই মঙ্গল। এদেশীয়েরা সুশিক্ষিত হইলে শাসনকার্য্যে ব্যয় অনেক অল্প হইবে। যে টাকায় এদেশীয় কর্ম্মচারীগণ কাজ করেন, সেই প্রকার গুণ বিশিষ্ট ইউরোপীয় কর্ম্মচারী আনিতে অনেক ব্যয় পড়িবে।"

(খ) বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র —"জাতীয় ভাষা উত্তম বটে, কিন্তু ইউরোপীয় ভাষার দ্বারা অলঙ্কৃত করিবার পূর্ব্বে ইহাতে শিক্ষা হইতে পারে না। জাতীয় ভাষা যাহা হইবে তৎপ্রতি আসক্ত থাকা যথার্থ দেশহিতৈষির কাজ নহে। যাহা যে ভাষায় ভাল তাহা গ্রহণ করাই যথার্থ কর্ত্তব্যকর্ম্ম।"

(গ) বাবু কিশোরীচাঁদ মিত্র —"ইংরাজি দ্বারা বিস্তর উপকার হইতেছে। বর্ত্তমান রাজনীতি অনুসারে কাজ হইলে অনিষ্ট হইবে।"

(ঘ) বাবু বিপ্রদাস বন্দ্যোপাধ্যায় —"বঙ্গদেশে ৪০ লক্ষ বালক আছে। ইহাদিগের মধ্যে ১,৬১৬৭৪ জন মাত্র শিক্ষা করে। এই সংখ্যার মধ্যে ৪৫৬৮ জন বাঙ্গলা বিদ্যালয়ে আছে, দেশে ইংরাজি শিক্ষা বেশি হয় নাই, ইহাই তাহার প্রমাণ। এখানে ৭ লক্ষ মাত্র ব্যয় হয়। নিম্ন শ্রেণীকে শিক্ষা দেওয়া উচিত, কিন্তু কদাচ উচ্চতর শিক্ষা বন্ধ করা উচিত নহে।"[৫৪]

ভারতবর্ষীয় সভার নেতৃত্বে ইংরেজিভাষায় শিক্ষাদানের দাবিতে যে আন্দোলন হয়েছিল, তার বর্ণনা দিয়েছেন যোগেশচন্দ্র বাগল —"এই ১৮৬৯ সনেই ভারত সরকার বিলাতি কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ক্রমে ঘোষণা করলেন যে, এদেশে উচ্চ শিক্ষার জন্য আয়োজন প্রচুর। আর এর দ্বারা উপকৃত হন সমাজের উচ্চতর সম্পন্ন শ্রেণীর লোকেরাই বেশী করে। উচ্চ শিক্ষার খাতে ব্যয় কমিয়ে সাধারণ লোকের প্রাথমিক শিক্ষার আয়োজন করা দরকার। উচ্চ শিক্ষার জন্য সরকার যে ব্যয় করেন তার একটি বিশেষ অংশ এইরূপে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য খরচ হতে পারে। উচ্চ শিক্ষার এতাদৃশ সংকোচ সাধনের প্রস্তাবে ভারতবর্ষের শিক্ষিত সম্প্রদায় সবিশেষ বিচলিত হয়ে উঠলেন। কলকাতা তখন সমগ্র ভারতের রাজধানী। কাজেই এখান থেকেই এই অহেতুক শিক্ষা সংকোচের বিরুদ্ধে আন্দোলন

উপস্থিত হ'ল এবং সত্বর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল। উচ্চ শিক্ষার খাতে ব্যয় প্রয়োজনের তুলনায় যে আদৌ যথেষ্ট নয় ভারতবর্ষীয় সভা তার যাথার্থ্য প্রতিপন্ন করে সরকারকে লিখলেন এবং নিজেদের সপক্ষে যে জনমত প্রবল তা প্রমাণের উদ্দেশ্যেও বিভিন্ন স্থানে জনসভার আয়োজন করলেন। অল্পকাল মধ্যেই বিভিন্ন অঞ্চলে সরকারী ঘোষণার বিরুদ্ধে অন্তত ৪০টি জনসভা হয়। মফস্বলে—জেলা শহরে, যেমন, যশোহর, কৃষ্ণনগর, বহরমপুর, ঢাকা, রাজসাহী প্রভৃতিতে প্রতিবাদ সভা হয়েছিল। ভারতবর্ষীয় সভার নেতৃবৃন্দ এতাদৃশ জনমতকে সংহত ও সুপথে চালনা করার উদ্দেশ্যে কলকাতায় এক প্রতিনিধিমূলক সমাবেশের আয়োজন করেন ১৮৭০ সনের ২ জুলাই। সভায় ১৭টি জেলা থেকে প্রতিনিধি এসে যোগ দিলেন। সমাবেশে ভারতবর্ষীয় সভার সভাপতি রমানাথ ঠাকুর পৌরোহিত্য করেন। সম্পাদক কৃষ্ণদাস পাল সরকারী প্রস্তাবের প্রতিকূলে এবং ইংরেজী শিক্ষার সপক্ষে ইতিমধ্যে সর্বত্র যে জনমত সুস্পষ্টরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে তা সবিস্তারে বলেন। উক্ত প্রস্তাবে সমাজের বিভিন্ন স্তরে কিরূপ প্রতিক্রিয়া হয় তার প্রমাণস্বরূপ একটি কথা এখানে উল্লেখ করি। এই সভায় শুধু রাজনীতিবিদগণই নহেন, শিক্ষাবিদ, সাহিত্যিক, সমাজসেবী, শিল্পব্যবসায়ী, ব্যবহারজীবী, চিকিৎসাশাস্ত্রজ্ঞ প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর নেতৃবৃন্দ সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন, এবং কেহ কেহ সারগর্ভ বক্তৃতা দেন। সভায় সর্বসাকুল্যে চারটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। এর উপর যাঁরা বক্তৃতা করেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন—মহারাজা নরেন্দ্রকৃষ্ণ, জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার, চন্দ্রনাথ বসু, কালীমোহন দাস ও কিশোরীচাঁদ মিত্র।

"প্রস্তাবগুলিতে এই মর্মে বলা হল :—১. লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক ইংরেজীর মাধ্যমে শিক্ষাদান ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন এবং পরবর্তী বড়লাটগণ এটা বরাবর চালু রাখেন। এই ব্যবস্থা অব্যাহত রাখা একান্ত প্রয়োজন। কাজেই স্কুল কলেজ সমূহে সরকারী সাহায্যের সংকোচ সাধন জাতীয় দুর্দৈব বলে সভা মনে করেন। ২. ইংরেজীর পক্ষপাতী হয়েও সভা অঙ্গীকার করেন যে, দেশীয় ভাষা সমূহের উন্নতিসাধন একান্ত আবশ্যক। পাশ্চাত্য সাহিত্য ও বিজ্ঞান অনুশীলনের ফলে দেশীয় ভাষার যথাযোগ্য উন্নতি সম্ভব। ৩. ইংরেজী শিক্ষার প্রসার হেতু গবর্ণমেণ্টের অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক সাশ্রয় ঘটবে। এর ফলে শিল্প বাণিজ্যেরও উন্নতি হবে এবং বিধিবদ্ধ আইন সমূহ শিক্ষিত সাধারণের বোধগম্য হবে। শাসক ও শাসিতেরা ভাব বিনিময়ের দরুন পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন হবেন। ব্রিটিশ অধিকারের উদ্দেশ্য সাফল্য মণ্ডিত হবে।

৪. সভ্য দেশ সমূহের উচ্চ শিক্ষায়তনের ব্যয় ছাত্র বেতন দ্বারা সঙ্কুলান হয় না; সরকার এর জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করে থাকেন। ভারতে সরকার পক্ষে এরকম ব্যয় বরাদ্দ করা আরও বেশী প্রয়োজন এই কারণে যে, এখানকার অধিবাসীরা অন্যান্য দেশের তুলনায় দরিদ্র এবং শিক্ষাদানের নিমিত্ত অধিক বেতনে ইউরোপীয় অধ্যাপক নিযুক্ত রাখতে হয়।

"এই সকল প্রস্তাবের ভিত্তিতে রচিত স্মারকলিপিটি সাধারণ সভা অনুমোদন করেন। পরে উহা ভারতবর্ষীয় সভার পক্ষ থেকে ভারত সচিবের নিকট পাঠিয়ে দেওয়া হয়। বিলাতের ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষের মধ্যে বিষয়টি নিয়ে বেশ কিছুকাল আলোচনা চলে এবং শেষ পর্যন্ত ভারত সরকার কার্যত ইংরেজী শিক্ষা সঙ্কোচনের প্রস্তাব প্রত্যাহার করেন।"[৫৫]

ইংরেজিভাষায় শিক্ষার সপক্ষে যখন প্রবল আন্দোলন চলছে, তখন মাতৃভাষার সমর্থনে ক্ষীণ কণ্ঠস্বর শোনা যায় সাপ্তাহিক 'সংবাদ' পত্রিকায়। এই পত্রিকা লিখেছেন, "নিম্ন শ্রেণী বিদ্যা শিক্ষা করিলে জমিদারেরা আর অত্যাচার করিতে পারিবেন না। তাহারা আপনাদিগের বিষয় আপনা বুঝিয়া লইতে পারিবে।... সুশিক্ষিত ভদ্রলোকদিগের নিকটে জমিদারেরা এদিক ওদিক করিতে পারেন না।"[৫৬]

এর প্রতিবাদে 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকা জমিদারদের পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করে লিখেছেন, "নিম্নশ্রেণীর দুই চারিজন কিছু কিছু লেখাপড়া শিখিয়াছে, তাহারা কবচ প্রভৃতি জাল করিয়া জমিদারদিগের সঙ্গে সময়ে সময়ে নানাপ্রকার বিবাদ উপস্থিত করিয়া থাকে। গবর্ণমেণ্ট নিম্নশ্রেণীর যে শিক্ষাদান চেষ্টা পাইতেছেন, তাহা যদি উদাররূপে সম্পন্ন না হয়, ঐরূপ খোট আখরিয়ার সংখ্যা বৃদ্ধি হইবে। তখন জমিদারদিগের সহিত নিত্য বিরোধ উপস্থিত হইয়া গবর্ণমেণ্টকে বিব্রত হইতে হইবে কিনা?"[৫৭]

এই আন্দোলন ছিল প্রকৃতপক্ষে বৃটিশ-শিল্পস্বার্থের সঙ্গে দেশীয় ভূমিস্বার্থের সংঘর্ষ। এসময়ে ভারতে বৃটিশ-পুঁজি নিয়োগে যে-শিল্পের বিকাশ ঘটছিল, তার জন্য প্রয়োজন ছিল প্রাথমিক শিক্ষা। তাই তাঁরা উচ্চশিক্ষার তুলনায় প্রাথমিক শিক্ষার ওপরে বেশি জোর দিতে চেয়েছিলেন। এদেশে প্রাথমিক স্তর থেকে উচ্চতর স্তর পর্যন্ত সামগ্রিক শিক্ষা-বিস্তারের কোনো মহৎ অভিপ্রায় তাঁদের ছিল না। তাই প্রাথমিক শিক্ষার দাবি উত্থাপিত হলে তাঁরা উচ্চশিক্ষার বিকল্পরূপে প্রাথমিক শিক্ষাকে চিত্রিত করেছেন। তাতে ভূমি-নির্ভর শিক্ষিত সম্প্রদায় আতঙ্কিত হয়েছেন; 'কারণ যারা ধনী তারা ইংরাজী স্কুল চায়,

প্রাথমিক পাঠশালার প্রয়োজন বোধ করে না।'[৫৮] ফলে বৃটিশ-সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থরক্ষক এদেশীয় ভূস্বামীশ্রেণীর সঙ্গে বিরোধে বৃটিশ-শিল্পপতিদের পিছু হঠতে হ'ল —মাতৃভাষা ও প্রাথমিক শিক্ষা অবহেলিত হয়ে রইল।

কিন্তু যে-ইংরেজি-শিক্ষার জয়গানে ভূস্বামীশ্রেণী মুখর হয়ে উঠেছিলেন, তাতে 'শিক্ষিতদিগের সহিত অশিক্ষিতের মনোমিল থাকে না; শিক্ষিতগণ যেন একটি নূতন জাতি হইয়া দাঁড়ান।'[৫৯] এই 'নূতন জাতি'র সঙ্গে দেশ ও সমাজের কোনো সম্পর্ক থাকে না। জনস্বার্থের বিনিময়ে তাঁদের গগনচুম্বী প্রাসাদ গড়ে ওঠে। এ 'দেশে শিক্ষা যে করে শিক্ষার ফল তারই —দুধু-ভাতু খায় সেই।'[৬০] অর্থাৎ লেখাপড়া করে যে, গাড়ি-ঘোড়া চড়ে সে। দেশের বৃহত্তম গ্রামীণ জনসমাজকে শিক্ষার আঙ্গিনা থেকে দূরে সরিয়ে রেখে কেবলমাত্র গাড়ি-ঘোড়ায় চড়ার জন্য শহরের একদল পরশ্রমজীবী মানুষের আত্যন্তিক প্রয়াস লক্ষ্য করে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "শহরবাসী একদল মানুষ এই সুযোগে শিক্ষা পেলে, মান পেলে, অর্থ পেলে, তারাই হ'ল এনলাইটেন্‌ড্‌, আলোকিত। সেই আলোর পিছনে বাকি দেশটাতে লাগল পূর্ণ গ্রহণ। ইস্কুলের বেঞ্চিতে বসে যাঁরা ইংরেজি পড়া মুখস্থ করলেন শিক্ষাদীপ্ত দৃষ্টির অন্ধতায় তাঁরা দেশ বলতে বুঝলেন শিক্ষিত সমাজ, ময়ূর বলতে বুঝলেন তার পেখমটা, হাতি বলতে তার গজদন্ত।"[৬১]

যাদের অসহায় আত্মদানের বিনিময়ে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সম্পদ-বৃদ্ধি — ঐশ্বর্যের স্ফীতি, অবৈতনিক-আবশ্যিক শিক্ষার দ্বারা তাঁদেরকে কেবলমাত্র সাক্ষর করার পথে প্রধান বাধা এসেছিল এই সমস্ত 'গণ্যমান্য লোকের কাছ থেকেই।' প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার নির্মমতা উপলব্ধি করে গভীর বেদনাহত চিত্তে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "নীচের তলাটা উপরের তলাকে নিঃস্বার্থ ধৈর্যে শিরোধার্য করে নিয়েছে; তার ভার বহন করেছে, কিন্তু সুযোগ গ্রহণ করেনি, দাম জুগিয়েছে, মাল আদায় করেনি।"[৬২]

তাই পরান্নভোজী ইংরেজি-নকলনবীশদের স্ফীতোদর লক্ষ্য করে বঙ্কিমচন্দ্র ক্ষুরধার লেখনী দিয়ে তাঁদের আঘাত করেছেন। তিনি বলেছেন, "শিক্ষিত, অশিক্ষিতের হৃদয় বুঝে না। শিক্ষিত, অশিক্ষিতের প্রতি দৃষ্টিপাত করে না। মরুক রামা লাঙ্গল চযে, আমার ফাউলকারি সুসিদ্ধ হইলেই হইল। রামা কিসে দিনযাপন করে, কি ভাবে, তার কি অসুখ, তার কি সুখ, তাহা নদের ফটিকচাঁদ তিলার্দ্ধ মনে স্থান দেন না। বিলাতে কানা ফসেট্ সাহেব, এদেশে সার অস্‌লি ইডেন, ইঁহারা তাঁহার বক্তৃতা পড়িয়া কি বলিবেন, নদের ফটিকচাঁদের সেই ভাবনা। রামা চুলোয় যাক্, তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না।"[৬৩]

ভূস্বামীশ্রেণী যখন 'ইংরেজি শিক্ষাদানে দেশবাসীর মঙ্গল' বলে ইংরেজি ভাষায় শিক্ষার দাবিতে আন্দোলন করছেন, এবং 'শ্রমজীবী ও কৃষকেরা লেখা-পড়া শিক্ষা করুক, এ বিষয়ে কাহার বিপ্রতিপত্তি নাই'[৬৪] বলে ঘোষণা করেছেন, তখন 'দেশবাসীর' বৃহত্তম অংশ হাসিম শেখ, রামা কৈবর্ত আর পরাণ মণ্ডলদের প্রতি তাঁদের মনোভাব-আচরণ কিরূপ ছিল? সমকালীন ইতিহাস বলে, "এখন যেখানেই প্রাচীন ভূস্বামীবংশের স্থানে সন্তজাত জমীদার উত্থিত হইয়াছে, প্রায় সেখানেই অত্যাচার। তাঁহাদিগের মধ্যে অধিকাংশ লোক আয়র্লণ্ডের জমীদারগণের ঘৃণিত উপায় অবলম্বন করিয়া প্রজাপীড়ন পূর্ব্বক জমিদারীর আয় বৃদ্ধি করেন। ...তাঁহাদিগের আয় বৃদ্ধি করার উপায় জমা বৃদ্ধি করা এবং যে প্রজা বৃদ্ধি দিতে অস্বীকার করে, তাহাকে উচ্ছেদ করা।"[৬৫]

উনিশ শতকের ভূমি-সংশ্লিষ্ট সারস্বত-সমাজ ভূম্যধিকারীশ্রেণীর অত্যাচার উৎপীড়ন সম্পর্কে নীরব থাকলেও ইতিহাস নীরব নয়, মুখর। ইতিহাসকে সাক্ষী মানলে জানা যায়, "পূর্ব্বে এই বঙ্গে জমীদার প্রজায় কি মধুর সম্বন্ধ ছিল, তাহা জানি না, কিন্তু গত বিশ বর্ষে বঙ্গের বহু গ্রামের যে চিত্র দেখিয়া আসিতেছি, তাহাতে বলিতে সঙ্কোচ বা ভয় হয় না যে জমীদার এবং প্রজায় এখন যেন খাদ্য খাদক সম্বন্ধ।"[৬৬] জমিদারের খাদ্য-রূপে যাঁরা জীবনাহুতি দিয়েছেন, তাঁদের সম্বন্ধে তৎকালে লেখা হয়েছে, "যাহারা বাঁচিয়া আছে তাহাদিগের মধ্যে লাখ লাখ লোক আধপেটা খাইয়া আধমরা হইয়া আছে। গরীব কৃষকের ত কথাই নাই। দু'বেলা অন্ন তাহাদের ত কখন জুটে না, চোখের জল তাহাদিগের কখন শুকায় না, পেটের জ্বালায় তাহারা নিয়ত জ্বলিতেছে।... মহাজনের দেনা ও জমিদারের খাজনা না দিতে পারিলে চাষার গায়ের মাংস লইয়া টানাটানি হয়। মাথার ঘাম পায় ফেলিয়া, গায়ের রক্ত জল করিয়া, শস্য উৎপাদন করিল কৃষক। শস্য বা তাহার মূল্য উঠিল মহাজন জমিদারের ঘরে।"[৬৭]

পূর্ব বাংলা যখন দুর্ভিক্ষগ্রস্ত, তখন জমিদারেরা প্রজাদের কাছ থেকে নির্মম ভাবে খাজনা আদায় করেছেন; দয়া-মায়া, কারুণ্যের কোনো পরিচয় তাঁদের আচরণে দেখা দেয়নি। তৎকালীন সাময়িক পত্রের পৃষ্ঠা ওল্টালেই দেখা যায়, "এই দুঃখ-দুর্দ্দিনেও জমীদারেরাও কোমর বাঁধিয়া খাজনা আদায় করিতেছেন —এ বিবরণ অনেক জ্ঞাত হইতেছি। প্রজার অসংখ্য পিতামাতা আজ রাক্ষসের করাল মূর্তি ধারণ করিয়াছেন,—রক্ত শোষণ করিয়া, কত প্রজার ভিটা, মাটী, ঘটী, বাটী বিক্রয় করিয়াও খাজনা আদায় করিতেছেন। মহারাজ যতীন্দ্রমোহনই হউন বা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথই হউন, কাহার কথা বলিতে চাও? যাহা প্রত্যক্ষ

ঘটিতেছে, অনুসন্ধান করিয়া এস, বুঝিতে পারিবে, তাহা মর্ম্মপীড়ক, তাহা দুঃখদায়ক, তাহা হৃদয়বিদারক। কিন্তু সে সকল কথা বলে কে? **এ দেশের পত্রিকা সকল দিন দিন যেন ধনীদিগের পোষ্যপুত্র স্বরূপ হইতেছেন।** তাঁহাদের অত্যাচার, অমানুষী পশুতুল্য ব্যবহার, তাঁহাদের জীবন-সুলভ অকীর্ত্তিরাশি ঘোষণা করিতে কোন পত্রিকা নাই।"[৬৮] (মোটা হরফ লেখকের)। এই মন্তব্য ১৮৯৭ সালের। এবং তা স্মরণে রাখলে ভাষা-সংগ্রামে 'সোমপ্রকাশ' ইত্যাদি সমকালীন পত্রিকাগুলির ভূমিকা সম্পর্কে বুঝতে কোনো কষ্ট হয় না।

এই ভূস্বামী-দাসেরা রায়ত-কৃষকদের শিক্ষাদানের প্রতি কতখানি আন্তরিক ছিলেন, স্বভাবকবি গোবিন্দ দাস 'মগের মুলুক' কাব্যে তা চিত্রিত করেছেন। সেকালের খ্যাতনামা কবি ও সাহিত্যিক কালীপ্রসন্ন সিংহ ভাওয়ালের রাজার অনুগ্রহ-লাভের জন্য ঐ অঞ্চলের স্কুল ভেঙে দেওয়ায় স্বভাবকবি লিখেছেন,

"স্বর্গপুরে ছিল আগে উচ্চ বিদ্যালয়,
থেতে পেত পরতে পেত ছাত্র সমুদয়।
হারামজাদা অঙ্গারক সে স্বর্গপুরে গিয়া,
মূলশুদ্ধ বিদ্যালয়টি দিচ্ছে উঠাইয়া!
নাইক এখন পাঠশালাটি ক খ শিখতে ঠাঁই,
ছেলে পিলের তরে কাঁদে দেশের লোকে তাই!
লেখা পড়া শিখলে লোকের চোখ ফুটিয়ে যাবে,
অবিচারের অত্যাচারের দোষ ধর্ত্তে চাবে।
পারবে নাকো করিবারে যখন খুশী যা,
জোর জুলুমে চাঁদা মাথট আদায় হবে না।...
হবে নাকো আদায় এতে নানান আবুয়াব,
পাবলিক ওয়ার্ক রোড্ সেসে দেড়া দুনা লাভ।
হাতী দিয়ে ঘর ভাঙিয়ে ঘর জ্বালিয়ে দেওয়া,
জোর জুলুমে পরের তালুক দখল করে নেওয়া!
ধোপা নাপিত বন্ধ করা সভা সমাজ আর,
কয়েদ করে জরিমানা আদায় হবে ভার!
কঠিন হবে স্বেচ্ছাচার ইচ্ছা পূরাইতে,
প্রজার ঘরে নিত্য নূতন বৌ ঝি কেড়ে নিতে!

বুঝতে পেলে আপন স্বত্ব আপন সাহস বল,
ভেঙ্গে দিবে বদমায়েসী বঞ্চনা কৌশল!
ফুঁয়ে ছিঁড়ে যাবে তখন কোথায় কণিক সূতা,
পোড়ামুখে মারবে উহার পটাস্ পটাস জুতা!
এই ভয়ে অঙ্গারক সে স্কুল উঠায়ে দিছে,
সঙ্গে সঙ্গে আরেক ভয় দূর হয়ে গেছে।"[৬৯]

এ চিত্র কেবলমাত্র ভাওয়ালের নয়, সমগ্র বাংলাদেশের। মফস্বল শহরে স্কুল প্রতিষ্ঠিত হলেও গ্রামের ভেতরে জমিদারদের বিরুদ্ধাচরণের জন্য স্কুল স্থাপন করা সহজ ছিল না।

ভূমি-নির্ভর বিদ্বৎজনেরা ভূস্বামী শ্রেণীর শোষণ-পীড়নের প্রতিবাদ না করলেও সমগ্র বাংলাদেশ হয়ে উঠেছিল অগ্নিগর্ভ —একের বেদনা অন্যের বুকে সঞ্চারিত হয়ে, একের অভিজ্ঞতার দ্বারা অন্যে সমৃদ্ধ হয়ে রায়ত-কৃষকেরা ক্রমেই সুসংগঠিত সুসংহত হয়েছেন এবং ১৮৭২-৭৩ খৃষ্টাব্দে তাঁদের সংগঠিত বিদ্রোহের আত্মপ্রকাশ ঘটল পাবনা জেলায়। পাবনা জেলার অন্তর্গত সিরাজগঞ্জের চাষীরা স্থানীয়ভাবে সর্বপ্রথম কৃষক-সমিতি গঠন করেন এবং সমিতির নেতৃত্বে সংগঠিত কৃষকেরা বে-আইনি খাজনা বৃদ্ধির বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করলেও তাঁরা শীঘ্রই আওয়াজ তুললেন: জমিদারী প্রথার অবসান চাই। এই আন্দোলনের পরিসমাপ্তি ঘটল 'Laws relating to Landlords and Tenants Act, VII of 1859' নামক আইন পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এবং ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে প্রবর্তিত হ'ল 'বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন' (Bengal Tenancy Act, Act VIII of 1885)।[৭০] শাসকগোষ্ঠীও এই বিদ্রোহের গুরুত্ব স্বীকার করে লিখেছেন, "পাবনা জেলার ১৮৭২-৭৩ খৃষ্টাব্দের কৃষক-বিদ্রোহ ('Riots') একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। কারণ, ইহারই পরিণতিস্বরূপ কৃষিভূমির ওপর প্রজার অধিকার প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে পূর্ণ আলোচনা আরম্ভ হইয়াছিল এবং সেই আলোচনারই চূড়ান্ত ফল হিসাবে বিধিবদ্ধ হইয়াছিল 'প্রজাবৃন্দের সনদ' বলিয়া কথিত ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন"[৭১]

কেবলমাত্র বাংলাদেশে নয়, এসময়ে সমগ্র ভারতবর্ষে শ্রমজীবী-কৃষিজীবী-শ্রেণী বিক্ষোভে ধর্মঘটে সামিল হয়েছেন। '১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে নাগপুরের শিল্পকেন্দ্রে ভারতের প্রথম শ্রমিক ধর্মঘট, ১৮৮২ হইতে ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে বোম্বাই, মাদ্রাজ ও বঙ্গদেশে কয়েকটি বৃহৎ শ্রমিক ধর্মঘট এবং তৎসহ ১৮৬০ হইতে ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কয়েকটি সফল কৃষক-বিদ্রোহ, ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে সমগ্র

দাক্ষিণাত্যব্যাপী কৃষক-বিদ্রোহ এবং মহারাষ্ট্র, অযোধ্যা ও পাঞ্জাবের ব্যাপক কৃষক-অভ্যুত্থান ভারতের সমগ্র জনসাধারণের সম্মুখে সংগ্রামের এক নূতন দৃষ্টান্ত স্থাপন করে।"[৭২]

উৎপীড়িতদের বিদ্রোহ-সংগ্রাম স্বাভাবিক ভাবেই দেশীয় শোষক-উৎপীড়কদের ভীত-আতঙ্কিত করে তুলেছিল। সেজন্য তাঁরা জনশিক্ষার অত্যন্ত বিরোধী ছিলেন; কারণ 'লেখাপড়া শিখলে লোকের চোখ ফুটিয়ে যাবে, অবিচারের অত্যাচারের দোষ ধর্ত্তে চাবে।' তাই তাঁরা বাংলার ছোটলাট স্যার জর্জ ক্যাম্বেলের শিক্ষানীতিকে সমর্থন করেছিলেন। কারণ তিনিও গ্রামীণ মানুষদের উচ্চমানের প্রাথমিক শিক্ষাদানের বিরোধী ছিলেন। 'বেশি শিক্ষা পেলে গ্রামের লোকেরা পিতৃকর্ম ছেড়ে দেবে বলে দোকানদার ও তালুকদার, মোড়ল, ছুতোর, তাঁতি, কামার, মাঝি, জেলে প্রভৃতি সাধারণ লোকের স্বার্থ রক্ষার উপযোগী সামান্য লেখাপড়ার চেয়ে উচ্চমানের শিক্ষার দরকার নেই বলে তিনি ঘোষণা করেছিলেন।'[৭৩]

সেকারণে বোম্বাই ও মাদ্রাজে যখন নতুন প্রাথমিক স্কুল স্থাপিত হচ্ছিল, তখন বাংলাদেশে পাঠশালাগুলিকে নিয়ে প্রাথমিক শিক্ষা-ব্যবস্থা গড়ে ওঠে এবং সেখানে নিম্নমানের শিক্ষা দেওয়া হয়। '১৮৭৬-৭৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত যে-সমস্ত পাঠশালা বিভাগীয় ব্যবস্থার আওতায় এসেছিল, ১৮৮১-৮২ খৃষ্টাব্দে তার অর্ধেকের বেশি পূর্ণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পরিণত হয়েছিল। এই নিয়মে সর্বপ্রথম দেশীয় পাঠশালার উদ্যোগকর্তাদের মধ্যে সরকারি ব্যবস্থার অঙ্গীভূত হবার ইচ্ছার উদ্রেক হয়, কিন্তু সরকার ওই বর্ধিত ব্যয়ের সংস্থান করতে পারলেন না।'[৭৪] অথচ এসময়ে উচ্চ শিক্ষার বিস্তার ঘটেছে, সরকারি স্কুল-কলেজের সংখ্যা বেড়েছে। প্রাথমিক শিক্ষার তুলনায় উচ্চশিক্ষার ব্যয় বহুগুণ বৃদ্ধি হয়েছে। ১৮৬২ সালের ১৪ মে-র ডেসপ্যাচের নির্দেশ অনুসৃত হয়েছে। এই নির্দেশে[৭৫] বলা হয়েছে, সরকারি স্কুলের দায়িত্ব ভার পরিত্যাগের সময়ে 'স্থানীয় অবস্থার দিকে অবশ্যই দৃষ্টি দিতে হবে।' এবং 'যেখানে স্থানীয় অধিবাসীরা সরকারি স্কুল রাখার পক্ষে আন্তরিক ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন কিংবা বেসরকারি স্কুলে তাঁদের শিশুদের পাঠাতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেছেন, সেখানে সরকারি স্কুল বন্ধ করার বিষয়ে সরকার একান্তভাবে অনাগ্রহী।' সুতরাং স্কুল-কলেজের দায়িত্ব-ভার পরিত্যাগ করা তো দূরের কথা, তাঁরা নতুন করে উচ্চ শিক্ষার আরো দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন এবং নতুন কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ১৮৫৭ সাল থেকে ১৮৮২ সাল পর্যন্ত উচ্চশিক্ষা-প্রসারের তথ্য পরের পৃষ্ঠার সারণী[৭৬]-তে পাওয়া যাবে :

প্রদেশ			১৮৫৭ খৃঃ. কলেজের সংখ্যা	১৮৮২ খৃঃ কলেজের সংখ্যা
বাংলা	...	...	১৫	২৭
বোম্বাই	...	...	৩	৬
উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ		...	৫	১১
মাদ্রাজ	...	...	৪	২৫
পাঞ্জাব	...	...		২
মধ্যপ্রদেশ	...	...	...	১
মোট		...	২৭	৭২

সুতরাং বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষার পরীক্ষার্থী ও উত্তীর্ণদের সংখ্যাও অনুরূপভাবে বেড়েছে। নিম্নলিখিত সারণী[৭৭] তারই পরিচয় বহন করছে :

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা	পরীক্ষার্থী-সংখ্যা		উত্তীর্ণ-সংখ্যা	পরীক্ষার্থী-সংখ্যা	উত্তীর্ণ সংখ্যা
এণ্ট্রান্স	১৮৫৭ খৃঃ.			১৮৮২ খৃঃ.	
	২৪৪	...	১৬২	৩১১১	১,৪৫৮
এফ. এ.	১৮৬১ খৃঃ.			১৮৮২ খৃঃ.	
	১৬৩	...	৯৪	১৩০০	৪৪৬
বি. এ.	১৮৫৮ খৃঃ.			১৮৮২ খৃঃ.	
	১৩	...	২	৩৫৮	১০৫
এম. এ.	১৮৬১ খৃঃ.			১৮৮২ খৃঃ.	
	১	...	×	৭৯	৩২

১৮৬৯ সালের ভাষা-সংগ্রামে এদেশের ভূস্বামীশ্রেণীর কাছে বৃটিশ শিল্পপতিরা নতি স্বীকার করলেও মিশনারিরা মাতৃভাষায় জনশিক্ষার দাবি পরিত্যাগ করেননি। সরকার ঘোষিত নীতি অনুসরণ না করায় জনশিক্ষার প্রসার ঘটছিল না। এ অবস্থায় মিশনারিদের মধ্যে কেউ কেউ ইংলণ্ডে গিয়ে ভারতে প্রাথমিক শিক্ষা ও অন্যান্য বিষয়ে প্রচার করেছেন এবং দাবি আদায়ের জন্য তাঁরা 'জেনারেল কাউন্সিল অব এডুকেশন ইন ইণ্ডিয়া' প্রতিষ্ঠা করেছেন। ভারতবর্ষের কৃষক-বিদ্রোহ ও ইংলণ্ডে ১৮৮০ সালের প্রাথমিক শিক্ষা-আইনের দ্বারা সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা হওয়ায় ভারতে প্রাথমিক শিক্ষা-বিস্তারের সমস্যাটিও গুরুত্ব অর্জন করে এবং মিশনারিদের চাপে ভারত-সরকার ইংলণ্ডের নির্দেশে ১৮৮২ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি কুড়ি জন সদস্য নিয়ে ভারতীয় শিক্ষা কমিশন গঠন করেছেন। এসময়ে ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন গ্ল্যাডস্টোন এবং ভারতের গভর্ণর-জেনারেল ছিলেন গ্ল্যাডস্টোনিয়ান লর্ড রিপন।

ভারতীয় শিক্ষা কমিশনের সভাপতি ছিলেন স্যার উইলিয়ম হাণ্টার। ভারতীয়দের মধ্যে ছিলেন মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, আনন্দমোহন বসু, কাশীনাথ ত্রিম্বক তেলাং, স্যার সৈয়দ আহ্মদ, সৈয়দ মামুদ এবং শিক্ষা-অধিকর্তা এ. ডবলিউ. ক্রফ্ট্। এই কমিশন সভাপতির নামানুসারে হাণ্টার কমিশন নামে সুপরিচিত। ১৮৫৪ সালের পর থেকে এপর্যন্ত ভারতের শিক্ষার কতদূর অগ্রগতি ঘটেছে এবং ভবিষ্যতে শিক্ষা-বিস্তার কিভাবে ঘটবে সে-বিষয়ে তদন্ত, পর্যালোচনা ও পরামর্শ দেবার জন্য কমিশনকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। তবে প্রাথমিক শিক্ষার তুলনায় উচ্চ ও মাধ্যমিক শিক্ষার অগ্রগতি ঘটবার জন্য শিক্ষা-কমিশনকে প্রধানত প্রাথমিক শিক্ষার বিষয়ে তদন্ত ও সুপারিশ করতে বলা হয়েছিল। সুতরাং কমিশনের মূল লক্ষ্য ছিল 'সমগ্র সাম্রাজ্যে প্রাথমিক শিক্ষা-ব্যবস্থা সম্পর্কে তদন্ত এবং তাকে উন্নত ও সম্প্রসারিত করার বিষয়ে পরামর্শদান।'[১৮] তাঁরা পরের বছরে (১৪.৯.১৮৮৩) প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা-বিষয়ে তাঁদের রিপোর্ট পেশ করেছেন।

হাণ্টার কমিশন প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে গুরুত্ব আরোপ করে ইংলণ্ডের আদর্শে সুপারিশ করেছেন যে, প্রাথমিক শিক্ষার পরিচালনা, নিয়ন্ত্রণ ও দায়িত্ব স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলির ওপরে অর্পণ করা উচিত। তাঁরা বলেছেন, "আমরা মনে করি, প্রাথমিক স্কুলগুলির দায়িত্ব স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন-সংস্থাগুলির হাতে অর্পণ করা উচিত, যারা প্রত্যক্ষভাবে স্থানীয় জনসাধারণের কল্যাণমূলক কাজ করে এবং একাজ তুলনামূলকভাবে সহজ।

কিন্তু এ ধরণের সংস্থাগুলির দ্বারা উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি পরিচালিত হওয়া কতখানি কাম্য, তা এখনো পর্যন্ত একটা অমীমাংসিত বিষয়। আগামী বৎসরগুলির অভিজ্ঞতাই এ বিষয়ে আলোকপাত করতে পারে। এটা সম্ভব যে, উক্ত সংস্থাগুলি মনে করতে পারে যে, অল্পসংখ্যক লোককেই সুযোগ প্রদান করবে যা তাদের সাধ্যাতীত। পক্ষান্তরে এটাও সম্ভব যে, বহুমুখী উদ্দেশ্যে গঠিত উক্ত সংস্থাগুলির চেয়ে শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত কমিটির পরিচালনায় মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলি আরো উন্নত হতে পারে। অন্তত আমরা চাই যে, দেশীয় ভদ্রলোকেরা স্বেচ্ছায় কোনো মাধ্যমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হতে চাইলে তাতে যেন কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না করা হয়। সুতরাং আমরা সুপারিশ করছি যে, যদি কোনো প্রদেশে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন-প্রতিষ্ঠানকে কিংবা তাদের নিযুক্ত কমিটিকে সরকারি মাধ্যমিক স্কুলগুলির পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়, তাহলে পরবর্তীকালে সেই স্কুলগুলির পরিচালনা হস্তান্তর করতে হবে, এমন বেসরকারি ব্যক্তিদের সংগঠনের পরিচালকদের হাতে যারা স্কুলের স্থায়িত্ব ও কার্যকরতাকে নিশ্চিত করতে সক্ষম।"[১৯] কমিশনের রিপোর্টে আরো বলা হয়েছে যে, প্রাথমিক শিক্ষা উচ্চশিক্ষার প্রথম ধাপ নয়, জনসাধারণের নিজ নিজ ভাষায় তাঁদের জীবনের সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহের সম্পূর্ণ শিক্ষা এবং এই শিক্ষার মাধ্যম হবে আঞ্চলিক ভাষা। সরকারি দায়িত্ব সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, প্রাথমিক শিক্ষার জন্য সরকারকে অধিকতর অর্থ ব্যয় করতে হবে।

কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের দায়িত্ব স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন-প্রতিষ্ঠানগুলির ওপরে অর্পিত হ'ল এবং এই স্তরের শিক্ষার মাধ্যম রূপে আঞ্চলিক ভাষা ঘোষিত হ'ল। কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার প্রস্তাব কমিশনের সামনে উত্থাপিত হলে তা অবাস্তব ও অসময়োচিত বলে অগ্রাহ্য করা হয়। অথচ বৃটেনে ১৮৮০ সালের আইনানুযায়ী প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছিল। এ ঘটনায় অনেকে উদ্দীপ্ত হয়েছিলেন এবং কমিশনের সামনে স্যার চিমনলাল শীতলবাদ, স্যার ইব্রাহিম রহিমতুল্লা সহ অনেকে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের দাবি উত্থাপন করেছিলেন। কিন্তু ১৯০২ সালের পূর্বে ভারত-সরকার এই দাবি বিবেচনা করেননি।

প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারের অধিকতর দায়িত্ব গ্রহণের অজুহাতে মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারের আর্থিক দায়িত্বভার পরিত্যাগের জন্য

বেসরকারি ব্যক্তিদের হাতে মাধ্যমিক শিক্ষার দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল এবং সাহায্য-সহায়তার নীতি গৃহীত হয়েছিল। এই স্তরের শিক্ষার মাধ্যম সম্পর্কে নীরব থেকে শিক্ষা-কমিশন কার্যত ইংরেজিভাষাকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। তবে নিম্ন মাধ্যমিক অর্থাৎ 'মিড্‌ল্‌' স্কুলের শিক্ষার মাধ্যম নির্বাচনে প্রত্যেক প্রদেশকে স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে।

কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-বিস্তার সম্পর্কে কোনো কিছু উল্লিখিত না হলেও সাধারণ শিক্ষার কলেজগুলি সম্বন্ধে কয়েকটি মন্তব্য করা হয়েছে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে সরকারি দায়িত্বভার পরিত্যাগের সুপারিশ করা হয়েছে। ফলে সমাজের বিত্তশালীদের মনে প্রবল সন্দেহ সৃষ্টি হয় এবং সেই সন্দেহের প্রকাশ ঘটেছে কমিশনের রিপোর্টের পরিশিষ্টে প্রদত্ত কমিশনের সদস্য কাশীনাথ ত্রিম্বক তেলাংয়ের পৃথক নোটে। তিনি এই নোটে আশা প্রকাশ করেছেন যে, কলেজগুলির সঙ্গে ব্যবহারের ক্ষেত্রে রাজ্যসরকার 'উচ্চশিক্ষায় অনেক ব্যয় করা হয়েছে, এই মনোভাবের দ্বারা প্রভাবিত হবেন না'। এবং 'যে পদ্ধতিতে এই মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে, তার প্রতি আমার বিন্দুমাত্র সহানুভূতি নেই। আমি দ্বিধাহীন চিত্তে মনে করি যে, জনশিক্ষা ব্যতীত সমগ্র দেশ কখনো সেই ফললাভ করতে সক্ষম হবে না যা উচ্চশিক্ষা থেকে তার আশা করার অধিকার রয়েছে। মিলের কথানুযায়ী সেই উদ্দেশ্য-সাধনে আপনাদের ধীশক্তি তাঁদের জন্য ব্যবহার করা উচিত, যাঁদের কেবলমাত্র দু'টি হাত রয়েছে। এবং আমার বিচারে জনশিক্ষাকে অগ্রাধিকার দেবার সময় এখন হয়েছে। ···অন্যদিকে সমভাবে আমার সুদৃঢ় বিশ্বাস, উচ্চশিক্ষা ব্যতীত জনশিক্ষা সম্প্রসারিত হবে না। এবং এই যুক্তি প্রায়ই প্রদর্শিত হয় যে, একজন ছাত্রের উচ্চশিক্ষার জন্য যে অর্থ ব্যয় করা হয়, সেই অর্থ দিয়ে শতাধিক ছাত্রকে প্রাথমিক শিক্ষা-দেওয়া যেতে পারে। আমার মনে হয়, এক মুহূর্ত চিন্তা করলে এই যুক্তি একেবারে অর্থহীন ও মূল্যহীন বলে প্রতিভাত হবে। ···আমার মতে দেশের ধর্ম, সমাজ, রাজনীতি ও শিল্পের অগ্রগতি উচ্চশিক্ষার বিষয়ে সুদৃঢ় নীতির ওপরে নির্ভর করে যা অতীতে ইংরেজ-শাসকদের দ্বারা অনুমোদিত হয়েছিল।"[৮০]

পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে, জনশিক্ষার দাবি উত্থাপিত হলে শ্বেতাঙ্গ-সরকার এই সমস্যাটির সঙ্গে উচ্চশিক্ষার প্রসঙ্গ জড়িয়ে এমনভাবে জনসমক্ষে উপস্থিত করেন যেন সমস্যাটি হ'ল উচ্চশিক্ষা বনাম জনশিক্ষা —জনশিক্ষার প্রতিবন্ধক যেন উচ্চশিক্ষা। তাঁদের মতে জনশিক্ষার প্রসার ঘটাতে হলে উচ্চশিক্ষার সঙ্কোচন ঘটাতে হবে; উচ্চশিক্ষার দায়িত্বভার পরিত্যাগ করে জনশিক্ষার

খাতে অর্থব্যয় করতে হবে। শিক্ষা-সমস্যা এভাবে উত্থাপিত হলে মধ্যবিত্ত-সমাজের যে-অংশ জনশিক্ষার দাবির প্রতি সহানুভূতিশীল, তাঁরাও উচ্চশিক্ষা-সংকোচনের আশঙ্কায় অপরাংশের সঙ্গে মিলিত হয়ে উচ্চশিক্ষা-সম্প্রসারণের দাবি জোরালো ভাষায় উপস্থিত করেন। ফলে জনশিক্ষার দাবি দুর্বল হয় এবং ইংরেজ-সরকারের সুবিধা হয়। জনশিক্ষার প্রতি তাঁদের মৌখিক সহানুভূতি প্রকাশিত হলেও জনশিক্ষা-বিস্তারে কোনো কার্যকর পন্থা গ্রহণ করেন না; অন্যদিকে উচ্চশিক্ষা-প্রশ্নে তাঁদের পূর্বের অনুসৃত নীতি পরিত্যাগে কোনো অসুবিধা হয় না। অর্থাৎ কৃষিপণ্য-উৎপাদন ও বাজারের জন্য যেটুকু প্রাথমিক শিক্ষা এবং প্রশাসনিক কাজকর্ম সুষ্ঠুভাবে নির্বাহের জন্য যেটুকু উচ্চশিক্ষার প্রয়োজন, তার অতিরিক্ত শিক্ষা-বিস্তারে তাঁদের কোনো আগ্রহ ছিল না। জনমতের চাপে তাঁরা শিক্ষা-কমিশন গঠন করতে বাধ্য হলেও জনমতকে বিভ্রান্ত করার জন্য তাঁরা এই কৌশল গ্রহণ করেন। হাণ্টার কমিশনের ক্ষেত্রেও সে-ঘটনাই ঘটেছে। ১৮৮২ সালের পর থেকে লোকসংখ্যার অনুপাতে জনশিক্ষা সম্প্রসারিত হয়নি; অন্যদিকে উচ্চ-শিক্ষার দায়িত্ব বেসরকারি উদ্যোগের হাতে সম্প্রসারিত করেছেন, নতুন সরকারি স্কুল-কলেজ খোলা হয়নি। ভাষা-মাধ্যম প্রশ্নে প্রাথমিক ও মধ্যস্তরে (নিম্ন মাধ্যমিক) আঞ্চলিক ভাষা স্বীকৃত হলেও ইংরেজিভাষার প্রাধান্য অব্যাহত রয়েছে; মাধ্যমিক ও কলেজ-স্তরে শিক্ষার বাহনরূপে পূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত রয়েছে ইংরেজিভাষা।

ইংলণ্ডের আদর্শে এদেশের প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন-প্রতিষ্ঠানের ওপরে অর্পিত হওয়ায় প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে তার ফল শুভকর হয়নি। গ্রামগুলি ছিল জমিদারদের সাম্রাজ্য এবং তাঁদের সাম্রাজ্যে তাঁরাই ছিলেন দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। সুতরাং তাঁদের অঞ্চলের স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানগুলি জনস্বার্থবাহী হতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে এই প্রতিষ্ঠানগুলি ছিল বাস্তুঘুঘুদের বাসা। জমিদার, মহাজন ও তাঁদের অনুগৃহীত ব্যক্তিরাই ছিলেন এই প্রতিষ্ঠানগুলির পরিচালক। জনস্বার্থের পরিবর্তে শ্রেণীগত ও গোষ্ঠীগত স্বার্থ-পূরণে স্বায়ত্তশাসনের অর্থ-ভাণ্ডার ব্যবহৃত হ'ত। জনশিক্ষার ক্ষেত্রেও সেই ঘটনাই ঘটল। উপরন্তু জনশিক্ষা ছিল ভূস্বামীশ্রেণীর স্বার্থবিরোধী। সুতরাং জনশিক্ষার জন্য সরকারের কাছ থেকে অর্থ পেলেও সেই অর্থ সেই উদ্দেশ্যে ব্যয় করা হ'ল না। 'এই নূতন ব্যবস্থায় প্রাথমিক শিক্ষার আশানুরূপ ব্যাপ্তি ঘটেনি, যথা ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের ৩১ মার্চ জিলা বোর্ডের পরিচালিত ১৩,৩১৮টি স্কুলে ৫,৬৪,৮০২ ছাত্র আর

মিউনিসিপ্যাল বোর্ডের পরিচালিত ৮১৩টি স্কুলে ৭৯,৭৬৩ ছাত্র পড়তো। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে জিলাবোর্ডের পরিচালিত ১৪,৫৩১টি স্কুলে ৬,৩২৪,৪৩ ছাত্র ও মিউনিসিপ্যাল বোর্ডের পরিচালিত ১০৪১টি স্কুলে ১০১,২৯১ ছাত্র পড়তো। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সমগ্র ছাত্রসংখ্যার অর্ধেকের কিছু বেশি (৫৩%) ছাত্র তখন সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ে পড়তো।'[৮১]

কমিশন প্রাথমিক শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দেবার যে নির্দেশ দিয়েছিলেন, তা অনুসৃত হয়নি। পক্ষান্তরে উচ্চ ও মাধ্যমিক শিক্ষার বিস্তারই দ্রুততর হয়েছিল। 'প্রাথমিক শিক্ষাখাতে সরকারি ব্যয় ১৮৮১-৮২ খৃষ্টাব্দের ১৬'৭৭ টাকা থেকে ১৯০১-০২ খৃষ্টাব্দে ১৬'৯২ লক্ষ টাকা মাত্র হয়েছিল, অর্থাৎ বছরে হাজার টাকা হিসাবেও ব্যয়বৃদ্ধি হয়নি। আঞ্চলিক সংস্থাগুলি থেকে প্রাপ্ত টাকা ১৮৮১-৮২-র ২৪'৯ লক্ষ টাকা থেকে ১৯০১-০২ খৃষ্টাব্দে ৪৬'১ লক্ষ টাকা হয়েছিল। এই বৃদ্ধি প্রয়োজনের পক্ষে নিতান্ত অপ্রচুর ছিল।'[৮২] তার পরেও অবস্থার উন্নতি ঘটেনি, প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তৃত হয়নি। গ্রামে গ্রামে .প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা তো দূরের কথা, ১৯০৭ সালে বাংলাদেশে গড়পড়তা প্রতি ১০'৯ বর্গমাইলের মধ্যে মাত্র একটি করে প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল। এমন কি ১৯২০ সালেও 'বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয় অত্যন্ত কম ছিল, —গড়ে ছাত্র-প্রতি বৎসরে মাত্র ৩'৫ টাকা (বোম্বাইয়ে ৩৫৲) আর ছাত্র-প্রতি বেতনের গড় ছিল ১৷৵ (ভারতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশি)। ছাত্র-প্রতি সরকারি ব্যয় ছিল মোটে '০২৯ টাকা (বোম্বাইয়ে '২৬৫ টাকা) অর্থাৎ বাংলার মতো দরিদ্র দেশে ছাত্রেরা প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয় অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় অধিক পরিমাণে বহন করছিল।'[৮৩]

সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় ও বেসরকারি উদ্যোগে দ্রুতগতিতে মাধ্যমিক শিক্ষার বিস্তৃতি ঘটে। '১৮৮১-৮২ খৃষ্টাব্দে যেখানে ৩৯১৬টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ২,১৪,০৭৭ জন ছাত্র পড়তো, সেখানে ১৯০১-০২ খৃষ্টাব্দে ৫,১২৪টি বিদ্যালয়ে ৫,৯০,১২৯ ছাত্র ছিল। এই হিসেব সর্বৈবভাবে নির্ভরযোগ্য না হলেও বিশ বছরে মাধ্যমিক শিক্ষার প্রসার যে দ্বিগুণীকৃত হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। অর্থাৎ ১৮৫৪ থেকে ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের অন্তর্বর্তীকালের মতোই এই সময়ের মধ্যেও প্রাথমিক অপেক্ষা মাধ্যমিক শিক্ষার প্রসারই দ্রুততর হয়েছিল।'[৮৪] পরীক্ষার্থীদের সংখ্যার দ্বারা এই অভিমতই সমর্থিত হয়। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দিয়েছেন ৪৮,০৪৫ এবং উত্তীর্ণ হয়েছেন ২১,৯৬৯ জন। তারপর থেকে ১৯০২ সাল পর্যন্ত এণ্ট্রান্সের মোট পরীক্ষার্থী ছিল ১০৪,৪৮২ এবং উত্তীর্ণের সংখ্যা ৫২,০৬৩ জন।

মাধ্যমিকের ন্যায় কলেজ-স্তরেও উচ্চশিক্ষার দ্রুত বিস্তৃতি ঘটেছিল। ১৮৫৭ সালে ১৪টি সাধারণ শিক্ষার কলেজ (মেডিক্যাল ও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ব্যতীত) ছিল। ১৮৮২ সালে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির অনুমোদিত কলেজের সংখ্যা হ'ল ৬৮ —প্রথম শ্রেণীর ৪৯টি এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর ১৯টি। কিন্তু ১৯০২ সাল পর্যন্ত কলেজের সংখ্যা ক্রমশ বেড়ে দ্বিগুণেরও বেশি হয়েছে —সংখ্যা ১৭৯। এই কলেজগুলির মধ্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত কলেজের সংখ্যা ৭১। নিম্নলিখিত সারণীতে [৮৫] লিপিবদ্ধ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পরীক্ষার ১৮৮২ সাল পর্যন্ত মোট পরীক্ষার্থী ও উত্তীর্ণ-সংখ্যার সঙ্গে পরবর্তীকালের (১৮৮৩-১৯০২ খৃ:) মোট পরীক্ষার্থী ও উত্তীর্ণ-সংখ্যা তুলনা করলে উচ্চ শিক্ষা-বিস্তারের দ্রুততা উপলব্ধি করা যাবে :

পরীক্ষা	পরীক্ষার্থী-সংখ্যা	উত্তীর্ণ-সংখ্যা	পরীক্ষার্থী-সংখ্যা	উত্তীর্ণ-সংখ্যা
এফ. এ.	১৮৬১-১৮৮২ খৃ:		১৮৮৩-১৯০২ খৃ:	
	১৩,৪৯৪ ...	৫,১৭০	৪৯,৬৫৬ ...	৯,৪২৮
বি. এ.	১৮৫৮-১৮৮২ খৃ:		১৮৮৩-১৯০২ খৃ:	
	৪,৩৭৬ ...	১,৮১৭	২৫,৩৪০ ...	৭,৬৯২
এম. এ.	১৮৬১-১৮৮২ খৃ:		১৮৮৩-১৯০২ খৃ:	
	৭৫৭ ...	৪৪৫	২,৯২৭	১,৩৫১

প্রাথমিক শিক্ষা অপেক্ষা মাধ্যমিক ও কলেজীয় শিক্ষার ওপরে অত্যধিক গুরুত্বদানের ঘটনা কেবলমাত্র উনিশ শতকের শেষার্ধে নয়, বিশ শতকের সমগ্র বৃটিশ-রাজত্বে বজায় ছিল। যাঁরা মাধ্যমিক কিংবা কলেজীয় শিক্ষা গ্রহণ করেছেন, শ্রেণী-বিচারে তাঁরা প্রায় সকলেই উচ্চ ও মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে আগত ; বিত্তহীন অনুল্লেখযোগ্য। এবং যে ক'জন বিত্তহীন উচ্চশিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পেয়েছেন, বিত্তশালীদের ছিটে-ফোঁটা অনুগ্রহ-লাভের ফলেই তা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু সামগ্রিকভাবে শিক্ষার অগ্রগতি ছিল অসন্তোষজনক। ১৯০১ সালের সেন্সাস রিপোর্টে দেখা যায় যে, প্রতি দশজন পুরুষের একজন এবং প্রতি হাজার

জন মেয়ের সাতজন মাত্র সাক্ষর ছিলেন।

ইতোমধ্যে দেশে জাতীয় চেতনার উন্মেষ ঘটেছে; শিক্ষা-সংস্কারের দাবি উত্থাপিত হয়েছে। বিশ শতকের প্রারম্ভে প্রাথমিক শিক্ষার সম্প্রসারণের জন্য অধিক পরিমাণে অর্থ মঞ্জুর ও বাধ্যতামূলক করার জন্য দেশের জনমত বৃটিশ সরকারের ওপরে প্রবল চাপ দিয়েছে। এ অবস্থায় লর্ড কার্জন ১৯০৪ সালের ১১ মার্চ শিক্ষা-সম্পর্কে সরকারি-প্রস্তাব ঘোষণা করেছেন। এই প্রস্তাবে তিনি বলেছেন, "প্রাথমিক শিক্ষা হ'ল, জনসাধারণকে তাঁদের মাতৃভাষায় এমন বিষয়ে শেখানো যা তাঁদের বুদ্ধির উন্মেষ করে, জীবনযাত্রার উপযুক্ত করে তোলে। ১৮৫৪ সালে দেখা গেল যে, এ-বিষয়ে অত্যন্ত অবহেলা করা হয়েছে এবং তখনই প্রাথমিক শিক্ষায় ব্যয়বৃদ্ধির কথা চিন্তা করা হ'ল। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে শিক্ষা-কমিশন সুপারিশ করেছিল, "জনসাধারণের প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা, সম্প্রসারণ ও উন্নয়নকে শিক্ষা-ব্যবস্থার অংশ হিসাবে গণ্য করতে হবে এবং সেজন্য রাজ্যকে আগেকার তুলনায় অধিকতর সচেষ্ট হয়ে নিরন্তর প্রয়াসী হতে হবে।" ভারত সরকার এই অভিমতের সঙ্গে সর্বাংশে একমত যে, প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তার করাই হ'ল সরকারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য। তাঁরা এ দায়িত্ব কেবলমাত্র সাধারণ নীতি হিসাবে গ্রহণ করেননি, কারণ লর্ড লরেন্স বলেছিলেন, '**শাসনের অসুবিধাগুলির মধ্যে যা আমাদের সরকারের স্থায়িত্বের পক্ষে বিপজ্জনক হতে পারে, তা হ'ল জনসাধারণের মারাত্মক অজ্ঞতা।' উপরন্তু অতীতের তুলনায় বর্তমানে জনসাধারণের কাছেও শিক্ষা-হীনতা মারাত্মক অসুবিধার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। রেলওয়ে বিস্তারের দ্বারা ভারতের কৃষিব্যবস্থার অর্থনৈতিক দিকটির প্রভূত উন্নতি হয়েছে। বিশ্ব-বাণিজ্যের সঙ্গে কৃষকের সংযোগ সাধিত হয়েছে এবং আদান-প্রদানে তাঁকে নিযুক্ত করেছে যা একজন অশিক্ষিত ব্যক্তির পক্ষে বিশেষ অসুবিধাজনক।** উন্নত কৃষিপদ্ধতি প্রয়োগের জন্য উন্নয়ন-প্রকল্প, কৃষি-ব্যাঙ্ক স্থাপন, কৃষকদের আইনগত অবস্থানকে শক্তিশালী করা এবং সাধারণভাবে গ্রামীণ জীবনের উন্নয়ন প্রভৃতির জন্য শিক্ষার সঙ্গে বাস্তব সুযোগগুলি সম্প্রসারিত হয়েছে। ঐতিহ্যানুসারী ধ্যান-ধারণার ওপরে শিক্ষিত-মনের প্রভাব এবং জনগণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের ওপরে এই সমস্ত প্রকল্পের সাফল্য বৃহদংশে নির্ভর করে।···

"যেখানে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার চাহিদা বেড়েছে, সেখানে পূর্বের ন্যায় তত দ্রুতগতিতে বর্তমানে জোগান বাড়েনি। ১৮৭০-৭১ সালে ১৬,৪৭৩ টি

স্কুল ও ৬,০৭,৩২০ জন শিক্ষার্থী ছিল। ১৮৮১-৮২ সনে ৮২,৯১৬টি স্কুল ও ২,০৬১,৫৪১ জন বিদ্যার্থী ছিল। কিন্তু ১৮৯১-৯২ সালে কেবলমাত্র বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছিল ৯৭,১০৯টি স্কুল ও ২,৮৩৭,৬০৭ জন ছাত্র এবং ১৯০১-০২ সনে (৯৮,৫৩৮টি স্কুল ও ৩,২৬৮,৭২৬ জন ছাত্র) দেখা যায় যে, শিক্ষা-বিস্তারের প্রারম্ভিক গতি বর্তমানে স্তিমিত। প্রকৃতপক্ষে বিগত শতকের শেষ বছরে তার আগের বছরের তুলনায় নিম্নগতিই দেখা যায়। সঠিক তুলনা করবার জন্য সংখ্যাতত্ত্বের পার্থক্যের কিছু সুবিধা নিতে হবে; কিন্তু তার দ্বারা মোট ফলের তারতম্য ঘটবে না। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যাবৃদ্ধি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে সমতা রক্ষা করতে পারেনি, যেখানে গত কুড়ি বছরে দ্বিগুণেরও বেশি ছাত্রসংখ্যা বেড়েছে। এটা বলা হতে পারে, সাম্প্রতিককালের দুর্ভিক্ষ ও প্লেগের জন্য প্রাথমিক স্কুলের বিস্তার বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে এবং তা আরো ঘটেছে উচ্চতর ও উচ্চাভিলাষী শ্রেণীর প্রাথমিক শিক্ষা-প্রসারে অনীহার জন্য। যাই হোক, এই প্রতিবন্ধকগুলি সামান্য এবং তা শীঘ্রই দূরীভূত হতে পারে যদি প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংস্থানের প্রধান বাধা অপসারণ করা যায়।...

"এই প্রশ্নে সাধারণভাবে বলা যায়, ভারত-সরকার এই অভিমতের বিরোধিতা করতে পারেন না যে, প্রাথমিক শিক্ষার প্রতি যথেষ্ট মনোযোগ দেওয়া হয়নি এবং এই খাতে সরকারি অর্থ বরাদ্দ অপর্যাপ্ত। তাঁরা মনে করেন যে, প্রাথমিক শিক্ষার প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার ও স্থানীয় সরকারের সহানুভূতিশীল দৃষ্টি আকর্ষণের যুক্তিসঙ্গত দাবি রয়েছে এবং প্রাদেশিক রাজস্বের একটা ভালো অংশ এর জন্য ব্যয় করা উচিত। যেসব প্রদেশে প্রাথমিক শিক্ষা পশ্চাৎপদ অবস্থায় রয়েছে সেখানে তাকে উৎসাহিত করার জন্য প্রাথমিক দায়িত্ব বলে গ্রহণ করতে হবে। ভারত-সরকার বিশ্বাস করেন যে, স্থানীয় সরকারগুলি প্রাথমিক শিক্ষা-প্রসারের বিষয়ে তাঁদের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত এবং প্রত্যেক প্রদেশের আর্থিক সামর্থ অনুযায়ী নির্ধারিত সীমা পর্যন্ত তাঁরা প্রাথমিক শিক্ষাখাতে অর্থ ব্যয় করবেন।"[৮৬] (মোটা হরফ লেখকের)

ভাষা-মাধ্যম বিষয়ে উক্ত সরকারি প্রস্তাবে বলা হয়েছে, "প্রাথমিক শিক্ষা-কাঠামোয় ইংরেজিভাষার কোনো স্থান নেই এবং থাকা উচিতও নয়। কোনো শিশুকে ইংরেজিভাষায় শিক্ষাগ্রহণে অনুমতি দেওয়া কখনো উচিত নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে মাতৃভাষায় যথেষ্ট দক্ষতা প্রদর্শন করতে পারে এবং মাতৃভাষায় বিস্তৃত জ্ঞান অর্জন করতে পারে।" কেবলমাত্র ১৩ বছর বয়সের পর থেকে বিদেশী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা-গ্রহণে দক্ষ বলে বিবেচনা করা হয়েছিল।

সরকারি প্রস্তাবে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় মাধ্যমিক স্তরের শেষ পর্যন্ত মাতৃভাষায় শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল। প্রস্তাবে বলা হয়েছে, "**যদি শিক্ষিতশ্রেণী তাঁদের নিজেদের ভাষা-চর্চায় অবহেলা করেন, তাহলে তা আঞ্চলিক কথ্যভাষার মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়বে, তার কোনো সাহিত্য-মূল্য থাকবে না।**"[৮৭] (মোটা হরফ লেখকের)

মোটা হরফে চিহ্নিত বাক্যগুলির মধ্যে সাম্রাজ্য-স্বার্থের রক্ষক ও ভাষাবিদ্ —লর্ড কার্জনের এই দু'টি রূপই ফুটে উঠেছে। সাম্রাজ্যের প্রয়োজনে প্রাথমিক শিক্ষার প্রয়োজন এবং তা ইংরেজিভাষার-মাধ্যমে সম্ভব নয়, মাতৃভাষায় দিতে হবে। যদি মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা-বিস্তার না ঘটে, তাহলে জনসাধারণের অজ্ঞতা সাম্রাজ্যের সর্বনাশ ঘটাবে। কিন্তু মাতৃভাষায় শিক্ষাদানে প্রধান প্রতিবন্ধক হচ্ছে ইংরেজিভাষায় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনোভাব। সুতরাং তাঁদের সতর্ক করার জন্য তিনি যে-উক্তি করেছেন, তা ভাষা-বিজ্ঞানীদের অভিমত। মাতৃভাষা-চর্চায় অবজ্ঞার অর্থ হচ্ছে সেই ভাষা-বিকাশের পথ রুদ্ধ করা, তার উন্নয়নের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা। পরিণতিতে সেই ভাষা দুর্বল-পঙ্গু হয়ে পড়ে; জীবনের বহুমুখী প্রকাশের জন্য বিচিত্র ভাবের ভার বহনে সেই ভাষার কোনো ক্ষমতা থাকে না।

প্রাথমিক শিক্ষার প্রতি সরকারের উদাসীনতা ও অবহেলা এবং সরকারি অর্থব্যয়ের একান্ত কার্পণ্যতার জন্য জনশিক্ষা সম্প্রসারিত হয়নি বলে লর্ড কার্জন স্বীকার করলেও অবস্থার কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। প্রাথমিক শিক্ষাখাতে সরকারি অর্থ-বরাদ্দে উদারতার পরিচয় পাওয়া গেল না। তাঁরা মেয়োর ১৮৭০ সালের আদেশ-অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত হয়েছিলেন। এই আদেশে বলা হয়েছিল যে, শিক্ষাখাতে সমগ্র ব্যয়ের এক-তৃতীয়াংশের বেশি প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ব্যয় করা চলবে না। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে এই নির্দিষ্ট অর্থও ব্যয় করা হ'ত না। ফলে এটাই ঘটল যে, অর্থব্যয়ে কৃচ্ছতার জন্য কার্জনের ঘোষণা সত্ত্বেও জনশিক্ষা সম্প্রসারিত হ'ল না।[৮৮]

কার্জনের সরকারি প্রস্তাবে বাধ্যতামূলক সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা-বিষয়ে কোনো কিছু উল্লিখিত না হওয়ায় এই প্রস্তাব প্রাথমিক শিক্ষা জগতে কোনো প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারেনি। অথচ আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য উইলিয়ম অ্যাডাম ১৮৩৩ সালে বাধ্যতামূলকভাবে প্রত্যেকটি গ্রামে একটি প্রাথমিক স্কুল স্থাপনের জন্য আইন প্রণয়নের দাবি উত্থাপন করেছিলেন। বোম্বাই রাজ্যের রাজস্ব-কমিশনার ক্যাপ্টেন উইন্‌গেট ১৮৫২ সালে প্রস্তাব

দিয়েছিলেন যে, গ্রামীণ ছেলেদের আবশ্যিক শিক্ষাদানের জন্য ভূমি-রাজস্বের ওপরে শতকরা ৫ টাকা হারে শিক্ষাকর ধার্য করা হোক। ভীমরুলের চাকে ঘা পড়ায় দেশী-বিদেশী উভয় মহলের স্বার্থান্বেষী ব্যক্তিরা তীব্র আপত্তি জ্ঞাপন করেন। ফলে প্রস্তাবটি পরিত্যক্ত হয়। কিছুদিন পরে গুজরাটের শিক্ষা-বিভাগের ইন্সপেক্টার টি. সি. হোপ ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে প্রস্তাব করেছিলেন যে, আইন-প্রণয়নের দ্বারা প্রত্যেকটি গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য সেই অঞ্চলের অধিবাসীদের নিজেদের ওপরে কর-ধার্যের অধিকার দেওয়া হোক। বোম্বাইয়ের ডি. পি. আই. এই প্রস্তাব গ্রহণ করে একটি খসড়া বিল তৈরি করেন। কিন্তু ইংরেজ-সরকার এই জাতীয় প্রস্তাবগুলিকে অসময়োচিত ও অবাস্তব বলে নাকচ করেন।

১৮৭০ সালের পরে এই অবস্থার পরিবর্তন হতে আরম্ভ করে। প্রাথমিক শিক্ষার দ্রুত সম্প্রসারণের জন্য সভায় ও সংবাদপত্রের মাধ্যমে জাতীয় দাবি উত্থিত হয়। ১৮৮২ সালের ভারতীয় শিক্ষা-কমিশনের সামনে বিভিন্ন ধর্মের ভারতীয় নেতারা, মিশনারিরা ও দেশীয়-ইউরোপীয় সরকারি কর্মচারিরা আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষার দ্রুত প্রসারকল্পে আইন প্রণয়নের দাবি পেশ করেছিলেন। কিন্তু কমিশন এ বিষয়ে কোনো গুরুত্ব আরোপ না করে প্রাথমিক শিক্ষা যতদূর সম্ভব সম্প্রসারণের জন্য সরকারকে উদ্যোগী হবার পরামর্শ দিয়েছিলেন।

বৃটিশ-সরকার সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার দাবি অগ্রাহ্য করলেও জন-জীবনের বিভিন্ন অংশ এই দাবির সমর্থনে ক্রমেই সংগঠিত হয়। সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার সুদৃঢ় সমর্থক বরোদার মহারাজা সয়াজীরাও গায়কোয়ার এবিষয়ে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। ১৮৯৩ সালে তিনি প্রথমে আমরেলী অঞ্চলে আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন করেন এবং তার সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে তিনি সমগ্র বরোদা রাজ্যে সর্বজনীন বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রচলন করেন। প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে মহারাজার উদার দৃষ্টিভঙ্গি জাতীয়তাবাদী নেতাদের উৎসাহিত করেছে এবং তাঁরা সর্বজনীন, বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার দাবি উপস্থাপনে সাহসী হয়েছেন।

বোম্বাই রাজ্যে স্যার ইব্রাহিম রহিমতুল্লা ও স্যার চিমনলাল শীতলবাদ এই দাবির সমর্থনে আন্দোলন গড়ে তোলেন। ফলে ইংরেজ-সরকার ১৯০৬ সালে বোম্বাই শহরে প্রাথমিক শিক্ষার প্রচলন বিষয়ে পর্যালোচনার জন্য কমিটি গঠন করেন। কিন্তু সেই কমিটি বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের বিরুদ্ধে

রিপোর্ট পেশ করেন। তাসত্ত্বেও গোপালকৃষ্ণ গোখেল এই দাবির সমর্থনে কমিশন গঠনের জন্য ১৯১০ সালের ১৯ মার্চ কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় (Imperial Legislative Council) নিম্নলিখিত প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন, "এই কাউন্সিল সুপারিশ করছে যে, সমগ্র দেশে প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করার জন্য প্রচেষ্টা শুরু করা আবশ্যক এবং একটি নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে এসম্পর্কে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব দেবার উদ্দেশ্যে সরকারি ও বেসরকারি ব্যক্তিদের নিয়ে একটি কমিশন গঠন করা হোক।"[৮৯]

ভারত-সরকার বিবেচনার আশ্বাস দেওয়ায় গোখেল উক্ত প্রস্তাব প্রত্যাহার করেন। কিন্তু তা বিবেচিত না হওয়ায় পরবর্তী বৎসরে ১৬ মার্চ তারিখে তিনি অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা-বিল উত্থাপন করে বক্তৃতা-প্রসঙ্গে বলেন, "বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষানীতি সমগ্র দেশে ক্রমশ প্রবর্তন করাই হ'ল এই বিলের উদ্দেশ্য। অন্য দেশের অভিজ্ঞতা থেকে বিনা দ্বিধায় বলা যায় যে, জনসাধারণের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার বিপুল প্রসার ঘটাতে হ'লে কোনো না কোনো প্রকারের আবশ্যিকতা অপরিহার্য। সময় হয়েছে যখন ভারতবর্ষে এর শুরুটা অন্তত করতে হবে। ...পরিশেষে এই ব্যবস্থা প্রথমে কেবলমাত্র ছেলেদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হবে এবং পরবর্তীকালে কোনো স্থানীয় সংস্থা মেয়েদের ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন। প্রাথমিক শিক্ষা-গ্রহণের বয়স নির্দিষ্ট করা হচ্ছে ছয় থেকে দশ বৎসর।"[৯০]

পরবর্তী বৎসরে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় (১৭. ৩. ১৯১২) বিলটি পুনরায় আলোচনার জন্য উত্থাপিত হলে দেখা যায়, সরকারি ও বেসরকারি সদস্যদের অনেকেই বিলটির বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছেন। সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের দ্বারা বিলটি অগ্রাহ্য করা হবে তা পূর্বাহ্নে অনুমান করে গোখেল ইতিহাসের সতর্ক বাণী উচ্চারণ করে বলেন, "মাননীয় মহাশয়, আমি জানি আজকের অধিবেশন শেষ হবার আগেই এই বিলটি ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হবে। সেজন্য আমি কোনো অভিযোগ করছি না। এমনকি আমি দুঃখ অনুভবও করছি না। ১৮৭০ সালের আইন গৃহীত হওয়ার পূর্বে কোনোরকম দুঃখ অনুভব কিংবা অভিযোগ উত্থাপন না করে ইংলণ্ডেও যে-প্রাথমিক প্রচেষ্টা করতে হয়েছিল, তা আমি ভালোভাবে জানি। উপরন্তু আমি সবসময়ে অনুভব করি এবং প্রায়শঃই বলে থাকি যে, আমরা, ভারতের বর্তমান বংশধরেরা, আমাদের ব্যর্থতার মধ্য দিয়েই দেশ-সেবার আশা করতে পারি। যাঁরা সার্থকতার দ্বারা দেশসেবার সুযোগ পাবেন, তাঁরা পরে আসবেন। আমরা সন্তুষ্ট চিত্তে আনন্দের সঙ্গে সেই স্থান গ্রহণ করব,

যে-স্থান আমাদের অগ্রগতির স্বার্থে নির্দিষ্ট হয়ে আছে। আজ এই বিল ফেলে দেওয়া হলেও তা বারে বারে ফিরে আসবে, যতদিন পর্যন্ত না এই বিলের নিষ্প্রাণ ধারাগুলি জ্ঞানের আলোয় সারা দেশ ভরিয়ে দেয়। এটা হতে পারে যে, এই প্রত্যাশা ফলপ্রসূ হবে না। এটা হতে পারে যে, আমাদের প্রচেষ্টা সেই মহৎ উদ্দেশ্য, যা আমরা আন্তরিকভাবে অনুভব করি, তার রূপায়ণে এমনকি অপ্রত্যক্ষভাবেও সহায়ক হবে না এবং সমুদ্রতীরের বালিতে চাষ করার চেয়ে যা কোনো ভালো ফল দেবে না। কিন্তু মাননীয় মহাশয়, আমাদের প্রচেষ্টার পরিণতি যাই হোক, একটা বিষয় পরিষ্কার। আমরা মনে করি যে, আমরা আমাদের কর্তব্য করেছি এবং যেখানে কর্তব্যের আহ্বান পরিষ্কার, সেখানে একেবারে পরিশ্রম না করার চেয়ে পরিশ্রম করে ব্যর্থতা বরণ করা অনেক ভালো।"[১১]

বিতর্কের শেষে বিলটিকে ৩৮-১৩ ভোটে অগ্রাহ্য করা হ'ল। ভূস্বামীশ্রেণী কর্তৃক পৃষ্ঠপোষিত আলোকপ্রাপ্ত শিক্ষিত ব্যক্তিদের জনশিক্ষা-প্রসারে বাধাদান ও তাঁদের ন্যাক্কারজনক ভূমিকা দেখে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "মহাত্মা গোখলে এই লইয়া লড়িয়াছিলেন। শুনিয়াছি, দেশের মধ্যে বাংলাদেশের কাছ হইতেই তিনি সবচেয়ে বাধা পাইয়াছেন। বাংলাদেশে শুভবুদ্ধির ক্ষেত্রে আজকাল হঠাৎ সকল দিক হইতেই একটা অদ্ভুত মহামারীর আবহাওয়া বহিয়াছে। ভূতের পা পিছন দিকে, বাংলাদেশে সামাজিক সকল চেষ্টারই পা পিছনে ফিরিয়াছে।"[১২]

সর্বজনীন শিক্ষাবিস্তার বিষয়ে শিক্ষিত উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মনোভাবকে তীব্র আক্রমণ করে কবিগুরু আরো বলেছেন, "শিক্ষাবিস্তারে আমাদের গা নাই। তার মানে, শিক্ষার ভোজে নিজেরা বসিয়া যাইব, পাতের প্রসাদটুকু পর্যন্ত আর-কোনো ক্ষুধিত পায় বা না পায় সেকথা খেয়ালই নাই। এমন কথা যারা বলে 'নিম্নসাধারণের জন্য যথেষ্ট শিক্ষার দরকার নাই, তাতে তাদের ক্ষতিই করিবে' তারা কর্তৃপক্ষদের কাছ হইতে এ কথা শুনিবার অধিকারী যে, বাঙ্গালির পক্ষে বেশি শিক্ষা অনাবশ্যক, এমন-কি অনিষ্টকর। 'জনসাধারণকে লেখাপড়া শেখাইলে আমাদের চাকর জুটিবে না' এ কথা যদি সত্য হয় তবে আমরা লেখাপড়া শিখিলে আমাদেরও দাস্যভাবের ব্যাঘাত হইবে এ আশঙ্কাও মিথ্যা নহে।"[১৩] সেকারণেই 'মহাত্মা গোখলে যখন সার্বজনিক অবশ্যশিক্ষা প্রবর্তনে উদ্যোগী হয়েছিলেন তখন সবচেয়ে বাধা পেয়েছিলেন বাংলা প্রদেশের কোনো কোনো গণ্যমান্য লোকের কাছ থেকেই।'[১৪]

বাধ্যতামূলক সর্বজনীন অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার বিরোধী 'গণ্যমান্য লোক'দের মধ্যে অন্যতম ছিলেন স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, প্রমথ চৌধুরী প্রমুখ। অথচ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের পক্ষে অভূতপূর্ব সংগ্রাম করেছেন। তিনি লিখেছেন, "সর্বোপরি, আপ্রাণ চেষ্টায় মাতৃভাষার অনুশীলন কর। মাতৃভাষার মধ্য দিয়াই জনসাধারণের হৃদয় স্পর্শ করিতে পারিবে।"[৯৫] প্রমথ চৌধুরী রায়ত-কৃষকের পক্ষ নিয়ে কবিগুরুর সঙ্গে লেখনী-যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তিনিও মাতৃভাষার সপক্ষে লিখেছেন, "যদি কেউ মনে করেন যে, 'বাংলা বনাম ইংরেজী' এই ভাষার মামলায় বাদীর পক্ষে পুরোপুরি জয়লাভ হয়েছে, তা হলে তিনি নিতান্তই ভুল করবেন ; যা হয়েছে তা হচ্ছে তরমিম ডিগ্রি। ও দিকে একটু দৃষ্টিপাত করলে সকলেই দেখতে পাবেন যে, আমাদের আইন-আদালত স্কুল-কলেজ রাজদরবার-রাজনীতি জ্ঞান-বিজ্ঞান সবই অদ্যাবধি ইংরেজির পুরো দখলে রয়েছে। শুধু তাই নয়, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বেশির ভাগ গণ্যমান্য লোকেরা এসকল ক্ষেত্রে ইংরেজির দখল বজায় রাখাই সংগত ও কর্তব্য মনে করেন। মাতৃভাষা ইংরেজির হাত থেকে সেইটুকু মাত্র ছাড়া পেয়েছে, যেটুকু তার পক্ষে কেঁদে বাঁচবার জন্য দরকার।"[৯৬] তারপরে তিনি লিখেছেন, "ইংরেজি আজ বাংলার উপর প্রভুত্ব করছে। এ প্রভুত্ব হতে মুক্তিলাভ করবার একমাত্র উপায় হচ্ছে বাংলাকে বিদ্যাশিক্ষার ভাষা, অধ্যয়ন-অধ্যাপনার ভাষা, এক কথায় বিদ্যালয়ের ভাষা করে তোলা। আমাদের উচ্চ আশা এই যে, ভবিষ্যতে বাংলা উচ্চশিক্ষার ভাষা হবে ; শুধু বাল্যবিদ্যালয়ে নয়, বিশ্ববিদ্যালয়েও এ ভাষা পাবে প্রথম আসন, এবং ইংরেজি দ্বিতীয় আসন গ্রহণ করবে।"[৯৭] অথচ তিনি জনশিক্ষার বিরোধিতা করে লিখেছেন, "মান্যবর শ্রীযুক্ত গোপালকৃষ্ণ গোখলে যে হুজুগটির মুখপাত্র হয়েছেন, তার মূলে ইউরোপের নকল ছাড়া আর কোনো মনোভাব নেই। তাই গবর্ণমেণ্টকে ভজাবার জন্য দিবারাত্রি খালি বিলেতি নজিরই দেখানো হচ্ছে। শিক্ষা-শব্দের অর্থ শুধু লিখতে ও পড়তে শেখা হয়ে দাঁড়িয়েছে। গবর্ণমেণ্টই স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠা করে আমাদের লিখতে পড়তে শিখিয়েছেন। সুতরাং গবর্ণমেণ্টকে গ্রামে গ্রামে স্কুল স্থাপন করে রাজ্যিসুদ্ধ ছেলেমেয়েদের লেখা পড়া শেখাতেই হবে, এই হচ্ছে আমাদের হাল রাজনৈতিক আবদার।"[৯৮]

কেবলমাত্র স্যার আশুতোষ কিংবা প্রমথ চৌধুরী নন, সমগ্র উনিশ শতকে ও বিশ শতকের প্রথমার্ধে যাঁরা মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের পক্ষপাতী ছিলেন, তাঁরা অনেকেই নিজেদের শ্রেণী-সীমা ও চেতনাকে অতিক্রম করতে পারেননি।

শিক্ষা উচ্চ ও মধ্য শ্রেণীর গণ্ডী অতিক্রম করে বিত্তহীন শ্রেণীর মধ্যে ছড়িয়ে পড়ুক —এই অভিপ্রায় তাঁদের ছিল না। তাই তাঁরা জনশিক্ষার বিরোধিতা করেছেন। প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মাতৃভাষায় শিক্ষা প্রসারে ও স্ত্রীশিক্ষা-বিস্তারে প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে অক্লান্ত সংগ্রাম করেছেন। কিন্তু তাঁর সমস্ত শিক্ষা-প্রয়াস কেন্দ্রীভূত ছিল শহর ও গ্রামের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে। জনশিক্ষা-দানের কোনো পরিকল্পনা তাঁর ছিল না। কৃষক-সন্তানকে প্রাথমিক শিক্ষাদানের প্রশ্ন উত্থাপিত হ'লে তিনি বিরোধিতা করেছেন। দুর্ভাগ্যজনক হ'লেও একথা ঐতিহাসিক সত্য।

সপ্তম অধ্যায়

আশার ছলনে ভুলি

সাঁওতাল-বিদ্রোহ (১৮৫৫-৫৭ খৃঃ.), সিপাহী-বিদ্রোহ (১৮৫৭-৫৮ খৃঃ.) ইত্যাদি বিভিন্ন বিদ্রোহে কৃষকসাধারণের অংশগ্রহণের ফলশ্রুতি হ'ল ভারতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির শাসনের অবসান। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ২ আগস্ট বৃটিশ পার্লামেণ্ট এক নতুন আইনের দ্বারা ভারত-সাম্রাজ্যকে ইংলণ্ডীয়-সরকারের প্রত্যক্ষ শাসনাধীনে এনেছেন এবং এই বছরের ১ নভেম্বর মহারাণী ভিক্টোরিয়া ভারত-শাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করে নানাবিধ প্রতিশ্রুতিসহ ঘোষণাপত্র জারি করেছেন। তাতে উল্লসিত হয়ে এদেশের ভূম্যধিকারিশ্রেণী ও শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণী আশা প্রকাশ করেছেন যে, বৃটিশ-সরকার এখন তাঁদের শ্রেণীগত অসন্তোষ দূরীকরণের জন্য সচেষ্ট হবেন। বৃটিশ-রাণী অনুগৃহীতদের আশা পূরণ করেছেন। উডের সুপারিশ অনুসারে তাঁরা উচ্চতর শিক্ষা-বিস্তারে ব্রতী হয়েছেন।

ভারত-সরকার বিশ্ববিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠাকল্পে কলকাতার সরকারি-বেসরকারি দেশীয়-ইউরোপীয় শিক্ষাবিদ ও পদস্থ ব্যক্তিদের নিয়ে ১৮৫৬ সালে একটি কমিটি গঠন করেন। কমিটিতে বাঙ্গালিদের মধ্যে ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রামগোপাল ঘোষ ও রমাপ্রসাদ রায়। কমিটির রিপোর্ট অনুসারে ২৪ জানুয়ারি, ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে বিধিবদ্ধ আইনের দ্বারা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বৎসরে মাদ্রাজ ও বোম্বাইতেও বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। General Committee of Public Instruction এবং Council of Education-এর কাছ থেকে রাজ্যের শিক্ষা-পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। তবে উনিশ শতকের শেষ পর্যন্ত পাঠ্যপুস্তক নির্বাচন ও পরীক্ষা গ্রহণ করাই ছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একমাত্র কাজ। বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে ক্রমে ক্রমে প্রচলিত হয় উচ্চ শিক্ষার বিভিন্ন স্তরের পরীক্ষা —১৮৫৭ খৃষ্টাব্দ থেকে এণ্ট্রান্স পরীক্ষা (পরবর্তীকালে

'ম্যাট্রিকুলেশন' নামে অভিহিত হয়), ১৮৬১ সাল থেকে ফার্ষ্ট এগ্‌জামিনেশন ইন আর্ট্‌স্ বা এফ. এ. পরীক্ষা (পরে আই. এ. নামে অভিহিত হয়); ১৮৫৮ সন থেকে ব্যাচেলার অব আর্ট্‌স্ বা বি. এ. পরীক্ষা এবং ১৮৬১ খৃষ্টাব্দ থেকে মাষ্টার অব আর্ট্‌স্ বা এম. এ. পরীক্ষা আরম্ভ হয়। পরীক্ষার ফি ছিল — এণ্ট্রান্স —৫্ টাকা, এফ. এ. —১০্ টাকা, বি. এ. —২৫্ টাকা এবং এম. এ. —৫০্ টাকা। ষোল বৎসর পূর্ণ হ'লে এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দেবার অনুমতি দেওয়া হ'ত। একটা সুনির্দিষ্ট শিক্ষা-কাঠামো তৈরি করার জন্য বিভিন্ন সময়ে নানান্ বিধি প্রবর্তনের দ্বারা বিভিন্ন স্তরের পাঠ্য সময় নির্ধারিত হয়: এণ্ট্রান্স — ১০ বৎসর, এফ. এ.—২ বৎসর, বি. এ. —২ বৎসর এবং এম. এ. —২ বৎসর।

এণ্ট্রান্সের পাঠ্যবিষয় ছিল: '(১) ভাষাসমূহ —এর অন্তর্ভুক্ত ছিল ইংরেজি এবং নিম্নলিখিত যে কোনো একটি ভাষা: গ্রীক, লাতিন, আরবি, ফারসি, হিব্রু, সংস্কৃত, বাংলা, ওড়িয়া, হিন্দি, উর্দু ও বর্মি; (২) ইতিহাস ও ভূগোল —এর মধ্যে ছিল সাধারণ ইতিহাসের রূপরেখা, ভারতীয় ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত পরিচয়, ভূগোল সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞান ও ভারতের ভৌগোলিক জ্ঞান; (৩) গণিত ও প্রকৃতি বিজ্ঞান যার অন্তর্ভূত ছিল পাটিগণিত, বীজগণিত, জ্যামিতি ও বলবিদ্যার প্রাথমিক জ্ঞান; (৪) জীববৃত্তান্ত —এর অন্তর্ভুক্ত ছিল মেরুদণ্ডী প্রাণীর স্বভাব ও চরিত্রবৈশিষ্ট্য এবং গাছপালা ও তার পরিবেশ এবং উদ্ভিদের সরল বা প্রাথমিক অঙ্গগুলি সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান।'[১] পরীক্ষার্থীর এই পরীক্ষায় উপর্যুক্ত ভাষাসমূহের মধ্যে যে-ভাষা গ্রহণ করেছেন, সেই ভাষায় প্রশ্নের উত্তর লিখতে পারতেন।[২]

এফ. এ.-এর পাঠক্রমে ছিল: (১) 'ভাষাসমূহ: ইংরেজি ও নিম্নলিখিত যে কোনো একটি ভাষা —গ্রীক, লাতিন; হিব্রু,আরবি; ফারসি, সংস্কৃত, বাংলা, ওড়িয়া, হিন্দি, উর্দু; বর্মি, আর্মেনিয়; (২) ইতিহাস —১৮১৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বৃটিশ-শাসিত ভারতবর্ষের ইতিহাস-সহ ইংলণ্ডের ইতিহাস, আলেকজাণ্ডারের মৃত্যু পর্যন্ত গ্রীসের ইতিহাসের বিশেষ উল্লেখসহ প্রাচীন ইতিহাস; এবং (৩) গণিত ও জীববিজ্ঞান—পাটিগণিত, বীজগণিত, জ্যামিতি, সমতল ত্রিকোণমিতি; বলবিদ্যা।'[৩]

বি. এ. ডিগ্রির পাঠ্যতালিকায় ছিল: '(১) ভাষাসমূহ —ইংরেজি ও এণ্ট্রান্স পাঠ্যতালিকায় নির্দিষ্ট ভাষাগুলির যে কোনো একটি ভাষা; (২) ইতিহাস —এর অন্তর্ভুক্ত ইংলণ্ডের ইতিহাস এবং আলেকজাণ্ডারের মৃত্যু পর্যন্ত গ্রীসের ইতিহাসের বিশেষ উল্লেখসহ প্রাচীন ইতিহাস; অগাস্টাসের মৃত্যু

পর্যন্ত রোমের ইতিহাস এবং ইহুদী জাতির ইতিহাস; (৩) গণিত ও জীববিজ্ঞান —পাটিগণিত, বীজগণিত, জ্যামিতি, সমতল ত্রিকোণমিতি, বলবিদ্যা, তরল পদার্থের স্থিতিশক্তি-বিজ্ঞান, তরল পদার্থের গতিবিজ্ঞান এবং গ্যাস বিজ্ঞান, আলোকবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা; (৪) পদার্থবিদ্যা —রসায়নবিদ্যা, প্রাণীবিদ্যা, প্রাকৃতিক ভূবিদ্যা; (৫) মনোবিজ্ঞান ও নীতি বিজ্ঞান —যুক্তিবিদ্যা, নীতিশাস্ত্র, দর্শনশাস্ত্র।'[৪] ওপরের ভাষাসমূহের মধ্যে যে-কোনো একটি ভাষায় পরীক্ষা দেবার অধিকার পরীক্ষার্থীদের ছিল। তবে তিনি কোন্ ভাষায় পরীক্ষা দিতে ইচ্ছুক, আবেদনপত্রে তা উল্লেখ করতে হ'ত।[৫]

এম. এ. পরীক্ষার্থীরা নিম্নলিখিত বিষয়গুলির মধ্যে যে-কোনো একটিতে বা একাধিক বিষয়ে পরীক্ষা দিতে পারতেন: 'ভাষা, ইতিহাস, দর্শনশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র, গণিত, প্রকৃতি-বিজ্ঞান ও পদার্থবিদ্যা।'[৬]

উচ্চশিক্ষার বিভিন্ন স্তরের উপর্যুক্ত পাঠ্যবিষয়সমূহ ইউরোপীয় শিক্ষাদর্শে নির্বাচিত করা হয়েছিল; দেশের নাড়ীর সঙ্গে তার কোনো সংযোগ ছিল না। রবীন্দ্রনাথের মতে, প্রচলিত 'শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে আমাদের নিজ দেশের বিদ্যার স্থান নাই, অথবা তার স্থান সব-পিছনে; সেইজন্য আমাদের সমস্ত শিক্ষার মধ্যে এই কথাটি প্রচ্ছন্ন থাকে যে, আমাদের নিজ দেশের বিদ্যা বলিয়া পদার্থই নাই, যদি থাকে সেটা অপদার্থ বলিলেই হয়।'[৭]

রবীন্দ্রনাথের এই অভিমতকে সমর্থন করেছেন রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী। তিনি লিখেছেন, "আমরা বিজাতীয় সমাজের সম্বন্ধে যে সংবাদ রাখি, আমাদের আত্মসমাজের সম্বন্ধে সে সংবাদ রাখা আবশ্যক বোধ করি না। ...আমাদের মধ্যে যাঁহারা অত্যন্ত গম্ভীরভাবে বৈদেশিক সমাজের ইতিবৃত্ত ও সমাজতত্ত্বের আলোচনা করেন, তাঁহারা স্বদেশের ইতিবৃত্ত ও সমাজতত্ত্বের আলোচনায় সম্পূর্ণ উদাসীন। ...বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীই তাঁহাদের ঔদাসীন্যের জন্য ও অবজ্ঞার জন্য দায়ী। যে প্রণালী জাতীয় ভাবের ভিত্তির উপর স্থাপিত নহে, তাহাতে প্রকৃত স্বজাতি-অনুরাগ ও স্বদেশ-অনুরাগ আনিতে পারে না, কেবল স্বজাতির প্রতিও একটা কৃত্রিম অন্তঃসারশূন্য মৌখিক আসক্তির ছদ্মভাব উৎপাদন করে মাত্র।"[৮]

বিদেশের অনুকরণে রচিত শিক্ষা-ব্যবস্থার সমালোচনা প্রসঙ্গে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লিখেছেন, "আমরা কালেজে যে-শিক্ষা পাই সে শিক্ষা কোন কাজেরই নহে। উহা না একমুখী শিক্ষা না সর্ব্বতোমুখী শিক্ষা। উহা যে একমুখী শিক্ষা নহে তাহা প্রমাণ করিবার প্রয়োজন নাই। কারণ উহাতে আমাদের কোন বিষয়েই সম্পূর্ণ শিক্ষা দেয় না। উহা সর্ব্বতোমুখী শিক্ষাও নহে; কারণ উহাতে

শারীরিক শিক্ষার নামও নাই। যাহাতে হৃদয়বৃত্তির উন্নতি হয় উহাতে তাহার কিছুই নাই, যাহাতে ইচ্ছাশক্তি বা কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি হয় তাহাও উহাতে নাই। উহাতে আছে শুদ্ধ কয়েকটি বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালনা তাহাও উচ্চতর বৃত্তিসমূহের নহে। প্রধানতঃ কেবল স্মরণশক্তির উন্নতির দিকেই অধিক দৃষ্টি।"[৯]

সে-কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও পরীক্ষা-পদ্ধতির সমালোচনা প্রসঙ্গে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মন্তব্য করেছেন, "শিক্ষা কোথায় যে বাঙ্গালী সন্তান শিক্ষা লাভ করিবে? উচ্চশিক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় বর্তমান; কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা দেন না, কেবল পরীক্ষা করেন এবং সেই পরীক্ষার পদ্ধতি আবার এমন যে, যে শিখিতে ব্যস্ত, তার পরীক্ষায় উদ্ধারের আশা নাই; যে মুখস্থ করে, সে-ই তরিয়া যায়। শিক্ষার ভার স্বতন্ত্র বিদ্যালয়ের হাতে; কিন্তু প্রকৃত শিক্ষাদানে প্রকৃত বিদ্যালয়ের জীবনের স্থায়িত্ব সম্ভাবনা কতটুকু, তাহা যিনি জানেন, তিনিই বুঝিবেন। বিদ্যালয় শিক্ষা দেয় না, বিদ্যালয় পরীক্ষার জন্য ছাত্র তৈয়ার করে মাত্র।"[১০]

এই শিক্ষাদর্শ রচনার পশ্চাতে সাম্রাজ্যিক স্বার্থরক্ষার প্রেরণাই ছিল মূল উৎস। এদেশের মানুষ যাতে শিক্ষালাভের দ্বারা আত্মমর্যাদা ও স্বাধিকার সম্বন্ধে সচেতন না হন, সেকারণেই শ্বেতাঙ্গ-সরকার এমন ভাবে শিক্ষা-পরিকল্পনা তৈরি করেছেন যাতে শিক্ষা কেবলমাত্র সমাজের একটা নির্দিষ্ট অংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে; শিক্ষণীয় বিষয় এমনভাবে নির্বাচিত করা হয়েছে, যাতে শিক্ষিত ব্যক্তিরা স্বদেশ ও স্বজাতি সম্পর্কে অজ্ঞ থাকেন ও গ্লানিহীন চিত্তে সাম্রাজ্যের সেবাদাস হতে পারেন এবং এমন একটি ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম রূপে গ্রহণ করা হয়েছে, যাতে শিক্ষা-সম্প্রসারণের সম্ভাবনাকে রুদ্ধ করা যায়। 'এটা স্পষ্ট যে; সামন্ততান্ত্রিক ও সনাতন সমাজ-আরোপিত সীমাবদ্ধতার মধ্যে সাম্রাজ্যিক প্রশাসনের প্রয়োজন চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে বর্তমান শিক্ষাপ্রণালী পরিকল্পিত হয়েছিল।"[১১]

ফলে উচ্চশিক্ষার প্রথম পর্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিপ্রাপ্তদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ মেকলের আশানুযায়ী সাম্রাজ্য-সেবায় মনোযোগী হয়েছেন; 'নিম্নমুখী পরিস্রুতি তত্ত্বের' সমর্থকরূপে তাঁরা জনশিক্ষার বিরোধিতা করেছেন, জনস্বার্থ-বিরোধী শিবিরে তাঁরা থেকেছেন, ব্যক্তিস্বার্থে ও শ্রেণীস্বার্থে তাঁদের শিক্ষা ব্যবহৃত হয়েছে। এসময়ে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে যে অগ্রগতি ঘটেছে, তা লক্ষ্য করলে এই সত্য উদ্ভাসিত হয়ে উঠে যে, জাতির প্রয়োজনে নয়, সরকারি প্রয়োজনে ও অভিজাত শ্রেণীর চাহিদা ও স্বার্থ অনুযায়ী উচ্চশিক্ষার উন্নতি ঘটানো হয়েছে।

তাই 'আধুনিক কালের নতুন বিদ্যার যে আবির্ভাব হ'ল তার প্রবাহ বইল না সর্বজনীন দেশের অভিমুখে। পাথরে গাঁথা কুণ্ডের মতো স্থানে স্থানে সে আবদ্ধ হয়ে রইল ; তীর্থের পাণ্ডাকে দর্শনী দিয়ে দূর থেকে এসে গণ্ডুষ ভর্তি করতে হয়, নানা নিয়মে তার আট-ঘাট বাঁধা'[১২]

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে অর্থনৈতিক নিয়মানুসারে মধ্যবিত্তশ্রেণীর বিকাশ ঘটছিল। তাঁরাও ইংরেজি-শিক্ষা গ্রহণে আগ্রহী হয়েছিলেন। উচ্চ-শিক্ষার ভাষা-মাধ্যম নীতি সংকীর্ণ হলেও এণ্ট্রান্স ও বি. এ. স্তরে মাতৃভাষার মাধ্যমে পরীক্ষা দেবার সুযোগ থাকায় শিক্ষা-সম্প্রসারণের সম্ভাবনা ছিল। সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও উচ্চশিক্ষা ক্রমেই সম্প্রসারিত হওয়ায় বৃটিশ-শাসকদের টনক নড়েছিল। শিক্ষাবিস্তারের কোনো উদারনৈতিক মনোভাব তাঁদের ছিল না। তাঁরা শিক্ষাকে একটা গোষ্ঠীর মধ্যে আবদ্ধ রাখতে সচেষ্ট ছিলেন। ১৮৫৪ সালের উডের সুপারিশ অনুসারে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে মাতৃভাষা কিংবা পাঠ্য তালিকাভুক্ত যে কোনো ভারতীয়ভাষার মাধ্যমে যে-শিক্ষার সুযোগ তাঁরা দিয়েছিলেন, দু'বছর পরে ১৮৫৯ সনে তাঁরা সে-সুবিধা প্রত্যাহার করে নিলেন। সংশোধিত নিয়মানুযায়ী কেবলমাত্র ইংরেজিভাষার মাধ্যমে পরীক্ষা দেওয়া বাধ্যতামূলক করা হ'ল ; ইংরেজিভাষার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হ'ল উচ্চশিক্ষা। এখন থেকে 'পরিবর্তিত নিয়মানুসারে প্রতিটি শাখাতেই অন্যরকম নির্দেশ না থাকলে কেবলমাত্র ইংরেজিতেই উত্তর লিখতে হবে।'[১৩]

কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়-কর্তৃপক্ষের ভাষা-নীতি সংবাদপত্র কর্তৃক সমালোচিত হয়েছিল। 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকা সম্পাদকীয় স্তম্ভে মন্তব্য করেছেন (১১. ২. ১৮৬০), "আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের সুবিজ্ঞ অধ্যক্ষ মহাশয়েরা নিয়ম করিয়াছেন, ছাত্রদিগকে দুইটি ভাষায় পরীক্ষা দিতে হইবে। ইঙ্গরেজী ভাষাই পরীক্ষার প্রধান অঙ্গ। ইহা না হইলে চলিবে না। তাহার সঙ্গে অন্য কোন একটি ভাষার আবশ্যক। তাঁহাদের নিয়মানুসারে সকল ছাত্রেরাই অগ্রে কেবল ইঙ্গরেজী ভাষায় নৈপুণ্য লাভ করিতে অগ্রসর হয় দেশীয় ভাষার প্রতি তাহাদের আর তাদৃশ মনোযোগ থাকে না। অতএব যাহাতে দেশীয় ভাষার কোন প্রকারে অবনতি না হইয়া উন্নতি হয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষগণের সে বিষয়ে মনোযোগ করা নিতান্ত কর্ত্তব্য।" সুতরাং পত্রিকার মতে "দেশীয় ভাষার উন্নতি সাধন গবর্ণমেণ্টের ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অগ্রে কর্ত্তব্য। ইঙ্গরেজী ভাষা ও আমাদের সংস্কৃত ভাষার যেরূপ উপাধি পরীক্ষা ও উপাধি গ্রহণের রীতি আছে, আমাদের মতে বাঙ্গালা ভাষাতেও সেইরূপ রীতি

প্রচারিত করা অতি আবশ্যক। বাঙ্গালা ভাষার স্বতন্ত্র রূপে উপাধি পরীক্ষার রীতি প্রচারিত হইলে বড় এক দেশের মঙ্গল সাধনের উপায় হয়। ... অতএব আমাদের কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ মহাশয়েরা যদি বিবেচনাপূর্ব্বক বাঙ্গালা ভাষার উপাধি পরীক্ষার নিয়ম প্রচার করেন তাহা হইলে অতি শীঘ্রই বাঙ্গালা ভাষার উন্নতি হইয়া উঠিবে।”[১৪]

প্রায় এক'শ বছর পর্যন্ত এই ভাষানীতি অনুসৃত হওয়ায় একদিকে যেমন উচ্চশিক্ষার জগতে অনুত্তীর্ণের সংখ্যা ক্রমেই বেড়েছে, অন্যদিকে তেমনি ইংরেজি ভাষায় শিক্ষিত ব্যক্তিরা চাকরির উঁচু পদগুলি লাভ করেছেন, সমাজে তাঁদের আধিপত্য বিস্তৃত হয়েছে। ফলে সমগ্র দেশ দু'টি শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। 'এভাবে ইংরেজি ব্যবহারের দ্বারা জনসাধারণ দু'টি জাতিতে পরিণত হয়েছে; মুষ্টিমেয় একদল যাঁরা শাসন করেন এবং বৃহৎসংখ্যক অন্য দল যাঁরা শাসিত হচ্ছেন। একদল অন্যদলের ভাষায় কথা বলতে পারেন না বলে পরস্পরকে বোঝেন না।'[১৫] একই ভূখণ্ডে বসবাস করলেও তাঁরা ছিলেন দু'টি বিচ্ছিন্ন দ্বীপের অধিবাসীদের মতো। গায়ের রংয়ের মিল থাকলেও চিন্তা-ভাবনায় ও ধ্যান-ধারণায় তাঁদের মধ্যে কোনো মিল ছিল না। ইংরেজিভাষা-শিক্ষার দৌলতে একদল ঈশ্বরের বরপুত্র বলে নিজেদের মনে করতেন; আর সংখ্যাগরিষ্ঠ অনুত্তীর্ণরা নিজেদের ভাগ্যকে দায়ী করেছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে স্বল্পসংখ্যক ব্যক্তি সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন এবং বৃহৎসংখ্যক শিক্ষার্থী অনুত্তীর্ণ হয়ে সমাজের বোঝা বাড়িয়েছেন— বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে এই দু'শ্রেণীর মনোভাবের সার্থক অভিব্যক্তি ঘটেছে রামেন্দ্রসুন্দরের লেখনীতে—“বিশ্ববিদ্যালয় জন্তুটা কিরূপ, বুঝিবার একবার চেষ্টা করা উচিত। কেহ বলেন, উহা মাংসাশী, উহা কেবল বালকবৃন্দের রক্ত খায় ও হাড় চিবায়; কেহ বা বলেন—না, উহা উদ্ভিজ্জাশী ও তৃণভোজী, উহার বাঁটে দুধ পাওয়া যায়, উহার শিঙে ভেঁপু হয় ও উহার হাড়ে আত্মারাম সরকারের প্রেতপুরুষ চমকিত হয়।”[১৬] তবে ইংরেজিভাষায় পরীক্ষা দিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ বিশ্ববিদ্যালয়ের 'মাংসাশী' চরিত্রটাই উপলব্ধি করেছেন, আর কমসংখ্যক সৌভাগ্যবান ছাত্র 'বাঁটে দুধ'-এর সন্ধান পেয়েছেন।

ইংরেজিভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের যে-পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হ'ল, তাতে মানবশক্তির বিপুল অপচয় ঘটল। বিভিন্ন স্তরের পরীক্ষায়উত্তীর্ণ-সংখ্যার তুলনায় অনুত্তীর্ণরাই সংখ্যায় ভারী হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাব্যবস্থাকে পঙ্গু করে রেখেছিল। বি. এ. এবং এম. এ. পরীক্ষার ফল বিশ্লেষণ করলে এই বক্তব্যের

সততা উপলব্ধি করা যাবে :

বি. এ.

সন	পরীক্ষার্থী-সংখ্যা	উত্তীর্ণ-সংখ্যা	অনুপস্থিতি সহ অনুত্তীর্ণ সংখ্যা
১৮৫৮	১৩	২	১১
১৮৫৯	২০	১০	১০
১৮৬০	৬৫	১৩	৫২
১৮৬১	৩৯	১৫	২৪
১৮৬২	৩৪	২৪	১০
১৮৬৩	৩৫	২৫	১০
১৮৬৪	৬৬	৩০	৩৬
১৮৬৫	৮২	৪৫	৩৭
১৮৬৬	১২২	৭৯	৪৩
১৮৬৭	১৪১	৬০	৮১
মোট	৬১৭	৩০৩	৩১৪

এম. এ.

সন	পরীক্ষার্থী-সংখ্যা	উত্তীর্ণ-সংখ্যা	অনুপস্থিতি সহ অনুত্তীর্ণ সংখ্যা
১৮৬১	১	×	২
১৮৬২	৩	×	৩
১৮৬৩	৭	৬	১
১৮৬৪	৮	৩	৫
১৮৬৫	১৫	১১	৪
১৮৬৬	১৮	১৫	৩
১৮৬৭	৩৯	২২	১৭
১৮৬৮	২৫	১৫	১০
১৮৬৯	২৯	১৮	১১
১৮৭০	৩২	২৪	৮
মোট	১৭৭	১১৪	৬৩

দশ বছরে বি. এ.র মোট পরীক্ষার্থী ৬১৭ জনের মধ্যে উত্তীর্ণ হয়েছেন ৩০৩ জন। অর্থাৎ অনুত্তীর্ণদের পাল্লা ভারী। তাও আবার প্রথম বছরে ১৩ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে মাত্র ২ জন উত্তীর্ণ হয়েছেন। উত্তীর্ণদের নাম হ'ল বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং যদুনাথ বসু। কিন্তু তাঁরা প্রকৃতপক্ষে পরীক্ষায় সাফল্য অর্জন করতে পারেননি। বিশ্ববিদ্যালয়-কর্তৃপক্ষের সদয় দাক্ষিণ্যে তাঁরা বি. এ. ডিগ্রি লাভে সক্ষম হয়েছিলেন। ৭ নম্বর 'Special Grace' দিয়ে বি. এ. ডিগ্রির খোঁড়া পায়ে যাত্রা শুরু হয়েছিল (আজও সেই খোঁড়া পা সুস্থ হয়নি। কেবলমাত্র নাম পাল্টেছে। এখন 'Grace'-এর পরিবর্তে নাম দেওয়া হয়েছে 'Award')। বি. এ.র মতো এম. এ. পরীক্ষার দশ বছরের ফল হতাশাজনক না হলেও প্রথম দু'বছরে একজনও উত্তীর্ণ হতে পারেননি। তাছাড়া অনুমান করতে কষ্ট হয় না, বি. এ. পরীক্ষার ন্যায় এম. এ. পরীক্ষাতেও বিশ্ববিদ্যালয়-কর্তৃপক্ষের আশীর্বাদ বর্ষিত হয়েছিল।

পরবর্তীকালে বিভিন্ন স্তরের পরীক্ষাগুলিতেও একই চিত্র পাওয়া যায়—উত্তীর্ণদের তুলনায় অনুত্তীর্ণরা সংখ্যায় বিপুল। নীচের সারণী [১৭] তারই সাক্ষ্য বহন করছে :

পরীক্ষা	পরীক্ষার্থী-সংখ্যা	উত্তীর্ণ সংখ্যা	অনুপস্থিতি সহ অনুত্তীর্ণ সংখ্যা
এণ্ট্রান্স (১৮৫৭-৮৬)	১,৬০,৩৪৬	২,৬৫৫৪	১,৩৩,৭৯২
এফ. এ. (১৮৬১-৮৬)	১৮,০৩৪	৭,৪০১	১০,৬৩৩
বি. এ. (১৮৫৮-৮৬)	৬,৯০৬	৩,১২৯	৩,৭৭৭
এম. এ. (১৮৬১-৮৬)	১,০৮৮	৬৫৭	৪৩১

ওপরের সারণী থেকে আর-একটি চিত্রও পাওয়া যায়—তা হ'ল উচ্চশিক্ষার প্রত্যেকটি স্তরে পরীক্ষার্থীদের ক্রমিক সংখ্যা হ্রাস। এণ্ট্রান্সের তুলনায় এফ. এ.র পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৮৮.৭৬% ভাগ কমেছে; বি. এ. স্তরে সংখ্যাহ্রাস ঘটেছে ৬২.৭৬% এবং এম. এ. তো খুবই কম। উচ্চশিক্ষার প্রারম্ভকাল থেকে আজ পর্যন্ত সংখ্যাহ্রাসের ব্যাধি তার নিত্য সঙ্গী। কিন্তু কেন? উত্তরে বলা যায়, মাধ্যমিক শিক্ষার পরে উচ্চতর শিক্ষা-লাভের জন্য সাধারণ মধ্যবিত্তের সাধ থাকলেও ব্যয় বহন করার সাধ্য ছিল না (এবং আজও নেই)। তাঁরা কষ্ট-সাধ্য প্রয়াসে কোনোরকমে তাঁদের ছেলেদের এণ্টান্স পর্যন্ত পড়াতে সক্ষম হন এবং তারপরে অর্থনৈতিক কারণে সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ পিছু হঠে যান। এফ. এ. স্তরে যাঁদের ছেলেরা টিকে থাকেন, পরীক্ষায় কৃতকার্য হলেও কেবলমাত্র সংখ্যা-

লঘিষ্ঠ অংশ বি. এ.-তে ভর্তি হতে সক্ষম হয়। বি. এ. স্তরেও একই ঘটনা ঘটে। তাছাড়া অনেকে বাধ্য হয়ে যে কোনো ধরণের একটা চাকরি নিয়ে ছাত্রজীবনের পরিসমাপ্তি ঘটায়। এভাবে উচ্চতর শিক্ষা ক্রমেই উচ্চবিত্তশ্রেণীর মধ্যে কেন্দ্রীভূত হয় আর জনসমাজের বৃহত্তম অংশ শিক্ষালাভের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন। ক্রমেই 'শিক্ষাটা হয়ে উঠল মুষ্টিমেয়ের একচেটিয়া অধিকার যার সামান্যতম স্পর্শও জনসাধারণ পেলেন না।'[১৮]

পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণদের সংখ্যাবৃদ্ধি উনিশ শতকের শেষে এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, প্রথম ভারতীয় উপাচার্য স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর প্রথম সমাবর্তন-ভাষণে (১৮৯০ খৃঃ.) এই বিষয়টি উল্লেখ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। তিনি বলেছেন, "মাত্র কিছুদিন পূর্বেও আমাদের পরীক্ষাসমূহে অনুত্তীর্ণদের শতকরা সংখ্যা ছিল ৪০ থেকে ৬০, যা লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার সঙ্গে তুলনীয়। সেটাই ছিল আমাদের আদর্শ। গত বৎসরের পরীক্ষাগুলিতে দেখা যায়, প্রবেশিকা পরীক্ষায় ব্যর্থতা শতকরা ৭০ ভাগের বেশি এবং সব পরীক্ষাতেই তা বেশি ছিল। এত বেশি অনুত্তীর্ণের সংখ্যা —সময়, অর্থ ও শক্তির অপব্যয় নির্দেশক। সম্ভব হলে এই অপচয় বিশ্ববিদ্যালয়কে বন্ধ করতে হবে।[১৯] সুতরাং প্রতিষেধক ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য তদন্ত কমিটি গঠন করা হ'ল। ব্যাপক হারে ফেল করার কারণ অনুসন্ধান করে বলা হ'ল :

(১) স্কুল-কলেজগুলি 'inconveniently large size.'

(২) বক্তৃতার মাধ্যমে শিক্ষাদান করা হয় এবং টিউটোরিয়াল ক্লাস অবহেলিত হয়।

(৩) পাঠ্যসূচী এত ব্যাপক যে, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ফলপ্রসূ শিক্ষাদান কিংবা বুদ্ধিদীপ্ত আলোচনা সম্ভব নয়।

তদন্তের ফলাফল উল্লেখ করে স্যার গুরুদাস পুনরায় সমাবর্তন-ভাষণে (১৮৯২ খৃঃ.) বলেছেন; "শিক্ষক ও অধ্যাপকেরা দায়সারা ভাবে কেবলমাত্র উপরটুকুই মন্থন করে থাকেন এবং সময়াভাবে সাহিত্য ও বিজ্ঞানের গভীরে গিয়ে অন্তর্নিহিত সত্যকে উদ্ভাবনের দ্বারা ছাত্রদের মনে প্রভাব-বিস্তারে তাঁরা অক্ষম হন। অন্যদিকে অধিকাংশ ছাত্র পাঠ্যপুস্তকের বোঝার ভারে এত বেশি ভারাক্রান্ত বোধ করেন যে, তাঁরা তাঁদের সৃষ্টিশীল ক্ষমতা ব্যবহারের সুযোগ পান না এবং শিক্ষার আনন্দ উপভোগ করার ক্ষমতা তাঁদের খুব কমই থাকে।"[২০] ভাষণে তিনি আরো বলেছেন যে, এমন সব বিষয়ে প্রশ্ন করা হয় যা পরীক্ষার হলের

বাইরে বৃহত্তর জীবনের ক্ষেত্রে কোনো প্রয়োজন হয় না। বিষয়-সূচীর বাইরে এবং গুরুত্বহীন বিষয়ে ছাত্র-ঠকানো প্রশ্ন তৈরি করার অভিযোগ উত্থাপন করেছেন উপাচার্য আলফ্রেড ক্রফ্‌ট্‌ তাঁর সমাবর্তন-ভাষণে (১৮৯৬ খৃ:.), "নির্দিষ্ট পাঠ্য-সূচীর বাইরে থেকে প্রশ্ন দেওয়া হয় ; সেজন্য পাঠ্যবস্তুর অপ্রয়োজনীয় অংশেও অত্যধিক মনোযোগ দিতে হয়।"[২১]

সুতরাং পাঠ্যপুস্তকের বোঝায় পীড়িত পরীক্ষার্থী বিদেশী ভাষার মাধ্যমে পরীক্ষা-পাশের জন্য ঝাড়াই-বাছাই করে 'ভেরি ভেরি ইম্পর্‌টেন্ট' প্রশ্ন মুখস্থ করেন। একাজে তাঁর একমাত্র সহায়ক হ'ল বাজারের নোট বই। তার ফলে সাধারণ মেধাসম্পন্ন অধিকাংশ ছাত্র কিছুই শেখেন না। চাকরির জন্য বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কাছ থেকে সার্টিফিকেট সংগ্রহের আশায় তাঁরা নোটবই মুখস্থ করে পরীক্ষা-পাশের চেষ্টায় প্রয়াসী হন। ষাট বছরের বিশ্ববিদ্যালয়-শিক্ষার মূল্যায়ন করতে গিয়ে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী গভীর ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেছেন, "ইংরাজী শিক্ষা ষাটি বৎসরে আমাদের দেশে ফলে নাই। বৎসর বৎসর আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিদানকালে প্রতিনিধি চ্যান্সেলারের মুখে এই আক্ষেপই শুনা যায়। আমাদের জ্ঞানার্জ্জনে মতিগতি হইল না, জ্ঞান-রসের প্রতি আমাদের তৃষ্ণা জন্মিল না। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি বৎসর বৎসর হাজার দরুনে গ্রাজুয়েট সৃষ্টি করিতেছেন, কিন্তু একজনও একখান লাঙল আনিয়া জ্ঞানরাজ্যের এক ছটাক জমিতে চাষ দিল না।"[২২] 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকা লিখেছেন (জানুয়ারি ১৮৭৬ খৃ:.), "কলেজ ও স্কুলে যেরূপ শিক্ষাপ্রণালী ব্যবহৃত হইতেছে তাহা কেবল স্মরণশক্তির উন্নতিসাধন পক্ষে বিশেষ অনুকূল, বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালনা ও উন্নতি সাধনের প্রতি তত অনুকূল নহে।"[২৩]

জ্ঞানার্জনের নামে এই অদ্ভুত প্রহসন লক্ষ্য করে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "ভাষা আয়ত্ত হয় না বলিয়া গোটা ইংরেজি বই মুখস্থ করা ছাড়া উপায় থাকে না। অসামান্য স্মৃতিশক্তির জোরে যে ভাগ্যবানরা এমনতরো কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড করিতে পারে তারা শেষপর্যন্ত উদ্ধার পাইয়া যায়, কিন্তু যাদের মেধা সাধারণ মানুষের মাপে প্রমাণ সই তাদের কাছে এতটা আশা করা যায় না। তারা এই রুদ্ধ ভাষার ফাঁকের মধ্য দিয়া গলিয়া পার হইতেও পারে না, ডিঙাইয়া পার হওয়াও তাদের পক্ষে অসাধ্য।"[২৪] তবুও তাঁরা ইংরেজি-কলার ভেলায় পরীক্ষা-সমুদ্র পার হবার চেষ্টা করেন। ফল হয় ভয়ঙ্কর —সময়, অর্থ ও জীবনীশক্তির অপব্যয় ঘটে। কবিগুরু অন্যত্রও বলেছেন, "পরের ভাষায় গ্রহণ করাও শক্ত, প্রকাশ করাও কঠিন। এইরূপে রচনা করিবার চর্চা না থাকাতে যাহ শিক্ষি

তাহাতে আমাদের অধিকার দৃঢ় হইতেই পারে না। Key মুখস্থ করিয়া, শেখা এবং লেখা দুয়ের কাজ চালাইয়া দিতে হয়।"[২৫]

নোট মুখস্থ করে কোনরকমে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেও তাঁদের জ্ঞানভাণ্ডারে কিছু সঞ্চিত হয় না। রাজনারায়ণ বসুও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাব্যবস্থার সমালোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন, "এই কী মুখস্থ করা বহুল অনিষ্টের কারণ হইয়াছে। আমি বলি, বরং বিদ্যামন্দিরে সিঁদ কেটে ঢুকা ভাল, তবু এইরূপ চাবি দিয়া তাহার দ্বারা খোলা কর্ত্তব্য নয়। ছেলেরা যাহা কীতে আছে, তাহাই অবিকল মুখস্থ করে। পরীক্ষা দিয়া আসিয়া দেখে, যাহা লিখিয়াছে, তাহা কী-র সহিত মিলিয়াছে কি না? একবার এক বালক এইরূপে মিলাইবার সময় দেখিল, একটা "The" ভুল গিয়াছে, তাহার জন্য মহা দুঃখিত। ভূগোল গ্রন্থে অনেক সমান বর্ণনা থাকে বলিয়া Ditto শব্দ লিখিত থাকে। একবার প্রবেশিকা পরীক্ষার সময়, যাহার Ditto সে বিষয় লইয়া প্রশ্ন দেওয়া হয় নাই; কিন্তু যে বিশেষ তত্ত্বটির পার্শ্বে Ditto লিখিত আছে, কেবল সেই তত্ত্ব সম্বন্ধীয় প্রশ্ন দেওয়া হইয়াছিল। ইহাতে একটি বালক Ditto এই উত্তর লিখিয়াছিল। আমাদিগের দেশের একজন প্রধান ব্যক্তি বলেন যে, ছেলেরা পরীক্ষা দিয়া আইসে না, বমি করিয়া আইসে। কথাটি শুনিতে কিছু অশ্লীল, কিন্তু বস্তুতঃ ঠিক্।"[২৬]

এভাবে যাঁরা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন, ইংরেজিভাষায় তাঁদের দক্ষতা ও মাতৃভাষায় তাঁদের জ্ঞান সম্বন্ধে 'সম্বাদ ভাস্কর' পত্রিকা লিখেছেন (১৫ জানুয়ারি, ১৮৫৬ খৃঃ.), "যাঁহারদিগের পিতা মাতার কিঞ্চিৎ সম্পত্তি ছিল তাঁহারা ইজার, চাপকান, চেইন, ঘড়ী, শাল, পাগড়ী দেখাইতে সভায় ২ যান কিন্তু ইংরাজী ভাষায় তাদৃশ বক্তৃতাও করিতে পারেন না, …তাঁহারা কি ইংরাজ কি বাঙ্গালি হিন্দু মোগলাদি কোন শ্রেণীতেই মিশ্রিত হন না, যেন স্বতন্ত্র এক শ্রেণী হইয়া রহিয়াছেন, এইক্ষণে যাঁহারা অপর ভাষার দাসত্ব করিতেছেন তাঁহারা কি কর্ম্মের উপযুক্ত হইবেন তাহা ভাবিয়া স্থির করা যায় না, ইংরাজী ভাষায় তাদৃশ পারদর্শী হইলেন না সুতরাং ইংরাজেরা কোন উত্তম কর্ম্মে ডাকিবেন না, বাঙ্গালা ভাষার "ব"ও জানেন না তাহাতেই বা কি কর্ম্ম করিবেন।"[২৭]

পরীক্ষা-ব্যবস্থার এই ত্রুটির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে Indian Universities Commission (১৯০২ সালে গঠিত) তাঁদের প্রতিবেদনে বলেছেন, "ছাত্ররা সে-সব বক্তৃতাকেই সবচেয়ে বেশি মূল্য দেন, যে-বিষয়গুলি পরীক্ষার দিকে দৃষ্টি রেখে নির্বাচিত করা হয় এবং যা থেকে পরীক্ষকদের প্রশ্ন দেবার

সম্ভাবনা থাকে। আর সেই বইগুলি তাঁরা খুব যত্ন করে পড়েন, যেগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্ধারিত পাঠ্যপুস্তক নয়, বরং সেগুলি হ'ল পরীক্ষার দিকে দৃষ্টি রেখে রচিত সংক্ষিপ্তসার ও সহায়কগ্রন্থ, যাতে মূল গ্রন্থের নীরস রেখাচিত্রটি সহ গ্রন্থাংশ ও বিশিষ্টার্থক শব্দসমষ্টির টীকা দেওয়া হয়। আমাদের মনে হয় যে, সহায়ক পুস্তক ব্যবহারে নিরুৎসাহিত করার জন্য কলেজ কর্তৃপক্ষকে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে এবং আমরা আশা করি, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যবইয়ের সহায়ক গ্রন্থ রচনার মতো নিন্দনীয় ব্যবস্থার সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করবেন না।"[২৮] প্রশ্ন তৈরি করা সম্পর্কে তাঁরা বলেছেন, "প্রশ্নপত্র রচনার পদ্ধতিকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে পরিবর্তন করতে হবে, যাতে মুখস্থের বদলে যত্ন করে পড়তে হয়। এই উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য শ্রেষ্ঠ উপায় হ'ল সহজ প্রশ্ন।"[২৯]

অনুত্তীর্ণদের সংখ্যাবৃদ্ধির বিভিন্ন কারণ উল্লেখ করা হলেও এবং প্রতিষেধক ব্যবস্থা হিসাবে নানাবিধ দাওয়াই বাতলানো হলেও সরকারি কর্তাব্যক্তিদের মধ্যে কেউই ভাষা-মাধ্যম নীতিকে দায়ি করেননি। এমন কি এবিষয়ে কোনো প্রশ্নও উথাপিত হয়নি। অথচ পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের সংখ্যাবৃদ্ধির জন্য একমাত্র প্রয়োজন ছিল মাতৃভাষায় শিক্ষাদান। কিন্তু 'তাহা না হইয়া এক অতি কঠিন অতি দূরবর্তী জাতির ভাষায় আমরা শিক্ষা পাই। শুদ্ধ সেই ভাষাটি মোটামুটি শিখিতে রোজ চারি ঘণ্টা করিয়া অন্ততঃ আট দশ বৎসর লাগে। ভাষা শিক্ষাটি অথচ কিছুই নহে, ভাষাশিক্ষা কেবল অন্য ভাল জিনিস শিখিবার উপায় —উহাতে শিখিবার পথ পরিষ্কার হয় মাত্র—সেই পথ পরিষ্কার হইতে এত সময় ব্যয় ও এত পরিশ্রম। তবুও কি সে ভাষা বুঝা যায়? তাহার যো কি? বাঙ্গালা হইলে এই কেতাবী জিনিসই আমরা কত অধিক পরিমাণে শিখিতাম। ইংরেজীতে আমরা কথন কথা কহি না। এথন আমরা ইংরেজীতে চিঠিপত্রও বড় লিখি না অথচ আমাদের জ্ঞান উপার্জ্জনের একমাত্র দ্বার ইংরেজী। ইংরেজী আমাদের রাজভাষা। যাঁহারা ইংরেজের সংসর্গে আসিবেন তাঁহাদের ইংরেজী শিক্ষার প্রয়োজন। তাই বলিয়া ছয় কোটী ছেষট্টি লক্ষ লোক ইংরেজী পড়িয়া মরিবে কেন? বলিবে, ইংরেজ যখন রাজা সকলেই কোন না কোন সময়ে ইংরেজের সংসর্গে আসিবেন। স্বীকার। ইংরেজী ভাষা শিক্ষা কর ভাল করিয়াই শিক্ষা কর। ইংরেজীতে অঙ্ক কসিতে হইবে, ইতিহাস পড়িতে হইবে, বিজ্ঞান শিখিতে হইবে ইহার অর্থ কি? বাঙ্গালা দিয়া ইংরেজী শিখ না কেন? ইংরেজি দিয়া শাস্ত্র শিখিতে যাও কেন?[৩০]

ইংরেজ-নকলনবীশদের যুগে ১৮৭৩ সালে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এই দুঃসাহসিক প্রশ্ন উত্থাপন করলেও কেউই উত্তর দিলেন না। ১৮৮২ সালে গঠিত Indian Education Commission ভাষা-মাধ্যম বিষয়ে কোনো সুস্পষ্ট নির্দেশ-দানে অক্ষম হলেন। বিদ্যালয়-স্তরে শিক্ষার মাধ্যম-রূপে মাতৃভাষাকে স্বীকৃতিদানের পরিবর্তে ইংরেজিভাষার পক্ষে তাঁদের সহানুভূতি ছিল। ১৮৫৪ খৃঃ. থেকে ১৯০২ খৃষ্টাব্দের মধ্যবর্তীকালে 'কলেজ-স্তরে শিক্ষার বাহনের সমস্যাটি সে-সময়ে কখনো ওঠেনি, যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চপদস্থ বিভাগীয় কর্মচারিদেরই প্রাধান্য ছিল এবং তাঁদের মত ছিল যে, ভারতীয় ভাষাগুলি বিশ্ববিদ্যালয়-পর্যায়ে অধ্যয়নের উপযুক্ত নয়। কাজে একথা বলাই বাহুল্য যে কলেজ-স্তরে ভারতীয় ভাষা-শিক্ষার কোনো ঠাঁই তখন ছিল না।'[৩১] অতএব বিদেশী ভাষার খড়্গাঘাতে পরীক্ষার্থীদের শিরচ্ছেদ ঘটতে থাকল। স্বাধীন ভারতেও তা বন্ধ হ'ল না।

অষ্টম অধ্যায়

মাতৃভাষা বিনে পূরে কি আশা

ইংরেজ-দাসত্ব ও ইংরেজি-আনুগত্য দেশের শিক্ষিত-সম্প্রদায়কে এমন ভাবে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল যে, তাঁদের পোশাকে, আচরণে, ভাষায় কোথাও ভারতীয়ত্বের পরিচয় ছিল না। ইংরেজদের সন্তোষ-উৎপাদনার্থে শয়নে-স্বপনে, চলনে-বলনে তাঁরা পুরোপুরি ইংরেজ হবার চেষ্টা করেছিলেন। ইংরেজ-চরণে দেহ-মন সমর্পিলু নকল ইংরেজদের ব্যঙ্গাত্মক চিত্র এঁকেছেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়,

"আমরা বাংলা গিয়েছি ভুলি,
আমরা শিখেছি বিলিতি বুলি,
আমরা চাকরকে ডাকি "বেয়ারা"—আর
মুটেদের ডাকি "কুলি"।
"রাম" "কালীপদ" "হরিচরণ"
নাম এ সব সেকেলে ধরণ ;
তাই নিজেদের সব "ডে" "রে" ও "মিটার"
করিয়াছি নামকরণ ; ...
আমরা বিলিতি ধরণে হাসি,
আমরা ফরাসি ধরণে কাশি,
আমরা পা ফাঁক করিয়া সিগারেট খেতে
বড্ডই ভালবাসি। ...
আমরা সাহেবী রকমে হাঁটি,
স্পীচ দেই ইংরিজি খাঁটি ;
কিন্তু বিপদেতে দেই বাঙালিরই মত
চম্পট পরিপাটি।"[১]

শিক্ষিতশ্রেণীর ইংরেজ-ভজনার চিত্র সার্থকভাবে বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনীতে উদ্ভাসিত হয়েছে।

"হে ইংরাজ! আমি তোমাকে প্রণাম করি।...

তুমি হর্ত্তা —শত্রুদলের; তুমি কর্ত্তা —আইনাদির; তুমি বিধাতা —চাকরি প্রভৃতির। অতএব হে ইংরাজ! আমি তোমাকে প্রণাম করি।...

হে বরদ! আমাকে বর দাও। আমি শামলা মাথায় বাঁধিয়া তোমার পিছু পিছু বেড়াইব —তুমি আমাকে চাকরি দাও। আমি তোমাকে প্রণাম করি।

হে শুভঙ্কর! আমার শুভ কর। আমি তোমার খোশামোদ করিব, তোমার প্রিয় কথা কহিব, তোমার মনরাখা কাজ করিব —আমায় বড় কর, আমি তোমাকে প্রণাম করি।

হে মানদ! আমায় টাইটল দাও, খেতাব দাও, খেলাত দাও; —আমাকে তোমার প্রসাদ দাও —আমি তোমাকে প্রণাম করি।...

হে মিষ্টভাষিণ্! আমি মাতৃভাষা ত্যাগ করিয়া তোমার ভাষা কহিব; পৈতৃক ধর্ম্ম ছাড়িয়া ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বন করিব; বাবু নাম ঘুচাইয়া মিষ্টর লেখাইব; তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও। আমি তোমাকে প্রণাম করি।....

হে সর্ব্বদ! আমাকে ধন দাও, মান দাও, যশঃ দাও; —আমার সর্ব্ববাসনা সিদ্ধ কর। আমাকে বড় চাকরি দাও, রাজা কর, রায়বাহাদুর কর, কৌন্সিলের মেম্বর কর, আমি তোমাকে প্রণাম করি।"[২]

ইংরেজি-শিক্ষিত বাঙ্গালিদের বাংলা ভাষার প্রতি অবজ্ঞা-করুণা প্রদর্শন বঙ্কিমচন্দ্রকে উত্তেজিত করেছিল। 'বাঙ্গালা সাহিত্যের আদর' শীর্ষক রচনায় তিনি শ্লেষ-বিদ্রূপের কষাঘাতে তাঁদের জর্জরিত করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টিতে তাঁরা 'পরভাষাপারদর্শী, মাতৃভাষাবিরোধী' ও 'মাতৃভাষায় বাক্যালাপে অসমর্থ'[৩] ছিলেন। বিভিন্ন সভায়-সম্মেলনে-অধিবেশনে তাঁরা ইংরেজিতে বক্তৃতা করতেন এবং ইংরেজিতে প্রস্তাব গ্রহণ করতেন। তাঁদের বক্তৃতাগুলি 'অতি অল্প লোকে শুনে, অতি অল্প লোকে পড়ে, আর অতি অল্প লোকে বুঝে।'[৪] এভাবেই তাঁরা মাতৃভাষা পরিত্যাগ করে মাতৃভূমি-উদ্ধারের স্বপ্ন দেখেছেন। এঁদের চরিত্র-চিত্রণে বঙ্কিমচন্দ্র অতিরঞ্জন করেননি। কারণ ইতিহাস বলে, 'অধিকাংশ শিক্ষিত ব্যক্তি সহজেই আরামপ্রদ সরকারি চাকরি পেতেন এবং জনগণকে শিক্ষিত করার চেয়ে তাঁদের নিজেদের ভবিষ্যৎ উন্নতির জন্য সচেষ্ট হতেন।'[৫]

এই নয়া শিক্ষাব্যবস্থা ভারতের জনসমাজকে দু'টি স্বতন্ত্র শ্রেণীতে বিভক্ত করেছিল —একটি সংখ্যালঘিষ্ঠ দল যাঁরা উচ্চশিক্ষিত ও অভিজাত-উচ্চশ্রেণীভুক্ত

এবং শহরের অধিবাসী ; অন্যদিকে সংখ্যাগরিষ্ঠ হ'ল যাঁরা প্রায়ই অশিক্ষিত ও নীচু জাতের এবং গ্রামে বাস করেন।[৬] তাঁদের জন্য শিক্ষিত ব্যক্তিদের কোনো মাথাব্যথা ছিল না। কেবলমাত্র মাথায় কাঁঠাল ভাঙার প্রয়োজন দেখা দিলে তাঁদের কথা বক্তৃতার-ভাষণে উচ্চারিত হ'ত। এমনকি ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হলেও এই অবস্থার কোনো পরিবর্তন ঘটেনি।

জমিদার-মধ্যশ্রেণী থেকে উদ্ভূত কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ তাঁদের শ্রেণীগত দাবি-দাওয়া ইংরেজিতে উত্থাপন করেছেন। তাঁরা অর্থনৈতিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যসহ বিভিন্ন সমস্যার প্রতিকারের জন্য ইংরেজিতে ইংরেজদের কাছে আবেদন জানিয়েছেন, মাতৃভাষায় দেশের জনগণের কাছে নয়। কলকাতা-অধিবেশনে (১৮৯৬ খৃঃ) কংগ্রেস-সভাপতি রহমতুল্লা সিয়ানী ভাষণ-প্রসঙ্গে বলেছেন, "আমাদের কাজ হ'ল, আমাদের ন্যায্য চাহিদাগুলি ও রাজনৈতিক অসহায়তার কথা সরকারের গোচরে আনা।"[৭] শ্রেণীস্বার্থ পূরণের দাবিতে তাঁরা সরব হলেও তৎকালীন শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে কোনো উচ্চবাচ্য করেননি—মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের দাবি উত্থাপন করা তো দূরের কথা, স্বপ্ন দেখার ক্ষমতাও তাঁদের ছিল না।

অথচ সে-সময়ে বঙ্কিমচন্দ্র সকল-ইংরেজদের সতর্ক করে বলেছেন, "আমরা যত ইংরাজী পড়ি, যত ইংরাজী কহি বা যত ইংরাজী লিখি না কেন, ইংরাজী কেবল আমাদিগের মৃত সিংহের চর্মস্বরূপ হইবে মাত্র। ডাক ডাকিবার সময়ে ধরা পড়িব। পাঁচ সাত হাজার নকল ইংরাজ ভিন্ন তিন কোটি সাহেব কখনই হইয়া উঠিবে না। গিল্টি পিতল হইতে খাঁটি রূপা ভাল। প্রস্তরময়ী সুন্দরী মূর্তি অপেক্ষা, কুৎসিতা বন্যনারী জীবনযাত্রার সুসহায়। নকল ইংরাজ অপেক্ষা খাঁটি বাঙ্গালী স্পৃহনীয়। ইংরাজী লেখক, ইংরাজী বাচক-সম্প্রদায় হইতে নকল ইংরাজ ভিন্ন কখনো খাঁটি বাঙ্গালীর সমুদ্ভবের সম্ভাবনা নাই। যতদিন না সুশিক্ষিত জ্ঞানবন্ত বাঙ্গালীরা বাঙ্গালা ভাষায়, আপন উক্তি সকল বিন্যস্ত করিবেন, ততদিন বাঙ্গালীর উন্নতির কোন সম্ভাবনা নাই।"[৮]

কিন্তু এই অবস্থা-পরিবর্তনের সূচনা ঘটল ঊনিশ শতকের শেষ দশকে — ভাষা-প্রশ্নে সরকারি নীতিতে কেন্দ্রীয় জনমত ক্রমেই দৃঢ় হতে থাকে। বিশ্ববিদ্যালয়-স্তরে আধুনিক ভারতীয় ভাষা-শিক্ষা ও উচ্চতর পেশাগত শিক্ষাক্ষেত্রে ভাষা-মাধ্যম বিষয়ে জাতীয় দাবি উত্থিত হয়। কবি-কণ্ঠে শোনা যায়,

"নানান্ দেশে নানান্ ভাষা
বিনে স্বদেশীয় ভাষা পুরে কি আশা ?
কত নদী সরোবর,
কি বা ফল চাতকীর।
ধারাজল বিনে কভু ঘুচে কি তৃষা ?"[৯]

নিধুবাবুর গান বাংলার আকাশে-বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে। কবি মনের জিজ্ঞাসা মানুষকে আত্মসচেতন করে তোলে। মাতৃভূমি থেকে নির্বাসিত মাতৃভাষাকে স্বমর্যাদায় এদেশের শিক্ষাঙ্গনে প্রতিষ্ঠার আন্দোলন আরম্ভ হয়। ইংরেজিভাষার পরিবর্তে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের দাবি উত্থাপিত হ'ল। বিভিন্ন স্তরের পাঠক্রমে ভারতীয় ভাষাসমূহের অন্তর্ভুক্তির দাবি সর্বপ্রথমে উত্থাপন করলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভারতীয় উপাচার্য স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি সমাবর্তন-ভাষণে (২৬ জানুয়ারি, ১৮৯১ খ্রী.) বলেন, "আমি মনে করি এটা শুধু কাম্যই নয়, প্রয়োজনও বটে যে, যে-সব ভারতীয় ভাষাসমূহের সাহিত্য রয়েছে, সে ভাষাগুলিকে সহযোগী প্রাচীন ভারতীয় ভাষাগুলিসহ আমাদের পরীক্ষাগুলিতে অবশ্য পাঠ্য বিষয়-রূপে গ্রহণ করে সেগুলির চর্চায় আমাদের অবশ্যই উৎসাহ দিতে হবে। বর্তমানে বাংলা ভাষার সমৃদ্ধ সাহিত্য রয়েছে যা পাঠোপযোগী এবং উর্দু ও হিন্দিও সেদিকে লক্ষ্য রেখে উন্নত হচ্ছে।"[১০]

দেশপ্রেমের সাময়িক উত্তেজনায় নয়, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থার সামগ্রিক পর্যালোচনা করে স্যার গুরুদাস আরো বলেন, "আমি দৃঢ়-ভাবে বিশ্বাস করি যে, জাতি হিসাবে আমাদের একটা পূর্ণ ও সার্বিক সংস্কৃতি থাকবে না যতক্ষণ পর্যন্ত জ্ঞান-বিদ্যার আমাদের নিজেদের ভাষায় না হচ্ছে। অতীতের শিক্ষা বিবেচনা করুন; ইউরোপের মধ্যযুগীয় অন্ধকার তখনই দূরীভূত হ'ল যখন বিভিন্ন আধুনিক ভাষার মাধ্যমে জ্ঞানের আলো সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল। তেমনি ভারতবর্ষে জ্ঞান যদিও একটি বিশিষ্ট ভাষার মাধ্যমে সমাজের উচ্চতর স্তরে বিস্তৃত হয়েছে, তবুও সর্বব্যাপী অজ্ঞতার অন্ধকার দূরীভূত হবে না, যতক্ষণ জ্ঞান তাঁদের নিজস্ব ভাষায় তাঁদের কাছে না পৌঁছাচ্ছে।"[১১]

বিদেশী ভাষা আমাদের স্বাধীন চিন্তাশক্তিকে পঙ্গু করে দিয়েছে। শিক্ষিত-সম্প্রদায় নকলনবীশ কেরানী-দোভাষী রূপে এদেশে গড়ে উঠেছে। বহু বিচিত্র দেশীয় সংস্কৃতি, ইতিহাস ও জীবনযাত্রা সম্পর্কে তাঁদের কোনো চিন্তা-ভাবনা ছিল না। শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী-সম্প্রদায়ের দেউলেপনার কারণ বিশ্লেষণ করে গুরুদাস

বন্দ্যোপাধ্যায় পরবর্তী বৎসরের সমাবর্তন-ভাষণে বলেছেন, "আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা যে মৌলিক চিন্তার উন্মেষে অসমর্থ, তার কারণ হ'ল, এই শিক্ষা একটি বিদেশী ভাষার মাধ্যমে দেওয়া হয়, যে-ভাষার সৃজনী ক্ষমতা আমাদের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এই ভাষাকে আত্মস্থ করাও প্রায় অনুকরণেরই সামিল। অনুকরণের অভ্যাস ক্রমে এত গভীরে প্রবেশ করে যে, তা আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে সাধারণভাবে প্রভাবিত করে। তাছাড়া আমাদের ছাত্ররা তাদের চিন্তাশক্তিকে যে-দুর্মূল্য পোশাকের দ্বারা সজ্জিত করে, তা তাদের সীমাবদ্ধ মানসিক ক্ষমতার ওপরে এমন চাপ সৃষ্টি করে যে তার চিন্তাশক্তির উন্নতি ও পুষ্টির জন্য অন্য কোনো সুযোগ থাকে না।"[১২]

এ সময়কার শিক্ষাব্যবস্থার একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র এঁকেছেন প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় —"সে সময়ে উচ্চশিক্ষিত দেশীয় ও বিদেশীয় ভদ্রেরা স্কুলে বাংলা অধ্যাপন নিষ্প্রয়োজন মনে করিতেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় বাংলা ভাষার কোনো পরীক্ষা-গ্রহণের ব্যবস্থা ছিল না। কয়েক বৎসর পরে বালিকাদের জন্য বাংলা পরীক্ষণীয় বিষয় হয়; বালকদের পক্ষে বহু সাধ্যসাধনার পর অনুমতি লাভ করা সম্ভব হইত। বাংলা অধ্যাপনের অবসান হইত থার্ড ক্লাসে বা বর্তমান অষ্টম মানে। গণিত বিজ্ঞান ভূগোল প্রাকৃতিক-ভূগোল ভারত-ইতিহাস ইংলণ্ডের ইতিহাস সিটিজেন অব ইণ্ডিয়া নামে ভারত-শাসনাদি বিষয়ক গ্রন্থ সংস্কৃতের পরীক্ষা —সমস্তই ইংরেজির মাধ্যমে হইত।"[১৩]

মর্তবাসী কবি রবীন্দ্রনাথ ভাববিহারী হলেও ধূলিধূসরিত জগৎ সম্পর্কে উদাসীন নন; নৈর্ব্যক্তিক মনোভাব নিয়ে তিনি নিজেকে ঘরের নিরালা কোণে সরিয়ে রাখেননি। মর্তবাসীদের পুঞ্জীভূত বেদনা কবিকে আলোড়িত করে। তার পরিচয় পাওয়া যায় কবি কর্তৃক প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার তীব্র সমালোচনায়। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে রচিত 'শিক্ষার হেরফের' নামক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "ইংরাজি ভাষাটা অতিমাত্রায় বিজাতীয় ভাষা। শব্দবিন্যাস সম্বন্ধে আমাদের ভাষার সহিত তাহার কোনপ্রকার মিল নাই। তাহার পরে আবার ভাববিন্যাস এবং বিষয়প্রসঙ্গও বিদেশী। আগাগোড়া কিছুই পরিচিত নহে, সুতরাং ধারণা জন্মিবার পূর্বেই মুখস্থ আরম্ভ করিতে হয়। তাহাতে না চিবাইয়া গিলিয়া খাইবার ফল হয়।"

মুখস্থ-বিদ্যা কতকগুলি মেরুদণ্ডহীন গোলাম-চিন্তাশক্তিবিহীন দাস তৈরি করে। এই সত্য কবি-লেখনীতে উদ্ভাসিত হয়েছে, —"ইহাতে কি সে ছেলের কখনো মানসিক পুষ্টি, চিত্তের প্রসার, চরিত্রের বলিষ্ঠতা লাভ হইতে পারে?

সে কি একপ্রকার পাণ্ডুবর্ণ রক্তহীন শীর্ণ অসম্পূর্ণ হইয়া থাকে না? সে কি বয়ঃপ্রাপ্তিকালে নিজের বুদ্ধি খাটাইয়া কিছু বাহির করিতে পারে, নিজের বল খাটাইয়া বাধা অতিক্রম করিতে পারে, নিজের স্বাভাবিক তেজে মস্তক উন্নত করিয়া রাখিতে পারে? সে কি কেবল মুখস্থ করিতে, নকল করিতে এবং গোলামি করিতে শেখে না?"[১৫]

কবিগুরু নিজেই এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন, "আমরা যে শিক্ষায় আজন্মকাল যাপন করি সে শিক্ষা কেবল যে আমাদিগকে কেরানিগিরি অথবা কোনো একটা ব্যবসায়ের উপযোগী করে মাত্র, যে সিন্দুকের মধ্যে আমাদের অপিসের শামলা এবং চাদর ভাঁজ করিয়া রাখি সেই সিন্দুকের মধ্যেই যে আমাদের সমস্ত বিদ্যাকে তুলিয়া রাখিয়া দিই, আটপৌরে দৈনিক জীবনে তাহার যে কোনো ব্যবহার নাই, ইহা বর্তমান শিক্ষাপ্রণালীগুণে অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিয়াছে। এজন্য আমাদের ছাত্রদিগকে দোষ দেওয়া অন্যায়। তাহাদের গ্রন্থ-জগৎ এক প্রান্তে আর তাহাদের বসতি-জগৎ অন্য প্রান্তে, মাঝখানে কেবল ব্যাকরণ-অভিধানের সেতু।"[১৬]

কিন্তু এই সেতু কাজের জগতের সঙ্গে ভাবের জগতের মিলন-সেতু নয়। ইংরেজিভাষা আমাদের চাকরির জগতে নিয়ে গেলেও ভাবের জগতের সন্ধান দেয় না। কারণ 'ইংরাজি আমাদের পক্ষে কাজের ভাষা, কিন্তু ভাবের ভাষা নহে। প্রত্যক্ষ দেখিয়াছে যে, যদিও আমরা শৈশবাবধি এত একান্ত যত্নে একমাত্র ইংরাজি ভাষা শিক্ষা করি, তথাপি আমাদের দেশীয় বর্তমান স্থায়ী সাহিত্য যাহা-কিছু তাহা বাংলা ভাষাতেই প্রকাশিত হইয়াছে। তাহার প্রধান কারণ, বাঙ্গালি কখনোই ইংরাজি ভাষার সহিত তেমন ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-ভাবে পরিচিত হইতে পারে না যাহাতে সাহিত্যের স্বাধীন ভাবোচ্ছ্বাস তাহার মধ্যে সহজে প্রকাশ করিতে পারে। যদি বা ভাষার সহিত তাহার তেমন পরিচয় হয় তথাপি বাঙ্গালির ভাব ইংরাজের ভাষায় তেমন জীবন্তরূপে প্রকাশিত হয় না। যে-সকল বিশেষ মাধুর্য, বিশেষ স্মৃতি আমাদিগকে প্রকাশচেষ্টায় উত্তেজিত করে, যে-সকল সংস্কার পুরুষানুক্রমে আমাদের সমস্ত মনকে একটা বিশেষ গঠন দান করিয়াছে, তাহা কখনোই বিদেশী ভাষার মধ্যে যথার্থ মুক্তি লাভ করিতে পারে না।"[১৭] যথার্থ মুক্তির জন্য প্রয়োজন স্বদেশের ভাষায় দেশের মাটির সঙ্গে সংযোগস্থাপন।

তাই 'শিক্ষার সহিত জীবনের সামঞ্জস্যসাধন'-এর জন্য কবি প্রার্থনা জানিয়েছেন, "আমরা বিধাতার নিকট এই বর চাহি, আমাদের ক্ষুধার সহিত

অন্ন, শীতের সহিত বস্ত্র, ভাবের সহিত ভাষা, শিক্ষার সহিত জীবন কেবল একত্র করিয়া দাও।"[১৮]

মাতৃভাষার সপক্ষে কবিগুরুর লেখনী-চালনা সৎ বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। তাঁর অভিমতের প্রতি ঐকান্তিক সমর্থন জ্ঞাপন করে চিঠি লিখেছেন বঙ্কিমচন্দ্র, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রথম ভারতীয় র‍্যাংলার আনন্দমোহন বসু। কবির বক্তব্যের সমর্থনে লোকেন্দ্রনাথ পালিত লিখেছেন 'শিক্ষাপ্রণালী' নামক প্রবন্ধ। এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে ১৮৯২ খৃষ্টাব্দের 'সাধনা' পত্রিকায়।

লোকেন্দ্রনাথ প্রথমেই শিক্ষার উদ্দেশ্যে সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লিখেছেন, "শিক্ষার দুই উদ্দেশ্য। প্রথমতঃ কতকগুলি বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞান সঞ্চয় করা, এবং দ্বিতীয়তঃ মনোবৃত্তি চালনা করিবার ক্ষমতা চর্চ্চা করা। যে-শিক্ষায় দুই উদ্দেশ্যই সাধন হয়, সেই শিক্ষাই যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট এ বিষয়ে কাহারও কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। দুই উদ্দেশ্যের মধ্যে এক উদ্দেশ্য সম্পাদিত হইলেও শিক্ষাটাকে চলনসই বলা যাইতে পারে। কিন্তু দুইটার মধ্যে কোন উদ্দেশ্যই সফল না হইলে সে শিক্ষার মূল্য সম্বন্ধে বোধহয় তর্কের আবশ্যক নাই।"[১৯] অর্থাৎ জ্ঞান সঞ্চয় ও মনোবৃত্তি চালনার ক্ষমতা অর্জনই হ'ল শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। এবং এই উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য প্রয়োজন দেশীয় ভাষায় শিক্ষাদান, ইংরেজি ভাষায় তা সম্ভব নয়। অথচ 'যে ভাষা নিতান্ত বিজাতীয়, যে ভাষায় বিন্দু বিসর্গমাত্র দখল নাই, সেই ভাষায় এই সকল তত্ত্ব শিক্ষা দেওয়া হয়। ... ফলে সেগুলি নিতান্ত অস্পষ্ট ও ঝাপসা মনে হয়; ঠিক পরিষ্কার করিয়া ধরিতে পারি না। অথচ ক্লাসের পড়া তৈয়ার করাও আবশ্যক, পরীক্ষায়ও উত্তীর্ণ হইতে হইবে, কাজেই মুখস্থ করা আমাদের এক সহজ উপায় হইয়া দাঁড়ায়। বস্তুতঃ মুখস্থ করাই একমাত্র উপায় হইয়া দাঁড়ায়। বেচারারা করিবে কি? মুখস্থ করা ভিন্ন কি অন্য পন্থা আছে?"[২০]

তারপরে লোকেন্দ্রনাথ ইংরেজি-শিক্ষাদানের প্রণালী সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করে লিখেছেন, "উপস্থিত প্রণালীতে যে ইংরাজী শিক্ষা ভাল হয় সেবিষয়ে আমার খুবই সন্দেহ আছে। আমাদের ইংরাজী শিখাইবার প্রণালীতে কতকগুলি বাঁধা বই মুখস্থ করা ছাড়া আর বিশেষ কিছু হয় না। দু'একটি টেক্সট্ বুক পড়ান হয়, কতকগুলি শব্দের প্রতিশব্দ মুখস্থ হয়, তাছাড়া ভাষায় জ্ঞান লাভ বিন্দুমাত্রও হয় না। এণ্ট্রান্স-পাশ করা ছেলে কি ইংরাজী লিখিতে কিম্বা বলিতে কিম্বা বুঝিতে পারে? কেমন করিয়াই বা হইবে? যে প্রণালীতে

শিক্ষা দেওয়া হয় এবং পরীক্ষা করা হয় তাহাতে প্রতিশব্দ মুখস্থ করা ছাড়া আর কিছুই চলে না।···ভাষা শিক্ষা দিতে হইলে ভাষাটা ভাষাস্বরূপে শিক্ষা দেওয়াই ভাল। ভাষাশিক্ষা হইবার অগ্রে সেই ভাষায় অন্য কঠিন বিষয় শিক্ষা দিলে, না হয় ভাষা শিক্ষা, না হয় বিষয় শিক্ষা।.[২১]

বঙ্কিমচন্দ্র, গুরুদাস ও আনন্দমোহনের চিঠি ১৮৯২ খৃষ্টাব্দের 'সাধনা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের 'শিক্ষার হেরফের' প্রবন্ধ উল্লেখ করে লিখেছেন, "পৌষ মাসের সাধনায় প্রকাশিত শিক্ষাসম্বন্ধীয় প্রবন্ধটি আমি দুইবার পাঠ করিয়াছি। প্রতি ছত্রে আপনার সঙ্গে আমার মতের ঐক্য আছে। এ বিষয় আমি অনেকবার অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির নিকট উত্থাপিত করিয়াছিলাম, এবং একদিন সেনেট হলে দাঁড়াইয়া কিছু বলিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম।"[২২]

স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, "আপনার 'শিক্ষার হরফের' নামক প্রবন্ধটি মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়াছি, এবং যদিও তাহার আনুষঙ্গিক দুই একটি কথা (যথা ইউরোপীয় সভ্যতার প্রতি অনাস্থার কারণ) আমার মতের সঙ্গে সম্পূর্ণ মিলে না, তাহার প্রধান প্রধান কথাগুলি আমারও একান্ত মনের কথা, এবং সময়ে সময়ে তাহা ব্যক্তও করিয়াছি। আমার কথানুসারে বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রদ্ধাস্পদ কয়েকজন সভ্য বাঙ্গলা ভাষা শিক্ষার প্রতি উৎসাহ প্রদানার্থে একটি প্রস্তাব উপস্থিত করেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহা গৃহীত হয় নাই (Cal. University Minutes for 1892-92. pp. 56-58) ·· কি উপায়ে যে এই উপকার সাধন হইতে পারে তাহা বলা বড় সহজ নহে। ভাবিয়া চিন্তিয়া যতটুকু বুঝিয়াছি তাহাতে বোধ হয় দুই দিকে চেষ্টা করা আবশ্যক। প্রথমতঃ বঙ্গভাষায় এমন সকল সাহিত্যের ও বিজ্ঞান দর্শনাদির গ্রন্থ যথেষ্ট পরিমাণে রচিত হওয়া আবশ্যক যাহাতে মনের আশা, জ্ঞানের আকাজ্ক্ষা মিটে। দ্বিতীয়তঃ সমাজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য শিক্ষাবিভাগের কর্তৃপক্ষ ও রাজপুরুষগণের নিকট হইতে বাঙ্গলা ভাষা শিক্ষার যতদূর উৎসাহ পাওয়া যাইতে পারে তাহা পাইবার চেষ্টা করা উচিত। অনেক স্থলে সভা সমিতির কার্য্য ও বক্তৃতা ইংরাজিতে হওয়া আবশ্যক বটে, কিন্তু এমনও অনেক স্থল আছে যেখানে তাহা বঙ্গভাষায় হইতে পারে ও হইলে অধিক শোভা পায় ; এবং সেই সকল স্থলেই স্বদেশীয় ভাষায় মনের ভাব ব্যক্ত করার পদ্ধতি চলিলেও অনেকটা উপকার হইতে পারে।"[২৩]

আনন্দমোহন বসু কবির সমর্থনে লিখেছেন, "পৌষ মাসের সাধনায় প্রকাশিত 'শিক্ষার হেরফের' নামক প্রবন্ধটি অত্যন্ত আহ্লাদের সহিত

পড়িয়াছি। আপনি এ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, অনেক পূর্ব্ব হইতে আমারও সেই মত। সুতরাং সেই মত এমন অতি সুন্দর ভাবে এবং দক্ষতার সহিত সমর্থিত ও প্রচারিত হইতে দেখিয়া আনন্দিত হইব ইহাও স্বাভাবিকই। প্রবন্ধটি যেমন গুরুতর বিষয় সম্বন্ধীয়, ভাবগুণে এবং ভাষালালিত্যে আবার তেমনি মধুর ও উপাদেয় হইয়াছে।

"এখন আলোচ্য প্রদর্শিত অনিষ্টের প্রতিকারের উপায় কি? বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষার ভাষা এবং নিয়মাদি সম্বন্ধে কতক কতক পরিবর্ত্তন করিলে উপকার হইতে পারে কিন্তু এই বিষয়ের আমি যখনই অবতারণা করিয়াছি তখনই আমাদের স্বদেশীয়দের নিকট হইতেই আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছে। এতৎ সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে পাব্লিক ওপিনিয়ান অনেকটা পরিবর্ত্তন হওয়া আবশ্যক। আমি সময়ে সময়ে এ সম্বন্ধে প্রস্তাব বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মুখে আনিব মনে করিয়াছি, কিন্তু যে পর্য্যন্ত এই পরিবর্ত্তন সাধিত না হয় কিছুই করা যাইতে পারিবে না বলিয়া নিরস্ত হইয়াছি। আশা করি, এই পরিবর্ত্তন সংসাধন পক্ষে আপনার সুন্দর প্রবন্ধটি বিশেষ সাহায্য করিবে এবং এই উদ্দেশে এই প্রবন্ধের বহুলরূপে প্রচার প্রার্থনীয়।"[২৪]

বঙ্কিমচন্দ্র, গুরুদাস ও আনন্দমোহনের তিনটি চিঠি প্রকাশ করে রবীন্দ্রনাথ 'সাধনা' পত্রিকায় যে সুদীর্ঘ মন্তব্য করেছেন, তা 'শিক্ষা' গ্রন্থে সংকলিত না হওয়ায় ভাষা ও শিক্ষা-বিষয়ে রবীন্দ্র-ভাবনাকে অনুধাবনের জন্য এখানে প্রায় সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করা হ'ল। —"উক্ত তিনপত্র হইতে এইরূপ অনুমান হয় যে, সিণ্ডিকেটের সভ্যগণ বাঙ্গালির শিক্ষায় বাঙ্গলার কোন উপযোগিতা স্বীকার করেন না এবং আমাদের স্বদেশীয়দের নিকট হইতেই প্রধানতঃ আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছে। অবশ্য আমদের স্বদেশীয়েরা যে এসম্বন্ধে আপত্তি করিবেন তাহাতে আশ্চর্য্য কিছুই নাই। যদি না করিতেন তবে আমাদের দেশের এমন দুর্দ্দশা হইবে কেন?'[২৫] [কেবলমাত্র ইংরেজি-বাংলা প্রশ্নে নয়, সেকালে প্রাথমিক শিক্ষার প্রশ্নেও ইংরেজি-শিক্ষিত সম্প্রদায় থেকে বাধা দেওয়া হয়েছিল এবং রবীন্দ্রনাথ সে প্রসঙ্গেও পরবর্তীকালে বিরূপ মন্তব্য করেছেন। একালে কবি ও বাধাদানকারীরা বেঁচে নেই; কিন্তু তাঁদের উত্তরাধিকারীরা রয়েছেন। তাই প্রাথমিক ও উচ্চশিক্ষাক্ষেত্রে ভাষা-প্রশ্নে দেখা গেল সেই একই ইতিহাস। শিক্ষাকে জনমুখী করার জন্য কবির উত্তরাধিকারীরা কোমর বেঁধে দাঁড়িয়েছেন, অন্যদিকে ইংরেজ-দাসদের বংশধরেরা গগনচুম্বী প্রাসাদ ভেঙে পড়ার আশঙ্কায় রাস্তায় নেমেছেন। কবির ভাষায় আমরাও বলি, এতে আশ্চর্যের কিছুই

নেই ; কারণ শিক্ষা সম্প্রসারণের অর্থই হ'ল শ্রেণী-স্বার্থ বিপন্ন হওয়া। —লেখক]

এই দুর্দশার অবসানের জন্য প্রয়োজন মাতৃভাষায় শিক্ষাদান। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "স্বদেশী ভাষার সাহায্য ব্যতীত কখনই স্বদেশের স্থায়ী কল্যাণ সাধিত হইতে পারে না একথা কে না বোঝে ? কিন্তু দুর্দৈবক্রমে সহজ কথা না বুঝিলে তাহার মত কঠিন কথা আর নাই। কারণ, কঠিন কথা না বুঝিলে সহজ কথার সাহায্যে বুঝাইতে হয়, কিন্তু সহজ কথা না বুঝিলে আর উপায় দেখা যায় না।

"দেশের অধিকাংশ লোকের শিক্ষার উপর যদি দেশের উন্নতি নির্ভর করে এবং সেই শিক্ষার গভীরতা ও স্থায়িত্বের উপর যদি উন্নতির স্থায়িত্ব নির্ভর করে, তবে মাতৃভাষা ছাড়া যে আর কোন গতি নাই একথা কেহ না বুঝিলে হাল ছাড়িয়া দিতে হয়।

"রাজা কত আসিতেছে, কত যাইতেছে ; পাঠান গেল, মোগল গেল, ইংরাজ আসিল, আবার কালক্রমে ইংরাজও যাইবে —কিন্তু ভাষা সেই বাঙ্গলাই চলিয়া আসিতেছে এবং বাঙ্গলাই চলিবে ; যাহা কিছু বাঙ্গলায় থাকিবে তাহাই যথার্থ থাকিবে এবং চিরকাল থাকিবে। ইংরাজ যদি কাল চলিয়া যায়, তবে পরশ্ব ঐ বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়গুলি বড় বড় সৌধবুদ্বুদের মত প্রতীয়মান হইবে।

"ভালরূপ নজর করিয়া দেখিলে আজও ওগুলাকে বুদ্বুদ বলিয়া বুঝা যায়। উহারা আমাদের বৃহৎ লোক-প্রবাহের মধ্যে অত্যন্ত লঘুভাবে অতিশয় অল্পস্থান অধিকার করিয়া আছে। প্রবাহের গভীর তলদেশে উহাদের কোন মূল নাই। তীরে বসিয়া ফেনের আধিক্য দেখিলে ভ্রম হয় তবে বুঝি আগাগোড়া এইরূপ ধবলাকার, একটু অন্তরে অবগাহন করিলেই দেখা যায় সেখানে সেই স্নিগ্ধ শীতল চিরকালের নীলাম্বুধারা।

"শিক্ষা যদি সেই তলদেশে প্রবেশ না করে, জীবন্ত মাতৃভাষার মধ্যে বিগলিত হইয়া চিরস্থায়িত্ব লাভ না করে, তবে সমাজের উপরিভাগে যতই অবিশ্রাম নৃত্য করুক এবং ফেনাইয়া উঠুক তাহা ক্ষণিক শোভার কারণ হইতে পারে, চিরন্তন জীবনের উৎস হইতে পারে না।

... "এতদিনকার ইংরাজি শিক্ষাতেও শিক্ষিতগণের মধ্যে প্রকৃত মানসিক বিকাশ দেখা যায় না। তাহারা এমন একটা কিছু করেন নাই যাহাকে পৃথিবীর একটা নূতন উপার্জন বলা যাইতে পারে, যাহাতে মনুষ্য জাতির একটা নূতন গৌরব প্রকাশ পাইয়াছে। কেহ কেহ ভাল ইংরাজি বলেন, কেহ কেহ বিশুদ্ধ উচ্চারণ রক্ষা করেন, কিন্তু ধাত্রীর অঞ্চল ছাড়িয়া কেহ এক পা হাঁটিতে

পারেন না।

"তাহার প্রধান কারণ বিদেশী ভাষার ভার বড় গুরুতর। একজনের খোলষ আর একজনের স্কন্ধে চাপাইলে সে কখনই তাহা লইয়া বেশ স্বাধীন সহজভাবে চলিতে পারে না। আমাদের ভাবকে বিদেশী ভাষার বোঝা কাঁধে লইয়া চলিতে হয়। প্রতিপদে পদস্খলনের ভয়ে তাহাকে বড় সাবধানে অগ্রসর হইতে হয়, কোন মতে মান বাঁচাইয়া বাঁধা রাস্তা ধরিয়া চলিতে পারিলেই তাহার পক্ষে যথেষ্ট।

"কিন্তু ততটুকু করাই এত কঠিন যে, সেইটুকু সুসম্পন্ন করিলেই পরম একটা গৌরব অনুভব করা যায় — সেখানে খুব একটা মহৎ ফললাভ বলিয়া ভ্রম হয়। অন্যদেশে একটা বড় কাজের যতটা মূল্য, আমাদের দেশে একটা অবিকল নকলের মূল্য তাহা অপেক্ষা অল্প নহে। এতটা করিয়া যাহা হইল তাহা যে কিছুই নহে একথা লোককে বোঝানো বড় শক্ত। ··· একজন এণ্ট্রেন্স ক্লাশের ছোকরা কতটুকুই বা বুঝিতে পারে কতটুকুই বা প্রকাশ করিতে পারে। সে দশ বারো বৎসর কাল খেলাধূলো ভুলিয়া প্রাণপণ করিয়া অতি যৎসামান্য ইংরাজি শিখে, তাহাতে তাহার মানসিক দৈন্য কিছুই দূর হয় না। নিজে কিছু বুঝিয়া উঠা, কিছু ভাবিয়া বলা তাহার পক্ষে অসাধ্য। কারণ, সকলি অভ্যাসের উপর নির্ভর করে। কথার মানে দেখিতে দেখিতে "কী" মুখস্থ করিতে করিতে হতভাগ্য হয়রাণ হইয়া গিয়াছে; এ পর্য্যন্ত মনের মধ্যে একটি ভাব রীতিমত ধারণ করিবার অবকাশ তাহার হয় নাই। ··· কথার মানে বুঝিতে এত কাল লাগে যে, ভাব বুঝিতে অনেক বিলম্ব হয়, কেবল ভাষা রচনা করিতে এতদিন কাটিয়া যায় যে, ভাব প্রকাশ করিতে বহুকাল অপেক্ষা করিতে হয়। ···

"দেশী ভাষায় যদি আমরা শিক্ষালাভ করিতে পারিতাম তবে সে শিক্ষা আমাদের পক্ষে অপর্য্যাপ্ত হইত। আমরা তাহার মধ্যে যথেচ্ছ বিচরণ সঞ্চরণ করিতে পারিতাম, তাহার মধ্যে বাস করিতে পারিতাম এবং ক্রীড়া করিতেও পারিতাম। তাহার মধ্যে কাজও পাইতাম অবকাশও পাইতাম, সেও আমাকে গঠন করিত, আমিও তাহাকে গঠন করিতাম। শিক্ষা এবং মনের মধ্যে খুব একটা স্বাভাবিক চলাচল থাকিত। ··· কিন্তু বোধকরি প্রধান আপত্তি এই যে, শিশুকাল হইতে সমস্ত শিক্ষা ইংরাজি ভাষায় নির্ব্বাহ না হইলে বাঙ্গালির ছেলে ভাল করিয়া ইংরাজি শিখিতে পারিবে না।

"চোর মনে করে যত অধিক পরিমাণে লইব তত শীঘ্র শীঘ্র চুরি শেষ হইবে। থলির মুখ সঙ্কীর্ণ; তাহার মধ্যে দুই হাত প্রবেশ করাইয়া দেয়; বহু লোভে দুই

মুঠা ভরিয়া যখন হাত বাহির করিতে চায় তখন হাত বাহির হয় না, অবশেষে মুঠা হইতে অধিকাংশ চৌর্য্যসামগ্রী যখন পড়িয়া যায় তখন হাত বাহির হইয়া আসে।

"আমাদের শিক্ষা-থলির প্রবেশ-পথও বড় সঙ্কীর্ণ, কারণ, সে থলি বিদেশী ভাষা। তাহার মধ্যে তুই মুঠা ভরিয়া আমরা লুণ্ঠন করিতে চেষ্টা করি, কিন্তু যখন হাত টানিয়া লই, তাহাতে কতটুকু অবশিষ্ট থাকে? বোঝা ভারি করা সহজ, বহন করাই শক্ত।

"সরল হইতে ক্রমে তুরূহে অধিরোহণ করাই শিক্ষার অভিক্রম। শিক্ষার পদ্ধতিটি আয়ত্ব করাই শিক্ষার একটি প্রধান বাধা, সেই ছাঁচটি একবার গড়িয়া লইতে পারিলে অনেক কঠিন শিক্ষা সহজ হইয়া আসে। ব্যাকরণ-শিক্ষা ভাষা-শিক্ষার একটি প্রণালী। কিন্তু যে ভাষার কিছুই জানি না সেই ভাষার ব্যাকরণ হইতেই যদি প্রথম ব্যাকরণ শিক্ষা হয়, তবে শিশুদের মস্তিষ্কের প্রতি কি অন্যায় উৎপীড়ন করা হয়। কর্ত্তা কর্ম্ম ক্রিয়া প্রভৃতি অ্যাবষ্ট্রাক্ট শব্দগুলি ছেলেদের পক্ষে কত কঠিন সকলেই জানেন; উপর্য্যুপরি সহজ উদাহরণের দ্বারা ব্যাকরণের কঠিন সূত্রগুলি কথঞ্চিৎ বোধগম্য হয়। কিন্তু ভাষা এবং ব্যাকরণ তুই যখন বিদেশী তখন কাহার সাহায্যে কাহাকে বুঝিবে? তখন সূত্রও অপরিচিত, উদাহরণও অপরিচিত। যে ভাষা সর্ব্বাপেক্ষা পরিচিত সেই ভাষার সাহায্যে ব্যাকরণ জ্ঞানলাভ করাই প্রশস্ত নিয়ম, অবশেষে একবার ব্যাকরণ জ্ঞান জন্মিলে সেই ব্যাকরণের সাহায্যে অপরিচিত ভাষা শিক্ষা সহজ হইয়া আসে।

"অতএব শিখিবার প্রণালীটি যদি একবার মাতৃভাষার সাহায্যে অপেক্ষাকৃত সহজে আয়ত্ব হইয়া আসে, মনটি যদি শিক্ষার জন্য প্রস্তুত হইয়া উঠে, তবে ধারণাশক্তি যে কতটা পরিপক্ব হইয়া উঠে, কত অনাবশ্যক পীড়ন, কঠিন চেষ্টা ও শরীর মনের অবসাদ হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। কত অল্পসময়ে ও কত স্থায়ীরূপে নূতন শিক্ষা গ্রহণ করা যায় তাহা যাঁহারা দৃষ্টান্ত দেখিয়াছেন তাঁহারাই জানেন। ...

"ঘরে ঘরে আপন আপন সন্তানকে মাতৃস্তন্যের ন্যায় মাতৃভাষার দ্বারা সম্যকরূপে পরিপুষ্ট ও পরিণত করিয়া তুলিতে চেষ্টা করেন তবে কালক্রমে দেশের যে শ্রী ও উন্নতি হইবে সভাসমিতিতে সহস্র বৎসর ইংরাজি বক্তৃতা করিয়াও সেরূপ হইবে না।"[২৬]

রবীন্দ্রনাথ এখানেই থামলেন না। ইংরেজি-দাসত্বের জন্য তিনি ভূস্বামী

শ্রেণীভুক্ত রাজনৈতিক নেতাদেরও আক্রমণ করেছেন, "জমিদারগণ দেশের জন্য গবর্ণমেণ্টের মুখ তাকাইয়া, ইঁহারা (অর্থাৎ রাজনৈতিক নেতারা —লেখক) যাহা করেন তাহাও ইংরেজের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া। তাহার ভাষা ইংরেজি, তাহার প্রণালী ইংরেজি, তাহার প্রচার ইংরেজিতে।"[২৭] কেবলমাত্র প্রবন্ধে নয়, কবিতার মাধ্যমেও তিনি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের কশাঘাত হেনেছেন। 'পরবেশ' কবিতায় তিনি লিখেছেন,

"কে তুমি ফিরিছ পরি প্রভুদের সাজ।
ছদ্মবেশে বাড়ে না কি চতুর্গুণ লাজ।
পরবস্ত্র অঙ্গে তব হয়ে অধিষ্ঠান
তোমারেই করিছে না নিত্য অপমান? ···
সর্বাঙ্গে লাঞ্ছনা বহি এ কী অহংকার।
ওর কাছে জীর্ণ চীর জেনো অলংকার।"[২৮]

একই সুর ধ্বনিত হয়েছে কামিনী রায়ের কণ্ঠে—

"পরের মুখে শেখা বুলি পাখীর মত কেন বলিস?
পরের ভঙ্গী নকল করে নটের মত কেন চলিস?
তোর নিজত্ব সর্ব্বাঙ্গে তোর দিলেন ধাতা আপন হাতে,
মুছে সেটুকু 'বাজে' হলি, গৌরব কিছু বাড়্‌ল তাতে?
আপ্‌নার যে ভেঙে চুরে গড়তে চায় পরের ছাঁচে
অলীক, ফাঁকি, মেকি সেজন, নামটা তার কদিন বাঁচে?
পরের চুরি ছেড়ে দিয়ে আপন মাঝে ডুবে যারে
খাঁটি ধন যা সেথাই পাবি আর কোথাও পাবি না রে।"[২৯]

দ্বিজেন্দ্রলাল তাই কামনা করেছেন,

"জননি বঙ্গভাষা এ জীবনে
চাহি না অর্থ চাহি না মান,
যদি তুমি দাও তোমার ও দুটি
অমল-কমল-চরণে স্থান!"[৩০]

রামেন্দ্রসুন্দরের দৃষ্টিতে ইংরেজি-নকলনবীশেরা —"আমাদিগকে না চালাইলে আমরা চলিতে পারি না, আমাদিগকে পথ না দেখাইয়া দিলে আমরা পথ চিনিয়া লইতে পারি না; আমাদের নিজের হাত পায়ের উপর নিজের কর্তৃত্ব নাই; আমাদের জীবনীশক্তির মাত্রা শূন্য। আমরা সোলার সিপাই; তার টানিলে আমাদের হাতের ঢাল তলোয়ার নড়িতে থাকে; আমরা

ছেলেদের খেলনার ব্যাঙ ; পেট টিপিলে আমরা কক্ কক্ করি।"[৩১]

রাজনারায়ণ বসু সেকালের অনুকরণপ্রিয়তা প্রসঙ্গে লিখেছেন, "সকল বিষয়েই ঐ হীন অনুকরণ দৃষ্ট হয়। একটি সামান্য পত্র লিখিতে হইলে তাহা ইংরাজীতে লেখা হয়। কোন্ ইংরাজ ফ্রেঞ্চ অথবা জর্মান ভাষায় স্বদেশীয় লোককে পত্র লিখে ? যে সকল ছাত্রেরা ইংরাজী লিখিতে শিখিতেছেন, তাঁহারা ঐ ভাষায় লেখা অভ্যাস করিবার জন্য ইংরাজীতে পত্রাদি লিখিতে পারেন, কিন্তু বয়স্ক লোকে এরূপ করেন কেন ? বাঙ্গালীর সভায় ইংরাজীতে বক্তৃতা করা হয় কেন ? ইহার মানে কি ? যে সভার সভ্যেরা বাঙ্গালী, সে সভার কার্য্যবিবরণ ইংরাজীতে রাখা হয় কেন ? ডিবেটিং ক্লব, জুবিনাইল ক্লব প্রভৃতি সভা, যাহার উদ্দেশ্য ইংরাজী চর্চ্চা এবং ইংরাজী শিক্ষার্থী বালকেরা যাহার সভ্য, সে সকল সভার সভ্যেরা ইংরাজী ভাষা আয়ত্ত করিবার জন্য সভার কার্য্যবিবরণ ইংরাজী ভাষাতে রাখিতে পারেন, কিন্তু প্রবীণ লোকের সভা যাহা অন্য উদ্দেশ্যে সংস্থাপিত হইয়াছে, তাহার সভ্যেরা তাহার কার্য্যবিবরণ ইংরাজীতে রাখিয়া মাতৃভাষার কেন অবমাননা করেন, ইহার অর্থ কিছুই বুঝিতে পারি না। যদি জিজ্ঞাসা করেন যে, এই সকল অকিঞ্চিৎকর বিষয়ে এত বাক্যব্যয় কেন ? তাহার উত্তর এই যে, যাহাতে জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিত হয়, তাহা কখন অকিঞ্চিৎকর হইতে পারে না। এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিত হইতে হইতে মহৎ বিষয়ে জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিত হইবে। আর এক কথা এই, যাহা মাতৃভাষাসম্বন্ধীয়, তাহা আমরা আদৌ অকিঞ্চিৎকর জ্ঞান করি কেন ?"[৩২]

কিন্তু ভূমি-নির্ভর ইংরেজ-সেবাদাসেরা 'জননী বঙ্গভাষা'র 'অমল-কমল-চরণে' আশ্রয়লাভের চেয়ে ইংরেজিভাষার ছায়াতলে স্থানলাভ শ্রেয় মনে করেছেন। কবি-লেখকদের শ্লেষ-বিদ্রূপে তাঁদের চৈতন্যোদ্রেক ঘটেনি ; অচল-অটল তাঁদের ইংরেজি-আনুগত্য। ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের বাণ তাঁদের দেহাচ্ছাদিত 'পরবস্ত্র' ভেদ করতে পারে না ; বিদেশী ভাষায় 'ভিক্ষাবৃত্তি' অবলম্বনে তাঁরা কুণ্ঠিত নন। শ্রেণীস্বার্থ তাঁদের দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করেছে। 'পর-ধন লোভে-মত্ত' হয়ে তাঁরা দেশ, জাতি ও মাতৃভাষাকে পরিত্যাগ করেছেন। মাইকেল মধুসূদনের আক্ষেপোক্তিতে তাঁদের হৃদয় স্পন্দিত হয় না,—

"হে বঙ্গ ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন ;—
তা সবে, (অবোধ আমি) অবহেলা করি,

পর-ধন-লোভে মত্ত, করিনু ভ্রমণ
পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি।
কাটাইনু বহু দিন সুখ পরিহরি!
অনিদ্রায়, নিরাহারে সঁপি কায়, মনঃ,
মজিনু বিফল তপে অবরেণ্যে বরি ;—
কেলিনু শৈবালে ; ভুলি কমল কানন!"[৩৩]

রবীন্দ্রনাথ রাজনৈতিক জগতেও বাংলা প্রচলনে উদ্যোগী হলেন। তিনি দেখেছিলেন, "যে দেশ প্রত্যক্ষ তাহার ভাষাকে বিস্মৃত হইয়া, তাহার ইতিহাসকে অপমান করিয়া, তাহার সুখদুঃখকে নিজের জীবনযাত্রা হইতে বহু দূরে রাখিয়াও আমরা দেশহিতৈষী হইতেছিলাম। দেশের সহিত লেশমাত্র লিপ্ত না হইয়াও বিদেশীয় রাজদরবারকেই দেশহিতৈষিতার একমাত্র কার্যক্ষেত্র বলিয়া গণ্য করিতেছিলাম।"[৩৪] দেশের মানুষকে ও তাঁর মুখের ভাষাকে বাদ দিয়ে দেশ-হিতৈষণা কবির কাছে প্রবঞ্চনার সামিল। তাই ১৮৯৭ সালের জুন মাসে নাটোরে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের প্রাদেশিক সম্মেলনে তিনি ইংরেজির পরিবর্তে বাংলাভাষায় সভার কাজ পরিচালনার চেষ্টা করেছেন। এসম্পর্কে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন,—"আরো অনেক নেতারা, ন্যাশনাল কংগ্রেসের চাঁইরাও গিয়েছিলেন। ন-পিসেমশাই জানকীনাথ ঘোষাল, ডব্‌লিউ. সি. বোনার্জি, মেজো-জ্যাঠামশায়, লালমোহন ঘোষ—প্রকাণ্ড বক্তা তিনি, বড়ো ভালো লোক ছিলেন, আর কী সুন্দর বলতে পারতেন কিন্তু ঝোঁক ওই ইংরেজিতে—সুরেন্দ্র বাঁড়ুজ্জে, আরো অনেকে ছিলেন—সবার নাম কি মনে আসছে এখন। ···

"আগে থেকেই ঠিক ছিল, রবিকাকা প্রস্তাব করলেন প্রোভিন্সিয়াল কনফারেন্স বাংলা ভাষায় হবে। আমরা ছোকরারা সবাই রবিকাকার দলে ; আমরা বললুম, নিশ্চয়ই, প্রোভিন্সিয়াল কনফারেন্সে বাংলা ভাষার স্থান হওয়া চাই। রবিকাকাকে বললুম, ছেড়ো না, আমরা শেষ পর্যন্ত লড়ব এজন্য। সেই নিয়ে আমাদের বাধল চাঁইদের সঙ্গে। তাঁরা আর ঘাড় পাতেন না, ছোকরার দলের কথায় আমলই দেন না। তাঁরা বললেন, যেমন কংগ্রেসে হয় তেমনি এখানেও হবে সব-কিছু ইংরেজিতে। অনেক তক্কাতক্কির পর দুটো দল হয়ে গেল। একদল বলবে বাংলাতে, একদল বলবে ইংরেজিতে। সবাই মিলে গেলুম প্যাণ্ডেলে। বসেছি সব, কনফারেন্স আরম্ভ হবে। রবিকাকার গান ছিল, গান তো আর ইংরেজিতে হতে পারে না, বাংলা গানই হল। 'সোনার

বাংলা' গানটা বোধহয় সেই সময় গাওয়া হয়েছিল — রবিকাকাকে জিজ্ঞেস করে জেনে নিয়ো।

"এখন প্রেসিডেণ্ট উঠেছেন স্পীচ দিতে; ইংরেজিতে যেই-না মুখ খোলা আমরা ছোকরারা যারা ছিলুম বাংলা ভাষার দলে সবাই একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলুম —বাংলা, বাংলা। মুখ আর খুলতেই দিই না কাউকে। ইংরেজিতে কথা আরম্ভ করলেই আমরা চেঁচাতে থাকি —বাংলা, বাংলা। মহা মুশকিল, কেউ আর কিছু বলতে পারেন না। তবুও ওই চেঁচামেচির মধ্যেই দু-একজন দু-একটা কথা বলতে চেষ্টা করেছিলেন। লালমোহন ঘোষ ছিলেন ঘোরতর ইংরেজিদুরস্ত, তাঁর মতো ইংরেজিতে কেউ বলতে পারত না, তিনি ছিলেন পার্লামেণ্টারি বক্তা —তিনি শেষটায় উঠে বাংলায় করলেন বক্তৃতা। কী সুন্দর তিনি বলেছিলেন। যেমন পারতেন তিনি ইংরেজিতে বলতে তেমনি চমৎকার তিনি বাংলাতেও বক্তৃতা করলেন। আমাদের উল্লাস দেখে কে, আমাদের তো জয়জয়কার। কনফারেন্সে বাংলা ভাষা চলিত হল। সেই প্রথম আমরা পাবলিকলি বাংলা ভাষার জন্য লড়লুম।"[৩৫]

কংগ্রেস-সম্মেলনে বাংলাভাষা প্রচলনের ঘটনা স্মরণ করে কবিগুরু স্বয়ং বলেছেন, " 'সাধনা' পত্রিকায় রাষ্ট্রীয় বিষয়ে আমি প্রথম আলোচনা শুরু করি। তাতে আমি এই কথাটার উপরেই বেশি জোর দিয়েছি। তখনকার দিনে চোখ রাঙিয়ে ভিক্ষা করা ও গলা মোটা করে গবর্ণমেণ্টকে জুজুর ভয় দেখানোই আমরা বীরত্ব বলে গণ্য করতেম। আমাদের দেশে পোলিটিক্যাল অধ্যবসায়ের সেই অবাস্তব ভূমিকার কথাটা আজকের দিনের তরুণেরা ঠিকমতো কল্পনা করতেই পারবেন না। পলিটিক্সের সমস্ত আবেদনটাই ছিল উপরওয়ালার কাছে, দেশের লোকের কাছে একেবারেই না। সেই কারণেই প্রাদেশিক রাষ্ট্রসম্মিলনীতে, গ্রাম্য-জনমণ্ডলী সভাতে ইংরেজি ভাষায় বক্তৃতা করাকে কেউ অসংগত বলে মনে করতেই পারতেন না। রাজশাহী সম্মিলনীতে নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্রনাথের সঙ্গে চক্রান্ত করে সভায় বাংলা ভাষা প্রবর্তন করবার প্রথম চেষ্টা যখন করি, তখন উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রভৃতি তৎসাময়িক রাষ্ট্রনেতারা আমার প্রতি একান্ত ক্রুদ্ধ হয়ে কঠোর বিদ্রূপ করেছিলেন। বিদ্রূপ ও বাধা আমার জীবনের সকল কর্মেই আমি প্রচুর পরিমাণে পেয়েছি, এক্ষেত্রেও তার অন্যথা হয়নি। পর বৎসরে রুগ্ন শরীর নিয়ে ঢাকা কনফারেন্সেও আমাকে এই চেষ্টায় প্রবৃত্ত হতে হয়েছিল। আমার এই সৃষ্টিছাড়া উৎসাহ উপলক্ষে তখন এমনতরো একটা কানাকানি উঠেছিল যে, ইংরেজি ভাষায়

আমার দখল নেই বলেই রাষ্ট্রসভার মতো অজায়গায় আমি বাংলা চালাবার উদ্যোগ করেছি। বাঙ্গালির ছেলের পক্ষে যে-গালি সব চেয়ে লজ্জার সেইটেই সেদিন আমার প্রতি প্রয়োগ করা হয়েছিল, অর্থাৎ ইংরেজি আমি জানি নে। এত বড়ো দুঃসহ লাঞ্ছনা আমি নীরবে সহ্য করেছিলুম তার একটা কারণ, ইংরেজি ভাষা শিক্ষায় বাল্যকাল থেকে আমি সত্যই অবহেলা করেছি, দ্বিতীয় কারণ, পিতৃদেবের শাসনে তখনকার দিনেও আমাদের পরিবারে পরস্পর পত্র লেখা প্রভৃতি ব্যাপারে ইংরেজি ভাষা ব্যবহার অপমানজনক বলে গণ্য হত।"[৩৬]

১৮৯১ খৃষ্টাব্দের গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমাবর্তন-ভাষণ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়কে উৎসাহিত করেছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো-রূপে নির্বাচিত হয়ে তিনি প্রস্তাব দিলেন (১ মার্চ, ১৮৯১ খৃঃ.), "কলাবিভাগের পরীক্ষায় যে-প্রার্থীরা সংস্কৃত নেবেন তাঁদের বাংলা অথবা হিন্দি কিংবা ওড়িয়া ভাষায় এবং যাঁরা ফারসি কিংবা আরবি নেবেন তাঁদের উর্দু ভাষায় পরীক্ষা দিতে হবে। এম. এ. পর্যন্ত সমস্ত পরীক্ষায় দেশীয় ভাষা-চর্চার উৎসাহ দেওয়া হবে।"[৩৭] কিন্তু ফ্যাকাল্টি অব আর্টসের সভায় (১১ জুলাই, ১৮৯১ খৃঃ.) ইংরেজি-শিক্ষাভিমানীদের প্রয়াসে আশুতোষের প্রস্তাব ১৭-১১ ভোটে অগ্রাহ্য হয়। এতে নিরুৎসাহিত না হয়ে আশুতোষ মুখোপাধ্যায় পুনরায় সিণ্ডিকেটের সভায় প্রস্তাব করেন, "সিণ্ডিকেট সিনেটের কাছে সুপারিশ করছে যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়াসে এপর্যন্ত ভারতীয় ভাষাসমূহের শিক্ষাদানে যা করা হয়েছে তার চেয়ে অধিকতর উদ্যোগ গ্রহণের জন্য একটি পরিকল্পনা রচনা করা যায় কিনা সে-বিষয়ে বিবেচনার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হোক।"[৩৮] কিন্তু এ-প্রস্তাবও গৃহীত হ'ল না। তবে তিন বৎসর পরে গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রস্তাবক্রমে এই বিষয়টি বিবেচনার জন্য একটি কমিটির কাছে পাঠাতে ফ্যাকাল্টি সম্মত হয়। কিন্তু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি-সমর্থকরা ছিলেন শক্তিশালী, সক্রিয় ও তীব্র দেশীয় ভাষা-বিদ্বেষী। 'ভালো করে বলতে পারুক আর না পারুক এইসব উন্নাসিকদের অনেকের মাতৃভাষা যেন ইংরেজি। ঠিক যেমন আইনসভাগুলির ভাষা ইংরেজি এবং ভারতমাতা যেন ভিক্টোরিয়ার কৃষ্ণাঙ্গী কন্যাদের অন্যতমা। ...তাঁদের কাছে টেনিসন ও ওয়ার্ডসওয়ার্থ-এর তুলনায় রবীন্দ্রনাথ আঞ্চলিক ভাষার একজন কবি, কাব্যের প্রাথমিক স্তরে একজন অনুপ্রবেশক মাত্র।"[৩৯] সুতরাং পর্দার অন্তরালে তাঁদের কার্যকলাপে অচিরেই প্রস্তাবটির সমাধি-লাভ ঘটল।

১৯০১ সালে ইংরেজিভাষায় শিক্ষাগ্রহণের অসুবিধার বিষয়টি উল্লেখ করে

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য টমাস র‍্যালে সমাবর্তন-ভাষণে বলেছেন, "আমাদের ভারতীয় কলেজগুলিতে শিক্ষকেরা যে ছাত্রদের মনের কাছাকাছি আসবেন, তার অনেক বাধা রয়েছে যেগুলি অতিক্রমনের প্রয়োজন। ধরা যাক, তিনি একটি বৈজ্ঞানিক-বিষয় কিংবা ইতিহাসের একটি যুগ ইংরেজি ভাষায় উপস্থাপন করছেন যা তাঁর মাতৃভাষা নয়। এমন একটি ক্লাসে তাঁকে পড়াতে হচ্ছে যেখানে ছাত্ররা বিভিন্ন সম্প্রদায় থেকে এসেছেন, যাঁরা বাড়িতে অন্য ভাষায় কথা বলেন এবং যাঁরা ভিন্ন বিশ্বাসে মানুষ হয়েছেন। ইংরেজি তাঁদের অনেকের কাছে বইয়ের ভাষা মাত্র। প্রতিটি বাক্যের ব্যাকরণগত-কাঠামোর দিকে তাঁদের গভীর মনোযোগ দিতে হয়। এটাই কি আশ্চর্যজনক নয় যে, তাঁদের শিক্ষক কষ্ট করে যা দিতে প্রয়াসী হয়েছেন, সে-বিষয়ে ভালোভাবে গ্রহণ না করেও তাঁরা যদি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।"[৪০]

১৯০২ সালে Indian Universities Commission দুঃখ প্রকাশ করে বলেছেন, "মাতৃভাষা-শিক্ষার প্রতি যথেষ্ট মনোযোগ দেওয়া হয়নি এবং …বহু স্নাতকের মাতৃভাষায় জ্ঞান খুবই অসম্পূর্ণ।"[৪১] সুতরাং ভারতীয় ভাষা-চর্চায় উৎসাহ দেবার জন্য কমিশনের প্রস্তাব হ'ল :

"(১) মাতৃভাষায় রচনা বি. এ.-র পাঠ্যতালিকায় আবশ্যিক করা হোক ; কিন্তু এ বিষয়টি পঠন-পাঠনের প্রয়োজন নেই।

(২) এম. এ. পরীক্ষায় ইংরেজির সঙ্গে মাতৃভাষাকেও একটি বিষয় হিসাবে আবশ্যিক করা হোক।

(৩) মাতৃভাষাগুলিতে অধ্যাপক-পদ স্থাপনের লক্ষ্য থাকা উচিত যাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থ যথোপযুক্তভাবে ব্যবহৃত হতে পারে।

(৪) মাতৃভাষায় অধিকতর উৎসাহদানের জন্য সাহিত্যকর্ম ও বিজ্ঞান-রচনাকে পুরস্কৃত করা হোক।"[৪২]

মধ্যবিত্তশ্রেণীর ক্রমসম্প্রসারণ, অর্থনৈতিক দুর্দশাবৃদ্ধি ও শিক্ষিত বেকার যুবকদের সংখ্যাস্ফীতি গাড়ি-ঘোড়ায় চড়ার স্বপ্ন ভেঙে দিয়েছে। 'পাশ্চাত্য জাতির সম্পর্কে আসিয়া আমরা যে ভাবী ঐশ্বর্য্যের স্বপ্ন দেখিতেছিলাম; সে সুখস্বপ্ন যেন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। যে মোহের ঘোরে আমরা এতদিন আচ্ছন্ন ছিলাম, সে মোহের ঘোর যেন কাটিয়া গিয়াছে। কেহ যেন আমাদের কানে কানে দৃঢ় স্বরে বলিয়া দিয়াছে, তোমরা দীন, কুটীর মধ্যে ছিন্ন কন্থায় শয়ন করিয়া তোমরা ঐশ্বর্য্যের স্বপ্ন দেখিতেছিলে, সে স্বপ্ন সফল হইবার নহে। পরন্তু তোমরা ভিক্ষুক ; ভিক্ষুকের জীবনে শ্রেয়োলাভের আশা বিড়ম্বনা।"[৪৩]

স্বপ্ন-ভঙ্গের বেদনা শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণীকে আত্মানুসন্ধানে ব্রতী করেছে, পথ-সন্ধানে তাঁরা সচেষ্ট হয়েছেন।

অন্যদিকে বৃটিশ-শাসকেরা আতঙ্কিত হয়েছিলেন। সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও উচ্চ শিক্ষা সমাজের মধ্যবিত্ত-অংশকে স্বাধিকার সম্বন্ধে সচেতন করে তুলছিল, ইংরেজ-শাসন সম্পর্কে তাঁদের মোহমুক্তি ঘটছিল ; ক্রমেই তাঁরা জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হচ্ছিলেন। তাই ইংরেজ-শাসকরা উচ্চশিক্ষা-সঙ্কোচনে প্রয়াসী হলেন। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে গঠিত হ'ল উইলিয়ম হাণ্টারের নেতৃত্বে ভারতীয় শিক্ষা কমিশন। প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে তদন্তের জন্য এই কমিশন গঠিত হলেও এর কার্যবিধি এমনভাবে পরিচালিত হয়েছিল যে বৃটিশ-সরকারের প্রকৃত অভিসন্ধি সম্পর্কে বুদ্ধিজীবীসম্প্রদায়ের মনে সন্দেহের উদ্রেক ঘটেছিল। উচ্চশিক্ষা কমিশনের এক্তিয়ারভুক্ত না হলেও উচ্চশিক্ষা সম্পর্কে কমিশনের সুপারিশগুলি প্রাথমিক শিক্ষা-সম্প্রসারণের পরিবর্তে উচ্চশিক্ষা সংকোচনে সাহায্য করেছিল।

তাসত্ত্বেও বেসরকারী উদ্যোগে উচ্চশিক্ষার অগ্রগতি ঘটছিল। নিম্নলিখিত সারণীতে অগ্রগতির চিত্র পাওয়া যায় :

	১৮৮২ খৃঃ.	১৯০২ খৃঃ.
এফ. এ. পরীক্ষার্থীর সংখ্যা	১২০০	৪১৩৯
বি. এ. ,, ,,	৩৫৮	২১৮১*
এম. এ. ,, ,,	৭৯	১৯৪
কলেজের সংখ্যা	৬৯	১২০

[* এই বছরে বি.এস. সি. পরীক্ষা আরম্ভ হয় এবং পরীক্ষার্থী-সংখ্যা ছিল ১২। সুতরাং বি. এ. ও বি. এস.সি. র মোট সংখ্যা ২১৯৩।]

উচ্চশিক্ষার আলোকে বাংলাদেশের মধ্যবিত্তশ্রেণীর একাংশ বৃটিশ-বিরোধী চেতনায় দীক্ষিত হচ্ছে, দেশে রাজনৈতিক আন্দোলনের বিস্তার ঘটছে এবং ছাত্রসমাজ তাতে প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে অংশগ্রহণ করছেন। এই পটভূমিতে উচ্চ-শিক্ষা-সংকোচনের জন্য ১৯০২ সালের জানুয়ারি মাসে লর্ড কার্জনের নির্দেশে ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির অবস্থা সম্পর্কে তদন্তের জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য টমাস র‍্যালের সভাপতিত্বে Indian Universities Commission গঠিত হয় এবং কমিশনের রিপোর্ট ঐ বৎসরের জুন মাসে সরকারের কাছে পেশ করা হয়। কমিশনের সুপারিশে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির অধিকার হরণের সম্ভাবনা দেখা দেওয়ায় জন-মনে প্রবল অসন্তোষের সৃষ্টি হয় এবং তার প্রকাশ ঘটে জাতীয়তাবাদী পত্রিকাগুলির মন্তব্যে। তাই ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে

বিক্ষুব্ধ জনমতকে শান্ত করার অভিপ্রায়ে টমাস র‍্যালে সমাবর্তন-ভাষণে বলেন, "এই রিপোর্টে এমন কিছুই নেই যাতে এই অভিযোগ প্রমাণ করা যায় যে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলি বর্তমানে যে স্বাধীনতা উপভোগ করছে তা ধ্বংস করার উদ্দেশ্য আমাদের ছিল।"[৪৪] কিন্তু র‍্যালের আশ্বাসবাণীতে শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের মন থেকে সন্দেহ-অবিশ্বাস দূর হয়নি। চিন্তাশীল ব্যক্তিদের বিরোধিতা সত্ত্বেও ১৯০৪ সালে Indian Universities Act প্রবর্তিত হয়। এই আইনের দ্বারা ইংরেজ-শাসকরা স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ন্ত্রণের অধিকতর ক্ষমতা গ্রহণ করলেন। এই আইন যে সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে রচিত হয়েছিল, তা প্রমাণিত হ'ল পরবর্তীকালের ঘটনাবলীতে।

১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলন থেকে গড়ে উঠল জাতীয় শিক্ষা-আন্দোলন। ১৯ জুলাই লর্ড কার্জন বঙ্গচ্ছেদ ঘোষণা করেছেন এবং তা কার্যকরী হয়েছে ১৬ অক্টোবর। প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠল সমগ্র বাংলাদেশ। জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ ছাত্র-যুব সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণে বিদেশী শিল্পসামগ্রী-বর্জনের আন্দোলন দ্রুত প্রসার-লাভ করতে লাগল। ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে বৃটিশ-সরকারের চীফ সেক্রেটারি কার্লাইল রাজনীতিতে ছাত্রদের অংশগ্রহণ নিষিদ্ধ করে আদেশ দিয়েছেন। কার্লাইল-সার্কুলারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করলেন খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ্‌রা। সাম্রাজ্যবাদী নিয়ন্ত্রণমুক্ত জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার আহ্বান জানালেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, চিত্তরঞ্জন দাশ, বিপিনচন্দ্র পাল, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রাসবিহারী ঘোষ, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ভূপেন্দ্রনাথ বসু, তারকনাথ পালিত, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ। প্রবল উৎসাহে ১৯০৬ সালের ১১ মার্চ গঠিত হ'ল জাতীয় শিক্ষা পরিষদ (National Council of Education)। বঙ্গভঙ্গ আদেশ প্রত্যাহৃত হ'লে শিক্ষা-আন্দোলনে যাতে ভাঁটা না পড়ে সেজন্য রবীন্দ্রনাথ আগেই সকলকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন, "গবর্ণমেণ্ট যদি দুই দিন পরে এই পরওয়ানা প্রত্যাহারও করেন, তবু যেন আমরা ইহার শিক্ষাটি কখনও ভুলিয়া না যাই। আমাদের শিক্ষাকে স্বাধীন করিবার জন্য জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিবার সময় এখন উপস্থিত হইয়াছে।"[৪৫]

সকলের আন্তরিক প্রয়াসে ও জাতীয় শিক্ষা পরিষদের উদ্যোগে ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের ১৪ আগস্ট প্রতিষ্ঠিত হ'ল Bengal National College & School। শিক্ষা পরিষদের লক্ষ্য হ'ল মাতৃভাষার মাধ্যমে মানবিক, কারিগরী ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষাদান; তবে ইংরেজিকে তাঁরা আবশ্যিক রাখলেন। বিদেশী শিক্ষাপ্রণালী অনুসরণ করায় শিক্ষা পরিষদের শিক্ষা-নীতিতে কবিগুরু সন্তুষ্ট হতে পারলেন

না। বিক্ষুব্ধ চিত্তে তিনি মন্তব্য করেছেন, "বর্তমান শিক্ষা-প্রণালীটাই যে আমাদের ব্যর্থতার কারণ, অভ্যাসগত অন্ধ মমতার মোহে সেটা আমরা কিছুতেই মনে ভাবিতে পারি না। ঘুরিয়া ফিরিয়া নূতন বিশ্ববিদ্যালয় গড়িবার বেলাতেও প্রণালী বদল করিবার কথা মনেই আসে না; তাই নূতনের ঢালাই করিতেছি সেই পুরাতনের ছাঁচে। নূতনের জন্য ইচ্ছা খুবই হইতেছে অথচ ভরসা কিছুই হইতেছে না। কেননা ঐটেই যে রোগ, এত দিনের শিক্ষা-বোঝার চাপে সেই ভরসাটাই যে সমূলে মরিয়াছে।"[৪৬]

বঙ্গভঙ্গে অর্থনৈতিক দিক থেকে সর্বাপেক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত হ'লেন ভূস্বামীশ্রেণী। তাই তাঁরা বঙ্গভঙ্গ-প্রতিরোধের জন্য বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলন ও শিক্ষা-আন্দোলনের পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। তবে তাঁরা শ্রেণীস্বার্থে জনশিক্ষা-প্রসারের বিরোধী ছিলেন বলেই তাঁদের পৃষ্ঠপোষিত জাতীয় শিক্ষা পরিষদের জনশিক্ষা-বিস্তারের কোনো পরিকল্পনা ছিল না; 'দেশের শিক্ষার এই দূরত্ব' দূর করার কোনো চেষ্টা তাঁদের ছিল না। বঙ্গভঙ্গ-আদেশ প্রত্যাহৃত হওয়ায় (১২ ডিসেম্বর, ১৯১১ খৃঃ.) মধ্যবিত্তশ্রেণীভিত্তিক শিক্ষা-আন্দোলন উৎসাহের অভাবে স্তিমিত হয়ে পড়ে। মধ্যবিত্ত-পরিবারের ছেলেরা চাকরির জন্য পুনরায় স্কুল-কলেজে ভীড় করে। আর্থিক ক্ষতির আশঙ্কা দূরীভূত হওয়ায় ভূস্বামীশ্রেণীও শিক্ষা-আন্দালেনে উৎসাহ-সমর্থন দেওয়া বন্ধ করলেন। ফলে অকালে জাতীয় শিক্ষা-আন্দোলনের পরিসমাপ্তি ঘটে। এই আন্দোলনের তীব্রতায় যে-সমস্ত ইংরেজনবীশ বুদ্ধিজীবী নীরব হতে বাধ্য হয়েছিলেন, তাঁরা এই সুযোগে মাতৃভাষায় শিক্ষাদান ও জনশিক্ষার দাবির বিরুদ্ধে সক্রিয় হয়ে উঠেছেন। জাতীয় শিক্ষা-আন্দোলনের পুরোধাদের মধ্যে অন্যতম তারকনাথ পালিত ও রাসবিহারী ঘোষের ভূমিকায় তাঁরা উৎসাহিত হয়েছেন। পরবর্তীকালে প্রখ্যাত জাতীয়তাবাদী নেতা লালা লাজপত রায় ক্ষুব্ধ চিত্তে মন্তব্য করেছেন, "জাতীয় শিক্ষা পরিষদ এখনো বর্তমান, কিন্তু সেটা শুধু নামে। এর অবস্থা মরণাপন্ন। নেতা ও কর্মকর্তারাই এর শ্বাসরোধ ঘটিয়েছেন। মিঃ টি. পালিত ও স্যার রাসবিহারী ঘোষ, যাঁরা এর দুই শক্তিশালী স্তম্ভ, একে মরণ-আঘাত দিয়েছেন যখন তাঁরা বিপুল অর্থ জাতীয় শিক্ষা পরিষদকে না দিয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করেছেন; অথচ তাঁরাই ছিলেন শিক্ষা পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা ও নেতা (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে ১৯১২ সালে বিখ্যাত ব্যারিষ্টার তারকনাথ পালিত দু'দফায় মোট ১৪ লক্ষ টাকা এবং প্রসিদ্ধ উকীল রাসবিহারী ঘোষ ১৯১৩, ১৯১৯ ও ১৯২১ সালে তিন দফায় মোট ২৪,৫০,৫০০.

টাকা দান করেছেন —লেখক)। যে স্বল্প সংখ্যক আত্মত্যাগী বিদ্বৎজন নিজেদের ভবিষ্যৎ নষ্ট করে জাতীয় মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রদের শিক্ষাদানে রত ছিলেন, তাঁরা ছত্রভঙ্গ হলেন। তাঁরা বর্তমানে সরকারি সাহায্য প্রাপ্ত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে চাকরির সন্ধান করছেন। শিক্ষা পরিষদ কর্তৃক পরিচালিত জাতীয় বিদ্যালয়গুলির অধিকাংশই পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপে বিলুপ্ত হয়েছে এবং বর্তমান মুহূর্তে এই আন্দোলনের আর কিছুই নেই; যা রয়েছে, তা শুধু এদেশের এক বাতিল ও ধ্বংসপ্রাপ্ত শিক্ষা-আন্দোলনের চিহ্নমাত্র।"[৪৭]

শিক্ষা-আন্দোলনের সার্থকতার জন্য প্রয়োজন ছিল ভূমি-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন; মাতৃভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য অবশ্য-কর্তব্য ছিল কৃষকের হাতে জমির অধিকার ফিরিয়ে দেওয়া; জনমুখী উচ্চশিক্ষার জন্য প্রয়োজন ছিল শিক্ষাক্ষেত্রে শ্রেণী-আধিপত্যকে বিলুপ্ত করা। কিন্তু এই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি না থাকায় জাতীয় শিক্ষা পরিষদের শিক্ষা-আন্দোলন উচ্চ-মধ্য শ্রেণীর মধ্যে আবদ্ধ হয়ে থাকল, নীচের তলায় তা সম্প্রসারিত হ'ল না। ভূস্বামীশ্রেণীর পৃষ্ঠপোষকতা এবং তাঁদের ওপরে নির্ভরশীলতা আন্দোলনের সংগঠকদের দৃষ্টিশক্তিকে আচ্ছন্ন করেছিল; তাঁরা অনুধাবন করতে পারেননি 'সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটিতেছেই এবং ঘটিবেই, কেহ তাহাকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারিবে না, অথচ ব্যবস্থাকে সনাতন রেখায় পাকা করিয়া রাখিলে মানুষের পক্ষে তেমন দুর্গতির কারণ আর কিছুই হইতে পারে না।'[৪৮] এই ঐতিহাসিক সত্য উপলব্ধির ক্ষমতা শিক্ষা পরিষদের ছিল না। অথচ ইতিহাসের অনিবার্য সম্মুখ গতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে না পারলে চলন্ত ট্রেন থেকে অসতর্ক অবস্থায় বাইরে ছিট্‌কে পড়ার মত লোক-প্রবাহ থেকে বহুদূরে নিক্ষিপ্ত হতে হয়; অকালে জীবনের মাঝপথে দাঁড়ি টেনে দিতে হয়। সেকারণেই শিক্ষা-আন্দোলনের অকাল পরিসমাপ্তি ঘটেছিল। ফলে ইংরেজিভাষায় শিক্ষাদানের নীতি হতভাগ্য শ্রমজীবী-কৃষিজীবী মানুষের বুকে জগদ্দল পাথরের মত চেপে বসে রইল।

শিক্ষা পরিষদের কর্মকাণ্ডকে কেন্দ্র করে সমাজ-জীবনে যে-আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল, তা স্তিমিত হলেও কবিগুরুর লেখনী স্তব্ধ হ'ল না। 'শিক্ষা সংস্কার' (১৯০৬), 'শিক্ষাসমস্যা' (১৯০৬), 'জাতীয় বিদ্যালয়' (১৯০৬), 'আবরণ' (১৯০৬), 'শিক্ষাবিধি' (১৯১২), 'লক্ষ্য ও শিক্ষা' (১৯১২), 'শিক্ষার বাহন' (১৯১৫), 'অসন্তোষের কারণ', (১৯১৯), 'বিদ্যার যাচাই' (১৯১৯); 'বিদ্যাসমবায়' (১৯১৯), 'বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ' (১৯৩২), 'শিক্ষার বিকিরণ' (১৯৩৬), 'শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ' (১৯৩৬) ইত্যাদি শিক্ষাবিষয়ক প্রবন্ধে ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থার সমালোচনা,

প্রচলিত শিক্ষাপ্রণালীর পরিবর্তন, দেশোপযোগী পাঠক্রম প্রচলন, উচ্চশিক্ষা সম্প্রসারণকল্পে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান ও সর্বজনীন অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য জাতীয় দায়িত্বের কথা রবীন্দ্রনাথ বারে বারে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

উচ্চশিক্ষা বিস্তারের প্রধান বাধাটিকে নির্দেশ করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "বিদ্যাবিস্তারের কথাটাকে যখন ঠিকমত মন দিয়া দেখি তখন তার সর্বপ্রধান বাধাটা এই দেখিতে পাই যে তার বাহনটা ইংরেজি। বিদেশী মাল জাহাজে করিয়া শহরের ঘাট পর্যন্ত পৌছিতে পারে, কিন্তু সেই জাহাজটাতে করিয়াই দেশের হাটে হাটে আমদানি রপ্তানি করাইবার দুরাশা মিথ্যা। যদি বিলিতি জাহাজটাকেই কায়মনে আঁকড়াইয়া ধরিতে চাই তবে ব্যবসা শহরেই আটকা পড়িয়া থাকিবে।"[৪৯] কিন্তু ইংরেজ-রাজত্বে যখন ইংরেজি-বাহনটা থাকবেই, তখন তার সঙ্গে মাতৃভাষাকেও শিক্ষার মাধ্যম করার আবেদন জানিয়েছেন তিনি, "আমি এই বলি, বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরাতন বাড়িটার ভিতরের আঙিনায় যেমন চলিতেছে চলুক, কেবল তার এই বাহিরের প্রাঙ্গণটাতে যেখানে আম-দরবারের নূতন বৈঠক বসিল সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাটাকে যদি সমস্ত বাঙ্গালির জিনিস করিয়া তোলা যায় তাতে বাধাটা কী? আহূত যারা তারা ভিতর-বাড়িতেই বসুক, আর রবাহূত যারা তারা বাহিরে পাত পাড়িয়া বসিয়া যাক্-না। তাদের জন্য বিলিতি টেবিল না হয় না রহিল, দিশি কলাপাত মন্দ কী? তাদের একেবারে দারোয়ান দিয়া ধাক্কা মারিয়া বিদায় করিয়া দিলে কি এ যজ্ঞে কল্যাণ হইবে? অভিশাপ লাগিবে না কি?"[৫০]

কবি একই কথা অন্যত্রও বলেছেন, "বাংলা-বিশ্ববিদ্যালয়ের একেশ্বরত্বের অধিকার আজ সহ্য হবে না। নূতন স্বাধীনতার দাবিকে পুরাতন অধীনতার সেফগার্ডস্-এর দ্বারা বেড়া তুলে দেবার আশ্বাস না দিতে পারলে সবটাই ফেঁসে যেতে পারে, এই আমার ভয়। তাই বলছি, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরের দালানে বিদ্যার ভোজের যে আয়োজন চলছে তার রান্নাটা বিলিতি মসলায় বিলিতি ডেকচিতে, তার আহারটা বিলিতি আসনে বিলিতি পাত্রেই চলুক; তার জন্যে প্রাণপণে আমরা যে মূল্য দিতে পারি তাতে ভূরিভোজের আশা করা চলবে না। যারা কার্ড পেয়েছে তারা ভিতর-মহলেই বসুক, আর যারা রবাহূত বাইরের আঙিনায় তাদের জন্যে পাত পেড়ে দেওয়া যাক-না। টেবিল পাতা নাই হল, কলাপাত পড়ুক।"[৫১]

উচ্চশিক্ষা-ক্ষেত্রে বাংলা প্রচলনের বিরোধিতা করতে গিয়ে যাঁরা বাংলা-

ভাষায় উচুদরের শিক্ষাগ্রন্থের অভাবের কথা বলেছেন, তাঁদের জবাবে কবি বলেছেন, "নাই সে কথা মানি, কিন্তু শিক্ষা না চলিলে শিক্ষাগ্রন্থ হয় কী উপায়ে? শিক্ষাগ্রন্থ বাগানের গাছ নয় যে শৌখীন লোকে শখ করিয়া তার কেয়ারি করিবে কিম্বা সে আগাছাও নয় যে মাঠে বাটে নিজের পুলকে নিজেই কণ্টকিত হইয়া উঠিবে। শিক্ষাকে যদি শিক্ষাগ্রন্থের জন্য বসিয়া থাকিতে হয় তবে পাতার জোগাড় আগে হওয়া চাই তারপরে গাছের পালা এবং কূলের পথ চাহিয়া নদীকে মাথায় হাত দিয়া পড়িতে হইবে। বাংলায় উচ্চ অঙ্গের শিক্ষা-গ্রন্থ বাহির হইতেছে না এটা যদি আক্ষেপের বিষয় হয়, তবে তার প্রতিকারের একমাত্র উপায়, বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলায় উচ্চ-অঙ্গের শিক্ষা প্রচলন করা।"[৫২] সুতরাং যাঁরা 'বাংলাভাষায় বিজ্ঞানশিক্ষা অসম্ভব' মনে করেন, কবি তাঁদের উদ্দেশ্যে বলেছেন, "ওটা অক্ষমের, ভীরুর ওজর।"[৫৩]

শুধু উন্নত মানের শিক্ষাগ্রন্থ নয়, আজ থেকে একশ বছর আগে শ্রমজীবিদের জন্য বাংলাভাষায় বিজ্ঞান-গ্রন্থ রচনার আবেদন জানিয়েছিলেন 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকা। 'বঙ্গভাষায় বিজ্ঞান' শীর্ষক প্রবন্ধে এই পত্রিকা লিখেছেন (মে, ১৮৮১), "সত্য বটে এখন কিছু কিছু বিজ্ঞানের চর্চ্চা আরম্ভ হইতেছে কিন্তু তাহা ইংরাজী ভাষায়। এবং যে যে বিদ্যালয়ে তাহার অধ্যাপনা হয় সর্ব্বসাধারণে ব্যয়ভার স্বীকার করিয়া তাহার ফল পাইতে পারেন না। আরও একটা কথা এই যে, যে অল্প সংখ্যক লোকের মধ্যে বিজ্ঞানের অনুশীলন হইতেছে তাঁহারা উচ্চশ্রেণীর লোক। তাঁহারা বিজ্ঞানের জ্ঞানটুকু মাত্র আয়ত্ত করিলেন কিন্তু সেই জ্ঞান কার্য্যে পরিণত করিয়া কি পরিমাণে যে স্বদেশের উন্নতি করা যায় সে বিষয়ে উদাসীন। কিন্তু বিজ্ঞান যাহাদের জীবিকার উপায় হইবে সেই শ্রমজীবিদিগের মধ্যে যত দিন ইহার বিশেষ চর্চ্চা না হইতেছে ততদিন ইহা দ্বারা এতদ্দেশের কোনও উপকার দর্শিতেছে না। অতএব যে উপায়ে বিজ্ঞান সেই শ্রমজীবি-শ্রেণীতে প্রবেশাধিকার পায় তজ্জন্য সাধারণের যত্ন ও চেষ্টা একান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। শিল্পশাস্ত্র বিজ্ঞান হইতে প্রসূত। বিজ্ঞান ব্যতীত শিল্পের উন্নতি হয় না। এক্ষণে এই বিজ্ঞান ও শিল্প গ্রন্থের নানা বিভাগ ভূরি পরিমাণে অনুবাদিত হউক। বিজ্ঞান ও শিল্পের নানা বিভাগ অনুবাদিত ও প্রচারিত হইলে সকল লোকেরই সুবিধা হইতে পারিবে। ...আমরা বলি যাঁহারা উচ্চ-বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান-চর্চ্চা করিতেছেন তাঁহারা দেশীয় ভাষায় সেই সমস্ত গ্রন্থের অনুবাদ করুন। আর সেই সমস্ত গ্রন্থ নিম্নতম বিদ্যালয়ের পাঠ্য গ্রন্থ হউক, তাহা হইলে ক্রমশঃ বিজ্ঞান-তত্ত্ব সাধারণের মধ্যে প্রচার হইতে থাকিবে এবং

দেশীয় উচ্চ ও নীচ সকল শ্রেণীর লোক রুচি ও প্রবৃত্তি অনুসারে নানা রূপ বৈজ্ঞানিক ব্যবসায়ের সৃষ্টি করিয়া আপনাদিগের অবস্থার উন্নতি করিয়া লইতে পারিবে।"[৫৪] তবে পত্রিকার মতে "বিজ্ঞানের অনুবাদে একটু বিশেষ সাবধানতা চাই। বিজ্ঞানের ভাষা যত সহজ ও সরল হইবে ততই ভাল। এমনকি এদেশীয় নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীপুরুষ পর্য্যন্ত বুঝিতে পারে বৈজ্ঞানিক গ্রন্থের এইরূপ ভাষা হওয়া চাই।"[৫৫] পরিশেষে 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকা বাংলাভাষায় 'বোধসুলভ করিয়া বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব প্রচার' করার জন্য তৎকালের খ্যাতনামা ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের কাছে আবেদন জানিয়েছেন।

কিন্তু মাতৃভাষায় বিজ্ঞান-গ্রন্থ রচনার অসুবিধার কথা বলে ইংরেজিতে লেখার জন্য যাঁরা ওকালতি করেন, তাঁদের অপচেষ্টাকে ধিক্কার জানিয়ে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী লিখেছেন, "যাঁহারা আশা করিয়া নিশ্চিন্ত আছেন যে বাঙ্গালি জনসাধারণ এককালে ইংরেজীতে পণ্ডিত হইয়া উঠিবে তখন আর বাঙ্গালা ভাষায় কোন বৈজ্ঞানিক সাহিত্য প্রণয়নের আবশ্যকতা থাকিবে না, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। আমার সে আশা নাই। বাঙ্গালার জনসাধারণ মাতৃভাষা ত্যাগ করিয়া ইংরাজী ধরুক, সে আকাঙ্ক্ষা আমার মনে প্রবেশ করিতেও পারে না। বর্ত্তমান বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ইংরেজীর স্থানে বাঙালা আসিয়া বসিবে, আমি বরং সেই দিনের আশা রাখি। এই হতভাগ্য দেশে সেদিন শীঘ্র আসিবে না ; কিন্তু আমাদের চেষ্টার অভাবে যদি সেদিন না আসে, তাহা হইলে আমাদের শিক্ষায় ধিক্।"[৫৬]

এই ধিক্কার উচ্চারিত হয়েছে শরৎচন্দ্রের কণ্ঠেও। মাতৃভাষা বিনে এদেশে বিজ্ঞান-সাহিত্য-শিল্প উন্নত ও বিকশিত হতে পারে না, অনুকরণ মানুষকে কলের পুতুল তৈরি করে, মৌলিক চেতনার অধিকারী করে না। যদি নবীন প্রাণের ফসলে দেশকে সুসমৃদ্ধ করতে হয়, তাহলে দেশজ ভাষায় চাষ করতে হবে, বিদেশী ভাষায় নয় —এই উপলব্ধি ছিল শরৎচন্দ্রের। প্রচলিত শিক্ষাবিধি, শিক্ষণীয় বিষয়, ভাষা-সমস্যা প্রভৃতি বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের মতো তিনিও একই অভিমত পোষণ করেছেন। বর্তমান শিক্ষাপ্রণালী প্রবর্তনের পশ্চাতে বৃটিশ-অভিসন্ধির স্বরূপ বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্র বলেছেন, "বিজ্ঞানের যে শিক্ষায় মানুষ যথার্থ মানুষ হয়ে ওঠে, তার আত্মসম্মান জাগ্রত হয়ে দাঁড়ায়, সে উপলব্ধি করে সেও মানুষ, অতএব স্বদেশের দায়িত্ব শুধু তারই, আর কারও নয় —পরাজিতের জন্য এমনি শিক্ষার ব্যবস্থা বিজেতা কি কখনও করতে পারে? তার বিদ্যালয়, তার শিক্ষার বিধি সে কি নিজের সর্বনাশের জন্যেই তৈরি করিয়ে দেবে? সে

কেবলমাত্র এইটুকুই দিতে পারে যাতে তার নিজের কাজগুলি সুশৃঙ্খলায় চলে।"[৫৭]

সুতরাং এদেশের মানুষকে দেশ ও সমাজ-সচেতন নাগরিক-রূপে গড়ে তোলার জন্য তিনি ইংরেজিভাষার পরিবর্তে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের দাবি উত্থাপন করেছেন। শরৎচন্দ্র বলেছেন, "বাঙ্গালী বাংলা ছাড়া চিন্তা করিতে পারে না, ইংরাজ ইংরাজি ছাড়া ভাবিতে পারে না। তাহার পক্ষে মাতৃভাষা ভিন্ন যথার্থ চিন্তা যেমন অসম্ভব, বাঙ্গালীর পক্ষেও তেমনি। তা তিনি যত বড় ইংরাজি জানা মানুষই হউন। বাংলা ভাষা ছাড়া স্বাধীন, মৌলিক বড় চিন্তা কোনমতেই সম্ভব হইবে না।"[৫৮] কারণ 'যথার্থ স্বাধীন ও মৌলিক চিন্তার সাক্ষাৎ মাতৃভাষা ভিন্ন ঘটে না, যথার্থ বড় চিন্তার ফল সংগ্রহ করিবার পথ মাতৃগৃহদ্বারের ভিতর দিয়াই, বাঙ্গালী যখন বাঙ্গালী, সে যখন সাহেব নয়, তখন বিলাতি ভাষার মস্ত বড় ফটকের সম্মুখে যুগ যুগান্তর দাঁড়াইয়াও কোনদিনই সে পথের সন্ধান পাইবে না।'[৫৯]

ইংরেজিভাষায় শিক্ষাগ্রহণের ফলে শিক্ষিতসম্প্রদায় মাতৃভাষা সম্পর্কে উন্নাসিক মনোভাব পোষণ করেন। তাঁরা বাংলায় একটি বাক্যও শুদ্ধভাবে লিখতে সক্ষম হন না। কিন্তু এই অক্ষমতা তাঁরা সগর্বে জাহির করেন; মাতৃভাষায় চিন্তা-ভাবনা করার অক্ষমতার জন্য তাঁরা লজ্জিত নন। এই মর্মান্তিক সত্য চিত্রিত হয়েছে শরৎচন্দ্রের লেখনীতে—"একটা কথা আমার অত্যন্ত দুঃখের সহিত মনে পড়িতেছে, আমার জীবনে আমি এমন দুই-একটি কৃতবিদ্য বাঙ্গালীকে ঘনিষ্ঠভাবে জানিয়াছি যাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত পরীক্ষাগুলিই কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়াও মাতৃভাষা জানা এবং না-জানার মধ্যে কোন পার্থক্যই দেখিতে পাইতেন না। তাঁহারা সব কটাই পাশ করিয়াছেন এবং সরকারি চাকরিতে হাজার টাকা বেতন পাইতেছেন। অর্থাৎ যে সব অদ্ভুত কাণ্ড করিতে পারিলে বাঙ্গালী সমাজে মানুষ প্রাতঃস্মরণীয় হয়, তাঁহারা সেইসব করিয়াছেন। অথচ বাঙ্গালায় একখানা চিঠি পর্যন্ত লিখিতে পারিতেন না।"[৬০]

ইংরেজি-শিক্ষিত বাঙ্গালির বাংলাভাষার জ্ঞান সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের উক্তি অতিশয়োক্তি নয়। ইতিহাসের পাতা খুললে অনেকের উক্তিতেই শরৎচন্দ্রের সমর্থন পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, ইংরেজি-শিক্ষিত ব্যক্তিরা "ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই আপনার মাতৃভাষাকে দৃঢ়সম্বদ্ধ রূপে পান নাই বলিয়া মাতৃভাষা হইতে তাঁহারা দূরে পড়িয়া গেছেন এবং মাতৃভাষার প্রতি তাঁহাদের একটি অবজ্ঞা জন্মিয়া গেছে। বাংলা তাঁহারা জানেন না সে কথা স্পষ্টরূপে স্বীকার না

করিয়া তাঁহারা বলেন, 'বাংলায় কি কোনো ভাব প্রকাশ করা যায় ? এ ভাষা আমাদের মতো শিক্ষিত মনের উপযোগী নহে।" প্রকৃত কথা, আঙুর আয়ত্তের অতীত হইলে তাহাকে টক বলিয়া উপেক্ষা আমরা অনেক সময় অজ্ঞাতসারে করিয়া থাকি।"[৬১] তখন ইংরেজি-জানাটাই ছিল সমাজের কাছ থেকে শ্রদ্ধা ও সম্মান পাওয়ার একমাত্র প্রশস্ত রাজপথ, আর 'বাঙ্গালির ছেলেকে মাথা হেঁট করতে হয় 'শুধু কেবল বাংলা ভাষা জানি' বলতে।'[৬২] কিন্তু যাঁরা পরিশ্রম করে ইংরেজিভাষায় ডিগ্রি অর্জন করতেন; তাঁরা কি যথার্থই ইংরেজিভাষায় সুশিক্ষিত হতেন ? এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন মহাত্মা গান্ধী।

ইংরেজির মাধ্যমে শিক্ষাদান-পদ্ধতির তীব্র সমালোচনা করেছেন মহাত্মা গান্ধী। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে তিনি বলেছেন, "স্বরাজের কথা আমাদের বিদেশী ভাষায় বলিতে হইবে, ইহা অপেক্ষা হীনতা আর কি হইতে পারে ? ···আমরা যদি একে অন্যকে পত্র লিখি তাহাও ভুল ভ্রান্তিযুক্ত ইংরেজিতে লিখি। যাঁহারা ইংরেজিতে এম. এ. উপাধি পান তাঁহাদেরও ইংরেজিতে ভুল থাকে। আমাদের ভাল চিন্তা আমরা ইংরেজির সাহায্যেই প্রকাশ করিয়া থাকি। আমাদের কংগ্রেস-অধিবেশনের কার্যবিবরণী ইংরেজিতে পরিচালিত হয়; আমাদের সবচেয়ে ভালো সংবাদপত্রগুলি ছাপা হয় ইংরেজিতে; আমার মনে হয়, যদি এই রকম ভাবে ইংরেজি ভাষা ব্যবহারের ব্যবস্থা অধিক দিন চলিতে থাকে, আমাদের ভবিষ্যৎবংশীয়গণ আমাদের নিন্দা করিবে, অভিশাপ দিবে।"[৬৩]

১৯১৫ সালে গান্ধীজী ভারতীয় জীবনে মেকলের শিক্ষাপদ্ধতির সর্বনাশা প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে তীব্র মন্তব্য করেছেন, "লক্ষ লক্ষ দেশবাসীকে ইংরেজিনবীশ করার চেষ্টার অর্থ তাদের দাসত্ব-নিগড়ে আবদ্ধ করা; মেকলে যে-শিক্ষাপদ্ধতির ভিত্তি স্থাপন করেন, তা আমাদের ক্রীতদাসে পরিণত করেছে।"[৬৪] ইংরেজি-নির্ভরশীলতা সম্পর্কে তিনি কয়েক বৎসর পরে পুনরায় মন্তব্য করেছেন, "ভারতবর্ষ যে-সব কুসংস্কার দ্বারা আক্রান্ত, তার শিরোমণি হচ্ছে এই কথা বিশ্বাস করা যে স্বাধীনতার ভাবধারায় উদ্দীপ্ত হবার জন্য এবং চিন্তার যথার্থতা গড়ে তোলার জন্য ইংরেজি ভাষার জ্ঞান অপরিহার্য।"[৬৫]

প্রচলিত শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিদের মনোভাব লক্ষ্য করে গান্ধীজী বলেছেন, "প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতির সর্বাপেক্ষা ভীষণ দৃশ্যগোচর অভিশাপ হচ্ছে (এটা আবার আরও একটি গভীর ত্রুটির দ্যোতক) এই যে, এশিক্ষা আমাদের অস্তিত্বের ধারাবাহিকতাকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিয়েছে। সুশিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে সেই যুগকে পূর্বসূরীদের সম্পদভার বহনে উপযুক্ত করা এবং সমগ্র সমাজ-জীবনকে

অসংহতি ও দুর্বিপাকের হাত থেকে বাঁচিয়ে সজীব রাখা। সমাজ-জীবনের সম্পত্তির উত্তরাধিকার-ভার অবিচ্ছিন্ন এবং তাই কোনো সময় সমাজ যদি তার পূর্বসূরীদের কর্মপ্রচেষ্টা ও সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে সম্বন্ধ-বিবর্জিত হয়ে যায় বা কোনো কারণে নিজ সংস্কৃতির জন্য লজ্জা বোধ করে, তাহলে তার সমাধি রচিত হয়েছে বলতে হবে।"[৬৬] সুতরাং তাঁর মতে জাতিকে মৃত্যুর কবল থেকে রক্ষা করতে হ'লে মাতৃভাষার মাধ্যমে দেশের চিত্তের সঙ্গে আধুনিক শিক্ষার সংযোগ-স্থাপন করতে হবে। 'অতএব চাকরির অধিকার নহে, মনুষ্যত্বের অধিকারের যোগ্য হইবার প্রতি যদি লক্ষ্য রাখি, তবে শিক্ষা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য-চেষ্টার দিন আসিয়াছে এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। দেশের লোককে শিশুকাল হইতে মানুষ করিবার সদুপায় যদি নিজে উদ্ভাবন এবং তাহার উদ্যোগ যদি নিজে না করি তবে আমরা সর্বপ্রকারে বিনাশপ্রাপ্ত হইব, অন্নে মরিব, স্বাস্থ্যে মরিব, বুদ্ধিতে মরিব, চরিত্রে মরিব—ইহা নিশ্চয়।"[৬৭] এই সতর্কবাণী উচারণ করে শাসক-শোষকশ্রেণীর শিক্ষানীতির প্রকৃত স্বরূপ উদ্ঘাটনকল্পে কবিগুরু টলষ্টয়ের উক্তি উদ্ধৃত করেছেন, "The strength of the Government lies in the people's ignorance, and the Government knows this, and will therefore always oppose true enlightenment."[৬৮] অর্থাৎ জনসাধারণের অজ্ঞতাতেই সরকারের শক্তি নিহিত। সরকার তা জানেন, এবং সেকারণে তাঁরা প্রকৃত জ্ঞান পরিবেষণে সবসময়ে বাধা দেন। শিক্ষার আলোয় শোষিতশ্রেণী পথের নিশানা পেলে শাসক-শোষকশ্রেণীর সর্বনাশ। তাই এদেশে বৃটিশ-শাসকসম্প্রদায় ও তাঁদের অনুগৃহীত এদেশীয় ভূস্বামী-অনুচরবর্গ সর্বশক্তি দিয়ে মাতৃভাষায় শিক্ষাবিস্তারের প্রয়াসকে প্রতিরোধ করেছেন।

নবম অধ্যায়

ছিঁড়ে আনো ফুটন্ত সকাল

সুদীর্ঘ স্বাধীনতা আন্দোলনকালে ভারতের মানবপ্রেমিক মনীষীরা মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের সপক্ষে ছিলেন। রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা শিক্ষা-আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। তাঁরা অনুভব করেছিলেন, 'শিক্ষার মাধ্যম রূপে ইংরেজিভাষা গ্রহণের অর্থই হ'ল জনসাধারণকে কিছুতেই শিক্ষা না দেওয়া। এই নীতি একটা নতুন শ্রেণী অথবা একটা ক্ষুদ্র বুদ্ধিজীবীগোষ্ঠী সৃষ্টি করেছিল, জনগণের সঙ্গে যাঁদের কোনো সম্পর্ক ছিল না।'[১] কিন্তু জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন এই 'নতুন শ্রেণী'র চিন্তা-ভাবনায় শ্রেণী-স্বার্থেরই প্রতিফলন ঘটেছিল। উনিশ শতকে ইংরেজিভাষায় শিক্ষাদানের নীতি গ্রহণের ফলে এই 'নতুন শ্রেণী'র উদ্ভব হয়েছিল। সেকারণে শিক্ষা-বিষয়ে রামমোহন-দ্বারকানাথ-প্রসন্নকুমারের ভূমিকা সম্পর্কে প্রশ্ন ওঠে। তাঁরা তো ছিলেন একালের বিজ্ঞ-পণ্ডিতদের দৃষ্টিতে উনিশ শতকের নবজাগরণ-আন্দোলনের স্রষ্টা। তাঁরা ধর্ম-সমাজ-শিক্ষা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আন্দোলন করেছেন। কিন্তু এই সমস্ত আন্দোলনের কেন্দ্রমূলে কি ছিলেন দেশের নিরন্ন-অসহায় রায়ত-কৃষকেরা? যদি গ্রামীণ মানুষদের জাগরণের জন্যই এই আন্দোলন করা হয়ে থাকে, তাহলে তাঁদের শিক্ষা-আন্দোলনের ফলে রায়ত-কৃষকেরা কেন শিক্ষালাভের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হলেন? কেন তাঁরা ইংরেজিভাষার পরিবর্তে বাংলাভাষায় শিক্ষাদানের দাবি উত্থাপন করলেন না? অথচ তাঁরা যে সংস্কার-আন্দোলনে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তা তো ইংরেজিভাষার মাধ্যমে নয়, মাতৃভাষায় তাঁরা শহরের মানুষদের কাছে তাঁদের চিন্তা-ভাবনা উপস্থিত করেছিলেন। রামমোহনের বেদ ও উপনিষদের ধর্মাদর্শ আবিষ্কার, জ্ঞানতপস্বী অক্ষয়কুমারের বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদ প্রতিষ্ঠার প্রয়াস, মানবপ্রেমিক বিদ্যাসাগরের সমাজ-সংস্কারের প্রচেষ্টা, ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের ভারতীয় সমাজ-প্রকৃতির স্বরূপ-নির্ধারণ, মাইকেল মধুসূদনের সামন্ততান্ত্রিক চিন্তাদর্শের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ,

রাজেন্দ্রলাল মিত্রের প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা ইত্যাদি সবই তো হয়েছিল মাতৃভাষায়। মাতৃভাষাই ছিল সেই আন্দোলনের প্রধান বাহন। তাসত্ত্বেও 'নবজাগরণ'-আন্দোলনের স্রষ্টা রাজা রামমোহন কেন আধুনিক শিক্ষার আলো দরিদ্রশ্রেণীর অন্ধকার ঘরে পৌঁছে দেবার জন্য মাতৃভাষায় শিক্ষা-প্রসারের দাবি উত্থাপন করেননি ? তিনি কেন ইংরেজিভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য শিক্ষাদানের প্রস্তাব করেছিলেন ? তৎকালীন শিক্ষা-আন্দোলনে রামমোহনের এই ভূমিকার পশ্চাতে কোন্ মনোভাব সক্রিয় ছিল —মানব-হিতৈষণা অথবা শ্রেণী-হিতৈষণা ? এই প্রশ্নের উত্তর নিহিত রয়েছে তাঁদের শিক্ষা-আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে —রায়ত-কৃষকেরা রয়েছেন অশিক্ষা-অজ্ঞতার অন্ধকার রাজ্যে, আর শহরবাসী স্বল্পসংখ্যক মানুষ ইংরেজিভাষার দৌলতে সম্পদ-বৈভবের চূড়ায় বসে বৃটিশ-সাম্রাজ্যশক্তির সহযোগী হয়েছেন ; মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের প্রবল আন্দোলন গড়ে উঠলেও শিক্ষাক্ষেত্রে একচেটিয়া অধিকার হারানোর আশঙ্কায় তাঁরা সে-আন্দোলনের বিরোধিতা করেছেন —সমগ্র উনিশ শতকে ও বিশ শতকে।

মাতৃভাষা-মাধ্যমের পক্ষে চিন্তাশীল শিক্ষাবিদ্‌রা অভিমত প্রকাশ করা সত্ত্বেও ইংরেজি-শিক্ষাভিমানীদের চৈতন্যোদ্রেক হয়নি ; ভাষা-মাধ্যম বিতর্কের অবসান ঘটেনি। গুরুদাস বন্দোপাধ্যায়ের আমল থেকে এ বিষয়ের আলোচনা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের চার দেওয়ালের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় উপাচার্য-রূপে নিযুক্ত হওয়ার পর থেকে তাঁর প্রথম পর্যায়ের কর্মকালে (১৯০৬-১৯১৪ খৃঃ.) বহুবিধ চেষ্টা করেও উগ্র ইংরেজ-প্রেমীদের বাধাদানের ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছ থেকে অন্তত ম্যাট্রিকুলেশন-স্তরে মাতৃভাষার মাধ্যমে পরীক্ষাদানের অনুমতি আদায় করতে সক্ষম হননি। তাছাড়া জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ হলেও মধ্যবিত্তশ্রেণীর মানসিকতা ছিল ইংরেজি-শিক্ষা গ্রহণের অনুকূলে। সেকারণে '১৯০২ সালের মধ্যে ইংরেজি ভাষা-শিক্ষা মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে প্রধান লক্ষ্যরূপে গণ্য হ'ল। স্বাভাবিকভাবে ভারতীয় ভাষা-শিক্ষা অবহেলিত হ'ল ; এমনকি মাতৃভাষা সম্পর্কে ভালো রকম জ্ঞান-অর্জনের পূর্বেই ছাত্রদের প্রায়ই ইংরেজিভাষা-শিক্ষা আরম্ভ করতে হ'ত। এবং মাধ্যমিক-স্তরের একেবারে প্রথম দিকে ইংরেজিকে শিক্ষার মাধ্যম রূপে গ্রহণ করার ফলে শিক্ষণীয় বিষয়গুলিতে দক্ষতা অর্জনের চেয়ে ইংরেজিভাষায় শিক্ষাদানের জন্য যে-অসুবিধাগুলি সৃষ্টি হত, তা অতিক্রম করে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার জন্য ছাত্ররা অধিকাংশ সময় ব্যয় করত।'[২]

কিন্তু চিন্তাশীল মনীষীরা বিদেশী ভাষার শৃঙ্খল থেকে দেশের ছাত্রসমাজকে মুক্ত করার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন। ফলে ভাষা-সংগ্রাম আরো তীব্র হয়ে উঠেছিল। ১৯১৫ সালের ১৭ মার্চ কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় এস. রায়ানিঙ্গার প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন যে, "এই সভা স-সচিব গভর্ণর জেনারেল মহোদয়ের কাছে সুপারিশ করছে যে, প্রাদেশিক সরকার ও প্রশাসনের সঙ্গে পরামর্শ করে সমস্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভারতীয়-ভাষাগুলিকে শিক্ষার মাধ্যম এবং ভারতীয় ছাত্রদের জন্য ইংরেজিকে আবশ্যিক দ্বিতীয় ভাষা-রূপে গণ্য করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হোক।" কিন্তু শিক্ষাক্ষেত্রে একচেটিয়া অধিকার হারাবার ভয়ে ভীত হয়ে ইংরেজি-শিক্ষিত সদস্যরা এই প্রস্তাবের প্রবল বিরোধিতা করেছেন। তাঁদের মতে এই প্রস্তাবের দ্বারা ইংরেজিভাষার মানের অবনতি ঘটবে, মাতৃভাষার পরিভাষা ও সুযোগ্য শিক্ষকের অভাব, অতগুলি দেশজ ভাষার ব্যবহারে শিক্ষার ব্যয়বৃদ্ধি ও জাতীয় ঐক্যের হানি ঘটবে। স্যার হারকোর্ট বাটলার মাতৃভাষাবাহনে শিক্ষিত ছেলেদের বুদ্ধিবিকাশ সহজতর হয় বলে স্বীকার করলেও এবিষয়ে কোনো সাহায্য করেননি। ফলে প্রস্তাবটি পরিত্যক্ত হ'ল। পুনরায় এই বিষয়টি উত্থাপিত হয় ১৯১৭ সালের সিমলার শিক্ষা-সম্মেলনে। শিক্ষা-বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সদস্য স্যার শঙ্করণ নায়ারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনে লর্ড চেমস্‌ফোর্ড মাতৃভাষা মাধ্যমের বিষয়টি আলোচনার জন্য উপস্থিত করেন। কিন্তু তীব্র মতবিরোধের জন্য কোনো সিদ্ধান্ত গৃহীত হ'ল না।

এসময়ে বিশ্বের প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হয়েছে এবং ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অবস্থা ক্রমশ বৃটিশ-সাম্রাজ্য স্বার্থের পরিপন্থী হয়ে উঠেছে। বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলন কেবলমাত্র বঙ্গভঙ্গ-বিরোধিতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, তা বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তিমূলকে আঘাত করেছিল। একদিকে মধ্যবিত্তশ্রেণীর যুবকেরা ক্রমেই বিপ্লবমন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছেন, তাঁদের সশস্ত্র আত্মপ্রকাশ ঘটেছে এবং বহু অত্যাচারীকে প্রাণ দিতে হয়েছে; অন্যদিকে শ্রমিকশ্রেণী সংগঠিত হয়েছেন, ধর্মঘটে-সংগ্রামে শামিল হয়েছেন। বাংলাদেশে ১৯০৫ সালের হাওড়ার বার্ণ কোম্পানির শ্রমিক-কর্মচারিদের ধর্মঘট, ১৯০৬ সালের ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেল-ধর্মঘট, বজবজে ক্লাইভ জুট মিলে শ্রমিক-ধর্মঘট, সরকারি প্রেস-কর্মচারিদের ধর্মঘট, কলকাতা পৌরসভার দু'হাজার ধাঙ্গর-শ্রমিকদের ধর্মঘট, ১৯০৮ সালের কাঁকিনাড়া জুটমিলে ধর্মঘট ইত্যাদি ঘটনাগুলি বাংলাদেশের রাজনৈতিক আবহাওয়াকে উত্তপ্ত করে তুলেছিল। বৃটিশ-পুঁজির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশঙ্কিত

হয়ে 'স্টেটস্‌ম্যান' পত্রিকা লিখেছেন (২৭. ৭. ১৯০৬ খৃঃ.), "এক শিল্পময় ভারত দ্রুত গড়ে উঠছে এবং তার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে শিল্পসমাজের বিশেষত্ব—ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে উঠছে এবং তার সাথে আসবে শ্রম-অশান্তি ও ধর্মঘট।"৩

কেবলমাত্র বাংলাদেশে নয়, ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে শ্রমিক-কৃষক ও মধ্যবিত্তশ্রেণীর সাম্রাজ্যতন্ত্র ও সামন্ততন্ত্র-বিরোধী চেতনার উন্মেষ ঘটেছে এবং তাঁরাও বৃটিশ-শক্তি ও দেশীয় ভূস্বামীশ্রেণীর বিরুদ্ধে আন্দোলনে-ধর্মঘটে অংশ গ্রহণ করেছেন। ১৯০৬ সালের পাঞ্জাবের কৃষি-শ্রমিকদের বেগার-প্রথা, বর্ধিত ভূমিকর ও জলকরের বিরুদ্ধে শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে ওঠে। বৃটিশ-শক্তি ও দেশীয় সামন্ত-শক্তির বিরুদ্ধে মরণপণ সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়ার জন্য আহ্বান জানালেন চরমপন্থী নায়ক অজিত সিং। ১৯০৭ সনের ২১ এপ্রিল বিশাল জনসমাবেশে তিনি মুক্তিসংগ্রামের আহ্বান জানিয়ে বলেছেন, "হিন্দু ভাইসব, মুসলমান ভাইসব, জাঠ ভাইসব, শ্রমিক ভাইসব. সিপাহি ভাইসব, আমরা সবাই এক। বৈদেশিক সরকার আমাদের নিকট ধূলিমুষ্টির ন্যায় তুচ্ছ। (১৯০৬ খৃষ্টাব্দের) ১৬ই এপ্রিল আমরা এই সরকারের বিরুদ্ধে মাথা তুলিয়াছিলাম—ঠিক যেমন বাঙ্গালী ভাইরা ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের ১৬ই অক্টোবর মাথা তুলিয়াছিলেন। আমরা (১৯০৭ খৃষ্টাব্দের) ১৬ই এপ্রিল আবার মাথা তুলিয়াছিলাম। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের মহাবিদ্রোহের সময় শাসকগোষ্ঠী প্রাণের দায়ে কয়েকটি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল। কিন্তু আজ পর্যন্ত তাহার একটিও কার্যে পরিণত করা হয় নাই। মনে রাখিবেন, শাসকগোষ্ঠী আমাদের হুকুমের দাস ব্যতীত আর কিছুই নয়। আপনাদের ভয় কি? আপনারা প্লেগে প্রাণ দিতেছেন, দেশের জন্য প্রাণ দিন। আমরা সংখ্যায় তাহাদের অপেক্ষা অনেক বেশী। সত্য বটে, তাহাদের কামান-বন্দুক আছে। কিন্তু আমাদেরও আছে মুষ্টি। আমরা চাবুক মারিয়া তাহাদের এদেশ হইতে তাড়াইব। আপনারা প্লেগ ও অন্যান্য ব্যাধিতে প্রাণ না দিয়া সেই প্রাণ দেশমাতৃকার জন্য উৎসর্গ করুন। ঐক্যের মধ্যেই আমাদের শক্তি নিহিত। বাংলাদেশের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করুন।"৪

বোম্বাইয়ে ১৯০৫ সালের ফোনিক্স মিলের তিন হাজার শ্রমিকের সংগ্রাম, ১৯০৬ সনের ডাক-বিভাগের শ্রমিক-কর্মচারিদের ধর্মঘট, ১৯০৭ সালের রেল-কারখানাগুলির শ্রমিকদের ধর্মঘট, ১৯০৮ সনের ভারত ও ব্রহ্মদেশের টেলিগ্রাফ-শ্রমিকদের ধর্মঘট, ১৯০৮ খৃষ্টাব্দের ২৪ জুন বাল গঙ্গাধর তিলককে গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে সমগ্র দেশের জনসংগ্রাম ইত্যাদি ঘটনা শাসকশ্রেণীকে আতঙ্কিত

করেছিল। জাগ্রত জনশক্তিকে দমন করার জন্য তাঁরা পাশব-শক্তি প্রয়োগ করেছেন; তাঁরা প্রবর্তন করেছেন সিডিশাস মিটিংস অ্যাক্ট (১৯০৭ খৃঃ.) ও নতুন প্রেস অ্যাক্ট (১৯১০ খৃঃ.)। বোম্বাইয়ের শ্রমিকশ্রেণী তিলকের মুক্তির দাবিতে কারখানা ছেড়ে রাস্তায় বেরিয়ে এলে তাঁরা রক্তের বন্যায় শ্রমিক-প্রতিরোধকে ভেঙে ফেলার চেষ্টা করেছেন। এই লড়াইয়ে শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক চেতনা লক্ষ্য করে লেনিন বলেছেন, "জনগণ যখন দাসত্ব-লুণ্ঠন আর ধ্বংসকারী মূলধন ও ধনতান্ত্রিক ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান আরম্ভ করিতেছে, তখনই স্বদেশে শ্রমিক-আন্দোলনের অগ্রগতিতে ক্রুদ্ধ এবং ভারতবর্ষের বৈপ্লবিক সংগ্রামে ভীত-সন্ত্রস্ত উদারপন্থী বৃটিশ-বুর্জোয়ারা, সর্বোচ্চ স্তরের নিয়মতান্ত্রিকতার মধ্য দিয়া আসিলেও, সর্বাপেক্ষা 'সভ্য' য়ুরোপীয় রাষ্ট্রনায়কগণ কিরূপ বীভৎস বর্বরতার অনুষ্ঠান করিতে পারে তাহা ক্রমশ তাহারা অধিক ঘন ঘন, ক্রমশ স্পষ্টতর এবং ক্রমশ লক্ষণীয়ভাবে জাহির করিতেছে।...ভারতবর্ষের জনসাধারণ তাহাদের লেখক ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে রক্ষা করিবার জন্য সংগ্রামে অবতীর্ণ হইতে আরম্ভ করিয়াছে। ভারতের গণতান্ত্রিক নায়ক তিলকের বিরুদ্ধে বৃটিশ-শৃগালের দল দণ্ডাদেশ ঘোষণা করিয়াছে দীর্ঘকালের নির্বাসন-দণ্ড। বৃটিশ 'হাউস অব কমন্স্'-এ প্রশ্নোত্তরে প্রকাশিত হইয়াছে যে, ভারতীয় জুরিরা তাঁহার মুক্তির জন্যই সুপারিশ করিয়াছিলেন। কিন্তু সংখ্যাধিক বৃটিশ-জুরিদের ভোটের জোরেই এই দণ্ড দেওয়া হইয়াছে। একজন গণতান্ত্রিক নায়কের বিরুদ্ধে অর্থপিশাচ মূলধনীদের পদলেহী কুকুরদের এই প্রতিহিংসামূলক দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে বোম্বাইয়ের রাজপথে প্রতিবাদ-অভিযান এবং ধর্মঘটের ঝড় বহিতেছে।

"ভারতবর্ষের শ্রমিকশ্রেণী ইতিমধ্যেই শ্রেণীসচেতন রাজনীতিক গণ-সংগ্রাম চালনার জন্য যথেষ্ট যোগ্যতা অর্জন করিয়াছে। সুতরাং ভারতবর্ষে রুশীয় পদ্ধতিতে পরিচালিত বৃটিশ-শাসনের শয়তানী খেলা এবার শেষ হইতে চলিয়াছে।"[৫]

শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্তশ্রেণীর সংগঠিত চেতনার বহিপ্রকাশে কংগ্রেসের নরমপন্থী নেতারা ভীত হয়েছেন এবং তারফলে কংগ্রেসের মধ্যে ভাঙন ধরেছে। ১৯০৭ সালের কংগ্রেসের সুরাট-অধিবেশনে নরমপন্থী ও চরমপন্থীরা কংগ্রেসকে দু'টুকরো করেন এবং ১৯১৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তাঁরা দু'টি পৃথক দল হিসাবে কাজ করেন। এ সময়ে দুনিয়া-জোড়া ভাগ-বাঁটোয়ারার প্রশ্নে শুরু হয়েছে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (৪ আগস্ট, ১৯১৪ খৃঃ.) এবং চার বছর পরে বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি

ঘটেছে (১১ নভেম্বর, ১৯১৮ খৃঃ.)। যুদ্ধ চলাকালে গণ-আন্দোলনের আঘাতে ভারত-সাম্রাজ্যের বিপদ যাতে না ঘটে, সেজন্য বৃটিশ-শাসকেরা নানাবিধ দমনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। 'অবস্থা যাহাতে তাঁহাদের আয়ত্তের বাহিরে যাইতে না পারে সেইজন্য জরুরী আইন ও বিশেষ ক্ষমতা চালু করা হইল। এগুলির মধ্যে ভারত-রক্ষা আইন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এইসব আইনের বলে বিভিন্ন বিপ্লবী দলের সভ্যদের কারারুদ্ধ বা অন্তরীণে আটক রাখা হইল। স্বাধীনতাকামীদের বেড়াজালে আটক করার এই সরকারি অভিযানে যুদ্ধের প্রথম দিকে রাজনৈতিক আন্দোলনের উর্দ্ধতন মহলের অনেকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই সহযোগিতা করিয়াছিলেন।'[৬]

নরমপন্থীদের প্রভাবাধীন কংগ্রেস-নেতারা সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী গণ-সংগ্রামকে তীব্র না করে বৃটিশ-শক্তির সঙ্গে সর্বাত্মক সহযোগিতার নীতি গ্রহণ করেছিলেন। যুদ্ধ চলাকালীন কংগ্রেসের অধিবেশনগুলিতে (১৯১৪ থেকে ১৯১৬ খৃ:.) বিভিন্ন প্রদেশের বৃটিশ-গভর্ণরেরা উপস্থিত হয়ে আশীর্বাণী উচ্চারণ করেছেন। কংগ্রেস-নেতৃবৃন্দও যুদ্ধের সমর্থনে প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন এবং ইংরেজ-শাসকদের প্রতি তাঁদের আনুগত্য ঘোষিত হয়েছে। লণ্ডনে কংগ্রেসের প্রতিনিধিদল (লালা লাজপত রায়, মিঃ জিন্না, মিঃ সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ প্রমুখ) ঘোষণা করেন, "দেশীয় নৃপতিবৃন্দ ও ভারতের জনসাধারণ অগৌণে ও স্বেচ্ছায় গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে যথাশক্তি সহযোগিতা করিবে এবং সাম্রাজ্য-রক্ষার যুদ্ধে দ্রুত জয়লাভের উদ্দেশ্যে মহামান্য সম্রাটের গভর্ণমেণ্ট যাহাতে ভারতের শক্তি ও সম্পদ কাজে লাগাইতে পারেন তাহারা সেই সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করিবে।"[৭]

লণ্ডনে অবস্থানকালে গান্ধীজী ভারত-সচিবের কাছে এক চিঠিতে লিখেছেন, "আমাদের অনেকে এরূপ সিদ্ধান্ত বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে করিতেছে যে, সাম্রাজ্যের এই ঘোর সঙ্কটের কালে যে-সব ভারতীয় ইংলণ্ডে রহিয়াছেন ও রহিয়া যাইবেন তাঁহারা বৃটিশ-কর্তৃপক্ষের নিকট কাজ করিবার জন্য নিজেদের বিনাসর্তে সমর্পণ করিবেন। আমাদের এই চিঠি-সংলগ্ন তালিকায় যাঁহাদের নাম আছে তাঁহাদের সকলের পক্ষ হইতে আমরা কর্তৃপক্ষের নিকট যুদ্ধের কাজে নিজেদের আত্ম-নিয়োগের প্রস্তাব করিতেছি।"[৮]

১৯১৪ সনে কংগ্রেস-সভাপতি ভূপেন্দ্রনাথ বসু বলেছেন, "সাম্রাজ্যের অন্য সকলের সঙ্গে বৃটিশ-সাম্রাজ্যের এই চরম সঙ্কটের সময় ভারতের সকল প্রদেশের ও সকল সম্প্রদায়ের লোকের কেবল একমাত্র চিন্তা—আমরা যুদ্ধ করিয়া

আমাদের সাম্রাজ্য রক্ষা করিব।"[৯]

১৯১৫ সালে সভাপতি সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ বলেছেন, "আজ ভারতের সর্বত্র, উচ্চ নীচ সকল শ্রেণীর মধ্যে রাজভক্তির প্রবল বন্যা বহিতেছে —শিখ পাঠানের ন্যায় বাঙ্গালীও আজ সম্রাটের পতাকাতলে যুদ্ধ করিবার জন্য ব্যগ্র। ···আমরা পুনঃ পুনঃ বলিয়াছি, আবার বলিতেছি, এই নিদারুণ সঙ্কটের সময় আমরা গভর্ণমেণ্টকে কোনরূপে বিব্রত করিতে চাই না। আমার দেশবাসীরা যেভাবে বিনা দ্বিধায় স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সরকারকে যুদ্ধে সর্বপ্রকার সাহায্য করিয়াছে তাহার জন্য আমরা কোন অনুগ্রহ বা সুবিধার দাবি করিব না।"[১০]

যুদ্ধশেষে স্বায়ত্তশাসন-লাভের আশায় কংগ্রেস-নেতৃবৃন্দ ইংরেজ-সরকারকে সর্বাত্মক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। সৈন্যবাহিনীতে যোগ দেবার জন্য গান্ধীজী দেশের যুবসমাজের কাছে আহ্বান জানালেন, "সৈন্যবাহিনীতে আমাদের নাম তালিকাভুক্ত করা আমাদের কর্তব্য। সাম্রাজ্য-রক্ষার্থে অংশ-গ্রহণ করাই হ'ল স্বরাজ-লাভের সহজ ও সোজা পথ।"[১১]

একেবারে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ। উৎপীড়ন-নিপীড়নের বিরুদ্ধে একটা প্রতিবাদও নয়। কেবলমাত্র যুদ্ধের মওকায় ভারতীয় শিল্পপতিদের সুবিধালাভ ও স্বরাজলাভের প্রত্যাশা। এর সুযোগ গ্রহণ করেছেন শাসকশ্রেণী। 'বিংশ শতাব্দীতে ইংরেজের শাসননীতির একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, হিন্দুদের কল্পিত দেবদেবীর ন্যায় তাহাদের একহাতে ছিল খড়্গ অপর হাতে বরাভয়।"[১২] সুতরাং শ্বেতাঙ্গ-সরকার অত্যাচারের ষ্টীম রোলার চালিয়ে সংগ্রামী জনগণের মেরুদণ্ড ভেঙে ফেলার চেষ্টা করেছেন। ৩৮ জনের ফাঁসি, ৫৮ জনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর এবং ৫৮ জনের নির্দিষ্টকালের জন্য দ্বীপান্তর বা সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়।[১৩] অন্যদিকে ভারতীয় শিল্প-মালিকদের কিছু সুবিধা দেওয়া হয়। '১৯১৫ সালে বিদেশ থেকে ভারতে আমদানিকৃত জিনিসপত্রের ওপর শতকরা ৫ টাকা শুল্ক বসানো হয়। এবং পরবর্তী বছরে আরও কিছু দ্রব্যসামগ্রী, বিশেষ করে আমদানিকৃত সূতী বস্ত্রের ওপর শুল্ক আরও বৃদ্ধি করা হয়। বৃহৎ পুঁজিপতিগোষ্ঠী, বিশেষ করে সূতীবস্ত্রের মালিকগোষ্ঠী এতে নিঃসন্দেহে লাভবান হয়।'[১৪]

১৯১৭ সালে বিশ্বের মেহনতী মানুষের জীবনে ঘটল নবীন সূর্যোদয়। রাশিয়ার গণতান্ত্রিক বিপ্লব (মার্চ, ১৯১৭ খৃঃ) সমগ্র পৃথিবীর শ্রমজীবী মানুষকে দাসত্বের-শোষণের শৃঙ্খল ভেঙে ফেলতে অনুপ্রাণিত করেছে। আতঙ্কিত হয়েছেন সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি। তাঁরা নবজাত শিশুকে মেরে ফেলার জন্য

নানাবিধ ষড়যন্ত্র করেছেন। বিপ্লবের শত্রুদের উৎসাহ-মদত দিয়েছেন। কিন্তু 'দিনে দিনে বাড়ে কালকেতু' —ঘটে অক্টোবর বিপ্লব। ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়ে রুশ-বিপ্লবের প্রভাব। বৃটিশ-সরকার শঙ্কিত-সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছেন। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের ২০ আগস্ট ভারতসচিব মণ্টেগু ঘোষণা করেছেন, "বৃটিশ-সাম্রাজ্যের অবিভাজ্য অংশ হিসাবে ভারতবর্ষে দায়িত্বশীল গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে ক্রমে ক্রমে স্বায়ত্তশাসন সম্পন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহ গড়িয়া তোলাই বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের লক্ষ্য" এবং "এই বিষয়ে যথাসত্বর বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট যথাসাধ্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন।"[১৫] কংগ্রেস-নেতৃবৃন্দ এই ঘোষণাকে স্বাগত জানিয়ে কলকাতা-অধিবেশনে প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন, "ঐক্যবদ্ধ ভারতবাসীর মুখপাত্র-রূপে এই কংগ্রেস মহামান্য সম্রাটের প্রতি তাহাদের গভীর আনুগত্য ও আসক্তি জ্ঞাপন করিয়া সশ্রদ্ধ মনে জানাইতেছে যে, বৃটিশ শক্তির সহিত তাহাদের সম্পর্ক তাহারা অটুট রাখিবে এবং বৃটিশ-সাম্রাজ্যের বিপদে সকল সময়েই তাহারা সর্বতোভাবে উহাকে রক্ষা করার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ থাকিবে।"[১৬]

ভারতীয় জনমতকে বিভ্রান্ত করার জন্য ইংরেজ-সরকারের যেমন রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয়েছে, তেমনি বাংলাদেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়কে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-ব্যবস্থা পর্যালোচনার জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন গঠনের সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয়েছে। ১৯১৭ সালের ৬ জুলাই গঠিত এই কমিশনের সভাপতি ছিলেন লীড্‌স্ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ এম. ই. স্যাডলার। স্যাডলার কমিশন নামে সুপরিচিত এই কমিশনের আটজন সদস্যের মধ্যে মাত্র দু'জন ভারতীয় ছিলেন – স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এবং ডঃ জিয়াউদ্দীন আহ্‌মদ। কমিশনের কার্যাবলীর বিভিন্ন ধারার মধ্যে দু'টি ধারা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য —(১) "কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান সংগঠন ও অনুমোদিত কলেজগুলির কর্মপ্রণালী, শিক্ষার মান, পরীক্ষা-ব্যবস্থা ও শিক্ষক-বন্দোবস্ত সম্পর্কে তদন্ত করা।" এবং (২) "বর্তমান গঠনতন্ত্র, প্রশাসন ও শিক্ষানীতি বিষয়ে যা কাম্য বলে মনে হবে তা সুপারিশ করা।"[১৭]

১৯১৯ খৃষ্টাব্দের ১৮ মার্চ পাঁচ খণ্ডে স্যাডলার কমিশনের বিশাল রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। এর সঙ্গে থাকে অতিরিক্ত আট খণ্ড পরিশিষ্ট। কলকাতা সহ ভারতের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-ব্যবস্থার পর্যালোচনা করে কমিশনের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, "বাংলাদেশের, প্রকৃতপক্ষে সমগ্র ভারতের সাম্প্রতিক ইতিহাসের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্যগুলির অন্যতম হ'ল, বিগত দু'দশকে বিশেষ করে ১৯০৪ সালের বিশ্ববিদ্যালয়-আইনের পর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ছাত্রসংখ্যা

অত্যন্ত দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি ঘটেছে। ১৯০৪ সনে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইণ্টার-মিডিয়েট পরীক্ষা দিয়েছে ২৪৩০ জন, ঐ পরীক্ষায় বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ৪৫৭ জন এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ৩৮৩২ জন পরীক্ষার্থী ছিল। ১৯০৪ সালে এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলির বয়স ৫০ বছরের কম হওয়া সত্ত্বেও এই সংখ্যা বিস্ময়কর। কিন্তু ১৯১৭ সালে মাদ্রাজের ৫৪২৪, বোম্বাইর ১২৮১ এবং কলকাতার ৮০২০ জন পরীক্ষার্থীর চেয়ে কম ছিল না। এর অর্থ হ'ল, সর্বত্র উল্লেখযোগ্য ভাবে ছাত্রসংখ্যার বৃদ্ধি ঘটেছে। বিশেষত, বাংলাদেশে যেভাবে বৃদ্ধি হয়েছে, ভারতের আর কোথাও তা হয়নি। এমনকি বিশ্বের যে-কোনো অংশে এর সমান্তরাল উদাহরণ পাওয়া যাবে না। ছাত্রসংখ্যার এই ভয়ঙ্কর বোঝায় ভারাক্রান্ত হয়ে বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজীয় শিক্ষা ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়েছে। এটাই শিক্ষাব্যবস্থার ত্রুটি বিশেষ ভাবে নির্দেশ করে। যদি ন্যায় বিচার করতে হয় এবং দেশের প্রয়োজনার্থে বাংলার যুবকদের শিক্ষা-লাভের আগ্রহকে যদি ব্যবহার করতে হয় তাহলে বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থার চরম ও দুঃসাহসিক পরিবর্তন ও উন্নয়ন প্রয়োজন।

"(২) বাংলাদেশ ও যুক্তরাজ্যের মধ্যে তুলনা করলে এই ঘটনাগুলির সম্পূর্ণ গুরুত্ব উপলব্ধি করা যাবে। এই দু'দেশের জনসংখ্যা প্রায় এক —প্রায় ৪৫,০০০,০০০। এই দু'দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি লাভেচ্ছুক ছাত্রসংখ্যারও কৌতূহলোদ্দীপক মিল রয়েছে —প্রায় ২৬,০০০। কিন্তু বাংলাদেশে সমগ্র জনসংখ্যার প্রতি দশ জনে একজন লিখতে ও পড়তে পারে। যারা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা গ্রহণ করছে, তাদের আনুপাতিক হার যুক্তরাজ্যের তুলনায় দশ গুণ বেশী।

"(৩) বৈসাদৃশ্যের এটাই কেবলমাত্র উল্লেখযোগ্য নয়। যুক্তরাজ্যের ছাত্রসংখ্যার মধ্যে বাংলাদেশ-সহ সমগ্র বৃটিশ-সাম্রাজ্যের ছাত্রসংখ্যাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে; বাংলাদেশের ছাত্ররা সকলেই ভারতীয়। পুনরায়, যুক্তরাজ্যের ছাত্রসংখ্যার উল্লেখযোগ্য অংশ হ'ল মেয়েরা। কিন্তু বাংলাদেশে ছাত্রীসংখ্যা, বর্তমান সামাজিক অবস্থা সম্ভবত অনেকদিন টিকে থাকবে, প্রকৃতপক্ষে অত্যন্ত কম। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হ'ল, যুক্তরাজ্যের ছাত্রসংখ্যার একটি বৃহৎ অংশ বৃত্তিমূলক পাঠক্রম —চিকিৎসা, আইন, ব্রহ্মবিদ্যা, শিক্ষণবিদ্যা, যন্ত্রবিজ্ঞান অথবা প্রযুক্তিবিজ্ঞান —গ্রহণ করে। কিন্তু বাংলাদেশে আইনের ছাত্রসংখ্যা অনেক হলেও চিকিৎসা-বিদ্যার ছাত্রসংখ্যা যুক্তরাজ্যের তুলনায় অনেক কম; যন্ত্রবিজ্ঞানের ছাত্রসংখ্যা মুষ্টিমেয়; ব্রহ্মবিদ্যার ছাত্ররা—হিন্দু অথবা মুসলমান —বিশ্ববিদ্যালয়ের

শিক্ষা গ্রহণ করে না ; শিক্ষণবিদ্যা গ্রহণেচ্ছুক ছাত্রসংখ্যা খুবই কম এবং প্রযুক্তি-বিজ্ঞানে কার্যত কোনো ছাত্র নেই। কারণ বাংলাদেশে শিল্প এখনো শৈশবে এবং প্রধানত ইংলণ্ড থেকে বিশেষজ্ঞরা এদেশে আসেন।

"(৪) সুতরাং এথেকে বুঝা যায় যে, যুক্তরাজ্যের তুলনায় বাংলাদেশের ছাত্রসংখ্যার একটা অস্বাভাবিক বৃহদংশ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা গ্রহণ করে এবং অত্যন্ত ক্ষুদ্র অংশ বৃত্তিগত শিক্ষা গ্রহণের জন্য ভর্তি হয়। ছাব্বিশ হাজার ছাত্রের মধ্যে বাইশ হাজারের বেশী ছাত্র সাহিত্য-বিষয়ক পাঠ-চর্চা করে, যারা প্রশাসনিক ও করণিক কাজ, শিক্ষকতা এবং (অপ্রত্যক্ষভাবে) আইনের কাজ ছাড়া অন্য কোনো কাজে উপযুক্ত নহে। কিন্তু যুক্তরাজ্যে (যদি শিক্ষক-শিক্ষণকে বৃত্তিগত শিক্ষা বলে গণ্য করা হয়) এর প্রায় বিপরীত চিত্র দেখা যায়। অন্য যে কোনো বৃহৎ জনসংখ্যা-বিশিষ্ট রাষ্ট্রের সঙ্গে তুলনা করলে ফল কমের দিকেই নির্দেশ করবে। বাংলা যে-কোনো সভ্যদেশের মতো নয়, কারণ এত উচ্চ-সংখ্যক শিক্ষিত লোক তাদের স্বাভাবিক লক্ষ্য হিসাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিকে গ্রহণ করেছে ও সেই লক্ষ্য পূরণের জন্য পড়াশুনা এবং একেবারে সাহিত্যবিষয়ক পেশা গ্রহণ করার ফলে তাদের পেশাগত শিক্ষা ব্যাহত হয়।"[১৮]

উচ্চশিক্ষার বিস্তার সম্পর্কে স্যাডলার কমিশনের অভিমত অতিরঞ্জিত নয়। পূর্ববর্তী শতকে উচ্চশিক্ষার ওপরে যে গুরুত্ব আরোপিত হয়েছিল, তা এসময়েও অব্যাহত ছিল। ১৮৫৪ থেকে ১৯০২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে সরকারি শিক্ষানীতির মূল লক্ষ্য ছিল শিক্ষার উন্নয়নের পরিবর্তে উচ্চশিক্ষা বিস্তার। সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মচারিরা মনে করতেন কোনো স্কুল না থাকার চেয়ে কিছু স্কুল থাকা ভালো। কিন্তু ১৮৫৪ থেকে ১৯০২ সালের শিক্ষার ফল সম্পর্কে এক সমীক্ষায় দেখা গেল যে, এসময়ে কার্যত শিক্ষার অগ্রগতি ঘটেনি, বরং গুণগত মানের অবনতি ঘটেছে। ফলে ১৯০২ খৃষ্টাব্দ থেকে সরকারি শিক্ষানীতির সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটল এবং এবিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন লর্ড কার্জন। মাধ্যমিক ও কলেজ-স্তরে শিক্ষার স্বেচ্ছামূলক ব্যাপক বিস্তৃতির সপক্ষে ছিলেন দেশের শিক্ষিত-সম্প্রদায়। কিন্তু শিক্ষিত যুবকদের মধ্যে ক্রমশ বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ায় এবং জাতীয় চেতনার বিকাশ ঘটায় কার্জন শিক্ষার মানোন্নয়নের অজুহাতে স্কুল-কলেজের সংখ্যাহ্রাসের চেষ্টা করেছিলেন। অন্যদিকে প্রাথমিক শিক্ষা-প্রসারের কথা বলা হলেও এখানে মানোন্নয়নের নীতি অনুসৃত হওয়ায় প্রাথমিক শিক্ষার আশানুরূপ বিস্তৃতি ঘটল না। ১৯০১-০২ থেকে ১৯৩৬-৩৭ সালের মধ্যে সমগ্র ভারতবর্ষের শিক্ষাচিত্র অপর পৃষ্ঠার সারণী [১৭]তে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে :

বিভিন্ন শ্রেণীর শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান	শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা			শিক্ষার্থী-সংখ্যা		
	১৯০১-০২	১৯২১-২২	১৯৩৬-৩৭	১৯০১-০২	১৯২১-২২	১৯৩৬-৩৭
১. বিশ্ববিদ্যালয়	৫	১০	১৫	সংখ্যা পাওয়া যায়নি	সংখ্যা পাওয়া যায়নি	৯,৬৯৭
২. আর্টস্ কলেজ	১৪৫	১৬৫	২৭১	১৭,৬৫১	৪৫,৪১৮	৮৬,২৭৩
৩. প্রোফেসনাল কলেজ	৪৬	৬৪	৭৫	৫,৫৫৮	১৩,৬৬২	২০,৬৪৫
৪. মাধ্যমিক বিদ্যালয়	৫,৪৯৩	৭,৫৩০	১৩,০৫৬	৬,২২,৭৬৮	১১,০৬,৮০৩	২২,৮৭,৮৭২
৫ প্রাথমিক বিদ্যালয়	৯৭৮৫৪	১,৫৫,০১৭	১,৯২,২৪৪	৩২,০৪,৩৩৬	৬১,০৯,৭৫২	১,০২,২৪,২৮৮
৬. বিশেষ শ্রেণীর বিদ্যালয়	১,০৮৪	৩,৩৪৪	৫,৬৪৭	৩৬,৩৮০	১,২০,৯২৫	২,৫৯,২৬৯
মোট অনুমোদিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	১,০৪,৬২৭	১,৬৬,১৩০	২,১১,৩০৮	৩৮,৮৬,৪৯৩	৭৩,৯৬,৫৬০	১,২৮,৮৮,০৪৪
৭. অননুমোদিত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান	৪৩,০৮১	১৬,৩২২	১৬,৬৪৭	৬,৩৫,৪০৭	৪,২২,১৬৫	৫,০১,৫৩০
সর্বমোট	১,৪৭,৭০৮	১,৮২,৪৫২	২,২৭,৯৫৫	৪৫,২১,৯০০	৭৮,১৮,৭২৫	১,৩৩,৮৯,৫৭৪

উক্ত সারণীতে লক্ষ্য করা যায় যে, বিগত শতকের চুয়াল্লিশ বছরের তুলনায় এই শতকের ছত্রিশ বছরের মধ্যে উচ্চশিক্ষার ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটেছে এবং এসময়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের মানসিকতারও পরিবর্তন হয়েছে। আমরা দেখেছি, বিগত শতকে সরকারি ভালো পদে চাকরিলাভের আশায় ছাত্রদের মনে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি লাভের প্রবল আকাজ্ক্ষা ছিল। সেসময়ে গ্র্যাজুয়েটদের সংখ্যা কম ছিল এবং তাঁরা প্রায় সকলেই চাকরি পেয়েছিলেন। কিন্তু ১৯০২ সাল থেকে অবস্থার পরিবর্তন ঘটল। গ্র্যাজুয়েটদের সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি ঘটেছিল এবং সরকারি চাকরি পাওয়া ক্রমেই দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছিল। ১৯২১ সালের মধ্যে শিক্ষিত বেকার-সংখ্যার ক্রমশ বৃদ্ধিতে প্রত্যাশিত দুর্দশার আতঙ্কে কলেজীয় শিক্ষাক্ষেত্রের বাতাস ভারী হয়ে উঠেছিল। সুতরাং সরকারি চাকরি-লাভের বিষয়টি আর কলেজীয় শিক্ষা-বিস্তারের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। এসময়ে শিক্ষা-প্রসারের অন্যতম কারণ ছিল বৃত্তিগত শিক্ষাগ্রহণের ব্যাপক সুযোগ না থাকায় তরুণেরা কলেজের শিক্ষাগ্রহণের জন্য ভিড় করেছিলেন।

কিন্তু সমাজ-জীবনে তার ফল হয়েছিল ভয়ঙ্কর। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর ভাষায় বলা যায়, "ইংরাজী শিক্ষার প্রথম আবির্ভাবকালে যে সকল মহারত্ন সহসা আবির্ভূত হইয়া সমাজকে উল্টাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের হৃদয়ের উৎসাহবাহ্ন শেষ পর্য্যন্ত হাকিমী, উকীলী, কেরাণীগিরি প্রভৃতিতে কথঞ্চিৎ উপশমিত হয়। সেই অবধি আজ পর্য্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়-প্রদত্ত শিক্ষার বলে হাকিম ও উকীল ও কেরাণীতে দেশটা প্লাবিত হইয়া গেল। ফলতঃ মূষিক অতিবৃষ্টি প্রভৃতির ন্যায় গ্রাজুয়েটের অতিসৃষ্টি রাষ্ট্রের পক্ষে একটা ঈতি-স্বরূপ বলিয়া গণ্য হইতেছে। রাজা ব্যস্ত; ইহাদিগকে লইয়া কি করিবেন? সমাজ ব্যস্ত, কিরূপে ইহাদের খোরাক যোগাইবে; বিশ্ববিদ্যালয়-জননীও প্রসূত অপোগণ্ডগুলির সংখ্যাধিক্যে লজ্জিতা ও কাতরা। আমাদের মত যাহারা বিশ্ববিদ্যালয়-মাতার অকৃতী সন্তান, তাহারাও ভ্রাতৃসংখ্যাধিক্যে ভীত হইয়া সম্বোধন করিয়া ডাকিতেছে,—'সম্বর! সুভগে, দিনকতক ক্ষান্তি দাও; এ যদুকুল আর বাড়াইয়া ফল কি! আমাদের খোরাকের কিছু আধার হউন! শেষে ভূভার হরণের জন্য অবতারের প্রয়োজন যেন না হয়! জননী, উকীল-প্রসবিনী, উকীলের আর স্থান নাই মা।

"অন্য দেশে কি অবস্থা, জানি না; কিন্তু সম্প্রতি ভারতবর্ষে লোকে জীবিকার্জ্জনের পন্থা শিখিবার জন্য বিদ্যামন্দিরে প্রবেশ লাভ করে। এবং ইহাও একটা লোমহর্ষণ সত্য কথা, যে ব্যক্তি বিদ্যামন্দির হইতে বাহির হইয়া

অর্থোপার্জনে সমর্থ না হইল, তাহার জীবন নিরর্থক বলিয়া বিবেচিত হয়। সমাজ তাহাকে অবজ্ঞা করে, তাহার আত্মীয় স্বজন তাহাকে টিট্‌কারি দেয়; সে দুষ্কৃতকারীর মত মুখ ঢাকিয়া লোকসমাজে বেড়ায়; তাহার জীবনে ভারবোধ হয়। সে অক্ষম ও ভাগ্যহীন, সংসারমধ্যে সে দয়ার পাত্র।"[২০]

ভাষা-বিষয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ও সমাজ-জীবনের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের অভিমত সংগ্রহ করেছেন। তাঁরা শান্তিনিকেতনে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁর শিক্ষা সম্পর্কিত অভিমত সংগ্রহ করেন এবং তার সারমর্ম কমিশনের রিপোর্টে প্রকাশিত হয় —"স্যার রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস যে, ইংরেজিভাষা দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে দক্ষতার সঙ্গে নিপুণভাবে শেখানো প্রয়োজন এবং মাতৃভাষা অবশ্যই মাধ্যমিক শিক্ষার (এমনকি কলেজ থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত) প্রধান মাধ্যম হবে। ...তাঁর অভিমত হ'ল, পাশ্চাত্য সংস্কৃতির মৌলিক বিষয়গুলি সমগ্র বাংলাদেশের জনসাধারণের কাছে সর্বব্যাপী শিক্ষার মাধ্যমে পৌঁছে দিতে হবে। কিন্তু তা কেবলমাত্র মাতৃভাষার ব্যাপক ব্যবহারের দ্বারাই সম্ভব। মানুষের সহজাত প্রতিভা, বিশেষত কবিতা আবৃত্তি ও গল্প-বলার ক্ষমতা, সঙ্গীত-প্রতিভা, হাতের কাজে (যদিও খুব অবহেলিত) দক্ষতা, কল্পনাশক্তি ও সংবেদনশীলতার প্রকাশকে উন্নত করাই শিক্ষার লক্ষ্য হওয়া উচিত। সেইসঙ্গে জাতীয় চরিত্রের ত্রুটি ও দুর্বলতাগুলিকে দূর করার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞানদান, সামাজিক উন্নতির উদ্দেশ্যে সুযোগ-সুবিধাগুলির সতর্ক ব্যবহারকল্পে অন্যান্যদের সঙ্গে নিরন্তর সহযোগিতার অভ্যাস গড়ে তোলার জন্য শিক্ষাদান এবং সর্বজনীন কল্যাণের আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি করাই হবে শিক্ষার লক্ষ্য।"[২১]

ভাষা-মাধ্যমের বিষয়ে স্যাডলার কমিশনের সিদ্ধান্ত ছিল গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষিতসম্প্রদায়ের মাতৃভাষার জ্ঞান দেখে কমিশন মন্তব্য করেছেন, "আমাদের সুদৃঢ় অভিমত হ'ল যে, শিক্ষাব্যবস্থায় কিছু ত্রুটি রয়েছে যার ফলে একজন শিক্ষার্থী পাঠশেষে তাঁর মাতৃভাষায় স্বচ্ছন্দগতিতে কথা বলতে কিংবা লিখতে অক্ষম হন। এটা বিতর্কাতীত যে, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে, ইণ্টারমিডিয়েট কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে মাতৃভাষা-চর্চার উন্নয়নের জন্য সুসম্বদ্ধ প্রয়াস করা উচিত।"[২২]

সুতরাং কমিশনের সুপারিশে বলা হ'ল, "মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে বর্তমানে ইংরেজি-মাধ্যমের ব্যবহার অত্যধিক যা ছাত্রদের শিক্ষা ও ভাষা-মাধ্যমের যুক্তিসঙ্গত ব্যবহারের পক্ষে ক্ষতিকারক। সুতরাং এবিষয়ে সুচিন্তিত

পরিবর্তনের প্রয়োজন এবং সম্ভবত এই নিয়মই বাঞ্ছনীয় যে, মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে ইংরেজি ও গণিত ব্যতীত সমস্ত বিষয়ের মাধ্যম মাতৃভাষা করতে হবে।"[২৩] ভাষা-মাধ্যম বিষয়ে কমিশনের এই সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণরূপে সন্তোষজনক না হলেও পুরোনো নীতির অনুসরণ নয় এবং শিক্ষা-সম্প্রসারণের পক্ষে তা অনেকটা সহায়ক হ'ত। তাসত্ত্বেও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমিক-স্তরে মাতৃভাষা ভাষা-মাধ্যম রূপে স্বীকৃতি পেল না। কমিশনের সদস্য আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের আন্তরিক প্রয়াস ব্যর্থ হ'ল।

স্যাডলার কমিশন বৈজ্ঞানিক ভিত্তির ওপরে উচ্চশিক্ষার কাঠামো গড়ে তোলার জন্য প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস করতে চেয়েছেন। তাঁরা ম্যাট্রিকুলেশন ও ইন্টারমিডিয়েট-স্তরে শিক্ষাদান ও পরীক্ষার কাজ পরিচালনার জন্য একটি স্বতন্ত্র পর্ষদ গঠনের সুপারিশ করেন এবং তাঁরা সেজন্য ইন্টারমিডিয়েট কলেজ-স্থাপনের প্রস্তাব দিয়েছেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের সুপারিশে বলা হ'ল, "(১) বিশ্ববিদ্যালয় ও মাধ্যমিক শিক্ষাক্রমের মধ্যে বিভাজন-রেখা ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার পরিবর্তে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা থেকে টানা অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। (২) সুতরাং সরকারকে এক নতুন ধরণের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে যেগুলি 'ইন্টারমিডিয়েট কলেজ' নামে অভিহিত হবে এবং যেখানে কলা, বিজ্ঞান, চিকিৎসা, যন্ত্রবিজ্ঞান, শিক্ষণবিদ্যা ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হবে। (৩) বিশ্ববিদ্যালয়-স্তরে প্রবেশ করতে হ'লে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। (৪) সরকার, বিশ্ববিদ্যালয়, মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহ এবং ইন্টারমিডিয়েট কলেজ থেকে প্রতিনিধি নিয়ে মাধ্যমিক ও ইন্টারমিডিয়েট শিক্ষা পর্ষদ গঠন করতে হবে এবং মাধ্যমিক শিক্ষার নিয়ন্ত্রণ ও প্রশাসনের দায়িত্ব এই পর্ষদকে দিতে হবে।"[২৪] তাছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন আরো দু'টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সুপারিশ করেছেন, "(১) অধিকতর সক্ষম ছাত্রদের প্রয়োজনার্থে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি-স্তরে পাশ কোর্স থেকে পৃথক করার জন্য অনার্স কোর্স প্রবর্তন করতে হবে। (২) ইন্টারমিডিয়েটের পরে ডিগ্রি কোর্সের পাঠ্য-সময় তিন বছর হওয়া উচিত।"[২৫]

স্যাডলার কমিশনের সুপারিশ অনুসারে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি-স্তরে অনার্স কোর্স প্রবর্তিত হলেও বিশ্ববিদ্যালয়-কর্তৃপক্ষ ইন্টারমিডিয়েট-শিক্ষা ও পরীক্ষা পরিচালনার দায়িত্ব কোনো স্বতন্ত্র পর্ষদের হাতে দিতে রাজী হলেন না এবং তিন বছরের ডিগ্রি কোর্সও প্রবর্তিত হ'ল না। যদিও ভারতবর্ষের কয়েকটি

বিশ্ববিদ্যালয়ে ইণ্টারমিডিয়েট কলেজ স্থাপনের প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল এবং সেসকল অঞ্চলে ইণ্টারমিডিয়েট কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

যুদ্ধ-পরবর্তী ভারতের রাজনৈতিক অবস্থার প্রতিক্রিয়ায় কমিশন কর্তৃক এই ভাষা-প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল। ভারতের অবস্থা তখন অগ্নিগর্ভ। ভারতীয় নেতাদের আশা পূরণ হয়নি; যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেও ভারতের কাছে স্বরাজ মরীচিকা হ'য়ে রইল। একদিকে যুদ্ধোত্তর অর্থনৈতিক মন্দা, বেকারের সংখ্যাবৃদ্ধি, অন্যদিকে স্বাধিকার-লাভে বঞ্চনা জনমানসে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করল; জনসাধারণ বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেন। কবি-কণ্ঠে জনগণের বুকফাটা আর্তনাদ ধ্বনিত হয়:

"ক্ষুধাতুর শিশু চায়না স্বরাজ, চায় দু'টো ভাত একটু নুন।
বেলা ব'য়ে যায়' খায়নি ক' বাছা, কচি পেটে তার জ্বলে আগুন!
কেঁদে ছুটে আসি পাগলের প্রায়,
স্বরাজের নেশা কোথা ছুটে যায়!
কেঁদে বলি, ওগো ভগবান, তুমি আজিও আছ কি? কালি ও চূণ
কেন ওঠে নাক' তাহাদের গালে, যারা খায় এই শিশুর খুন?

আমরা তো জানি, স্বরাজ আনিতে পোড়া বার্তাকু এনেছি খাস!
কত শত কোটী ক্ষুধিত শিশুর ক্ষুধা নিঙাড়িয়া কাড়িয়া গ্রাস
এল কোটী টাকা, এল না স্বরাজ!
টাকা দিতে নারে ভুখারী সমাজ।
মা'র বুক হ'তে ছেলে কেড়ে খায়, মোরা বলি, বাঘ খাও হে ঘাস
হেরিনু, জননী মাগিছে ভিক্ষা ঢেকে রেখে ঘরে ছেলের লাশ!"[২৬]

সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের প্রয়োজনে দারিদ্রপীড়িত দেশ লুণ্ঠিত হয়। বিশ্বযুদ্ধের ব্যয়ের অংশ বহন করতে ভারতকে বাধ্য করা হয়। সমগ্র যুদ্ধের খরচ বাবদ প্রায় তেরো কোটি পাউণ্ড ভারতের রাজস্ব বহন করে। এছাড়া নগদ দশ কোটি পাউণ্ড বৃটিশ সরকারকে 'দান' করা হয়। এভাবে প্রচুর অর্থ ও সম্পদ জোগাতে বাধ্য করে ভারতের অর্থনীতিতে চরম সংকট সৃষ্টি করা হ'ল। পণ্যমূল্যবৃদ্ধি ও নির্দয় মুনাফাবৃত্তি দেশের জনসাধারণকে চূড়ান্ত দুর্দশা ও দারিদ্রের দিকে ঠেলে দিল। যুদ্ধশেষের মহামারীতে মারা গেলেন ১ কোটি ৪০ লক্ষ মানুষ। জনসাধারণের প্রবল অসন্তোষের প্রকাশ ঘটল পাঞ্জাবের গদর-আন্দোলনে ও সৈন্যবাহিনীর বিদ্রোহে। এই বিদ্রোহ নিষ্ঠুরভাবে দমন করা হয়।

বিদ্রোহীদের মধ্যে কয়েকজন প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হলেন এবং অনেককে দীর্ঘমেয়াদী কারাদণ্ড দেওয়া হ'ল। বিপ্লবী আন্দোলনকে দমন করার উদ্দেশ্যে ১৯১৭ সালে গঠিত হ'ল রাউলাট কমিটি এবং তাঁদের সুপারিশ-অনুসারে রাউলাট আইন গৃহীত হ'ল (মার্চ, ১৯১৯ খৃঃ.)। প্রতিবাদে গর্জে উঠল দেশের জনসাধারণ। প্রতিবাদের কণ্ঠকে স্তব্ধ করার জন্য বৃটিশ-শক্তির পাশুপত অস্ত্র রাউলাট আইন প্রয়োগ করা হ'ল। জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের (১৩ এপ্রিল, ১৯১৯ খৃঃ.) মধ্যদিয়ে তাঁদের হিংস্র স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হ'ল। কিন্তু ব্যাপক চণ্ডনীতি জনগণের সংগ্রামী মেজাজকে ভীত-সন্ত্রস্ত করতে পারেনি; হরতাল-ধর্মঘটের ঢেউয়ে ভারতবর্ষ আলোড়িত হয়ে উঠল।

১৯১৯ সালের দেশব্যাপী গণ-বিক্ষোভের উত্তাল তরঙ্গ ১৯২০ ও ১৯২১ সালেও প্রবাহিত হ'ল। ১৯২০ সালের শেষভাগের তীব্র অর্থনৈতিক সঙ্কটের জন্য ঐ বিক্ষোভ-তরঙ্গ আরো প্রবল হয়ে উঠল। ১৯২০ সালের প্রথম ছয় মাসের মধ্যে প্রায় দু'শ ধর্মঘটে পনেরো লক্ষ শ্রমিক অংশ গ্রহণ করেছেন। '১৯১৯-এর শেষার্দ্ধে এবং ১৯২০-র প্রারম্ভে সমগ্র দেশে শ্রমিকশ্রেণীর লড়াই আরও বৃদ্ধি পায়। কানপুরের ১৭,০০০ কারখানা-শ্রমিক, জামালপুরের ১৬,০০০ রেল-শ্রমিক, কলকাতার ৩৫,০০০ চটকল-শ্রমিক, বোম্বাই-এর বিভিন্ন কলকারখানার ২,০০,০০০ শ্রমিক, শোলাপুরের ১৬,০০০ কাপড়ের কলের শ্রমিক, ২০,০০০ ডক-শ্রমিক, টাটার লোহা-ইস্পাত কারখানার ৪০,০০০ শ্রমিক, মাদ্রাজের ১৭,০০০ এবং আহ্‌মেদাবাদের ২৫,০০০ কাপড়ের কলের শ্রমিক ধর্মঘটে নামে।'[২৭] মিছিলে-সমাবেশে, হরতালে-ধর্মঘটে ও রাজপথের সংগ্রামে যখন সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্তের সংগ্রামী মেজাজের অভিব্যক্তি ঘটছে, তখন কলকাতায় ১৯২০ খৃষ্টাব্দের ৪ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হ'ল কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন। এখানে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ছাত্রসমাজের কাছে ইংরেজি স্কুল-কলেজ বর্জনের আহ্বান জানিয়ে প্রস্তাবে বলা হয়, স্বরাজ-লাভের জন্য 'সরকারের নিজের, সাহায্য প্রাপ্ত কিংবা নিয়ন্ত্রিত স্কুল ও কলেজ থেকে ছাত্রদের ক্রমশ প্রত্যাহার ও ইংরেজি স্কুল-কলেজের পরিবর্তে বিভিন্ন প্রদেশে জাতীয় স্কুল-কলেজ স্থাপন'[২৮] করতে হবে।

গান্ধীজীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে হাজার হাজার ছাত্র ইংরেজি স্কুল-কলেজ ছেড়ে অসহযোগ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। এক বৎসরের মধ্যে স্বরাজ-লাভের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তিনি ছাত্রদের উদ্দেশ্যে বলেন, "এক বছর কিংবা স্বরাজ

প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত তোমরা লেখাপড়া স্থগিত রাখো। আমি যদি সমগ্র ছাত্রসমাজের মধ্যে আমার বিশ্বাস সঞ্চারিত করতে পারি, তাহলে আমি জানি যে, এক বছরের বেশী লেখাপড়া স্থগিত রাখার প্রয়োজন হবে না"[২৯]। ১৯২১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে গান্ধীজী পুনরায় আশ্বাসবাণী শুনিয়ে বলেছেন যে, 'বৎসর শেষ হবার পূর্বেই স্বরাজ-লাভ সম্পর্কে তিনি এতই সুনিশ্চিত যে, স্বরাজ ব্যতীত ৩১ ডিসেম্বরের পরে তিনি বেঁচে থাকতে পারেন এই কল্পনাও তিনি করতে পারেন না।'[৩০]

অসহযোগ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে ভারতের সর্বত্র শিক্ষা-আন্দোলন গড়ে ওঠে। বিভিন্ন প্রদেশে ছাত্রদের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয় কলকাতায় ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, কাশী বিদ্যাপীঠ, বিহার বিদ্যাপীঠ, গুজরাট বিদ্যাপীঠ, মহারাষ্ট্র বিদ্যাপীঠ, আলিগড় ন্যাশনাল মুস্‌লিম ইউনিভার্সিটি ইত্যাদি। এই সমস্ত জাতীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের প্রণালী প্রবর্তিত হয়। শিক্ষা-আন্দোলনের প্রভাবে কোনো কোনো প্রাদেশিক সরকার শিক্ষানীতি সংশোধন করতে বাধ্য হয় এবং মাতৃভাষায় স্কুলের সর্বোচ্চ পরীক্ষা দেবার অধিকার দেওয়া হয়। ১৯২২ খৃষ্টাব্দে বোম্বাইয়ে, ১৯২৪ সালে পাঞ্জাবে এবং ১৯২৫ সনে বিহারে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান ও ম্যাট্রিকুলেশন বা স্কুলের সর্বশেষ-স্তরের পরীক্ষা-গ্রহণের ব্যবস্থা প্রচলিত হয়। কিন্তু কলকাতায় ইংরেজি-নকলনবীশেরা ছিলেন শক্তিশালী ও সক্রিয়। জাতীয় স্বার্থের চেয়ে গোষ্ঠী-আধিপত্য কায়েম রাখাই ছিল তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য। তাঁদের প্রবল বাধাদানে বঙ্গসরস্বতী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পবিত্র অঙ্গনে প্রবেশিকাধিকার-লাভে বঞ্চিত হলেন।

১৯২১ সালে দ্বিতীয় দফায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের দায়িত্বভার গ্রহণ করে আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষা-মাধ্যম নীতি পরিবর্তনের জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করেছেন। সেসময়ে কলকাতা-সহ ভারতের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি ও প্রাচীন ভাষা-শিক্ষায় অত্যধিক গুরুত্ব দেবার জন্য আধুনিক ভারতীয় ভাষাগুলির চর্চায় নজর দেওয়া হ'ত না এবং এই অবহেলা দেশীয় ভাষাগুলির উন্নয়নে ও শিক্ষার মাধ্যম রূপে মাতৃভাষাকে গ্রহণের পথে প্রতিবন্ধক হয়েছিল। অথচ শিক্ষার্থীরা ইংরেজিভাষাও ভালো রকম আয়ত্ত করতে পারতেন না। 'পরীক্ষকদের প্রতিবেদন যদি পরীক্ষার্থীদের অর্জিত বিদ্যা সম্পর্কে কোনো মাপকাঠি হয়, তাহলে ১৯২১-২২ সালের ইংরেজি মানের সঙ্গে ১৯০১-০২ সালের মানের কোনো পার্থক্য নেই প্রকৃতপক্ষে, একজনও

অনুভব না করে পারবেন না যে, এযুগের শিক্ষাবিদেরা একটা অসম্ভব কাজে ব্রতী হয়েছেন। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পাঠরত প্রত্যেকটি ছাত্রকে ইংরেজি ভাষায় দক্ষ করে তুলতে তাঁরা চেয়েছেন। খুব অল্পসংখ্যক ছাত্র ব্যতীত অন্যান্যদের ক্ষেত্রে একাজ সম্ভব ছিল না। সুতরাং ইংরেজিভাষায় দক্ষতা অর্জনের জন্য গুরুত্ব প্রদানের বাস্তব অর্থ হ'ল অধিকাংশ ছাত্রের ওপর অত্যাচার। ইংরেজিভাষা-শিক্ষা তাঁর পাঠ্যসময়ের অনেকখানি দখল করে এবং তা অন্যান্য পাঠ্য বিষয়ের যথোপযুক্ত চর্চায় বাধা সৃষ্টি করে। বিদেশী ভাষায় দক্ষতা অর্জনের জন্য তাঁর সমস্ত প্রয়াস নিয়োজিত হয়; কিন্তু বিনিময়ে স্বল্পজ্ঞান অর্জিত হয়।'[৩১] ইংরেজিভাষায় শিক্ষাগ্রহণের জন্য মানব শক্তির বিপুল অপচয় ঘটতে দেখে রবীন্দ্রনাথ ব্যথিত চিত্তে মন্তব্য করেছেন, "আমাদের শিক্ষাকে আমাদের বাহন করিলাম না, শিক্ষাকে আমরা বহন করিয়াই চলিলাম।"[৩২]

শিক্ষাকে বাহন না করে বহন করার অর্থ হ'ল শিক্ষালাভের সুযোগ থেকে জনগণকে বঞ্চিত করে শিক্ষার ওপরে ইংরেজি-শিক্ষিত ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর একচেটিয়া আধিপত্য বজায় রাখা। এবং বাস্তবে তাই ছিল। শিক্ষা-বিষয়ক সংখ্যাতত্ত্ব থেকে এটা সুস্পষ্ট যে, বিগত একশ' বছরে (১৮২১-২২ থেকে ১৯২১-২২ খৃঃ.) শিক্ষার অগ্রগতি সন্তোষজনক নয়। শ্রীসৈয়দ নুরুল্লা ও শ্রী জে. পি. নায়েক বলেছেন, "উনিশ শতকের প্রারম্ভে সরকার যখন জনগণের শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করেনি, তখন শিক্ষা একটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল এবং জনগণের বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ লিখতে ও পড়তে অক্ষম ছিলেন। এমন-কি ১৯২১-২২ সালেও এই অবস্থার কোন বাস্তব পরিবর্তন ঘটেনি। এখনো পর্যন্ত শিক্ষা একটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রয়েছে। ১৯২১ সালে সাক্ষরতার শতকরা হার অত্যন্ত কম (স্ত্রী-পুরুষে মিলিয়ে ভারতের সাক্ষরতা এসময়ে ছিল ৭% —লেখক) এবং এখনো পর্যন্ত জনসাধারণের বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ শিক্ষার জগৎ থেকে দূরে রয়েছেন। ...১৯২১-২২ সালের শিক্ষা-বিস্তার ১৮৩৫-৩৮ সাল থেকে ব্যাপকতর ছিল না।"[৩৩]

তাই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন-স্তরের ভাষা-মাধ্যম নীতি পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে এই বিষয়ে আলোচনার জন্য আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ১৯২১ খৃষ্টাব্দের ৭ মে বাংলা ও আসামের উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকদের সম্মেলন আহ্বান করেন। সেই সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয় যে, ইংরেজি বিষয় ছাড়া অন্যান্য বিষয়ে মাতৃভাষার মাধ্যমে ম্যাট্রিকুলেশন-পরীক্ষা দেবার

অধিকার দেওয়া হোক। তারপরে বিদ্যালয়-পরিচালক সমিতির সদস্যদের ও অভিভাবকদের সম্মেলনে প্রধান শিক্ষকদের প্রস্তাব সমর্থিত হয়। ১৯২২ সালের ৭ জুলাই সিনেটে ম্যাট্রিকুলেশন-পরীক্ষার যে নতুন খসড়া-আইন গৃহীত হয়, তাতে উক্ত প্রস্তাব অন্তর্ভুক্ত হয় এবং তা অনুমোদনের জন্য প্রাদেশিক সরকারের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। ভাষা-মাধ্যম বিষয়ে খসড়া-আইনে বলা হয়, "ইংরেজি ছাড়া সকল বিষয়ের পঠন-পাঠন ও পরীক্ষা মাতৃভাষায় হবে; তবে সিণ্ডিকেট বিশেষ ক্ষেত্রে এ নিয়মের ব্যতিক্রম করতে পারেন কিংবা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য এ নিয়মের কার্যকারিতা স্থগিত রাখতে পারেন।"[৩৪] কিন্তু স্যার আশুতোষের কর্মকালের মধ্যে এই প্রস্তাব সরকার অনুমোদন করলেন না। ১৯২২ থেকে ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত খসড়া-আইন সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে সরকার ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের মধ্যে মতের আদান-প্রদান হয় এবং পরিশেষে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

কোনো স্কুল ইংরেজির মাধ্যমে শিক্ষাদানের পদ্ধতি বজায় রাখলে তার অনুমোদন বাতিল করার অধিকার বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রদান করতে সরকারের আপত্তি ছিল। সেকারণে খসড়া-আইন সংশোধনের জন্য সরকার প্রস্তাব করেছেন যে, ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় ইংরেজি ও অঙ্ক ভিন্ন অন্যান্য বিষয়ে ইংরেজি অথবা মাতৃভাষায় পরীক্ষা দেবার সুযোগ দেওয়া হোক। তাছাড়া খসড়া-আইনে বলা হয়েছিল যে, আঞ্চলিক ভাষা-বিষয়ক তিনটি পেপার (বাংলা, হিন্দী, উর্দু, অসমীয়া, ওড়িয়া —এই ভাষাগুলির যে কোনো দু'টি এবং খাসী, গারো, মনিপুরী, নেপালী —এগুলির যে কোনো একটি) এবং ইংরেজি-বিষয়ে দু'টি পেপার থাকবে। কিন্তু ইংরেজ-সরকার তাতে আপত্তি জ্ঞাপন করায় বিশ্ববিদ্যালয়-কর্তৃপক্ষ স্থির করেন যে, ইংরেজিতেও তিনটি পেপার থাকবে। সরকারের ইচ্ছানুযায়ী খসড়া-আইনে বিদ্যালয়ের অনুমোদন-বিষয়ক ধারায় পরিবর্তন করে বলা হয়, "অন্য রকম নির্দেশ না থাকলে ইংরেজি ও অন্যান্য ইউরোপীয় ভাষা-বিষয় ছাড়া অন্য সকল বিষয়ের উত্তর যে কোনো একটি প্রধান দেশীয় ভাষায় লিখতে হবে।"[৩৫]

পরিবর্তিত খসড়া-আইনটিকে গ্রহণ করার জন্য সরকারের কাছে আবেদন জানিয়ে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বলেছেন, "আজ আমরা সেই মহান আদর্শকে স্মরণ করি, যে-আদর্শের প্রেরণায় ১৯২১ সালে এই পরিকল্পনা উপস্থাপিত হয়েছিল এবং আমাদের ঘোষণা করতে দেওয়া হোক যে, সুদীর্ঘ ও উত্তপ্ত বিতর্কের অবসান ঘটেছে। ...আর ইতস্তত না করে সে সময়ের দিকে লক্ষ্য রেখে

আমাদের সামনে এগিয়ে যেতে হবে, যখন আমাদের মাতৃভাষা কেবলমাত্র ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার মাধ্যম নয়, এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম পরীক্ষারও মাধ্যম হবে।"৩৬

১৯৩৪ খৃষ্টাব্দের আগস্ট মাসে উপাচার্য-পদে নিযুক্ত হয়ে শ্যামাপ্রসাদ পিতার অসমাপ্ত কাজের দায়িত্বভার গ্রহণ করে মাতৃভাষা-প্রবর্তনে আত্মনিয়োগ করলেন। নানা টালবাহানার পরে ১৯৩৫ সালের জুন মাসে খসড়া-আইনটি সরকারি অনুমোদন-লাভের পরে বিধিবদ্ধ আইনে পরিণত হয় এবং মাতৃভাষা ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার ভাষা-মাধ্যম রূপে স্বীকৃতি লাভ করে। কিন্তু তা কার্যকরী হয় ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে। অবশ্য ইংরেজি আবশ্যিক ভাষা-রূপে ছাত্রদের কাঁধে চেপে রইল।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গনে বঙ্গসরস্বতীকে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হলেও ইংরেজিনবীশ-বুদ্ধিজীবীদের প্রতিকূল মনোভাবের জন্য মধ্যবিত্তসমাজে মাতৃ-ভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হ'ল না। তাঁদের উন্নাসিক মনোভাব ও ইংরেজি-প্রীতির জন্য বিদেশী ভাষার দাসত্ব থেকে শৃঙ্খল-মুক্তির আনন্দের প্রকাশ ঘটল না। ইংরেজি-জানা বাবুদের প্রচারে চাকরি-নির্ভর মধ্যবিত্ত-সম্প্রদায় তাঁদের সন্তান-সন্ততির ভবিষ্যতের ভাবনায় ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন। অবশ্য তাঁদের ভয়-ভাবনার মূলে যুক্তিসঙ্গত বাস্তব কারণও ছিল। এসময়ে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে মাতৃভাষাকে ভাষা-মাধ্যম রূপে নীতিগতভাবে স্বীকৃতি দেওয়া হলেও কার্যত ইংরেজি ছিল শিক্ষার মাধ্যম। কারণ প্রথমত, বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ-স্তরে ইংরেজিভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হ'ত এবং ইণ্টারমিডিয়েট থেকে উচ্চতর পরীক্ষাগুলির মাধ্যম ছিল ইংরেজিভাষা। দ্বিতীয়ত, সমস্ত সরকারি চাকরির পরীক্ষা ইংরেজিতে হ'ত এবং ইংরেজিতে যাঁর ভালো দখল ছিল, সেই ব্যক্তি সরকারি চাকরি-লাভের অগ্রাধিকার পেতেন। সুতরাং অভিভাবকেরা তাঁদের ছেলেমেয়েদের ইংরেজিভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানে আগ্রহী ছিলেন। তৃতীয়ত, ইংরেজ-সরকার মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের জন্য অর্থব্যয়ের দায়িত্ব গ্রহণ না করায় অর্থাভাবে মাতৃভাষায় বিদ্যাদানের মান উন্নয়ন করাও সম্ভব হ'ল না এবং বিভিন্ন ভারতীয় ভাষা প্রবর্তন করা গেল না। চতুর্থত, ইংরেজি-শিক্ষিত বিদ্বৎজনমণ্ডলী বিজ্ঞান ও কারিগরি বিষয়গুলি ভারতীয় ভাষায় রচনার কাজে অগ্রসর না হওয়ায় ইংরেজি-গ্রন্থের মাধ্যমেই শিক্ষা গ্রহণ করতে হ'ত। জন-বিকাশের ইতিহাস, জনশিক্ষা প্রসারের ইতিবৃত্ত, ইংরেজিভাষায় শিক্ষাদানের বিরুদ্ধে মানবপ্রেমিক মনীষীদের অভিমত, মাতৃভাষার সপক্ষে

তাঁদের প্রচেষ্টা, আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষার জন্য আন্দোলন ইত্যাদি কোনো কিছুতেই আত্মবিক্রয়কারী বুদ্ধিজীবীদের সামাজিক দায়িত্ব-পালনে উদ্বুদ্ধ করতে পারেনি। ফলে সমাজের সর্বস্তরে শিক্ষার সম্প্রসারণ ঘটল না। ইংরেজিভাষার দাপট অব্যাহত থাকায় ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণদের সংখ্যাহ্রাস তো দূরের কথা বরং সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটেছে।

অসহযোগ-আন্দোলনের তীব্রতার সামনে ইংরেজিভাষা-প্রেমিকেরা পিছু হঠেছিলেন। ফলে, বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে খসড়া-আইন প্রণয়ন করা সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীকালের দেশের রাজনৈতিক অবস্থার সুযোগ নিয়ে তাঁরা পুনরায় সক্রিয় হয়ে সরকারের সহযোগিতায় এই আইনকে বিধিবদ্ধ রূপদানে বাধা দিয়েছেন। এবং তখনই এই আইন সংশোধিত রূপে বিধিবদ্ধ হয়েছে, যখন দেশে পুনরায় রাজনৈতিক পট পরিবর্তন ঘটেছে। সুতরাং ম্যাট্রিকুলেশন-স্তরে মাতৃভাষার অধিকার-প্রতিষ্ঠার পশ্চাতে রয়েছে এসময়কার রাজনৈতিক ইতিহাস।

১৯২১ সালের শেষদিকে অসহযোগ আন্দোলন নতুন স্তরে উন্নীত হয়েছে — সমগ্র ভারত ধর্মঘট-বিক্ষোভের উত্তাল তরঙ্গে আলোড়িত। ১৯২০ সালের শেষদিকে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ভারতের শ্রমিকদের কেন্দ্রীয় সংগঠন — নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস। এবং ১৯২১ সালে গঠিত হয়েছে শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক দল ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি। এই বছরের ১৭ নভেম্বরে বৃটিশ-যুবরাজ প্রিন্স অব ওয়েল্‌স্‌-এর ভারত-আগমন উপলক্ষে সারা দেশে হরতাল পালিত হ'ল — রক্তে রঞ্জিত হয়েছিল বোম্বাইয়ের রাজপথ। এই আন্দোলনকে ব্যর্থ করার জন্য সরকার সমস্ত রকমের দমন-পীড়নের পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন। ১৯২২ সালের প্রথম দিকে কেবলমাত্র গ্রেপ্তারের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ত্রিশ হাজার। ১৯২২ সনের ৯ ফেব্রুয়ারি ভারতের বড়লাট বৃটেনে এক তারবার্তায় জানিয়েছেন, "অসহযোগ আন্দোলন শহরগুলির নিম্নশ্রেণীর লোকজনকে সাঙ্ঘাতিক ভাবে প্রভাবিত করিয়াছে। ... কোন কোন অঞ্চলে কৃষকরাও সংক্রামিত হইয়াছে, বিশেষতঃ আসাম উপত্যকা, যুক্তপ্রদেশ, বিহার, উড়িষ্যা ও বাংলার কোন কোন অংশে। পাঞ্জাবে আকালী আন্দোলনের ঢেউ পল্লীবাসী শিখদের নিকটে পর্য্যন্ত পৌছিয়া গিয়াছে। সমগ্র দেশের মুসলিম জনশক্তির একটা বড় অংশ ক্ষুব্ধ ও উত্তেজিত। ...মারাত্মক অবস্থা দেখা দিতে পারে। ...গবর্ণমেণ্ট বর্তমান পরিস্থিতির গুরুত্ব খাটো করিয়া দেখাইতে চান না। তাঁহারা ভয়ঙ্কর রকমের বিশৃঙ্খল অবস্থার সহিত যুঝিবার

জন্য প্রস্তুত রহিয়াছেন।"[৩৭]

জন-আন্দোলনের প্রবল ধাক্কায় যখন সাম্রাজ্য-শোষণের শৃঙ্খল ভেঙে পড়ার উপক্রম, তখন ৫ ফেব্রুয়ারি চৌরীচৌরার ঘটনায় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ১১ ফেব্রুয়ারি বারদৌলীর অধিবেশনে অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন —"আইন-অমান্যের জন্য গণ-আন্দোলনে প্রতিবার সহিংস গোলযোগ সংঘটিত হওয়ায় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি আইন-অমান্যের ভিত্তিতে গণ-আন্দোলন প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া স্থানীয় কংগ্রেস কমিটিগুলির উপর গবর্ণমেন্টের প্রাপ্য ভূমি-রাজস্ব ও অন্যবিধ কর দিবার জন্য কৃষকদের বুঝাইবার ও সর্ববিধ আক্রমণাত্মক কার্যকলাপ বন্ধ করার জন্য নির্দেশ প্রদান করিতেছেন।"[৩৮]

কংগ্রেস-নেতৃত্বের আকস্মিক এই সিদ্ধান্তে জনসাধারণ হতচকিত এবং বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেন। সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ল হতাশা আর আশাভঙ্গের বেদনা। লালা লাজপত রায় লিখেছেন, "রাজনৈতিক পরিস্থিতি অত্যন্ত নৈরাশ্যজনক। জনসাধারণের মধ্যে দারুণ হতাশার ভাব। আদর্শ, কার্যকলাপ, পার্টি, রাজনীতি —সব কিছুই ভাঙনের মুখে পড়িয়াছে।"[৩৯] বারদৌলীর আঘাতে প্রায় পাঁচ বৎসর সংঘবদ্ধ জাতীয় আন্দোলনের কোনো স্ফূরণ ঘটল না। এই সুযোগে ভারত-সরকার বিচ্ছিন্ন ও বিভ্রান্ত জনগণের ওপরে আঘাত হেনেছেন। গান্ধীজী গ্রেপ্তার ও কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছেন (১৯২২ খৃঃ)। জঙ্গী শ্রমিক-আন্দোলনের বিশিষ্ট কমিউনিস্ট নেতাদের 'কানপুর বলশেভিক ষড়যন্ত্র মামলা'য় গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বাংলাদেশে বিপ্লবী যুবকদের দমন করার জন্য সামরিক আইন জারী করা হয়েছে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা ঘটেছে। ইংরেজ-সরকার রাজনৈতিক আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে ও শিক্ষাজগতে আক্রমণ করেছেন। ইস্পাত সংরক্ষণ আইনের দ্বারা ভারতের শিল্পপতিদের যে সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়েছিল, তা নাকচ করে ষ্টিল প্রোটেকশন আইনের দ্বারা বৃটিশ-শিল্পের পক্ষে সুবিধাজনক হার নির্ধারিত হ'ল এবং টাকার মূল্য ১ শিলিং ৬ পেনি হার ধার্য করা হ'ল।

ভারতবর্ষের বিপ্লবী আন্দোলনের কেন্দ্রমূলে ছিল বাংলাদেশ। নানাবিধ উপায়ে এই আন্দোলনকে দমন করার চেষ্টা হয়েছিল। মধ্যবিত্তশ্রেণীর যুবকদের বিপ্লবী কর্মপ্রয়াস ও গণ-চেতনার বিস্তারকে রুদ্ধ করার জন্য ইংরেজ-সরকার একদিকে অত্যাচার-উৎপীড়ন করেছেন, অন্যদিকে শিক্ষাসংকোচনের

নীতি গ্রহণ করেছেন। সাম্রাজ্যের ভিত্তিমূল দৃঢ় করার জন্য উনিশ শতকের প্রথম ভাগে যে উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে বাংলাদেশে ইংরেজি-শিক্ষা বিস্তারে বৃটিশ-সরকার উদ্যোগী হয়েছিলেন, বিশ শতকের প্রথম ভাগে সেই ভিত্তিমূল কেঁপে ওঠায় তাঁদের শিক্ষানীতির পরিবর্তন ঘটেছে ; শিক্ষাখাতে তাঁরা ব্যয় হ্রাস করেছেন। ব্যয়-হ্রাসের চিত্র[৪০] নিম্নরূপ :

১৯২৭ খৃঃ. —১,৪৭,৯৪,৬৮৬ টাকা

১৯৩২ খৃঃ. —১,৪৪,৪৬,৮৮১ „

১৯৩৭ খৃঃ —১,৪১,১২,৮১৭ „

অন্যান্য স্থান থেকে লব্ধ অর্থের তুলনায় সরকারের প্রদত্ত অর্থের অনুপাতও হ্রাস হচ্ছিল। ১৯২২ খৃষ্টাব্দে সরকার যেখানে শিক্ষাখাতে ব্যয়ের '৪০'৬% অংশ বহন করতেন, ১৯৩৭ সালে সেখানে ব্যয় করেছেন ৩১% অংশ। বাংলাদেশের শিক্ষাখাতে সরকারি ব্যয়ের অংশ সর্বভারতীয় অনুপাতের থেকেও কম ছিল। 'তখন বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয় অত্যন্ত কম ছিল, —গড়ে ছাত্রপ্রতি বৎসরে মাত্র ৩'৫ টাকা (বোম্বাইয়ে ৩৫ টাকা) আর ছাত্রপ্রতি বেতনের গড় ছিল ১৷৵. (ভারতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশী)। ছাত্রপ্রতি সরকারি ব্যয় ছিল মোটে '০২৯ টাকা (বোম্বাইয়ে '২৬৫ টাকা) অর্থাৎ বাংলার মতো দরিদ্র দেশে ছাত্রেরা প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয় অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় অধিক পরিমাণে বহন করছিল।'[৪১] তাসত্ত্বেও বাংলাদেশে বেসরকারি উদ্যোগে শিক্ষা সম্প্রসারিত হচ্ছিল। সরকারি অর্থ বরাদ্দের পরিমাণ কমলেও শিক্ষার ব্যয়ভার দেশের মানুষ বহন করায় শিক্ষা সংকুচিত হয়নি। তার পরিচয় পাওয়া যায় নিম্নের সারণীতে[৪২] :

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান	১৯২১-২২ খৃঃ.	১৯৩৬-৩৭ খৃঃ.
বিশ্ববিদ্যালয়	২	২
সাধারণ শিক্ষার কলেজ	৩৬	৫০
বৃত্তিশিক্ষার কলেজ	১০	১৮
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	২,৬৭৮	৩,২৯১
প্রাথমিক „	৫৭ ৭৮৩	৬১,৫১৭
বিশেষ „	১,৪২০	২,৬৪০
অননুমোদিত বিদ্যালয়	১,৮৪০	১,৩০৭

জাতীয় আন্দোলনের জোয়ার-ভাঁটার প্রতিক্রিয়া ঘটেছে প্রাথমিক শিক্ষাজগতে। অসহযোগ আন্দোলন যখন উত্তুঙ্গে, তখন জনগণের উৎসাহে

প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার ঘটেছে, গ্রামীণ মানুষ জনশিক্ষা গ্রহণে আগ্রহান্বিত হয়েছেন। প্রাথমিক শিক্ষা-বিস্তারে গোখেলের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার জন্য ভারতের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্‌রা আত্মনিয়োগ করেছেন। ১৯১৭ সালের ২৫ জুলাই বিঠলভাই প্যাটেল বোম্বাই ব্যবস্থাপক সভায় রাজ্যের পৌর এলাকায় আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রচলনের জন্য খসড়া বিল উত্থাপন করেন এবং ১৯১৭ সালের ৫ ডিসেম্বরে তা গৃহীত হয়ে 'প্যাটেল-আইন' নামে খ্যাত হয়। এই আইন অন্যান্য প্রদেশকেও অনুপ্রাণিত করে। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে বৃটিশ-শাসনাধীন প্রত্যেকটি প্রদেশে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইন গৃহীত হয়। এই সমস্ত আইনে একটি নির্দিষ্ট এলাকায় আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য পৌরপ্রতিষ্ঠানগুলিকে ক্ষমতা দেওয়া হয়। বাংলাদেশে ১৯১৭ সালের ১৮ ডিসেম্বরে সুরেন্দ্রনাথ রায় কর্তৃক বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় The Bengal Primary Education Bill উত্থাপিত হয় এবং ১৯১৯ সালের ২৭ মার্চ তা গৃহীত হয়। পুনরায় মন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন কর্তৃক ১৯৩০ সালের ১৩ আগস্টে The Bengal (Rural) Primary Education Bill উত্থাপিত হয়ে আলোচনান্তে ১৯৩০ সালের ২৬ আগস্ট গৃহীত হয়। কিন্তু এই আইনগুলি বিভিন্ন প্রদেশে গৃহীত হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভূস্বামীগোষ্ঠী ও স্বার্থান্বেষীদের বাধাদানের ফলে কার্যকরী হ'ল না। আইনের বইয়ের মধ্যে এই আইনগুলি রয়ে গেল। ১৯২১-২২ সালে এই আইন মাত্র ৮টি শহর ছাড়া কোনো গ্রামে প্রবর্তিত হয়নি। পরবর্তী যোলো বছরে অর্থাৎ ১৯৩৬-৩৭ সালের মধ্যে ২১০৩টি শহরের মধ্যে ১৬৭টি এবং ৬,৫৫, ৮৯২টি গ্রামের মধ্যে মাত্র ১৩,০৬২টি গ্রামে এই আইন প্রচলিত হয়।[৪৩]

মণ্টেগু-চেমসফোর্ডের ১৯১৮ সালের রিপোর্ট অনুযায়ী ১৯১৯ সালের ২৩ ডিসেম্বর ভারতশাসন-বিষয়ক আইন গৃহীত হয় এবং ১৯২১ সালের ৩ জানুয়ারি থেকে নতুন শাসনতন্ত্র কার্যকরী হয়। কংগ্রেস-নেতৃবৃন্দ নতুন সংবিধান অনুসারে অনুষ্ঠিত ব্যবস্থাপক সভার নির্বাচন বর্জন করলেও সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ লিবারেল দলের সদস্যগণ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে নির্বাচিত হন এবং স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন, চিকিৎসা, শিক্ষা, কৃষি, পশুপালন, সমবায় সমিতি প্রভৃতি বিভিন্ন দপ্তরের মন্ত্রিত্বের দায়িত্ব তাঁরা গ্রহণ করেছেন। তাঁদের প্রচেষ্টায় ১৯২১-২২ সালে প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটে —এসময়ে প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা হয় ১,৬০,০৭০। পূর্ববর্তীকালের তুলনায় এসময়ের এই সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হলেও প্রয়োজনের তুলনায় তা ছিল খুবই কম। সমগ্র জনসংখ্যার মাত্র শতকরা

২'৬ জন প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ পেয়েছেন। হাজার হাজার গ্রামে কোনো প্রাথমিক স্কুল ছিল না। মেয়েদের কিংবা পশ্চাদ্‌পদশ্রেণীর সন্তানদের শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ ছিল অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। এসময়ের প্রাথমিক শিক্ষা-চিত্র[৪৪] ছিল নিম্নরূপ :

বৎসর	প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা	ছাত্র-সংখ্যা
১৯২১-২২ খৃঃ.		
প্রাথমিক বিদ্যালয়	১,৬০,০৭০	৬৩,১০,৪০০
মাঃ বিদ্যালয়ে প্রাঃ বিভাগ	৬,৭৩৯	৬,৪৪,৬১৪
মোট	১,৬৬,৮০৯	৬৯,৫, ০১৪
১৯২৬-২৭ খৃঃ.		
প্রাথমিক বিদ্যালয়	১,৮৯,৩৪৮	৮২,৫৬,৭৬০
মাঃ বিঃ প্রাঃ বিভাগ	৮,৬৫১	৮,৫৩,৬৪০
মোট	১.৯৭,৯৯৯	৯১,১০,৪০০
১৯৩১-৩২ খৃঃ.		
প্রাথমিক বিদ্যালয়	২,০১,৪৭০	৯৪,৫৪,৩৬০
মাঃ বিঃ প্রাঃ বিভাগ	১০,৬১৬	১৩,৪২,৪৬৮
মোট	২,১২,০৮৬	১,০৭,৯৬,৮২৮
১৯৩৬-৩৭ খৃঃ.		
প্রাথমিক বিদ্যালয়	১,৯৭,২২৭	১,০৫,৪১,৭৯০
মাঃ বিঃ প্রাঃ বিভাগ	১০,৭৬২	১৩,৬৩,৩৪৬
মোট	২,০৭,৯৮৯	১,১৯,০৫,১৩৬

১৯২১-২২ থেকে ১৯২৬-২৭ সাল পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তৃতি কিছু পরিমাণে ঘটলেও তারপর থেকে জনশিক্ষা প্রসারের এই অগ্রগতি অক্ষুণ্ণ ছিল না। অথচ ভারতীয় মন্ত্রীরাই শিক্ষা দপ্তরের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। জনগণ আশা করেছিলেন, সর্বজনীন বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তিত হবে এবং তাঁরা সে-শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পাবেন। কিন্তু তাঁদের আশা পূরণ হ'ল না। প্রাদেশিক সরকারগুলি তাঁদের দায়িত্ব পালন করলেন না। তাঁদের প্রত্যক্ষ পরিচালনাধীন শিক্ষা-বিভাগের মাধ্যমে তাঁরা কোনো প্রচেষ্টা না করে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন-প্রতিষ্ঠানসমূহকে সেই দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন। কিন্তু এই প্রতিষ্ঠানগুলি শোষকশ্রেণীর ঘাঁটি হওয়ায় গ্রামে গ্রামে জনশিক্ষা সম্প্রসারিত হ'ল না।

'১৯২০ সালের ৩রা আগস্ট বাংলা গভর্ণমেণ্ট মিঃ ব্রিস্‌কে প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারের একটা কর্মসূচী সম্পর্কে রিপোর্ট দিতে বলেন। রিপোর্ট ১৯২১-এর ৩১শে মার্চ দাখিল হয়। প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারের বিপক্ষে শক্তিশালী বিরোধিতার কথা ব্রিস সাহেব বলেছেন। শেষোক্তদের পক্ষ থেকে তাঁর কাছে যুক্তি উপস্থিত করা হয়। সেই যুক্তির বিবরণ তিনি রিপোর্টে তালিকাবদ্ধ করেন। তালিকা দেখলেই বোঝা যাবে এসব আপত্তি প্রধানত জমিদারশ্রেণীর। আপত্তির যুক্তিগুলি নিম্নরূপ (উদ্ধৃতি ইনভারটেড কমা দ্বারা চিহ্নিত, বাকি অংশ সারমর্ম): (১) চাষীর ছেলের রোদ বাতাস সহ্য করার ক্ষমতা চলে যাবে। (২) ঐ ছেলে পিতার কাজকে অর্থাৎ চাষের কাজকে ঘৃণা করতে শিখবে। (৩) চাকর বাকর নষ্ট হয়ে যাবে। (৪) চোখ খুলে যাবে, দারিদ্র্য বেশী উপলব্ধি করবে এবং তা দূরীকরণের জন্য 'সংগ্রাম শুরু করবে।' (৫) "বেঙ্গল এডমিনিস্ট্রেশান্ রিপোর্ট প্রাচ্যের জনসমাজের মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষার বিপদের কথা উল্লেখ করলো।" (৬) "যদি চাষী পড়তে আরম্ভ করে ও ভাবতে আরম্ভ করে তাহলে নীতিহীন প্রচারকের পাল্লায় পড়বে। বিক্ষুব্ধ মধ্যবিত্তের সঙ্গে বিক্ষুব্ধ প্রোলেটারিয়েটকে যুক্ত করা বাস্তবিকই নির্বুদ্ধিতা।" মিঃ ব্রিস বলেন এ ছাড়া একটা ব্যাপার অনুক্ত হলেও তিনি বুঝেছেন। ফরাসী দার্শনিক ডিডেরো বলেছিলেন: "যে কৃষক পড়তে পারে তাকে ঠকানো যে কোনও অন্য ব্যক্তিকে ঠকানো অপেক্ষা কঠিন।" এই উক্তির উল্লেখ করে তিনি যা বললেন তার মর্মার্থ, আপত্তিটা হচ্ছে এই যে, কৃষক লেখাপড়া শিখলে তাকে ঠকানো যাবে না। (বোধ হয় এরই জন্য অনেক পরে কংগ্রেসী জমিদার বেঙ্গল রুরাল প্রাইমারী এডুকেশন বিল আলোচনার সময় বিলের প্রতিবাদে বলেন, "it is not necessary to accentuate the intelligence of the rural people"—"গ্রামের মানুষের বুদ্ধিকে উদ্দীপিত করার প্রয়োজন নাই")। বস্তুত জমিদারদের বে-আইনী আয় অনেক ছিল। পরে ১৯২৮ ও ১৯৩৮-এর প্রজাস্বত্ব আইনে যতটুকু বা প্রজার অধিকার স্বীকৃত হয়েছিল তখন তাও ছিল না। (আর তারপরেও কৃষকের এ বিষয়ে অসুবিধা প্রায় সমানই থেকে গিয়েছিল।) জমিদারের চেক, পাট্টা, নামজারির উপর আইনগত ভাবেই অনেক কিছু নির্ভর করতো। এই সব কাগজে অশিক্ষিত প্রজাকে প্রবঞ্চিত করা বা কাগজ না দিয়ে প্রবঞ্চিত করা হামেশা জমিদার ও তাদের কর্মচারীদের আচরণ ছিল। প্রজা লেখাপড়া শিখলে এই মোটা আমদানী বন্ধ হয়ে যাবে—জমিদারদের এই ছিল ভয়; এবং এ জন্যই তাদের আপত্তি।"[৪৫]

তবুও প্রাথমিক শিক্ষা-লাভের যে সীমাবদ্ধ সুযোগ ঘটেছিল, তার মূলে ছিল প্রাথমিক স্তরে পরিবর্তিত ভাষানীতি। ১৯২০ সালের ১৬ নভেম্বর বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষাবিভাগের সার্কুলারে[৪৬] প্রাথমিক স্তরের পাঠক্রম সম্পর্কে নির্দেশ দিতে গিয়ে বলা হয়েছে :

(১) বাংলা অথবা স্থানীয় আঞ্চলিক ভাষা যা স্কুলের পরিচালকমণ্ডলী অর্থাৎ জেলা-বোর্ড, মিউনিসিপ্যালিটি অথবা স্কুল-ইন্সপেক্টর প্রয়োজনীয় বলে মনে করবেন।

(২) নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আবশ্যিক —(ক) পড়া, (খ) লেখা, (গ) অঙ্ক, (ঘ) ভূগোল, (ঙ) ইতিহাস, (চ) স্বাস্থ্য [ছেলেদের জন্য] অথবা স্বাস্থ্য ও গার্হস্থ্য অর্থনীতি [মেয়েদের জন্য], (ছ) পর্যবেক্ষণ-পাঠ [ছেলেদের জন্য] ও (জ) ড্রিল [ছেলেদের জন্য] অথবা ড্রিল অথবা সেলাই [মেয়েদের জন্য]।

চতুর্থ শ্রেণীর পাঠশেষে উচ্চ প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে এবং প্রথম ছ'টি বিষয়ের পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে। দ্বিতীয় শ্রেণীর পাঠশেষে নিম্ন প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে এবং প্রথম চার বিষয় ও ষষ্ঠ বিষয়ের পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে।

(৩) উচ্চ প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষার জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলির মধ্যে যে কোনো দু'টি বিষয় ঐচ্ছিক বিষয় রূপে অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে : (ক) অঙ্কন, (খ) হাতের কাজ [ছেলেদের জন্য], অথবা মৃণ্ময় মূর্তি নির্মাণ-সহ হাতের কাজ [মেয়েদের জন্য], (গ) বিজ্ঞান অথবা বিদ্যালয়ের বাগানকেন্দ্রিক প্রকৃতি-পাঠ, (ঘ) ইংরেজি, (ঙ) জমিদারি ও মহাজনী হিসাব।

নিম্ন প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষার জন্য নিম্নোক্ত দু'টি বিষয়ের মধ্যে যে কোনো একটি বিষয় ঐচ্ছিক বিষয় রূপে অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে : (ক) অঙ্কন, (খ) হাতের কাজ।

(৪) ঐচ্ছিক বিষয়-রূপে উর্দু শিক্ষার জন্য বর্তমান ব্যবস্থা অব্যাহত থাকবে।

(৫) মুসলমান ছাত্রদের মানুষ অথবা জীবজন্তুর ছবি আঁকা অথবা মূর্তি নির্মাণের জন্য বলা হবে না।

(৬) ধর্মীয় গোষ্ঠীর দ্বারা পরিচালিত স্কুলে ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে।

(৭) প্রাথমিক পাঠক্রমের সময়-সীমা ৫ বছর (শিশুশ্রেণী ও প্রথমশ্রেণী

থেকে চতুর্থ শ্রেণী) এবং এই পাঠক্রমের সর্বশেষ পরীক্ষা চূড়ান্ত প্রাথমিক পরীক্ষা বলে অভিহিত হবে।

(৮) **প্রাথমিক বিত্থালয়ের যে ছাত্র উচ্চ অথবা মধ্য ইংরেজি-স্কুলে ভর্তি হতে ইচ্ছুক, তাকে অবশ্যই দ্বিতীয় শ্রেণীর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে উচ্চ অথবা মধ্য ইংরেজি-স্কুলে ভর্তি হতে হবে। চতুর্থ শ্রেণীর শেষে যে কোনো ছাত্র প্রাথমিক স্কুল থেকে উচ্চ অথবা মধ্য ইংরেজি-স্কুলে ভর্তি হতে পারে, তবে তাকে প্রাথমিক স্কুলের তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীতে ইংরেজিকে অবশ্যই ঐচ্ছিক বিষয় রূপে গ্রহণ করতে হবে।** [মোটা হরফ লেখকের]

মোটা হরফের বাক্য সমূহে বলা হয়েছে, উচ্চ ও মধ্য বিত্থালয়ে শিক্ষালাভের জন্য নিম্ন প্রাথমিক স্তরে ইংরেজি না থাকায় উচ্চ প্রাথমিক স্তরে (অর্থাৎ তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীতে) ইংরেজিকে অবশ্যই ঐচ্ছিক বিষয় রূপে গ্রহণ করতে হবে। অর্থাৎ মাধ্যমিক স্তরে ইংরেজি-মাধ্যম থাকার জন্য উচ্চ প্রাথমিক স্তরে ইংরেজির প্রাধান্য অব্যাহত ছিল —সচ্ছল পরিবারের সন্তানেরা উচ্চ প্রাথমিক স্তরে ইংরেজি বিষয় নিয়ে লেখাপড়া করত। তাসত্ত্বেও একথা অস্বীকার করা যায় না যে, যদি কোনো ছাত্র কেবলমাত্র প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করতে চায় তাহলে সে ইংরেজি ছাড়া অন্য যে কোনো দু'টি ঐচ্ছিক বিষয় নিয়ে পড়তে পারে। অর্থাৎ প্রাথমিক স্তরে অন্য কোনো দ্বিতীয় ভাষা নয়, একটি মাত্র ভাষা — মাতৃভাষায় শিক্ষাগ্রহণের সীমাবদ্ধ সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। জনসাধারণ সেই সুযোগ গ্রহণ করায় ১৯২১-২৬ সালে ছাত্রসংখ্যায় অভূতপূর্ব বৃদ্ধি ঘটেছিল এবং শাসক-শোষকশ্রেণী আতঙ্কিত হয়েছিলেন। ফলে অর্থসংকটের অজুহাতে তাঁরা প্রাথমিক শিক্ষাখাতে বরাদ্দ অর্থ ছাঁটাই করেছেন, হাটগ কমিটির সুপারিশ অনুসারে বহু প্রাথমিক স্কুল বন্ধ করে দিয়েছেন, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন-প্রতিষ্ঠানগুলি নানাবিধ পদ্ধতিতে জনশিক্ষা-প্রসারে বাধা সৃষ্টি করেছেন। ফলে ১৯২৬-২৭ সাল থেকে ছাত্রসংখ্যা পূর্ববর্তী পাঁচ বছরের ন্যায় বৃদ্ধি ঘটেনি।

১৯১৯ সালের ভারতশাসন-আইনানুসারে দশ বছর পরে শাসন-সংস্কারের জন্য বৃটিশ-রাজকীয় কমিশন গঠন করা হবে। কিন্তু ১৯১৯ সালের শাসন-সংস্কার সম্পর্কে জনমত ক্রমেই বিক্ষুব্ধ হওয়ায় ১৯২৭ সালে স্যার জন সাইমনের সভাপতিত্বে রাজকীয় কমিশন গঠিত হয় (এই কমিশন 'সাইমন কমিশন' নামে খ্যাত)। এই কমিশনকে বৃটিশ-ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে রিপোর্ট দিতে

বলা হয় এবং সেজন্য প্রয়োজন হলে সহায়ক কমিটি গঠন করতে বলা হয়। ফলে সাইমন কমিশন স্যার ফিলিপ হার্টগের সভাপতিত্বে 'Auxiliary Committee of the Indian Statutory Commission' গঠন করেন। স্যার হার্টগ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের সদস্য ছিলেন এবং ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন।

হার্টগের নেতৃত্বে সহায়ক কমিটি প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার বিষয়ে সমগ্র ভারতে তদন্ত করে ১৯২৯ সালে যে-রিপোর্ট উপস্থিত করেন, তা হার্টগ কমিটির রিপোর্ট নামে খ্যাত। এযুগের শিক্ষা-বিস্তারের ইতিহাসে এই রিপোর্ট একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল এবং তাতে ভারতের শিক্ষা সম্বন্ধে বৃটিশ-শাসকদের দৃষ্টিভঙ্গি উদ্ভাসিত হয়েছে। সুতরাং এই দলিলটি সতর্ক বিশ্লেষণের প্রয়োজন।

১৯১৭ সাল থেকে ১৯২৭ সালের মধ্যে বিভিন্ন স্তরে শিক্ষার ব্যাপ্তি লক্ষ্য করে হার্টগ কমিটির রিপোর্টে বলা হয়েছে, "শিক্ষার ক্রমোন্নতি সম্পর্কে আমাদের পর্যালোচনায় ভারতের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অনেক মৌলিক তথ্য উদ্ঘাটিত হয়েছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে বহুল পরিমাণে ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি প্রমাণ করে যে, শিক্ষা সম্পর্কে জনসাধারণের প্রাচীনকালের নিস্পৃহ মনোভাব ক্রমেই দূরীভূত হচ্ছে। ভারতবর্ষের মেয়েদের মধ্যে সামাজিক ও রাজনৈতিক জাগরণ ঘটেছে এবং তাদের পক্ষ থেকে শিক্ষা ও সমাজ-সংস্কারের দাবি উত্থাপিত হয়েছে। শিক্ষাগ্রহণের জন্য মুসলমান ছাত্রদের সংখ্যাও দ্রুতগতিতে ক্রমবর্ধমান। অনুন্নত শ্রেণীর মানুষদের অবস্থা উন্নয়নের জন্য প্রচেষ্টা হয়েছে এবং তারাও এতে সাড়া দিয়ে শিক্ষা গ্রহণে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চাইছে। সকল দিক থেকে শিক্ষার মত গুরু ও জটিল সমস্যাকে বোঝার আগ্রহ জন-নেতাদের রয়েছে। শিক্ষামন্ত্রীদের দ্বারা শিক্ষার খাতে অতিরিক্ত ব্যয়ের প্রস্তাব করা হয়েছে এবং তাতে ব্যবস্থাপক-সভার সদস্যরা স্বেচ্ছায় সম্মতি দিয়েছেন। এটা হ'ল একদিককার ছবি, কিন্তু অন্যদিকও রয়েছে।"[৪৭]

শিক্ষাজগতের এই 'অন্যদিক'-এর চিত্র তুলে ধরতে গিয়ে হার্টগ কমিটি প্রাথমিক শিক্ষা-সমস্যার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেবার কথা বলেছেন। কারণ তাঁদের দৃষ্টিতে জনশিক্ষার অবস্থা ছিল গভীর হতাশাব্যঞ্জক। কমিটির মতে নৈরাশ্যপূর্ণ এই অবস্থা সৃষ্টির কারণ ছিল 'যেখানে উচ্চতর শিক্ষার প্রতি অত্যধিক মনোযোগ দেওয়া হয়েছিল, সেখানে প্রাথমিক শিক্ষার প্রতি অবহেলার মনোভাব প্রদর্শিত হইয়াছিল।'[৪৮] এটা বিস্ময়জনক যে, এই একই অভিমত

১৮৫৪ সালের ডেসপ্যাচে, ১৮৬৬-৭০ সনের সরকারি শিক্ষা-পর্যালোচনায়, ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের ভারতীয় শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টে, ১৯০৪ সালের ১১ মার্চ শিক্ষানীতি সম্পর্কিত সরকারি প্রস্তাবে ব্যক্ত হয়েছিল। তারপরে হার্টগ কমিটির রিপোর্টে সেই একই কথা বলা হ'ল। অর্থাৎ বিগত একশ' বছর ধরে প্রাথমিক শিক্ষা-প্রসার সম্পর্কে নানা আলোচনা ও পরিকল্পনা হলেও তাকে রূপায়িত করার কোনো আন্তরিকতা সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের ছিল না।

হার্টগ কমিটি প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে 'অপচয়' (Wastage) ও 'বদ্ধতা' (Stagnation) লক্ষ্য করে এই দু'টি সমস্যার প্রতি সর্বপ্রথমে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তাঁরা বলেছেন, "সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থায় অপচয় ও অপ্রয়োজনীয় বস্তু প্রচুর। আমাদের মতে প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা এমন ভাবে পরিকল্পিত হওয়া উচিত যাতে সাক্ষরতার সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটে ও বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে ভোটদানের ক্ষমতা হয়। কিন্তু সেখানেও অপচয় ভয়াবহ। আমাদের মনে হয়, প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির বিশাল ছাত্রসংখ্যার সঙ্গে সাক্ষরতার সংখ্যাবৃদ্ধির সম্পর্ক নেই। কারণ তাদের মধ্যে কেবলমাত্র একটি ক্ষুদ্র অংশ চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত পৌছায় — যে শ্রেণীতে সাক্ষরতা আশা করা যায়। একটি প্রদেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা, ছাত্রসংখ্যা ও অর্থ ব্যয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি হলেও ১৯২৭ সালের চতুর্থ শ্রেণীতে উত্তীর্ণ ছাত্রসংখ্যা পূর্ববর্তী দশ বছরের তুলনায় ত্রিশ হাজারের কম ছিল। এটা স্মরণে রাখা প্রয়োজন যে, গ্রামীণ জীবনের বর্তমান অবস্থায় এবং আঞ্চলিক ভাষায় রচিত উপযুক্ত সাহিত্যের অভাবে স্কুল-ত্যাগের পরে একটি শিশুর সাক্ষর-জ্ঞান বজায় রাখার সম্ভাবনা খুবই কম। এবং প্রকৃতপক্ষে শিক্ষিতদের মধ্যেও সাক্ষরহীনতা দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা খুবই প্রবল। ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের ক্ষেত্রে অপচয় আরো ভয়াবহ।"[৪৯]

কমিটি দেখিয়েছেন, সমগ্র বৃটিশ-ভারতে ১৯২২-২৩ সনের প্রথম শ্রেণীর ছাত্রসংখ্যা ৫,৩৩,৮৭৮ ছিল ; ১৯২৩-২৪ সালের দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র ছিল ১,৬১,২২৮ ; ১৯২৪-২৫ খৃষ্টাব্দের তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রসংখ্যা ছিল ৮৬,৮৪৬ ; ১৯২৫-২৬ সনের চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র ছিল ৫৫,৭৯৪ এবং ১৯২৬-২৭ সালের পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রসংখ্যা ছিল ৩৩,৫৮৮। অর্থাৎ ১৯২২-২৩ খৃষ্টাব্দে প্রথম শ্রেণীতে পাঠরত প্রতি ১০০ ছাত্রছাত্রীর মধ্যে মাত্র ১৮ জন ছাত্রছাত্রী ১৯২৬-২৭ সালে পঞ্চম শ্রেণীতে পৌছেছিল।[৫০] এ সম্পর্কে কমিটি বলেছেন, "ছাত্রসংখ্যা হ্রাসের কারণ হ'ল প্রধানত দু'টি, যাকে আমরা 'অপচয়' (Wastage) ও 'বদ্ধতা' (Stagnation) বলে অভিহিত করতে পারি। 'অপচয়' শব্দটির দ্বারা প্রাথমিক

শিক্ষা সম্পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই যে কোনো স্তরে বিদ্যালয় থেকে শিশুকে অসময়ে প্রত্যাহার করে নেওয়াটাকে আমরা বুঝিয়েছি। মৃত্যু ও অসুস্থতার কারণে শ্রেণী থেকে শ্রেণীতে ছাত্রসংখ্যা স্বাভাবিকভাবে হ্রাস ঘটে ; কিন্তু মৃত্যুসংখ্যা প্রমাণ করে যে, এই কারণে ছাত্রসংখ্যার হ্রাস সামগ্রিক ছাত্রসংখ্যা-হ্রাসের তুলনায় অত্যন্ত কম। 'বদ্ধতা' শব্দটির দ্বারা নিম্নশ্রেণীতে একটি শিশুকে এক বছরের বেশী আটকিয়ে রাখাকে আমরা বুঝিয়েছি। এধরণের বদ্ধতার জন্য শেষ পর্যন্ত উচ্চশ্রেণীর সঙ্গে নিম্নশ্রেণীর ছাত্রসংখ্যার সামঞ্জস্য থাকে না। একটা শ্রেণী থেকে অন্য শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হওয়ার সময়ে ছাত্রসংখ্যার যে অবনতি ঘটে, তা 'অপচয়'-এর জন্য কতজন এবং 'বদ্ধতা'র জন্য কতজন বুঝা যায় না। কিন্তু আমাদের তদন্তের ফলাফল প্রমাণ করে যে, ছাত্রসংখ্যা হ্রাসের প্রধান কারণ হ ল অপচয়।

"এটা সত্য যে, বিশেষ অবস্থার জন্য ছাত্রসংখ্যা বিশ্লেষণকালে কিছু সুবিধা দেওয়া উচিত। দ্রুতগতিতে বিস্তৃতির স্বাভাবিক পরিণতি হ'ল প্রথম শ্রেণীর ছাত্রসংখ্যার অস্বাভাবিক বৃদ্ধি এবং তারফলে প্রথম শ্রেণীর সঙ্গে অন্যান্য উচ্চতর শ্রেণীর ছাত্রসংখ্যার অসামঞ্জস্য ঘটে। আবার অনেক প্রদেশে বিদ্যালয়-বর্ষের শেষদিকেও অনেক শিশুকে নতুন ভর্তি করা হয় এবং সেকারণে প্রথম শ্রেণীর ছাত্রসংখ্যার বৃদ্ধি ঘটলেও নতুন ছাত্ররা পরবর্তী বছর শেষ না হওয়া পর্যন্ত উত্তীর্ণ হওয়ার আশা করতে পারে না। কিন্তু উদারতার সঙ্গে অনেক কিছু বাদ দিয়ে আমরা যখন হিসাব করি, তখন অপচয় ও বদ্ধতার মত বেদনাদায়ক কঠিন সত্যটাই উদ্ভাসিত হয়।"[৫১]

সুতরাং এই নৈরাশ্যজনক অবস্থার প্রতিকারের জন্য হার্টগ কমিটি দাওয়াই দেবার পূর্বে আরো বলেছেন, "বহু জায়গায় এই মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে, যে-সকল ত্রুটি প্রাথমিক শিক্ষার জগৎকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করেছে, তা দূর করতে হলে বাধ্যতামূলক শিক্ষাই হ'ল একমাত্র সর্বরোগহর ওষুধ। আমরা যদিও মনে করি, জনশিক্ষার পরিকল্পনাকে সফল করতে হলে বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রয়োজন ; কিন্তু আমরা বুঝেছি যে, অবিলম্বে ও ব্যাপকভাবে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রচলন করলে সঙ্কটজনক হয়ে উঠবে এবং কোনো কোনো অঞ্চলে অনতিক্রম্য অর্থ নৈতিক বিপত্তি ঘটাবে। সুতরাং মাতৃভাষায় জাতীয় শিক্ষার সুষ্ঠ ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য বিস্তৃতির পরিবর্তে সংহতির প্রয়োজন। বহু অঞ্চলে ব্যাপকভাবে বাধ্যতামূলক নীতি প্রয়োগের পূর্বে কঠোরতার সঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষা-ব্যবস্থা পুনর্গঠনের প্রয়োজন। দ্রুতগতিতে শিক্ষানীতির

অবিবেচনাপ্রসূত প্রয়োগ অলাভজনক অর্থব্যয়ের কারণ হবে এবং বর্তমান ত্রুটিগুলিকে আরো ঘনীভূত করবে। অকার্যকর, অপ্রয়োজনীয় ও নিম্নমানের কর্মীবৃন্দের বিদ্যালয়ে ছাত্রদের উপস্থিত হতে বাধ্য করলে কেবলমাত্র বর্তমান অপচয়কে বাড়িয়ে তুলবে —যা বর্তমানে অনেক প্রদেশে দেখা যায়। ···পাঞ্জাবে ···এই নীতিকে বাধ্যতামূলকভাবে একই সঙ্গে ব্যাপক অঞ্চলে প্রয়োগ করা হয়নি। পক্ষান্তরে তাঁরা গ্রামাঞ্চলে আঞ্চলিক ভাষায় উন্নত বিদ্যালয় গড়ে তুলেছেন এবং যখন সেই বিদ্যালয়-সংলগ্ন অঞ্চল বাধ্যকরণের উপযোগী হয়ে উঠেছে, তখন তাঁরা বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রচলন করেছেন। এভাবে তাঁরা ধীরে ধীরে একটা গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্তন করছেন। এটাই সম্ভাব্য যে, দ্রুত ও সমভাবে বাধ্যতামূলক শিক্ষানীতির প্রয়োগে উক্ত পদ্ধতি সাহায্য করেছে।"[৫২]

অতএব তাঁরা এই সমস্যার সমাধান খুঁজে পেয়েছেন শিক্ষা-সংকোচনের মধ্যে। অবৈতনিক বাধ্যতামূলক সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা নয়, ব্যাপকভাবে প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা নয়, শিক্ষকদের শিক্ষাদানের মান উন্নয়ন, কিংবা শ্রেণী থেকে শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হওয়ার পদ্ধতি পরিবর্তন করা নয়, হার্টগ কমিটি কেবলমাত্র প্রাথমিক বিদ্যালয় বন্ধ করার দাওয়াই দিয়ে রোগ সারাবার চেষ্টা করেছেন। এ যেন মানুষের গলা কেটে মানুষের সমস্যা সমাধানের চেষ্টা। তাঁদের সুপারিশের সঙ্গে পূর্ববর্তীকালের বৃটিশ-শাসকদের অনুসৃত প্রাথমিক শিক্ষানীতির কোনো পার্থক্য ছিল না। ইংরেজ-শাসকেরা প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তারকল্পে অবৈতনিক বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার বিরোধী ছিলেন। তখন তাঁরা অর্থাভাবের অজুহাত দেখিয়ে প্রাথমিক শিক্ষা-প্রসারের প্রয়াসকে ব্যর্থ করার চেষ্টা করেছিলেন, আর হার্টগ কমিটি অপচয়ের অজুহাতে প্রাথমিক শিক্ষা-বিস্তারের প্রচেষ্টাকে ব্যাহত করার জন্য সচেষ্ট হয়েছেন। ১৯১৩ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি সরকারি প্রস্তাবে বলা হয়েছে, "আর্থিক ও প্রশাসনিক কারণে সরকার বাধ্যতামূলক শিক্ষানীতি প্রত্যাখ্যান করেছেন; কিন্তু তাঁরা স্বেচ্ছামূলক ভিত্তিতে ব্যাপকভাবে প্রাথমিক শিক্ষা-প্রসারে ইচ্ছুক। অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের সময় এখনো হয়নি। ···ইতোমধ্যে কিছু কিছু প্রদেশে প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক করা হয়েছে এবং অধিকাংশ প্রদেশে সেই সকল ছাত্রকে অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে যাদের পিতামাতার বেতনদানের আর্থিক ক্ষমতা নেই। দরিদ্রতর ও অনুন্নত শ্রেণীর মানুষদের অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষাদানের জন্য প্রাদেশিক সরকারগুলিকে

অনুরোধ করা হয়েছে। বর্তমানে এর চেয়ে বেশী করা সম্ভব নয়।"৫৩ কিন্তু সাত মণ তেলও পোড়েনি, আর রাধাও নাচেনি। প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ পেয়েছেন গ্রামের কেবলমাত্র উচ্চবিত্ত সচ্ছল মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেরা। শিক্ষার আলোয় কৃষকের ঘর আলোকিত হয়নি; নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে তাঁরা মুক্তি পাননি। এবারেও পেলেন না। হার্টগ কমিটি রায়ত-কৃষকের ছেলেদের শিক্ষিত করে শোষণ-বঞ্চনার ভিত্‌কে কাঁপাতে চাননি। সাম্রাজ্য ও সামন্ত-শোষণের ভিত্তিমূলকে আরো সুদৃঢ় করার জন্য তাঁরা প্রাথমিক বিদ্যালয় বন্ধ করার সুপারিশ করেছিলেন।

মাধ্যমিক ও স্নাতক-স্তরের শিক্ষাক্ষেত্রেও হার্টগ কমিটি শিক্ষা-সংকোচনের সুপারিশ করেছেন। তাঁরা বলেছেন, "মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরের কোনো কোনো ক্ষেত্রে অগ্রগতি ঘটেছে। বিশেষত শিক্ষকদের শিক্ষাদানের মান, তাদের চাকরির অবস্থা ও শিক্ষক-শিক্ষণ পদ্ধতি উন্নত হয়েছে এবং স্কুল-জীবনের সাধারণ কাজকর্মের প্রসার ঘটেছে। কিন্তু এখানেও মারাত্মক ত্রুটি রয়েছে। সমগ্র মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থা এখনো পর্যন্ত এই মনোভাবের দ্বারা প্রভাবিত যে, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে যে ভর্তি হচ্ছে, তাকে অবশ্যই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের জন্য প্রস্তুত হতে হবে। এবং তারফলে ম্যাট্রিকুলেশন ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলিতে অসংখ্য ছাত্রের অকৃতকার্যতার জন্য মারাত্মক অপচয় ঘটে। বৃত্তিগত ও শিল্পসংক্রান্ত শিক্ষার জন্য যে প্রচেষ্টা রয়েছে তার সঙ্গে শিক্ষাব্যবস্থার যোগাযোগ সামান্য এবং সেকারণে তা বৃহদংশে নিষ্ফল। বহু বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ তাদের শিক্ষাদানের পদ্ধতিতে যথেষ্ট উন্নতির পরিচয় দিয়েছে এবং তাদের মৌলিক কাজকর্মও যথেষ্ট; এবং নিঃসন্দেহে তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ পূর্বের তুলনায় আরো উন্নত পদ্ধতিতে যৌথ জীবনের শিক্ষা দিচ্ছে। কিন্তু ভারতের অধিকাংশ মানুষের মত হ'ল যে, একমাত্র না হলেও প্রধানত ছাত্রদের পরীক্ষায় পাস করানোর জন্যই বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি করা হয়েছে। আমাদের আকাঙ্ক্ষা এই যে, উন্নতমনা, সহিষ্ণু ও আত্মবিশ্বাসী নাগরিক গড়ে তোলাই হোক বিশ্ববিদ্যালয়গুলির প্রাথমিক কর্তব্য। কিন্তু যাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাগ্রহণের যোগ্যতা নেই এবং যারা অন্য পেশা গ্রহণ করলে সফল হ'ত, তাদের ভীড়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।"৫৪

সুতরাং হার্টগ কমিটি সাম্রাজ্যস্বার্থ-সিদ্ধির অভিপ্রায়ে মাধ্যমিক স্তরে অপচয় ও বিশ্ববিদ্যালয়-স্তরে ভীড় কমানোর জন্য শিক্ষা-প্রসারের পরিবর্তে শিক্ষা-সংকোচনের নীতি গ্রহণের পরামর্শ দিয়েছেন—'quantity'-র পরিবর্তে

'quality' বৃদ্ধির জন্য তাঁরা যে-সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন, তার সঙ্গে দেশের নাড়ীর কোনো সংযোগ ছিল না এবং তাঁদের রিপোর্টও ছিল বাস্তবের সঙ্গে সম্পর্কবিহীন। প্রকৃতপক্ষে ভারতে সাক্ষরতা বৃদ্ধির হার ছিল খুবই কম। ১৮৮১ সালের সাক্ষরতার সংখ্যা শতকরা ৩'৫ থেকে বৃদ্ধি হয়ে ১৯৩১ সালে শতকরা ৮ হয়েছে অর্থাৎ প্রতি দশকে শতকরা একজনেরও কম সাক্ষর হয়েছেন। সাক্ষরতা বৃদ্ধির হার জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সমগতিতে বর্ধিত হয়নি —যেখানে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল প্রতি বছরে শতকরা একজন। সুতরাং সাক্ষরদের সংখ্যাবৃদ্ধির তুলনায় নিরক্ষরদের সংখ্যাবৃদ্ধি অনেক বেশী ছিল। তাঁদের শিক্ষিত করার জন্য প্রয়োজন ছিল শিক্ষাকে জলস্রোতের ন্যায় প্রবাহিত করা, ফোঁটায় ফোঁটায় নয়। নিরক্ষরতা দূর করার জন্য যতদিন পর্যন্ত না একটা সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী পরিকল্পিত ও কার্যকরী হয়, ততদিন ভারতে জনশিক্ষা-সমস্যার সমাধান ঘটবে না। তাই হার্টগ কমিটির রিপোর্ট ইংরেজ-সরকার ও পরান্নভোজীদের খুশি করলেও ভারতের জনসাধারণ এই রিপোর্ট প্রত্যাখ্যান করেছেন। শ্রীআর. ভি. পারুলেকর বলেছেন, "কেবলমাত্র অন্যান্য দেশের উদাহরণ নয়, তাদের শিক্ষার ইতিহাসে দেখা যায় যে, অন্যবিধ শিক্ষা-সংস্কারের পূর্বে অবশ্য প্রয়োজন দ্রুত শিক্ষা-বিস্তার। জনশিক্ষার ক্ষেত্রে ভারতবর্ষ এই পরম সত্যটি কখনো উপলব্ধি করেনি যে, শিক্ষার শ্লথ গতি অগ্রগতিই নয়। 'শ্লথ গতিতে শিক্ষার প্রসার হলে মুষ্টিমেয় শিক্ষিত ব্যক্তি নিরক্ষর জনগণের জড়ত্বে আচ্ছন্ন হয়ে যেতে পারে। শিক্ষা সর্বোত্তম ফলদায়ক হয়ে ওঠে তখনই, যখন তা বিন্দুবর্ষণের পরিবর্তে দ্রুত সর্বজনীন হয়।' সহজেই এই সত্যটিকে ব্যাখ্যা করা যায়। বড় জমিকে চাষযোগ্য করার জন্য যদি আমরা আগাছামুক্ত করতে চাই, তাহলে প্রতিদিন জমির এদিকে দু'একটা, ওদিকে দু'একটা আগাছা তুললে আমরা কিছুতেই আমাদের লক্ষ্য পূরণে সক্ষম হব না। যে-সময়ে একটু এগোবো, সে-সময়ে পরিষ্কার করা জায়গায় নতুন আগাছা জন্মাতে থাকবে। এর শেষ আর হতে চাইবে না। দ্রুত শিক্ষা-প্রসারের দাবির পিছনে অন্য এক যুক্তিও রয়েছে। এটা দেখানো হয়েছে যে, উচ্চ হারে জন্ম ও মৃত্যুর জন্য বিদ্যালয় থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত নয়া সাক্ষরদের শতকরা ৭৫ ভাগের সাক্ষরতার যথার্থ প্রতিফলন হয় না। যে-গতিতে শূন্যতা সৃষ্টি হচ্ছে, তার চেয়ে দ্রুততর গতিতে পূরণ করা আবশ্যক। অন্যথা অগ্রগতি মন্থর কিংবা বর্তমানের মত অচল হতে বাধ্য।"[৫৫]

সাইমন কমিশন কর্তৃক নিযুক্ত হার্টগ কমিটির শিক্ষা বিষয়ক সুপারিশ যে

প্রকৃতপক্ষে জন-হিতার্থে রচিত নয়, তা যে কেবলমাত্র বিক্ষুব্ধ জনমতকে বিভ্রান্ত করার কৌশল মাত্র, সে-ব্যাপারে চিন্তাশীল মনীষীরা সকলেই একমত ছিলেন। এবিষয়ে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য ছিল খুবই শ্লেষাত্মক : "দেশব্যাপী অশিক্ষাজনিত বিপদ দূর করবার উপায় কমিশনের পরামর্শমাত্র-দ্বারা লাভ করা যায় না — সে সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের তেমনি তৎপর হওয়া উচিত যেমন তৎপর ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট নিশ্চয়ই হত যদি এই সমস্যা ব্রিটেন দ্বীপের হত। সাইমন কমিশনকে আমাদের প্রশ্ন এই যে, ভারতের অজ্ঞতা-অশিক্ষার মধ্যে এত বড়ো মৃত্যুশেল নিহিত হয়ে এতদিন রক্তপাত করছে এই কথাই যদি সত্য হয়, তবে আজ এক শো ষাট বৎসরের ব্রিটিশ-শাসনে তার কিছুমাত্র লাঘব হল না কেন? কমিশন কি সাংখ্যতথ্যযোগে দেখিয়েছেন পুলিসের ডাণ্ডা যোগাতে ব্রিটিশরাজ যে খরচ করে থাকেন তার তুলনায় দেশকে শিক্ষিত করতে এই সুদীর্ঘকাল কত খরচ করা হয়েছে? দূরদেশবাসী ধনী শাসকের পক্ষে পুলিসের ডাণ্ডা অপরিহার্য, কিন্তু সেই লাঠির বংশগত যাদের মাথার খুলি তাদের শিক্ষার ব্যয়বিধান বহু শতাব্দী মুলতবী রাখলেও কাজ চলে যায়।"[৫৬]

প্রকৃতপক্ষে প্রশ্নটা শ্লথগতি বনাম দ্রুতগতির ছিল না। মৌলিক প্রশ্নটা ছিল, দরিদ্র শ্রমজীবী-কৃষিজীবী মানুষকে সাক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন করে তোলা হবে কিনা? এই প্রশ্নে বিদেশী শাসকশক্তি ও দেশীয় ভূস্বামীশ্রেণীর মনোভাব একই ছিল। তাঁরা সকলেই অবৈতনিক সর্বজনীন জনশিক্ষার বিরোধী ছিলেন। হার্টগ কমিটি চাতুরীপূর্ণ বাক্যের আবরণে তাঁদের জনবিরোধী দৃষ্টিভঙ্গি ঢাকতে পারেননি। তাঁদের অসতর্ক উক্তিতে ঝুলির ভেতর থেকে বেড়াল বেরিয়ে পড়েছে। তাঁরা বলেছেন, "**জনসাধারণের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা কি করতে যাচ্ছে? সহজে প্রভাবিত ও বিচলিত হয় এমন এক জাতিকে কি আরও প্রভাবিত হওয়ার জন্য প্রস্তুত করবে?**"[৫৭] [মোটা হরফ লেখকের]। অর্থাৎ জনসাধারণকে প্রাথমিক শিক্ষাদানের অর্থই হ'ল, স্বাধিকার সম্বন্ধে তাঁদের সচেতন করে তোলা, শোষণ-বঞ্চনার বিরুদ্ধে তাঁদের জাগ্রত করা, শাসক-শোষকদের বিরুদ্ধে সম্মিলিত প্রতিরোধ-শক্তি গড়ে তুলতে সাহায্য করা এবং পরিণতিতে আমেরিকা-উপনিবেশের মত ভারত-উপনিবেশকে হাতছাড়া করা ও সামন্তশোষণমুক্ত নবীন ভারত গঠনে প্রেরণা দেওয়া। সুতরাং বৃটিশ-শক্তি ও তাঁদের সহযোগী দেশীয় সামন্ত-শক্তি এবং ভূস্বামী-নির্ভর ইংরেজি-শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী-সমাজ —এঁরা সকলেই শিক্ষাকে সর্বস্তরে ছড়িয়ে দেওয়ার একান্ত বিরোধী ছিলেন। জনশিক্ষা, মাতৃভাষা,

উচ্চশিক্ষা, শিক্ষণীয় বিষয় ইত্যাদি সকল প্রশ্নে তাঁদের মনোভাব ছিল জনস্বার্থবিরোধী। শিক্ষা-প্রসারের প্রয়াসকে তাঁরা নানাবিধ কৌশলে প্রতিহত করার চেষ্টা করেছেন। এই উক্তি যে অতিরঞ্জিত নয়, তার পরিচয় পাওয়া যায় এসময়কার বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার কার্যবিবরণীতে ও বাংলাদেশের ঘটনাবলীতে।

সৈয়দ শাহেদুল্লাহ্ তাঁর গ্রন্থে তৎকালীন দিনের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেছেন। প্রাথমিক শিক্ষা-প্রশ্নে বিভিন্ন শ্রেণীর স্বার্থরক্ষার প্রচেষ্টা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হওয়ার জন্য তাঁর গ্রন্থ থেকে এখানে বিস্তৃত উদ্ধৃতি দেওয়া হ'ল : "জমিদারদের বিরোধিতা সত্ত্বেও সাধারণ কৃষকদের প্রাথমিক শিক্ষার দাবি অসহযোগ আন্দোলনের পরে বেড়ে গেল। এই সুযোগে সাম্রাজ্যবাদ প্রাথমিক শিক্ষার খসড়া বিলের জন্য এমন এক প্রস্তাব করল যাতে তার শিক্ষাব্যবস্থা সরকারি নিয়ন্ত্রণের অধীনে থাকে। এই নিয়ন্ত্রণের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে সাধারণের তরফ থেকে প্রতিবাদ হল। জমিদার তাদের প্রাথমিক শিক্ষার প্রতি মূল বিরোধিতা সরকারি নিয়ন্ত্রণের প্রতি বিরোধিতার আড়ালে কিছুটা ঢাকতে পারল। সাম্রাজ্যবাদের দুরভিসন্ধি খুলে প্রকাশ করে দেওয়া ও সম্ভবমত উপায়ে তার বিরোধিতা করা প্রয়োজন ছিল। কিন্তু এমন কিছু করা উচিত ছিল না যাতে জমিদারদের অভিসন্ধি সার্থক হয় এবং সাধারণ কৃষক মনে করেন প্রাথমিক শিক্ষার প্রস্তাবকে ব্যর্থ করার উদ্দেশ্যে জমিদারদের যে প্রচেষ্টা তাকেই সমর্থন করা হচ্ছে। বস্তুত, বারবার 'সিলেক্ট কমিটি'তে পাঠানোর ফলে এবং বিধানসভার মধ্যে অন্যান্য ভাবে জমিদারদের সমর্থন করার ফলে স্বরাজদল (বা কংগ্রেস দল) সম্বন্ধে স্বভাবতই কৃষকের ঐরূপ ধারণা হল।

"১৯২৭ সালে প্রথম খসড়া বিল উত্থাপিত হয়; উপরোক্ত পদ্ধতিতে বিরোধিতার ফলে বারবার সিলেক্ট কমিটিতে যায়। কৃষক জনমতের এক বিরাট অংশ জমিদারদের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ হয়ে যে কোনও উপায়ে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের পক্ষে এবং খসড়া বিল, এমনকি উপস্থাপিত পূর্ণ খসড়া বিলটি পাশ করার পক্ষে চলে যায়।

"খসড়া বিলে প্রস্তাব করা হয়েছিল বাংলাদেশে খাজনার টাকা প্রতি পাঁচ পয়সা (পুরাতন পয়সা)* শিক্ষাকর প্রয়োগ হবে। এর মধ্যে অনুপাত হবে জমিদারদের উপর টাকায় এক পয়সা এবং প্রজার উপর টাকায় চার পয়সা। জমিদারদের উপরই সম্পূর্ণ ট্যাক্স প্রযুক্ত হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু হল সম্পূর্ণ

---

* ৬৪ পয়সায় টাকা।

বিপরীত। প্রজাপক্ষীয়েরা যাঁরা প্রধানত প্রাথমিক শিক্ষা বিলের উৎসাহী সমর্থক এই অনুপাতের তীব্র প্রতিবাদ করলেন এবং জমিদারদের উপর বেশী হার প্রয়োগ করার দাবি করলেন। সিলেক্ট কমিটিতে তাঁরা আংশিকভাবে জয়ী হলেন এবং প্রজার ৩ পয়সা ও জমিদারের ২ পয়সা অনুপাত ঠিক করলেন। সরকার সে-অনুমোদন গ্রহণ না করে পুনরায় বিলের পূর্ব হার প্রস্তাব করলেন। জমিদাররা একযোগে তাদের উপর কর প্রয়োগের বিরোধিতা করল। দুই-একজন বাদ দিয়ে কংগ্রেসপক্ষীয়েরা জমিদারের পক্ষে খুবই লড়লেন। রণজিত পাল চৌধুরী বললেন এই বিল জমিদারদের বিরুদ্ধে 'ডিসক্রিমেনাটারি' পক্ষপাত দুষ্ট। জমিদারদের মত প্রতিধ্বনি করে কংগ্রেস নেতা নলিনী সরকার বললেন, "…কংগ্রেস দল জমিদারদের পক্ষে সুবিচারের জন্য দাঁড়ায় একথা সত্য।" সঙ্গে সঙ্গে জমিদার পক্ষে এই প্রকাশ্য ওকালতিটা ঢাকার জন্য বললেন : আমার দল বিশ্বাস করে যে উভয়ের স্বার্থের পক্ষে সেবা করে এতে স্বরাজের শক্ত ভিত পাওয়া যায়।" (৫ ই, ৬ ই, ৭ ই আগস্ট, ১৯২৯, কাউন্সিল বিবরণী) কংগ্রেসের অন্যতম সদস্য সেকালের বিখ্যাত অধ্যাপক ও বক্তা জে. এল. ব্যানার্জী ভোটাভুটি দল নির্দেশে দিলেও জমিদার পক্ষে কংগ্রেস দলের ক্রিয়াকলাপ প্রকাশ করে দিলেন। সরকার জমিদারদের খাতির করে সিলেক্ট কমিটির প্রস্তাবিত হার অগ্রাহ্য করাটা এবং পূর্ব হার (অর্থাৎ জমিদারদের টাকা প্রতি ১ পয়সা এবং প্রজাদের ৪ পয়সা) প্রস্তাব করায় তার নিন্দা করলেন এবং তারপর বললেন, "স্বরাজ দলের কয়েকজন খ্যাতনামা ভদ্রলোক (যাঁদের নাম আমি করব না) আরও বেশী গেছেন। তাঁরা বলছেন, জমিদারদের উপর এই এক পয়সা কর প্রয়োগও অত্যন্ত বেশী হচ্ছে; তাঁরা বলছেন, সমস্ত খরচটাই (অর্থাৎ গোটা ৫ পয়সা করই) প্রজার উপর প্রয়োগ হোক। হ্যাঁ, মশায়, ঠিক তাই করা উচিত কারণ তাদের না চওড়া পিঠ আছে? সে পিঠের উপর যত রকম ট্যাক্সের বোঝা চাপিয়ে সে পিঠ চূর্ণ করার উপযোগী নয় কি?" তিনি প্রস্তাব করেন প্রজার উপর কর না চাপিয়ে অধিক আয়ের উপর কর প্রয়োগ করুন কিংবা জমিদারদের দেয় রাজস্বের পরিমাণ বৃদ্ধি করে দিতে পারেন। (কাউন্সিল বিবরণী ৫. ৮. ২৯)

"যাই হোক, জমিদারদের জিদ খানিকটা বজায় থাকল। নাজিমুদ্দিন জমিদারদের টাকায় সাড়ে তিন পয়সা এবং প্রজাদের টাকায় দেড় পয়সা এই প্রস্তাবে নতুন বিল এনে বেঙ্গল রুরাল প্রাইমারী এডুকেশন বিল পাশ করিয়ে নিলেন। …

"এই উপলক্ষে বাংলাদেশকে বিরাট আঘাত দেওয়া হল —সেটারও উল্লেখ থাকা উচিত। প্রাথমিক শিক্ষা বিলের উপস্থাপনা থেকে পাশ পর্যন্ত এমন ভাবেই স্বার্থান্বেষীরা পরস্পরকে পরিচালনা করতে সক্ষম হল যে এই পর্যন্ত ব্যাপারটা একটা সাম্প্রদায়িক বিবাদের স্তরে নামিয়ে দিল। বাংলাদেশের সাধারণ গরীব মানুষের মধ্যে হিন্দু মুসলমান প্রায় সমান সমান কিন্তু জমিদারদের মধ্যে বেশীর ভাগ হিন্দু। মুসলমান জমিদার ঘরের সংখ্যা নগণ্য। মর্লে-মিন্টো রিফর্মস বা তার পূর্বে প্রধানত জমিদার শ্রেণীর বা তাদের সঙ্গে সখ্য সূত্রে আবদ্ধ শ্রেণীর মানুষই লেজিস্‌লেটিভ কাউন্সিল প্রভৃতিতে নির্বাচিত হয়ে আসতেন। হিন্দু মুসলমান উভয় ক্ষেত্রেই হত। কিন্তু যেহেতু মুসলমান জমিদার ঘর কম সেহেতু তাঁদের মধ্যে অন্যান্য শ্রেণীর মানুষও থাকতেন। জমিদাররা স্বভাবতই প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারের বিরোধী হতেন। এটাও জমিদারদের বিরোধিতা বলে প্রচারিত না হয়ে 'হিন্দুদের' বিরোধিতা বলে প্রচারিত হত। স্বয়ং হিন্দু জমিদার ও সাম্প্রদায়িকরাও এই ভাবে প্রচার করতেন এবং মুসলমান সাম্প্রদায়িকরা তা করতেন। বিশ দশকে অসহযোগ আন্দোলনের পর যখন মণ্ট-ফোর্ড রিফর্মস প্রবর্তিত হল, ব্যাপকতর পৃথক নির্বাচনের ফলে সাম্প্রদায়িক প্রচার ইত্যাদির সুযোগ বৃদ্ধি হল। এইরূপ প্রচার শতাব্দীর গোড়া থেকে আরম্ভ হয় —এবং ১৯৩০-এ বিলটি পাশ হওয়ার সময় চরমতম পর্যায়ে পৌঁছায়। স্বদেশী আন্দোলনের কালেই এর বীজ রোপিত। লর্ড কার্জন তখন ফাটল খোঁজার তালে ছিলেন। কৃষকদের নিজেদের জমির স্বত্ব ইত্যাদি বোঝার জন্য লেখাপড়া জানা দরকার একথাটা তিনি বললেন তাঁর ১৯০৪ সালের প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত প্রস্তাবে। তিনি বড়লাট। প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা তিনি ইচ্ছা করলেই করতে পারতেন। তা করলেন না। কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষার উপকারিতা সম্বন্ধে প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। সুতরাং এর মধ্যে গভীর অর্থ থাকা বিচিত্র নয়। ১৯০৮ সালে বগুড়ায় একটি মুসলমান শিক্ষা সম্মেলন হয়। প্রস্তাব নেওয়া হল হিন্দুরা যদি শিক্ষার জন্য কর দিতে না চায়, শুধু মুসলমানদের উপর কর প্রয়োগ করে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হোক।

"ঐ প্রস্তাবে ঘোষণা করা হল মুসলমানরা সে ব্যবস্থায় সম্মত। ১৯২৬ থেকে ১৯৩০ উপরে উল্লিখিত বিল পাশ হওয়ার সময় এই সুর ধীরে ধীরে চরমে উঠল। ১৯২৮ সালে লাট সাহেব কাউন্সিলের উদ্বোধন বক্তৃতায় প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ে ভাষণ দেওয়ার সময় বললেন: "একটা সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার জন্য সেই সব সম্প্রদায় ব্যগ্র যারা শিক্ষায় তুলনামূলক ভাবে

পশ্চাৎপদ", অর্থাৎ যুৎসই প্ররোচনা দেওয়া হল। তাঁর চেষ্টা বিফলে গেল না। সাড়া পেলেন। বিল আলোচনার সময় সনাতনধর্মী জমিদার শিবশেখরেশ্বর রায় বললেন : "ব্রাহ্মণ ও বৈশ্য যাঁরা শতকরা শতজনই শিক্ষিত এ আইনে তাঁরা কিছু উপকৃত হবেন না। মুসলমান, নমশূদ্র এবং অন্যান্য নিম্ন সম্প্রদায়ের লোকেরাই উপকৃত হবে।" (কাউন্সিল বিবরণী, ৯. ৮. ২৮)।

"জমিদার ও কংগ্রেসীদের চেষ্টায় বিলটি বারবার সিলেক্ট কমিটিতে প্রেরিত হয়। জে. এল. ব্যানার্জী এই পদ্ধতিকে বললেন "frankly delatory"। মুসলমান সাম্প্রদায়িকদের পক্ষে এই পদ্ধতি সুযোগ এনে দিল। নাজিমুদ্দিন তখন মন্ত্রী। তাঁর দরকারও ছিল। কারণ সিলেক্ট কমিটি বিলকে যে ভাবে সংস্কার করেছিলেন—তাতে জমিদারদের দেয় করের হার বেড়েছিল এবং প্রজার ঐ হার কমেছিল। তাছাড়া সরকারী নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাটা শিথিল হয়ে গিয়েছিল। সুতরাং তিনি জমিদারদের হার কমিয়ে প্রজার হার বাড়িয়ে এবং সরকারী নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা ও শৃঙ্খল বাড়িয়ে নূতন বিল উপস্থিত করলেন। তারপক্ষে জনমত দরকার। সুতরাং "হিন্দুরা" মুসলমান ও নমশূদ্রকে লেখাপড়া শিখতে দিচ্ছে না, এই প্রচার তাঁর প্রয়োজন। তিনি সাধারণ মুসলমান কৃষকদের শিক্ষার প্রতি আগ্রহকে কাজে লাগাবার চেষ্টা করলেন। ফজলুল হক অভিযোগ করে বলেছিলেন, "মন্ত্রী মশাই-এর (অর্থাৎ নাজিমুদ্দিনের) মুসলমান জেলাগুলিতে ভ্রমণ এমন অভূতপূর্ব উৎসাহ সৃষ্টি করেছে যে আমার গরীব মক্কেলরা পর্যন্ত আমাকে এসে বলছে যে, আমি যেন মুসলমানদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা না করি এবং এই বিলের পক্ষে ভোট দিই।" (কাউন্সিল বিবরণী, ১৪. ৮. ৩০)

"নাজিমুদ্দিনের পাল্টা হলেন জমিদার শিবশেখরেশ্বর। তিনি বললেন, "স্বভাবতই শিক্ষায় পশ্চাৎপদ শ্রেণীরা এইরূপ আইন অভিনন্দন করবেন। যদিও এর জন্য তাঁদের উপর অধিকন্তু খানিকটা করের বোঝা চাপে তবুও তাঁরা তা করবেন। মুসলমানরা সম্প্রদায় হিসাবেই এই দলে পড়েন। তাঁদের ন্যায্য মনের আবেগ উত্তেজিত করার জন্য খুব বড় প্রচারের প্রয়োজন হয় না। অন্যদিকে এও স্বাভাবিক যারা (ঠিক হক বা ভুল হক) মনে করে তাদের উপর যে-বোঝা চাপানো হচ্ছে তা প্রাপ্য সুবিধার সঙ্গে সমতুল নয় তারাও এরূপ আইনের বিরোধিতা করবে। সুতরাং দেখা যাবে যে জমিদারের উপর করের ভার বোঝা চাপিয়ে এবং কঠিন সরকারি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা করে এই যে আইন পাশ হচ্ছে—এ আইন হিন্দুদের শক্তিশালী বিরোধিতার সম্মুখীন হবে। তাঁর

বক্তব্য এমন যেন বাংলাদেশের সব হিন্দু জমিদারের পক্ষে। আইন পাশ হওয়ার সময় জমিদারদের প্রস্তাবে দু' একজন বাদে সমস্ত হিন্দু সদস্য প্রতিবাদে কাউন্সিলের অধিবেশন ত্যাগ করেন। অবশ্য মনে রাখতে হবে, কংগ্রেস তখন কাউন্সিলে নাই। হিন্দু প্রতিনিধিদের মধ্যে যাঁরা আছেন তাঁরা হয় জমিদার কিংবা সাম্প্রদায়িক কিংবা উভয়ই। কংগ্রেসীরা তখন আইন সভায় নেই। ১৯৩০-এর অসহযোগ আন্দোলন চলছে। কংগ্রেসীদের অতীতের ক্রিয়াকাণ্ড দেখলে মনে হয় তাঁরাই বিরোধিতা করতেন।

"এখানে ঢাকার নবাব প্রভৃতি মুসলমান জমিদারদের কথাটা কিছু বলা উচিত। তখন রাজনৈতিক গতি এমন দাঁড়িয়েছিল যে প্রাথমিক শিক্ষা বিল এঁদের সমর্থন না করে উপায় নেই। অন্যদিকে তাঁদের সাম্প্রদায়িক রাজনীতিতেও এটা কাজে লাগছিল। কিন্তু ট্যাক্সের অনুপাতের ভোটে নবাব সাহেবদের আসল চরিত্র প্রকাশ পেয়ে যায়। প্রজাপক্ষীয় সংশোধন ছিল। সে-সংশোধনে প্রজার হার কমিয়ে জমিদারের হার বাড়ানোর কথা বলা হয়েছিল। নাজিমুদ্দিন, ঢাকার নবাব, গজনভী প্রভৃতি মুসলমান জমিদাররা এই সংশোধনীর বিরুদ্ধে ভোট দিলেন এবং একে পরাজিত করলেন।

"উপরের ঘটনাবলীতে বোঝা যাবে জনসাধারণের জীবনের একটি সমস্যাকে ইচ্ছামত মোচড় দিয়ে কেমন সুচতুর ভাবে সাম্রাজ্যবাদ ও তার অনুচর বাংলার জমিদাররা তিক্ততা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করতে পেরেছিল।

"কিন্তু এত সত্বেও পরবর্তী ১৯৩৬ সালের নির্বাচনে নাজিমুদ্দিন আর তাঁর মুসলীম লীগ জয়ী হন নাই। জয়ী হয়েছিলেন ফজলুল হক আর তাঁর কৃষক প্রজা পার্টি। শেষোক্তদের উদ্ভব হয়েছিল প্রজাস্বত্ব বিল আর প্রাথমিক শিক্ষা বিলে কংগ্রেস প্রজাস্বার্থের বিরোধিতা করায় এবং তার দরুণ বিক্ষোভের ফলে।"[৫৮]

অর্থাৎ শিক্ষার সুপক্ব ফলটি খাবেন সমাজের সুবিধাভোগীশ্রেণী, আর তার বোঝা বইবেন সহায়-সম্বলহীন দরিদ্রশ্রেণী। পাকা আমটির রসাস্বাদ করবেন সমাজের ওপরতলার মানুষ, আর আঁটি মাটিতে পুঁতে আম ফলাবেন নীচু তলার জীর্ণ-শীর্ণ মানুষেরা। এই নীতির তীব্র প্রতিবাদ করেছেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ। শিক্ষাকরের আংশিক ভার-বহনের বিরুদ্ধে যখন ভূস্বামীশ্রেণী ও তাঁদের পৃষ্ঠপোষক রাজনৈতিক দলগুলি প্রতিবাদ জানাচ্ছেন, রবীন্দ্রনাথ তখন রাশিয়ায়। প্রজাদের কাঁধে শিক্ষাকরের অধিকাংশ বোঝা চাপিয়ে দেবার সংবাদ পেয়ে ১৯৩০ সালের ৫ অক্টোবর তিনি এক চিঠিতে লিখেছেন, "কাগজে পড়লুম, সম্প্রতি দেশে প্রাথমিক

শিক্ষা প্রবর্তন-উপলক্ষে হুকুম পাস হয়েছে প্রজাদের কান মলে শিক্ষা-কর আদায় করা, এবং আদায়ের ভার পড়েছে জমিদারের 'পরে। অর্থাৎ, যারা অমনিতেই আধমরা হয়ে রয়েছে শিক্ষার ছুতো করে তাদেরই মার বাড়িয়ে দেওয়া।

"শিক্ষা-কর চাই বই কি, নইলে খরচ জোগাবে কিসে? কিন্তু দেশের মঙ্গলের জন্যে যে কর, কেন দেশের সবাই মিলে সে কর দেবে না? সিভিল সার্ভিস আছে, মিলিটারি সার্ভিস আছে, গভর্নর ভাইস্‌রয় ও তাঁদের সদস্যবর্গ আছেন, কেন তাঁদের পরিপূর্ণ পকেটে হাত দেবার জো নেই? তাঁরা কি এই চাষীদের অন্নের ভাগ থেকেই বেতন নিয়ে ও পেন্‌সন নিয়ে অবশেষে দেশে গিয়ে ভোগ করেন না? পাটকলের যে-সব বড়ো বড়ো বিলাতি মহাজন পাটের চাষীর রক্ত নিয়ে মোটা মুনাফার সৃষ্টি করে দেশে রওনা করে, সেই মৃতপ্রায় চাষীদের শিক্ষা দেবার জন্যে তাদের কোনোই দায়িত্ব নেই? যে-সব মিনিস্টার শিক্ষা-আইন পাস নিয়ে ভরা পেটে উৎসাহ প্রকাশ করেন তাঁদের উৎসাহের কানাকড়ি মূল্যও কি তাঁদের নিজের তহবিল থেকে দিতে হবে না? ...প্রাথমিক শিক্ষার নামে কণামাত্র শিক্ষা চালিয়ে ভারত-গবর্ণমেন্ট এত দিন পরে দুশো বছরের কলঙ্ক মোচন করতে চান, অথচ তার দাম দেবে তারাই যারা দাম দিতে সকলের চেয়ে অক্ষম —গবর্ণমেন্টের প্রশ্রয়লালিত বহ্বাশী বাহন যারা তারা নয়, তারা আছে গৌরব ভোগ করবার জন্যে।"[৫৯]

ইতোমধ্যে ভারতের রাজনৈতিক অবস্থার দ্রুত পট পরিবর্তন ঘটতে থাকে। ১৯২৭ সালের শেষভাগ থেকে পুনরায় জনগণের বিক্ষোভের প্রকাশ ঘটেছে এবং তার প্রতিক্রিয়া দেখা যায় কংগ্রেসের মাদ্রাজ-অধিবেশনে। এই অধিবেশন থেকে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি ঘোষিত হয় ও সাইমন কমিশন বয়কট করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এদেশে সাইমন কমিশনের পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র ভারতে দেখা দিল বিক্ষোভ ও ধর্মঘটের উত্তাল তরঙ্গ। ১৯২৮ সালের কলকাতা অধিবেশনে কংগ্রেস অসহযোগ আন্দোলনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। পঞ্চাশ হাজার শ্রমিকের মিছিল এই অধিবেশনে উপস্থিত হয়ে 'ভারতে স্বাধীন সমাজ-তান্ত্রিক রাষ্ট্রের'[৬০] দাবি উত্থাপন করেছেন। বৃটিশ সরকারও সম্ভাব্য জঙ্গী গণ-আন্দোলনকে অঙ্কুরে বিনষ্ট করার জন্য জনগণের অগ্রগামী বাহিনী শ্রমিক-শ্রেণীর ওপরে আঘাত হেনেছেন। ১৯২৯ সালের মার্চ মাসে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে রাতের অন্ধকারে মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ, ফিলিপ স্প্র্যাট, বি. এফ. ব্র্যাডলি, এস. এস. মিরাজকর, রাধারমণ মিত্র, অযোধ্যাপ্রসাদ প্রমুখ শ্রমিক-শ্রেণীর ৩১ জন কমিউনিস্ট নেতাকে গ্রেফ্‌তার করে তাঁদের বিরুদ্ধে 'মীরাট

ষড়যন্ত্র মামলা' দায়ের করেছেন। 'ভারতে কমিউনিস্ট কার্যকলাপ'[৬১] ও গণ-আন্দোলনকে দমন করার উদ্দেশ্যে ভারতের বড়লাট 'জন-নিরাপত্তা আইন' জারি করেছেন। তা সত্ত্বেও ভারতের মানুষ ভীত হননি; তাঁরা চূড়ান্ত লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হয়েছেন।

১৯২৯ সালের কংগ্রেসের লাহোর অধিবেশনে আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং পরের বছরের এপ্রিল মাসে গান্ধীজীর নেতৃত্বে নির্বাচিত স্বেচ্ছাসেবকদের দ্বারা লবণ-তৈরির মধ্য দিয়ে আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ হয়। কিন্তু এই আন্দোলনকে সীমাবদ্ধ করে রাখার প্রয়াস সত্ত্বেও কিছুদিনের মধ্যে নেতৃত্বের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তা ব্যাপক গণ-আন্দোলনে রূপান্তরিত হ'ল। 'দেখা দিল ছোট বড় ধর্মঘট, বিরাট শোভাযাত্রা ও বিক্ষোভ প্রদর্শন, চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন, পেশোয়ারের ঘটনাবলী (দশ দিন পেশোয়ার জনগণের দখলে ছিল) এবং বহু অঞ্চলে কৃষকদের স্বতঃপ্রণোদিত খাজনা-বন্ধ আন্দোলন।'[৬২]

বৃটেনের শ্রমিক-দলের সরকার ভারতে গণ-আন্দোলনকে চূর্ণ করার জন্য সকল রকমের পাশবিক শক্তি প্রয়োগ করেছেন। '১৯৩০-৩১ সালে মাত্র দশ মাসের মধ্যে ৯০ হাজার নরনারী ও শিশু কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছেন।'[৬৩] এবং গুলি-চালনায় নিহত হয়েছেন ১০৩ জন। কিন্তু দমন পীড়ন সত্ত্বেও জনগণের সংগ্রামী মেজাজ যখন প্রবল ভাবে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে আত্মপ্রকাশ করছে, যখন ইংরেজ-সরকার ভীত-কম্পিত ও তাঁদের শাসন-ব্যবস্থা টলমলায়মান, তখন গান্ধী-আরউইন চুক্তির (১৯৩১ সালের ৪ মে) দ্বারা আইন-অমান্য আন্দোলন পরিত্যক্ত হ'ল। 'যখন জাতীয় আন্দোলন উচ্চতম শিখরে পৌছোচ্ছিল এবং বৈপ্লবিক রূপ নিচ্ছিল, তখন স্বাধীনতা বা কোনো আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার না পেয়েই তাকে বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে এক বিরাট বিশ্বাসঘাতকতা। পুঁজিপতি এবং সামন্তশ্রেণীর স্বার্থের জন্যে কংগ্রেসের বুর্জোয়া নেতৃত্ব বিশ্বাসঘাতকতা, আপোস-রফার এবং সহযোগিতার পথ বেছে নেয়। শ্রমিক-কৃষক পার্টি এবং অল ইণ্ডিয়া ইয়ুথ লীগ এই আপোস-রফার তীব্র নিন্দা করে।'[৬৪] এই চুক্তির দ্বারা জনগণের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামকে আকস্মিকভাবে মধ্যপথে বন্ধ করে দেওয়ায় পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু হতাশায় ভেঙে পড়ে তীব্র মন্তব্য করেছেন, "আমি দেখিলাম, আমাদের লক্ষ্য ও মূল উদ্দেশ্য—পূর্ণ স্বাধীনতা—তাহাও বিলীন হইল। ইহার জন্যই কি আমার দেশবাসী এক বছর ধরিয়া বীরের মত লড়িয়াছিল? এত যে বড় বড় কথা (brave words) ও দুঃসাহসিক কাজ

(brave deeds) —তাহার পরিণাম কি এই ? এইরূপ ভাবনায় আচ্ছন্ন হইয়া ৪ঠা মার্চ রাত্রিতে বিছানায় পড়িয়া রহিলাম —মনে হইল, মন প্রাণ যেন শূন্য হইয়া গিয়াছে, যেন কোন মহামূল্য দ্রব্য হারাইলাম, জীবনে আর তাহা ফিরিয়া পাইব না।”[৬৫]

গান্ধী-আরউইন চুক্তি করে ইংরেজ-সরকার জনশক্তির বিরুদ্ধে সর্বাত্মক আঘাত হানার জন্য প্রস্তুত হয়ে ১৯৩২ সালের ৪ জানুয়ারি অতর্কিতে আক্রমণ করেছেন। নানারকম দমনমূলক অর্ডিন্যান্স জারী করা হ'ল। গান্ধীজী ও কংগ্রেসের বহু নেতা গ্রেপ্তার হলেন। কংগ্রেস ও তার সংগঠনগুলি অবৈধ ঘোষিত হ'ল। অপ্রস্তুত থাকার জন্য কংগ্রেস-নেতারা বৃটিশ-সরকারের আকস্মিক আক্রমণে আত্মরক্ষা করতে পারলেন না ; প্রেস, তহবিল, সম্পত্তি ইত্যাদি সবকিছুই বাজেয়াপ্ত করা হ'ল। পাইকারী নিপীড়ন, প্রহার, গুলিবর্ষণ, পিটুনি-পুলিসের নির্যাতন, গ্রামে গ্রামে পাইকারী জরিমানা ও গ্রামবাসীদের জমি ও বিষয়-সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা ইত্যাদি ভয়ঙ্কর অত্যাচার-উৎপীড়নের দ্বারা গণ-বিক্ষোভকে দমন করার প্রয়াস হ'ল। পনেরো মাসে গ্রেপ্তার হ'ল ১ লক্ষ ৩০ হাজার। তাসত্ত্বেও ভারতের জনগণ আত্মসমর্পণ করেননি ; তাঁদের সংগ্রাম চলছিল। অবশেষে ১৯৩৪ সালের মে মাসে পাটনায় নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে নেতৃবৃন্দ বিনা সর্তে আইন-অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার করেছেন। কিন্তু আক্রমণ বন্ধ হ'ল না। জুন মাসে কংগ্রেসের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হলেও জুলাই মাসে শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি বেআইনী ঘোষিত হ'ল।

১৯৩৫ সালে ভারতের গণ-আন্দোলনকে দুর্বল করার জন্য ভারত-শাসন আইন প্রবর্তিত হয়। কিন্তু ভারতের জনগণ নতুন উদ্যমে চূড়ান্ত সংগ্রামের জন্য সংগঠিত হতে শুরু করে। ১৯৩৬ সালে সারা ভারত কৃষক সভা এবং নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশন গঠিত হয়। নতুন সংবিধান অনুসারে ১৯৩৭ সালের জানুয়ারি মাসে প্রথম নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং দ্বৈত শাসনব্যবস্থার পরিবর্তে প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হ'ল। এই নির্বাচনে বিহার, উড়িষ্যা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, মধ্যপ্রদেশ ও যুক্তপ্রদেশে কংগ্রেস একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। বাংলা আসাম ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে কংগ্রেস নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভে সক্ষম না হলেও অন্যান্য রাজনৈতিক দলের তুলনায় বেশী আসন লাভ করে। সুতরাং জনমনে আশা উত্থিত হ'ল যে, এবারে তাঁরা সর্বজনীন অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষালাভের সুযোগ পাবেন ; নতুন প্রাদেশিক সরকারগুলি

শিক্ষা পুনর্গঠনের পরিকল্পনা রচনা করবেন এবং দৃঢ়তা ও দ্রুততার সঙ্গে তা রূপায়িত করবেন। কিন্তু জনগণের আশা বাস্তবায়িত হ'ল না। অথচ এসময়ে শিক্ষাজগতে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেছিল।

১৯৩৪ সালে যুক্তপ্রদেশ সরকার বেকার-সমস্যার তীব্রতার কারণ ও তার সমাধানের জন্য স্যার তেজবাহাদুর সাপ্রুর সভাপতিত্বে কমিটি গঠন করেন। 'এই কমিটি লক্ষ্য করেছিলেন যে, শিক্ষার বড় ত্রুটি হ'ল কেতাবী দৃষ্টিভঙ্গি, ডিগ্রি অর্জনের জন্য অস্বাভাবিক ঝোঁক। মাধ্যমিক শিক্ষা যাতে স্বয়ংসম্পূর্ণ, বাস্তবধর্মী ও বহুমুখী পঠন-পাঠনের উপযোগী হয়, সেজন্য শিক্ষার্থীদের রুচি ও প্রবণতা অনুযায়ী বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রবর্তনের কথা বলা হয়। মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যসূচীতে কারিগরী, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প প্রভৃতি বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা থাকা দরকার বলে বিবেচিত হয়। শিক্ষার্থী যাতে একটি বিশেষ পাঠক্রম অনুসরণ করে উচ্চশিক্ষার দিকে যেতে পারে সেইজন্য মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে একাদশ শ্রেণীর কর্মসূচী গ্রহণ করতে পরামর্শ দেওয়া হয়।'[৬৬] অর্থাৎ স্যাডলার কমিশন কলেজের সঙ্গে যুক্ত দু'বছরের ইণ্টারমিডিয়েট কোর্স বাতিল করে দিয়ে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের দশমশ্রেণীর সঙ্গে দু'বছর যুক্ত করে দ্বাদশশ্রেণীর উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপনের যে সুপারিশ করেছিলেন, তা সাপ্রু কমিটি নাকচ করে একাদশশ্রেণীর উচ্চ মাধ্যমিক পাঠক্রম প্রবর্তনের প্রস্তাব করেছিলেন।

কেবলমাত্র যুক্ত প্রদেশে নয়, সমগ্র ভারতে বেকার-সমস্যা ক্রমশ তীব্রতর হওয়ায় বিভিন্ন শিক্ষা-কমিটি বৃত্তিশিক্ষার প্রাধান্য দেবারজন্য প্রস্তাব করেছিলেন। সেণ্ট্রাল অ্যাডভাইসরি বোর্ড অব এডুকেশন ১৯৩৫ সালে এবিষয়ে অনুসন্ধানের জন্য সুপারিশ করায় ভারত-সরকার ১৯৩৬ সালে মিঃ এ. অ্যাবট ও মিঃ এস. এইচ. উডের নেতৃত্বে কমিটি গঠন করেছিলেন। এক বছর পরে তাঁরা যে রিপোর্ট দিয়েছিলেন, তা 'উড-অ্যাবট রিপোর্ট' নামে পরিচিত। কমিটি অনুসন্ধান করে সুপারিশ করেছিলেন কিভাবে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে বৃত্তিমূলক শিক্ষার আয়োজন করা যেতে পারে এবং বৃত্তিমূলক যে-সব শিক্ষায়তন আছে সেগুলি কিভাবে সংস্কার সাধন করলে বেকার সমস্যার সুরাহা হতে পারে। এই কমিটির উল্লেখযোগ্য সুপারিশ হ'ল, সাধারণ শিক্ষার মতো উচ্চশিক্ষার পর্যায় পর্যন্ত বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা। এই অভিমত অনুযায়ী দেশে 'পলিটেকনিক' জাতীয় বিদ্যালয় গড়ে উঠে।[৬৭] তাছাড়া কমিটি ভাষা-শিক্ষা সম্পর্কে বলেছেন, "সমগ্র মাধ্যমিক স্তরে যতদূর সম্ভব মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দিতে হবে; কিন্তু এই স্তরে ইংরেজি ভাষা-শিক্ষা

বাধ্যতামূলক হবে।"[৬৮] তাসত্ত্বেও ইংরেজিভাষার প্রাধান্য অব্যাহত ছিল। বৃত্তিমূলক শিক্ষান্তে জীবিকার্জনের সুযোগ না থাকায় এই শিক্ষা ছাত্র সমাজকে আকৃষ্ট করতে পারেনি। ফলে সকলেই উচ্চশিক্ষা গ্রহণে সচেষ্ট হয়েছেন। উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধিতেই তার পরিচয় পাওয়া যায়।

১৯৩৭ থেকে ১৯৪৭ সালের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা-প্রসারের তুলনায় উচ্চতর শিক্ষা-বিস্তার সর্বাধিক হয়েছিল। ১৯৩৬-৩৭ সালের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা (পাকিস্তান ভূখণ্ড সহ) ছিল ১,২৬,২২৮; কিন্তু ১৯৪৬-৪৭ সালে ছাত্রসংখ্যা (পাকিস্তান বাদে হ'ল ২,৪১,৭৯৪। এই অভূতপূর্ব ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধির প্রধান কারণ ছিল মধ্যবিত্তশ্রেণীর ইংরেজি-শিক্ষা গ্রহণের মানসিকতা ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্য করণিক-পদে চাকরি পাওয়ার সুলভতা। যুদ্ধের জন্য প্রচুর সংখ্যক ইংরেজি-শিক্ষিত ব্যক্তির প্রয়োজন হওয়ায় ইংরেজ-সরকার উচ্চশিক্ষা-সম্প্রসারণে অধিক অর্থ ব্যয় করেছেন। বহু নতুন কলেজ প্রতিষ্ঠা, নতুন বিভাগ খোলা, ৪টি নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন এবং পুরোনো বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলিতে বিভিন্ন বিষয়-শিক্ষার সম্প্রসারণ ইত্যাদির জন্য উচ্চতর শিক্ষা ক্রমশ মাথা ভারী হয়ে উঠেছে। কিন্তু ইংরেজি-শিক্ষার সুফল পেয়েছেন কিছু মানুষ, সমগ্র দেশ নয়। যাঁদের অর্থক্ষমতা আছে, কলেজে বেতন-দানের ক্ষমতা যাঁদের রয়েছে, উচ্চশিক্ষা-গ্রহণের পক্ষে অনুপযুক্ত হলেও তাঁরা কলেজে ভর্তি হয়েছেন; আর যাঁদের আর্থিক ক্ষমতা ছিল না, তাঁরা প্রতিভাবান হলেও উচ্চশিক্ষা-লাভে বঞ্চিত হয়েছেন।

এযুগে মাধ্যমিক শিক্ষার উল্লেখযোগ্য প্রসার ঘটেনি। স্কুলের সংখ্যা ও ছাত্রসংখ্যার বৃদ্ধি ঘটলেও পূর্ববর্তী যুগের মাধ্যমিক শিক্ষা-বিস্তারের তুলনায় এযুগের শিক্ষা-প্রসার দ্রুততর ছিল না। ১৯৩৬-৩৭ সালে স্কুলের সংখ্যা ও ছাত্রসংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১৩,০৫৬ ও ২২,৮৭,৮৭২; কিন্তু ১৯৪৬-৪৭ সালে স্কুল-সংখ্যা ও ছাত্রসংখ্যা হ'ল যথাক্রমে ১১,৯০৭ ও ২৬,৮১,৯৮১। পাকিস্তান-ভূখণ্ডের স্কুল ও ছাত্রসংখ্যা বাদ দিলেও একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও এসময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ হয়েছিল; কিন্তু সেই অনুপাতে স্কুলের ছাত্রসংখ্যার বৃদ্ধি ঘটেনি। মাধ্যমিক শিক্ষা সম্প্রসারিত না হওয়ার পশ্চাতে দু'টি কারণ ছিল। প্রথমত, প্রাথমিক শিক্ষা-প্রসারে শ্লথ গতি এবং দ্বিতীয়ত, যুদ্ধজনিত অর্থনৈতিক অবস্থা। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অধিকাংশ ছাত্র শহরবাসী মধ্যবিত্তশ্রেণী থেকে আগত। দুর্ভাগ্যবশত একদিকে জীবনযাত্রার ব্যয়বৃদ্ধি, অন্যদিকে শিক্ষার ব্যয়বৃদ্ধি —এই দুইয়ের

আঘাতে এই শ্রেণীর পক্ষে জীবনযাপন করা দুর্বিসহ হয়ে উঠেছিল। ফলে মাধ্যমিক স্কুলে মধ্যবিত্তশ্রেণীর সন্তানদের ভর্তি হওয়ার সংখ্যা পূর্বের তুলনায় অনেক কমে গেল। কেবলমাত্র এই শ্রেণীর ওপর তলার অংশ যাঁদের অর্থ আছে, তাঁরাই শিক্ষা-ক্রয়ের সুযোগ পেলেন। অর্থাৎ বর্তমান মাধ্যমিক শিক্ষা-ব্যবস্থায় যে বাছাই-করা পদ্ধতি রয়েছে, তা বুদ্ধি ও মেধার পরিবর্তে অর্থের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে। সুস্পষ্ট ভাষায় বলা যায়, শিক্ষা ক্রয় করার ক্ষমতা যাঁদের রয়েছে, তাঁরাই কেবলমাত্র শিক্ষা-ক্রয়ের সুযোগ পাবেন। স্বাভাবিক ভাবেই সমাজের পক্ষে তার ফল হ'ল বিষময়।

প্রাথমিক শিক্ষার অবস্থা এযুগে আরো হতাশাব্যঞ্জক। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কেবলমাত্র বোম্বাই রাজ্যে কিছুটা বিস্তৃত হলেও অন্যান্য রাজ্যের চিত্র ছিল দুঃখকর। যেখানে বোম্বাইয়ে এক হাজার কিংবা তার বেশী জনসংখ্যা বিশিষ্ট গ্রামগুলিতে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রচলিত হয়েছিল, সেখানে বাংলাদেশের গ্রামগুলি ছিল নিরক্ষরতার অন্ধকারে নিমজ্জিত। ভারতের অন্যান্য রাজ্যগুলির অবস্থা ছিল প্রায় বাংলাদেশের মতো। হার্টগ কমিটির সুপারিশ কার্যকরী হওয়ায় সমগ্র ভারতে প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা কমেছে। ১৯৩৬-৩৭ সালে প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা ছিল ১,৯২,২৪৪; কিন্তু তা কমে গিয়ে ১৯৪৫-৪৬ সালে হ'ল ১,৬৭,৭০০। তা সত্ত্বেও গ্রামীণ মানুষের শিক্ষালাভের আকাঙ্ক্ষা দমিত হ'ল না। এসময়ে স্কুলের সংখ্যা কমলেও ছাত্রসংখ্যা বেড়েছে। ১৯৩৬-৩৭ সালে ছাত্রসংখ্যা ছিল ১,০২ ২৪,২৮৮; কিন্তু ১৯৪৫-৪৬ সালে ছাত্রসংখ্যা হ'ল ১,৩০ ২৭,৩১৩। বেসরকারি প্রচেষ্টায় প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে ছাত্রসংখ্যার সামান্য বৃদ্ধি সাক্ষরতার ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করেছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির অনুপাতে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তৃত না হওয়ায় ১৯৩১ সালের তুলনায় ১৯৪১ সালে সাক্ষরহীন ব্যক্তিদের সংখ্যা বেশী ছিল। সমগ্র ভারতে ১৯৩১ সালে সাক্ষরহীন ব্যক্তি ছিলেন ৩১,৪৬,৭৭,০০০ জন; ১৯৪১ সালে সাক্ষরহীন ব্যক্তির সংখ্যা হ'ল ৩৪,১৪,৭৭,০০০ জন।[৬৯] অথচ জনসংখ্যা বৃদ্ধির চেয়ে সাক্ষরতার সংখ্যা বৃদ্ধি না ঘটলে জনশিক্ষার প্রসার ঘটেছে একথা বলা যায় না। এ সমস্যার সমাধানের একমাত্র পথ ছিল সার্বজনিক, অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা।

কিন্তু সমগ্র বৃটিশ-শাসনকালে এই নীতি অনুসৃত হয়নি—মেকলের শিক্ষাদর্শ রূপায়িত হয়েছে। যদিও বিভিন্ন কমিশন-কমিটির প্রতিবেদনে প্রাথমিক শিক্ষাদানের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল এবং দেশের নাড়ীর সঙ্গে

সংযোগ-সাধনের জন্য মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের দাবিকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল তা'সত্ত্বেও জনস্বার্থ-বিরোধী নীতি অনুসৃত হয়েছিল। ফলে ১৯৩৭-৪৭ সালের শিক্ষাচিত্র ছিল নৈরাশ্যজনক। একদিকে ইংরেজি-শিক্ষার প্রতি উচ্চ ও মধ্যশ্রেণীর আসক্তি এবং উচ্চতর শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁদের একাধিপত্য, অন্যদিকে জনশিক্ষার প্রতি তাঁদের ঔদাসীন্য ও বিরোধিতা এযুগেও অব্যাহত ছিল। কিন্তু চিন্তাশীল মনীষী ও শিক্ষাবিদেরা এই ঔপনিবেশিক শিক্ষানীতির তীব্র সমালোচনা করেছেন।

বিদেশী ভাষায় শিক্ষাদানের তীব্র সমালোচনা করে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "প্রাণী বিবরণে দেখা যায়, একজাতীয় জীব আছে যারা পরাসক্ত হয়ে জন্মায়, পরাসক্ত হয়েই মরে। পরের অঙ্গীভূত হয়ে কেবল প্রাণ ধারণ মাত্রে তাদের বাধা ঘটে না, কিন্তু নিজের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পরিণতি ও ব্যবহারে তারা চিরদিনই থাকে পঙ্গু হয়ে। আমাদের বিদ্যালয়ের শিক্ষা সেই জাতীয়। আরম্ভ থেকেই এই শিক্ষা বিদেশী ভাষার আশ্রয়ে পরজীবী। একেবারেই যে তার পোষণ হয় না তা নয়, কিন্তু তার পূর্ণতা হওয়া অসাধ্য। আত্মশক্তি ব্যবহারে সে যে পঙ্গু হয়ে আছে সে কথা সে আপনি অনুভব করতেও অক্ষম হয়ে পড়েছে, কেননা ঋণ করে তার দিন চলে যায়। গৌরব বোধ করে এই ঋণলাভের পরিমাণ হিসাব করে। মহাজন-মহলে সে দাসখত লিখিয়ে দিয়েছে।"[৭০]

জাপানের শিল্পোন্নতির রহস্য বিশ্লেষণ করে কবিগুরু বলেছেন, "আমাদের এই ভীরুতা কি চিরদিনই থাকিয়া যাইবে? ভরসা করিয়া এটুকু কোনদিনই বলিতে পারিব না যে, উচ্চশিক্ষাকে আমাদের দেশের ভাষায় দেশের জিনিস করিয়া লইতে হইবে? পশ্চিম হইতে যা কিছু শিখিবার আছে জাপান তা দেখিতে দেখিতে সমস্ত দেশে ছড়াইয়া দিল তার প্রধান কারণ, সেই শিক্ষাকে তারা দেশী ভাষার আধারে বাঁধাই করিতে পারিয়াছে। অথচ জাপানি ভাষার ধারণাশক্তি আমাদের ভাষার চেয়ে বেশী নয়। নূতন কথা সৃষ্টি করিবার শক্তি আমাদের ভাষায় অপরিসীম। তাছাড়া য়ুরোপের বুদ্ধিবৃত্তির আকার প্রকার যতটা আমাদের সঙ্গে মেলে এমন জাপানির সঙ্গে নয়। কিন্তু উদ্যোগী পুরুষসিংহ কেবলমাত্র লক্ষ্মীকে পায় না, সরস্বতীকেও পায়। জাপান জোর করিয়া বলিল, 'য়ুরোপের বিদ্যাকে নিজের বাণীমন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করিব।' যেমন বলা তেমনি করা, তেমনি তার ফল লাভ। আমরা ভরসা করিয়া এ পর্যন্ত বলিতেই পারিলাম না যে, বাংলাভাষাতেই আমরা উচ্চশিক্ষা দিব এবং দেওয়া যায় এবং দিলে তবেই বিদ্যার ফসল দেশ জুড়িয়া ফলিবে।"[৭১]

কেবলমাত্র জাপান কেন, 'ভারতবর্ষ ছাড়া পৃথিবীর অন্য কোন দেশেই শিক্ষার ভাষা এবং শিক্ষার্থীর ভাষার মধ্যে আত্মীয়তা-বিচ্ছেদের অস্বাভাবিকতা দেখা যায় না।'[৭২] এই 'অস্বাভাবিকতা'র জন্য 'আমরা বইয়ের লোককে চিনি, পৃথিবীর লোককে চিনি না; বইয়ের লোক আমাদের পক্ষে মনোহর, পৃথিবীর লোক শ্রান্তিকর। আমরা বিরাট সভায় বক্তৃতা করিতে পারি, কিন্তু জনসাধারণের সঙ্গে কথাবার্তা কহিতে পারি না।'[৭৩] দেশ, জাতি ও সমাজের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে অক্ষমতার কারণ অনুসন্ধান করে কবিগুরু লিখেছেন, "অনেকের ঘরে বালক-বালিকা সাহেবিয়ানায় অভ্যস্ত হইতেছে। তাহারা আয়ার হাতে মানুষ হয়, বিকৃত হিন্দুস্থানি শেখে, বাংলা ভুলিয়া যায় এবং বাঙালির ছেলে বাংলাসমাজ হইতে যে শত-সহস্র ভাবসূত্রে আজন্মকাল বিচিত্র রস আকর্ষণ করিয়া পরিপুষ্ট হয় সেই-সকল স্বজাতীয় নাড়ীর যোগ হইতে তাহারা বিচ্ছিন্ন হয়—অথচ ইংরেজি সমাজের সঙ্গে তাহাদের সম্বন্ধ থাকে না। তাহারা অরণ্য হইতে উৎপাটিত হইয়া বিলাতি টিনের টবের মধ্যে বড়ো হইতেছে। আমি স্বকর্ণে শুনিয়াছি এই শ্রেণীর একটি ছেলে দূর হইতে কয়েকজন দেশীভাবাপন্ন আত্মীয়কে দেখিয়া তাহার মাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছে: Mamma, Mamma, look, lot of Babus are coming। বাঙালির ছেলের এমন দুর্গতি আর কী হইতে পারে! বড়ো হইয়া স্বাধীন রুচি ও প্রবৃত্তি-বশত যাহারা সাহেবি চাল অবলম্বন করে তাহারা করুক, কিন্তু তাহাদের শিশু-অবস্থায় যে-সকল বাপ-মা বহু অপব্যয়ে ও বহু অপচেষ্টায় সন্তানদিগকে সকল সমাজের বাহির করিয়া দিয়া স্বদেশে অযোগ্য এবং বিদেশে অগ্রাহ্য করিয়া তুলিতেছে, সন্তানদিগকে কেবলমাত্র কিছুকাল নিজের উপার্জনের নিতান্ত অনিশ্চিত আশ্রয়ের মধ্যে বেষ্টন করিয়া রাখিয়া ভবিষ্যৎ দুর্গতির জন্য বিধিমতে প্রস্তুত করিতেছে, এই সকল অভিভাবকদের নিকট হইতে বালকগণ দূরে থাকিলেই কি অত্যন্ত দুশ্চিন্তার কারণ ঘটিবে?"[৭৪]

তাই দেশ ও দশের মঙ্গলের জন্য কবি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের কাছে উচ্চশিক্ষা-ক্ষেত্রে বাংলাভাষা প্রচলনের আবেদন জানিয়েছেন, "বাংলা যার ভাষা সেই আমার তৃষিত মাতৃভূমির হয়ে বাংলার বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে চাতকের মতো উৎকণ্ঠিত বেদনায় আবেদন জানাচ্ছি: তোমার অভ্রভেদী শিখরচূড়া বেষ্টন করে পুঞ্জ পুঞ্জ শ্যামল মেঘের প্রসাদ আজ বর্ষিত হোক ফলে শস্যে, সুন্দর হোক পুষ্পে পল্লবে, মাতৃভাষার অপমান দূর হোক, যুগশিক্ষার উদ্‌বেল ধারা বাঙালিচিত্তের শুষ্ক নদীর রিক্ত পথে বান ডাকিয়ে বয়ে যাক, দুই

কূল জাগুক পূর্ণ চেতনায়, ঘাটে ঘাটে উঠুক আনন্দধ্বনি।"[৭৫]

রবীন্দ্রনাথের মতো গান্ধীজীও ইংরেজি-শিক্ষাব্যবস্থার কঠোর সমালোচনা করেছেন। স্বাধীনতা-সংগ্রামের চূড়ান্ত মুহূর্তে গান্ধীজী পশ্চাদ্‌পসরণ করলেও একথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, ইংরেজি বনাম মাতৃভাষা, উচ্চশিক্ষা-বিস্তারে ইংরেজির ভূমিকা, প্রাথমিক শিক্ষায় ইংরেজির স্থান, দেশ ও জাতির সঙ্গে শিক্ষণীয় বিষয়ের সম্পর্কহীনতা, মুষ্টিমেয়ের পরিবর্তে সকলের জন্য জনশিক্ষা ইত্যাদি প্রশ্নে তিনি কখনো পিছু হঠেননি। ইংরেজিভাষায় শিক্ষাদানের বিরুদ্ধে গান্ধীজীর নিরলস সংগ্রাম, বুনিয়াদি শিক্ষার দাবিতে তাঁর সোচ্চার কণ্ঠ সেযুগের শিক্ষা-আন্দোলনকে উৎসাহ-প্রেরণা দিয়েছে।

১৯২১ সালে গান্ধীজী 'ইয়ং ইণ্ডিয়া'য় লিখেছেন, "ইংরেজি আজ আমাদের হৃদয়ে প্রিয়তমের স্থান জুড়িয়া আছে এবং মাতৃভাষাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়াছে। ইংরেজগণের সহিত আমাদের অসম সম্বন্ধের দরুন ইহা এক অস্বাভাবিক অবস্থা। ইংরেজি জ্ঞান ছাড়াও ভারতীয় চিত্তের শ্রেষ্ঠ বিকাশ নিশ্চয়ই সম্ভব। ইংরেজি জ্ঞান ছাড়া শ্রেষ্ঠ সমাজে প্রবেশ অসম্ভব — আমাদের ছেলেমেয়েদের মধ্যে এই ভাবনায় উৎসাহ দিয়া ভারতীয় মনুষ্যত্ব ও নারীত্বের উপর জুলুম করা হইতেছে। এইরূপ অবমাননাকর ভাবধারা দুঃসহ।"[৭৬]

ইংরেজিভাষায় শিক্ষাগ্রহণকালে দেশীয় যুবশক্তির বিপুল অপচয় লক্ষ্য করে তিনি ১৯২১ সালের ১ সেপ্টেম্বর 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' পত্রিকায় লিখেছেন, "ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে জ্ঞান লাভ করার জন্য প্রত্যেক ভারতীয় যুবক তাহার জীবনের অন্তত ছয়টি মূল্যবান বৎসর হারাইয়াছে। আমাদের বিদ্যালয় ও কলেজ হইতে যত ছাত্র বাহির হয় তাহার সহিত এই সংখ্যার গুণ করুন, তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন জাতি হিসাবে কত হাজার বছর এইভাবে খোয়া গিয়াছে। আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ এই যে, আমাদের কোন উদ্যম নাই। বিদেশী ভাষা আয়ত্ত করিতেই যদি আমাদের মূল্যবান সময় অতিবাহিত হইয়া যায় তবে আমাদের উদ্যম কি করিয়া থাকিবে? কিন্তু এই চেষ্টায়ও আমরা ব্যর্থকাম হই। ···বিদেশী শিক্ষা-মাধ্যম মস্তিষ্কে ক্লান্তি আনিয়া দিয়াছে, আমাদের শিশুদের স্নায়ুর উপর অহেতুক চাপ দিয়াছে, উহাদিগকে মুখস্থবিদ ও অনুকারক করিয়া তুলিয়াছে, মৌলিক কোন কাজ বা কল্পনার অযোগ্য করিয়া ফেলিয়াছে; পরিবার বা জনগণের মধ্যে তাহাদের শিক্ষা সঞ্চারিত করিতে পারে নাই। বিদেশী শিক্ষা-মাধ্যম আমাদের শিশুদের কার্যত আমাদের দেশে বিদেশী করিয়া ফেলিয়াছে। বর্তমান ব্যবস্থার ইহাই সর্বাধিক শোচনীয় পরিণতি। বিদেশী মাধ্যম আমাদের

দেশীয় ভাষাগুলির পরিপুষ্টি ব্যাহত করিয়াছে। আমার যদি আজ স্বেচ্ছাচারী শাসনকর্তার মতো ক্ষমতা থাকিত, তবে আজই আমি বিদেশী ভাষার মাধ্যমে আমাদের বালক-বালিকাদের শিক্ষা বন্ধ করিয়া দিতাম এবং অন্যথায় কর্মচ্যুতির হুমকি দিয়া শিক্ষক ও অধ্যাপকদের এখনই পরিবর্তন সাধনে বাধ্য করিতাম। আমি পাঠ্যপুস্তক রচনার জন্য অপেক্ষা করিতাম না। পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাহা অনুসৃত হইত। ইহা এমন একটি অন্যায় যাহার সরাসরি প্রতিকার দরকার।"[১৭]

গান্ধীজীর মতে বিদেশী ভাষার মাধ্যমে উচ্চতর শিক্ষাদানের অর্থ হ'ল, অবশিষ্ট সমাজের জীবনপ্রবাহ থেকে শিক্ষিত শ্রেণীর অনিবার্য বিচ্ছিন্নতা। ১৯২৮ সালের ৫ জুলাই 'ইয়ং ইণ্ডিয়া'য় তিনি লিখেছেন, "নিঃসন্দেহে ইহা স্বতঃসিদ্ধ যে, জনসাধারণের বোধ্যভাষার মাধ্যমে যদি কোন জাতির যুবসম্প্রদায়ের শিক্ষালাভ না হয় তবে এই যুবসম্প্রদায় জনসাধারণের সহিত সজীব সম্পর্ক রাখিতে বা প্রতিষ্ঠা করিতে পারে না। বিদেশী ভাষা ও বাকৃপদ্ধতি তাহাদের দৈনন্দিন জীবনে আদৌ লাগে না; অথচ ইহা আয়ত্ত করিতে সহস্র সহস্র যুবক সময়ের অপচয় করিতে বাধ্য হইয়াছে; এজন্য তাহাদের মাতৃভাষা ও সাহিত্যকে অবহেলা করিতে হইয়াছে। জাতির এই অপরিমেয় ক্ষতি কে হিসাব করিবে? ইহার চাইতে বড় কুসংস্কার আর কিছু হইতে পারে না যে, কোন একটি বিশেষ ভাষা গভীর মানস অথবা বৈজ্ঞানিক ভাব প্রকাশ করিতে পারে না অথবা প্রসার লাভ করিতে পারে না।

"বিদেশী শাসনের বহু অনাচারের মধ্যে দেশের যুবসমাজের ওপর বিদেশী মাধ্যমের এই অকল্যাণকর আরোপ ইতিহাসে বৃহত্তম বলিয়া গণ্য হইবে। ইহা জাতির শক্তিকে দুর্বল করিয়া দিয়াছে, ইহা শিক্ষার্থীদের আয়ু ক্ষীণতর করিয়া দিয়াছে, ইহা তাহাদিগকে জনগণের প্রতি বিরূপ করিয়া দিয়াছে, ইহা শিক্ষাকে অহেতুক ব্যয়সাপেক্ষ করিয়াছে। এই রীতি যদি এখনও চালাইয়া যাওয়া হয়, ইহাতে জাতির আত্মা অপহৃত হইবার আশঙ্কা বিদ্যমান। সুতরাং, শিক্ষিত ভারত যত শীঘ্র বিদেশী মাধ্যমের মোহ হইতে মুক্ত হইবে ততই তাহাদের এবং জনসাধারণের পক্ষে মঙ্গল।"[১৮]

প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তে জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনকল্পে মহাত্মা গান্ধী ১৯৩৭ সালের ২২ ও ২৩ অক্টোবর ওয়ার্ধায় শিক্ষাবিদদের সর্বভারতীয় সম্মেলন আহ্বান করেছেন। সম্মেলনের সভাপতি-রূপে ভাষণ-দান প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, "বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা যে কোনো রূপে বা আকৃতিতে দেশের

প্রয়োজন পূরণে অক্ষম। ইংরেজিকে শিক্ষার সকল উচ্চতর শাখার মাধ্যম করায় উচ্চশিক্ষিত-সংখ্যালঘু ও অশিক্ষিত-সংখ্যাগরিষ্ঠদের মধ্যে চিরস্থায়ী ব্যবধানের সৃষ্টি করেছে। এর ফলে জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞানের প্রসার ব্যাহত হয়েছে। ইংরেজির ওপরে অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করায় শিক্ষিতশ্রেণী মনের দিক থেকে পঙ্গু হয়ে পড়েছেন এবং তারফলে তাঁরা নিজের দেশেই প্রবাসী।"[৭৯] সুতরাং গান্ধীজীর মতে, "প্রাথমিক শিক্ষাক্রমকে অন্তত সাত বছর প্রসারিত করা প্রয়োজন এবং ইংরেজি বাদ দিয়ে ম্যাট্রিকুলেশনের মানোপযোগী সাধারণ জ্ঞান ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রাথমিক স্তরের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।"[৮০] অন্যত্রও তিনি বলেছেন, "মাতৃভাষায় শিক্ষাদান করা উচিত, অন্য কোনো ভাষায় নয়।"[৮১]

সম্মেলনে শিক্ষাবিষয়ক অন্যান্য প্রস্তাবের সঙ্গে নিম্নলিখিত দু'টি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়:

"(১) ৭ থেকে ১৪ বৎসর বয়সের সকল বালক-বালিকাদের জন্য অবৈতনিক, সর্বজনীন ও বাধ্যতামূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

"(২) এই শিক্ষা মাতৃভাষার মাধ্যমে দিতে হবে এবং এই স্তরে ইংরেজি শেখানো অবশ্যই চলবে না।"[৮২]

উপর্যুক্ত প্রস্তাবের ভিত্তিতে একটি বিস্তৃত পাঠক্রম রচনা করে সম্মেলনের সভাপতিকে দেবার জন্য সম্মেলনে ডঃ জাকির হোসেনের সভাপতিত্বে একটি কমিটি গঠিত হয়। উক্ত কমিটি দ্রুততার সঙ্গে রিপোর্ট তৈরি করে ডিসেম্বর মাসে পেশ করেন এবং কংগ্রেসের হরিপুরা-অধিবেশনে (১৯৩৮ খৃঃ) তা গৃহীত হয়।

ইংরেজিভাষা-মাধ্যমের বিরুদ্ধে গান্ধীজীর লেখনী ছিল খাপ-খোলা শাণিত তলোয়ার। ইংরেজি-শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে তিনি পুনরায় 'হরিজন' পত্রিকায় লিখেছেন (১১. ৬. ৩৮), "আমরা ইংরেজিকে নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি; কারণ শিশুরা প্রচুর সময় ব্যয় করে ইংরেজি শব্দ ও বাক্যাংশ মুখস্থের দ্বারা যা শেখে কিংবা শিক্ষকেরা তাদের যা শেখান, তা দিয়ে তারা নিজেদের ভাষায় লিখতে সক্ষম হয় না। অন্যদিকে তাচ্ছিল্য প্রকাশের জন্য তারা নিজেদের ভাষাও ভুলে যায়।"[৮৩] রবীন্দ্রনাথের ন্যায় গান্ধীজীও মাতৃভাষাকে মাতৃদুগ্ধ বলে মনে করেছেন। ইংরেজিভাষার প্রতি বিজাতীয় ঘৃণা নয়, ভারতবাসীকে শিক্ষিত করার জন্য প্রয়োজন মাতৃভাষা। ১৯৪৬ সালে তিনি বলেছেন, "সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও আমি মাতৃস্তন্যের মতো মাতৃভাষাকে আঁকড়ে

ধরে থাকব। কেবলমাত্র এই ভাষাই আমার কাছে প্রাণদ-দুগ্ধ। ইংরেজি-ভাষাকে তার নিজস্ব পরিধিতে আমি ভালবাসি। কিন্তু যা তার স্থান নয় তা যদি সে দখল করে তবে আমি তার তীব্র বিরোধী। সন্দেহ নেই, ইংরেজি বর্তমানে বিশ্বজনীন ভাষা। সেইজন্য আমি এই ভাষাকে দ্বিতীয় ভাষা, ঐচ্ছিক ভাষা রূপে গণ্য করার বিষয়ে একমত; কিন্তু তাও স্কুলে নয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রমে। তা কেবলমাত্র মুষ্টিমেয় ব্যক্তির জন্য হতে পারে, লক্ষ লক্ষ লোকের জন্য নয়। আজ পর্যন্ত আমরা যখন বিনা ব্যয়ে আবশ্যিক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে পারিনি, তখন আমরা কি করে ইংরেজি শেখার ব্যবস্থা করব? রাশিয়ার সমস্ত বৈজ্ঞানিক উন্নতি ইংরেজি ছাড়াই হয়েছে। **এটা আমাদের মানসিক দাসত্ব যে, আমরা সবসময়ে মনে করি, ইংরেজি বাদ দিয়ে আমরা কিছু করতে পারি না। এধরণের পরাজিত মনোভাবে আমার কদাচ সমর্থন নেই।**"[৮৪] (মোটা হরফ লেখকের)

মাতৃভাষায় শিক্ষাদান-নীতির প্রতি সুদৃঢ় সমর্থন জ্ঞাপন করে গান্ধীজী লিখেছেন (হরিজন —৯. ৯. ৩৯), "আমি কখনো মনে করিনি যে, প্রাথমিক স্তরে ইংরেজির কোনো স্থান আছে। শিশুদের ওপরে ইংরেজি চাপিয়ে দিলে তাদের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ক্ষতিগ্রস্থ হয় এবং সম্ভবত তাদের মৌলিকতাও নষ্ট হয়। স্মরণশক্তি উন্নতির জন্য ভাষা শিক্ষা হ'ল প্রাথমিক শিক্ষণ। প্রথম থেকে ইংরেজি শেখার অর্থ হ'ল শিশুদের ওপরে অনাবশ্যক চাপ সৃষ্টি করা। কেবল-মাত্র মাতৃভাষার মাধ্যমেই সে তা শিখতে পারে। আমি মনে করি, শহরের মতো গ্রামের শিশুদেরও মাতৃভাষার শক্ত পাথরের ওপরে তাদের উন্নতির ভিৎ গাঁথতে হবে। এটাই ভারতের দুর্ভাগ্য যে, এই স্বাভাবিক ঘটনাও হয়ে দাঁড়ায় প্রমাণ সাপেক্ষ।"[৮৫]

গান্ধীজীর প্রস্তাবিত বুনিয়াদি শিক্ষা পরিকল্পনা সম্পর্কে দেশব্যাপী আলোচনা আরম্ভ হয়। ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে পুণায় বুনিয়াদি শিক্ষার জাতীয় সম্মেলন হয়। গৃহীত প্রস্তাবে মাতৃভাষা ভালোভাবে আয়ত্ত হওয়ার আগে ইংরেজি-শিক্ষা আরম্ভ করার বিরোধিতা করা হয় এবং বুনিয়াদি শিক্ষার স্বাভাবিক উৎকর্ষ ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করে এবিষয়ে দায়িত্ব গ্রহণের জন্য সরকারের কাছে দাবি করা হয়। ১৯৪১ সালে দিল্লীতে দ্বিতীয় বুনিয়াদি শিক্ষাসম্মেলন ও ১৯৪৫ সনে সেবাগ্রামে তৃতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই দু'টি সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবগুলি বিবেচনার জন্য বিভিন্ন রাজ্যের কংগ্রেস-মন্ত্রীসভার সামনে উপস্থিত করা হয়। ১৯৩৭ সালে কংগ্রেস-নেতৃবৃন্দ সাতটি

রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করে একটি জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা গঠনের জন্য উদ্যোগী হলেন এবং ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর সভাপতিত্বে ন্যাশনাল প্ল্যানিং কমিটি গঠিত হয়। সাধারণ শিক্ষা ও টেক্‌নিক্যাল শিক্ষার বিষয়ে পরিকল্পনার জন্য ডঃ. রাধাকৃষ্ণণ ও ডঃ. মেঘনাদ সাহার সভাপতিত্বে গঠিত দু'টি সাব-কমিটি ১৯৩৯ সালে কাজ শুরু করেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, তীব্র জাতীয় আন্দোলন ইত্যাদি বিবিধ কারণে কমিটির কাজ বিলম্বিত হয়। ফলে ১৯৪৮ সালে কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। কিন্তু এই রিপোর্ট ভারতের শিক্ষা-জগতে কোনো প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি।

কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগে গঠিত কেন্দ্রীয় শিক্ষা-উপদেষ্টা পর্ষৎ ১৯৩৮ থেকে ১৯৪৩ সালের মধ্যে শিক্ষার বিভিন্ন স্তরের অবস্থা পর্যালোচনাকল্পে অনেকগুলি কমিটি গঠন করেন। তাঁদের রিপোর্ট বিচার করে দেখার জন্য ১৯৪৩ সালে কেন্দ্রীয় শিক্ষা-কমিশনার স্যার জন সার্জেণ্টের সভাপতিত্বে পুনরায় একটি কমিটি গঠিত হয় এবং তাঁরা ১৯৪৪ সনে যুদ্ধোত্তর ভারত গঠনের জন্য একটি সামগ্রিক শিক্ষা-পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন। এই পরিকল্পনা 'সার্জেণ্ট পরিকল্পনা' নামে খ্যাত। প্রকৃতপক্ষে এই পরিকল্পনা নতুন নয়। সাপ্রু কমিটি, ওয়ার্ধা পরিকল্পনা, জাকির হোসেন কমিটি, খের কমিটি, কেন্দ্রীয় শিক্ষা-উপদেষ্টা পর্ষৎ প্রভৃতির গৃহীত নীতি ও প্রস্তাবের ভিত্তিতে 'সার্জেণ্ট পরিকল্পনা' রচিত হয়।

প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে এই পরিকল্পনায় বলা হয় যে, ৬ থেকে ১৪ বছরের সকল বালক-বালিকাকে বুনিয়াদি শিক্ষার আদর্শের ভিত্তিতে সর্বজনীন, অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া হবে। দু'ভাগে বিভক্ত এই স্তরের শিক্ষা-কাঠামো হ'ল : প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী বা নিম্ন বুনিয়াদি (বয়স ৬ থেকে ১১) এবং ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী বা উচ্চ বুনিয়াদি (বয়স ১১ থেকে ১৪)।

মাধ্যমিক শিক্ষা-স্তর সম্পর্কে বলা হয়েছে, ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে একাদশ শ্রেণী পর্যন্ত মাধ্যমিক স্তর বলে বিবেচিত হবে এবং ৬ বছরে বিন্যস্ত এই স্তরের জন্য দু'ধরনের পাঠক্রম (অ্যাকাডেমিক ও টেক্‌নিক্যাল) নির্দিষ্ট হবে। উচ্চ বিদ্যালয়ের ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তির বয়স হবে সাধারণত ১১+ বৎসর। উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষার দু'টি শাখার মধ্যে 'অ্যাকাডেমিক হাইস্কুলে' বিশুদ্ধ কলা ও বিজ্ঞান বিষয়ের এবং 'টেক্‌নিক্যাল হাইস্কুলে' ফলিত বিজ্ঞান, শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ের শিক্ষা দেওয়া হবে। কিন্তু 'উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষাকে কোনোরকমেই

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার প্রাথমিক স্তর রূপে বিবেচিত হবে না। এই স্তরটি হবে স্বয়ংসম্পূর্ণ। যদিও বুদ্ধি ও মেধা-বিশিষ্ট ছাত্রদের বিশ্ববিদ্যালয়ে কিংবা সম-মানোপযোগী অন্যান্য শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ করা উচ্চ বিদ্যালয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হবে, তবুও উচ্চ বিদ্যালয়ের অধিকাংশ ছাত্র যাতে মাধ্যমিক-স্তরের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত হতে পারে কিংবা বিভিন্ন বৃত্তি গ্রহণ করতে পারে সেইভাবে তাদের অবশ্যই শিক্ষা দিতে হবে।'[৮৬]

বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত কলেজীয় শিক্ষার কাঠামো সম্পর্কে প্রস্তাব করা হয়েছে, প্রচলিত ৪ বছরের ইন্টারমিডিয়েট ও ডিগ্রির (২+২) পাঠক্রমকে পরিবর্তন করে ৩ বছরের ডিগ্রি কোর্স প্রবর্তন করতে হবে এবং ইন্টারমিডিয়েট-স্তরের প্রথম বছরটি উচ্চ বিদ্যালয়ের অঙ্গীভূত হয়ে 'একাদশ শ্রেণী' নামে অভিহিত হবে। অর্থাৎ সাপ্রু কমিটির প্রস্তাবাদর্শে ইন্টারমিডিয়েট কোর্সটিকে বাতিল করে দু'বছরের ডিগ্রি কোর্সের পরিবর্তে তিন বছর এবং মাধ্যমিক-স্তরের শেষ সীমা দশম শ্রেণীর পরিবর্তে একাদশ শ্রেণী করার পরিকল্পনা রচিত হয়েছে।

ভাষা-বিষয়ের তিনটি প্রশ্ন নিয়ে সার্জেন্ট পরিকল্পনায় আলোচনা করা হয়েছে : (১) সর্বভারতীয় যোগাযোগের ভাষা ; (২) শিক্ষার মাধ্যম রূপে মাতৃভাষা ; (৩) ইংরেজিভাষার স্থান নির্ণয়। দেবনাগরী লিপির হিন্দী ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে গ্রহণের জন্য প্রস্তাব করে বলা হয়েছে, ১৯৬৫ সালের পূর্বে ভারতের সরকারি ভাষা রূপে হিন্দীভাষা প্রবর্তনের জন্য সর্ববিধ ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। ভাষা-মাধ্যম বিষয়ে সুপারিশ করা হয়েছে, মাতৃভাষার মাধ্যমে মাধ্যমিক-স্তরের সকল উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষা দেওয়া হবে। ইংরেজি ভাষার গুরুত্ব স্বীকার করে নিয়ে বলা হয়েছে, এই ভাষা হবে আবশ্যিক দ্বিতীয় ভাষা। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রের চিত্র ছিল বিপরীত। মাধ্যমিক-স্তরে মাতৃভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম রূপে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেওয়া হলেও এবং ইংরেজিকে দ্বিতীয় ভাষা রূপে ঘোষণা সত্ত্বেও চাকরিক্ষেত্রে ইংরেজির প্রাধান্য অব্যাহত থাকার জন্য ইংরেজি প্রথম ভাষার মর্যাদা পেয়েছে। তাছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়-স্তরে শিক্ষার মাধ্যম ইংরেজি হওয়ায় উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ছেলেমেয়েরা ইংরেজি-চর্চার দিকেই ঝুঁকেছে।

এসময়কার শিক্ষাবিষয়ক চিন্তাভাবনা সমকালীন রাজনৈতিক অবস্থার প্রতিফলন মাত্র। ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে জয়লাভ করে কংগ্রেস যখন সরকারি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়, তখন আন্তর্জাতিক অবস্থা ছিল সংকটজনক।

সাম্রাজ্যের ভাগ-বাঁটোয়ারা নিয়ে ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের ৩ সেপ্টেম্বর বিশ্বের সাম্রাজ্যবাদী-শক্তিগুলি বিশ্বযুদ্ধে মেতে উঠল। এই যুদ্ধকে উপলক্ষ করে বৃটিশ-শাসকদের সঙ্গে কংগ্রেস-নেতৃবৃন্দের মতবিরোধ ঘটে। কংগ্রেস-নেতারা ঘোষণা করলেন, 'যদি বৃটিশ-সরকার যুদ্ধের পরে ভারতকে স্বাধীনতা দেওয়ার কথা ঘোষণা করে এবং কেন্দ্রে অস্থায়ী জাতীয় সরকার স্থাপিত করে তবে তাঁরা যুদ্ধে বৃটিশ-সরকারকে সর্বপ্রকার মদত দিতে প্রস্তুত আছেন। যখন বৃটিশ শাসকগোষ্ঠী এক পাও এগোতে প্রস্তুত নয়, তখন কংগ্রেসের নেতৃত্ব অক্টোবর, ১৯৪০-এ গান্ধীজীর নেতৃত্বে ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ আরম্ভ করেন।'[৮৭] এবং কংগ্রেসী-মন্ত্রীসভাগুলি পদত্যাগ করেন।

যুদ্ধের বিরুদ্ধে ও স্বাধীনতার দাবিতে সমগ্র ভারতে অভূতপূর্ব গণজাগরণ ঘটে। সাম্রাজ্যতন্ত্র ও সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র-যুব —সকলেই মরণপণ সংগ্রামে অবতীর্ণ হন। সকলের কণ্ঠে এক আওয়াজ —পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙে ফেল, সামন্ত-শোষণ থেকে ভারতকে মুক্ত কর। কিন্তু বৃটিশ-শক্তি 'এই গণ-আন্দোলনকে দমন করার জন্যে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করে। ভারতবর্ষের কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র 'ন্যাশনাল ফ্রন্ট', 'ক্রান্তি' প্রভৃতি বন্ধ করে দেয়। ভারত-রক্ষা আইন বলে সমস্ত দেশের কমিউনিস্ট এবং অন্যান্য বামপন্থীদের গ্রেফ্‌তার করা হয়। হাজার হাজার মানুষের উপর মোকদ্দমা চালিয়ে তাদের সাজা দেওয়া হয় এবং হাজার হাজার মানুষকে নির্বাসিত কিংবা ঘরে নজরবন্দী করে রাখা হয়।'[৮৮]

ভারতের মানুষ যখন সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে জাতীয় স্বাধীনতার যুদ্ধে পরিণত করছে, তখন আন্তর্জাতিক রাজনীতির পট-পরিবর্তন ঘটে। ১৯৪১ সালের জুন মাসে বিশ্বযুদ্ধের সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র বদলে যায় যখন ফ্যাসিস্ট জার্মানি বিশ্বের শ্রমিক শ্রেণীর দুর্গ সোভিয়েত ইউনিয়নকে আক্রমণ করে। এই অবস্থায় পণ্ডিত নেহেরু ১৯৪১ সনের ডিসেম্বর মাসে ঘোষণা করেন, "দুনিয়ার প্রগতিশীল শক্তি আজ সেই গোষ্ঠীর সঙ্গে আছে, যার প্রতিনিধিত্ব রাশিয়া, বৃটেন, আমেরিকা এবং চীন করছে।"[৮৯] এই ঘোষণার ফলে অবস্থার পরিবর্তন ঘটে এবং কংগ্রেস-সহ কমিউনিস্ট নেতাদের মুক্তি দেওয়া হয়; কমিউনিস্ট পার্টি বৈধ বলে ঘোষিত হয়। কংগ্রেসের সঙ্গে আপোষ করার জন্য বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল ১৯৪২ সালের ২৩ মার্চ স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌সের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল ভারতে প্রেরণ করেন। কিন্তু তাঁরা যে প্রস্তাব জনগণের সামনে উত্থাপন করেন, তা পুরোনো প্রস্তাবের অনুরূপ ছিল। জাতীয় সরকার স্থাপনের

কোনো পরিকল্পনা তাঁদের ছিল না। পক্ষান্তরে, তাঁদের প্রস্তাবের দ্বারা সাম্প্রদায়িক বিভেদ সৃষ্টি করতে চাওয়া হয়েছিল। জনগণ ক্রিপ্সের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। ক্রিপ্স-মিশনের দৌত্য ব্যর্থ হ'ল।

জনসাধারণের মুক্তির আকাঙ্ক্ষা প্রতিধ্বনিত হ'ল ১৯৪২ সালের ১৪ জুলাই ওয়ার্ধায় নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে—পূর্ণ স্বাধীনতার দাবিতে গণ-আন্দোলন ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর করার প্রস্তাব গৃহীত হ'ল। ৭ আগস্ট বোম্বাইয়ে এ. আই. সি. সি.-র অধিবেশন শুরু হয় এবং ৮ আগস্ট ওয়ার্ধার প্রস্তাবের সমর্থনে গৃহীত হয় ঐতিহাসিক আগস্ট প্রস্তাব। ঘোষিত হয়— ইংরেজ ভারত ছাড়ো। ঘোষণা ছড়িয়ে পড়ে দিক থেকে দিগন্তে। ইংরেজ সরকারও প্রস্তুত ছিল। অতর্কিতে আক্রমণ করে তাঁরা গান্ধীজী সহ অন্যান্য কংগ্রেস-নেতাদের গ্রেফ্তার করেছেন। আগস্ট-আন্দোলন দমনের জন্য 'বৃটিশ শাসক গোষ্ঠীর পাশবিকতা সীমাহীন ছিল। তারা কঠোর থেকে কঠোরতর দমন-পীড়ন চালায়। সরকারি হিসাব অনুসারে ৯ই আগস্ট থেকে ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে ৬২,২২৯ জনকে গ্রেফ্তার করে, ভারত-রক্ষা আইনে ১৮,০০০ জনকে নজরবন্দী করে এবং পুলিশ ও মিলিটারির গুলিতে ৯৪০ জন নিহত হয় এবং ১৬৩০ জন আহত হয়।'[১০] অন্যদিকে 'নেতাদের গ্রেফ্তারে জনসাধারণ ক্ষুব্ধ হয়ে নিজেরা যা বুঝেছে সেইভাবে কাজ করেছে। তারা রাস্তাঘাট খুঁড়ে দেয়, তার কাটে, রেল লাইন তুলে ফেলে, স্টেশন জ্বালিয়ে দেয়।'[১১] কিন্তু আগস্ট-আন্দোলনের দায়িত্ব কংগ্রেস-নেতারা গ্রহণ করলেন না। 'গান্ধী পুনঃ পুনঃ এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে, ১৯৪২ সনে ভারতীয়দের পক্ষ হইতে যে হিংসাত্মক কার্য হইয়াছে ইহা যে কেবল তাঁহার নির্দেশমত হয় নাই তাহা নহে, এগুলি সম্পূর্ণরূপে তাঁহার মতের বিরোধী। এ কথাটি যে সম্পূর্ণ সত্য সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।'[১২]

নেতৃবিহীন অবস্থায় যখন আগস্ট আন্দোলন চলছে, তখন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু ভারতের বাহিরে থেকে সশস্ত্র মুক্তিসংগ্রাম পরিচালনা করেছেন। ১৯৪১ সালের ১৬ জানুয়ারি তিনি পুলিসের চোখে ধুলো দিয়ে অন্তর্হিত হন এবং বার্লিনে উপস্থিত হয়ে গঠন করেন আজাদ হিন্দ ফৌজ। জার্মান-জাপ সহযোগিতায় ভারতের স্বাধীনতার জন্য তিনি বৃটিশ-সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন এবং ১৯৪৩সালের ২১ অক্টোবর ভারতীয় ভূখণ্ড আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে তাঁর সেনানায়কত্বে উত্তোলিত হ'ল স্বাধীন ভারতের পতাকা—গঠিত হ'ল আজাদ হিন্দ সরকার। কিন্তু 'সুভাষের এই প্রচেষ্টায় কংগ্রেস-নেতাদের সহানুভূতি

ছিল না। কংগ্রেস-নেতৃবৃন্দ, বিশেষতঃ জওহরলাল নেহেরু জাপানের সহায়তা দ্বারা ভারত-মুক্তির বিরোধী ছিলেন এবং সুভাষের সৈন্যদলসহ জাপান ভারত আক্রমণ করিলে তাহাদের বিরুদ্ধে লড়িবেন এরূপ মত প্রকাশ করিয়াছিলেন।'[১৩]

এর পরেই ভারতের বুকে বয়ে যায় নানা রাজনৈতিক ঘটনা-দুর্ঘটনার ঝড়-ঝঞ্ঝা। বাংলাদেশে পঞ্চাশের মন্বন্তরে (১৯৪৩ খৃঃ.) অনাহারে ৩৫ লক্ষ লোকের মৃত্যু, ১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিসমাপ্তি এবং পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলির মুক্তিলাভ, ১৯৪৫ সনের ডিসেম্বরে কেন্দ্রীয় বিধান পরিষদের ও ১৯৪৬ সনের মার্চ মাসে প্রাদেশিক বিধান সভার নির্বাচনে প্রধানত কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের প্রতিনিধিদের জয়লাভ, কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে তীব্র মতবিরোধ, ১৯৪৫-৪৬ সালে আজাদ হিন্দ ফৌজের সেনবাহিনীর বিচার ও জনগণের সুদৃঢ় প্রতিরোধ, ১৯৪৬ সনের ১৮ ফেব্রুয়ারি ভারতের নৌবাহিনীর বিদ্রোহে বৃটিশ-শাসনের মৃত্যুঘণ্টা ধ্বনিত হওয়া—১৯ ফেব্রুয়ারি বৃটিশ পার্লামেন্টে নতুন সংবিধান প্রণয়নকল্পে ভারতে 'ক্যাবিনেট মিশন' প্রেরণের ঘোষণা, কংগ্রেস-লীগ বিরোধের দুঃখজনক পরিণতি ১৯৪৬ সালে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, ১৯৪৬ সালে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা গঠন—এই সমস্ত বহুমুখী ঘটনার পরিণতিতে ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্টের মধ্যরাত্রে দ্বিখণ্ডীকরণের মধ্য দিয়ে ভারত ও পাকিস্তান নামে সমগ্র ভারত-ভূখণ্ডের স্বাধীনতা লাভ। দুর্জয় সংগ্রামের মধ্য দিয়ে শ্রমজীবী-কৃষিজীবী মানুষ 'রাত্রির গভীর বৃন্ত থেকে ছিঁড়ে' আনে 'ফুটন্ত সকাল'—খণ্ডিত ভারতের বুকে ছড়িয়ে পড়ে সূর্যের রাঙা আলো। 'অনন্ত আকাশে, উদাত্ত আলোকে, মুক্তির বাতাসে' ছড়িয়ে পড়ে তাঁদের আহ্বান—

'দূর করো চিত্তের দাসত্ববন্ধ,
ভাগ্যের নিয়ত অক্ষমতা,
দূর করো মূঢ়তায় অযোগ্যের পদে
মানবমর্যাদাবিসর্জন,
চূর্ণ করো যুগে যুগে স্তূপীকৃত লজ্জারাশি
নিষ্ঠুর আঘাতে।'[১৪]

দশম অধ্যায়

জ্বলে দুখের রক্তশিখা

নতুন প্রেক্ষাপট। বৃটিশ-শাসন-মুক্ত ভারত। জনগণের মধ্যে প্রবল উৎসাহ-উদ্দীপনা। মধ্যরাত্রের রাজপথে উত্তাল জনস্রোত। পরাধীনতার শৃঙ্খল-মুক্ত ভারতবাসীর মনে শোষণ-মুক্ত সমাজ গঠনের নবচেতনা। ১৭৫৭ সালের পলাশীর রণক্ষেত্রে পট-পরিবর্তন কালে দেশের মানুষের কোনো ভূমিকা ছিল না। কিন্তু দু'শ বছরের পরাধীনতার জ্বালা, ক্ষুধার যন্ত্রণা, জমি হারানোর বেদনা, মাতৃভাষা নির্বাসিত হওয়ার ব্যথা মানুষকে জাগ্রত ও আত্মসচেতন করে তুলেছিল ; স্বাধিকার প্রতিষ্ঠায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তাঁরা বিদেশী শাসক ও দেশীয় ভূস্বামীশ্রেণীর বিরুদ্ধে সুদৃঢ় প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন। সুতীব্র গণ-আন্দোলনের আঘাতে ইংরেজ-শাসকেরা পিছু হঠলেন।

১৯৪৭ সালের ১৪ আগষ্টের মধ্যরাত্রে দিল্লীতে লর্ড মাউণ্টব্যাটেনের হাত থেকে রক্তঝরা দ্বিখণ্ডিত ভারতের শাসনক্ষমতা গ্রহণ করেছেন পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু। শোষিত-বঞ্চিত মানুষের স্বপ্ন-কল্পনাকে বাস্তবায়িত করার শপথ নিয়ে জাতির উদ্দেশ্যে তিনি ঘোষণা করেছেন, "বহুদিন পূর্বে ভাগ্যের সঙ্গে ছিল আমাদের চুক্তি। আজ আমাদের সম্পূর্ণভাবে না হলেও অনেকাংশে ওয়াদা পূরণের সময় হয়েছে। মধ্যরাত্রির ঘণ্টাধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে যখন সমগ্র বিশ্ব সুপ্তিমগ্ন, তখন ভারত জাগ্রত হবে প্রাণশক্তিতে, উদ্বুদ্ধ হবে স্বাধীনতায়। ইতিহাসে এমন মুহূর্ত কমই আসে যখন একটা যুগ শেষ হয় এবং পুরাতন যুগ থেকে নতুন যুগে আমাদের পদক্ষেপ ঘটে ; দীর্ঘকালের শৃঙ্খলিত জাতির আত্মা মুখরিত হয়ে ওঠে। এটাই সঠিক যে, এই মুহূর্তে আমরা ভারত ও তার জনগণের এবং বৃহত্তর মানব-সেবার অঙ্গীকার করছি।

"ইতিহাসের প্রত্যুষ-লগ্নে অসীমানুসন্ধান ভারতকে অনুপ্রাণিত করেছিল এবং অজানা শতাব্দীগুলি সেই সৌন্দর্যময় সাধনার সার্থকতায় ও ব্যর্থতায় ভরপুর।

"সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের দিনগুলিতে ভারত কখনো তার শক্তির উৎস স্বরূপ অন্বেষা ও আদর্শ বিস্মৃত হয়নি। আজ আমাদের দুর্ভাগ্যের অবসান ঘটছে এবং ভারত পুনরায় নিজেকে আবিষ্কার করেছে। আজ যে সাফল্যের উদ্‌যাপনে আমরা রত, তা অপেক্ষামান বৃহত্তর বিজয় ও সাফল্যলাভের একটি পদক্ষেপ মাত্র। ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জ ও সুযোগের সদ্ব্যবহার করার মত যথোচিত সাহস ও জ্ঞান কি আমাদের আছে?

"সে ভবিষ্যৎ আরাম ও বিশ্রামের নয়, তা অবিরাম সংগ্রামের এবং যার দ্বারা অতীতের ও আজকের শপথগুলি আমরা পূরণ করতে পারি। ভারত-সেবার অর্থ হ'ল লক্ষ লক্ষ শোষিত-বঞ্চিত মানুষের সেবা। ...সুতরাং আমাদের স্বপ্নকে সার্থক করার জন্য আবশ্যক কঠিন-কঠোর পরিশ্রম। এ স্বপ্ন ভারতের, এ স্বপ্ন বিশ্বেরও। ...শান্তি যেমন অবিভাজ্য, তেমনি স্বাধীনতা, সচ্ছলতা এবং এমনকি বিপদকেও এই পৃথিবীতে আর বিচ্ছিন্ন করে দেখা যায় না।

"আমরা ভারতের জনগণের কাছে, যাদের প্রতিনিধি আমরা, বিশ্বাস ও আস্থা নিয়ে এই বিশাল ও দুঃসাহসিক প্রচেষ্টায় আমাদের সঙ্গে যোগদানের জন্য আহ্বান জানাচ্ছি। ধ্বংসাত্মক ও সঙ্কীর্ণ সমালোচনার কাল এখন নয়; অন্যের দোষ ধরা কিংবা ঈর্ষার সময় এখন নয়। আমাদের এখন স্বাধীন ভারতের মহান সৌধ নির্মাণ করতে হবে, যেখানে তার সন্তানেরা বসবাস করতে পারে।"[১]

কিন্তু ভারতের শাসনক্ষমতা গ্রহণ করে কংগ্রেস-নেতৃবৃন্দ জনগণের শাসক হলেন, সেবক হলেন না। কিছুদিনের মধ্যেই তাঁরা সমস্ত প্রতিশ্রুতি ভুলে গিয়ে শিল্প-কৃষি-শিক্ষা প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে-কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন, তা 'স্বাধীন ভারতের মহান সৌধ নির্মাণ'-এর কর্মসূচী নয়, তা শোষণ-ব্যবস্থাকে জীইয়ে রাখার প্রয়াস মাত্র। শ্রমজীবী-কৃষিজীবী মানুষ অবাক বিস্ময়ে দেখেছেন যে, বিদেশী শোষকেরা এদেশ থেকে বিদায় নিলেও শাসন-কাঠামোর কোনো পরিবর্তন ঘটল না। পুরোনো অর্থনৈতিক-সামাজিক কাঠামোর বদলে কোনো নতুন কাঠামো গড়ে তোলা হ'ল না। উৎপাদন-যন্ত্রের ওপরে ব্যক্তির কর্তৃত্ব অক্ষত থাকল। উৎপাদন-সম্পর্কের কোনো পরিবর্তন ঘটল না; উৎপাদন-ব্যবস্থায় সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হ'ল না। অথচ উৎপাদন-যন্ত্রের মালিকানা যে-শ্রেণীর অধীনে থাকে, সেই শ্রেণী নিজ স্বার্থে শিক্ষা ও সংস্কৃতির জগৎকে নিয়ন্ত্রিত করে। 'সেই শ্রেণী শাসন-ক্ষমতা বা রাজনীতিক ক্ষমতা দখল করতে পেরেছে বলেই সমাজের বৈষয়িক শক্তি ও অর্থব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ

করবার সুযোগ ও ক্ষমতাকে নিজের চিন্তাভাবনা মোতাবেক পরিচালনা করতে পারে।'[২]

তাই শাসক বদলালেও শাসন-নীতি অপরিবর্তিত রইল, শোষণ-ব্যবস্থা বজায় থাকল। শাসকশ্রেণীর স্বার্থে তৈরি ঔপনিবেশিক শিক্ষানীতির মৌল চরিত্রেরও কোনো পরিবর্তন সূচিত হ'ল না। শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য একই থাকল। অর্থাৎ বেন্টিঙ্ক-মেকলের ঔপনিবেশিক শিক্ষানীতি অব্যাহত রইল —শাসিত-শোষিত শ্রেণীর কাছে শাসকশ্রেণীর চিন্তাধারা পৌঁছে দেওয়া এবং তাঁদের ওপরে প্রভাব বিস্তার করে শাসকশ্রেণীর সমর্থকগোষ্ঠী তৈরি করা —এই লক্ষ্য নিয়ে স্বাধীন ভারতের শিক্ষানীতি প্রস্তুত করা হ'ল। অবৈতনিক ও সার্বজনিক শিক্ষা-বিস্তারের কোনো আন্তরিক প্রচেষ্টা না থাকায় শিক্ষা জনমুখীন হ'ল না। শিক্ষার কাঠামো, শিক্ষণীয় বিষয়, জনশিক্ষা, ভাষা-মাধ্যম ও ভাষা-বিষয় ইত্যাদি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণকালে বৃহত্তম গ্রামীণ জনসমষ্টির কথা কংগ্রেস-নেতৃবৃন্দ ভুলে গিয়েছেন। যদিও তাঁরা মাঝে মধ্যে সেই সমস্ত প্রতারিত মানুষের উদ্দেশে প্রতিশ্রুতির বন্যা বহিয়ে দিয়েছেন, ভবিষ্যতের উজ্জ্বল স্বপ্ন এঁকেছেন, আর ধৈর্য ধারণের উপদেশ দিয়েছেন। এই উক্তি অতিরঞ্জিত কিংবা একদেশদর্শী নয়। স্বাধীন ভারতের অর্থনৈতিক-সামাজিক অবস্থা বিশ্লেষণ করলে এই নির্মম সত্যই উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে যে, শোষিত-বঞ্চিত মানুষেরা বৃটিশ-যুগের মত স্বাধীন ভারতেও বর্ণ-বিত্তের শিকার হয়ে অত্যাচারিত-উৎপীড়িত হয়েছেন ; দেশের সত্তর ভাগ মানুষ দারিদ্র-সীমারেখার নীচে রয়েছেন —যাঁদের কাছে কোনো রকমে বেঁচে থাকাটাই এক ভয়ঙ্কর সমস্যা, শিক্ষার স্বপ্ন দেখা তাঁদের কাছে বিলাসিতা মাত্র। সুতরাং শিক্ষা-বিষয়ে আলোচনার পূর্বে স্বাধীনোত্তর ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের শিল্পনীতি ও কৃষিনীতির বিষয়ে একটি সংক্ষিপ্ত রেখাচিত্র অঙ্কনের প্রয়োজন।

১৯৪৮ সালে ভারত-সরকারের শিল্পনীতি ঘোষিত হয় এবং ১৯৫৬ সালে তা সংশোধিত হয়। এই শিল্পনীতির মূল লক্ষ্য ছিল সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে শিল্পস্থাপন, ব্যক্তিগত উদ্যোগকে উৎসাহদানের জন্য সরকারি সাহায্য প্রদান এবং স্বল্প ব্যয়ে নিয়ন্ত্রণবিহীন অধিকতর মুনাফা অর্জন। ফলে জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি ঘটলেও সেই অর্থ সমাজের নীচের স্তরে ছড়িয়ে পড়েনি, সেই বর্দ্ধিত আয় পকেটস্থ করেছেন কিছুসংখ্যক বৃহৎ শিল্পপতি, কালোবাজারি ব্যবসায়ীশ্রেণী ও ভূস্বামীশ্রেণীভুক্ত জোতদার-মহাজনেরা। এঁরা কি পরিমাণে ধনী থেকে আরো ধনী হয়েছেন, তা ভারত-সরকার ও রিজার্ভ ব্যাঙ্কের

বুলেটিনগুলি দেখলে বোঝা যায়। কিন্তু জাতীয় জীবনে এর ফল হয়েছে ভয়াবহ। শিল্পপতি-তোষণমূলক শিল্পনীতির ফলে ধনের অসম বণ্টন যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে, তেমনি বেড়েছে শিল্পের অসম বিকাশ আর সঙ্কট ক্রমেই ঘনীভূত হয়েছে। দেশের মানুষের কর্মক্ষমতাকে সম্পূর্ণরূপে ব্যবহার করার কোনো সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা না থাকায় কর্মহীন মানুষের সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে তা বিস্ফোরণের পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে। নিম্নলিখিত সারণী[৩] তারই পরিচয় বহন করছে :

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষে (১৯৫৬ খৃঃ.)	বেকার সংখ্যা	—৫৩,০০,০০০
দ্বিতীয় ,, ,, ,, (১৯৬১ খৃঃ.)	,,	— ৭১,০০,০০০
তৃতীয় ,, ,, ,, (১৯৬৫ খৃঃ.)	,,	— ৯৬,০০,০০০
তিন বৎসরের পরিকল্পনা-ছুটির শেষে (১৯৬৮ খৃঃ.)	,,	—১,২৬,০০,০০০
চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষে (১৯৭৩ খৃঃ.)	,,	—১,৭১,০০,০০০
পঞ্চম ,, ,, ,, (১৯৭৮ খৃঃ.)	,,	—২,১২,০০,০০০

কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী গত ৭.৫.৮১ তারিখে রাজ্যসভায় এক প্রশ্নের (প্রশ্ন নং ১৫৬৬) উত্তরে জানিয়েছেন, চলতি ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষে একমাত্র শিক্ষিত বেকারের সংখ্যাই হবে ৪৬ লক্ষ ৬০ হাজার। কিন্তু উক্ত চিত্রে কেবলমাত্র রেজিষ্টার্ড বেকারের সংখ্যা তুলে ধরা হয়েছে। এর সঙ্গে যোগ করতে হবে কৃষির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মহীন যুবকের সংখ্যা। তাঁরা একদিকে শিক্ষালাভের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছেন, অন্যদিকে মানুষের মত বাঁচবার অধিকারও তাঁদের নেই।

স্বাধীনোত্তর ভারতের কৃষি-চিত্র শিল্প-চিত্র থেকে ভিন্ন নয়। শোষণমূলক অর্থনৈতিক কাঠামো পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজন ছিল আমূল ভূমি-সংস্কার —সামন্ততান্ত্রিক শোষণের অবসান। জনশিক্ষার ব্যাপকতম বিস্তৃতি ঘটাতে হলে জমিদার-মহাজন-জোতদারদের সর্বগ্রাসী শোষণ থেকে ভূমিহীন রিক্ত-নিঃস্ব কৃষকদের মুক্ত করার জন্য আবশ্যক ছিল জমিদারি প্রথার অবসান। কৃষকদের আর্থিক অবস্থার যদি পরিবর্তন ঘটে, যদি তাঁদের ক্রয়ক্ষমতা বাড়ে, তাহলে কেবলমাত্র প্রাথমিক শিক্ষা নয়, উচ্চশিক্ষার দরজাও তাঁদের কাছে খুলে যায় — মেধাবী কৃষক-সন্তানদের শিক্ষার জগৎ থেকে অকালে বিদায় নিতে হয় না। তাই 'স্বাধীন দেশে কংগ্রেসের শাসন কায়েম হওয়ায় স্বভাবতই কৃষকদের মধ্যে নতুন আশা-আকাঙ্ক্ষা জাগে। জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ করবার জন্য মুসলিম লীগ সরকার ১৯৪৭-এর গোড়ার দিকে যে বিল সরকারি গেজেটে প্রচার করার

পরও আইনসভায় পেশ করেনি, লোকে আশা করেছিল কংগ্রেস-সরকার অবিলম্বে অন্তত সেই ধরণের একটা বিল পাশ করবে। কিন্তু তা করেনি।

'কৃষকদের দাবি ছিল পরিষ্কার। তারা চেয়েছিল বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ করে বিনামূল্যে কৃষকদের জমি দেওয়া হ'ক, চাষের জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হ'ক, বর্গাদারদের তেভাগা এবং জমি চাষের স্থায়ী স্বত্ব দেওয়া হ'ক, খেতমজুরদের জন্য জমি ও কাজের ব্যবস্থা করা এবং বাঁচার মত মজুরী দেওয়া হ'ক। পাটের ও অন্যান্য ফসলের ন্যায্য দর ধার্য করা, মহাজনী ঋণ মকুব করা, দ্রব্যমূল্য কমাবার ব্যবস্থা করা, কালোবাজারী ও মুনাফাখোরী বন্ধ করা, খাদ্যসমস্যার স্থায়ী সমাধানের উদ্দেশ্যে ন্যায্য দরে প্রয়োজনীয় সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য দেশে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করা ইত্যাদি দাবিও তোলা হয়েছিল।'[৪] কিন্তু 'ক্রমে এটা পরিষ্কার হতে থাকে যে এই সকল দাবির ভিত্তিতে ভূমি-ব্যবস্থার সংস্কার করা, খাদ্য সমস্যার ও দর সমস্যার সমাধান করা, কৃষকদের ও কারিগরদের জীবন ও জীবিকার অবস্থার উন্নতি সাধন করা —এ সকল বিষয়ে কংগ্রেস-সরকারের বা কংগ্রেস-নেতাদের কোনো রকম আগ্রহ নেই।

'বরং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মতিগতি দেখে ক্রমশ লোকের মনে একটা ধারণা জন্মে যে, জমিদারি-জোতদারি শোষণকে বন্ধ করা তার অভিপ্রায় নয়, কৃষকদের শোষণের মাত্রা কমাবার জন্যও তার কোনো গরজ নেই। অনেকের মনে প্রশ্ন জাগে, তাহলে কি কংগ্রেস ইংরেজ আমলের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের অনুকূল অর্থব্যবস্থাকেই বজায় রাখতে চায়, না জনস্বার্থের অনুকূল নতুন ধরণের কোনো অর্থব্যবস্থা প্রবর্তন করা প্রয়োজন মনে করে?'[৫]

'প্রাদেশিক কৃষক সভার সাংগঠনিক পত্রে (১ম সংখ্যা, ৮ জুন, ১৯৪৮) কংগ্রেস-রাজত্বে ভূমি-সংস্কার আইনের সম্ভাবনা বিচার করে বলা হয়েছিল: রাইয়তওয়ারী ব্যবস্থাভুক্ত জমিতে আজ খোদ-চাষী জমির মালিক নয়। এখানেও কায়েমী স্বার্থ অকৃষক ও পরজীবী উৎপাদনের এক বিরাট অংশ আত্মসাৎ করিয়া কৃষককে চরম দারিদ্রে আনিয়া ফেলিয়াছে। অপরপক্ষে বর্তমানে খোদ-চাষীর মধ্যে শতকরা ৫০|৬০ ভাগেরও অধিক চাষীর জীবিকা-উপযোগী জমি নাই। যদি জমি এমনভাবে বণ্টন করা না হয় যাহাতে প্রতি চাষী-পরিবারের জীবিকা-উপযোগী জমি থাকে, তবে বর্তমানের ন্যায় জমি হইতে চাষীকে উৎখাতের গতি অব্যাহত চলিবে, ইহারা দ্রুত ভূমিহীনে পরিণত হইবে, আধিয়ার, খেতমজুর ও এই নূতন নূতন ভূমিহীনের সংখ্যা মিলিয়া

কলের মজুরদের ন্যায় গ্রামে এক বিরাট উদ্বৃত্ত মজুর বাহিনী সৃষ্টি করিবে যাহার ফলে কায়েমী স্বার্থের শোষণের ক্ষমতা আরো বাড়িবে।

'.. বাংলায় কৃষকের দারিদ্র চরমে পৌছিয়াছে। ইহাদের আর্থিক ক্ষমতা একেবারে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। এই অবস্থায় জমিদারি উচ্ছেদের সম্ভাবনায় জমিদার, জোতদার, ধনী মহাজনের দল কৃষককে উৎখাত করিয়া যত অধিক সম্ভব জমি খাস করিয়া লইতেছে। ইহার ফলে জমিদারি উচ্ছেদের পর খোদ-চাষীর হাতে জমি অতি অল্পই থাকিবে এবং বর্তমানে কৃষকের আর্থিক দুর্বলতার সুযোগে যে সামান্য জমিও থাকিয়া যাইবে, তাহাও অচিরেই এই কায়েমী স্বার্থের কবলে আসিয়া পড়িবে।'[৬]

কৃষকসভার আশঙ্কা সত্য প্রমাণিত হ'ল। জমিদারি দখল আইন (১৯৫৩ খৃঃ.) এবং ভূমি-সংস্কার আইন (১৯৫৫ খৃঃ.) প্রবর্তিত হওয়া সত্ত্বেও ভূমি-হারা কৃষকেরা জমির অধিকার ফিরে পেলেন না। ভয়াবহ দারিদ্র তাঁদের জীবনে চিরসঙ্গী হয়ে থাকল। তাঁরা ক্রমশ দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর হয়েছেন, ভূমিহীন ও খেতমজুরের সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পেয়েছে; অন্যদিকে তাঁদের দারিদ্রের সুযোগ নিয়েছেন জোতদার-মহাজনেরা। অথচ জনশিক্ষা, বয়স্ক শিক্ষা কিংবা সাক্ষরতার কর্মসূচীকে রূপায়িত করতে হলে জমিদারি-জোতদারি প্রথার সম্পূর্ণ অবসান, মহাজনী শোষণ-ব্যবস্থার সম্পূর্ণ বিলুপ্তি এবং কৃষককে জমির মালিক করা প্রয়োজন ছিল।

শ্রমিক-কৃষকের মত মধ্যবিত্তশ্রেণীর জীবনেও অর্থনৈতিক সংকট ক্রমেই ঘনীভূত হচ্ছিল। ১৯৫৪ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে ব্যাপকভাবে সমীক্ষা করেন। এই সমীক্ষায় দেখা যায়, "শতকরা ৩২.৯ জন ছাত্র যে-সব পরিবার থেকে এসেছেন, তাঁদের মাসিক মাথাপিছু ব্যয় ত্রিশ টাকা বা তার কম; অর্থাৎ তাঁরা মানুষের মত বাঁচবার মানের নীচে বাস করেন। শতকরা ৩১ জন ছাত্র এসেছেন সেই সব পরিবার থেকে, যাঁদের মাসিক মাথাপিছু ব্যয় ত্রিশ থেকে পঞ্চাশ টাকা; অর্থাৎ তাঁরা কোনো রকমে জীবনধারণ করেন। এই ব্যয়ের মধ্যে শিক্ষার ব্যয়ও আছে। শতকরা ১৫ জন ছাত্র পুরো সময় ও শতকরা ১১ জন ছাত্র আংশিক সময় কাজ করেন। ডিগ্রি-স্তরে যাঁরা কাজ করে পড়েন, তাঁদের শতকরা হার আরো বেশী।

"বাসস্থানের অবস্থা আরো শোচনীয়। হোষ্টেলে-মেসে শতকরা ৬.১ জনের স্থান সংকুলান হয়। অননুমোদিত মেসগুলিতে শতকরা ৪.৭ জনের জায়গা হয়। মাটির ঘরে থাকেন শতকরা ১০ জন। শতকরা ৫৫ জনের জায়গায়

পরিমাণ ২৪ বর্গফুট। শতকরা ৬৮ জনকে একাধিক ব্যক্তির সঙ্গে একই ঘরে শুতে হয়। দর্শনার্থীদের ও গৃহস্থালীর কাজের জন্য ব্যবহৃত ঘরে অন্যান্য পড়ুয়ার সঙ্গে শতকরা ৬৪ জনকে লেখাপড়া করতে হয়; অর্থাৎ যেখানে ভয়ানকভাবে লেখাপড়ার ব্যাঘাত ঘটে। অনেক সময়ে পাঠকক্ষ ও শয়নকক্ষ একই। কেবলমাত্র শতকরা ১৫ জন ছাত্রের পড়ার কিংবা শোয়ার জন্য পৃথক কিংবা একই ঘর রয়েছে।

"ভবিষ্যৎ কর্মজীবন সম্পর্কে শতকরা ৪৪ জন ছাত্রের কোনো সুস্পষ্ট ধারণা নেই। মাসিক ১০০ টাকা থেকে ২০০ টাকা বেতনে যে-কোনো চাকরি পেলে শতকরা ৩০ জন ছাত্র লেখাপড়া বন্ধ করে দিতে ইচ্ছুক।

"বহু ছাত্রকেই পাঠ্যপুস্তক ছাড়া পড়তে হয়। শতকরা ৫৭ জন ছাত্রের প্রয়োজনীয় পাঠ্যপুস্তক ক্রয়ের ক্ষমতা নেই। অপরের কাছ থেকে কিছু বই চেয়ে নিয়ে শতকরা ৩৪ জন ছাত্রকে পড়তে হয়। শতকরা ১১ জনকে সম্পূর্ণভাবে অন্যের বইয়ের ওপরে নির্ভর করতে হয়। আর শতকরা ১২ জন ছাত্র চেয়ে-চিন্তে বই যোগাড় করতে পারেন না। ডিগ্রি-স্তরে এই সংখ্যা আরো বেশী।"[৭] স্বাধীনতা-প্রাপ্তির পরবর্তী ৩৪ বছরে এ-অবস্থার আরো দ্রুত অবনতি ঘটেছে। মধ্যবিত্ত বিত্তহীন হয়েছে, গরীব আরো গরীব হয়েছে—তাঁদের ছেলেমেয়েদের জন্য উচ্চশিক্ষার দরজা ক্রমেই সংকুচিত হয়েছে।

শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্তশ্রেণীর অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন না হলে শিক্ষা-সম্প্রসারণ সম্ভব ছিল না। সর্বস্তরে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দেবার জন্য আবশ্যক ছিল নতুন সমাজ-ব্যবস্থা। তাই 'নীচের তলা'র মানুষেরা আশা করেছিলেন, এদেশ থেকে বৃটিশ-শক্তি বিদায় নিলে তাঁদের মুক্তিলাভ ঘটবে। স্বাধীন দেশে যে-নতুন শিক্ষানীতি গ্রহণ করা হবে তার স্পর্শে আলোকিত-উন্নত হবে তাঁদের ছেলেমেয়েরা। চাবাগানে, কয়লার খনিতে, চাষের ক্ষেতে কিংবা শহরের চায়ের দোকানে শিশু-বয়স থেকে আর ভীড় জমাবে না তারা; পরগাছাদের বোঝা বয়ে শৈশবেই তাদের মেরুদণ্ড আর বেঁকে যাবে না। খাতা, বইপত্র বগলে নিয়ে তারা স্কুলে যাবার অধিকার পাবে এবং স্কুল-শিক্ষার শেষে তারা উচ্চশিক্ষার জগতে প্রবেশ করার সুযোগ লাভ করবে। কিন্তু হায়! ভারত স্বাধীন হলেও অন্ধকার থেকে আলোর জগতে প্রবেশ করার অধিকার পেল না দেশের শতকরা ৭০ ভাগ মানুষ। বাকি ৩০ ভাগের মধ্যে ২৫ ভাগ ছেলেমেয়ে শিক্ষালাভের মধ্যপথে অকালে ঝরে যায়। কারণ শাসক বদলালেও শোষণ-মূলক সমাজ-ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটেনি—পুরোনো শিক্ষাব্যবস্থার ওপরে নিত্য

নতুন এডুকেশন কমিশনের দ্বারা বহু বিচিত্র রং আরোপ করা হলেও তার মৌলিক চরিত্র বদলায়নি; শ্রমজীবী-কৃষিজীবী মানুষের স্বার্থে শিক্ষার কাঠামো, শিক্ষণীয় বিষয় ও ভাষানীতির জনমুখীন পরিবর্তন না করে কেবলমাত্র এখানে-ওখানে পলেস্তারা লাগানো হয়েছে। স্বাধীনোত্তর ভারতে এই ৩৪ বছরে গঙ্গা দিয়ে অনেক জল গড়িয়ে গেলেও 'শিক্ষার সঙ্গে দেশের মনের সহজ মিলন ঘটাবার আয়োজন আজ পর্যন্ত হ'ল না।'[৮] অথচ 'চিত্তবিকাশের যে আয়োজনটা স্বভাবতই সকলের চেয়ে আপন হওয়া উচিত ছিল সেইটেই রয়েছে সবচেয়ে পর হয়ে —তার সঙ্গে আমাদের দড়ির যোগ হয়েছে, নাড়ীর যোগ হয়নি; এর ব্যর্থতা আমাদের স্বাজাতিক ইতিহাসের শিকড়কে জীর্ণ করছে, খর্ব করে দিচ্ছে সমস্ত জাতির মানসিক পরিবৃদ্ধিকে।'[৯]

১৯৪৮ সালের জানুয়ারি মাসে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী কর্তৃক আহুত রাজ্য-শিক্ষামন্ত্রীদের সম্মেলনের উদ্বোধনী ভাষণে প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু বৃটিশ-শিক্ষানীতির তীব্র সমালোচনা করে বলেছেন, "ভারতে শিক্ষার জন্য পরিকল্পনা গ্রহণের উদ্দেশ্যে যখন কোনো সম্মেলন আহুত হ'ত, তখন সামান্য সংস্কার করে প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতিকেই টিকিয়ে রাখার মনোভাব লক্ষ্য করা যেত। বর্তমানে এই মনোভাব অবশ্যই পরিত্যাগ করতে হবে। **দেশে একটা বিরাট পরিবর্তন ঘটেছে এবং পরিবর্তিত অবস্থানুসারে শিক্ষাপদ্ধতি গড়ে তোলা প্রয়োজন। শিক্ষার সামগ্রিক ভিত্তি হবে বৈপ্লবিক।**"[১০] [মোটা হরফ লেখকের]

সুতরাং 'পরিবর্তিত অবস্থানুসারে' 'বৈপ্লবিক' শিক্ষানীতির জন্য প্রয়োজন ছিল যাঁদের জন্য শিক্ষা তাঁদের আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন করা, প্রাথমিক শিক্ষা ও বয়স্ক শিক্ষার ওপরে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া, মাধ্যমিক ও উচ্চতর শিক্ষাকে সহজলভ্য করা, আর্থিক কারণে মেধাবী ছাত্রদের অপচয় বন্ধ করা, সমাজের সঙ্গে শিক্ষার সংযোগ স্থাপন করা, সমাজকেন্দ্রিক শিক্ষণীয় বিষয় নির্বাচন করা, প্রাথমিক স্তরে একটি ভাষা নির্ধারণ করা, মাধ্যমিক ও স্নাতক-স্তরে ভাষা-বিষয় চর্চার প্রশ্নে বৈজ্ঞানিক নীতি গ্রহণ করা, স্নাতকোত্তর-স্তরে শিক্ষার মাধ্যম রূপে মাতৃভাষা প্রবর্তনের বন্দোবস্ত করা, শিক্ষান্তে জীবিকার ব্যবস্থা করা প্রভৃতি।

এই সমস্ত সমস্যার সমাধানকল্পে জাতীয় শিক্ষানীতি তৈরির জন্য সর্বোত্তম পন্থা ছিল শিক্ষা কমিশন গঠন করা, যাঁরা শিক্ষার সামগ্রিক পুনর্গঠনের প্রশ্নটি পরীক্ষা করবেন এবং সুসংহত ও দীর্ঘকালীন পরিকল্পনা রচনা করবেন। শিক্ষা-

সংহতি হবে দু'ভাবে —প্রথমত বিভিন্ন স্তরের শিক্ষা-কাঠামোর মধ্যে এবং দ্বিতীয়ত শিক্ষার সঙ্গে জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রের —সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনীতিক ও আর্থনীতিক —মিলন-সাধনের মধ্যে। ১৯৪৮ সালের শিক্ষা-মন্ত্রীদের সম্মেলনের পরে যদি এ ধরণের শিক্ষা কমিশন গঠন করা হ'ত, তাহলে তাঁরা দু'বছরের মধ্যে তাঁদের প্রতিবেদন উপস্থিত করতেন এবং কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে শিক্ষা-সমস্যার প্রশ্নটিকে সামগ্রিকভাবে বিবেচনা করে ভারত-সরকার অগ্রসর হতে পারতেন। দুর্ভাগ্যবশত শিক্ষা-সমস্যার প্রতি এ ধরণের সামগ্রিক ও বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা হ'ল না। পক্ষান্তরে অতীতের ধারা অনুসরণ করে সামগ্রিকতার পরিবর্তে খণ্ড-খণ্ড ভাবে প্রত্যেকটি স্তরকে বিচ্ছিন্নভাবে বিচার করে ও বিভিন্ন পরিকল্পনাকে পৃথকভাবে পর্যালোচনা করে তাঁরা শিক্ষা-বিস্তারে প্রয়াসী হয়েছেন।

প্রাথমিক শিক্ষার পরিবর্তে উচ্চশিক্ষার ওপরে গুরুত্ব প্রদানের জন্য ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কমিশন এবং ১৯৫২ সালে মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন গঠিত হ'ল। কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষা কমিশন গঠন করা হ'ল না। তার পরিবর্তে ১৯৫০ সালে প্রাথমিক শিক্ষা কমিটি গঠিত হ'ল। শিক্ষার অন্যান্য ক্ষেত্রেও বিভিন্ন কমিটি গঠিত হয়েছে (রুরাল হায়ার এডুকেশন কমিটি [১৯৫৪-৫৫ খৃঃ.], কমিটি অন থ্রী ইয়ার ডিগ্রি কোর্স [১৯৫৬-৫৮ খৃঃ.], অ্যাসেসমেণ্ট কমিটি অন বেসিক এডুকেশন [১৯৫৮-৫৯ খৃঃ.] প্রভৃতি) এবং তাঁরা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সুপারিশ করেছেন। কিন্তু সবগুলিই ছিল একের সঙ্গে অপরের সম্পর্কবিহীন। অখণ্ড ও সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি তাঁদের প্রস্তাবে-সুপারিশে প্রতিফলিত হয়নি। 'জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার মনোভাব না থাকলেও 'বৈপ্লবিক' পরিবর্তনের আওয়াজ এখনো উত্থিত হচ্ছে। কিন্তু কার্যত প্রান্তিক পরিবর্তন ছাড়া আর কিছুই হয়নি এবং এই পরিবর্তনকে 'উদারনৈতিক সংস্কার' বলা যেতে পারে।'[১১] কেন্দ্রীয় সরকারের গেজেটেও ১৯৭৮ সালে বলা হয়েছে, "প্রথম তিনটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (১৯৫১-৬৫ খৃঃ.) শিক্ষার অগ্রগতি ঘটলেও বাস্তব সত্যকে অস্বীকার করা যায় না যে, জাতীয় ভিত্তিতে সামগ্রিক দৃষ্টি-ভঙ্গিতে রচিত সুসংহত ও দীর্ঘকালীন পরিকল্পনার অভাবহেতু শিক্ষা-প্রয়াস বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে।"[১২]

পরস্পরের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক না থাকায় বিভিন্ন কমিশন ও কমিটির সুপারিশগুলি ছিল বাস্তবের সঙ্গে সঙ্গতিবিহীন এবং অনেক সময়ে পরস্পর-বিরোধী। অথচ 'প্রত্যেক বৈদ্যরাজই এক একটা অব্যর্থ ঔষধের পেটেণ্ট

লইয়া তারস্বরে চীৎকার করিতেছেন ও প্রশংসাপত্রমণ্ডিত ঔষধের বোতল মাথায় রাজপথে হুঙ্কার করিয়া গৃহস্থের শান্তিভঙ্গ করিতেছেন। কিন্তু হায়! অমোঘ ঔষধের সংখ্যাও যে পরিমাণে অধিক, রোগ প্রতিকারের সম্ভাবনাও সেই পরিমাণে অল্প।'[১৩] অথচ জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন ছিল সমাজ-পরিবর্তনের উদ্যোগ। ১৯৬৫ সালে শ্রী জে. পি. নায়েক বলেছেন, "আমরা এই ধারণা এখনো গড়ে তুলতে সক্ষম হইনি যে, জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা গড়তে হলে সংবিধানে নির্দেশিত সামাজিক, আর্থনীতিক, রাজনীতিক ও সাংস্কৃতিক লক্ষ্য পূরণের প্রয়োজন এবং নতুন সমাজ-ব্যবস্থা গঠনে শিক্ষা সাহায্য করতে পারে।"[১৪] কিন্তু বাস্তবে তা ঘটল না। বৃটিশ-শাসনকালের মত কংগ্রেস-শাসনকালেও শিক্ষা রইল বিত্তবান-বর্ণশ্রেষ্ঠদের অধিকারে ; বিত্তহীনেরা বিদ্যাঙ্গনে প্রবেশাধিকার পেলেন না—স্বাধীন ভারতে ওরা রইলেন দ্বারের বাহিরে।

১৯৪৭ সালে ক্ষমতা হস্তান্তরের সময়ে শতকরা ১৪ জন ছিলেন সাক্ষর এবং স্কুলের ছাত্রসংখ্যা ছিল খুবই কম ; ৬ থেকে ১১ বছর বয়সের প্রতি তিনজনের একজন এবং ১১ থেকে ১৪ বছর বয়সের প্রতি ১১ জনের ১ জন স্কুলের ছাত্র ছিল। ১৯৪৯ সালের সরকারি হিসাবে দেখা যায়, সমগ্র ভারতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ২,২০০০০। কোনো কোনো শহরে ও বড় বড় গ্রামে একাধিক স্কুল থাকার জন্য একথা বললে ভুল হবে না যে, মাত্র দু'লক্ষ শহরে ও গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল। সমগ্র দেশে অবৈতনিক, সর্বজনীন ও আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য সুদীর্ঘকালের শিক্ষা-সংগ্রামের স্বীকৃতি পাওয়া যায় ১৯৫০ সালে, যখন বি. জি. খেরের সভাপতিত্বে গঠিত প্রাথমিক শিক্ষা কমিটি ১০ বছরের মধ্যে ৬ থেকে ১৪ বছর বয়সের সকলকে সর্বজনীন, অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষাদানের প্রস্তাব করেছেন এবং সেই অনুযায়ী সংবিধানের ৪৫নং ধারায় ঘোষিত হ'ল, "সংবিধান গৃহীত হওয়ার দিন থেকে ১০ বছরের মধ্যে ১৪ বছর বয়স না হওয়া পর্যন্ত সকল শিশুকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা দেবার জন্য রাষ্ট্র প্রয়াসী হবে।"[১৫]

কিন্তু সংবিধানের নির্দেশ-অনুসারে ১৯৬০ সালের মধ্যে কি উক্ত বয়সের সকল শিশু প্রাথমিক শিক্ষা-লাভের সুযোগ পেয়েছেন কিংবা স্বাধীনতা প্রাপ্তির ৩৪ বছরের মধ্যেও কি সংবিধানের নির্দেশ পালন করা হয়েছে ? উত্তর হ'ল, না। এসময়ের প্রাথমিক শিক্ষা-বিস্তারের পরিচয় পরের পৃষ্ঠার সারণীতে[১৬] পাওয়া যাবে :

প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে ছাত্রভর্তির সংখ্যা

[১৯৫০ —১৯৭৪ খৃঃ.]

সন ও পরিকল্পনা		১ম-৫ম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্র-সংখ্যা (দশ লক্ষ হিসাবে)	১ম-৫ম শ্রেণী পর্যন্ত ৬ থেকে ১১ বছর বয়সের ছাত্র ভর্তির শতকরা হার	৬ষ্ঠ-৮ম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্র-সংখ্যা (দশলক্ষ হিসাবে)	৬ষ্ঠ-৮ম শ্রেণী পর্যন্ত ১১ থেকে ১৪ বছর বয়সের ছাত্র ভর্তির শতকরা হার
১	২	৩	৪	৫	৬
১৯৫০-৫১ খৃঃ.	বালক	১৩.৮	৬০.০	২.৬	২০.৮
প্রথম পরিকল্পনা	বালিকা	৫.৪	২৪.৯	০.৫	৪.৩
	মোট	১৯.২	৪২.৬	৩.১	১২.৯
১৯৫৫-৫৬ খৃঃ.	বালক	১৭.৫	৭২.০	৩.৪	২৫.৪
দ্বিতীয় পরিকল্পনা	বালিকা	৭.৬	৩২.৮	.৯	৬.৯
	মোট	২৫.১	৫২ ৮	৪.৩	১৬.৫
১৯৬০-৬১ খৃঃ.	বালক	২৩.৬	৮২.৬	৫.১	৩২.২
তৃতীয় পরিকল্পনা	বালিকা	১১.৪	৪১.৪	১.৬	১১.৩
	মোট	৩৫.০	৬২.৪	৬.৭	২২.৫
১৯৬৫-৬৬ খৃঃ.	বালক	৩২.২	৯৬.৩	৭.৭	৪৪.২
পরিকল্পনা	বালিকা	১৮.৩	৫৬.৫	২.৮	১৭.০
থেকে ছুটি ৩ বছর	মোট	৫০.৫	৭৬.৭	১০.৫	৩০.৯
১৯৬৮-৬৯ খৃঃ.	বালক	৩৪.২	৯৫.৬	৯.০	৪৭.০
চতুর্থ পরিকল্পনা	বালিকা	২০.২	৫৯.৬	৩.৫	১৯.৩
	মোট	৫৪.৪	৭৮.১	১২.৫	৩৩.৫

চারটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষে নিম্ন প্রাথমিক স্তরে (প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত) শিক্ষালাভের সুযোগ পেয়েছে শতকরা ৭৮.১ জন এবং উচ্চ প্রাথমিক-স্তরে (ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত) মাত্র শতকরা ৩৩.৫ জন। এই ক্ষেত্রে শিক্ষা-বিস্তার নৈরাশ্যজনক। মেয়েদের অবস্থা তো আরো খারাপ। তাছাড়া ওপরের সারণীতে বর্ণিত প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম

শ্রেণীর ছাত্রসংখ্যার মধ্যে কেবলমাত্র ৬ থেকে ১১ বছর বয়সের ছেলেমেয়েরা নয়, ৬ বছরের কম ও ১১ বছরের বেশী বয়সের ছেলেমেয়েরা রয়েছে এবং তাদের সংখ্যা হ'ল উক্ত শ্রেণীগুলির মোট ছাত্রসংখ্যার শতকরা ৩০ জনের বেশী। এঅবস্থায় বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ শ্রী জে. পি. নায়েক মন্তব্য করেছেন, "প্রাথমিক স্তরে শিক্ষা-বিস্তার যথেষ্ট দ্রুত নয় এবং আমরা সংবিধানের ৪৫নং ধারার নির্দেশ পালনে ব্যর্থ হয়েছি।"[১৭]

১৯৬০ সালের মধ্যে সংবিধানের নির্দেশ পালনে অক্ষম হওয়ায় 'পরবর্তীকালে এই লক্ষ্য সংশোধন করে বলা হ'ল, ১৯৬৫-৬৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ৬ থেকে ১১ বছর বয়সের শিশুদের সর্বজনীন শিক্ষা দিতে হবে। কিন্তু ১৯৭৮-৭৯ সালের পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষেও এই লক্ষ্য সম্ভবত পূরণ করা সম্ভব হবে না। শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট বিবেচনা করে ১৯৬৮ সনে এই লক্ষ্য পুনরায় সংশোধন করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে যে, ১৯৮৫-৮৬ সালের মধ্যে ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত সকল ছেলেমেয়েদের অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা দেওয়া হবে। শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রগতির প্রধান প্রতিবন্ধক হ'ল অর্থ ব্যয়ে অনুদারতা।[১৮]

প্রকৃতপক্ষে প্রাথমিক স্তরে সমাজের দুর্বলশ্রেণীর মানুষেরা এখনো পর্যন্ত খুবই কম সুযোগ পান। এই শ্রেণী থেকে স্কুলে ভর্তির সংখ্যা অন্যান্য শ্রেণীর তুলনায় অনেক কম, অথচ অপচয়ের হার অন্যদের চেয়ে বেশী। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে হার্টগ কমিটির রিপোর্টে সর্বপ্রথম অপচয় (Wastage) ও বদ্ধতার (Stagnation) প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছিল। তাতে বলা হয়েছে,"১৯২২-২৩ সালের প্রথম শ্রেণীর প্রতি ১০০ জন ছাত্রের মধ্যে কেবলমাত্র ১৮ জন ছাত্র ১৯২৫-২৬ সালের পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ছিল।" তারপরে অবস্থার সামান্য পরিবর্তন হয়েছে। এন. সি. ই. আর. টি-র এক সমীক্ষায় বলা হয়েছে, "১৯৫০-৫১ সালকে ভিত্তিবর্ষ ধরে ১৯৫৬-৫৭ সাল পর্যন্ত ছাত্রসংখ্যা বিচার করলে দেখা যায়, প্রাথমিক স্তরে চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত অপচয়ের হার হ'ল শতকরা ৬৫·৯৫ (অর্থাৎ চতুর্থ শ্রেণীর পরে শতকরা ৩৪ জন পঞ্চম শ্রেণীতে পড়তে সক্ষম হয়েছিল — লেখক); আর প্রথম শ্রেণী থেকে সপ্তম শ্রেণী পর্যন্ত অপচয়ের হার শতকরা ৭৮·৩৫ (অর্থাৎ অষ্টম শ্রেণীতে শতকরা ২২ জন পড়ছিল — লেখক)। প্রথম শ্রেণীতেই অপচয়ের হার সর্বাধিক। এই হার হ'ল শতকরা ৩৮·৮৭।"[১৯]

কিন্তু এই সমস্যার প্রতিকারকল্পে আধা-সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার পরিবর্তনের জন্য কোনো মৌলিক পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় স্বাধীন ভারতের ৩৪ বছরেও মানবশক্তির বিপুল অপচয় বন্ধ হয়নি। পরের পৃষ্ঠার সারণীতে[২০] প্রথম

শ্রেণী থেকে চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রসংখ্যার শতকরা হার লিপিবদ্ধ করা হয়েছে :

	বালক				বালিকা			
	১৯৫৮	১৯৫৯	১৯৬০	১৯৬১	১৯৫৮	১৯৫৯	১৯৬০	১৯৬১
প্রথম শ্রেণী	১০০				১০০			
দ্বিতীয় শ্রেণী		৬১.২				৫৬.৪		
তৃতীয় শ্রেণী			৫১.১				৪৫.১	
চতুর্থ শ্রেণী				৪৪.৪				৩৭.৫

নিম্ন প্রাথমিক স্তরে (প্রথম শ্রেণী থেকে চতুর্থ শ্রেণী) অপচয়ের হার অন্যান্য স্তরের তুলনায় অনেক বেশী —প্রায় শতকরা ৫৬ জন ছেলে ও ৬২ জন মেয়ে। অর্থাৎ ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের মধ্যে অপচয়ের হার বেশী। তারপরেও অপচয় অব্যাহত থাকে। প্রথম শ্রেণীর ছাত্রদের মধ্যে কেবলমাত্র শতকরা ২০ জন ছাত্র শেষ পর্যন্ত অষ্টম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়। বাকি শতকরা ৮০ জন দরিদ্র ছাত্রের মধ্যে মেধাবী ছাত্ররাও আছে, যারা প্রধানত অর্থনৈতিক কারণে বিভিন্ন শ্রেণীর বিদ্যাচর্চা থেকে বিরত হয়। কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক প্রকাশিত গ্রন্থে বলা হয়েছে, "একথা সত্য যে, দারিদ্রের কারণে শতকরা ৮০ জন ছাত্র স্কুলে যায় না কিংবা প্রাথমিক শিক্ষা-সমাপ্তির পূর্বেই স্কুল ত্যাগ করে।"[২১] মাধ্যমিক সহ শিক্ষার উচ্চতর স্তরেও একই চিত্র পাওয়া যায়।

অপচয়ের মত বদ্ধতাও ছাত্রদের চিরসঙ্গী। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে না পেরে একই শ্রেণীতে বছরের পর বছর আবদ্ধ থেকে তাদের মধ্যে নিরুৎসাহের মনোভাব সৃষ্টি হয় এবং শক্তির অপচয় ঘটে। ফলে অসময়ে স্কুল থেকে বিদায় নিতে বাধ্য হয়। বার্ষিক পরীক্ষায় অকৃতকার্যতার জন্য একই শ্রেণীতে আবদ্ধ থাকার চিত্র নিম্নলিখিত সারণীতে[২২] উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে :

প্রথম শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী

অনুত্তীর্ণ চিত্র

	প্রথম	দ্বিতীয়	তৃতীয়	চতুর্থ	পঞ্চম	ষষ্ঠ	সপ্তম	অষ্টম
বালক	৪০.৩	২৬.৬	২২.৬	২১.৭	১৬.৪	১৪.১	১৩.৭	১৩.২
বালিকা	৪৭.১	৩৩.১	২৬.৬	২৫.৬	১৯.৮	১৭.৩	১৭.৯	১৬.৪

অর্থাৎ অনুত্তীর্ণদের ক্ষেত্রেও ছেলেদের তুলনায় মেয়েরা সংখ্যায় বেশী এবং শহর ও গ্রামের মধ্যে তুলনা করলে অপচয় ও অকৃতকার্যতার হার গ্রামাঞ্চলে অনেক বেশী।

অপচয় ও বদ্ধতার কারণ নির্দেশ করে শিক্ষা কমিশনের (১৯৬৪-৬৬ খৃঃ.) প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সাধারণভাবে অপচয় ও বদ্ধতার কারণগুলিকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায় : অর্থনৈতিক, সামাজিক ও শিক্ষাসংক্রান্ত। দারিদ্রের জন্য শতকরা ৬৫ জন শিক্ষা-সমাপ্তির পূর্বেই স্কুল থেকে চলে যায়। ৬ থেকে ৯ বছর বয়সের শিশুকে স্কুলে পাঠাতে সকলেই ইচ্ছুক। কারণ এসময়ে শিশুটি সংসারে সাহায্য করবার পরিবর্তে উপদ্রব করে। ৯ কিংবা ১০ বছর বয়সে সে অর্থনৈতিক দিক থেকে মূল্যবান বলে বিবেচিত হয়। এসময়ে সে সংসারের কাজ কিংবা বাহিরে উপার্জন করতে সক্ষম হয়। বিশেষত একথা মেয়েদের ক্ষেত্রে সত্য, যারা গৃহের কাজে কর্মক্লান্ত মাকে সাহায্য করে। সুতরাং শিশুটিকে স্কুল থেকে ছাড়িয়ে নেওয়া হয় এবং একটি অপচয়ের ঘটনা ঘটে। এই সমস্যার সমাধানের একমাত্র উপায় হ'ল অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন।[২৩]

শিক্ষা-সংক্রান্ত কারণে শতকরা ৩০ ভাগ অপচয় ঘটে। অনুত্তীর্ণতার কারণে একই শ্রেণীতে দীর্ঘকাল আবদ্ধ থাকার জন্য স্কুলে থাকতে শিশুরা অনিচ্ছুক হয়। অধিকাংশ স্কুলগুলির একঘেয়ে চরিত্র এবং ছাত্রদেরকে আকৃষ্ট করা ও ধরে রাখার ক্ষমতার অভাব, একই শ্রেণীতে বিভিন্ন বয়সের ছেলে-মেয়েদের সমাবেশ, সারা বছর ধরে স্কুলে ছাত্র ভর্তি, অনিয়মিত উপস্থিতি, স্কুলে প্রয়োজনীয় শিক্ষক ও শিক্ষা-সরঞ্জামের অভাব, অনুপযুক্ত পাঠক্রম প্রভৃতির জন্য অপচয় হয়,[২৪] সামাজিক কারণের জন্য মেয়েদের ক্ষেত্রে বেশী অপচয় ঘটে। শিক্ষা-সংক্রান্ত ও সামাজিক কারণগুলির পশ্চাতে রয়েছে অর্থনৈতিক কারণ। অর্থাৎ স্কুলগুলিকে পর্যাপ্ত পরিমাণে অর্থ সাহায্য করলে অপচয়ের পরিমাণ অনেকাংশে বন্ধ করা যায়। কিন্তু শ্রমিক-কৃষকের আর্থিক অবস্থা পরিবর্তিত না হলে শতকরা ৬৫ ভাগ অপচয় বন্ধ হবে না।

কিন্তু এই অপচয় ও বদ্ধতার জন্য নতুন নিরক্ষর সৃষ্টি হচ্ছে। ৫ থেকে ১৪ বছর স্কুলগামী-বয়সের ছেলেমেয়েদের নিরক্ষরতার হার নিম্নলিখিত সারণীতে[২৫] দেওয়া হয়েছে :

	গ্রামাঞ্চল		শহরাঞ্চল		উভয়াঞ্চল	
	১৯৮১	১৯৭১	১৯৬১	১৯৭১	১৯৬১	১৯৭১
বালক	৬৪·৬	৬২·৮	৪০·৬	৩৬·৮	৬২·০	৫৭·৯
বালিকা	৮৫·৪	৭৯·৪	৫২.২	৪৪·৯	৭৯·৭	·২ ৯
মোট	৭৫ ৬	৭০·৭	৪৬·১	৪০·৭	৭০·৫	৬৫·০

এই সারণী থেকে দেখা যায়, পুরোনো নিরক্ষরদের সংখ্যা বাদ দিলেও

প্রত্যেক বছরে উক্ত বয়সের ছেলেমেয়েদের মধ্যে বিশাল অংশ কোনো শিক্ষালাভের সুযোগ না পেয়ে নিরক্ষর-সংখ্যা বৃদ্ধি করছে। আর পুরোনো নিরক্ষর-সংখ্যার সঙ্গে এই নতুন নিরক্ষর-সংখ্যা যোগ করলে দেখা যায়, আমাদের দেশ ক্রমশ শিক্ষার দিক থেকে পিছিয়ে পড়ছে। 'গোটা দুনিয়ায় যেখানে নিরক্ষরের সংখ্যা আশী কোটি, সেখানে এই ভারতেই পঞ্চান্ন কোটি নিরক্ষর নরনারী। ভারত বিশ্বে সর্বাধিক সংখ্যক নিরক্ষরের দেশ বলে চিহ্নিত। স্বাধীনতালাভের চৌত্রিশতম বার্ষিকী উদ্‌যাপনের পরেও সাক্ষরতা বাড়ার হার চৌত্রিশ হয়নি। বছরে শতকরা এক ভাগ সাক্ষরতা বাড়েনি; বরং হিসেব করলে দেখা যাবে, জনসংখ্যা বৃদ্ধির তুলনায় সাক্ষর মানুষের বৃদ্ধির হার কমছে।'[২৬]

শিক্ষা কমিশনের (১৯৬৪-৬৬ খৃঃ.) প্রতিবেদনে আশঙ্কা প্রকাশ করে বলা হয়েছে, "যে ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে প্রাথমিক শিক্ষা চলছে তা কার্যকরী নয়, বরং অপচয়। যে শিশুরা এই ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে যায়, হয় তারা প্রকৃত শিক্ষালাভ করে না, নতুবা কিছুকাল পরেই অজ্ঞানতার অন্ধকারে তলিয়ে যায় এবং আমরা যদি ক্রমাগত এই ব্যবস্থার ওপরেই নির্ভরশীল হতে থাকি, তাহলে আগামী ২০০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যেও নিরক্ষরতা দূরীকরণ সম্ভব নাও হতে পারে"[২৭]

স্বাধীনতা-প্রাপ্তির সময়ে ভারতে অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির (শিক্ষিত ব্যক্তিরা সহ) সংখ্যা ছিল শতকরা ১৪ জন। ১৯৫০ সালে সেই সংখ্যা শতকরা ১৬.৬, ১৯৬১ সনে শতকরা ২৪.৩ এবং ১৯৭১ খৃষ্টাব্দে সাক্ষর-সংখ্যা হয়েছে শতকরা ২৯.৪ জন। নিম্নলিখিত সারণীতে[২৮] ১৯৫০ থেকে ১৯৭১ খৃঃ. পর্যন্ত সাক্ষর-বৃদ্ধির হার তুলে ধরা হয়েছে:

	১৯৫০ খৃঃ. [হাজারের ভিত্তিতে]			১৯৭১ খৃঃ. [হাজারের ভিত্তিতে]		
	পুরুষ	স্ত্রী	মোট পুরুষ-স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী	মোট পুরুষ-স্ত্রী
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
সাক্ষর	৪৫,৬১০ (২৪.৯)	১৩,৬৫১ (৭.৯)	৫৯,২৬১ (১৬.৬)	১,১১,১৭৮ (৩৯.৫)	৪৮,৭৩১ (১৮.৫)	১,৬০,৫০৯ (২৯.৪)
নিরক্ষর	১,৩৭,৭২৩ (৭৫.১)	১,৫৯,৮৯৫ (৯২.১)	২,৯৭,৬১৮ (৮৩.৪)	১,৭১,২৭৮ (৬০.৫)	২,১৫,১৬৯ (৮১.৫)	৩,৮৬,৪৪৭ (৭০.৬)

[দ্রঃ শতকরা হিসেবে বন্ধনীভুক্ত সংখ্যা দেখানো হয়েছে]

অর্থাৎ কুড়ি বছরের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষে আমাদের দেশে শতকরা ৭০ জনেরও বেশী মানুষ নিরক্ষর। ভারতে জনসংখ্যা বাড়ছে বছরে ২.৫% হারে, কিন্তু সাক্ষর-সংখ্যা বাড়ছে বছরে ০.৭৫% হারে; অর্থাৎ প্রতি বছরে জনসংখ্যা বৃদ্ধির অনুপাতে ১.৩০% করে নিরক্ষরের সংখ্যা বাড়ছে। ১৯৫০ সালে যেখানে নিরক্ষর-সংখ্যা ছিল ২,৯৭, ৬১৮, সেখানে ১৯৭১ সনে হয়েছে ৩,৮৬,৪৪৭। এভাবে চললে এমন একটা সময় আসবে যখন ভারতবর্ষে কেবলমাত্র নিরক্ষর ব্যক্তিরাই বাস করবেন।

তাছাড়া শহরের স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে সাক্ষরতার হার বৃদ্ধির তুলনায় গ্রামের স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি অত্যন্ত কম। পুনরায় ছেলেদের তুলনায় শহর ও গ্রামের মেয়েদের সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি গভীর নৈরাশ্যজনক। প্রাথমিক শিক্ষা ও বয়স্ক শিক্ষা সম্পর্কে শাসকশ্রেণীর মনোভাবের জন্য এই ক্ষেত্রে সংকটজনক অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। এই অবস্থায় যে কোনো মানবপ্রেমিক ব্যক্তি বিচলিত হন। তাই শ্রী জে. পি. নায়েক গভীর ক্ষোভের সঙ্গে মন্তব্য করেছেন, "এই স্তরের অবহেলা অপরাধজনক।"[২৯] এবং "আমরা এই স্তরে চূড়ান্ত অবহেলা করেছি ও নিরক্ষরতা দূরীকরণে ব্যর্থ হয়েছি।"[৩০] অথচ ১৯৮১ সালের জুন মাসে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত রাজ্য-শিক্ষামন্ত্রীদের সম্মেলনে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বলেছেন, "আমাকে অবশ্যই বলতে হবে যে, সামগ্রিক দিক থেকে সাক্ষরতার বিষয়ে আমাদের হতাশ হওয়ার কারণ খুবই অল্প।"—"I must say that we are a bit dishartened with the whole aspect of literacy."[৩১] অর্থাৎ কোটি কোটি মানুষের নিরক্ষরতা ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে বিন্দুমাত্রও বিচলিত করতে পারে না। বিচলিত না হওয়াটাই স্বাভাবিক; বিপরীত ঘটনা ঘটলেই বরং শাসকশ্রেণী বিচলিত হতেন। কারণ জনগণের অজ্ঞতার ওপরেই শাসক-শ্রেণীর অস্তিত্ব ও স্থায়িত্ব নির্ভর করে। বস্তুত, বিগত ৩৪ বছর ধরে শিক্ষাকে সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়া নয়, একটা নির্দিষ্ট শ্রেণীর মধ্যে শিক্ষাকে সীমাবদ্ধ রাখার প্রচেষ্টা হয়েছে। তাই ইংরেজ-শাসনকালের মত কংগ্রেস-শাসনকালেও প্রাথমিক শিক্ষার তুলনায় মাধ্যমিক ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে শিক্ষা প্রসারের ওপরে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

১৯৫০-৫১ খৃষ্টাব্দ থেকে অর্থাৎ প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রথম বছর থেকে চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রথম বছর (১৯৬৮-৬৯ খৃঃ) পর্যন্ত বিভিন্ন স্তরে শিক্ষার প্রসার কিভাবে ঘটেছে, তা পরের পৃষ্ঠার পরিসংখ্যানে[৩২] পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে:

স্তর	শ্রেণী	ছাত্রসংখ্যা		বয়স
		১৯৫০-৫১	১৯৬৮-৬৯	
প্রাথমিক	১ম-৫ম	১ কোটি ৯০ লক্ষ	৫ কোটি ৬০ লক্ষ	৬-১১
মাধ্যমিক	৬ষ্ঠ-৮ম	৩ কোটি	১২ কোটি ৩০ লক্ষ	১১-১৪
উচ্চ মাধ্যমিক	৯ম-১১শ	১২ লক্ষ	৬৬ লক্ষ	১৪-১৭
বিশ্ববিদ্যালয়	বি.এ. ও এম.এ.	৩ লক্ষ ৬০ হাজার	১৬ লক্ষ ৯০ হাজার	১৭-২১
টেকনিক্যাল শিক্ষা	ডিগ্রি কলেজ	৪,০০০	২৫,০০০	
ঐ	ডিপ্লোমা বিদ্যালয়	৫,৯০০	৪৮,৬০০	

অর্থাৎ ১৯৫০-৫১ সাল থেকে ১৯৭০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রাথমিক স্তরে শিক্ষা-বিস্তার হয়েছে প্রায় তিন গুণ, মাধ্যমিক স্তরে প্রায় চার গুণ, উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে প্রায় ছয় গুণ, বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে প্রায় পাঁচ গুণ, টেকনিক্যাল ডিগ্রি স্তরে প্রায় চার গুণ এবং টেকনিক্যাল ডিপ্লোমা স্তরে প্রায় আট গুণ।

স্বাভাবিকভাবে প্রাথমিক শিক্ষার তুলনায় উচ্চশিক্ষার খাতে ব্যয় হয়েছে বেশী। একজন স্নাতক শিক্ষার্থী পিছু গড় খরচ একজন প্রাথমিক শিক্ষার্থীর মাথাপিছু খরচের এগারো গুণ বেশী এবং একজন স্নাতকোত্তর শ্রেণীর ছাত্রের মাথাপিছু খরচ ৩৯ গুণ বেশী।[৩৩] একদিকে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারগুলি অন্যান্য খাতে ব্যয়ের তুলনায় শিক্ষার জন্য অর্থ ব্যয় কম করেছেন, অন্যদিকে শিক্ষাখাতে বরাদ্দ অর্থ প্রাথমিক শিক্ষার তুলনায় উচ্চতর শিক্ষার জন্য বেশী ব্যয় করেছেন। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা থেকে প্রাথমিক শিক্ষাখাতে ব্যয় কমিয়ে উচ্চশিক্ষাখাতে অধিকতর অর্থ বরাদ্দ করা আরম্ভ হয়। নিম্নলিখিত পরিসংখ্যানে[৩৪] এই সত্য উদ্ভাসিত :

	প্রথম পরিকল্পনা	দ্বিতীয় পরিকল্পনা
	(টাকা।	কোটি হিসাবে)
প্রাথমিক শিক্ষা	৯৩	৮৯
মাধ্যমিক শিক্ষা	২২	৫১
বিশ্ববিদ্যালয়	১৫	৫৭
টেকনিক্যাল ও ভোকেশনাল	২৩	৪৮
সোশ্যাল	৫	৫
অ্যাডমিনিস্ট্রেশন	১১	৫৭
মোট	১৬৯	৩০৭

এন. সি. ই. আর. টি. কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তকেও বলা হয়েছে, "ভারতবর্ষের মত বিশাল দেশে যেখানে জনসংখ্যা বিপুল, কেন্দ্রীয় সরকারের কিংবা রাজ্য-সরকারগুলির শিক্ষাখাতে বরাদ্দ অর্থ অত্যন্ত অপ্রতুল। ...১৯৬৮ সালের জাতীয় শিক্ষানীতি বিষয়ক সরকারি প্রস্তাবে শিক্ষার জন্য সমগ্র রাজস্বের শতকরা ৬ ভাগ অর্থ অবশ্যই ব্যয় করতে হবে।"[৩৫] কিন্তু এই প্রস্তাব কার্যকরী হয়নি। ১৯৭৮ খৃষ্টাব্দে ভারত সরকারের গেজেটে বলা হয়েছে, "১৯৬০-৬১ সালে শিক্ষার জন্য জাতীয় আয়ের শতকরা ২·৪ ভাগ অর্থ ব্যয় করা হয়েছিল এবং ১৯৬৮-৬৯ সালে তা বর্দ্ধিত হয়ে শতকরা ২·৯ ভাগ অর্থ ব্যয়িত হয়েছিল। কিন্তু এই অর্থের বৃহদংশ প্রাথমিক ও জনশিক্ষার মত গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রকে বঞ্চিত করে উচ্চতর শিক্ষার খাতে ব্যয় করা হয়েছে। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে ভারতবর্ষ বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের শিক্ষার জন্য বিশ্বের অন্যান্য দেশগুলির তুলনায় বেশী ব্যয় করেছে। আর্থনীতিক ও সামাজিক উন্নয়নের জন্য জনশিক্ষার ক্রমবর্ধমান প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা সত্ত্বেও উচ্চতর শিক্ষাখাতে এই প্রচুর ব্যয় জনচিত্তে বিক্ষোভ সৃষ্টি করছে।"[৩৬]

কিন্তু প্রশ্নটা হ'ল, উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিরা সংখ্যায় কত জন? তাঁরা কি সমাজের বৃহদংশ? এবং এই উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিরা সমাজের কোন্ শ্রেণী থেকে এসেছেন? কেন্দ্রীয় সরকার কেন তাঁদের জন্য প্রাথমিক শিক্ষার তুলনায় বেশী ব্যয় করছেন? প্রশ্নগুলির উত্তর নিহিত রয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে। তাঁরা জনশিক্ষা প্রসারে প্রয়াসী হয়ে নিজেদের বিপদ ডেকে আনতে চাননি। কারণ তাঁরা জানেন, শিক্ষা আনে চেতনা, চেতনা আনে বিপ্লব, বিপ্লব আনে মুক্তি —সর্ববিধ শোষণ থেকে মুক্তি। তাই তাঁরা মেকলের আদর্শানুসরণ করেছেন —উচ্চশিক্ষার পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন এই উদ্দেশ্য নিয়ে যে, উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিরা শাসকশ্রেণীর ভাবাদর্শ প্রচার করবেন এবং শোষণমূলক সমাজব্যবস্থাকে জীইয়ে রাখার জন্য সচেষ্ট হবেন। সেকারণে তাঁরা উচ্চতর শিক্ষার দরজা সকলের জন্য খোলা রাখেননি এবং উচ্চতর শিক্ষা-ক্ষেত্রে ইংরেজিভাষার আধিপত্য হ্রাসে প্রয়াসী হননি। ফলে বৃটিশ-যুগের মত এযুগেও উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিরা সংখ্যায় মুষ্টিমেয়।

১৯৫১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী খানিকটা ইংরেজি জানেন এমন লোকের সংখ্যা সারা দেশে ৩৮ লক্ষ অর্থাৎ একশোতে একের সামান্য বেশী।[৩৭] আর ১৯৭২ সালে স্বাধীনতার ২৫ বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য ও খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ ভি. কে. আর. ভি. রাও লিখেছেন, "বর্তমানে

আমাদের শিক্ষিত শ্রেণী—এর মধ্যে ম্যাট্রিকুলেট থেকে তার ওপরের শিক্ষিতদের ধরে—সমগ্র জনসংখ্যার এক ক্ষুদ্র অংশ—শতকরা প্রায় দুইজন।"[৩৮] এর অর্থ হ'ল, পঁচিশ বছর আগেও যেমন ম্যাট্রিকুলেট থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তর পর্যন্ত শিক্ষিতের হার ছিল ১'৬৬৫, পঁচিশ বছর পরেও প্রায় ঠিক তাই আছে। সংখ্যাতত্ত্বের দিক থেকে অবশ্য শিক্ষিতের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে, তেমনি মোট জনসংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু এই মুষ্টিমেয় উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি ইংরেজি-ভাষায় শিক্ষিত এবং তাঁরা পূর্বের মতই সামাজিক সুখ-সুবিধাগুলি ভোগ করছেন। এন. সি. ই. আর. টি.-র পুস্তকে বলা হয়েছে, "আশ্চর্যের বিষয়, স্বাধীনতার পরেও ইংরেজিভাষার আধিপত্য এখনো বহু ক্ষেত্রে রয়েছে এবং উচ্চ-মধ্যবিত্তশ্রেণী সামরিক, অসামরিক ও অন্যান্য পেশার উচ্চতর পদে চাকরির সুযোগ পাচ্ছেন। তাই **যখনি মাতৃভাষা-শিক্ষা কিংবা মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের প্রশ্ন ওঠে, এই শ্রেণীর ব্যক্তিরা তখনি তীব্র প্রতিবাদ জানান; কারণ তাঁরা তাঁদের সুযোগ-সুবিধার বিলুপ্তি চান না। যে ইংরেজিভাষার জন্য তাঁদের সামাজিক মর্যাদা, তা রক্ষা করার উদ্দেশ্যে তাঁরা মাতৃভাষার উন্নয়নকে স্তব্ধ করার জন্য সমস্ত রকমের পদ্ধতি গ্রহণ করেন।**"[৩৯] [মোটা হরফ লেখকের]

অথচ গান্ধিজী গভীর ক্ষোভের সঙ্গে বলেছিলেন, "ইংরেজি আজ আমাদের হৃদয়ে প্রিয়তমের স্থান জুড়িয়া আছে এবং মাতৃভাষাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়াছে। ইংরেজগণের সহিত আমাদের অসম সম্বন্ধের দরুণ ইহা এক অস্বাভাবিক অবস্থা। ইংরেজি জ্ঞান ছাড়া ভারতীয় চিত্তের শ্রেষ্ঠ বিকাশ নিশ্চয়ই সম্ভব। ইংরেজি জ্ঞান ছাড়া শ্রেষ্ঠ সমাজে প্রবেশ অসম্ভব—আমাদের ছেলেমেয়েদের মধ্যে এই ভাবনায় উৎসাহ দিয়া ভারতীয় মনুষ্যত্ব ও নারীত্বের উপর জুলুম করা হইতেছে।"[৪০]

তাই স্বাধীন ভারতে ইংরেজিভাষায় শিক্ষাদানের বিরুদ্ধে অভিমত প্রকাশ করে গান্ধীজী ১৯৪৭ সালের ২১ সেপ্টেম্বর 'হরিজন' পত্রিকায় লিখেছেন, "ইংরেজ অপহারকদের রাজনৈতিক শাসন আমরা যেরূপ সাফল্যের সহিত নির্বাসিত করিতে পারিয়াছি আমার অভিপ্রায় সংস্কৃতির অপহারক ইংরেজিকেও তেমনি নির্বাসিত করা।"[৪১] সেই উদ্দেশ্যে তিনি সর্বস্তরে শিক্ষার মাধ্যম-রূপে মাতৃভাষাকে গ্রহণের জন্য দাবি উত্থাপন করে বলেছেন, "সমস্ত শিক্ষা প্রাদেশিক ভাষাগুলির মাধ্যমে অবশ্যই দিতে হবে।"[৪২]

কিন্তু ইংরেজ-অধীনতা থেকে মুক্ত হলেও ভারত ইংরেজিভাষার দাসত্ব

থেকে মুক্তি পেল না। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের দাবি স্বীকৃত হলেও বিশ্ববিদ্যালয়-স্তরে মাতৃভাষার প্রবেশাধিকার স্বীকৃত হ'ল না। যদিও জীবনের সর্বক্ষেত্রে মাতৃভাষা ব্যবহারের জন্য সংবিধানের অষ্টম তফসিলে আঞ্চলিক ভাষাগুলিকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে —অসমীয়া, গুজরাটী, হিন্দী, কানাড়া, কাশ্মীরী, মালয়ালাম, মারাঠী, ওড়িয়া, পাঞ্জাবী, সংস্কৃত, সিন্ধি, তামিল, তেলেগু, উর্দু।

অবশ্য উচ্চশিক্ষা কিছুটা সম্প্রসারিত হয়েছে, মাতৃভাষা ম্যাট্রিকুলেশন-স্তর ডিঙিয়ে ডিগ্রি-স্তরের পাশ কোর্সে প্রবেশের অনুমতি পেয়েছে। কিন্তু এখানেও হাত প্রসারিত নয়, ছোট হাতে দয়ার দান মাত্র। অর্থাৎ পরীক্ষায় মাতৃভাষা মাধ্যম-রূপে স্বীকৃত হলেও ক্লাসে পড়ানো হ'ত ইংরেজিভাষায়। ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভারতীয় আচার্য সি. রাজাগোপালাচারী সমাবর্তন-ভাষণে শিক্ষার উচ্চতর স্তরে মাতৃভাষাকে মাধ্যম-রূপে স্বীকৃতি দেবার জন্য আবেদন জানান। ১৯৪৮ সালে উপাচার্য প্রমথনাথ ব্যানার্জীর প্রয়াসে I. A., I. Sc., B. A., B. Sc., B. Com-এর পাশ কোর্সে ভাষা-বিষয় বাদে অন্য সব বিষয়ে মাতৃভাষার মাধ্যমে পরীক্ষা দেবার সুযোগ দেওয়া হয়। কিন্তু অনার্স কোর্সে এবং এবং এম. এ-স্তরে মাতৃভাষা 'নিজভূমে পরবাসী' হয়ে রইল। ইংরেজ বিদায় নিলেও ইংরেজি-আনুগত্য হ্রাস পায়নি; বরং প্রশাসন-যন্ত্রে ইংরেজদের শূন্য স্থানগুলিতে কায়েমী স্বত্ব স্থাপনের জন্য ইংরেজি-জানা শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে প্রবল আগ্রহ পরিলক্ষিত হতে থাকল। শ্রেণী-আধিপত্য বজায় রাখার উদ্দেশ্যে তাঁরা ইংরেজিভাষা-শিক্ষায় আগ্রহী ও মাতৃভাষা-চর্চার বিরোধী ছিলেন। 'সমস্ত দেশের সামান্য যে-কয়জন লোক ইংরেজিভাষাটাকে কোনো-মতে ব্যবহার করবার সুযোগ পাচ্ছে তাদের ভাগে উক্ত ভাষার অধিকারে পাছে লেশমাত্র কমতি ঘটে এই ছিল তাদের ভয়।'[৪৩] তাই বিত্তবানশ্রেণী এবং তাঁদের প্রসাদভিক্ষু ব্যক্তিরা শিক্ষার মানের অবনমনের অজুহাত তুলে ইংরেজি-ভাষার গুরুত্ব হ্রাসের বিরোধী ছিলেন।

১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে স্যার সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের সভাপতিত্বে গঠিত ইউনিভার্সিটি এডুকেশন কমিশন (রাধাকৃষ্ণণ কমিশন নামে সুপরিচিত) ইংরেজিভাষা-শিক্ষার ফলাফল বিশ্লেষণ করে বলেছেন, "এভাবে ইংরেজি ব্যবহারের দ্বারা জনসাধারণ দু'টি জাতিতে পরিণত হয়েছে; মুষ্টিমেয় একদল যাঁরা শাসন করেন এবং বৃহৎ সংখ্যক অন্য দল যাঁরা শাসিত হচ্ছেন। একদল অন্যদলের ভাষায় কথা বলতে পারেন না বলে পরস্পরকে বোঝেন না।"[৪৪] অর্থাৎ ইংরেজিভাষা-শিক্ষার ওপরে

অত্যধিক গুরুত্ব প্রদানের ফলে ইংরেজিভাষা না-জানার অপরাধে দেশের শতকরা ৯৮ জনের বেশী মানুষ ইংরেজি-জানা প্রায় শতকরা দু'জন লোকের শাসনাধীনে রইল এবং তার ফলে জাতীয় জীবনে ও সমাজ-মানসে ইংরেজিভাষা-শিক্ষার কুফল দেখা গেল। কমিশনের মতে "ইংরেজিভাষা-শিক্ষা থেকে উদ্ভূত 'বাবু মানসিকতা' কেবলমাত্র ব্যক্তির মধ্যে নয়, সমগ্র জাতির মধ্যে বিচ্ছিন্নতা-বোধ সৃষ্টি করেছে। এটাই বৃটিশ-শাসনাধীন ভারতে ঘটেছিল। ইংরেজিভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের জন্য আমরা অতীতে অনেক মূল্য দিয়েছি।"[৪৫]

এই 'মূল্যের' অর্থ উপলব্ধি করা যায় বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর মন্তব্যে, —"দেশের সাম্প্রতিক ইতিহাসের মধ্যে যেমন অনেক গৌরবময় কথা আছে তেমনি অনেক কলঙ্কের কথাও আছে। এই কলঙ্কের ইতিহাস যদি আলোচনা করা যায়, তাহলে দেখা যাবে, যাঁদের সূত্রে এই কলঙ্ক ছড়িয়েছে তাঁরা সকলেই ইংরেজিশিক্ষিত। আমি এইটুকু বলতে চাইছি যে, দেশের সাম্প্রতিক ইতিহাসে আমাদের যেমন গর্ব করবার অনেক কথা আছে, তেমনি আমাদের দুঃখ করবার লজ্জিত হবার কথাও আছে। কিন্তু সেই সকলের মূল যদি অনুসন্ধান করা যায় তাহলে এই সমস্ত শোচনীয় ঘটনার মূলে অনেক সময় দেখা যাবে ইংরেজি-শিক্ষিত গর্বিত ও স্বার্থপর লোকের কীর্তিকলাপ।"[৪৬]

জাপানের উদাহরণ দিয়ে বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের মতই বলেছেন, "প্রায় একশ' বছর হ'ল পাশ্চাত্য জগতের হাতে ঘা খেয়ে জাপান ঠিক করল, যে বিদ্যা ও জ্ঞানের জন্য প্রতীচ্য এত শক্তিমান হয়েছে সে-জ্ঞান ও সে-সমস্ত বিদ্যা আয়ত্ত করতে হবে। এখনও একশ' বছর হয়নি। এরই মধ্যে জাপানের কীর্তিকলাপের কথা সকলেই জানেন। বিশ বছর আগে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে যখন জাপানের হার হ'ল তখন জাপানের দুরবস্থার শেষ ছিল না। আজ কিন্তু জাপানে গেলে মনে হবে না যে এরকম কোন অবস্থার মধ্য দিয়ে তাকে যেতে হয়েছিল।"[৪৭]

ইংরেজি আন্তর্জাতিক ভাষা দোহাই দিয়ে যাঁরা বলেন, উচ্চশিক্ষার্থে কিংবা কোনো আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগ দিতে হলে ইংরেজিভাষায় জ্ঞান থাকা প্রয়োজন, তাঁদের ভ্রান্ত ধারণা নিরসনের জন্য সত্যেন্দ্রনাথ নিজের অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিয়েছেন, "একটি সম্মেলন আহ্বান করেছিলেন জাপানীরা। সেখানে শিক্ষিত লোকেরা – যাঁরা দার্শনিক, বিজ্ঞানী কিংবা শিক্ষক, তাঁরা সকলে একত্র হয়েছিলেন আলোচনা করতে যে, আধুনিক বিজ্ঞানের যুগে মানুষের কি করা উচিত এবং মানুষের ভবিষ্যতই বা কি হবে। সম্মেলনে আমি এবং আরও

দু' একজন বিদেশী ছিলেন। কিন্তু বেশীর ভাগই জাপানের লোক এবং আলোচনা যা হয়েছিল তা সমস্তই হয়েছিল জাপানীতে। তাঁদের দু' একজন ইংরেজী ভাষাতে কিছু কথা বললেও পরে আলোচনা যা হ'ল সবই জাপানী ভাষায়। এটা বললে ভুল হবে যে, তাঁরা ইংরেজি জানেন না। কেননা, আমরা যখন ইংরেজী বলি তখন তাঁরা প্রায় সকলেই বোঝেন। তবে তাঁদের মনে এমন বিশ্বাস ছিল না যে, ইংরেজী বললে নিজের মনের ভাব স্পষ্ট করে বোঝাতে পারবেন। সেইজন্য যে সব বিজ্ঞানী ও দার্শনিক সেখানে উপস্থিত ছিলেন তাঁরা সকলেই জাপানী ভাষাতেই নিজের মনোভাব প্রকাশ করেছিলেন। দেখা গেল, শুদ্ধ দার্শনিক তত্ত্ব কিংবা বর্তমান বিজ্ঞানের উচ্চ স্তরের কথা সবই জাপানী ভাষায় বলা সম্ভব এবং জাপানী কথায় তা বলবার জন্য লোকে ব্যগ্র।"[৪৮]

কেবলমাত্র জাপানে নয়, বিশ্বের সমস্ত দেশে মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা তিনি লক্ষ্য করেছেন। সত্যেন্দ্রনাথ লিখেছেন, "অন্য দেশে গেলে একটি জিনিস চোখে পড়ে। সব দেশেই চেষ্টা চলছে মাতৃভাষার মাধ্যমে, যে ভাষা সবাই বোঝে তার উপর বনিয়াদ করে, শিক্ষার ব্যবস্থা করবার। সব জায়গায় এই রীতি চালু রয়েছে।"[৪৯] রবীন্দ্রনাথও বলেছেন, "অন্য স্বাধীন দেশের সঙ্গে আমাদের একটা মস্ত প্রভেদ আছে। সেখানে শিক্ষার পূর্ণতার জন্যে যারা দরকার বোঝে তারা বিদেশী ভাষা শেখে। কিন্তু বিদ্যার জন্যে যেটুকু আবশ্যক তার বেশি তাদের না শিখলেও চলে। কেননা তাদের সমস্ত কাজই নিজের ভাষায়। আমাদের দেশের অধিকাংশ কাজই ইংরেজি ভাষায়।"[৫০]

সুতরাং স্বাধীন ভারতে ইংরেজি-অধীনতা থেকে মুক্ত একটা সুস্পষ্ট ভাষা-নীতি অনুসরণের জন্য প্রথম শ্রেণী থেকে ডিগ্রি স্তর পর্যন্ত ভাষা-শিক্ষা বিষয়ে রাধাকৃষ্ণণ কমিশন পরামর্শ দিয়েছেন। প্রাক্ নবম-দশম স্তরের ভাষা-চর্চা সম্বন্ধে তাঁরা বলেছেন, "**প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্ররা কেবলমাত্র মাতৃভাষা শিখবে।** ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত মাতৃভাষা ও রাষ্ট্রীয় ভাষায় গুরুত্ব আরোপ করতে হবে (মোটা হরফ লেখকের। কেবলমাত্র কোঠারি কমিশন নয়, রাধাকৃষ্ণণ কমিশনও প্রাথমিক স্তরে কেবলমাত্র একটি ভাষা-শিক্ষার কথা বলেছেন। অথচ একালের পরান্নভোজীরা সব ইতিহাস ভুলে গিয়ে প্রাথমিক স্তরে ইংরেজীভাষা শেখানোর দাবিতে রাস্তায় বসেছেন —লেখক)।"[৫১] বিজ্ঞানসম্মত ভাষানীতির পরিবর্তে রাজনৈতিক স্বার্থে কমিশন নবম শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত ত্রিভাষা নীতি অনুসরণের পরামর্শ দিয়েছেন। নবম-দশম শ্রেণীর ক্ষেত্রে তাঁদের অভিমত হ'ল "(১) মাতৃভাষা (নির্ভুল ও কার্যকরভাবে

ভাষা ব্যবহার ও নির্বাচিত সাহিত্যের পরিচিতি ও রসগ্রহণ)। (২) রাষ্ট্রভাষা (জ্ঞান ও সরল প্রাত্যহিক কাজকর্মে ব্যবহার) অথবা প্রাচীন অথবা আধুনিক ভারতীয় ভাষা (তাদের জন্য মাতৃভাষা যাদের রাষ্ট্রভাষা)। (৩) ইংরেজি (বোঝা ও সরল রচনা)।"[৫২] একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণীর (ইণ্টারমিডিয়েট) জন্য কমিশন পরামর্শ দিয়েছেন, "(১) মাতৃভাষা। (২) রাষ্ট্রভাষা অথবা প্রাচীন অথবা আধুনিক ভারতীয় ভাষা (তাদের জন্য মাতৃভাষা যাদের রাষ্ট্রভাষা)। (৩) ইংরেজি।"[৫৩] ডিগ্রি-স্তরের কলা ও বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রদের (পাশ ও অনার্স) জন্য কমিশন সুপারিশ করেছেন, "কলা ও বিজ্ঞানের পাশ ও অনার্সের ছাত্রছাত্রীদের পড়তে হবে —(১) রাষ্ট্রভাষা অথবা তা যদি মাতৃভাষা হয়, তাহলে প্রাচীন কিংবা আধুনিক ভারতীয় ভাষা ; (২) ইংরেজিভাষা।"[৫৪]

উচ্চতর স্তরে কোন্ ভাষার মাধ্যমে বিদ্যাদান করা হবে —সে-প্রশ্নের উত্তরে রাধাকৃষ্ণণ কমিশন বলেছেন, "(৩) উচ্চতর শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে যত শীঘ্র সম্ভব ইংরেজির পরিবর্তে একটি ভারতীয় ভাষাকে গ্রহণ করতে হবে ; কিন্তু বিশেষ বিশেষ অসুবিধার জন্য সংস্কৃত ভাষাকে গ্রহণ করা সম্ভব নয়। (৪) (i) উচ্চতর মাধ্যমিক অথবা বিশ্ববিদ্যালয়-স্তরে ছাত্রদের তিনটি ভাষার সঙ্গে পরিচিত হতে হবে, —আঞ্চলিক ভাষা, রাষ্ট্রভাষা ও ইংরেজিভাষা (শেষোক্তটির উদ্দেশ্য হ'ল, ইংরেজি বই পড়ার ক্ষমতা অর্জন করা) ; এবং (ii) আঞ্চলিক ভাষায় উচ্চতর শিক্ষা দিতে হবে ; এর সঙ্গে রাষ্ট্রভাষায় কিছু বিষয় অথবা সমস্ত বিষয় পরীক্ষা দেওয়ার অধিকার দিতে হবে।"[৫৫]

কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কমিশনের সুপারিশ অনুসারে বিশ্ববিদ্যালয়-স্তরের শিক্ষার মাধ্যম-রূপে কি মাতৃভাষা স্বীকৃতি পেয়েছিল ? কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্যসরকারগুলি ত্রিভাষা প্রচলনে যে-পরিমাণে উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন, মাতৃভাষা প্রবর্তনে কি সেই চেষ্টা ছিল ? তাঁরা কি আঞ্চলিক ভাষার উন্নয়নে কোনো সার্বিক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন ? উচ্চতর শিক্ষা বিস্তৃতির জন্য যা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, দুর্ভাগ্যবশত সে-বিষয়ে বিশেষ কোনো কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়নি। ফলে ১৯৬৪-৬৬ সালের শিক্ষা কমিশন পুনরায় সুপারিশ করেছেন, "বিশ্ববিদ্যালয়-স্তরে শিক্ষার মাধ্যম-রূপে আঞ্চলিক ভাষা প্রবর্তন করা উচিত।"[৫৬] কারণ "আমরা জোরালো ভাষায় বলতে চাই যে ক্লাস-ঘর ও পরীক্ষার মাধ্যম সাধারণত একই হওয়া উচিত। বর্তমান ব্যবস্থায় ছাত্রসমাজের বৃহদংশ ডিগ্রি-স্তরের ও তার পরবর্তীকালের পরীক্ষায় আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার করেন, যদিও ক্লাস-ঘরে ইংরেজির মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হয়। শিক্ষাগত দিক

থেকে এই পদ্ধতি অসন্তোষজনক। ...যতদিন পর্যন্ত প্রশাসনের উচ্চতম পদগুলির চাকরির জন্য ইংরেজিভাষায় দক্ষ ছাত্ররা সুযোগ লাভ করবেন, ততদিন পর্যন্ত ছাত্রসমাজের একটি নির্দিষ্ট অংশ ইংরেজিভাষায় শিক্ষাগ্রহণকে যদি পছন্দ করেন তাহলে সেটা আশ্চর্যের কিছু নয়।"[৫৭]

শিক্ষা কমিশনের সুপারিশ সত্ত্বেও শাসকশ্রেণী প্রশাসন-যন্ত্রে আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহারে প্রয়াসী হলেন না এবং আত্মসর্বস্ব ইংরেজি-শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীরা উচ্চতর শিক্ষায় শ্রেণী-আধিপত্য বিলুপ্ত হওয়ার আশঙ্কায় ইংরেজির মাধ্যমে শিক্ষাদানের নীতি পরিত্যাগ করলেন না। ইংরেজিভাষা পণ্ডিতদের-বিত্তবানদের ভাষা, বিত্তহীনদের মাতৃভাষাকে স্বীকৃতি দিয়ে ইংরেজিভাষার কৌলীন্য নষ্ট করতে পরনির্ভর বিদ্বৎজনেরা রাজী নন। তাই স্বাধীন ভারতেও ইংরেজি-ভাষার দাপট অব্যাহত রইল, মাতৃভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হ'ল না। ক্লাস-ঘরে ইংরেজিতে শিক্ষাদানের প্রথা চালু থাকায় ছাত্ররা ইংরেজিভাষায় পরীক্ষা দিতে বাধ্য হতে থাকলেন। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়-স্তরে অপচয় ও বদ্ধতার পরিমাণ হ্রাস হ'ল না—স্বাধীন ভারতের মাটিতে বিদেশী ভাষার যূপকাষ্ঠে অসংখ্য ছাত্র বলি হলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে-কোনো পাঁচ বছরের ডিগ্রি পরীক্ষার ফল বিশ্লেষণ করলে এই সমস্যার গুরুত্ব উপলব্ধি করা যাবে। নিম্নলিখিত পরিসংখ্যান তিনটিতে[৫৮] সে-চিত্র অঙ্কিত হয়েছে :

(ক —১) . এ.

বছর	পরীক্ষার্থী সংখ্যা	উত্তীর্ণ সংখ্যা	অনুত্তীর্ণ সংখ্যা	অনুপস্থিত	বহিষ্কৃত	পাশের হার
১৯৫৬	৬,৯২০	৩,০২৬	৩,৫৬৯	২৮৩	৮	৪৫·৭
১৯৫৭	৯,১৫৭	৩,৬৩৬	৫,০৭১	৪৫০	১৪	৪২·০
১৯৫৮	১২,৫৬৮	৫,৫৯৫	৬,২৯৭	৬১৬	৩০	৪৭·২
১৯৫৯	১৪,১৯৪	৫,২৫৬	৮,০১৯	৮৯৩	২৬	৩৯·৫
১৯৬০	১৭,৩৯১	৪,৯০৬	১২,৪৮৫	১,০০৯	৮৫	৩০·২

(ক —২) বি. এ. পরীক্ষায় একটি বিষয়ে অনুত্তীর্ণ

বছর	ইংরেজিভাষা	মাতৃভাষা	সংস্কৃত	ইতিহাস	অর্থনীতি	দর্শন	অঙ্ক
১৯৫৬	১,০৯৬	৭৬	৭২	১২৮	২০৭	৭১	৩১
১৯৫৭	১,২০৭	২৭৩	৭৫	২৮২	৩৩১	২১৩	৭১
১৯৫৮	২,১৭৪	২২০	১১	২৬১	৪৮৩	১৭৪	৮৩
১৯৫৯	১,৯২৫	২৩৭	১২২	৪২০	৬০১	১১৯	২১
১৯৬০	২,৫৮৯	৫০৯	৪৭	৫৭৮	৭১৮	৩৪	৩১

(ক—৩) বি. এ. পরীক্ষায় একাধিক বিষয়ে অনুত্তীর্ণ

বছর	ইংরেজিভাষা	মাতৃভাষা	সংস্কৃত	ইতিহাস	অর্থনীতি	দর্শন	অঙ্ক
১৯৫৬	২,৬৮৮	৬৭৯	৩৫১	১,১২৭	১,৪৫৮	২৫৮	১৪৮
১৯৫৭	৫,৩৭৩	১,৪৭৭	৩৪৮	২,৩১০	২,১০৩	৩৩৪	২০৮
১৯৫৮	৪,৬১৬	১,৩৯৬	৩৩৮	২,২৩৯	২,৮৩৯	৩৮১	২৬৮
১৯৫৯	৫,৭৭৮	২,৩৩৮	৪৯০	৩,০৮০	৩,৭৫৭	৩৪৭	১৯৯
১৯৬০	৮,১৭৩	৪,৭২৩	৪৪৭	৪,৫০৭	৫,৬৪৪	৩২৯	২১৬

ক—২-এর সারণীতে দেখা যায়, ইংরেজিভাষায় অনুত্তীর্ণের সংখ্যা সর্বাধিক এবং ক—৩-এর সারণী বিশ্লেষণ করলে এই সত্যটি উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে যে, ভাষাপত্রগুলিতে শতকরা পঞ্চাশ ভাগের বেশী ছাত্র উত্তীর্ণ হতে পারেননি — ভাষাবিষয়গুলিতে ও অন্যান্য বিষয়সমূহে অনুত্তীর্ণের সংখ্যা হ'ল যথাক্রমে ১৯৫৬ সালে ৩,৭১৮ ও ৩,০১৮ ; ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দে ৭,১৯৮ ও ৪,৯৫৫ ; ১৯৫৮ সনে ৬,৩৫০ ও ৫,৭২৭ ; ১৯৫৯ সালে ৮,৬০৬ ও ৭,৩৮৩ ; ১৯৬০ খৃষ্টাব্দে ১৩,৩৪৩ ও ১০,৬৯৬।

পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় ডিভিসনের তুলনায় তৃতীয় ডিভিসনে উত্তীর্ণদের সংখ্যা অনেক বেশী। উচ্চশিক্ষা-স্তরের বিভিন্ন পরীক্ষায় ক্রমবর্ধমান হারে তৃতীয় ডিভিসনে উত্তীর্ণদের সংখ্যাবৃদ্ধি রাধাকৃষ্ণণ কমিশনকে চিন্তিত করেছিল। ডিগ্রি-স্তরের কলা ও বিজ্ঞান শাখার তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণদের দু'বছরের চিত্র তাঁরা নিম্নোক্ত সারণীতে[৫৯] তুলে ধরেছেন :

	বি. এ.				বি. এস-সি.			
	প্রথম বিভাগ	দ্বিতীয় বিভাগ	তৃতীয় বিভাগ	তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণদের শতকরা হার	প্রথম বিভাগ	দ্বিতীয় বিভাগ	তৃতীয় বিভাগ	তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণদের শতকরা হার
১৯৪৪	২৭	৫৫০	২,০৬৬	৭৮	১৯৩	×	৪৮৮	৭২
১৯৪৭	১৩২	×	১,৫৫৩	৮২	২০০	×	৬৭৫	৭৭

১৯৭২ সালে প্রকাশিত এন. সি. ই.আর. টি-র পুস্তকে বলা (পৃঃ ৭৯) হয়েছে, "বিশ্ববিদ্যালয়-স্তরে উচ্চতর হারে অপচয় ও বদ্ধতার প্রধান কারণ হ'ল, বিদেশী ভাষার মাধ্যম ও আবশ্যিক বিষয়-রূপে বিদেশী ভাষা শিক্ষা। ...যাই হোক, আমরা যদি ছাত্রদের জাত ও তাঁদের অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করি,

তাহলে আমরা দেখব যে, খুবই অনগ্রসর সম্প্রদায়ের ছাত্রদের উচ্চতর শিক্ষাক্ষেত্রে আকৃষ্ট করার জন্য মাতৃভাষা সাহায্য করেছে।" নিম্নলিখিত পরিসংখ্যান[৬০] থেকে দেখা যায়, ইংরেজিভাষা-মাধ্যমের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির তুলনায় যে-সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে মাতৃভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম করা হয়েছে, সেখানে উত্তীর্ণের শতকরা হার অনেক ভালো এবং অপচয় ও বদ্ধতার হারও কম :

বি. এ. স্তরে পাশের শতকরা হার (১৯৬৩ ও ১৯৬২ সাপ্লিমেণ্টারি)

			পাশের হার
(ক) বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ —যেখানে শিক্ষার মাধ্যম-রূপে মাতৃভাষা প্রবর্তিত	(i) আলিগড়	—	৮৬·৯
	(ii) গুজরাট	—	৭৮·৭
	(iii) পাঞ্জাবী	—	৬১·৮
	(iv) রাজস্থান	—	৪৯·০
(খ) বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ —যেখানে শিক্ষার মাধ্যম-রূপে ইংরেজিভাষা প্রচলিত	(i) বোম্বাই	—	৬৭·৬
	(ii) কলকাতা	—	৫১·১
	(iii) দিল্লী	—	৫০·৮
	(iv) মাদ্রাজ	—	৩৯·৬

সরকারি ভাষা কমিশনের (১৯৫৬ খৃ:.) প্রতিবেদনেও দেখা যায়, "ভারতীয় ভাষার মাধ্যমে ঐসব জ্ঞানবিজ্ঞান অধ্যয়ন সম্পর্কে আমাদের নিকট যেসব সাক্ষ্যপ্রমাণ আসিয়াছে, তাহাতে দেখিতেছি, যেসব বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন ভারতীয় ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম করা হইয়াছে, সেখানে ছাত্রদের গ্রহণক্ষমতা ও প্রকাশশক্তি উন্নত হইয়াছে। বস্তুত ইহা ছাড়া বিপরীত কোন ফল আশা করা যায় না।"[৬১]

সেইজন্যেই তো ইংরেজিপ্রেমিক বুদ্ধিজীবীদের প্রধান আপত্তি। মাতৃভাষা শিক্ষার মাধ্যম হলে উচ্চতর শিক্ষার সুযোগ পাবেন তাঁরাই, যাঁরা বংশপরম্পরায় এই নাক-উঁচুওয়ালা ভদ্রশ্রেণীর কাছে 'ছোটলোক' বলে বিবেচিত। তাহলে তো তাঁদের আভিজাত্য, কৌলিন্য, সামাজিক মর্যাদা সবকিছুই ধূলাবলুণ্ঠিত হবে। সুতরাং নৈব নৈব চ। 'ছোটলোকেরা' যদি শিক্ষা চায় তবে তাদের বিদেশী ভাষার ফাঁদে ফেলে উচিতমত শিক্ষা দাও যাতে তারা আর কখনো উচ্চতর শিক্ষার স্বপ্ন না দেখে। বেঁচে থাকুক ইংরেজিভাষা শতায়ু হয়ে। অক্ষয়-অব্যয় হয়ে থাকল ইংরেজিভাষার শৃঙ্খল —ছক্কা-পঞ্জাদের কণ্ঠ ইংরেজি-

ভাষার জয়গানে মুখরিত হয়ে উঠল। ১৯৭৮ সালের ভারত-সরকারের গেজেটে বলা হয়েছে, "বিশ্ববিদ্যালয়-স্তরে শিক্ষার মাধ্যম প্রশ্নটি উত্তপ্ত বিতর্ক সৃষ্টি করেছিল। ১৯৪৮-৪৯ খৃষ্টাব্দে রাধাকৃষ্ণণ কমিশন ইংরেজিভাষার পরিবর্তে আঞ্চলিক ভাষা প্রবর্তনের সুপারিশ করেছিলেন। কিন্তু এবিষয়ে সামান্য অগ্রগতি ঘটেছে।"[৬২]

বিশ্ববিদ্যালয়-স্তরে অপচয় ও বদ্ধতা এবং তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণদের সংখ্যা-বৃদ্ধির সমস্যার প্রতিকারকল্পে হার্টগ কমিটির (১৯২৮ খৃঃ) রিপোর্টে বলা হয়েছিল, অনুপযুক্ত ছাত্রদের ভীড়ে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি ভারাক্রান্ত হচ্ছে এবং প্রত্যেক বছরে ছাত্রদের মানের ক্রমশ অবনতি ঘটছে। সুতরাং তাঁদের প্রস্তাব ছিল, অনুপযুক্ত ছাত্রদের উচ্চতর শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ বন্ধ করতে হবে এবং কেবলমাত্র নির্বাচিত মেধাবী ছাত্রদের সে-সুযোগ দেওয়া হবে। রাধাকৃষ্ণণ কমিশন হার্টগ কমিটির প্রস্তাবের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন। অতি-সাধারণ মেধাবিশিষ্ট ছাত্রদের বিশ্ববিদ্যালয়-অঙ্গনে প্রবেশ-লাভের সুযোগ বন্ধ করার উদ্দেশ্যে পরীক্ষা-পাশের ও ডিভিসন-লাভের ন্যূনতম নম্বর বাড়াবার পরামর্শ দিয়ে বলেছেন, "অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ে বি. এ. ও বি. এস-সি. পরীক্ষায় পাশের ন্যূনতম নম্বর হ'ল শতকরা ৩৬; দ্বিতীয় ও প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হওয়ার ন্যূনতম নম্বর হ'ল যথাক্রমে শতকরা ৪৮ ও ৬০। আমরা মনে করি যে, এই শতকরা হার কম। আমাদের গ্র্যাজুয়েটদের কাছ থেকে এর চেয়ে উচ্চতর মান প্রয়োজন। সুতরাং আমরা সুপারিশ করছি যে, সমস্ত প্রথম ডিগ্রি পরীক্ষায় পাশের ন্যূনতম নম্বর হওয়া উচিত শতকরা ৪০ এবং দ্বিতীয় ও প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হওয়ার ন্যূনতম নম্বর হওয়া উচিত যথাক্রমে শতকরা ৫৫ ও ৭০।"[৬৩] এই প্রস্তাবকে রূপায়িত করার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক-নিয়োগ, শিক্ষাদানের মানোন্নয়ন, নির্দিষ্ট সংখ্যক উচ্চ মেধাসম্পন্ন ছাত্রভর্তি ইত্যাদি সুপারিশ করে পাঠ্যবিষয় প্রসঙ্গে তাঁরা বলেছেন যে, ছাত্রদের ভাষা-বিষয় ছাড়া নবম-দশম শ্রেণীর জন্য পাঁচটি বিষয়, একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণীর জন্য তিনটি বিষয় এবং ডিগ্রির জন্য দু'টি বিষয় পড়তে হবে।

রাধাকৃষ্ণণ কমিশন তৎকালে প্রচলিত শিক্ষা-কাঠামোর পরিবর্তে নতুন শিক্ষা-কাঠামো নির্মাণের প্রস্তাব দিয়েছেন। বৃটিশ-শাসনের শেষ পর্যায়ে বাংলাদেশে ডিগ্রি লাভের জন্য শিক্ষার কাঠামো ছিল ১০+২+২ [ম্যাট্রিকুলেশন (১০ বছর), ইণ্টারমিডিয়েট (২ বছর), ডিগ্রি (২ বছর)]। প্রচলিত শিক্ষা-কাঠামোর পরিবর্তে নয়া কাঠামো নির্মাণের জন্য ১৯১৯ সালের স্যাডলার

কমিশনের সুপারিশ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাস্তবায়িত হয়নি ; যদিও ভারতের কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে তা কার্যকরী হয়েছিল। এ বিষয় উল্লেখ করে রাধাকৃষ্ণণ কমিশন বলেছেন, "কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন (১৯১৯) 'শিক্ষা-সংস্কারের জন্য সমগ্র পরিকল্পনার মুখ্য বিষয়'-রূপে ইণ্টারমিডিয়েট কলেজ স্থাপনের সুপারিশ করেছিলেন। এই নতুন ধরণের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ইণ্টারমিডিয়েট কলেজে বর্তমানে উচ্চ বিদ্যালয়ের দু'টি সর্বোচ্চ শ্রেণীকে উচ্চ বিদ্যালয় থেকে পৃথক করে দু'বছরের ইণ্টারমিডিয়েট কোর্সের সঙ্গে যুক্ত করে পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা করাই ছিল এই প্রস্তাবের মূল উদ্দেশ্য।"[৬৪]

স্যাডলার কমিশনের ইণ্টারমিডিয়েট কলেজ-গঠন ও পাঠ্য-সময়সীমার প্রস্তাব রাধাকৃষ্ণণ কমিশনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। ইণ্টারমিডিয়েট কলেজ স্থাপনের প্রস্তাবকে সমর্থন করে তাঁরা বলেছেন, "আমাদের উচ্চ বিদ্যালয় ও ইণ্টারমিডিয়েটের মান উন্নত করার বিষয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের সুপারিশগুলিকে অবহেলার দ্বারা আমরা ইতোমধ্যে ত্রিশ বছর নষ্ট করেছি। একথা আমাদের উপলব্ধি করার সময় হয়েছে যে, আমাদের সমগ্র শিক্ষা-কাঠামোর মধ্যে মাধ্যমিক শিক্ষাই হ'ল দুর্বলতম যোগসূত্র এবং সেকারণে তা সংস্কার করা অত্যন্ত জরুরী।"[৬৫] সুতরাং কমিশনের সুপারিশ হ'ল, "প্রয়োজনীয় সংখ্যক উপযুক্ত শিক্ষক ও শিক্ষা-সরঞ্জাম সহ ইণ্টারমিডিয়েট কলেজ (নবম শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী অথবা ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী সহ) স্থাপন করতে হবে।"[৬৬]

রাধাকৃষ্ণণ কমিশনের মতে ১২ বছরের স্কুল-শিক্ষার শেষে ১৮ বছর বয়সে ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি-শিক্ষার সুযোগ লাভ করবে। তাঁরা বলেছেন, "সুতরাং আমরা সুপারিশ করছি যে, ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের মান রূপে গ্রহণ করা উচিত। সাধারণত ১৮ বছর বয়সের একটি ছাত্র স্কুল ও ইণ্টারমিডিয়েট কলেজে শিক্ষার শেষে এই পরীক্ষা দিতে পারবে।"[৬৭]

ডিগ্রি-স্তরের পাঠ্যসময়ের জন্য নির্ধারিত দু'বছরের পরিবর্তে তিন বছরের সময়-সীমা নির্দেশ করে কমিশন বলেছেন, "আমরা প্রস্তাব করছি যে, ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয়ে কলা, বিজ্ঞান ও পেশাগত যেমন ডাক্তারি, ইঞ্জিনিয়ারিং ও প্রযুক্তি-বিদ্যার কলেজে বারো বছর স্কুল-শিক্ষার পরে অর্থাৎ বর্তমানে ইণ্টারমিডিয়েট পর্যায়ের শেষে ভর্তি হতে পারে।

"বিজ্ঞান ও কলা বিভাগের পাশ কোর্স বা অনার্স কোর্সের স্নাতক-ডিগ্রির জন্য তিন বছর সুপারিশ করা হয়েছে। অর্থাৎ একজন নিয়মিত ছাত্র স্কুল ও

কলেজে পনেরো বছর শিক্ষার পরে স্নাতক-ডিগ্রি গ্রহণ করতে পারবেন। স্নাতক ডিগ্রি লাভের শেষে অনার্স-শিক্ষার্থীরা এক বছর পরে এবং পাশ কোর্সের ছাত্ররা দু'বছর পরে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করতে পারবেন।

"পাশ ও অনার্সের স্নাতক-ডিগ্রির জন্য তিন বছর সময়-সীমার সুপারিশ করেছিলেন ১৯১৭ সালের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন, কিন্তু তা কার্যকর হয়নি।

"নিম্নের সারণীতে আমরা দেখিয়েছি যে, একটি নির্দিষ্ট পরীক্ষা অথবা ডিগ্রি পরীক্ষা দেবার জন্য একটি ছাত্র কত বছর স্কুলে শিক্ষা গ্রহণ করবে। অধিকাংশ রাজ্যে পাঁচ কিংবা ছ'বছর বয়স থেকে স্কুল-শিক্ষা আরম্ভ হয়।

শিক্ষাদানের বছর-সংখ্যা

(ইংলণ্ড ও আমেরিকার সঙ্গে তুলনীয়)

ডিগ্রি-পরীক্ষাগুলির জন্য একটি নিয়মিত ছাত্রের সাধারণ সময়-সীমা

দেশ	ম্যাট্রি-কুলেশন	ইণ্টারমিডিয়েট অথবা অনুরূপ স্তর	স্নাতক ডিগ্রি	স্নাতকোত্তর ডিগ্রি	ডক্টরেট
ভারতবর্ষ (বর্তমানে প্রচলিত)	১০	১২	১৪	১৬	১৮
ভারতবর্ষ (ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তাবিত)	১০	১২	১৫	১৬ (অনার্সের জন্য) ১৭ (পাশ কোর্সের জন্য)	১৮
ইংলণ্ড	...	১৩	১৬	১৭	১৮
আমেরিকা	১২	১৪	১৬	১৭	১৯

"[৩৮]

উচ্চশিক্ষার কাঠামো-নির্মাণে রাধাকৃষ্ণণ কমিশন ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের স্যাডলার কমিশনের প্রস্তাব সমর্থন করলেও তা সম্পূর্ণভাবে কার্যকরী হ'ল না। বিশ্ব-

বিদ্যালয়ের বি. এ. ও এম. এ.-র মানোন্নয়নের জন্য নবম শ্রেণী কিংবা ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে ইণ্টারমিডিয়েট পর্যন্ত শিক্ষাস্তরকে একটি স্বতন্ত্র পর্ষদের পরিচালনাধীনে আনয়নের প্রস্তাবের কিছু অংশ বাস্তবায়িত হ'ল। দশম শ্রেণী পর্যন্ত স্কুল-শিক্ষা পরিচালনার জন্য ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষা আইন প্রবর্তিত হয়। পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ গঠিত হয় এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ ১১০০টি উচ্চ বিদ্যালয় পর্ষদের পরিচালনাধীন হয়। স্কুলের সর্বশেষ পরীক্ষা ম্যাট্রিকুলেশনের নাম পরিবর্তন করে 'স্কুল ফাইন্যাল' রাখা হয় এবং ১৯৫২ সালে প্রথম দল স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষা দিয়েছে।

রাধাকৃষ্ণ কমিশনের বিচার্য বিষয়গুলি প্রধানত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাস্তরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। তাঁরা প্রসঙ্গক্রমে মাধ্যমিক শিক্ষা-স্তর সম্পর্কে মন্তব্য করলেও মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থার বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেননি। কারণ এবিষয়ে অনুসন্ধান করার কোনো ক্ষমতা তাঁদের ছিল না। অথচ শিক্ষার কাঠামো নির্মাণে, ভাষা-নীতি প্রণয়নে, পাঠ্য বিষয় নির্ধারণে মাধ্যমিক শিক্ষা-ব্যবস্থার পর্যালোচনা অত্যাবশ্যক ছিল। এ বিষয়ে পরামর্শদানের জন্য ১৯৪৮ সালে কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা পর্ষদ মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন গঠনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে সুপারিশ করেছিলেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার কমিশন গঠন না করে শিক্ষা-উপদেষ্টা ডঃ. তারাচাঁদের সভাপতিত্বে একটি কমিটি গঠন করেছিলেন।

মাধ্যমিক শিক্ষাকাল সম্পর্কে স্যাডলার কমিশনের প্রস্তাব সমর্থন করে তারাচাঁদ কমিটি বলেছেন, ডিগ্রি কোর্সে ভর্তির পূর্বে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার সময়-সীমা ১২ বছর হওয়া উচিত। সমগ্র শিক্ষাকালটিকে তাঁরা নিম্ন বুনিয়াদি, উচ্চ বুনিয়াদি ও মাধ্যমিক —এই তিনটি স্তরে ভাগ করেছেন। নিম্ন বুনিয়াদি শিক্ষার জন্য পাঁচ বছর, উচ্চ বুনিয়াদি বা প্রাক্-মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য তিন বছর এবং মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য চার বছর থাকবে। মাধ্যমিক পাঠক্রমকে বহুমুখী করার জন্য তাঁরা বহুসাধক উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পরামর্শ দিয়েছেন।

ভাষা-বিষয়ে উক্ত কমিটির প্রস্তাবে বলা হয়, "নিম্ন বুনিয়াদি শিক্ষার শেষে রাষ্ট্রভাষা শিক্ষা আরম্ভ করা উচিত এবং তা বাধ্যতামূলকভাবে সমগ্র প্রাক্-মাধ্যমিক শিক্ষাকালে চর্চা করা উচিত। তারপরে রাষ্ট্রভাষা শিক্ষাকে ঐচ্ছিক করা যেতে পারে। যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মাধ্যম-রূপে ইংরেজিভাষা থাকবে না, তখন মাধ্যমিক স্তরে রাষ্ট্রভাষা আবশ্যিক বিষয় হওয়া উচিত।"[৬৯]

কমিশনের পরিবর্তে কমিটি গঠিত হওয়ায় ভারতের শিক্ষাবিদেরা সন্তুষ্ট হতে

পারেননি। ইতোমধ্যে রাধাকৃষ্ণন কমিশনের প্রতিবেদন প্রকাশিত হওয়ায় মাধ্যমিক-স্তরের শিক্ষা-সমস্যা নিয়ে সামগ্রিক পর্যালোচনার জন্য একটি পৃথক কমিশন গঠনের প্রয়োজন তীব্রভাবে অনুভূত হয়। অবশেষে শিক্ষাবিদ্‌দের আন্দোলনের ফলে ভারত-সরকার ১৯৫২ খৃষ্টাব্দের ২৩ সেপ্টেম্বর মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ. এ. লক্ষণস্বামী মুদালিয়র-এর সভাপতিত্বে মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন গঠন করেন এবং পরবর্তী বছরের জুন মাসে কমিশনের রিপোর্ট প্রদত্ত হয়।

অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন না ঘটলে, সামাজিক অবস্থা পরিবর্তিত না হলে মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থার সম্প্রসারণ সম্ভব নয়। শিক্ষা মুষ্টিমেয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে, শিক্ষার আলো গিয়ে পৌঁছুবে না গ্রামজীবনের অন্ধকারের মাঝে। তাই শিক্ষার স্বার্থে সর্বাগ্রে প্রয়োজন ছিল জনগণের জীবন ও জীবিকার মানোন্নয়ন। এই সত্যকে অস্বীকার করতে পারেননি মুদালিয়র কমিশন। তাঁরা বলেছেন, "সম্ভাবনায় উজ্জ্বল হলেও বাস্তবে ভারত এখনো দরিদ্র দেশ। **এদেশের বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশকে অর্থনৈতিক দিক থেকে অর্ধ-মানবিক স্তরে বাস করতে হয়।** জরুরী সমস্যাগুলির মধ্যে অন্যতম হ'ল উৎপাদন ক্ষমতার উন্নতি করা ও জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি করা এবং তার দ্বারা **জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান সন্তোষজনক ভাবে উন্নত করা।**"[৭০] [মোটা হরফ লেখকের]

স্কুল-শিক্ষা ও কলেজ-শিক্ষা পরস্পরের সঙ্গে সম্পৃক্ত বলেই মুদালিয়র কমিশন স্কুল-শিক্ষার কাঠামো নির্মাণ বিষয়ে সুপারিশকালে ডিগ্রি-স্তরের শিক্ষাকেও বিবেচনার মধ্যে রেখেছিলেন। মাধ্যমিক-স্তরের সময়-সীমা ও কাঠামোগত বিষয়ে রাধাকৃষ্ণণ কমিশন ও তারাচাঁদ কমিটির প্রস্তাবকে বাতিল করে তাঁরা ১৯৩৪ সালে উত্তরপ্রদেশ সরকার গঠিত সাপ্রু কমিটির সুপারিশকে সমর্থন করেছেন। মাধ্যমিক-স্তরের শিক্ষাকাল বৃদ্ধির সুপারিশ করতে গিয়ে মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন বলেছেন, "বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের পূর্বে তাঁদের জন্য কিছুটা দীর্ঘ সময়ের শিক্ষার প্রয়োজন, যাঁরা উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণ করতে চান এবং যাঁরা মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষা শেষ করতে চান।"[৭১]

রাধাকৃষ্ণণ কমিশনের তিন বছরের ডিগ্রি কোর্সের সুপারিশ গ্রহণ করলেও ইণ্টারমিডিয়েট-স্তরের দু'বছরের শিক্ষাক্রমকে মাধ্যমিক স্তরে নিয়ে আসার প্রস্তাবকে মুদালিয়র কমিশন সমর্থন করেননি। এবিষয়ে তাঁদের অভিমত হ'ল, "অতএব আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি —যা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কমিশনের

এই প্রসঙ্গের অভিমতের সঙ্গেও মিল রয়েছে—যে, বর্তমান ইন্টারমিডিয়েট-স্তরটির বিলুপ্তি, মাধ্যমিক-স্তরের সময়-সীমা একটি বছর বাড়ানো এবং বিশ্ব-বিদ্যালয়-স্তরে তিন বছরের ডিগ্রি কোর্সের পরিকল্পনা বাঞ্ছনীয়।"[১২]

সুতরাং স্কুল ও কলেজের শিক্ষা-স্তর সম্পর্কে সামগ্রিক পর্যালোচনার শেষে মুদালিয়র কমিশনের সুপারিশ হ'ল:

"(৩) বর্তমান ইন্টারমিডিয়েট-স্তরের পরিবর্তে উচ্চতর মাধ্যমিক-স্তর প্রবর্তিত হোক যার শিক্ষাকাল হবে চার বছর। এর ফলে ইন্টারমিডিয়েটের এক বছর অন্তর্ভুক্ত হবে।

"(৪) পূর্ববর্তী সুপারিশসমূহের ফলশ্রুতি হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ডিগ্রি কোর্সের শিক্ষাকাল তিন বছর হওয়া উচিত।

"(৫) যারা উচ্চ বিদ্যালয় (অর্থাৎ দশম শ্রেণী—লেখক) থেকে উত্তীর্ণ হবে তাদের জন্য এক বছরের প্রাক্-বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রমের ব্যবস্থা করা হোক। এক বছরের পাঠক্রম এমনভাবে পরিকল্পিত হোক যাতে ছাত্ররা ডিগ্রি অথবা পেশাগত শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। বুদ্ধিগত কৌতূহলকে জাগ্রত করা, কলেজ-স্তরে অধ্যয়ন বিষয়ে শিক্ষাদান এবং বিশ্ববিদ্যালয়-স্তরে যতদিন ইংরেজিভাষা শিক্ষার বাহন-রূপে গণ্য হবে ততদিন ইংরেজি-চর্চার ওপরে বিশেষ জোর দিতে হবে।"[১৩] শিক্ষার সামগ্রিক কাঠামো সম্পর্কে মুদালিয়র কমিশনের প্রস্তাবে বলা হয় যে, চার বা পাঁচ বছরের প্রাথমিক শিক্ষার শেষে মাধ্যমিক শিক্ষারম্ভ হওয়া প্রয়োজন। উচ্চ বুনিয়াদি বা মধ্য বা নিম্ন-মাধ্যমিক শিক্ষার সময়-সীমা তিন বছর এবং উচ্চ মাধ্যমিকের শিক্ষাকাল চার বছর হওয়া উচিত। আর ডিগ্রি-লাভের শিক্ষাকাল হবে তিন বছর।

মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দে ইন্টারমিডিয়েট শিক্ষা-স্তরের পরিবর্তে ১১ বছরের উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাক্রম এবং ১৯৫৯ সালে প্রাক্-বিশ্ববিদ্যালয় ও ১৯৬০ সনে ত্রৈবার্ষিক ডিগ্রির শিক্ষাক্রম প্রবর্তিত হ'ল। পুরোনো শিক্ষা-কাঠামো পরিবর্তনের প্রয়োজনে কিছুকালের জন্য স্কুল ফাইন্যাল ও প্রাক্-বিশ্ববিদ্যালয়-স্তর বজায় রাখার কথা বলা হলেও তা স্থায়ী রূপ নিল। সরকারি অর্থসাহায্যের অভাবে সমগ্র রাজ্যে এক ধরণের শিক্ষার কাঠামো প্রবর্তিত হ'ল না। নয়া সিদ্ধান্তে নতুন কাঠামো হ'ল: ১১ (উচ্চ মাধ্যমিক) +২+১ (ডিগ্রির প্রথম পর্ব ও দ্বিতীয় পর্ব)। পুরানো কাঠামো ১০ বছরের মাধ্যমিক স্তরও থাকল। মাধ্যমিক পরীক্ষান্তে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি স্তরের ৩ বছরের শিক্ষাক্রমে ভর্তি হবার পূর্বে শিক্ষার্থীকে এক বছরের প্রাক্-বিশ্ববিদ্যালয়

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হ'ত। অর্থাৎ ১০ (স্কুল ফাইন্যাল)+১ (প্রি. ইউ. কিংবা ইউ. ই.)+২+১ (ডিগ্রির প্রথম পর্ব ও দ্বিতীয় পর্ব) — এই ছিল স্নাতক-স্তর পর্যন্ত শিক্ষার আর একটি কাঠামো। কিন্তু তার ফল হ'ল ভয়ঙ্কর। শিক্ষার বিভিন্ন স্তরের মধ্যে শিক্ষণীয় বিষয়ের কোনো সমতা রক্ষা করা হ'ল না; বহুমুখী শিক্ষার নামে পাঠ্যপুস্তকের বোঝা বাড়ানো হ'ল; শিক্ষার ব্যয় বৃদ্ধি ঘটল। উচ্চশিক্ষা সম্প্রসারণের অজুহাতে কেন্দ্রীয় সরকার সুকৌশলে শিক্ষা-সংকোচন করে শিক্ষার ব্যয়ভার চাপিয়ে দিলেন সাধারণ মধ্যবিত্তের কাঁধে। অর্থ দিয়ে শিক্ষা ক্রয় করার সামর্থ্য যাঁদের আছে, তাঁদের ঘরের ছেলেমেয়েরাই বহুমুখী মাধ্যমিক শিক্ষা-গ্রহণের সুযোগ পেলেন।

অর্থনৈতিক সংকট ক্রমেই তীব্র হওয়ায় তার প্রতিক্রিয়া মধ্যবিত্তশ্রেণীর মধ্যেও দেখা দিয়েছে। ব্যবসা-বাণিজ্য ও কালোবাজারী করে একটি ক্ষুদ্র অংশ উচ্চশ্রেণীভুক্ত হয়েছে, অন্য বৃহত্তর অংশটি ক্রমশ সাধারণ মধ্যবিত্ত থেকে নিম্নবিত্ত ও বিত্তহীন হয়ে পড়েছে। শিক্ষাকে সর্বজনীন করার লক্ষ্য না থাকায় উচ্চতর শিক্ষা ক্রমেই উচ্চবিত্তশ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়েছে। বহুমুখী শিক্ষার নামে স্কুল-স্তরে এবং বিজ্ঞান-শিক্ষার অজুহাতে ডিগ্রি-স্তরে শিক্ষার ব্যয়-বৃদ্ধি ঘটেছে। রাধাকৃষ্ণণ কমিশন কিংবা মুদালিয়র কমিশন সর্বস্তরের শিক্ষাকে অবৈতনিক করার প্রস্তাব গ্রহণ করেননি। ফলে শিক্ষার ব্যয়-বৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক সংকটের জন্য উচ্চতর শিক্ষা ক্রমশ মধ্যবিত্তশ্রেণীর নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছিল। তাঁরা মাধ্যমিক স্তরের সর্বশেষ পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের পড়াতে সক্ষম হলেও ইণ্টারমিডিয়েট কিংবা ডিগ্রি-স্তরে তাদের পাঠাতে পারেন না। অকালে ফুল ঝরে যায়; অপচয় ও বদ্ধতার সংখ্যা বাড়ে। নীচের চিত্রটি[৭৪] তারই সাক্ষ্য বহন করছে:

সাল	ম্যাট্রিকুলেশন	ইণ্টারমিডিয়েট	ডিগ্রি (বি. এ., বি. এস-সি. ইত্যাদি)
১৯৩৩	২০,৭৮২	৭,৮৫৫	৩,৭৭৪
১৯৪৭	৬০,৮৪১	২০,০৭৫	৫,৬৫১
১৯৪৮	২৯,৮৩৯	১৩,৬৮৬	৪,০৫৯
১৯৪৯	৩৩,৭৩০	১৯,৭৮৫	৫,৫৫৪
১৯৫০	৩৮,০১৬	২১,৯৮৪	৬,৬৮৮
১৯৫১	৩৮,৪৬৪	২৩,১১৩	৭,৫৬৩

মাধ্যমিক শিক্ষা সম্প্রসারণের জন্য প্রয়োজন ছিল এই স্তরের শিক্ষাকে সর্বজনীন করা। তাহলে মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্তশ্রেণীর আধিপত্য সংকুচিত হ'ত। কিন্তু 'সর্বজনীন মাধ্যমিক শিক্ষা থেকে আমরা বহুদূরে রয়েছি। এমনকি তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষেও ১৪ থেকে ১৭ বছর বয়সের ছেলেমেয়েদের মধ্যে শতকরা ১৮ জন মাধ্যমিক শ্রেণীতে ভর্তির সুযোগ পাবে। অর্থাৎ প্রাথমিক স্তরের তুলনায় মাধ্যমিক-স্তরের শিক্ষার সুযোগ অনেক কম। মাধ্যমিক শিক্ষা এখনো পর্যন্ত অনেকাংশে শহরকেন্দ্রিক এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ হ'ল ছেলেরা। শহরের অধিবাসী উচ্চ ও মধ্যবিত্তশ্রেণীভুক্ত ছেলেরা মাধ্যমিক শিক্ষার সুযোগ পায়।'[৭৫]

এঅবস্থায় ভারতীয় শিক্ষাবিদ্দের মতে "বৃটিশ-যুগে এর প্রধান লক্ষ্য ছিল দু'টি —(১) বিশ্ববিদ্যালয়-স্তরে প্রবেশের জন্য শিক্ষার্থীকে প্রস্তুত করা এবং (২) ইংরেজিভাষা শিক্ষা। ১৯২১ সালের পরে মাধ্যমিক শিক্ষাক্রমকে বহুমুখী করা এবং বৃত্তিমূলক পাঠক্রম প্রবর্তন করার জন্য কয়েকটি উৎসাহশূন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছিল। কিন্তু বিশেষ কোনো ফল হয়নি। মুদালিয়র কমিশনের রিপোর্ট সত্ত্বেও স্বাধীনতা-উত্তর যুগে এই অবস্থার কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। একইভাবে চলেছে। **প্রকৃতপক্ষে ১৯৪৭ সালে যে অবস্থা ছিল আজকের অবস্থা তার চেয়েও খারাপ।**"[৭৬] [মোটা হরফ লেখকের]

বহু ভাষাভাষীর দেশ ভারতবর্ষে বৃটিশ-যুগে ছিল ইংরেজির আধিপত্য। স্বাধীন ভারতে দেখা দিল ইংরেজিভাষার সঙ্গে হিন্দীভাষার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা। দেবনাগরী লিপির হিন্দী ভারতীয় সংবিধানের ৩৪৩ নং ধারায় রাষ্ট্রভাষা-রূপে ঘোষিত হ'ল। সুস্পষ্ট ভাষানীতির অভাবে বিভেদ-বুদ্ধির অঙ্কুরোদ্গম ঘটল এবং রাজনৈতিক স্বার্থান্বেষী মহলের পৃষ্ঠপোষকতায় অচিরেই তা শাখা-প্রশাখা বিস্তার করল। স্বাধীনতা-আন্দোলনের কালে সমস্ত রাজ্যের বিভিন্ন ভাষা-ভাষী মানুষের মধ্যে যোগাযোগের ভাষা হিসেবে হিন্দী স্বাভাবিক গতিতে স্থান গ্রহণ করছিল। কিন্তু স্বাধীনতোত্তর ভারতে হিন্দীওয়ালাদের অত্যুগ্র উৎসাহে অহিন্দীভাষী মধ্যবিত্তশ্রেণীর মনে তীব্র প্রতিক্রিয়া ঘটে। মাতৃভাষা কিংবা আঞ্চলিক ভাষার উন্নয়নে কেন্দ্রীয় সরকারের উপেক্ষার মনোভাব এবং হিন্দী ও ইংরেজির প্রতি তাঁদের অহেতুক আনুকূল্য জনচিত্তে প্রবল সন্দেহ সৃষ্টি করে। তদুপরি রাধাকৃষ্ণণ কমিশনের ত্রিভাষা-শিক্ষাদানের প্রস্তাব অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দেয়। ফলে হিন্দীর আধিপত্য প্রতিরোধের জন্য অহিন্দীভাষী মধ্যবিত্তশ্রেণী নিজেদের ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির চর্চা না করে ইংরেজিভাষা-শিক্ষায় আগ্রহী

হলেন। মাধ্যমিক শিক্ষা-স্তরে হিন্দী ও ইংরেজিভাষা-চর্চার বিষয়ে বিভিন্ন রাজ্যের অধিবাসীদের মধ্যে মতবিরোধের মীমাংসা না হলে সর্বনাশের সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে —প্রাদেশিকতা-আঞ্চলিকতার মনোভাব ছড়িয়ে পড়লে খণ্ডিত ভারত বহুধাবিভক্ত হবে। এবিষয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে মুদালিয়র কমিশন বলেছেন, "সাম্প্রতিককালে প্রাদেশিকতা, আঞ্চলিকতা ও অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থের অনাকাঙ্ক্ষিত মনোভাব বৃদ্ধির ঝোঁক দেখা যাচ্ছে। এই অবস্থা সংকট-জনক পরিণতির দিকে নিয়ে যেতে পারে। সুতরাং জনসাধারণের মনোভাবকে সঠিক পথে চালনার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাবিদদেরও কর্তব্য।"[৭৭]

কিন্তু মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশনও জনমুখীন দৃষ্টিভঙ্গির অভাবে শিক্ষাক্ষেত্রে ভাষা-সমস্যার সমাধানে দিক্-নির্দেশ করতে পারেননি। সমগ্র ভারতে মাতৃভাষা কিংবা কোনো কোনো আঞ্চলিক ভাষা স্কুল-শিক্ষার মাধ্যম হলেও তাঁরা লক্ষ্য করেছিলেন, "যাই হোক, সমস্ত রাজ্যের মাধ্যমিক-স্তরে ইংরেজি আবশ্যিক বিষয়-রূপে রয়েছে।"[৭৮] অর্থাৎ ইংরেজ বিদায় নিলেও ইংরেজিভাষার ভূত এদেশে আসর জাঁকিয়ে বসেছিল। এবং সেকারণেই ভারতীয় ভাষাগুলির তুলনায় ইংরেজিভাষায় অনেক বেশী বই প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৬৪-৬৫ থেকে ১৯৬৬-৬৭ সন পর্যন্ত এদেশে ইংরেজি সহ বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায় প্রতি বছরে গড়ে ২০,০০০ বই প্রকাশিত হয়েছে। এসময়ে ভারতের জনসংখ্যা ছিল ৪৩,৯২,০০,০০০ এবং সমগ্র লোকসংখ্যার শতকরা ২৪ জন অর্থাৎ ১০,৫০,০৮,০০০ জন সাক্ষর। সুতরাং ভারত প্রত্যেক বছরে প্রতি ৫,২৫০ জন সাক্ষরের জন্য একটি বই প্রকাশ করে। কিন্তু ইংরেজি বই বাদ দিয়ে কেবলমাত্র বিভিন্ন দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত পুস্তকের হিসেব করলে নৈরাশ্যকর চিত্র উদ্ভাসিত হয়। নিম্নোক্ত সারণীতে[৭৯] দেখা যায়, প্রত্যেক বছরে এদেশে প্রকাশিত গ্রন্থগুলির প্রায় শতকরা ৫০ ভাগ ইংরেজিভাষায় লিখিত। অর্থাৎ ১০,৫০০ সাক্ষর ব্যক্তির জন্য ভারতীয় ভাষায় একটি বই প্রকাশিত হয়। সমগ্র জনসংখ্যার ভিত্তিতে হিসেব করলে চিত্রটি আরো বেদনাদায়ক হয়ে ওঠে — ৪৪,০০০ জনের জন্য মাত্র একটি বই।

বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত পুস্তক-সংখ্যা

ভাষা	১৯৬৪-৬৫	১৯৬৫-৬৬	১৯৬৬-৬৭
১	২	৩	৪
অসমীয়া	৭৭	৫৪	১১৮

১	২	৩	৪
বাংলা	১,৩০২	১,৪২২	১,১৩৭
ইংরেজি	১০,৪৩৮	১০,৩৪৭	৯,৭৪৫
গুজরাটী	৯৭২	৯২২	১,০৪৯
হিন্দী	২,৬৩৩	২,৩৪৭	২,৭৬৭
কানাড়া	৩০৬	২৪১	৬৮০
কাশ্মীরী	—	১০	—
মালয়ালম	৫৯৫	৫৭৩	৫৮৯
মারাঠী	১,৫১৪	১,৬১২	১,৮৮৫
ওড়িয়া	৩২২	১২০	৪২৫
পাঞ্জাবী	৫৯৭	১৬৭	১৪২
সংস্কৃত	২৭৭	২০৭	১১২
তামিল	৯১০	৯৪৭	৬৭১
তেলেগু	৮১৭	৫১৮	৫৩৮
উর্দু	২৫২	৩৭২	২৩৭
অন্যান্য ভাষা	২৫৩	২৮৭	১৮৫
	২১,২৬৫	২০,১৫৬	১৯,৯৮০

কংগ্রেস-সরকারের ভাষা-বিষয়ক নীতি ভারতের জনগণের মধ্যে বিভেদের বীজ বপনে সহায়ক হয়েছিল। তাঁরা একদিকে আন্তর্জাতিক ভাষার ওজর তুলে অহিন্দীভাষী জনগণকে ইংরেজি-অনুশীলনে উৎসাহ দিয়েছেন, অন্যদিকে রাষ্ট্রভাষার অজুহাতে হিন্দী-চর্চায় উৎকট আগ্রহ দেখিয়ে হিন্দীভাষীদের সন্তুষ্ট করেছেন। অথচ মাতৃভাষা ও আঞ্চলিক ভাষাগুলির প্রতি তাঁদের চরম অবহেলার মনোভাব প্রদর্শিত হয়েছে। তাই মুদালিয়র কমিশন যাতে হিন্দী ও ইংরেজির ওপরে সমমূল্য আরোপ করেন, সেজন্য তাঁদের ওপরে চাপ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকার শঠতাপূর্ণ কৌশল গ্রহণ করেন। তাঁরা হিন্দী ও ইংরেজিভাষার অধ্যাপকদের দু'টি পৃথক সম্মেলন আহ্বান করেছেন। তাঁদের উদ্যোগে ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দের ২০ ও ২১ জানুয়ারি নয়াদিল্লীতে ২৫টি বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দী-বিভাগের অধ্যাপকদের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সেই সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয়, "হিন্দী ও অহিন্দী অঞ্চলের মাধ্যমিক স্কুল-

সমূহে হিন্দীকে আবশ্যিক বিষয়-রূপে শিক্ষাদান যেহেতু লক্ষ্য ···যেখানে জনমত হিন্দীকে আবশ্যিক করার পক্ষে নয়, সেখানে হিন্দীকে নির্বাচিত বিষয় (elective subject) রূপে রাখতে হবে। কিন্তু উচ্চতরশ্রেণীতে উত্তরণের জন্য সেই বিষয়ে উত্তীর্ণ হওয়া আবশ্যিক করতে হবে।"[৮০] বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ইংরেজি ভাষার অধ্যাপকদের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ঐ বছরের ২৩ ও ২৪ জানুয়ারি। সেই সম্মেলনে প্রস্তাব গৃহীত হয়, "মাধ্যমিক-স্তরে ছয় বছরের জন্য আবশ্যিক বিষয়-রূপে ইংরেজি শিক্ষা দেওয়া উচিত।"[৮১]

এই অবস্থায় রাধাকৃষ্ণণ কমিশনের ত্রিভাষা-সূত্রকে সমর্থন করে মুদালিয়র কমিশন স্কুল-শিক্ষার্থীদের কাঁধে ভাষার বিপুল বোঝা চাপিয়ে দিয়েছেন। তাঁরা সুপারিশ করেছেন, "(১) সমগ্র মাধ্যমিক স্তরে মাতৃভাষা অথবা আঞ্চলিক ভাষা শিক্ষার মাধ্যম হবে। তবে ভাষাগত দিক থেকে যাঁরা সংখ্যা-লঘু, কেন্দ্রীয় শিক্ষা-উপদেষ্টা পর্ষদের পরামর্শ-অনুসারে তাঁদের বিশেষ সুবিধা দিতে হবে। (২) মধ্য-স্কুল স্তরে (অর্থাৎ ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী —লেখক) প্রত্যেকটি শিশুকে ন্যূনতম দু'টি ভাষা শিখতে হবে। নিম্ন বুনিয়াদি স্তরের পরে ইংরেজি ও হিন্দী আরম্ভ করতে হবে; তবে একই বছরে দু'টি ভাষা আরম্ভ করা যাবে না। (৩) উচ্চ ও উচ্চতর মাধ্যমিক স্তরে ন্যূনতম দু'টি ভাষা শিখতে হবে; এর মধ্যে একটি মাতৃভাষা অথবা আঞ্চলিক ভাষা।"[৮২] প্রাক্-বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাক্রমে ইংরেজি-শিক্ষার ওপরে বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে, "যতদিন পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়-স্তরে শিক্ষার মাধ্যম-রূপে ইংরেজি থাকবে, ততদিন এই স্তরে ইংরেজি শিক্ষার ওপরে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতে হবে।"[৮৩]

মাতৃভাষা কিংবা আঞ্চলিক ভাষা, রাষ্ট্রভাষা ও ইংরেজিভাষাকে স্কুল-শিক্ষার তালিকাভুক্তির দ্বারা রাজনৈতিক চাপের কাছে নতি স্বীকার করে তাঁরা স্কুল-গুলিকে নির্দেশ দিয়েছেন, "প্রত্যেক স্কুলকে রাষ্ট্রভাষা হিন্দী ও আন্তর্জাতিক ভাষা ইংরেজি শেখাবার ব্যবস্থা করতে হবে। তবে এ ব্যবস্থাও রাখতে হবে, যদি শিক্ষার্থী কিংবা অভিভাবক ইংরেজি শিখতে ইচ্ছুক না হন, তাহলে ইংরেজিকে আবশ্যিক বিষয়-রূপে গণ্য করা হবে না।"[৮৪] তিনটি ভাষা শেখার সুপারিশ করলেও তাঁরা অবশ্য শিক্ষাক্ষেত্রের সর্বস্তরে শিক্ষার মাধ্যম-রূপে মাতৃভাষা কিংবা আঞ্চলিক ভাষা প্রবর্তনের পক্ষে সুপারিশ করেছেন, "সর্বস্তরে শিক্ষার বাহন হবে মাতৃভাষা কিংবা আঞ্চলিক ভাষা।"[৮৫]

তিনটি ভাষার বোঝা যে সাধারণ মেধাসম্পন্ন ছাত্রদের শিক্ষালাভের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে, অর্ধপথেই যে তাঁদের শিক্ষাজীবনের পরিসমাপ্তি ঘটবে,

তা মুদালিয়র কমিশন অস্বীকার করতে পারেননি ; তবুও তাঁরা রাজনৈতিক কারণে ত্রিভাষা-প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন। তাঁরা বলেছেন, "মাতৃভাষা ছাড়া আরো দু'টি ভাষা থাকায় ভাষা-বিষয়গুলি কিছুমাত্রায় ভারী হচ্ছে। কিন্তু আমাদের মত বহু ভাষাভাষীর দেশে এটা অনতিক্রম্য এবং আমাদের ভাষাগত ঐতিহ্যের জন্য এই মূল্য আমাদের দিতে হবে।"[৮৬]

এই মূল্য আমাদের দিতে হচ্ছে—একদিকে অনুত্তীর্ণদের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটছে, অন্যদিকে বিচ্ছিন্নতাবোধ সমগ্র ভারতে ছড়িয়ে পড়ছে। তাই তিনটি ভাষা-শিক্ষার মূল্যায়ন করে শ্রী জে. পি. নায়েক বলেছেন, "ত্রিভাষা-সূত্রের ফলাফল সন্তোষজনক নয়। তিনটি পৃথক ভাষা-শিক্ষা ছাত্রদের কাঁধে অসহনীয় বোঝা চাপিয়েছে। যাঁরা ভাষাগত দিক থেকে সংখ্যালঘু, তাঁদের ক্ষেত্রে ভাষার বোঝা বেড়ে গিয়ে চারটি এবং কখনো কখনো পাঁচটি হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং এই সমগ্র সমস্যাটিকে পুনর্বিবেচনার প্রয়োজন।"[৮৭]

কিন্তু ভারত-সরকার ত্রিভাষা-সূত্র সংশোধনের কোনো প্রয়োজন বোধ করেন নি। ভাষা-সমস্যার বৈজ্ঞানিক সমাধান তাঁদের কাম্য ছিল না। ইংরেজ-শাসকদের সাম্রাজ্য-শাসনের আদর্শে জনসাধারণের মধ্যে অনৈক্য-বিভেদ সৃষ্টি করে তাঁরা দেশ-শাসন করতে চেয়েছেন। ফলে হিন্দী ও ইংরেজিভাষার লড়াই তীব্র হয়েছে। প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি সক্রিয় হয়ে উঠে সমগ্র ভারতে বিষাক্ত চিন্তা-ভাবনা ছড়িয়ে দিচ্ছে। মাতৃভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠা কিংবা উপজাতিগুলির ভাষা উন্নত করার প্রশ্ন ভুলে গিয়ে শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণী ক্রমশ প্রাদেশিকতা ও আঞ্চলিকতার মনোভাবে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ছেন এবং তাঁরা সেই ভাবধারা সমাজের সর্বস্তরে ছড়িয়ে দেবার চেষ্টা করছেন। কেন্দ্রীয় সরকার তা বন্ধ করার চেষ্টা না করে ইন্ধন জুগিয়েছেন। বিচারকার্যে, প্রশাসনিক কার্যে, শিক্ষাব্যবস্থায় ও তাঁদের প্রত্যেক কাজকর্মের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে হিন্দীভাষা প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা রাষ্ট্রপতিকে ভাষা কমিশন গঠনের অনুরোধ করেছেন এবং রাষ্ট্রপতি ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দের ৭ জুন বি. জি. খেরের সভাপতিত্বে 'সরকারি ভাষা কমিশন' নিয়োগ করেন এবং ৩১ জুলাই, ১৯৫৬ সালের মধ্যে কমিশনকে ভাষা-সম্পর্কিত রিপোর্ট পেশের নির্দেশ দেওয়া হয়। কমিশন নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যেই রাষ্ট্রপতির কাছে রিপোর্ট উপস্থিত করেন। তবে এই রিপোর্ট সর্বসম্মত ছিল না।

ভাষা কমিশনের বিচার্য বিষয়গুলির মধ্যে শিক্ষাক্ষেত্রে ভাষার স্থান সম্পর্কে কোনো কিছু উল্লিখিত না হলেও কমিশন এবিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করে তাঁদের

সুপারিশ উপস্থিত করেছেন। তাঁরা বলেছেন, "আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার বিভিন্ন স্তরে কি পরিমাণ ভাষাজ্ঞান দিবার আয়োজন থাকা উচিত আমরা কেবল তাহাই সাধারণভাবে বলিব। কতদিন ধরিয়া এবং শিক্ষার সঠিক কোন্ স্তরে বিবিধ উদ্দেশ্যে সবচাইতে ভালোভাবে ভাষাজ্ঞান দেওয়া যাইতে পারে তাহাও মোটামুটি বলিতে চেষ্টা করিয়াছি। সুতরাং, আমরা কেবল সাধারণ মানকে লক্ষ্য করিয়া আমাদের প্রস্তাব করিয়াছি।"[৮৮]

প্রাথমিক-স্তরে ভাষা কমিশন কেবলমাত্র একটি ভাষা —মাতৃভাষা শিক্ষার সুপারিশ করেছেন, "আঞ্চলিক ভাষা সম্পর্কে বক্তব্য এই যে, শিক্ষার্থীরা প্রাথমিক স্তরে একান্তভাবে এই ভাষা শিক্ষা করিবে।"[৮৯] এই স্তরে ইংরেজিভাষা-শিক্ষা সম্পর্কে বলা হয়েছে, "যে প্রকার ও পরিমাণ ইংরেজী জ্ঞান প্রাক্-স্নাতক ও স্নাতকদের অপরিহার্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি তাহা বিবেচনা করিয়া আমরা প্রস্তাব করিয়াছি যে, ইংরেজী শিক্ষা মোটামুটি এস. এল. সি-র পাঁচ বৎসর পূর্বে অর্থাৎ শিশুর যখন ১২ বৎসর বয়ঃক্রম তখন হইতে শুরু হওয়া উচিত। সংবিধানের ৪৫ নং অনুচ্ছেদ অনুসারে যেসব শিশু নিঃখরচা ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করিবে তাহার ইংরেজী ভাষা শিক্ষা অপচয় হইবে মাত্র। এই অল্প সময়ে ইংরেজীর মতো সম্পূর্ণ একটি বিদেশী ভাষায় শিক্ষাদানে কোন উদ্দেশ্যসিদ্ধি হইবে না।"[৯০] অর্থাৎ তাঁদের মতে ইংরেজি-শিক্ষা সপ্তম শ্রেণী থেকে আরম্ভ করা উচিত। হিন্দীভাষা-শিক্ষা সম্পর্কে তাঁরা বলেছেন, "আমরা ১৪ বছরের বাধ্যতামূলক বয়ঃসীমার মধ্যে অন্তত তিন-চার বছর সকল শিশুকে ইউনিয়নের ভাষা, হিন্দীভাষা শিক্ষাদান একান্ত আবশ্যক মনে করি।"[৯১] সুতরাং তাঁদের প্রস্তাব হ'ল : "১০ বৎসর বয়ঃক্রম বা মধ্য বিদ্যালয় স্তর হইতে দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে হিন্দী শিক্ষার সূচনা হইতে পারে।"[৯২] অর্থাৎ হিন্দীভাষা-শিক্ষা পঞ্চম শ্রেণী থেকে শুরু করা আবশ্যক।

মাধ্যমিক-স্তরে শিক্ষার মাধ্যম হবে মাতৃভাষা এবং ত্রিভাষা-সূত্র অনুযায়ী হিন্দী ও ইংরেজিভাষা-শিক্ষা বাধ্যতামূলক করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়-স্তরের শিক্ষার বাহন সম্পর্কে ভাষা কমিশন বলেছেন, "সাধারণ শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে ইংরাজী হইতে ভারতীয় ভাষাসমূহে পরিবর্তন আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে অদূর ভবিষ্যতে ক্রমশ হইবে।...প্রাক্-স্নাতক যেখানে কাজ চালাইবার মতো হিন্দীজ্ঞান লইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে আসিতেছে, সেখানে পূর্বোক্ত সকল কথা বিবেচনান্তে, আমরা মনে করি না যে, অহিন্দী এলাকাসমূহে বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে হিন্দীকে শিক্ষার মাধ্যম রূপে গ্রহণ কোন প্রকারে অসম্ভব।"[৯৩] সুতরাং তাঁদের সুপারিশ হ'ল,

"(ক) স্ব স্ব বিশ্ববিদ্যালয়ে সাধারণ শিক্ষা' মাধ্যম আঞ্চলিক ভাষা অথবা হিন্দী হইবে তাহা স্থির করার স্বাধীনতা বিশ্ববিদ্যালয়গুলিরই থাকা উচি।

"(খ পরস্পরের সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়া আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় পার্ষদের মতো সংস্থার সাহত যথারীতি আলোচনান্তে, কোন্ ফ্যাকাল্টিতে, বিশেষ করিয়া বৃত্তিগত বিষয় ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে এবং কোন স্তরে, বিশেষ করিয়া স্নাত-কোত্তর স্তরে, ইংরেজী ভাষার স্থানচ্যুতিতে একমাত্র হিন্দীই সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার সাধারণ মাধ্যম হইবে তাহা স্থির করার ভার বিশ্ববিদ্যালয়গুলির উপরই ছাড়িয়া দেওয়া যাইতে পারে।"[৯৪]

কিন্তু এই সুপারিশসমূহের সঙ্গে ভাষা কমিশনের সদস্য ডঃ. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও ডঃ. পি. সুব্বারায়ণ একমত হতে পারেননি। একটি পৃথক নোটে ডঃ. চট্টোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন,' সারা ভারতে যে কোন উপায়ে হিন্দী প্রচলনের প্রচ্ছন্ন এবং বেপরোয়া ব্যস্ততার ভাব রিপোর্টের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়।"[৯৫] এই 'বেপরোয়া ব্যস্ততার' জন্য তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন, "সুপারিশগুলি কার্যকর হইবার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের নাগরিকেরা প্রথম শ্রেণীর নাগরিক ও দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক — এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া যাইবে; যাহাদের ভাষা হিন্দী তাহারাই হইবে প্রথম শ্রেণীর নাগরিক এবং তাহারা এই ভাষার জন্যই প্রচুর পরিমাণে বিশেষ সুবিধা ভোগ করিবে। অন্যান্য সকলে হইবে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক, এবং এই ভাষার জন্যই তাহারা চিরস্থায়ী অক্ষমতা ভোগ করিবে।"[৯৬] সেকারণে তিনি ভাষা কমিশনের সুপারিশগুলিকে 'জাতিস্বার্থবিরোধী' বলে অভিহিত করে লিখেছেন, "সত্য বলতে কি, আমি যেন চক্ষুর উপরে এক 'হিন্দী সাম্রাজ্যবাদের' সূচনা দেখিতে পাইতেছি এবং যেহেতু সংখ্যার আধিক্য ছাড়া অন্য কোন ক্ষেত্রে হিন্দী এখনো পর্যন্ত ভারতবর্ষের অন্যান্য ভাষা অপেক্ষা কোনও রূপ প্রাধান্যই অর্জন করিতে পারে নাই, সেইজন্য ইহা হইবে আরও বেশী জাতিস্বার্থবিরোধী।"[৯৭]

কমিশনের অপর সদস্য ডঃ. পি. সুব্বারায়ণও একই অভিযোগ উত্থাপন করেছেন, "রিপোর্টে সমগ্র ভারতবর্ষে হিন্দী প্রচলনের জন্য এক বেপরোয়া ব্যস্ততা প্রকাশিত হইয়াছে।"[৯৮] তাঁর মতে, "ভারতবর্ষের অহিন্দীভাষী জনসাধারণের সম্পর্কে বিন্দুমাত্র সহানুভূতি, চিন্তা বা কল্পনার প্রমাণ নাই।"[৯৯]

এই অভিযোগ কেবলমাত্র কমিশনের দু'জন সদস্যের নয়, রাষ্ট্রভাষা প্রচলন-কারীদের বিরুদ্ধে অহিন্দীভাষী অঞ্চলের শিক্ষিত-সম্প্রদায় একই অভিযোগ করেছেন। কেন্দ্রীয় চাকরির প্রতিযোগিতায় কোণঠাসা হওয়ার আশঙ্কায় এবং

আঞ্চলিক ভাষা-শিক্ষা-সাহিত্য-সংস্কৃতির ওপরে হিন্দীভাষার আধিপত্য বিস্তারের ভয়ে তাঁরা হিন্দীর বিকল্প ভাষা-রূপে ইংরেজিভাষার দিকে ঝুঁকে পড়েছেন। ইংরেজিভাষাকে অবলম্বন করে তাঁরা 'হিন্দী সাম্রাজ্যবাদ'কে প্রতিরোধের চেষ্টা করেছেন। ফলে উচ্চতর শিক্ষাক্ষেত্রে ইংরেজিভাষার আধিপত্য রয়ে গেল; মাতৃভাষা অবহেলিত হ'ল। উচ্চশিক্ষা সম্প্রসারিত হ'ল না —মুষ্টিমেয়ের একচেটিয়া অধিকার অব্যাহত রইল।

অথচ স্বাভাবিক গতিতে অগ্রসর হ'লে এবং ত্রিভাষা-সূত্র চাপিয়ে না দিলে ইংরেজিভাষার পরিবর্তে হিন্দী সংযোজক ভাষা-রূপে অহিন্দীভাষীদের স্বীকৃতি পেত। মাতৃভাষা-চর্চার মাধ্যমে উচ্চতর শিক্ষাজগৎ থেকে ইংরেজিভাষার স্থানচ্যুতি ঘটত —শিক্ষা সম্প্রসারিত হ'ত। কিন্তু সে-অভিপ্রায় শাসকশ্রেণীর ছিল না। তাই একালের শিক্ষাবিদ শ্রীভূদেব চৌধুরী কেন্দ্রীয় সরকারের ভাষানীতি সমালোচনা করে লিখেছেন, "বহু ভাষাভাষী ভারতবর্ষের প্রশাসনিক প্রয়োজনের তাগিদেও, একটি যোগাযোগকারী ভাষার প্রয়োজন প্রথমাবধি আবশ্যিক বিবেচিত হয়েছিল। ঔপনিবেশিক শাসনকালে সে-ভাষা ছিল ইংরেজি; এবং তা বৃহত্তর ভারতের স্বল্পসংখ্যক শিক্ষিত সমাজে সংস্কৃতির —মন দেওয়া-নেওয়া, তথা —মননের আদান-প্রদানের একান্ত মাধ্যমও হয়েছিল। রাজনীতিজীবীদের বিশেষ প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে সংখ্যাগরিষ্ঠের সংঘবদ্ধ চাপে নামমাত্র ভোটাধিক্যের জোরে স্বাধীন ভারতে ইংরেজির বদলে হিন্দি হয়ে গেল সংযোজক ভাষা; ক্রমে তা 'রাষ্ট্রভাষা'র ভূমিকা দাবি করতে করতে আরো পরে সাংস্কৃতিক ভাষার মর্যাদা জবরদখল করতে চাইছে —তার পেছনে সক্রিয় শক্তি এবং স্বার্থ দুই-ই রাষ্ট্রনীতির। ঐখানেই ঔপনিবেশিক শিক্ষার দুর্বল এবং অক্ষম অনুবর্তন-চেষ্টা আমাদের নতুন শিক্ষাব্যবস্থাকে স্বাধীন ভারতেও বিপর্যস্ত করেছে।...অথচ সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে সমাজ কিংবা রাষ্ট্রের প্রয়োজনেও ঐ ভাষা সহজতম যোগাযোগের মাধ্যম হতে পারত; এবং হতে পারত সবচেয়ে অবিতর্কিতও। কিন্তু উত্তর-পশ্চিম ভারতকে এক বৃহৎ জনগোষ্ঠী রাজনীতিক প্রতিষ্ঠার একাধিপত্য কামনা করে ঐ ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা এবং সাংস্কৃতিক ভাষাও করতে চেয়েছেন।...

"আসলে রাষ্ট্র-শক্তির স্বার্থেও সংযোজক ভাষা আর রাষ্ট্রভাষার তফাতটা বিবেচনা করে দেখবার মত। বহুভাষী দেশে প্রতিটি জনগোষ্ঠীর আঞ্চলিক বিকাশ —শিক্ষা, সংস্কৃতি ও রাষ্ট্র প্রয়োজনের সকল ক্ষেত্রেই নিজ নিজ মাতৃভাষার মাধ্যমে হতে পারে। কেবল আন্তরাঞ্চলিক এবং কেন্দ্রীয় যোগাযোগ

ক্ষেত্রেই সংযোজক ভাষার অনায়াস ব্যবহার প্রয়োজনীয়। কিন্তু একটি ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করতে গেলে অপরাপর ভাষার ওপরে তার সাংস্কৃতিক প্রাধান্য এবং নিতান্ত চাকুরিজীবী আমাদের বিদ্বৎ-সমাজে আর্থিক প্রতাপের সম্ভাবনাকেও মেনে নিতে হয়। বস্তুত এই দ্বিতীয়তর কারণেই অহিন্দিভাষী অঞ্চলে হিন্দি বিরোধিতার উৎস নিহিত।"[১০০]

শিক্ষা কমিশন (১৯৬৪-৬৬ খৃ:.) ফ্রান্স, জার্মানি, সোভিয়েট রাশিয়া, জাপান, ইরাণ ইত্যাদি দেশগুলির ভাষা-নীতি উল্লেখ করেছেন। কোনো দেশেই ছাত্রদের তিনটি ভাষা শেখা বাধ্যতামূলক নয়। তাঁদের সযত্ন প্রয়াসে মাতৃভাষা-চর্চায় ছাত্ররা উৎসাহিত হয়েছেন। বৈজ্ঞানিক ভাষানীতির জন্য তাঁদের মাতৃভাষা ও আঞ্চলিক ভাষা এত উন্নত ও সমৃদ্ধ হয়েছে যে, তাঁরা একাধিক ভাষায় সাহিত্য-সৃষ্টিতে সক্ষম। কিন্তু এদেশে কেন্দ্রীয় সরকার-অনুসৃত ভাষা-নীতি ছাত্রদের মাতৃভাষা শিক্ষাতেই নিরুৎসাহিত করছে। চাকরি-নির্ভর মধ্যবিত্তশ্রেণী লক্ষ্য করেছেন যে, রাজ্যের কিংবা কেন্দ্রের সরকারি চাকরির জন্য ইংরেজি কিংবা হিন্দী শিখতে হবে। চাকরিলাভের ক্ষেত্রে মাতৃভাষার কোন প্রয়োজন না থাকায় ছেলেমেয়েরা ১৪ বছর মাতৃভাষা-চর্চা করতে বাধ্য হলেও আন্তরিকতার অভাবে মাতৃভাষায় পারঙ্গম হতে পারছেন না। আবার ইংরেজি বিদেশী ভাষা হওয়ার জন্য তাতে প্রচুর সময় ব্যয় করেও তা আয়ত্ত করতে পারছেন না। তাছাড়া ভাষা-চর্চায় তাঁরা যে-পরিমাণে সময় ও শ্রম ব্যয় করছেন, বিষয়-চর্চায় তা না করায় সে বিষয়গুলিও তাঁদের আয়ত্তাধীন হচ্ছে না। মুদালিয়র কমিশন বৃটিশ-যুগের শিক্ষানীতি সম্পর্কে যা বলেছেন, তা একালেও সত্য। তাঁরা মন্তব্য করেছেন, "তুলনামূলক বিচারে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত ইংরেজি ছিল আবশ্যিক বিষয় ও শিক্ষার মাধ্যম। যে সমস্ত ছাত্রের বিশেষভাবে ভাষাগত দক্ষতা নেই, শিক্ষা-গ্রহণের ক্ষেত্রে তাঁরা প্রবল অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছিলেন। যদি কোনো ছাত্র ইংরেজিতে দক্ষতার পরিচয় দিতে অক্ষম হতেন, তাহলে তিনি যেমন মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারতেন না, তেমনি সরকারি চাকরিও তাঁর জুটত না।"[১০১]

পাঠ্যবিষয়-রচনার ক্ষেত্রে বৃটিশ-ঐতিহ্যকেই অনুসরণ করা হয়েছে। জীবনাভিমুখীন রচনার পরিবর্তে জীবনবিমুখ পাঠ্যপুস্তক রচিত হচ্ছে। বহু বিচিত্র জীবনধারায় সমৃদ্ধ ভারতের সঙ্গে নব্য শিক্ষিতদের কোনো পরিচয়ের সুযোগ নেই। সামন্ত-শৃঙ্খলে আবদ্ধ দেশের শতকরা ৭০ ভাগ দারিদ্রের

সীমারেখার নীচের মানুষের জীবনাচরণ তাঁদের চেতনায় উদ্ভাসিত হওয়ার কোনো পরিচয় পাওয়া যায় না। আত্মকেন্দ্রিক-আত্মসর্বস্ব সমাজবিমুখ শিক্ষা শিক্ষার্থীদের একটি অংশকে শাসক-শোষকশ্রেণীর দাস-রূপে গড়ে তুলছে। 'বিশেষ শিক্ষার গতিকেই দেশ-দেখার চোখ'[১০২] তাঁরা হারিয়েছেন। পাঠ্যবিষয় থেকে লব্ধ জ্ঞান জনজীবনে সেতুবন্ধনের কাজ করল না। প্রচলিত পাঠ্যবিষয়ের অন্তরালে পড়ে রইল 'আমাদের দেশের ইতিহাস, আমাদের স্বজাতির হৃদয়।'[১০৩]

কিন্তু শ্রেণী-বিভক্ত সমাজে এটাই স্বাভাবিক। শিক্ষার কাঠামো যে শ্রেণী-শোষণের দিকে লক্ষ্য রেখেই নির্মিত হয়, ভাষা যে শাসকশ্রেণীর স্বার্থে ব্যবহৃত হয়, শিক্ষণীয় বিষয় যে শাসক-স্তাবক তৈরি করার উদ্দেশ্যেই রচিত হয় এবং সর্বোপরি শিক্ষা যে রাজনীতি-সম্পর্ক বিরহিত নয়, তা স্বাধীন ভারতের শিক্ষা ও ভাষা-নীতি বিশ্লেষণ করলে উপলব্ধি করা যায়। কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন কমিশনের সেই প্রস্তাবগুলিই কার্যকরী করেছেন, যেগুলি ছিল জনস্বার্থ-বিরোধী, অন্যদিকে জনমুখীন সুপারিশসমূহ রূপায়ণে তাঁদের অনীহার মনোভাব পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। কিন্তু কোনো রাজ্য সরকার শিক্ষার উন্নয়নে ব্রতী হলে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরাগভাজন হয়েছেন। ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দে শ্রী ই. এম. এস. নাম্বুদিরিপাদের নেতৃত্বে কেরালার কমিউনিস্ট সরকার রাজ্যের শিক্ষার উন্নয়নে সচেষ্ট হওয়ায় কেন্দ্রীয় সরকার সেই সরকারকে বরখাস্ত করেছেন। ১৯৭৯ সালে পশ্চিমবাংলার বামপন্থী ফ্রন্ট-সরকার শিক্ষা-সম্প্রসারণকল্পে কোঠারি কমিশনের প্রস্তাবসমূহ বাস্তবায়িত করার কাজে প্রয়াসী হলে শিক্ষা-ব্যবসায়ীরা আতঙ্কিত হয়েছেন এবং মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বাধীন বামপন্থী ফ্রন্ট-সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দরবার করেছেন।

মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশনের সুপারিশ অনুসারে মাধ্যমিক স্তরে একাদশ শ্রেণী প্রবর্তন বিষয়ে বহু শিক্ষাবিদ্ বিরুদ্ধ মত জ্ঞাপন করেছিলেন। কিন্তু তাঁদের অভিমতকে কোনো মূল্য না দিয়ে প্রস্তাবকে কার্যকরী করা হয়েছিল। অবশেষে ১৯৬৪ সালের রাজ্য-শিক্ষামন্ত্রীদের সম্মেলনে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল যে, "স্নাতকস্তরে প্রবেশের পূর্বে স্কুল-স্তরে দ্বাদশ শ্রেণী প্রবর্তন করার লক্ষ্য হওয়া উচিত।"[১০৪] ফলে ভারত-সরকার জাতীয় শিক্ষানীতি নির্ধারণ ও সর্বস্তরের শিক্ষার উন্নয়ন বিষয়ে পরামর্শ-দানের জন্য ১৯৬৪ সালের ১৪ জুলাই ডঃ. ডি. এস. কোঠারির সভাপতিত্বে দেশ-বিদেশের সতেরো জন খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ্‌কে নিয়ে শিক্ষা কমিশন (এই কমিশন সভাপতির নামানুসারে 'কোঠারি কমিশন'

নামে সুপরিচিত) গঠন করেন। এবারেই সর্বপ্রথম তিনটি স্তরের শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়ে অভিমত প্রদানের জন্য কমিশনকে অনুরোধ করা হয় এবং তাঁরা ১৯৬৬ সনের ২৯ জুন সরকারের কাছে তাঁদের প্রতিবেদন উপস্থিত করেন। শিক্ষার মাধ্যম, বিভিন্ন স্তরের ভাষা-শিক্ষা, আবশ্যিক বিষয়ের বোঝা, শিক্ষণীয় বিষয়, শিক্ষার কাঠামো প্রভৃতি বিষয়ে কমিশন তাঁদের সুচিন্তিত অভিমত জ্ঞাপন করেছেন।

মাধ্যমিক-স্তরের শিক্ষা-কাঠামো সম্পর্কে শিক্ষা কমিশন মন্তব্য করেছেন যে, মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশনের প্রস্তাবানুযায়ী তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষে দশম শ্রেণীর মাধ্যমিক স্কুলগুলির শতকরা প্রায় ২৫ ভাগ স্কুল একাদশ শ্রেণীর স্কুলে রূপান্তরিত হয়েছে। পুনর্গঠনের ফলে সর্বত্র একই আদর্শে স্কুল ও কলেজগুলির ক্লাস বিন্যস্ত হয়নি। পুনর্গঠনের সময়ে যেমন ছিল, আজও তেমনি বিভিন্ন ধরণের কাঠামো বর্তমান।[১০৫] সুতরাং শিক্ষাক্ষেত্রে এই নৈরাজ্যকর অবস্থার অবসানের জন্য কোঠারি কমিশন নয়া শিক্ষা-কাঠামো নির্মাণের সুপারিশ করেছেন, –

"৩. নতুন শিক্ষা-কাঠামো নিম্নলিখিতভাবে গঠিত হবে

—প্রাক-প্রাথমিক-স্তরের শিক্ষা এক থেকে তিন বছরের ;

—দশ বছরের সাধারণ শিক্ষা এর মধ্যে সাত থেকে আট বছরের প্রাথমিক স্তর (চার কিংবা পাঁচ বছরের নিম্ন প্রাথমিক-স্তর এবং তিন কিংবা দু'বছরের উচ্চ প্রাথমিক-স্তর) এবং সাধারণ শিক্ষার জন্য তিন কিংবা দু'বছরের নিম্ন মাধ্যমিক স্তর কিংবা এক থেকে তিন বছরের বৃত্তিমূলক শিক্ষা (বৃত্তিমূলক পাঠক্রমে ছাত্রভর্তির সংখ্যা সমগ্র ছাত্রসংখ্যার তুলনায় শতকরা ২০ ভাগ বাড়াতে হবে) ;

– সাধারণ শিক্ষার জন্য দু'বছরের উচ্চতর মাধ্যমিক স্তর কিংবা এক থেকে তিন বছরের বৃত্তিমূলক শিক্ষা (বৃত্তিমূলক পাঠক্রমে ছাত্রভর্তির সংখ্যা সমগ্র ছাত্রসংখ্যার তুলনায় শতকরা ৫০ ভাগ বাড়াতে হবে) ;

—উচ্চতর শিক্ষা-স্তরে প্রথম ডিগ্রির জন্য তিন বছরের কিংবা তার বেশী সময়ের পাঠক্রম থাকবে এবং পরবর্তী দ্বিতীয় ডিগ্রি কিংবা রিসার্চের জন্য শিক্ষাকাল বিভিন্ন হবে।

"৪. প্রথম শ্রেণীতে ন্যূনতম বয়স হবে ৬ + ;

"৫. দশ বছরের স্কুল-শিক্ষার শেষে প্রথম পাব্লিক পরীক্ষা হবে ;

"৬. নবম শ্রেণী থেকে সাধারণ শিক্ষাকে বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত করার

ব্যবস্থ ি লুপ্ত করা উচিত এবং দশম শ্রেণী অতিক্রম করার পূর্বে কোনো বিষয়ে বিশেষ অধ্যয়নের প্রচেষ্টা করা উচিত নয়।

"৭. মাধ্যমিক বিদ্যালয় দু'রকমের হবে —দশ বছরের উচ্চ বিদ্যালয় এবং একাদশ অথবা দ্বাদশ শ্রেণীর উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়।

"৮. প্রত্যেকটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করার প্রয়াস বন্ধ করতে হবে। কেবলমাত্র বৃহত্তর এবং অধিকতর যোগ্য বিদ্যালয়গুলি —সমগ্র সংখ্যার এক চতুর্থাংশ —উচ্চতর স্তরে উন্নীত করা যেতে পারে। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে বর্তমানের উচ্চতর বিদ্যালয়গুলির অবস্থা বিচার করতে হবে এবং যে বিদ্যালয়গুলি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উন্নীত হওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হবে না, তাদের নীচের স্তরে নামিয়ে দিতে হবে।

"৯ একটি নতুন উচ্চতর পাঠক্রম, যা একাদশ শ্রেণী থেকে আরম্ভ হবে, প্রবর্তন করা উচিত। একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীতে (এবং পরিবর্তনকালে কেবলমাত্র একাদশ শ্রেণীতে) বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষ অধ্যয়নের ব্যবস্থা করা আবশ্যক। বর্তমানে যে সকল উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে নবম, দশম ও একাদশ শ্রেণীর পাঠক্রম সন্তোষজনকভাবে পঠন-পাঠন হচ্ছে, সেখানে দ্বাদশ শ্রেণী যুক্ত না হওয়া পর্যন্ত বর্তমান ব্যবস্থা চলতে পারে।

"২. (১) ১৯৭৫-৭৬ সালের মধ্যে প্রাক্-বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রম বিশ্ববিদ্যালয় ও অনুমোদিত কলেজগুলি থেকে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে নিয়ে আসা উচিত এবং ১৯৮৫-৮৬ সালের মধ্যে এর পাঠক্রমের শিক্ষাকাল দু'বছর করা উচিত।

"২) প্রাক্-বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা ইন্টারমিডিয়েটের কাজ বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলি থেকে স্কুলে স্থানান্তরকালে ইউ. জি সি. দায়ী থাকবেন।

"৩) একই সঙ্গে রাজ্যের শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক নির্বাচিত বিদ্যালয়গুলিতে স্বয়ংসম্পূর্ণ ইউনিট রূপে উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষা শুরু করা প্রয়োজন এবং সেজন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সাহায্য করতে হবে।

"(৪) উচ্চতর মাধ্যমিক স্তরের দায়িত্ব গ্রহণের জন্য মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদগুলিকে পুনর্গঠনের প্রয়োজন।"[১০৬]

শিক্ষা কমিশন বিশ্বের বহু ভাষাভাষী ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির ভাষা-শিক্ষা পর্যালোচনা করে এদেশে শিক্ষার বাহন ও ভাষা-শিক্ষা সম্পর্কে সুপারিশ করেছেন, —

(ক "নিম্ন প্রাথমিক স্তরে কেবলমাত্র একটি ভাষা-শিক্ষা আবশ্যিক

থাকবে —শিক্ষার্থীদের ইচ্ছানুযায়ী মাতৃভাষা কিংবা আঞ্চলিক ভাষা। ...এই স্তরে আমরা দ্বিতীয় ভাষারূপে ইংরেজি-শিক্ষার পক্ষপাতী নই।"[১০৭]

(খ) "উচ্চ প্রাথমিক স্তরে কেবলমাত্র দু'টি ভাষা-শিক্ষা আবশ্যিক থাকবে —(i) মাতৃভাষা কিংবা আঞ্চলিক ভাষা এবং (ii) রাষ্ট্রভাষা।"[১০৮]

(গ) "নিম্ন মাধ্যমিক স্তরে তিনটি ভাষা-শেখা বাধ্যতামূলক করা প্রয়োজন।"[১০৯]

(ঘ) "উচ্চতর মাধ্যমিক শ্রেণীতে যা উচ্চতর শিক্ষার প্রস্তুতি-স্তর হিসেবে কাজ করবে, কেবলমাত্র দু'টি ভাষা-শিক্ষা আবশ্যিক থাকবে এবং পূর্বে অধীত তিনটি ভাষার মধ্যে যে কোনো দু'টি ভাষা অথবা নিম্নলিখিত গ্রুপ থেকে কম্বিনেশন বিষয়-রূপে পঠিত যে কোনো দু'টি ভাষাকে নির্বাচিত করার অধিকার ছাত্রদের দিতে হবে —(i) আধুনিক ভারতীয় ভাষাসমূহ ; (ii) আধুনিক বিদেশী ভাষাসমূহ ; (iii) প্রাচীন ভাষাসমূহ —ভারতীয় ও বিদেশী।"[১১০]

(ঙ) "বিশ্ববিদ্যালয়-স্তরে ভাষা-শিক্ষা আবশ্যিক করা উচিত নয়।"[১১১]

বিশ্ববিদ্যালয়-স্তরে শিক্ষার মাধ্যম সম্পর্কে শিক্ষা কমিশনের মন্তব্য-প্রস্তাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জাতীয় সংহতির স্বার্থে শিক্ষার নিম্নতম স্তর থেকে উচ্চতম স্তর পর্যন্ত সর্বক্ষেত্রে শিক্ষার মাধ্যম-রূপে আঞ্চলিক ভাষা গ্রহণের জন্য 'ইমোশ্যনাল ইন্টিগ্রেশান কমিটি' যে-প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন এবং যা ১৯৬২ সালের জুন মাসে 'ন্যাশনাল ইন্টিগ্রেশান কাউন্সিল' কর্তৃক সমর্থিত হয়েছে, সেই প্রস্তাব সমর্থন করতে গিয়ে কমিশন বলেছেন, "এই যুক্তি কখনো কখনো দেখানো হয়েছে যে, বিশ্ববিদ্যালয়-স্তরে শিক্ষার মাধ্যম-রূপে একটি ভাষা থাকা উচিত —কিছুকালের জন্য ইংরেজি হলেও চূড়ান্তভাবে হিন্দীভাষা সে-স্থান অধিকার করবে এই কারণে যে, দেশের এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাওয়ার জন্য ছাত্র ও শিক্ষকদের সচল করে তুলবে ; শিক্ষাবিদ্, চাকুরিজীবী ও প্রশাসকদের মধ্যে যোগাযোগ বৃদ্ধি করবে। পুনরায় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে বুদ্ধি ও মেধার সহযোগিতা ঘটবে এবং অন্যভাবে সমগ্র দেশে বুদ্ধিদীপ্ত জীবন-গঠনে সাহায্য করবে। আমরা এই বিষয়টি গভীরভাবে বিবেচনা করে দেখেছি যে, এই সমাধান বাস্তবোচিত নয়। বাস্তবে এর অর্থ হ'ল, উচ্চতর শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষার বাহন-রূপে ইংরেজিভাষাকে অনির্দিষ্টকালের জন্য চলতে দেওয়া। দেশের বৃহত্তর স্বার্থে আমরা এই অবস্থা সমর্থন করতে পারি না। সমগ্র ভারতে শিক্ষার সাধারণ মাধ্যম-রূপে হিন্দী ভাষার প্রবর্তন সম্ভব নয়। অহিন্দী-অঞ্চলগুলিতে এই ভাষা গ্রহণ করার পক্ষে অসুবিধা রয়েছে এবং সম্ভবত তা বাধাপ্রাপ্ত হবে। সুতরাং বিশ্ববিদ্যালয়-স্তরে

শিক্ষার বাহন-রূপে আঞ্চলিক ভাষা প্রবর্তনের সপক্ষে বর্তমান মনোভাবের বিরোধিতা করা এবং উচ্চতর শিক্ষাক্ষেত্রে একটি সাধারণ মাধ্যমের জন্য জোর করা অবিবেচনার কাজ হবে।"[১১২]

সুতরাং শিক্ষা কমিশনের সিদ্ধান্ত হ'ল, "আঞ্চলিক ভাষায় শিক্ষার সুবিধা সম্পর্কে আমাদের দৃঢ় প্রত্যয় জন্মেছে। দেশের অগ্রগতি ও শিক্ষার গুণগত মান উন্নতির পক্ষে আঞ্চলিক ভাষার প্রচলন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে আমরা মনে করি। ভুল বোঝাবুঝিকে এড়ানোর জন্য আমরা জোর দিতে চাই যে, এর অর্থ ইংরেজি কিংবা বিশ্বের অন্যান্য ভাষাগুলির চর্চা বন্ধ করে দেওয়া নয়। প্রকৃতপক্ষে আমরা তখনি এই সকল ভাষা থেকে বেশী করে জ্ঞান অর্জন করতে পারবো যখন আমাদের শিক্ষা অধিকতর ফলপ্রসূ ও উপযোগী হবে।"[১১৩] আঞ্চলিক ভাষাকে উচ্চতর-স্তরে শিক্ষার মাধ্যম করা না হ'লে 'ইংরেজিভাষা বিশ্ববিদ্যালয়-স্তরে শিক্ষার প্রধান মাধ্যম-রূপে এবং কেন্দ্রে ও অনেক রাজ্যের প্রশাসনিক ভাষা-রূপে উচ্চতর মর্যাদা ভোগ করবে।'[১১৪]

প্রাথমিক-স্তরে ভাষা-শিক্ষা ও উচ্চতর-স্তরে আবশ্যিক বিষয়-রূপে ভাষা-শিক্ষা সম্পর্কে শিক্ষা কমিশনের সুপারিশ ও তার প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে পরবর্তী দু'টি অধ্যায়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। এখানে কেবলমাত্র এটুকু বলা প্রয়োজন, পশ্চিমবাংলায় একমাত্র শিক্ষার কাঠামো পরিবর্তন ছাড়া তদানীন্তন রাজ্য-সরকার ভাষা-বিষয়ে কমিশনের সুপারিশগুলি কার্যকরী করেননি। উচ্চতর-স্তরে ইংরেজিভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান অব্যাহত ছিল। অথচ কেন্দ্রীয় সরকার কোঠারি কমিশনের প্রস্তাবগুলি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, "বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে শিক্ষার মাধ্যম-রূপে আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহারের জন্য জরুরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।"[১১৫] কেবলমাত্র উচ্চতর-স্তরে নয়, রাজ্য-সরকার প্রাথমিক-স্তরেও স্থিতাবস্থা বজায় রেখেছিলেন; অর্থাৎ মাতৃভাষার সঙ্গে ইংরেজিভাষা-শিক্ষা দেওয়া হচ্ছিল। ফলে শিক্ষার সম্প্রসারণ ঘটল না; অপচয় ও বদ্ধতার সংখ্যা কমল না।

১৯৪৭ সালে ইংরেজরা ভারতবর্ষের প্রশাসন-যন্ত্র থেকে বিদায় নিয়েছে। চৌত্রিশটি স্বাধীনতা দিবস অতিক্রান্ত হলেও রাষ্ট্র-জীবনে ও সমাজ-জীবনে এখনো ইংরেজিভাষার প্রভুত্বের অবসান ঘটেনি। দেশীয় শোষকশ্রেণীর শোষণে-পীড়নে অংশভাগী হওয়ার জন্য ইংরেজিভাষায় শিক্ষিত মুষ্টিমেয় ব্যক্তি ইংরেজি না-জানা সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশকে বিদেশী ভাষার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করতে একান্ত ভাবে অনাগ্রহী হওয়ায় জনসমাজের বৃহত্তম অংশ এখনো মৌন, মূক —

বিদেশী শাসকরা চলে গেলেও শোষণমূলক সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন না হওয়ায় উৎপীড়িত-বঞ্চিত মানুষেরা তাঁদের প্রাণের ভাষায়-মুখের ভাষায় শিক্ষিত হবার সুযোগ পেলেন না।

একাদশ অধ্যায়

এ কলঙ্ক মুছে যাক

১৯৪৭ সালে পশ্চিম বাংলার শাসন-ক্ষমতা লাভ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী-রূপে রাজ্যের কংগ্রেস-নেতা ডঃ. প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ। ত্রিস্তরের সার্বিক শিক্ষা-সংস্কারকল্পে ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে তিনি শিক্ষামন্ত্রী হরেন্দ্রনাথ চৌধুরীর সভাপতিত্বে 'পশ্চিমবঙ্গ স্কুল এডুকেশন কমিটি' গঠন করেছেন। এই কমিটি প্রাথমিক শিক্ষার নয়া পাঠক্রম রচনার জন্য নিম্নলিখিত শিক্ষাবিদ্‌দের নিয়ে উপসমিতি গঠন করেন :

ডাঃ. এন. এন লাহা—সভাপতি
অনাথনাথ বসু
শিক্ষা-অধিকর্তা বা তাঁর নির্বাচিত ব্যক্তি
বিজয়কুমার ভট্টাচার্য
জ্যোতিপ্রভা দাশগুপ্তা
সুজাতা রায়
ডি. এন মিত্র
মীরা দত্তগুপ্তা
ডাঃ. কে. ডি. ঘোষ —সম্পাদক

উক্ত উপসমিতির তৃতীয় অধিবেশনে (১৯৪৮ সালের ১৫ জুলাই) প্রাথমিক স্তরের জন্য নিম্নলিখিত পাঠক্রমটি চূড়ান্তভাবে গৃহীত হয় :

"(১) স্বাস্থ্য শিক্ষা। (২) শরীর চর্চা ও খেলাধূলা। (৩) সামাজিক ও নাগরিক শিক্ষা। (৪ সৃষ্টিমূলক কর্মধারা ও শিল্পকার্য। (৫) গৃহশিল্প, গার্হস্থ্য বিজ্ঞান ও উদ্যানবিদ্যা। (৬) ভাষা ও সাহিত্য। (৭) সরল গণিত। (৮) পরিবেশ পরিচিতি —(ক) ইতিহাস। (খ) ভূগোল। (গ) প্রকৃতি বিজ্ঞান। (৯) কলা, সঙ্গীত ও ছন্দ (১০ নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা।"[১]

১৯২০ সালের পাঠক্রমে ঐচ্ছিক বিষয়-রূপে ইংরেজি থাকলেও উচ্চশিক্ষা গ্রহণেচ্ছুকদের জন্য ইংরেজিকে আবশ্যিক করা হয়েছিল এবং এই নীতি দীর্ঘ

ত্রিশ বছর কার্যকর ছিল। ১৯৫০ সালে এই নীতির পরিবর্তন ঘটে। প্রাথমিক স্তরে ইংরেজিভাষার আধিপত্য খর্ব করে কেবলমাত্র মাতৃভাষা-শিক্ষার ওপরে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল। নয়া পাঠক্রমের 'ভাষা ও সাহিত্য' শীর্ষক অংশে প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত কেবলমাত্র মাতৃভাষা-শিক্ষার কথা বলা হয়েছে। এই স্তরে ইংরেজিভাষাকে দ্বিতীয় ভাষা-রূপে শিক্ষাদানের কথা বলা হয়নি।

প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণ করে ঘোষণা করা হয়, "নব পরিকল্পিত প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে প্রত্যেক শিশুকে ভবিষ্যৎ জীবনের উপযোগী বাস্তব ও মানসিক প্রস্তুতিতে সাহায্য করা এবং প্রত্যেক শিশুর বিভিন্ন ক্ষমতা অনুযায়ী তার ব্যক্তিত্বের সর্বোত্তম বিকাশের সুযোগ দান করা। এই উদ্দেশ্য নিয়ে বিদ্যালয়গুলিতে এমন পাঠ্যক্রমের ব্যবস্থা করতে হবে যাতে···মাতৃভাষার উপর তার যেন এমন অধিকার হয় যাতে সে সুস্পষ্টরূপে চিন্তা করতে এবং মনের ভাব প্রকাশ করতে পারে এবং পাঠে আনন্দ পায় এবং প্রাথমিক শিক্ষা-লাভের পর যদি তার উচ্চতর শিক্ষালাভের সুযোগ নাও ঘটে তবে সে যেন মাতৃভাষায় লিখিত পুস্তক পাঠে আনন্দ পায়, পূর্ণতর জ্ঞানলাভে সমর্থ হয়।"[২]

অর্থাৎ আনন্দ-স্ফূর্তির মধ্য দিয়ে অপরিচিত জগতের সঙ্গে শিশুর পরিচয় ঘটাতে হবে এবং মাতৃভাষার মাধ্যমে 'তার ব্যক্তিত্বের সর্বোত্তম বিকাশের সুযোগ' দিতে হবে। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী বলেছেন, "প্রকৃত কথা এই যে, বাল্যকালের উপযোগী যে শিক্ষা, সে শিক্ষার কেবল একটা অর্থ এবং তাহার কেবল একটা উপায়। সত্য বটে যে, ব্যক্তিভেদে সেই উপায় প্রয়োগের বিধিরও অল্পবিস্তর পরিবর্তন আবশ্যক ; কিন্তু সাধারণ নিয়ম একটা। কেবল বিজ্ঞান বা কেবল ইতিহাস বা কেবল সাহিত্য শিক্ষা দিলে চলিবে না। যেরূপেই হউক, বালকের মনুষ্যত্ব যাহাতে বৃদ্ধি পায়, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। পৃথিবীর এবং চাঁদের, সূর্য্যের, অম্লজানের ও যবক্ষারজানের কতকগুলি সংবাদ আনিয়া মাথায় পুরিয়া দিলে তাহাকে শিক্ষা বলিব না। শিক্ষার উদ্দেশ্য জ্ঞানার্জন নহে, বালক যাহাতে স্বয়ং আপন চেষ্টায় সমর্থ হয় তাহার বিধানের নামই শিক্ষা।"[৩]

প্রাথমিক স্তরে ইংরেজিভাষা শেখানোর দাবি যাঁরা করেছেন, তাঁদের উদ্দেশ্যে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর ভাষায় বলা যায়, "শিশুর সহিত যখন তাহার ভবিষ্যতের বাসভূমির প্রথম সাক্ষাৎ হয়, তখন সকলই তাহার নিকট নূতন ও নূতনত্বের রহস্য ও সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ। কত আগ্রহের সহিত কত ঔৎসুক্যের সহিত সে সেই নূতন পরিচিতের সহিত সম্বন্ধ স্থাপনের জন্য চেষ্টা পায় এবং

সম্বন্ধ স্থাপনে যে একটু সফলতা লাভ করে, তাহাতে তাহার কত আনন্দ উপস্থিত হয়। এমন সময়ে তুমি যদি তাহার ও জগতের মধ্যে দাঁড়াইয়া সেই সম্বন্ধ স্থাপনে বাধা দিতে চাও ও তাহার সেই আনন্দের প্রতিরোধী হও, তাহা হইলে তুমি নিষ্ঠুর ও পাষণ্ড; তুমি যদি সেইরূপ কার্য্যের দ্বারা তাহার হিতাকাঙ্ক্ষী বলিয়া পরিচিত হইতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে তুমি ঘোর মূর্খ।"[৪] কিন্তু ইংরেজি-প্রেমিকেরা 'নিষ্ঠুর ও পাষণ্ড' হলেও 'মূর্খ' নন। তাই স্বাধীনতা-লাভের অব্যবহিত পরে ইংরেজি-বিরোধী চেতনা যখন প্রবল, তখন তাঁরা গা-ঢাকা দিয়েছেন, প্রাথমিক স্তরে ইংরেজি-চর্চা বর্জন করে পাঠক্রম রচিত হলেও কোনো প্রতিবাদ করেননি; সময় ও সুযোগের জন্য তাঁরা অপেক্ষা করেছেন।

রায় চৌধুরী-কমিটির প্রস্তাবিত পাঠক্রম সন্তোষজনক না হলেও শিশুমনের বিকাশের জন্য ইংরেজিভাষা-শিক্ষা বর্জিত হওয়ায় জনগণ তা সমর্থন করেছিলেন। কিন্তু জনশিক্ষা সম্প্রসারণের সঙ্গে কেবলমাত্র ভাষা-প্রশ্ন নয়, অন্যান্য সমস্যাও জড়িত ছিল যেগুলির সমাধান করা ছিল একান্ত আবশ্যক। অথচ রায় চৌধুরী-কমিটি শিক্ষাক্ষেত্রের আমূল পরিবর্তনের জন্য কোনো মৌলিক সংস্কারের পরামর্শ দেননি। যাদের জন্য নিম্ন বুনিয়াদি শিক্ষার আয়োজন, মাধ্যমিক শিক্ষা-সংস্কারের প্রয়াস, তাঁদের জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন ছিল অর্থনৈতিক নিরাপত্তা, বাঁচবার জন্য ন্যূনতম ব্যবস্থা অর্থাৎ ধনতান্ত্রিক কাঠামোতে মানুষ যে সুযোগ-সুবিধা পান, এদেশে সেই ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি প্রবর্তন করা। কিন্তু তার পরিবর্তে কংগ্রেস-নেতৃবৃন্দ যে-মিশ্র অর্থনীতি প্রবর্তন করেছেন, তা প্রকৃতপক্ষে সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতি ও ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির সংমিশ্রণ। ফলে আমাদের দেশ গড়ে উঠল আধা-সামন্ততান্ত্রিক ও আধা-ধনতান্ত্রিক দেশ-রূপে। জমিদারি প্রথার অবসান হ'ল, কিন্তু চাষী পেলেন না জমির মালিকানা। জমিদার-জোতদার-মহাজনেরা সে-জমি বেনামায় রেখে দিলেন। সামন্ততান্ত্রিক শৃঙ্খলা থেকে মুক্তি পেলেন না রিক্ত নিঃস্ব খেতমজুর ও বর্গাদারেরা। এঅবস্থায় ছেলেমেয়েদের নিম্ন বুনিয়াদি শিক্ষা গ্রহণের জন্য স্কুলে পাঠানোর কথা তাঁরা ভাবতেই পারেন না। তাঁরা যে তিমিরে ছিলেন সেই তিমিরেই রয়ে গেলেন—নিরক্ষরতার অভিশাপে জর্জরিত হতে থাকল তাঁদের জীবন। অন্যদিকে তাঁদের অজ্ঞতা-অশিক্ষার সুযোগ নিয়ে সমৃদ্ধ হ'ল গ্রামীণ শোষক-সম্প্রদায় এবং তাঁদের ঘরের ছেলে-মেয়েরাই শিক্ষা-ক্রয়ের সুযোগ পেলেন।

বাস্তবের কঠোর-কঠিন আঘাতে ভেঙে চুরমার হয়ে গেল মেহনতী মানুষের

স্বপ্ন-কল্পনা। ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্টের প্রভাতের সূর্যকে তাঁরা ভেবেছিলেন নতুন দিনের সূর্য — পুরাতনের অনুবর্তন নয়। দ্বিখণ্ডিত পশ্চিম বাংলা। ভ্রাতৃবিচ্ছেদের বেদনায় মানুষের বুক উত্তাল। পূর্ব পাকিস্তান থেকে আগত বাস্তুচ্যুত মানুষের ব্যথায় এদেশের মানুষের হৃদয় ভারাক্রান্ত। তবুও রক্তাক্ত বুকে সংগুপ্ত হয়ে থাকে ভবিষ্যতের আশা, শোষণমুক্ত দেশ গঠনের স্বপ্ন — যেখানে সকলের থাকবে বাঁচার অধিকার, যেখানে সুখী জীবনযাপনের সুযোগ পাবেন সকলে আর বিদ্যাঙ্গন মুখরিত হয়ে উঠবে স্বাস্থ্যোজ্জ্বল শিশুর কলকাকলীতে। চাষী ফিরে পাবেন তাঁর জমি — জমি থেকে উচ্ছেদের সম্ভাবনা হবে চিরতরে অন্তর্হিত ; শ্রমিক পাবেন শ্রমের বিনিময়ে তাঁর ন্যায্য মজুরী ও কাজ পাওয়ার অধিকার — ছাঁটাইয়ের দুঃস্বপ্ন তাঁকে আর অহরহ পীড়িত করবে না। সমাজ ভোগ করবে উৎপাদিত দ্রব্যের মালিকানা। ব্যক্তিগত মুনাফার উৎকট লালসায় জর্জরিত হবে না সমাজ-জীবন। বেকার-সমস্যায় ভারাক্রান্ত হবে না মধ্যবিত্ত-জীবন। বিচ্ছিন্ন হয়ে নয়, শ্রমিক-কৃষকের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়ে মধ্যবিত্ত-শ্রেণীও বাঁচবার সুযোগ পাবেন — অভাব-অনটন-দারিদ্র্যে তাঁদের জীবন বিড়ম্বিত হবে না। ফিরে পাবেন সকলে মাতৃভাষার অধিকার — বিদেশী ভাষা তাঁদের চলার পথকে কণ্টকিত করবে না। প্রাথমিক স্তর থেকে ইংরেজিভাষার বোঝা হবে অপসারিত, উচ্চতর স্তরে মাতৃভাষায় শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ হবে অবারিত। শিক্ষা ক্রয় করা নয়, অবৈতনিক উন্নত মানের শিক্ষালাভের সুযোগ থাকবে সকলের — পরীক্ষা নামক মাংসাশী জন্তুর আক্রমণে শৈশব-জীবন ক্ষতবিক্ষত হবে না।

কংগ্রেস-নেতৃত্বের ওপরে জনগণের অগাধ অবস্থা। কিন্তু স্বাধীনতা প্রাপ্তির তিন বছরের মধ্যেই তাঁরা অবাক বিস্ময়ে দেখেছেন, দেশ-গঠনের কথা ভুলে গিয়ে মন্ত্রিত্বের জন্য কংগ্রেস-নেতাদের মারামারি, একের বিরুদ্ধে অপরের দুর্নীতির অভিযোগ, জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ, নিরাপত্তা আইন জারী, জনগণের প্রতিবাদ-মিছিলে পুলিশের গুলি চালনায় R. W. A. C.-র কর্মী শিশির মণ্ডলের মৃত্যু (১০ ডিসেম্বর, ১৯৪৭ খৃঃ), কমিউনিস্ট পার্টিকে বেআইনী ঘোষণা (২৬ মার্চ, ১৯৪৮ খৃঃ. ও পার্টির মুখপত্র 'স্বাধীনতা' পত্রিকা বাজেয়াপ্ত, অসংখ্য মানুষকে বিনা বিচারে আটক করা, ক্ষমতার দ্বন্দ্বে মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের পরাজয় ও নতুন মুখ্যমন্ত্রী-রূপে ডাঃ. বিধানচন্দ্র রায়ের ক্ষমতালাভ, আমূল ভূমি-সংস্কারে অনিচ্ছা, ব্যবসায়ী-শিল্পপতিদের তোষণ প্রভৃতি ঘটনাতে জনগণ ক্রমশ উপলব্ধি করেছেন, কংগ্রেস-নেতারা শাসন-

কাঠামোর ওপরে 'ইংলণ্ডে নির্মিত' ছাপটি তুলে দিয়ে ভারতে নির্মিত' ছাপটি বসিয়েছেন ; একটি সিংহের পরিবর্তে তিনটি সিংহ এসেছে – ভূস্বামী, শিল্পপতি ও কালোবাজারীদের অবাধ শোষণের রাজত্বে শিক্ষালাভ তো দূরের কথা, বাঁচবার সুযোগ হয়েছে ক্রমশ সংকুচিত। বিগত চৌত্রিশ বছরের ইতিহাস হ'ল বৃদ্ধির ইতিহাস —নিরক্ষরতা বৃদ্ধি, অপচয় ও বদ্ধতার সংখ্যা বৃদ্ধি, ভূমিহীনদের সংখ্যাবৃদ্ধি, ছাঁটাই শ্রমিক ও মধ্যবিত্ত বেকার যুবকদের সংখ্যাবৃদ্ধি, নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি ও পরোক্ষ কর বৃদ্ধি।

ফলে নতুন বাংলা গড়ে উঠল না। উৎপাদন-সম্পর্ক পরিবর্তিত না হওয়ায় শোষণমূলক সমাজ-ব্যবস্থা অব্যাহত রইল। এই ব্যবস্থাকে জীইয়ে রাখার জন্য অর্থ, জমি ও ভাষা বৃটিশ-যুগের মতই কিছু মানুষের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে থাকল। ফলশ্রুতি —১৯৭১ সালের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য উন্নয়ন পরিষদের রিপোর্টে প্রকাশ, পশ্চিমবাংলার শতকরা ৭০ ভাগ মানুষের আয় দারিদ্র-সীমার নীচে। শতকরা ৪৬ ভাগ জমি রয়েছে শতকরা ১০ ভাগ বড় জোতদারদের হাতে ; অন্যপক্ষে সবচেয়ে গরীব ৫০ ভাগ পরিবারের হাতে থেকেছে মাত্র ৪ ভাগ জমি। তফশীলভুক্ত জাতি-উপজাতিদের অবস্থা আরো খারাপ। তাঁদের মধ্যে শতকরা ৬৪ ভাগ পরিবার চাষ করছেন মাত্র শতকরা ১৪ ভাগ জমি। জমির মালিকানা ক্রমেই কেন্দ্রীভূত হচ্ছে অল্প কয়েকজনের হাতে —যারা জমি দেখিয়ে ব্যাঙ্কের ঋণ ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছে, উন্নত চাষের সঙ্গে নানা ধরনের শিল্প-ব্যবসা চালাচ্ছে, অথচ অন্যদিকে বিরাট সংখ্যাধিক্য মানুষ তাঁদের সামান্য এক টুকরো জমি পর্যন্ত নিজেদের মালিকানায় ধরে রাখতে পারছেন না। ভূমিহীন-খেতমজুরের শতকরা হিসাব বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪২ ভাগে। যেখানে ১৯৬১ থেকে ১৯৭১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত দশ বছরে পশ্চিমবঙ্গের লোকসংখ্যা বেড়েছে ২৭ ভাগ, সেখানে ভূমিহীন খেতমজুরের সংখ্যা বেড়েছে ৮৪ ভাগ। এবং তাঁদের আয় ক্রমশ নিম্নগামী। ১৯৬০-৬১ সালে একজন কৃষিমজুরের প্রকৃত আয় ছিল ১·৪৩ টাকা ; ১৯৬৭-৬৮ সনে তা কমে দাঁড়ায় ১·২৭ টাকা। ১৯৭৪-৭৫ সালে তাঁদের মজুরী আরো কমে গিয়ে দাঁড়ায় ·৭১ টাকায়।[৫] সুতরাং যেখানে এই স্বল্প আয়ে জীবনধারণ খুবই কষ্টকর, সেখানে শিক্ষা তাঁদের কাছে বিলাসিতা মাত্র।

'প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারের পথে সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক কি ? ভারত সরকারের পরিকল্পনা কমিশনের উদ্যোগে ১৯৬২ সালে একটি সমীক্ষা চালানো হয়েছিল, গ্রামাঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারের উপর (Problems of

Extension of Primary Education in Rural Areas)। রিপোর্টের একটি অংশে বিভিন্ন ধরণের চাষী পরিবারের শতকরা কত অংশ ছেলেমেয়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যাচ্ছে তার হিসাব দেওয়া হয়েছে। যেসব গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে সেই সব গ্রামের বড় চাষী পরিবার থেকে শতকরা ৮৪.৪ জন, মধ্যম চাষী পরিবার থেকে শতকরা ৭৩.৬ জন, ছোট চাষী পরিবার থেকে শতকরা ৬৪.০ জন এবং ভূমিহীন চাষী পরিবার থেকে শতকরা ৫১.৫ জন। যেসব গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই সেই সব গ্রামের ছেলেমেয়েদের কত অংশ বিদ্যালয়ে যায় তার হিসাবও দেওয়া হয়েছে। বড় চাষী পরিবার থেকে শতকরা ৬৬.০ জন, মধ্যম চাষী পরিবার থেকে শতকরা ৪৮.১ জন, ছোট চাষী পরিবার থেকে শতকরা ৪৬.২ জন এবং ভূমিহীন চাষী পরিবার থেকে শতকরা ৩৫.৬ জন। উল্লিখিত সমীক্ষার রিপোর্টের মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য :

"One of the disturbing findings of the study is the relatively low level of school-going among the children of landless labourers and tenants." (অর্থাৎ সমীক্ষা থেকে লব্ধ বেদনাদায়ক তথ্যগুলির মধ্যে একটি হ'ল, ভূমিহীন খেতমজুর ও প্রজাদের সন্তানদের মধ্যে বিদ্যালয়গামীদের সংখ্যা তুলনামূলক ভাবে কম।)

এই ঘটনার কারণ হিসাবে বলা হয়েছে :

"A study of the reasons for this state of affairs shows that financial difficulties of the parents figure permanently as an inhibiting factor." (অর্থাৎ এই পরিস্থিতির কারণসমূহ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, পিতামাতাদের অর্থনৈতিক দুরবস্থা স্থায়ীভাবে বাধাদানের হেতু হয়ে ওঠে।)

নানারকম আর্থিক সুযোগ-সুবিধা দিয়ে এই সকল পরিবারের ছেলেমেয়েদের কিভাবে বিদ্যালয়ে আনা যায় তা উল্লেখ করে এই রিপোর্টে বলা হয়েছে :

"Even then, there will be another difficulty faced by the children of these weaker sections, namely, the pressure on them to engage in work either to help their parents in occupational jobs or to relieve them from domestic chores (specially for girls). It is difficult to forsee any weakening of this pressure in the near future." (অর্থাৎ তা সত্ত্বেও আর একটি অসুবিধা থাকবে যা এই দুর্বলতর শ্রেণীর সন্তানেরা সম্মুখীন হচ্ছে। যেমন,

পিতামাতাদের পেশাগত কাজে সাহায্য করা কিংবা গৃহস্থালী কাজ থেকে অব্যাহতি দেওয়ার (বিশেষত মেয়েদের ক্ষেত্রে) কাজে নিযুক্ত হওয়ার জন্য তাদের ওপরে চাপ থাকবে। এই চাপকে নিকট-ভবিষ্যতে শিথিল করার বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করা কষ্টকর।)

তাহলে দেখা যাচ্ছে, প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারের সঙ্গে গ্রামের এবং শহরের দারিদ্রের একটা নিকট-সম্পর্ক রয়েছে। দেশের মানুষের আর্থিক অবস্থার অবনতির সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা প্রসারের পথও রুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। এ উপলক্ষে কয়েকটি প্রাসঙ্গিক অর্থনৈতিক সমীক্ষার বক্তব্য উল্লেখ করা যেতে পারে।

পশ্চিমবাংলার অধিবাসীদের আর্থিক অবস্থা অনুসন্ধান করে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য উন্নয়ন পরিষদ একটি রিপোর্টে বলেছেন, পশ্চিমবাংলার অধিবাসীদের শতকরা ৭০ ভাগ দারিদ্রসীমার নীচে পড়ে আছে। ১৯৭১ সালের আদমসুমারিতে দেখা গেছে যে, পশ্চিমবাংলায় যারা খেটে খায় সেই ১২৬ লক্ষ লোকের মধ্যে ৭২·৫ লক্ষ জন বা শতকরা ৫৭·৫ জন কৃষিতে নিযুক্ত এবং মোট কৃষিজীবীদের মধ্যে শতকরা ৪৪·৮ জন ভূমিহীন।

আর একটি হিসাব উল্লেখ করছি। ন্যাশনাল স্যাম্পল সার্ভের (এন. এস. এস.) সর্বশেষ (১৯৭১-৭২) হিসাব থেকে জানা যায়, ভূমিহীন এবং প্রায়-ভূমিহীন (১।৩ বিঘার নীচের জমির মালিক) পরিবার সমগ্র কৃষি-পরিবারের প্রায় ৫৯ ভাগ। এরই পাশাপাশি ১৯৭১-র সেন্সাসের গণনা অনুযায়ী গ্রামে শ্রমক্ষম মানুষের ৩৩ শতাংশ খেতমজুরে পরিণত হয়েছে।

উপরের পরিসংখ্যানগুলির ভিত্তিতে বলা যেতে পারে সাম্প্রতিক কালের বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রী বৃদ্ধির বেশীর ভাগ এসেছে সমাজের অন্যান্য অংশ থেকে। কলকাতা মহানগরী সম্বন্ধেও এই কথাটি সত্য। বেশ কয়েক বছর আগের হিসাব অনুযায়ী এই মহানগরীর প্রায় দেড় লক্ষ শিশু নিরক্ষর এবং এদের বেশীর ভাগই বস্তীবাসী।'[৬]

সুতরাং শিক্ষাও রয়েছে মুষ্টিমেয়ের অধিকারে। প্রাথমিক-স্তরে একটি মাত্র ভাষা-শিক্ষার অধিকার স্বীকৃত হলেও এবং ইংরেজিভাষা বর্জিত হলেও পরবর্তীকালে হিন্দী-ইংরেজির দ্বন্দ্বে ইংরেজিভাষী বাঙালি বুদ্ধিজীবীরা ইংরেজি ভাষার পক্ষে জোর সওয়াল শুরু করেছেন। বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি তাঁদের বিরূপ মনোভাব পরিস্ফুট হয়ে ওঠে যখন তাঁরা বঙ্গ-বিহার সংযুক্তি প্রস্তাবকে সোৎসাহে সমর্থন করেন; অথচ তাঁরা নাকি হিন্দীভাষার আধিপত্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছিলেন। বামপন্থী দলগুলির নেতৃত্বে জনগণের

সুদৃঢ় প্রতিরোধে সেই প্রস্তাব পরিত্যক্ত হয়। কিন্তু বামপন্থী দলগুলিও প্রাথমিক স্তরে কেবলমাত্র মাতৃভাষা-শিক্ষার দাবিতে কোনো আন্দোলন গড়ে তোলেননি। সেই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ইংরেজি-প্রেমিকেরা প্রাথমিক-স্তরে দ্বিতীয় ভাষা-রূপে সরকারিভাবে ইংরেজি প্রচলনের জন্য সচেষ্ট হয়েছেন (বেসরকারিভাবে ইংরেজিভাষা-শিক্ষা দেওয়া হত, বিশেষ করে উচ্চ বিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত প্রাথমিক বিভাগে)। তাঁদের নিরন্তর চাপে বুনিয়াদি শিক্ষাদর্শ পরিত্যক্ত হয়েছে এবং ইংরেজিভাষা প্রাথমিক স্তরে রাজকীয় মর্যাদায় ফিরে এসেছে —ষাটের দশকে প্রবর্তিত হয়েছে ইংরেজিভাষা-শিক্ষা। কেবলমাত্র একটি ভাষায় শিক্ষাদানের জন্য যেটুকু প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার ঘটেছিল, ইংরেজিভাষার বোঝা চাপিয়ে তাকে সংকুচিত করা হ'ল এবং দরিদ্রশ্রেণীর সন্তান-সন্ততিদের প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হ'ল। ফলে এদেশে নিরক্ষরদের সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটেছে। অন্যান্য রাজ্যের সাক্ষর-সংখ্যার তুলনায় পশ্চিমবাংলায় সাক্ষর-সংখ্যা বৃদ্ধির হার অত্যন্ত কম। নিম্নলিখিত পরিসংখ্যান[৭] তারই পরিচয় বহন করছে :

রাজ্য	১৯৫১	১৯৬১	দশ বছরে বৃদ্ধির হার
কেরালা	৪৬·৮	৬০·১৬	১৩·৩৬
মহারাষ্ট্র	২৯ ৮	৩৯·০৮	৯·২৮
মাদ্রাজ	৩১·৪	৩৯·৩৯	৭·৯৯
গুজরাট	৩০·৪৫	৩৫·৭৫	৫·৩০
পশ্চিমবাংলা	২৯·৩	৩৩·০৫	৪·২

'পশ্চিম বাংলার সাড়ে পাঁচ কোটি মানুষের মধ্যে প্রায় ৬৫ শতাংশ নিরক্ষর। তার মধ্যে গ্রামের ৮০ শতাংশ মানুষ নিরক্ষর। শহরের শ্রমিক ও অন্যান্য গরীব মানুষের মধ্যেও নিরক্ষরতার পরিমাণ বিপুল।'[৮] এর ফল হয়েছে মর্মান্তিক। শিক্ষার ক্ষেত্রে পশ্চিমবাংলা ক্রমাগতই পিছিয়ে পড়ছে। যেখানে সমগ্র ভারতের সাক্ষর সংখ্যা বৃদ্ধির হার শতকরা ৫·৩১, সেখানে পশ্চিমবাংলার শতকরা হার ৪·২। ১৯৫১ সালের সেন্সাসে সারা ভারতে সাক্ষরতায় পশ্চিমবঙ্গের স্থান ছিল দ্বিতীয়, ১৯৭১ সালের সেন্সাসে এয়োদশ এবং ১৯৮১ সালের সেন্সাসে এটা হয়েছে ষোড়শ। মেয়েদের সাক্ষরতায় ভারতের মধ্যে সপ্তদশ স্থান (শতকরা ৩০%)।[৯]

এই হ'ল এ রাজ্যের প্রাথমিক শিক্ষার চিত্র। জনশিক্ষার জন্য প্রয়োজন

ছিল প্রত্যেকটি গ্রামে প্রাথমিক স্কুল স্থাপন। কিন্তু তা হয়নি। নিম্নলিখিত সারণী[১০]তে দেখা যায় :

বছর	প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা
১৯৬২-৬৩	৩২,২৪৫
১৯৬৩-৬৪	৩২,৫৮৭
১৯৬৪-৬৫	৩২,৭২৮
১৯৬৫-৬৬	৩২,৮৭২
১৯৬৬-৬৭	৩৩,১৫৩
১৯৬৭-৬৮	৩৪,৫০৭

উক্ত পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে, ১৯৬৭-৬৮ সালে প্রথম যুক্তফ্রন্টের আমলে মাত্র এক বছরে যেখানে ১৩০৪টি নতুন স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেখানে পূর্ববর্তী পাঁচ বছরে (১৯৬২-৬৩ থেকে ১৯৬৬-৬৭ খৃঃ.) কংগ্রেসের আমলে ৯০৮টি স্কুল স্থাপিত হয়েছে। তাছাড়া উক্ত হিসাবে প্রমাণিত হয় যে, স্বাধীনতার কুড়ি বছর পরে ৩৮,৪৭১টি গ্রামের মধ্যে ৩৪,৫০৭টি গ্রামে স্কুল রয়েছে, ৩,৯৬৪টি গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই। আবশ্যিক, অবৈতনিক ও সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা এখনো প্রবর্তিত হয়নি। গ্রামাঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক হলেও আবশ্যিক নয় এবং অবৈতনিক স্কুলগুলিতে শিক্ষাদানের মান অত্যন্ত নীচু।

অবশ্য ১৯৭৮ সালের মধ্যে প্রাথমিক স্কুল স্থাপনে কিছুটা অগ্রগতি ঘটেছে, কিন্তু অন্যদিকের অবস্থা ভয়াবহ। ফোর্থ অল ইণ্ডিয়া এডুকেশনাল সার্ভে ১৯৭৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে যে-পরিসংখ্যান প্রস্তুত করেন, তা ১৯৮১ সালে কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও সমাজ-কল্যাণ মন্ত্রী এস. বি. চৌহান লোকসভায় উপস্থিত করেছেন। এই পরিসংখ্যান[১১] থেকে দেখা যায়, পশ্চিমবাংলার ৪২,৬৫৯টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৫ হাজারেরই নিজস্ব পাকা বাড়ী নেই। আর এর মধ্যে ১,৮৮৬টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাথার ওপরের আচ্ছাদন হ'ল খোলা আকাশ। এই চিত্র কেবলমাত্র পশ্চিমবাংলার নয়, সারা ভারতে প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রগতি (?) ঘটছে খোলা আকাশের নীচে। পৌনে পাঁচ লক্ষ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দেড় লক্ষেরই নিজস্ব কোনো পাকা বাড়ি নেই। নিজস্ব ঠিকানা বিহীন এইসব প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির কতিপয়ের শিক্ষাদান চলে তাঁবু অথবা অস্থায়ী কোনো কুঁড়ে বা মাটির ঘরে। আর বৃহদংশেরই পঠন-পাঠন চলে একেবারেই মুক্ত আকাশের নীচে। এবিষয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেছে উত্তরপ্রদেশ। এই রাজ্যের সত্তর হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে সাড়ে দশ হাজারের মাথার

ওপরের আচ্ছাদন হ'ল খোলা আসমান। উত্তর প্রদেশের পরেই স্থান হ'ল বিহারের। এই রাজ্যের পঞ্চাশ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নয় হাজারেরও মাথার ওপরে কোনো ছাদ নেই। এর পরের স্থান হ'ল পাঞ্জাবের। এই রাজ্যের পাঁচ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাথার ওপরে কোনো আচ্ছাদন নেই। ছাদবিহীন প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিচালনায় এর পরে জায়গা নিয়েছে ওড়িশা, মধ্যপ্রদেশ এবং রাজস্থান। ওড়িশা এবং মধ্যপ্রদেশে চার হাজার ক'রে ও রাজস্থানে দু' হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের আচ্ছাদন হ'ল দিগন্ত বিস্তৃত নীলাকাশ। ফলে এইসব স্কুলে কোন্ মানের শিক্ষা দেওয়া হয়, তা সহজেই অনুমেয়।

শহরাঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক কিংবা বাধ্যতামূলক নয়। অথচ ১৯৬৩ সালে গৃহীত 'আরবান প্রাইমারি এডুকেশন অ্যাক্ট'-এর দ্বারা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য পৌর প্রতিষ্ঠানগুলিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল এবং এই উদ্দেশ্যে শহরাঞ্চলে শতকরা দু'টাকা হারে শিক্ষাকর আরোপের অধিকার দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু কোনো শিক্ষাকর ধার্য হয়নি এবং ৮৮টি পৌরসভার মধ্যে কেবলমাত্র ১৭টি পৌরসভা প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক বলে ঘোষণা করেছে।[১২]

অপচয় ও বদ্ধতার জন্য প্রাথমিক শিক্ষার অনগ্রসরতা একদিকে যেমন নিরক্ষরতার সংখ্যা বৃদ্ধি করছে, অন্যদিকে তেমনি মাধ্যমিক ও উচ্চশ্রেণীর শিক্ষার প্রসার ও উন্নতি ব্যাহত করছে। 'পশ্চিম বাংলায় পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষে (১৯৭৯ সালে) বিদ্যালয়ে কত ছেলেমেয়ে যাবে তার লক্ষ্য (Targets) নির্ধারণ করা হয়েছিল। ঠিক হয়েছিল প্রতি ১০ জন বালক বালিকার মধ্যে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠ সমাধা করবে ৯ জন, অষ্টম শ্রেণীর শেষ পর্যন্ত যাবে ৪ জন এবং মাধ্যমিক স্তরের শেষ পর্যন্ত পৌছুবে মাত্র ২ জন। অর্থাৎ আমাদের বহুঘোষিত ১০+২+৩ শিক্ষা-কাঠামোয় হারাধনের দশটি ছেলেমেয়েদের মতো আটটি ছেলেমেয়ে প্রথম ধাপ শেষ হওয়ার আগেই হারিয়ে যাবে।'[১৩] পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিম্নোক্ত পরিসংখ্যানে[১৪] প্রাথমিক স্তর থেকে স্নাতকোত্তর স্তর পর্যন্ত অপচয়ের বাস্তব চিত্র তুলে ধরা হয়েছে :

বছর	শ্রেণী	ছাত্রসংখ্যা	শতকরা হার
১৯৬০-৬১	প্রথম	১২,৫৬,২৯৬	—
১৯৬১-৬২	দ্বিতীয়	৬,৪৫,৫৯৭	৫১'৩৯
১৯৬২-৬৩	তৃতীয়	৫,৪৪,২৯৭	৪৩'৩২

বছর	শ্রেণী	ছাত্রসংখ্যা	শতকরা হার
১৯৬৩-৬৪	চতুর্থ	৪,৫০,৩৫৩	৩৫'৮৫
১৯৬৪-৬৫	পঞ্চম	৩,৬০,৬৮৯	২৮'৭১
১৯৬৫-৬৬	ষষ্ঠ	৩,৪১,৪৬৭	২৭'১৮
১৯৬৬-৬৭	সপ্তম	২,৯২,৮৯৫	২৩'৩১
১৯৬৭-৬৮	অষ্টম	২,৮০,৯৮২	২২'৩৬
১৯৭০-৭১	একাদশ + প্রাক্‌-বিশ্ববিদ্যালয়	১,৩৭,২৮১	১০'৯৩
১৯৭৩-৭৪	স্নাতক (৩য় বর্ষ) আনুমানিক	৯৩,৬১০	৭'৪৫
১৯৭৫-৭৬	স্নাতকোত্তর (শেষ বর্ষ) আনুমানিক	৯,৩২৬	০'৭৪

১৯৬০-৬১ সালের প্রথম শ্রেণীর ছাত্রসংখ্যাকে শতকরা ১০০ ধরলে ১৯৬৪-৬৫ সালের পঞ্চম শ্রেণীতে ২৮'৭১ জন পড়তে সক্ষম হয়। অর্থাৎ প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা-সমাপ্তির পূর্বেই শতকরা ৭১'২৯ জন লেখাপড়া ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। ফলে নিরক্ষরতার সংখ্যা বাড়ে। পুনরায় একাদশ শ্রেণীতে শতকরা ১০'৯৩ জন, স্নাতকশ্রেণীর তৃতীয় বর্ষে শতকরা ৭'৪৫ জন, স্নাতকোত্তর শ্রেণীর শেষ বর্ষে শতকরা ০'৭৪ জন পড়তে সক্ষম হয়। এভাবেই মাধ্যমিক ও মাধ্যমিকোত্তর স্তরের শিক্ষা একটা ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে থাকছে এবং এই স্তরের শিক্ষাও ক্রমাগত মূল্যবান হয়ে উঠছে। কেবলমাত্র স্কুলে ও কলেজে বেতন দেওয়া নয়, গৃহে দু' তিনটি শিক্ষক রাখার ক্ষমতা যাঁদের রয়েছে, যাঁরা ছেলেমেয়েদের জন্য টেক্সট্‌ বই ছাড়াও অন্যান্য বই কিনে দিতে সক্ষম, তাঁদের ঘরের ছেলেমেয়েরাই ত্রিস্তরের শিক্ষা সম্পূর্ণ করার দুর্লভ সৌভাগ্যের অধিকারী হয়। ১৯৭৩ সালের হিসাবে দেখা যায়, ১১ থেকে ১৪ বছর বয়সের শতকরা ২৯'৯ জন এবং ১৪ থেকে ১৭ বছর বয়সের শতকরা ১৭'১ জন ছেলেমেয়ে অর্থের বিনিময়ে মাধ্যমিক শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ পায়।[২৫] মুদালিয়র কমিশনের সুপারিশ অনুসারে শিক্ষা-কাঠামো পরিবর্তন, বহুমুখী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও ত্রিভাষা-সূত্র বাস্তবায়িত করা ছাড়া এই স্তরে কোনো মৌলিক পরিবর্তন ঘটেনি। তাছাড়া একাদশ শ্রেণীর মাধ্যমিক শিক্ষা-কাঠামো ও তিন বছরের স্নাতক-

কাঠামো প্রবর্তনের সিদ্ধান্তও ছিল অবৈজ্ঞানিক। সকলের জন্য অবৈতনিক মাধ্যমিক শিক্ষা ঘোষিত না হওয়ায় এবং জনমুখীন শিক্ষণীয় বিষয় প্রবর্তিত না হওয়ায় শিক্ষা সম্প্রসারিত হয়নি এবং প্রচলিত শিক্ষা ছেলেমেয়েদের দেশ ও সমাজ-গঠনে উদ্বুদ্ধ করেনি ; পক্ষান্তরে বৃটিশ-যুগের মত একালের ছেলে-মেয়েদেরও আত্মসর্বস্ব ও শাসকশ্রেণীর দাস রূপে গড়ে তোলার ব্যবস্থা হয়েছে এবং সেকারণেই শিক্ষিতদের মধ্যে বৃহৎ জনগোষ্ঠী থেকে নিজেদের পৃথক করে রাখার প্রবণতা বেড়েছে। 'সুবিধাভোগী পিতামাতারা বাস্তব জীবনের রূঢ়তার সম্মুখীন হতে এবং দরিদ্রশ্রেণীর শিশুদের জীবন ও অভিজ্ঞতার অংশীদার হতে বাধা দেন।'[১৬] অথচ 'যে সমাজের এক অংশে শিক্ষার আলোক পড়ে, অন্য বৃহত্তর অংশ শিক্ষাবিহীন, সে সমাজ আত্মবিচ্ছেদের অভিশাপে অভিশপ্ত।'[১৭] এবং আমরা স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক সেই অভিশপ্ত জীবন বহন করে চলেছি।

বিশ্ববিদ্যালয়-স্তরে শিক্ষার বাহন ইংরেজিভাষা। অথচ 'বিদেশী ভাষা শিক্ষার বাহন হলে মুখস্থ করবার প্ররোচনা দেয় ছাত্রদের এবং এর ফলে তাদের মৌলিক চিন্তার প্রসার ঘটতে বাধার সৃষ্টি হয়।'[১৮] তাসত্ত্বেও এই স্তরের শিক্ষকেরা ইংরেজির মাধ্যমে শিক্ষা দেন এবং ইংরেজিতে পরীক্ষা গ্রহণ করেন। ইংরেজিভাষায় শিক্ষাদানের জন্য শিক্ষার্থীরা নিজ নিজ ভাষায় জ্ঞান অর্জনে অক্ষম হন। কেবলমাত্র মুখস্থ বিদ্যার দ্বারা পরীক্ষা-বৈতরণী অতিক্রম করতে সচেষ্ট হন। এখানে মাতৃভাষা দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক —শিক্ষকদের স্টাফ রুমে ও ছেলেমেয়েদের কমন রুমে তার স্থান। কলেজ-স্তরে ভাষা-শিক্ষা আবশ্যিক। শিক্ষাগত প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য না রেখে রাজনৈতিক স্বার্থে রুগ্ন কলেজ স্থাপন, যোগ্য শিক্ষকের পরিবর্তে তদ্বিরের জোরে কিংবা রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে শিক্ষক-নিয়োগ, শিক্ষা-সরঞ্জামের অভাব, লাইব্রেরিতে গ্রন্থাভাব ও ল্যাবোরেটরিতে বৈজ্ঞানিক সরঞ্জামের স্বল্পতা —এই হ'ল প্রাক্-সাতাত্তর সালের স্নাতক-স্তরের শিক্ষা-চিত্র। এ অবস্থায় পরীক্ষা-সমুদ্র সাঁতরে পার হওয়ার জন্য হাতে-পায়ে দড়ি বেঁধে ছাত্রছাত্রীদের জলে ফেলে দেওয়া হয়। শিক্ষার্থীরাও কেবলমাত্র মুখস্থ বিদ্যা নয়, টোকাটুকি করে পরীক্ষায় পাশ করতে সচেষ্ট হন।

প্রাথমিক শিক্ষাক্রম সমাপ্তির পূর্বে বিপুল সংখ্যক ছাত্রের বিদায়, মাধ্যমিক ও মাধ্যমিকোত্তর স্তরের ছাত্রদের মধ্যে সফলতা অর্জনে ব্যর্থ ছাত্রদের অন্ধকারাচ্ছন্ন ভবিষ্যৎ এবং বৈধ-অবৈধ উপায়ে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রদের চাকরি লাভে ব্যর্থতা সমাজ-জীবনকে ভারাক্রান্ত করে তুলেছিল। জনসাধারণও ক্রমশ

কংগ্রেস-নেতৃত্বের ওপরে আস্থা হারিয়ে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিলেন। ক্লোজার, লক আউট, লে-অফ, ছাঁটাই, বেকারদের সংখ্যাবৃদ্ধি, ভূমিহারাদের সংখ্যাবৃদ্ধি, খাদ্যদ্রব্যসহ অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের আকাশ-ছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধি, মুদ্রাস্ফীতি ইত্যাদি ঘটনায় জনসাধারণের বিক্ষুব্ধ মনোভাবের প্রকাশ ঘটল ধর্মঘটে-হরতালে। সংগ্রামী অভিব্যক্তিতে কম্পিত হ'ল কলকাতার রাজপথ। তাঁদের বজ্রনির্ঘোষ ছড়িয়ে পড়ল বাংলার আকাশে-বাতাসে। ট্রামের এক পয়সা ভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদে, বঙ্গ-বিহার সংযুক্তির প্রস্তাবের বিরুদ্ধে, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিরোধে ও খাদ্যের দাবিতে জনসাধারণের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের প্রকাশ ঘটেছে। বৃটিশ-শাসকদের ঐতিহ্য অনুসরণ করে দেশীয় শাসকশ্রেণী সশস্ত্র শক্তি দিয়ে গণ-সংগ্রামের মোকাবিলা করেছেন। গ্রাম-নগর ও শহরের রাজপথ সাধারণ মানুষের রক্তে সিক্ত হয়ে উঠেছে। ১৯৫৯ সালের ৩১ আগস্ট দু' মুঠো ভাতের দাবি করায় পুলিশের গুলিতে কলকাতার রাজপথে চিরবঞ্চিত ভূমিহারা ৮০ জন কৃষক-সন্তানকে প্রাণ দিতে হয়েছে।

কিন্তু শঙ্কিত-সন্ত্রস্ত হয়েছেন শাসকশ্রেণী। তাই বামপন্থী দলগুলিকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য চীন-ভারত সীমান্ত সংঘর্ষকে উপলক্ষ করে তাঁরা গণ আন্দোলনের মূল শক্তি কমিউনিস্ট পার্টির মার্কসবাদী অংশের ওপরে আঘাত হেনেছেন। কমিউনিস্ট পার্টি দ্বিধাবিভক্ত হয়েছে; মুজফ্‌ফর আহ্‌মেদ, প্রমোদ দাশগুপ্ত, জ্যোতি বসু, সরোজ মুখার্জী প্রমুখ বিপ্লবী অংশের কমিউনিস্ট নেতারা গ্রেফ্‌তার হয়েছেন, কমিউনিস্ট কর্মীরা আক্রান্ত হয়েছেন, বহু পার্টি অফিস ভস্মীভূত হয়েছে। কিন্তু মানুষ মৃত্যুঞ্জয়ী —মৃত্যু বরণ করে সে মৃত্যুকে জয় করে, মৃত্যুর মধ্য দিয়ে তার অগ্রগতির পথ নিধারিত হয়। সে অদম্য-অজেয়। তাই শাসকশক্তির হিংস্র আক্রমণেও জনগণ পিছিয়ে পড়েননি। মার্কসবাদী আলোকে পুনর্গঠিত হয়েছে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)। বন্দীমুক্তি ও খাদ্যের দাবিতে বাংলার মানুষ আবার রাজপথে নেমেছেন। গুলি-গোলা চালিয়ে তাঁদের আন্দোলনকে দমন করার চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু মোহমুক্ত মেহনতী মানুষের আন্দোলনকে দমন করা যায়নি। মোহমুক্ত চেতনার প্রকাশ ঘটল ১৯৬৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে; কংগ্রেস পরাজিত হ'ল।

স্বাধীনতা প্রাপ্তির কুড়ি বছর পরে কংগ্রেস-নেতৃত্ব পশ্চিম বাংলার শাসন-ক্ষমতা হারালেন। বামপন্থী ও অন্যান্য দলগুলির সমন্বয়ে গঠিত যুক্তফ্রণ্ট শাসন-ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছেন। কিন্তু বিভিন্ন বিপরীত স্বার্থের প্রতিনিধিত্বের জন্য একদিকে যেমন যুক্তফ্রণ্টের মধ্যে বিরোধ তীব্র হয়েছে, অন্যদিকে কংগ্রেস-

নেতৃত্ব সেই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তাঁদের বিরোধকে তীব্রতর করে তুলেছেন। তারপরের ইতিহাস অনেক গলি-ঘুঁজির ইতিহাস—রক্তস্রোতের ইতিহাস, বিচারক-উপাচার্য প্রধান শিক্ষক-অধ্যাপক ও শিক্ষক হত্যার ইতিহাস, ফরোয়ার্ড ব্লক নেতা হেমন্ত বসু সহ এগারো শ' কমিউনিস্ট নেতা ও কর্মীকে খুনের ইতিহাস, জরুরী অবস্থার ইতিহাস, উন্নত চেতনার অবক্ষয়ের ইতিহাস।

শাসকশ্রেণী দেখেছিলেন সমস্ত গণ-আন্দোলনে ও নির্বাচন-সংগ্রামের পুরোভাগে রয়েছেন পশ্চিমবাংলার ছাত্র-যুবশক্তি। সুতরাং তাঁদের মধ্যে সুবিধাবাদী ও অবক্ষয়ী মনোভাব সৃষ্টির জন্য শাসকশ্রেণী সচেষ্ট হয়েছেন এবং তাঁদের পৃষ্ঠপোষিত ছাত্রসংগঠনের নেতৃত্বে সংগঠিত ভাবে শুরু হ'ল পরীক্ষায় সহজে উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য অস্ত্রশক্তির সাহায্যে গণটোকাটুকি। যে সমস্ত শিক্ষক এই কাজে বাধা দিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেই লাঞ্ছিত, প্রহৃত ও আহত হলেন, কেউ-বা খুন হলেন। চূড়ান্ত নৈরাজ্যকর অবস্থায় পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়কে গণ-টোকাটুকিকে নিন্দা করে বিবৃতি দিতে অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু তিনি তাঁদের সে-অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন ; যদিও বামপন্থী নেতারা সমিতির অনুরোধে তীব্র ভাষায় গণটোকাটুকিকে নিন্দা করেছিলেন। এই গণটোকাটুকি যে কী ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছিল, তা শাসকশ্রেণীর দলভুক্ত বিধানসভার সদস্যদের বিধানসভায় প্রদত্ত বিবৃতি ও সংবাদপত্রের বিবরণ থেকে জানা যায়।

'যুগান্তর' পত্রিকায় প্রকাশিত হ'ল (১৭. ৭. ৭৫) : "সম্প্রতি ভয়াবহ গণ-টোকাটুকি, ইনভিজিলেটরদের ভীতি প্রদর্শন, ঘনঘন পরীক্ষা বাতিল, ফল প্রকাশে বিলম্ব ইত্যাদি ঘটনায় শিক্ষক সমিতি উদ্বেগ প্রকাশ করছে।"

'আনন্দবাজার' পত্রিকা "অনার্স পরীক্ষা নিয়ে গোলযোগ, লাঞ্ছনা" শিরোনামে লিখেছেন (২৬. ১১. ৭৫), "কৃষ্ণনগর সরকারি কলেজে পরীক্ষা বাতিল। কলকাতা স্কটিশ চার্চ কলেজে প্রচণ্ড গোলমালে সাময়িকভাবে পরীক্ষা বন্ধ। অধ্যাপক লাঞ্ছনার অভিযোগ। ... সিটি কলেজে (আমহার্স্ট স্ট্রীট) পরীক্ষার পর খাতা পাঠানো অসম্ভব ... সব মিলিয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এ., বি. এস-সি. পার্ট টু-র অনার্স পরীক্ষার দিনটি ছিল ঘটনাবহুল।"

'বসুমতী' পত্রিকায় শিরোনামা (২৮. ১১. ৭৫)—"স্কটিশ চার্চ কলেজে পরীক্ষা-কেন্দ্রে গার্ড-অধ্যাপক প্রহৃত।"

'আনন্দবাজার' পত্রিকায় শিরোনামা (১১. ১২. ৭৫)—"অধ্যাপক সহ তিনজনকে তালাবন্ধ করার অভিযোগে তিনজন ছাত্র ধৃত।"

'যুগান্তর' পত্রিকার সংবাদ (১৯. ১২. ৭৫): "আচার্য এ. এল. ডায়াস পরীক্ষার পবিত্রতা রক্ষায় কলেজের অধ্যাপকগণকে তাঁদের যোগ্য দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানিয়েছেন।"

রাজ্য বিধানসভায় কংগ্রেসী এম. এল. এ. তুহিন সামন্ত বলেছেন (২৫. ৩. ৭৪), "শিক্ষা-জগতে যেটা প্রথম এবং প্রধান জিনিস —শিক্ষাক্ষেত্রে যদি দুর্নীতি ঢোকে, অসততা ঢোকে, শিক্ষাক্ষেত্রে যদি মিথ্যা ঢোকে, শিক্ষাক্ষেত্রে যদি রাজনৈতিক প্রবেশ ঘটে তাহলে শিক্ষা জগৎ কোনদিনই ঠিক থাকতে পারে না এবং সেই শিক্ষাব্যবস্থা অন্ধকারে পর্যবসিত হতে বাধ্য। আমি বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা ইনসিডেণ্ট আপনার কাছে বলি এবং আপনার মাধ্যমে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীকে বলি, —কখনো শুনেছেন যে, একটা ছাত্র ৫টি পরীক্ষা দিচ্ছে? অনার্স দিচ্ছে, এম. কম. দিচ্ছে, বি. এড. দিচ্ছে, লাইব্রেরি সায়েন্স দিচ্ছে—একসঙ্গে একটি ছাত্র ৫টি পরীক্ষা দিচ্ছে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে। আপনি শুনেছেন কখনো যে একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের জুলজি ডিপার্টমেণ্টে ১৯ টা ছেলে পরীক্ষা দিয়েছে এবং তার মধ্যে ১৮টি ছাত্র ফার্স্ট ক্লাস পেল। তার সঙ্গে একজন ফার্স্ট ক্লাস পায়নি, সে বোধহয় দল করতে পারেনি, বাঁচামরা কমিটি করতে পারেনি। বোটানি ডিপার্টমেণ্টে ২৪টি ছাত্র পরীক্ষা দিয়েছে, তার মধ্যে ২৩টি ছাত্র ফার্স্ট ক্লাস, একটি ফার্স্ট ক্লাস নয়। এই রকম আরও অনেক দুর্নীতির কথা আমি আমাদের শিক্ষামন্ত্রীকে বলেছি।"[১৯]

কংগ্রেস এম. এল. এ. অধ্যাপক মনোরঞ্জন হালদার বলেছেন, "বর্তমান ছাত্রদের মধ্যে টুকে পাশ করার একটা প্রবণতা এসেছে, এটা আমি প্রমাণ করে দিতে পারি। যেমন, আমি একটি কলেজের লেকচারার। সেই কলেজে পরীক্ষা চলছিল, তা কলেজের প্রিন্সিপ্যাল বলেছিলেন যে, ভাই তোমরা টোকাটুকি কোরো না। আমি তোমাদের সবাইকে মোটামুটি নম্বর পেলে এলাউ করে দেবো। আমি সেখানে গার্ড দিচ্ছিলাম। আমি দেখলাম একটি ছাত্র টুকে পরীক্ষা দিচ্ছে, তা আমি তাকে বললাম যে, প্রিন্সিপ্যাল বলা সত্ত্বেও তুমি টুকছো কেন? মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, লজ্জার কথা কি বলব যে, ছেলেটি উত্তর দিল, আপনারা তো এখানে এলাউ করে দিলেন, কিন্তু ইউনিভার্সিটিতে গিয়ে যখন পরীক্ষা দিতে হবে তখন আপনি থাকবেন? তাই এখান থেকে অভ্যস্ত হয়ে নিচ্ছি এবং রেডি হচ্ছি কিভাবে টুকে পাশ করতে হয়।"[২০]

শাসকগোষ্ঠীর এম. এল. এ. মনোরঞ্জন প্রামাণিকের ভাষণে শিক্ষাক্ষেত্রে

নৈরাজ্যের সামগ্রিক চিত্র উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে : "অনেক অব্যবস্থা কলেজীয় শিক্ষায়, বহু সমস্যা, গণটোকাটুকি এবং ছাত্ররা পড়াশুনায় অনাগ্রহী ··· অধ্যাপকেরা নিয়মিত বেতন পান না, এই দুর্মূল্যের বাজারে ডি. এ. অত্যন্ত কম ··· কলেজীয় শিক্ষকদের ক্ষেত্রে গ্র্যাচুয়িটি নাই। প্রভিডেন্ট ফাণ্ড নাই ... কলেজীয় শিক্ষকরা নিয়মিত মাহিনা পান না, শিক্ষার উৎকর্ষ বাড়াবার জন্য আজকের এই শোচনীয় অবস্থা দূর করা দরকার এবং তাঁরা যাতে প্রতি মাসের ১লা তারিখে মাহিনা পেতে পারেন তার ব্যবস্থা করতে হবে। কলেজে ভর্তির নিয়মকানুন ঠিক করে দিতে হবে ···। আজকের শিক্ষাজগতে যে নৈরাজ্য চলছে সেটার দিকে দৃষ্টি দিন।"[২১]

কিন্তু দৃষ্টি দেবেন কি করে? যাদের সমর্থনে ও অস্ত্র-সাহায্যে শাসনক্ষমতা লাভ, তাদের অসদাচরণের বিরুদ্ধে বলার ক্ষমতা কোনো মন্ত্রীর ছিল না। তাই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় তাঁদের ছাত্রনেতারা অন্য জায়গা থেকে খাতা লিখিয়ে এনে জমা দিয়েছেন, বিমান বন্দর থেকে সোজাসুজি আইন পরীক্ষার কেন্দ্রে এসে আলাদা ঘরে বসে বই নিয়ে পরীক্ষা (?) দিয়েছেন এবং প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছেন। নকলে বাধা দিলে অধ্যাপকেরা লাঞ্ছিত ও প্রহৃত হয়েছেন; তাঁদের প্রতি নির্বিচারে বোমা ও অ্যাসিড নিক্ষিপ্ত হয়েছে। পরীক্ষার হলের মধ্যে পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকে নজরানা আদায় করে ঢালাও নকলের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন; প্রণামীর বিনিময়ে ট্যাবুলেশন বইয়ের নম্বর বদলে দিয়েছেন।

জনগণের নীরবতা দেখে কংগ্রেস (ই)র নেতৃবৃন্দ ভেবেছিলেন, অত্যাচার-উৎপীড়নের দ্বারা তাঁরা মেহনতী মানুষের মেরুদণ্ড ভেঙে দিতে সক্ষম হয়েছেন। তাই ১৯৭২ সালের নির্বাচনী প্রহসনের পুনরাবৃত্তি না করে ১৯৭৭ সালের জুন মাসের সাধারণ নির্বাচনে তাঁরা ভোটাধিকার প্রয়োগের সুযোগ দিয়েছিলেন। সেই সুযোগের সদ্ব্যবহারে জনগণ দ্বিধান্বিত হননি। ফলশ্রুতি —কংগ্রেস (ই)-র শোচনীয় পরাজয় এবং বামপন্থী ফ্রন্টের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতালাভ ও কমিউনিস্ট পার্টির (মার্কসবাদী) নেতৃত্বে বামফ্রন্ট-মন্ত্রীসভা গঠন।

সাধারণ নির্বাচনের পূর্বে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে মূর্ত করে বামপন্থী ফ্রন্টের ৩৬ দফা কর্মসূচী ঘোষিত হয়েছিল। নির্বাচনের পরে শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে বুর্জোয়া দলগুলির ন্যায় জনগণের কাছে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতির কথা ভুলে না গিয়ে তাঁরা 'ঘোষণা করেছেন যে, তাঁরা জনগণের অভিপ্রায়ের সঙ্গে সঙ্গতি বজায় রেখে বামফ্রন্টের ৩৬ দফা সাধারণ ন্যূনতম কর্মসূচী সুষ্ঠু ও

কার্যকরভাবে রূপায়ণের জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা করবেন। বামফ্রন্ট সরকারের এই ৩৬ দফা কর্মপন্থায় এ রাজ্যের আর্থনীতিক, শ্রমবিষয়ক, ভূমিসংস্কার ও কৃষিজীবী-সমস্যা সংক্রান্ত এবং শিক্ষাসম্পর্কিত বিষয় স্থান পেয়েছে।'[২২] এই ৩৬ দফাকে বিভিন্ন বিষয়ে ভাগ করলে দেখা যায়, তাঁরা ভূমিসংস্কার ও শিক্ষাসংস্কার বিষয়ে সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন — (ক) আর্থনীতিক — ৯ দফা ; (খ) শ্রম — ৬ দফা ; (গ) ভূমিসংস্কার ও কৃষক — ৮ দফা ; (ঘ) শিক্ষা — ৭ দফা এবং (ঙ) অন্যান্য — ৬ দফা।

'ভূমিসংস্কার ও কৃষক' বিষয়ক ৮ দফা কর্মসূচীতে বলা হয়েছে :

"(১৬) উদ্বৃত্ত ও বেনামী জমি অধিগ্রহণ ও ভূমিহীন এবং গরীব চাষী ও খেতমজুরদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণ। জমির মালিকানা কেন্দ্রীকরণের সকল পদ্ধতির অবসান করতে এবং বর্গাদার ও ভূমিহীন চাষী ও খেতমজুরদের পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার জন্য ভূমিসংস্কার আইনের আমূল পরিবর্তন।

"(১৭) চাষীদের দুর্দশার ভার লাঘব করার উদ্দেশ্যে তাদের ঋণ মকুব করা। সহজ শর্ত ও স্বল্প সুদে তাঁদের নতুন ঋণ প্রদান। নির্দিষ্ট সময় অন্তর ঋণের ব্যবস্থা করা এবং সুদখোরদের বিরুদ্ধে নিবৃত্তিমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ।

"(১৮) পাঁচ একর পর্যন্ত জমির মালিকদের জমির খাজনা মকুব করা। সেচ ও অসেচ এলাকায় খাজনার পুনর্নির্ধারণ করা এবং জমির উৎকর্ষের মূল্যায়নের ভিত্তিতে খাজনা কমানো।

"(১৯) জমির মালিকদের উপর বহুমুখী করের বিলোপসাধন এবং যুক্তিসঙ্গত ভিত্তিতে নির্ধারিত একমুখী কৃষি আয়কর প্রবর্তন।

"(২০) খেতমজুরদের জন্য পুরো বছরের কাজ এবং জীবনধারণের উপযোগী মজুরির ব্যবস্থা। বর্তমান নির্ধারিত স্তর থেকে তাঁদের ন্যূনতম মজুরির বৃদ্ধি। ন্যূনতম মজুরি সুনিশ্চিত করতে ব্যবস্থা গ্রহণ।

"(২১) বিশেষভাবে গরীব ও ভূমিহীন চাষীদের যুক্তিসঙ্গত হারে ও অনুদানের ভিত্তিতে বীজ, সার, কৃষিযন্ত্র ইত্যাদির সরবরাহ।

"(২২) সেচের কাজ ও প্রকল্পের কার্যকর উন্নতিসাধন। গ্রামাঞ্চলে পানীয় জলের সুব্যবস্থা।

"(২৩) কৃষি সমবায়ে উৎসাহদান।"[২৩]

'শিক্ষা' বিষয়ক ৭ দফা কর্মসূচীতে বলা হয়েছে :

"(২৪) নিরক্ষরতা দূর করার জন্য আইনগত ও প্রশাসনগত ব্যবস্থা সহ বাস্তব ও কার্যকর কর্মসূচী যা জনগণের সক্রিয় উদ্যোগের দ্বারা সমর্থিত হবে।

"(২৫) (ক) শিক্ষানীতির বিজ্ঞানসম্মত সংস্কার এবং মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিক্ষার প্রবর্তন।

(খ) সংস্কৃতিজগতে অবক্ষয় ও সাম্রাজ্যবাদী অনুপ্রবেশ প্রতিরোধ করা এবং প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক কার্যকলাপকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ।

"(২৬) অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রদের বিনামূল্যে বই, কাগজ, স্টেশনারি ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক দ্রব্য এবং প্রাথমিক স্তর পর্যন্ত ছাত্রদের মধ্যাহ্ন আহার সরবরাহ করা।

"(২৭) সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষালাভের দাবি বাস্তবায়িত করতে পদক্ষেপ গ্রহণ। সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত উর্দু, নেপালী ও সাঁওতালী ভাষা সহ সমস্ত আঞ্চলিক ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানে উৎসাহদান।

"(২৮) (ক) শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষক ও কর্মচারিদের চাকরির নিরাপত্তা। সরকার থেকে সকল পর্যায়ের শিক্ষকদের সরাসরি মাসিক বেতন প্রদান।

(খ) পশ্চিমবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় ব্যয় নিয়ন্ত্রণ আইন (১৯৭৬) বাতিল করা। পরিচালন কমিটিগুলিতে পর্যাপ্ত ছাত্র-শিক্ষক-কর্মচারি-প্রতিনিধি গ্রহণ করে সেগুলির গণতন্ত্রীকরণ।

(গ) নতুন সর্বাত্মক প্রাথমিক শিক্ষা আইন প্রণয়ন ও তার সঙ্গে পর্যাপ্ত শিক্ষক-প্রতিনিধিসহ গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত স্কুল বোর্ডের ব্যবস্থা রাখা।

"(২৯) সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির জন্য একটি নতুন সর্বাত্মক আইন প্রণয়ন।

"(৩০) আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে পঞ্চায়েত, মিউনিসিপ্যালিটি, করপোরেশন ও অন্যান্য আঞ্চলিক পরিষদগুলির অবিলম্বে নির্বাচন করতে হবে। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন সংস্থাগুলির হাতে আরও বেশী ক্ষমতা ও সম্পদ প্রদানের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ।"[২৪]

কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার 'মনে করেন, স্বাধীনতা-উত্তর ভারতের সমাজব্যবস্থায় যে মৌলিক সঙ্কট সৃষ্টি হয়েছে তার পূর্ণ সমাধান একটি অঙ্গ রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকার করতে পারে না। সারা দেশের সমাজ-কাঠামোয় বৈপ্লবিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এই সঙ্কটের সমাধান সম্ভব। সেই লক্ষ্যকে অবিচল রেখে গণ-আন্দোলনের বিকাশের ফলশ্রুতিতে পশ্চিমবাংলায় যে বামফ্রন্ট সরকারের আবির্ভাব ঘটেছে সে এই সমাজ-কাঠামোর মধ্যে একটি ভিন্ন পথে চলতে চায়, সঙ্কটের বাস্তব মূল্যায়নের ভিত্তিতে জনজীবনের আশু সমস্যাগুলিকে খানিকটা লাঘব করতে চায়, জনসাধারণকে ঐক্যবদ্ধ করতে চায় বৃহত্তর

সমাজ-পরিবর্তনের সংগ্রামের লক্ষ্যে। ৩৬-দফা কর্মসূচীর মর্মবস্তুও তাই। এটি হ'ল সীমাবদ্ধ ক্ষমতার মধ্যেও নতুন পথে চলার পথনির্দেশ।'[২৫]

তাই সীমাবদ্ধ ক্ষমতার সুযোগ গ্রহণ করে বামফ্রন্ট সরকার কৃষি ও শিক্ষা বিষয়ক উক্ত কর্মসূচী রূপায়ণে প্রয়াসী হয়েছেন। চার বছরের শাসনকালে কৃষিবিষয়ক কর্মসূচী রূপায়ণে তাঁরা কতখানি সক্ষম হয়েছেন, তার বিবরণ দিতে গিয়ে তাঁরা বলেছেন, "চার বছরের শাসনকালে বামফ্রন্ট সরকার ভূমিসংস্কার কর্মসূচীর উপর সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছেন। এই কর্মসূচী বলে ভাগচাষীদের (বর্গাদার) নাম রেকর্ড করানোর লক্ষ্যে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এর নাম 'বর্গা-অপারেশন'। ১৯৭৭ সালের জুন মাসে রেকর্ডভুক্ত বর্গাদারের সংখ্যা ছিল চার লক্ষের কম। বামফ্রন্ট সরকারের চার বছরের শাসনে এ সংখ্যা বেড়ে ১১ লক্ষে দাঁড়িয়েছে। এঁদের ৫৯ শতাংশ তফসিলী সম্প্রদায়ভুক্ত ও আদিবাসী।

"...ভূমিসংস্কার কর্মসূচীতে সিলিং বহির্ভূত উদ্বৃত্ত জমি উদ্ধারের উপরও খুবই গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। জমির উর্ধ্বসীমা সংক্রান্ত বিভিন্ন আইন বলে গত ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রায় ৩½ বছরে ১ লক্ষ ৭৫ হাজার একর কৃষি জমি সরকারে ন্যস্ত হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সারা ভারতের মধ্যে একমাত্র পশ্চিমবঙ্গেই উর্ধ্বসীমা সংক্রান্ত বিভিন্ন আইন রূপায়ণের মাধ্যমে এত বেশী পরিমাণে কৃষিজমি সরকারে ন্যস্ত হয়েছে। আশা হয় যে, সংশোধিত নতুন বিলটি কার্যকর হলে 'বেনামি' বা গোপনে হস্তান্তরিত সম্পত্তি খুঁজে বার করে আরও বেশী পরিমাণ জমি সরকারে ন্যস্ত করা যাবে। ৩১ ডিসেম্বর (১৯৮০) পর্যন্ত ন্যস্ত জমি ১১,৯৪,১৭৬ জন ভূমিহীন কৃষকের মধ্যে বিলি করা হয়েছে— এঁদের মধ্যে ৪,৪৩,০১৬ (৩৭ শতাংশ) তফসিলী সম্প্রদায়ভুক্ত এবং ২,৩২,৬৯৫ (২০ শতাংশ) আদিবাসী।...

"বিপুল সংখ্যক ভূমিহীন ভাগচাষী খেতমজুর বসবাস করেন সংশ্লিষ্ট জমির মালিকের দয়ার ওপর—বর্গাদাররা যখনই নাম রেকর্ডভুক্ত করেছেন বা খেতমজুররা যখনই বেশী মজুরি চেয়েছেন তখনই তাঁদের বাস্তুজমি থেকে উচ্ছেদ করার ভয় দেখানো হয়েছে। এই সঙ্কট দূর করার জন্য এধরণের বর্গাদার ও খেতমজুরদের ·০৮ একর করে জমির স্বত্ব দানের এক কর্মসূচী বামফ্রন্ট সরকার গ্রহণ করেছেন। এই কর্মসূচী বলে ১৯৮১ সালের ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত ৭৬,১০৪টি পরিবার এ সুযোগ পেয়েছেন। এঁদের মধ্যে ৩৩,৫৭২টি পরিবার তফসিলী সম্প্রদায়ভুক্ত আর ১৫,১৫৫টি পরিবার আদিবাসী।"[২৬]

এছাড়া সামাজিক-আর্থনীতিক উন্নয়নের জন্য নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করায় 'যতই দিন যাচ্ছে, গ্রামাঞ্চলে এসব ব্যবস্থার মোট ফল ততই বেশী অনুভূত হচ্ছে। এর ফলে গ্রামাঞ্চলের অর্থনীতিতে নবজীবনের সঞ্চার হয়েছে, লক্ষ লক্ষ নতুন শ্রমদিন সৃষ্টি হয়েছে এবং গ্রামের মানুষ জীবনের নতুন অর্থ, নতুন দিক খুঁজে পেয়েছেন। গ্রামাঞ্চলে শক্তির ভারসাম্য আজ গরীবদের দিকেই বেশ ঝুঁকে পড়েছে। গ্রামের উন্নয়নমূলক কাজকর্মে গরীবদের সাহচর্য এবং অংশগ্রহণ ক্রমশই স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠছে।'[২৭]

কেবলমাত্র পেটের ক্ষুধা মেটানোর জন্য অন্নের ব্যবস্থা করলে চলবে না, মনের ক্ষুধা মেটানোর জন্য প্রয়োজন শিক্ষা। তাছাড়া নিরক্ষর মানুষকে যাতে পুনরায় বঞ্চনা-প্রতারণার শিকার না হতে হয়, সেজন্য প্রয়োজন বয়স্ক শিক্ষা ও জনশিক্ষা। বামফ্রন্ট সরকার বিশ্বাস করেন যে, আমূল ভূমিসংস্কার ও খেতমজুর, ভূমিহীন ও দরিদ্র কৃষকদের আর্থিক অবস্থার উন্নয়ন ব্যতীত প্রাথমিক শিক্ষার সম্প্রসারণ ও নিরক্ষরতার অবসান সম্ভব নয়; এমনকি উচ্চতর শিক্ষাক্ষেত্রের সংস্কার সাধনও অসম্ভব হয়ে উঠবে। তাই তাঁরা একদিকে গ্রামীণ জীবনের পরগাছাদের নির্মূল করার জন্য নানাবিধ কৃষিকল্যাণমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন, অন্যদিকে শিক্ষাজগতে উচ্চশ্রেণীর একাধিপত্যকে ভেঙে ফেলার জন্য শিক্ষা কমিশনের (১৯৬৪-৬৬) যে-সকল সুপারিশ জনকল্যাণমূলক, সেগুলিকে ফাইলবন্দী না রেখে কার্যকর করতে ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করছেন। সুতরাং শুরু হয়েছে গ্রাম ও শহরের কায়েমী স্বার্থান্বেষীদের আর্তনাদ —ইংরেজ-দেউলের অন্ধকারাচ্ছন্ন গর্ভে রক্ষিত ইংরেজি-দেবতার আসন আলো-বাতাসের স্পর্শে নড়ে ওঠায় ত্রিকাল-অজ্ঞ পূজারীরা বামফ্রন্ট সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য দিল্লী থেকে কলকাতা পর্যন্ত সর্বত্র যাগ-যজ্ঞ করছেন, ভক্তদের সমাবেশ ঘটাচ্ছেন।

শিক্ষাক্ষেত্রে শ্রেণীবৈষম্যের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে শিক্ষা কমিশন যে মন্তব্য করেছিলেন, বামফ্রন্ট সরকার তার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে শিক্ষা-বিষয়ক কর্মসূচী নির্দিষ্ট করেছেন। ১৯৬৪-৬৬ সালে শিক্ষা কমিশন প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার তীব্র সমালোচনা করে বলেছেন, "বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণী ও গোষ্ঠীকে নিয়ে সাম্যের ভিত্তিতে সংহত সমাজ গঠনে উৎসাহদান করাই হ'ল দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থার দায়িত্ব। কিন্তু বর্তমানে তার পরিবর্তে **শিক্ষা সামাজিক ব্যবধানকে বাড়িয়ে তুলছে এবং শ্রেণী-বৈষম্যকে চিরস্থায়ী করছে।** প্রাথমিক স্তরের যে অবৈতনিক বিদ্যালয়গুলিতে জনসাধারণ তাঁদের

ছেলেমেয়েদের পাঠান এবং যেগুলি সরকার ও স্বায়ত্তশাসন-প্রতিষ্ঠানগুলির দ্বারা পরিচালিত, সেই স্কুলগুলির মান সাধারণত নীচু। কিছু বেসরকারি স্কুল সামগ্রিকভাবে অবশ্যই উন্নততর, কিন্তু তাদের মধ্যে অনেক স্কুল বেশী বেতন আদায় করে এবং তা কেবলমাত্র উচ্চ ও মধ্যবিত্তশ্রেণীর ব্যক্তিরা দিতে সক্ষম হন। মাধ্যমিক স্তরে বহু ভাল স্কুলই বেসরকারি। তারাও বেশী বেতন আদায় করে যা ওপরতলার শতকরা দশজন ছাড়া অন্য লোকের আয়ত্তের বাইরে; যদিও মধ্যবিত্তশ্রেণীভুক্ত কিছু পিতামাতা বহু ত্যাগ স্বীকার করে এই জাতীয় স্কুলে তাঁদের ছেলেমেয়েদের পাঠান। এভাবে শিক্ষাতে বৈষম্য ঘটে — অল্পসংখ্যক বেতনগ্রাহী ভালো বেসরকারি স্কুল উচ্চশ্রেণীর চাহিদা পূরণ করছে, অন্যদিকে সরকারি সাহায্যে পরিচালিত অধিকাংশ নিম্নমানের স্কুল জনসাধারণের বাকি অংশ কর্তৃক ব্যবহৃত হয়। সবচেয়ে খারাপ হ'ল, **এই বৈষম্য ক্রমবর্ধমান এবং দুই শ্রেণীর মধ্যে ক্রমশ দুস্তর ব্যবধান সৃষ্টি হচ্ছে।**

"প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার প্রধান ত্রুটিগুলির মধ্যে এটাই হ'ল অন্যতম। **সুশিক্ষা সকল শিশুদের কাছে কিংবা অন্ততপক্ষে সমাজের প্রত্যেকটি স্তরের সকল সক্ষম শিশুদের কাছে সহজলভ্য হওয়ার পরিবর্তে কেবলমাত্র ক্ষুদ্র সংখ্যালঘু অংশ তা লাভ করে যা সাধারণত বেতনদানের ক্ষমতার ভিত্তিতে নির্বাচিত করা হয়, মেধার ভিত্তিতে নয়।**"[২৮] [মোটা হরফ লেখকের]

অর্থাৎ স্বাধীন ভারতের শিক্ষাব্যবস্থায় দু'টি শ্রেণী বর্তমান এবং এই শ্রেণী-বৈষম্য ক্রমবর্ধমান —ক্ষুদ্র সংখ্যালঘু অংশ যাঁদের অর্থ আছে তাঁরাই শিক্ষা ক্রয় করে বিত্ত-বৈভবের অধিকারী হচ্ছেন, অন্যদিকে বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ যাঁদের অর্থ নেই, তাঁরা শিক্ষা-ক্রয়ে অক্ষমতা হেতু দারিদ্রের শিকার হচ্ছেন। শিক্ষাক্ষেত্রের এই শ্রেণী-বৈষম্য হ্রাসের জন্য বামফ্রন্ট সরকার যে নতুন শিক্ষানীতি রচনা করেছেন, তার সাধারণ রূপরেখাটি হ'ল নিম্নরূপ:

"(১) শিক্ষাকে গণমুখী করা, প্রসারিত করা এবং শ্রমজীবী ও পেছিয়ে পড়া জনগণের বিদ্যালয়ে অংশগ্রহণে উৎসাহিত করা। প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার উপর সবচেয়ে বেশী গুরুত্বদান;

"(২) মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষা পর্যদের কাজের উন্নতি বিধান ও এই স্তরের শিক্ষার সরলীকৃত সুষ্ঠু নীতি; শিক্ষাকে ক্রমাগত অবৈতনিক করা;

"(৩) বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের স্তরে পরিচালন-ব্যবস্থার গণতন্ত্রীকরণ,

শিক্ষক সমাজ ও ছাত্র সমাজের সঙ্গে নিরন্তর আলোচনার মধ্য দিয়ে পরীক্ষা, পঠন-পাঠন, সিলেবাস, ফলপ্রকাশ প্রভৃতি জমে থাকা বিভিন্ন সমস্যাগুলির সমাধানের উদ্যোগ ;

"(৪) অনুন্নত আদিবাসী এলাকায় বিশেষ কর্মসূচী ;

"(৫) নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য বিশেষ কর্মসূচী ;

"(৬) মাতৃভাষার ওপরে গুরুত্ব আরোপ করে নতুন ভাষানীতি ;

"(৭) পাঠ্যসূচীর বৈজ্ঞানিক ও গণতান্ত্রিক পরিবর্তন সাধন ;

"(৮) শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের সুযোগ-সুবিধার প্রসার।"[২৯]

গণমুখীন শিক্ষানীতিকে বাস্তবায়িত করার জন্য বামফ্রণ্ট সরকার বিগত চার বছরে (১৯৭৭-১৯৮১ খৃঃ.) শিক্ষাক্ষেত্রে যে-সকল কাজ করেছেন, তার একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা তাঁরা উপস্থিত করেছেন। এতে বলা হয়েছে, "শিক্ষাখাতে বাজেট বরাদ্দ যথেষ্ট পরিমাণে বাড়ানো হয়েছে। ১৯৭৬-৭৭ সালে যেখানে শিক্ষাখাতে মোট বরাদ্দ ছিল ১১৪ কোটি ২৩ লক্ষ টাকা, সেখানে ১৯৮১-৮২ সালে শিক্ষাখাতে ব্যয়-বরাদ্দের মোট পরিমাণ হল ২৮২ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা। এরাজ্যে ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত ছেলেদের ক্ষেত্রে চতুর্থ শ্রেণী এবং মেয়েদের ক্ষেত্রে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা ছিল অবৈতনিক। ১৯৮১ সালে বামফ্রণ্ট সরকারের আমলে ছেলে-মেয়ে নির্বিশেষে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাকে অবৈতনিক করা হয়েছে। এখানেই থেমে না থেকে শিক্ষা বিভাগ ১৯৮৪-৮৫ সালের মধ্যে ৬-১১ বছর বয়সী আরো ১৬ লক্ষ ৭৭ হাজার শিশুকে প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন। এর ফলে ঐ সাল নাগাদ পশ্চিমবাংলায় ৬-১১ বছর বয়সী সমস্ত শিশুই প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচীর আওতায় আসবে।

"এরাজ্যে গত চার বছরে প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে অগ্রগতির আর একটি দৃষ্টান্ত হল স্কুলবিহীন এলাকায় নতুন ৪ হাজার ৬শ' প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন। এই সময়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৩৫ লক্ষ ছাত্রছাত্রীকে স্কুলে থাকাকালীন খাবার দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। ১৯৭৬-৭৭ সালে দেওয়া হত মাত্র এক লক্ষ একুশ হাজার শিশুকে। পঞ্চায়েতের সক্রিয় সহযোগিতায় পাঁচ হাজার নতুন স্কুল তৈরির কাজ দ্রুত এগিয়ে চলেছে, সৃষ্টি করা হয়েছে ১৩ হাজার ৮শ' প্রাথমিক শিক্ষকের পদ। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক, খাতা ও শ্লেট বিতরণের ব্যবস্থা হয়েছে। তফসিলী সম্প্রদায় ও আদিবাসী সমস্ত ছাত্রীকে স্কুলের পোশাক দেবার ব্যবস্থা হয়েছে। অন্যান্য ছাত্রীদের চল্লিশ শতাংশও বর্তমানে বিনামূল্যে স্কুলের পোশাক পাচ্ছে। যারা

নানা কারণে প্রচলিত স্কুলে যেতে পারে না, এমন শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা দেবার জন্য ৫,৫০০টি নন ফর্মাল সেণ্টার (প্রচলিত ব্যবস্থার বাইরে) চালু আছে। ১৯৮৪-৮৫ সালের মধ্যে এই ধরণের সেণ্টার মারফত ৫ লক্ষ শিশুকে শিক্ষিত করে তোলার এক ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

"বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে এবং যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে ভাষা-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার দিকে লক্ষ্য রেখে বামফ্রণ্ট সরকার প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ প্রণীত পুস্তক 'সহজ পাঠ' বজায় রেখেও অতিরিক্ত আর একটি পুস্তক ('কিশলয়') পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করেছেন। আধুনিক কালে ভাষা শিক্ষা সংক্রান্ত বিশেষজ্ঞদের সুচিন্তিত পরামর্শ এবং মতামতকে মান্য করেই এই কাজ করা হয়েছে (এই বিষয়ে ইংরেজি-ভক্তরা রাতারাতি রবীন্দ্র-ভক্ত সেজে প্রাথমিক স্তর থেকে 'সহজ পাঠ' তুলে দেওয়ার কাল্পনিক অভিযোগ তুলে কুৎসার বন্যা বহিয়ে দিয়েছিলেন; বামফ্রণ্ট সরকারকে রবীন্দ্র-বিরোধী রূপে চিহ্নিত করতে চেয়েছিলেন। অথচ তাঁরা রবীন্দ্রনাথের কথাকে বিকৃত করে তাঁকে ইংরেজি-সমর্থক রূপে দেখাতে চেয়েছেন এবং যখন (১৯৪৭-৬৭ খৃঃ) প্রাথমিক স্তরে 'সহজ পাঠ' ছিল না, তখন তা নিয়ে কোনো উচ্চবাচ্য করেননি। ১৯৬৭ সালে প্রথম যুক্তফ্রণ্ট সরকার প্রাথমিক স্তরে যখন 'সহজ পাঠ' প্রবর্তন করেছিলেন, তখন সে-কাজের জন্য তথাকথিত এই 'রবীন্দ্র-ভক্তরা' যুক্তফ্রণ্ট সরকারকে অভিনন্দন জানাননি। প্রকৃতপক্ষে, রবীন্দ্র-আদর্শের প্রতি একনিষ্ঠতা নয়, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থতার জন্যই তাঁদের এই রবীন্দ্র-প্রীতি। — লেখক)।

"ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে বামফ্রণ্ট সরকারের বিরুদ্ধে শিথিলতার অভিযোগ সত্য নয়। এ ব্যাপারে সরকারের সিদ্ধান্ত অত্যন্ত স্পষ্ট: শিশু পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত একটি মাত্র ভাষাই শিখবে এবং সেটি হবে তার মাতৃভাষা। ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত মাতৃভাষা ছাড়াও দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে বাধ্যতামূলকভাবে সব ছাত্রছাত্রীকে ইংরেজি শিখতে হবে। কলেজ স্তরেও সমস্ত ছাত্রছাত্রীকে বাধ্যতামূলকভাবে একটি ভাষা পড়তে হবে। শিক্ষা কমিশনের (১৯৬৪-৬৬) সুপারিশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই এই নীতি নির্ধারিত হয়েছে। ভারতের অন্যান্য প্রায় সমস্ত রাজ্যে এই একই নীতি অনুসৃত হচ্ছে। বামফ্রণ্ট সরকারের ভাষানীতি কোন বিচ্ছিন্ন নীতি নয়, জাতীয় ঐক্যমত্যের উপর ভিত্তি করেই এই নীতি রচিত। ইউনেস্কো মাতৃভাষা শিক্ষা সংক্রান্ত যে দলিল প্রস্তুত করেছেন তার সঙ্গেও এই ভাষানীতির পূর্ণ সামঞ্জস্য রয়েছে। কাজেই একথা বেশ জোর দিয়েই বলা চলে যে, বামফ্রণ্ট সরকার শিক্ষাক্ষেত্র থেকে ইংরেজি বিতাড়নের

কোন কর্মসূচী গ্রহণ করেননি —শুধু ভালভাবে ভাষা-শিক্ষার স্বার্থে ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে ইংরেজি-শিক্ষার সূচনা করেছেন।

"মাধ্যমিক স্তরেও শিক্ষাকে সম্পূর্ণ অবৈতনিক করা হয়েছে এবং সেই সঙ্গে সমস্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে 'বেতন ঘাটতি পূরণ পরিকল্প'-এর আওতায় আনা হয়েছে। এর ফলে আর কোন মাধ্যমিক স্কুল শিক্ষককেই বেতনের জন্য মাসের পর মাস হা-পিত্যেস করে বসে থাকতে হয় না এবং সবাই স্কেল মাফিক পূর্ণ বেতন নির্দিষ্ট সময়ে পাচ্ছেন। গত চার বছরে স্কুলবিহীন এলাকায় ১ হাজারটি নতুন স্কুল খোলা হয়েছে এবং বিভিন্ন বিদ্যালয়ে ১৬ হাজার নতুন শিক্ষক পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। তফসিলীভুক্ত জাতি ও উপজাতি এবং অর্থনৈতিক দিক দিয়ে পশ্চাদ্‌পদ অন্যান্য শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সরকার নিয়মিতভাবে পাঠ্যপুস্তক, স্কুলের পোশাক, টিফিন ও স্কলারসিপ দিয়ে থাকেন। এছাড়া হ্রাসপ্রাপ্ত মূল্যে ছাত্রছাত্রীদের খাতা সরবরাহের কর্মসূচীও অব্যাহত রয়েছে। ষষ্ঠ শ্রেণীর সমস্ত ছাত্রছাত্রীকে বিনামূল্যে অঙ্ক বই সরবরাহ করা হয়ে থাকে। বামফ্রণ্ট সরকার মধ্য শিক্ষাপর্ষদ আইন, প্রাথমিক শিক্ষা আইন এবং সাধারণ গ্রন্থাগার আইনের উপযুক্ত সংশোধন করে এসব ক্ষেত্রেও গণতন্ত্রকে প্রসারিত করেছেন।

"এই বামফ্রণ্ট সরকারের আমলেই সর্বস্তরের শিক্ষক কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘ ভাতা পাচ্ছেন। এছাড়া ১৯৮০ সালের পয়লা এপ্রিল থেকে অনুমোদিত উচ্চ মাদ্রাসার শিক্ষক এবং অশিক্ষক কর্মচারিদের জন্য নির্দিষ্ট বেতনক্রম চালু হয়েছে।...

"প্রায় ৭ বছর ধরে শিক্ষাক্ষেত্রে চরম বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্যের অবসান ঘটিয়ে শিক্ষাক্ষেত্রে স্বাভাবিক ও সুস্থ পরিবেশ ফিরিয়ে এনেছেন বামফ্রণ্ট সরকার।... কর্মনিরাপত্তা আইনের আওতায় কলেজ-শিক্ষকদের চাকুরিতে এসেছে নিরাপত্তা; সরকারি সহায়তায় মাসিক বেতন নিয়মিত হয়েছে —যা আগে কখনো ছিল না। এছাড়া কলেজ সার্ভিস কমিশন প্রতিষ্ঠিত হবার ফলে নিরপেক্ষভাবে কলেজে শিক্ষক নিয়োগ সম্ভব হচ্ছে। গত চার বছরে ১২ টি নতুন কলেজ স্থাপিত হয়েছে এবং আঞ্চলিক অসাম্য দূর করার জন্য পশ্চাদ্‌পদ অঞ্চলে আরো ৭টি নতুন কলেজ স্থাপনের ব্যবস্থা হচ্ছে। মেদিনীপুরে বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। ইউ. জি. সি. স্কেলভুক্ত কলেজ-শিক্ষকেরা পেনসন, গ্র্যাচুইটি, পারিবারিক পেনসন ইত্যাদি বিষয়ে যে সুবিধা ভোগ করতেন এখন সেসব সুবিধা পুরাতন বেতনক্রমভুক্ত কলেজ-শিক্ষকেরাও

পাবেন। কলেজের অশিক্ষক কর্মচারি এবং ডে স্টুডেন্টস হোমের কর্মচারিদেরও এই সুবিধা দেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন বামফ্রন্ট সরকার।"[৩০]

শিক্ষাক্ষেত্রে জনকল্যাণমূলক প্রয়াসের যেসব দাবি রাজ্য সরকার উপস্থিত করেছেন, সে সম্পর্কে কেউ বিরোধিতা করেননি, নীরব থাকাই তাঁরা শ্রেয় মনে করেছেন। বামফ্রন্ট সরকারের ভাষানীতির বিরোধী ডঃ. নীহাররঞ্জন রায়, ডঃ. সুকুমার সেন, প্রেমেন্দ্র মিত্র, সুভাষ মুখোপাধ্যায় প্রমুখদের উক্ত কর্মকাণ্ডের বিষয়ে নীরবতা লক্ষ্য করে দেবেশ রায় প্রশ্ন করেছেন, "কিন্তু সমগ্র সত্যের প্রয়োজনে এ-কথা কি স্বীকার করা উচিত ছিল না যে, বামফ্রন্ট সরকার শাসন-ক্ষমতা পেয়েই বাংলা ভাষায় সরকারি কাজকর্ম করার নীতি কার্যকর করেছেন? এ-কথাও কি একবার উচ্চারণ করা দরকার ছিল না যে, এই রাজ্য সরকারই দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাকে অবৈতনিক করে দিয়েছেন? এ-কথা কি বলা উচিত ছিল না যে, কলেজের শিক্ষার সমস্ত ব্যয় এই রাজ্য সরকার বহন করছেন? এ-কথাও কি কোথাও-না-কোথাও একবার মেনে নেয়া উচিত ছিল না যে, গ্রামের প্রাথমিক শিক্ষার স্কুলে দুপুরের খাবার দেয়ার চেষ্টাও এই সরকারের পক্ষ থেকে শুরু করা হয়েছে? এই চারটি কাজ গত তেত্রিশ বছরের আর কোনো সরকারই করেনি। প্রাথমিক শিক্ষা থেকে উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত এই সরকারের ভাবনা-চিন্তা ও উদ্যোগেরই নিঃসংশয় প্রমাণ এই তিনটি কাজ —যদি সমগ্র সত্যই লক্ষ্য হয়।...

"...বিভিন্ন কলেজের স্থানীয় গভর্নিং বডির ওপর অধ্যাপক নিয়োগের দায়িত্ব না রেখে রাজ্যভিত্তিক কলেজ সার্ভিস কমিশন গঠন কি অন্যায়? এই কমিশন গঠনের প্রস্তাব তো এর আগের সরকারের আমলেই হয়েছিল। তখন তো কোনো আপত্তি হয়নি। কলেজে পড়ানোর চাকরির জন্য প্রয়োজনীয় নম্বর তো কার্যত এর আগের সরকারই কমিয়েছেন। তখন তো কোনো আপত্তি হয়নি। সরকারের একই আইনে পরিচালিত প্রেসিডেন্সি কলেজের শিক্ষকরা একই পাবলিক সার্ভিস কমিশন দ্বারা নিযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও ও তাঁদের বৈশিষ্ট্য প্রমাণের কোনো বিশেষ ব্যবস্থা না-থাকা সত্ত্বেও কার্যত কেন এমন বিশেষ মর্যাদা পাবেন যাতে তাঁদের বদলি করা যাবে না —এই প্রশ্ন তুললে সরকার কি অগণতান্ত্রিক হয়ে ওঠে।"[৩১] এই সমস্ত হিং টিং ছট্ প্রশ্ন জনজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন ধ্যানগম্ভীর ও আত্মসর্বস্ব বিদ্বৎজনদের বিচলিত করেনি; নীরবতা ভেঙে তাঁরা কোনো উত্তর দেননি। সুতরাং শিক্ষা-সম্প্রসারণের জন্য বামফ্রন্ট সরকারের উপর্যুক্ত প্রয়াসের দাবিকে সত্য বলে গ্রহণ করা যায়।

কেবলমাত্র প্রাথমিক ও স্নাতক-স্তরে বামফ্রন্ট সরকারের ভাষানীতির বিরোধিতা করা হয়েছে। 'সরকার ঘোষণা করেছেন, প্রাথমিক স্তরে বাঙালি ছেলেমেয়েকে কেবলমাত্র বাংলা এবং বাংলা মাধ্যমেই অন্য সব বিষয় পড়াতে হবে। ইংরেজি শেখা শুরু হবে মাধ্যমিক স্তর থেকে। অমনি বিরোধীপক্ষ দাবি তুলেছেন, প্রাথমিক স্তর থেকেই ইংরেজি পঠন আবশ্যিক করতে হবে। উভয়-পক্ষই তাঁদের মতের সমর্থনে রবীন্দ্রনাথকে সাক্ষী মেনেছেন। এখন আবার কেউ কেউ বিদ্যাসাগরকেও টানাটানি করছেন। লক্ষ্য করবার বিষয়, এঁরা কেউই প্রাথমিক স্তরে সর্বসাধারণের জন্যে ইংরেজি পড়া আবশ্যিক রাখতে চাননি। বিদ্যাসাগরের তত্ত্বাবধানে এবং সরকারি উদ্যোগে বঙ্গদেশের যে চারটি জেলায় অনেকগুলি প্রাথমিক স্কুল তখন গড়ে উঠেছিল সেখানে পাশ্চাত্য নানা জ্ঞানের বিষয় পড়ানো হত, কিন্তু সবই বাংলার মাধ্যমে। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তায় ভাষা-মাধ্যমের ভূমিকাটি আরও একটু স্বতন্ত্র।...রবীন্দ্রনাথ ভাবছিলেন তাদেরই শিক্ষার কথা যারা বাংলা জানে, ইংরেজি জানে না। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি-মাধ্যমে তখন শিক্ষাধারা যেভাবে চলছিল, তিনি শুধু তার পাশে বাংলা-মাধ্যমেও উচ্চশিক্ষার আর একটি ধারা খুলে দেবার অনুরোধ জানিয়েছিলেন। দূরদর্শী শিক্ষাবিদ ভালো করেই জানতেন, ভবিষ্যতে একদিন বাংলা মাধ্যমে শিক্ষার পথটিই রাজপথ হয়ে উঠবে।'[৩২] সেকারণেই তিনি লিখেছেন, "বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরাতন বাড়িটার ভিতরের আঙিনায় যেমন চলিতেছে চলুক, কেবল তার এই বাহিরের প্রাঙ্গণটাতে যেখানে আমদরবারের নূতন বৈঠক বসিল সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাটাকে যদি সমস্ত বাঙালির জিনিস করিয়া তোলা যায় তাতে বাধাটা কী? ...এমনি করিয়া বাংলার বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি এবং বাংলাভাষার ধারা যদি গঙ্গাযমুনার মতো মিলিয়া যায় তবে বাঙালি শিক্ষার্থীর পক্ষে এটা একটা তীর্থস্থান হইবে!"[৩৩] বামফ্রন্ট সরকার সে-কাজই করছেন। তাঁরা মাতৃভাষার ওপরে গুরুত্ব আরোপ করে প্রাথমিক স্তরে কেবলমাত্র মাতৃভাষা শেখার কথা বলেছেন, মাধ্যমিক ও উচ্চ-মাধ্যমিক স্তরে (ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী) ইংরেজিভাষা-শিক্ষা রেখেছেন, স্নাতক স্তরে ইংরেজি ও মাতৃভাষাকে আবশ্যিক-ঐচ্ছিক করেছেন, স্নাতকোত্তর স্তরে মাতৃ-ভাষা-মাধ্যম প্রচলনে উদ্যোগী হয়েছেন। অথচ বিরোধীরা এই পরিপ্রেক্ষিতের কথা না বলে উক্ত উদ্ধৃতির শেষাংশ তুলে ধরে রবীন্দ্রনাথকে ইংরেজির সমর্থক-রূপে দেখাতে চেয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথ ইংরেজি-সমর্থক বিত্তবানদের উদ্দেশ্যে বলেছেন, "ভাগ্যমন্তের

ছেলে ধাত্রীস্তন্যে মোটাসোটা হইয়া উঠুক-না, কিন্তু গরিবের ছেলেকে তার মাতৃস্তন্য হইতে বঞ্চিত করা কেন?"[৩৪] [মোটা হরফ লেখকের]। কিন্তু প্রশ্ন হ'ল, কবিগুরু ধনী ও দরিদ্রের জন্য ইংরেজি ও মাতৃভাষা শিক্ষার সুপারিশ করেছিলেন কেন? তিনি কি ইংরেজিভাষা-শিক্ষার সমর্থক ছিলেন? এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথের কথায়, "ভালো করে বাংলা শেখার দ্বারাতেই ভালো করে ইংরেজি শেখার সহায়তা হতে পারে, এ কথা মনে করতে সাহস হবে না। গরজটা অতিশয় জরুরি, তাই মন বলতে থাকে কী জানি! আমার সেই শিক্ষানেতা গুরুজনের মতো অভিভাবক বাংলাদেশে বেশি পাওয়া যাবে না, তাই **বেশি দাবি করে লাভ নেই। বাংলা-বিশ্ববিদ্যালয়ের একেশ্বরত্বের অধিকার আজ সহ্য হবে না। নূতন স্বাধীনতার দাবিকে পুরাতন অধীনতার সেফ্‌গার্ড্‌স্ এর দ্বারা বেড়া তুলে দেবার আশ্বাস না দিতে পারলে সবটাই ফেঁসে যেতে পারে, এই আমার ভয়।** তাই বলছি, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরের দালানে বিদ্যার ভোজের যে আয়োজন চলছে তার রান্নাটা বিলিতি মসলায় বিলিতি ডেকচিতে, তার আহারটা বিলিতি আসনে বিলিতি পাত্রেই চলুক; তার জন্যে প্রাণপণে আমরা যে মূল্য দিতে পারি তাতে ভূরিভোজের আশা করা চলবে না। যারা কার্ড পেয়েছে তারা ভিতর-মহলেই বসুক, আর যারা রবাহুত বাইরের আঙিনায় তাদের জন্যে পাত পেড়ে দেওয়া যাক-না। টেবিল পাতা নাই হল, কলাপাত পড়ুক।"[৩৫] (মোটা হরফ লেখকের)। অর্থাৎ কবিগুরুর এই বাস্তব জ্ঞান ছিল যে, ইংরেজিয়ানার যুগে ইংরেজিভাষা-শিক্ষার গ্যারান্টি না দিয়ে কেবলমাত্র মাতৃভাষা-শিক্ষার দাবি উত্থাপন করলে তা ইংরেজনবীশরা নাকচ করে দেবেন। তাই তিনি ইংরেজি-শিক্ষার পাশে মাতৃভাষা-শিক্ষাকে ঠাঁই করে দেবার জন্য গঙ্গা যমুনার মিলনের কথা বলেছেন।

বামফ্রন্টের বিরোধিতা করতে গিয়ে বিরোধী ব্যক্তিরা বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ বিবেকানন্দ, শরৎচন্দ্র ও গান্ধীজীকে প্রাথমিক স্তরে ইংরেজিভাষার সমর্থক রূপে চিত্রিত করেছেন এবং তাঁদের উক্তিকে বিকৃত করে ইংরেজিভাষা-শিক্ষার দাবিতে তাঁদের খণ্ডিত-বিচ্ছিন্ন উক্তি ও প্রতিকৃতি সহ শোভাযাত্রা করেছেন, অবস্থান করেছেন। অথচ তাঁরাই আমাদের শিখিয়েছিলেন, মিথ্যা কথা বলা মহাপাপ, কদাচ মিথ্যা কথা বলিও না। কিন্তু শ্রেণী-আধিপত্য সঙ্কুচিত হওয়ার আশঙ্কায় এখন তাঁরা হয়তো কবিগুরুর সৃষ্ট রঘুপতির উক্তি আমাদের স্মরণ করিয়ে দেবেন :

"মূর্খ, তোমার আমার হাতে সত্য নাই।
সত্যের প্রতিমা সত্য নহে, কথা সত্য
নহে, লিপি সত্য নহে, মূর্তি সত্য নহে —
চিন্তা সত্য নহে। সত্য কোথা আছে —কেহ
নাহি জানে তারে, কেহ নাহি পায় তারে।
সেই সত্য কোটি মিথ্যারূপে চারি দিকে
ফাটিয়া পড়েছে। সত্য তাই নাম ধরে
মহামায়া, অর্থ তার 'মহামিথ্যা'।"৩৬

রঘুপতি নিজ-স্বার্থ রক্ষার্থে সত্য মিথ্যার পার্থক্য ঘুচিয়ে দিতে চেয়েছিল, আর ইংরেজি-প্রেমিকেরাও শ্রেণীস্বার্থ রক্ষার্থে সেই কাজই করেছেন। তাই সত্যকে খুন করতে তাঁদের বিবেকে বাঁধেনি। নিহত সত্যের লাশকে ঢেকে রাখার জন্য তাঁরা রাজনৈতিক আঁধি সৃষ্টি করতে চেয়েছেন। চাকরির ক্ষেত্রে ইংরেজি-শিক্ষিত ব্যক্তিরা যে একচেটিয়া অধিকার ভোগ করছেন, বামফ্রন্ট সরকারের ভাষানীতির জন্য তাতে আঘাত লাগবার সম্ভাবনায় এবং চাকরি-ক্ষেত্রে প্রতিযোগীদের সংখ্যাবৃদ্ধির আশঙ্কায় তাঁরা চাকরি-নির্ভর মধ্যবিত্তশ্রেণীকে বিভ্রান্ত করার প্রয়াসে সত্য-মিথ্যার পার্থক্য ঘুচিয়ে দিয়েছেন। তাঁরা 'স্বাধিকার' রক্ষার জন্য সংগ্রাম করছেন। কিন্তু ইতিহাসের পটভূমিতে বিচার করলে দেখা যাবে, তাঁদের 'স্বাধিকার'-এর অর্থ হ'ল শ্রেণী-বৈষম্য অক্ষুণ্ণ রাখার অধিকার, উচ্চশ্রেণীর শোষণের অধিকার, সাধারণ মানুষকে নিরক্ষরতার অন্ধকারে রাখার অধিকার।

কিন্তু যাঁরা রক্তের বিনিময়ে বামফ্রন্টকে রাজ্যের শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করেছেন, তাঁরা চান অসত্য থেকে সত্যে, অন্ধকার থেকে জ্যোতিতে, মৃত্যু থেকে অমৃতে উত্তীর্ণ হতে —অসতো মা সদ্‌গময় তমসো মা জ্যোতির্গময় মৃত্যোর্মামৃতং গময়। বিদেশী ভাষার নিগড়ে আবদ্ধ অমৃত ঘট-রূপ বন্দিনী মাতৃভাষাকে উদ্ধার করাই হ'ল তাঁদের লক্ষ্য। মাতৃভাষায় শিক্ষিত হয়ে তাঁরা অসত্যের জালকে ছিন্ন করে আলোর স্পর্শে অমৃতলাভের অধিকারী হতে চান — যা আছে একের মধ্যে আবদ্ধ, তা হোক বহুর মধ্যে ব্যাপ্ত। সুতরাং পশ্চিমবঙ্গ সরকার উচ্চশ্রেণীর স্বার্থরক্ষাকারীদের স্বাধিকার রক্ষার আন্দোলনে বিচলিত হননি। তাঁরা জানেন, এই শিক্ষাসংস্কারের প্রশ্নে ১৯৫৯ সালে কেরালার কমিউনিস্ট সরকারকে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা বলে উচ্ছেদ করা হয়েছিল। তবুও মানুষের মুখের ভাষাকে শিক্ষাক্ষেত্রের স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করতে তাঁরা

দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। বিদেশী ভাষার শৃঙ্খল ভেঙে মাতৃভাষাকে মুক্ত করার প্রচেষ্টায় তাঁরা অবিচল। শিক্ষা-সম্প্রসারণ ও শ্রেণী-আধিপত্য সঙ্কোচনের জন্য বামফ্রণ্ট সরকার সততা ও ন্যায়কে অবলম্বন করে শিক্ষাসংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছেন। সুতরাং এই সংগ্রাম হ'ল সততার সঙ্গে অসততার, ন্যায়ের সঙ্গে অন্যায়ের; শোষিত-শ্রেণীর অগ্রগামী বাহিনীর সঙ্গে শোষকশ্রেণীর স্বার্থরক্ষকদের সংগ্রাম।

ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে আলোচিত পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলি থেকে বামফ্রণ্টের শিক্ষানীতির সার্থকতা উপলব্ধি করা যায়। কিন্তু সরকারী ভাষানীতির যৌক্তিকতা ভাষাতাত্ত্বিকদের দৃষ্টিতে বিশ্লেষণের প্রয়োজন। স্নাতক-স্তরের ভাষানীতি বিষয়ক আলোচনা পরবর্তী অধ্যায়ে করা হয়েছে। এখানে কেবলমাত্র প্রাথমিক স্তরের ভাষা-সমস্যা ও তার সমাধান-বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

বামফ্রণ্টের বিরোধীদের মধ্যে অগ্রগণ্য হলেন ডঃ. নীহাররঞ্জন রায়। তাঁর রচনায় বিরোধীদের অভিমত প্রকাশিত হওয়ায় জনসাধারণ তাঁদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে ওয়াকেবহাল হতে পেরেছেন। সুতরাং প্রাথমিক স্তরের ভাষা-বিষয়ে তাঁর প্রাসঙ্গিক বক্তব্য এখানে উপস্থিত করছি। তাঁর অন্যান্য বক্তব্য এখানে উত্থাপন করছি না কারণ; তিনি সে-সকল স্থানে শালীনতার সীমা অতিক্রম করেছেন, সৌজন্যবোধ বিসর্জন দিয়েছেন, রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে নিম্ন মানের ভাষায় আক্রমণ করেছেন। শিক্ষা যে রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্কশূন্য নয়, তা তাঁর রচনার শিরোনামে ('রাজনারায়ণই তবে কি বঙ্গবিজেতা?') ও বক্তব্যে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। এবং সেই রাজনীতি শ্রেণী-দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

প্রাথমিক স্তরে ইংরেজিভাষার পক্ষে সওয়াল্ করতে গিয়ে ডঃ. নীহাররঞ্জন রায় গান্ধীজীকে ইংরেজিভাষার সমর্থক রূপে চিত্রিত করেছেন। তিনি লিখেছেন, গান্ধীজী "ইংরেজকে আদেশ করেছিলেন দেশ ছেড়ে চলে যেতে, কিন্তু ইংরেজি-ভাষাকে দেশছাড়া করতে কখনো চাননি।"[৩৭] একথা বললেও তিনি গান্ধীজীর রচনা থেকে ইংরেজিভাষার সমর্থনে কোনো উদ্ধৃতি দেননি। অথচ প্রাথমিক স্তরে ইংরেজিভাষা-শিক্ষার বিরুদ্ধে গান্ধীজী বহুবার তাঁর অভিমত প্রকাশ করেছেন এবং এ বিষয়ে তাঁর তীব্র বিরোধিতা ইতিহাসের ছাত্র মাত্রই জানেন। বক্ষ্যমান গ্রন্থের লেখকও পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলিতে গান্ধীজীর রচনা থেকে বহু উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তাসত্ত্বেও এখানে তাঁর লেখা থেকে পুনরায় দু'টি উদ্ধৃতি দেওয়া হ'ল।

গান্ধীজী ১৯১৬ সালে লিখেছিলেন, "আমার যদি আজ স্বেচ্ছাচারী শাসন-কর্তার মতো ক্ষমতা থাকিত, তবে আজই আমি বিদেশী ভাষার মাধ্যমে আমাদের বালক-বালিকাদের শিক্ষা বন্ধ করিয়া দিতাম এবং অন্যথায় কর্মচ্যুতির হুমকি দিয়া শিক্ষক ও অধ্যাপকদের এখনই পরিবর্তন-সাধনে বাধ্য করিতাম। আমি পাঠ্যপুস্তক রচনার জন্য অপেক্ষা করিতাম না। পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাহা অনুসৃত হইত। ইহা এমন একটি অন্যায় যাহার সরাসরি প্রতিকার দরকার।"[৩৮] ১৯৪৭ সালের ১১ সেপ্টেম্বর অর্থাৎ এদেশ থেকে বৃটিশ-বিতাড়নের পরেই তিনি লিখেছেন, "ইংরেজ-অপহারকদের রাজনৈতিক শাসন আমরা যেরূপ সাফল্যের সহিত নির্বাসিত করিতে পারিয়াছি আমার অভিপ্রায় সংস্কৃতির অপহারক ইংরেজিকেও তেমনি নির্বাসিত করা।"[৩৯] তাসত্ত্বেও 'বাঙালির ইতিহাস'-এর লেখকের ইতিহাস-বিকৃতির অপচেষ্টা কেন, গান্ধীজীকে যথাযথভাবে উপস্থিত না করে তাঁকে বিকৃত ভাবে উপস্থাপনের চেষ্টা কেন — এ প্রশ্ন তো যুক্তিসঙ্গতভাবেই ইতিহাস-সচেতন পাঠকেরা উপস্থিত করতে পারেন।

তাছাড়া ডঃ. রায় প্রবোধচন্দ্র সেনের রচনা সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, "প্রবোধচন্দ্র রচনাটি শুরু করেছেন এই বলে যে, যদি তাঁর হাতে ক্ষমতা থাকতো তাহলে প্রাথমিক শিক্ষার স্তরে শুধু নয়, স্নাতকোত্তর শিক্ষা পর্যন্ত সকল স্তর থেকেই তিনি ইংরেজির নির্বাসন ব্যবস্থা করতেন। বাক্যটি পড়ে হঠাৎ প্রশ্ন জেগেছিল মনে, এ কার রচনা পড়ছি! এ উক্তি যে গায়ের জোরের উক্তি, এ তো যুক্তি নয়।"[৪০] ডঃ. রায় শ্রীসেনের উক্তিটির অন্তরালস্থিত হৃদয়ের গভীর বেদনা উপলব্ধি না করে আক্ষরিক অর্থ ধরে তাঁর নিন্দা করেছেন। কিন্তু গান্ধীজীও তো পঁচাত্তর বছর আগের উক্ত উদ্ধৃতিতে ("আমার যদি আজ স্বেচ্ছাচারী শাসনকর্তার মতো ক্ষমতা থাকিত, তবে আজই আমি বিদেশী ভাষার মাধ্যমে আমাদের বালক-বালিকাদের শিক্ষা বন্ধ করিয়া দিতাম···।") একই কথা বলেছিলেন। তাঁর এই উক্তির জন্য কি শ্রী রায়ের পদাঙ্ক অনুসরণ করে আমরা গান্ধীজীকে স্বৈরাচারী বলে অভিহিত করব? আমরা কি তাঁর হৃদয়ের গভীর অন্তর্বেদনা উপলব্ধি করব না?

নীহাররঞ্জন রায় লিখেছেন, "প্রাথমিক স্তরে ভাষাশিক্ষার ব্যাপারে যে ব্যবস্থা এখনও চালু আছে তাতে মাতৃভাষা (বাংলা) ও ইংরেজি দুইই পড়ানো হয়, মাতৃভাষা প্রথম শ্রেণী থেকেই, ইংরেজি তৃতীয় থেকে পঞ্চম পর্যন্ত। এ ব্যবস্থাটা আজকের নয়; গত ৭০।৮০ বছর ধরেই চালু আছে মোটামুটি এই

একই ব্যবস্থা। আমার মত আশি ছুঁই ছুঁই বয়স যাঁদের তাঁরাও সকলেই বাংলা ও ইংরেজি এই দুটি ভাষা প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই শিখেছেন এবং তা প্রাথমিক স্তরেই।"[৪১] ডাঃ রায় তাঁর ৮০ বছর বয়স উল্লেখ করেছেন। কিন্তু স্বাধীন ভারতের বয়স ৮০ বছর নয়, প্রবন্ধ-রচনাকালে মাত্র ৩৩ বছর বয়স ; বাকি ৪৭ বছর বৃটিশ-আমল। শিক্ষা-আন্দোলন ও স্বাধীনতা-সংগ্রামের কালে এটাই তো জাতীয় নেতারা, শিক্ষাবিদ্ ও মনীষীরা সকলেই বলেছিলেন, বৃটিশ-আমলে দেশীয় জনসাধারণকে শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করার জন্য প্রাথমিক স্তরে ইংরেজিভাষা-শিক্ষা জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং সেকারণে তার বিরুদ্ধে শিক্ষা-আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। রবীন্দ্রনাথ থেকে গান্ধীজী পর্যন্ত সকলেই প্রাথমিক স্তরে ইংরেজিভাষা-শিক্ষার তীব্র সমালোচনা করেছিলেন। এঁদের বক্তব্য ও মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের আন্দোলনের ইতিহাস পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলিতে বর্ণিত হয়েছে। গান্ধীজী ইংরেজিভাষা-শিক্ষা বর্জিত বুনিয়াদি শিক্ষা প্রবর্তনের পরামর্শ দিয়েছিলেন। তাই স্বাধীন ভারতের প্রথম তেরো বছরে পশ্চিমবাংলায় প্রাথমিক স্তরে ইংরেজিভাষা-শিক্ষা দেওয়া হ'ত না। প্রসঙ্গত আমার নিজের কথা বলি। ১৯৫৯ সালে আমি কলকাতা কর্পোরেশনের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলাম। ঐ সময়ে মাতৃভাষা ভিন্ন অন্য কোনো ভাষা আমাকে পড়াতে হয়নি। ১৯৫০ সালে যখন ইংরেজিভাষা-শিক্ষা বর্জিত নয়া প্রাথমিক পাঠক্রম প্রবর্তিত হয়, তখন ডঃ. রায় এবং তাঁর সমর্থকরা কোনো প্রতিবাদ করেননি। উপরন্তু একটি প্রশ্ন মনে দেখা দেয়। এসময়ে যখন প্রাথমিক স্তরে ইংরেজিভাষা-শিক্ষা দেওয়া হ'ত না এবং ছাত্রছাত্রীদের মাধ্যমিক স্তর থেকে ইংরেজিভাষা শিখতে হ'ত, তখনকার ছাত্রছাত্রীরা কি মূর্খ হয়ে আছেন ? তাঁরা কি জীবনে সফলতা অর্জন করতে পারেননি ? তাঁদের মধ্য থেকে মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা কি বিদেশে গিয়ে কিংবা এদেশে থেকে বিজ্ঞান-চর্চায় ব্রতী হননি ? এসময়টা কি ছিল নিস্ফলা ?

তাছাড়া ডঃ. রায় সম্ভবত চান, বৃটিশ-আমলের ঔপনিবেশিক শিক্ষানীতি স্বাধীন ভারতেও অনুসৃত হোক। তাঁর কাছে বৃটিশ-যুগের শিক্ষানীতি ও স্বাধীন ভারতের শিক্ষাদর্শ একই বলে প্রতিভাত হয়েছে। এই দুই যুগের শিক্ষা-ব্যবস্থার মধ্যে কোনো সীমারেখা টানা উচিত বলে তিনি মনে করেন না। তাই তিনি তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে প্রাথমিক স্তরে ৮০ বছরের ইংরেজিভাষা-শিক্ষার উদাহরণ তুলে ধরেছেন

শ্রী রায় লিখেছেন, "দেশে-বিদেশে বহু জায়গায় প্রাথমিক স্তরে দুটি ভাষা

শেখানো হয় এমন দৃষ্টান্তের অভাব নেই, বিশেষত যে সব দেশে বহুভাষা প্রচলিত, অর্থাৎ যে সব দেশ multi-lingual কতকটা আমাদের মত। ...দেশেও অধিকাংশ রাজ্যেই দুটি ভাষা প্রাথমিক স্তরে শেখানো হয়; হয় না প্রধানত হিন্দী ভাষাভাষী রাজ্যগুলিতে।"[৪২] শ্রী রায় বিদেশের প্রসঙ্গে চীন ও সোভিয়েত রাশিয়ার উদাহরণ তুলে ধরলেও অন্য কোনো দেশের নাম করেননি এবং এদেশের অহিন্দীভাষী রাজ্যগুলির মধ্যে পশ্চিমবাংলা ছাড়া কোন্ কোন্ অহিন্দীভাষী রাজ্যে প্রাথমিক স্তরে দু'টি ভাষা শিক্ষা দেওয়া হয় তা বলেননি। সুতরাং তাঁর এই দুটি তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা প্রয়োজন যে, তিনি সত্যের প্রতি কতখানি অনুগত।

১৯৬৪-৬৬ সালের শিক্ষা কমিশনের প্রতিবেদনে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের প্রাথমিক স্তর থেকে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত ভাষা-শিক্ষা সম্পর্কে যে-সকল তথ্য[৪৩] উপস্থিত করেছেন, তা সংক্ষেপে নিম্নে দেওয়া হল :

(১) আফগানিস্থান—এদেশের দু'টি প্রধান ভাষা—পুস্তু ও পারসী। তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত শিশুরা তাদের মাতৃভাষার (পুস্তু কিংবা পারসী) মাধ্যমে লেখাপড়া শেখে। চতুর্থ শ্রেণী থেকে ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত তারা মাতৃভাষা ভিন্ন দ্বিতীয় ভাষা শেখে। সপ্তম শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত মাধ্যমিক স্তরে তারা ইংরেজি, ফরাসী ও রাশিয়ান—এই তিনটি ভাষার মধ্যে যে কোনো একটি ভাষা শেখে।

(২) অষ্ট্রেলিয়া—১২ থেকে ১৩ বছর পর্যন্ত (প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক) তারা ইংরেজির মাধ্যমে লেখাপড়া শেখে। এর সঙ্গে তারা ন্যূনপক্ষে একটি বিদেশী ভাষা সাধারণত ফরাসীভাষা মাধ্যমিক স্তরে শেখে ও মেধাবী ছাত্ররা তার সঙ্গে ল্যাটিন শেখে। মাধ্যমিক স্কুলের দ্বিতীয় বছরে কিছু ছাত্র তৃতীয় ভাষা জার্মান শেখে।

(৩) অষ্ট্রিয়া—প্রথম শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত স্কুল-স্তরে জার্মান ভাষা শেখানো হয়। একটি আধুনিক বিদেশী ভাষা পঞ্চম শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শেখানো হয়। সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীতে ঐচ্ছিক ভাষা হ'ল ল্যাটিন।

(৪) ব্রাজিল—প্রথম শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত পর্তুগীজ ভাষা হ'ল প্রথম ভাষা এবং তা বাধ্যতামূলক। ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে ল্যাটিন, গ্রীক, ফরাসী, ইংরেজি ও স্প্যানিশ ভাষা শেখানো হয়।

(৫) বার্মা—প্রথম শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত দু'টি ভাষা শিক্ষা দেওয়া হয়। বর্মীভাষা ও ইংরেজিভাষা হ'ল যথাক্রমে প্রথম ভাষা ও

দ্বিতীয় ভাষা।

(৬) কানাডা —প্রথম শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত ইংরেজিভাষায় শিক্ষা দেওয়া হয়। মাধ্যমিক স্তরে দ্বিতীয় ভাষা-রূপে ফরাসী, ল্যাটিন, জার্মান, ইতালিয়ান, স্প্যানিশ ও গ্রীক —এই ভাষাগুলির মধ্যে যে কোনো একটি গ্রহণ করতে হয়।

(৭) শ্রীলঙ্কা —প্রথম শ্রেণী থেকে একাদশ শ্রেণী পর্যন্ত মাতৃভাষার (সিংহলী অথবা তামিল) মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হয়। তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত অন্য কোনো ভাষা থাকে না।

(৮) ডেনমার্ক —প্রাথমিক শিক্ষার সময় হ'ল ৭ অথবা ৮ বছর। মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত মাতৃভাষায় (ডেনিশ) শিক্ষা দেওয়া হয়। পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত মাতৃভাষা ভিন্ন অন্য ভাষা শিক্ষা দেওয়া হয় না। ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে দ্বিতীয় ভাষা ইংরেজি অথবা জার্মান শিখতে হয়।

(৯) ফ্রান্স —প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত মাতৃভাষা ফরাসী ভিন্ন অন্য ভাষা শিখতে হয় না। ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে দ্বিতীয় ভাষা শিখতে হয় —গ্রীক, ল্যাটিন কিংবা যে কোনো আধুনিক ভাষা।

(১০) জার্মানি —দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত জার্মান ভাষা শিখতে হয়। পঞ্চম শ্রেণী থেকে দ্বিতীয় ভাষা ইংরেজি শিখতে হয়।

(১১) ইন্দোনেশিয়া —প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে কেবলমাত্র আঞ্চলিক ভাষার (জাভানীজ) মাধ্যমে শিখতে হয়। তৃতীয় শ্রেণী থেকে ইন্দোনেশীয় ভাষা শিখতে হয় এবং এই ভাষাই হ'ল শিক্ষার মাধ্যম। সপ্তম শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত ইংরেজি শিখতে হয়।

(১২) ইরাণ —প্রথম শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত পারসী (প্রথম ভাষা) শেখানো হয়। ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত প্রাথমিক স্তরে কেবলমাত্র পারসী ভাষা শিখতে হয়। সপ্তম শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত আরবী ভাষা শেখানো হয়। সপ্তম শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত একটি বিদেশী ভাষা শিখতে হয়।

(১৩) আয়ারল্যাণ্ড —শিশু শ্রেণী থেকে স্কুল-শিক্ষার শেষ পর্যন্ত আইরিশভাষা শেখানো হয়। ভাষা-বিষয় ও ভাষা-মাধ্যম-রূপে এই ভাষা-শিক্ষার ওপরে বিশেষ জোর দেওয়া হয়। দ্বিতীয় ভাষা-রূপে ইংরেজিভাষা দ্বিতীয় শ্রেণী থেকে শেখা বাধ্যতামূলক।

(১৪) ইস্রায়েল —আট বছরের প্রাথমিক স্তরের আরব-স্কুলগুলিতে আরবী হ'ল প্রথম ভাষা এবং তা প্রথম শ্রেণী থেকে শিখতে হয়। হিব্রু চতুর্থ

শ্রেণী থেকে এবং ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে একটি বিদেশী ভাষা—অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইংরেজি শেখানো হয়।

(১৫) ইতালি—প্রথম শ্রেণী থেকে ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত কেবলমাত্র একটি ভাষা ইতালিয় ভাষা শেখানো হয়। সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীতে একটি বিদেশী ভাষা—ফরাসী, ইংরেজি, জার্মান কিংবা স্প্যানিশ ভাষা শিক্ষা দেওয়া হয়।

(১৬) জাপান—প্রথম শ্রেণী থেকে জাপানীভাষা শেখানো হয় এবং ছয় বছরের প্রাথমিক স্তরে অন্য কোনো ভাষা শিক্ষা দেওয়া হয় না। প্রাথমিক শিক্ষার শেষে তিন বছরের নিম্ন মাধ্যমিক স্তরে ছাত্ররা ইচ্ছুক হলে একটি বিদেশী ভাষাকে নির্বাচিত বিষয়-রূপে গ্রহণ করতে পারে।

(১৭) জর্ডন—প্রথম শ্রেণী থেকে সমস্ত স্কুলে আরবীভাষা প্রথম ভাষা রূপে শেখানো হয়। ইংরেজি-স্কুলে চতুর্থ শ্রেণী থেকে ইংরেজিভাষা শিখতে হয়। স্কুল-স্তরে অন্য কোনো ভাষা শিখতে হয় না।

(১৮) লিবিয়া—ছয় বছরের প্রাথমিক শিক্ষাস্তরের প্রথম শ্রেণী থেকে কেবলমাত্র একটি ভাষা—আরবীভাষা শেখানো হয়। সপ্তম শ্রেণী থেকে প্রথম বিদেশী ভাষা ও নবম শ্রেণী থেকে দ্বিতীয় বিদেশী ভাষা শিখতে হয়। সাধারণত এই দু'টি ভাষা হ'ল ইংরেজি ও ফরাসী ভাষা।

(১৯) মেক্সিকো—ছয় বছরের প্রাথমিক স্তরের প্রথম শ্রেণী থেকে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত স্প্যানিশভাষা শেখানো হয়। মাধ্যমিক স্তরের সপ্তম শ্রেণী থেকে ইংরেজি অথবা ফরাসী ভাষা শেখানো হয়।

(২০) নেদারল্যাণ্ড—প্রথম শ্রেণী থেকে ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত কেবলমাত্র একটি ভাষা—ডাচভাষা শিখতে হয়। সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীতে তিনটি বিদেশী ভাষার (ইংরেজি, ফরাসী ও জার্মান) মধ্যে যে কোনো দু'টি ভাষা ছাত্ররা ইচ্ছুক হলে শিখতে পারে।

(২১) নিউজিল্যাণ্ড—আট বছরের প্রাথমিক স্তরে কেবলমাত্র একটি ভাষা—ইংরেজি শেখানো হয়।

(২২) নরওয়ে—প্রথম শ্রেণী থেকে সপ্তম শ্রেণী পর্যন্ত কেবলমাত্র মাতৃভাষা (নরওয়েজীয়) শেখানো হয়। ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণীতে ছাত্ররা ইচ্ছুক হলে ইংরেজিভাষাকে ঐচ্ছিক বিষয়-রূপে গ্রহণ করতে পারে।

(২৩) পাকিস্তান—পাঁচ বছরের প্রাথমিক স্তরের প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত কেবলমাত্র একটি ভাষা শিক্ষা দেওয়া হয়। তা হ'ল মাতৃভাষা—উর্দু কিংবা বাংলা (পাকিস্তান থেকে পূর্ব বাংলা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ায়

বর্তমানে পাকিস্তানের মাতৃভাষা কেবলমাত্র একটি —উর্দু। —লেখক)। ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত ইংরেজিভাষা শিখতে হয়। ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্ররা ইচ্ছুক হলে একটি প্রাচীন ভাষা কিংবা ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত একটি আধুনিক কিংবা বিদেশী ভাষা (ফরাসী, পারসী, আরবী, বাংলা, গুজরাটী, সিন্ধি) শিখতে পারে।

(২৪) ফিলিপাইন —স্কুল-শিক্ষার সমগ্র স্তরে ইংরেজি ও ফিলিপিনো ভাষা শেখানো হয়। অন্য কোনো ভাষা শেখার ব্যবস্থা নেই।

(২৫) পোল্যাণ্ড —সাত বছরের প্রাথমিক স্তরের প্রথম শ্রেণী থেকে একাদশ শ্রেণী পর্যন্ত মাতৃভাষা —পোলিশভাষা শিখতে হয়। পঞ্চম শ্রেণী থেকে মাধ্যমিক স্তরের শেষ পর্যন্ত বিদেশী ভাষা —রুশভাষা শিখতে হয়। অষ্টম থেকে একাদশ শ্রেণী পর্যন্ত তৃতীয় ভাষা-রূপে যে কোনো আধুনিক ভাষা কিংবা ল্যাটিন ভাষা শিখতে পারে।

(২৬) পর্তুগাল —প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত কেবলমাত্র একটি ভাষা মাতৃভাষা (পর্তুগীজ) শিক্ষা দেওয়া হয়। পঞ্চম থেকে নবম শ্রেণী পর্যন্ত দু'টি ভাষা (পর্তুগীজ ও ফরাসী) এবং সপ্তম শ্রেণী থেকে নবম শ্রেণী পর্যন্ত তিনটি ভাষা (পর্তুগীজ, ফরাসী ও ইংরেজি) শিখতে হয়।

(২৭) স্পেন —চার বছরের প্রাথমিক স্তরে কেবলমাত্র মাতৃভাষা (স্প্যানিশ) শেখানো হয়। সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীতে অন্য আধুনিক ভাষা শিক্ষা দেওয়া হয়।

(২৮) সুদান —আট বছরের প্রাথমিক শিক্ষা স্তরের প্রথম শ্রেণী থেকে ছাত্ররা আরবীভাষা শেখে। পঞ্চম শ্রেণী থেকে বিদেশী ভাষা ইংরেজী শেখানো হয় এবং মাধ্যমিক স্তরে ইংরেজি হ'ল শিক্ষার মাধ্যম।

(২৯) সুইডেন—প্রথম শ্রেণী থেকে মাতৃভাষা—সুইডিস শিখতে হয়। পঞ্চম শ্রেণী থেকে ইংরেজি বিকল্প ভাষা।

(৩০) থাইল্যাণ্ড —চার বছরের প্রাথমিক স্তরের প্রথম শ্রেণী থেকে জাতীয় ভাষা —থাই ও ইংরেজি শিখতে হয়।

(৩১) তুর্কী —পাঁচ বছরের প্রাথমিক স্তরের প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চমশ্রেণী পর্যন্ত কেবলমাত্র তুর্কীভাষা শেখানো হয়। মাধ্যমিক স্তরে ছাত্রদের যে কোনো তিনটি ভাষার (ইংরেজি, ফরাসী, জার্মান) মধ্যে একটি ভাষা শিখতে হয়।

(৩২) সংযুক্ত আরব রিপাবলিক —ছয় বছরের প্রাথমিক স্তরে আরবী

ভাষা ভিন্ন অন্য ভাষা শিক্ষা দেওয়া হয় না। সপ্তম শ্রেণী থেকে একটি বিদেশী ভাষা শিখতে হয়। অষ্টম ও নবম শ্রেণীতে দু'টি ভাষা শেখানো হয়।

(৩৩) বৃটেন —সমগ্র মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত কয়েকটি প্রাইভেট স্কুল বাদে সর্বত্র কেবলমাত্র ইংরেজিভাষা শিক্ষা দেওয়া হয়। প্রাথমিক স্তরে অন্য কোনো ভাষা শিক্ষা দেওয়া হয় না। ইংরেজির মাধ্যমে টেকনিক্যাল ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা দেওয়া হয়।

(৩৪) সোভিয়েট রাশিয়া —সাত বছরের প্রাথমিক স্তরের প্রথম শ্রেণীতে মাতৃভাষা এবং দ্বিতীয় শ্রেণী থেকে জাতীয় ভাষা —রুশ ভাষা শেখানো হয়। পঞ্চম শ্রেণী থেকে যে কোনো একটি বিদেশী ভাষা শিখতে হয়। মাধ্যমিক স্তরের শেষ পর্যন্ত এই তিনটি ভাষা শিক্ষা দেওয়া হয়।

(৩৫) আমেরিকা —প্রথম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত ইংরেজিভাষা-শিক্ষা বাধ্যতামূলক। অন্য কোনো ভাষা শিক্ষা প্রাথমিক কিংবা মাধ্যমিক স্তরে বাধ্যতামূলক নয়। অনেক স্কুলে বিভিন্ন ভাষা-শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। বহু ছাত্র উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে দু' থেকে তিন বছরের জন্য একটি ভাষা ঐচ্ছিক বিষয়রূপে গ্রহণ করে—সাধারণত ফরাসী, জার্মান, স্প্যানিশ ইত্যাদির যে কোনো একটি।

(৩৬) যুগাশ্লাভিয়া —কেবলমাত্র একটি ভাষা অর্থাৎ মাতৃভাষা চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত শিখতে হয় এবং পঞ্চম শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত একটি বিদেশী ভাষা শেখানো হয়।

(৩৭) চীন —ভারত-চীন সম্পর্কের তিক্ততার জন্য শিক্ষা কমিশনের প্রতিবেদনে চীনের শিক্ষা বিষয়ে কিছু উল্লিখিত হয়নি। তাসত্ত্বেও অন্য সূত্র থেকে জানা যায় যে, ছয় বছরের প্রাথমিক স্তরে বিদেশী ভাষা শেখানো হয় না; কেবলমাত্র মাতৃভাষায় শিক্ষা দেওয়া হয়। মাধ্যমিক স্তর দু'টি পর্যায়ে বিভক্ত —জুনিয়র ও সিনিয়র। জুনিয়র হাই স্কুলের প্রথম বছরে সপ্তাহে তিন ঘণ্টা বিদেশী ভাষা শিক্ষা দেওয়া হয় এবং সিনিয়র হাইস্কুলের প্রতি শ্রেণীতে বিদেশী ভাষা পড়ানো হয়।[৪৪]

এই হ'ল বিশ্বের ভাষা-শিক্ষার চিত্র। কোথাও কোথাও চতুর্থ কিংবা পঞ্চম শ্রেণী থেকে দু'টি ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা থাকলেও অধিকাংশ দেশে প্রাথমিক স্তরে কেবলমাত্র একটি ভাষাই শিক্ষা দেওয়া হয় এবং তা হ'ল মাতৃভাষা। এবার দেশের দিকে চোখ ফেরানো যাক। নীহাররঞ্জন রায়ের কথানুযায়ী 'অধিকাংশ রাজ্যেই দু'টি ভাষা প্রাথমিক স্তরে শেখানো হয়' কিনা তা লক্ষ্য করা যাক।

এ বিষয়ে এন. সি. ই. আর. টি.-র প্রকাশিত পুস্তকে লিপিবদ্ধ সারণীতে[৪৫] বলা হয়েছে :

প্রাথমিক স্তরে বাধ্যতামূলক ভাষা-শিক্ষা

রাজ্য/কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল	প্রথম ভাষা মাতৃভাষা	দ্বিতীয় ভাষা	তৃতীয় ভাষা
১	২	৩	৪
অন্ধ্র প্রদেশ	১ম থেকে ৫ম শ্রেণী (তেলেগু)	৫ম শ্রেণী (হিন্দী)	৩য় শ্রেণী (ইংরেজি)
আসাম	এ, বি, ১ম, ২য়, ৩য় শ্রেণী (অসমীয়া)	—	—
বিহার	১ম থেকে ৫ম শ্রেণী (হিন্দী)	৩য় থেকে ৫ম শ্রেণী (অন্যান্য ভাষা)	—
গুজরাট	১ম থেকে ৪র্থ শ্রেণী (গুজরাটী)	—	—
হরিয়ানা	১ম থেকে ৫ম শ্রেণী (হিন্দী)	—	—
জম্মু ও কাশ্মীর	১ম থেকে ৫ম শ্রেণী (উর্দু)	৫ম শ্রেণী (ইংরেজি)	—
কেরালা	১ম থেকে ৪র্থ শ্রেণী (মালায়ালম)	৩য়, ৪র্থ শ্রেণী (ইংরেজি)	—
মধ্যপ্রদেশ	১ম থেকে ৫ম শ্রেণী (হিন্দী)	—	—
মহারাষ্ট্র	১ম থেকে ৪র্থ শ্রেণী (মারাঠী)	—	—
মহীশূর	১ম থেকে ৪র্থ শ্রেণী (কানাড়া)	—	—
নাগাল্যাণ্ড	এ, বি, ১ম, ২য় শ্রেণী (আঞ্চলিক ভাষা)	১ম শ্রেণী (ইংরেজি)	—
উড়িষ্যা	১ম থেকে ৫ম শ্রেণী (ওড়িয়া)	—	—

১	২	৩	৪
পাঞ্জাব	১ম থেকে ৫ম শ্রেণী (পাঞ্জাবী/হিন্দী)	—	—
রাজস্থান	১ম থেকে ৫ম শ্রেণী (হিন্দী)	—	—
তামিলনাড়ু	১ম থেকে ৫ম শ্রেণী (তামিল)	৩য় থেকে ৫ম শ্রেণী (ইংরেজি)	—
উত্তরপ্রদেশ	১ম থেকে ৫ম শ্রেণী (হিন্দী)	—	—
চণ্ডীগড়	১ম থেকে ৫ম শ্রেণী (হিন্দী, পাঞ্জাবী)	—	—
দাদ্রা, নগর হাভেলী	১ম থেকে ৪র্থ শ্রেণী (গুজরাটী)	—	—
দিল্লী	১ম থেকে ৫ম শ্রেণী (হিন্দী)	—	—
গোয়া, দমন ও দিউ	১ম থেকে ৪র্থ শ্রেণী (মারাঠী)	৪র্থ শ্রেণী (ইংরেজি)	—
হিমাচল প্রদেশ	১ম থেকে ৪র্থ শ্রেণী (হিন্দী)	৪র্থ শ্রেণী (ইংরেজি)	—
মণিপুর	১ম থেকে ৫ম শ্রেণী (মণিপুরী)	৩য় থেকে ৫ম শ্রেণী (ইংরেজি)	৪র্থ, ৫ম শ্রেণী (হিন্দী)
উত্তর পূর্ব সীমান্ত অঞ্চল (নেফা)	এ, বি, ১ম, ২য় শ্রেণী (অসমীয়া)	—	২য় শ্রেণী (ইংরেজি)
পণ্ডিচেরী	১ম থেকে ৫ম শ্রেণী (মালয়ালম/তামিল/তেলেগু)	—	—
ত্রিপুরা	১ম থেকে ৫ম শ্রেণী (বাংলা)	৩য় থেকে ৫ম শ্রেণী (ইংরেজি)	—

দেশ ও বিদেশের উক্ত দু'টি ভাষা-শিক্ষার চিত্র দেখলে জনসাধারণের মনের মধ্যে যে-প্রশ্ন দেখা দেয়, তা হ'ল, তথ্য উপস্থাপনে ডঃ. নীহাররঞ্জন রায়ের মত

একজন প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ ও বিশ্বখ্যাত পণ্ডিত ব্যক্তির এত শিথিলতা কেন, কি উদ্দেশ্যে তথ্যের বিকৃতিসাধন, কোন্ স্বার্থে সত্যের অপলাপ? যে ছু'টি গ্রন্থ থেকে উক্ত ছু'টি চিত্র তুলে ধরা হয়েছে, তা তো সহজলভ্য এবং তা নিশ্চয়ই ডঃ. রায় ও তাঁর সহযোগী শ্রদ্ধাভাজন পণ্ডিত বুদ্ধিজীবীরা দেখেছেন, তবুও বক্তব্য উপস্থাপনে তথ্য ও সত্যের প্রতি তাঁদের আনুগত্যের অভাব কেন?

নীহাররঞ্জন রায় প্রাথমিক শিক্ষাকালকে বিদেশী ভাষা-শিক্ষার পক্ষে উপযুক্ত সময় বলে মনে করেছেন। তিনি লিখেছেন, "পরদেশী ভাষা শিক্ষা ব্যাপারে যাঁরা বিশেষজ্ঞ তাঁরা সকলেই মনে করেন যে, তেমন ভাষা শেখার প্রশস্ততম বয়সই হচ্ছে চার থেকে দশ; এই বয়সের শিশুরাই খুব সহজে ও খুব তাড়াতাড়ি পরদেশী ভাষা আয়ত্ত করতে পারে।"[৪৬] এখানেও ডঃ. রায় কোনো ভাষা-বিশেষজ্ঞের নাম কিংবা তাঁদের কোনো রচনা থেকে প্রাসঙ্গিক বক্তব্য উদ্ধৃত করেননি। কিন্তু আমাদের মতো ছোট মাপের সাধারণ মানুষ শ্রীরায়ের উক্তিকে সংশয়হীন চিত্তে মেনে নিতে নারাজ। কারণ ভাষা-বিশেষজ্ঞদের মতামত, বিভিন্ন কমিশন-কমিটির অভিমত ডঃ. রায়ের উক্তিকে সমর্থন করে না, বরং বিপরীত কথাই তাঁরা বলেছেন। সুতরাং তাঁদের কথাই শোনা যাক।

প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের পক্ষে ছু'টি ভাষা-শিক্ষা উপযোগী কিনা, সেসম্পর্কে 'সেন্ট্রাল ইনস্টিটিউট অব ইণ্ডিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজেস'-এর ডিরেক্টর ডঃ. ডি. পি. পট্টনায়েক বিশ্বের ভাষাবিদ্‌দের অভিমত সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করেছেন, "বিশেষজ্ঞগণ এ ব্যাপারেও প্রায় একমত যে, ৬ থেকে ৯ বছরের শিশুদের রীতিমাফিক শিক্ষা-দানের আগে এবং রীতিমাফিক শিক্ষাদান শুরু করার সন্ধিক্ষণে দ্বিতীয় ভাষা-শিক্ষা উপযোগী নয়। বয়ঃসন্ধিকালের ছুইটি ভাষা-শিক্ষার রূপ শৈশবকালের ছুইটি ভাষাশিক্ষার রূপের মধ্যে গুণগত পার্থক্য দেখা যায়। এঙ্গেল (১৯৭৫) শিশুদের ভাষা-শিক্ষাদান-উপযোগী গ্রহণযোগ্য সময়ের লক্ষণগুলি সংক্ষেপে বলেছেন। লাদো (১৯৬৪) লক্ষ্য করেছেন যে, স্কুলে যাওয়ার আগে শিশুরা মাতৃভাষার মতই একটি ভাষা শিখতে পারে। লাভালে (১৯৭৩) ফরাসি-শিক্ষারত ৩৯ জন ইংরেজিভাষী ছেলেমেয়েকে জেনেভায় পরীক্ষা করেছিলেন। বয়স্ক ছেলেমেয়েদের তুলনায় স্কুলে যাওয়ার আগের ছেলেমেয়েরা নতুন ভাষায় আরো সুন্দর কথাবার্তা বলতে পারে। অপরদিকে তিনি লক্ষ্য করেছেন যে, ছেলেমেয়েদের জ্ঞানের বিকাশের মধ্যবর্তী অবস্থায় প্রমাণিত হয়েছে, তাদের পক্ষে দ্বিতীয় ভাষা শেখা কষ্টসাধ্য; হয় তারা ঐ ভাষায় কথা বলতে চায় না অথবা ঐ ভাষায় তারা সম্পূর্ণ বাক্য গঠন না করে অসমাপ্ত কথা

বলে। কিন্তু ছেলেমেয়েদের শিক্ষার শুরুতে অথবা নিয়মমাফিক শিক্ষা শুরুর আগে (আনুমানিক নয় থেকে বারো বছরের মধ্যে) দ্বিতীয় ভাষায় দ্রুত কথাবার্তা বলতে পারায় উন্নতি ঘটতে দেখা গেছে। স্টেম (১৯১৩) সুইডেনের ছেলেমেয়েদের দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে ইংরেজি শিক্ষা প্রকল্পে উল্লেখযোগ্যভাবে একই তথ্য দিয়েছেন। তিনি দেখেছেন, সাত বছরের ছেলেমেয়েদের তুলনায় এগারো বছরের ছেলেমেয়েরা বেশী তাড়াতাড়ি শিখতে পারে; বোধশক্তি ও উচ্চারণের ক্ষেত্রে তারা দ্রুত। গিলস্ (১৯৭১) অনুমান করেন যে, দুইটি ভাষা শিক্ষাদানের পদ্ধতির ব্যাপারে শিশুর ধারণ-ক্ষমতার ওপরেই ভিত্তি করে দ্বিতীয় ভাষা শিক্ষার উপযুক্ত সময় স্থির করা যায়; তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে, মাতৃভাষা শিক্ষার আগে শিশু দুইটি ভাষার মধ্যে যতটা বাধার সম্মুখীন হবে (৭ থেকে ১০ বছরের মধ্যে ঐ সময়ের পরে ততটা বাধা সে পাবে না।"[৪৭]

ইউনেস্কোর পক্ষ থেকে প্রাথমিক শিক্ষার ওপরে বহু গবেষণা ও সমীক্ষা করা হয়েছে। একটি গবেষণা-গ্রন্থে প্রাথমিক শিক্ষার পাঠক্রম প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, "প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার উদ্দেশ্যে যে সব সাধারণ বিষয় স্থান দেওয়া যুক্তিসঙ্গত তা হ'ল: (১) একটিমাত্র ভাষায় সাক্ষরতা দান; (২) সাধারণ সংখ্যাজ্ঞান; (৩) শিশু ও তার বিদ্যালয়ের পরিবেশের সঙ্গে পরিচিতি; (৪) জাতীয় চেতনা ও সম্মানবোধের উদ্বোধন; (৫) সাধারণ স্বাস্থ্য-জ্ঞান এবং বাসস্থানের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও স্থানীয় অঞ্চলের ময়লা আবর্জনা দূরীকরণ সম্পর্কে চেতনা; (৬) বিদ্যালয়ের মাধ্যমে সামাজিক নীতিবোধ জাগানোর চেষ্টা।"[৪৮]

ইংলণ্ডের রিডিং বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাবিজ্ঞানের প্রধান অধ্যাপক ও বিশিষ্ট ভাষাবিদ্ ডঃ. ডি. এ. উইলকিন্স্ বলেছেন, "শিশুর থেকে একটু বেশী বয়সে ভাষা-শিক্ষার ব্যাপারে সুবিধাগুলি হল: বেশী বয়সের শিক্ষাজাত সচেতনতা, বিশেষ করে ভাষা-শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতনতা, শেখবার ধারাবাহিক পদ্ধতি হৃদয়ঙ্গম করতে পারা। এই বয়সে যুক্তিগ্রাহ্য বিশ্লেষণী ক্ষমতার উদ্বোধন ঘটে—মানসিক ইচ্ছা ও প্রেরণার সঞ্চার ঘটে। বেশ কিছুদিন শিক্ষা গ্রহণের অভিজ্ঞতা থাকায় বেশী বয়সের শিক্ষার্থীরা শিশুদের চেয়ে শেখবার নানা পদ্ধতি আয়ত্ত করে নিতে পারে। ফলে শিশুদের তুলনায় বয়স্ক শিক্ষার্থীদের ভাষা-শিক্ষায় সিদ্ধিলাভ ঘটে অনেক বেশী।"[৪৯]

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভাষা-বিশেষজ্ঞ ডঃ. ফ্রাঙ্ক গ্রিটনার লিখেছেন, "মার্কিন

শিক্ষাবিদেরা মনে করেন, দ্বিতীয় ভাষা শেখার ব্যাপারে মাতৃভাষার এক বিশেষ নির্দিষ্ট উপযোগিতা রয়েছে। মার্কিন উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র যাঁরা বিদেশী ভাষা আয়ত্ত করতে চলেছেন তাঁদের পক্ষে মাতৃভাষা ইংরেজির যথাযথ ব্যবহার দ্বিতীয় ভাষা শেখা ত্বরান্বিত করে। দ্বিতীয় কোনো ভাষায় নিবিড়ভাবে দক্ষতা অর্জন করতে হলে আগে মাতৃভাষায় প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন করা দরকার—মাতৃভাষায় দক্ষতা না থাকলে বিদেশী ভাষা আয়ত্ত করা সহজ হবে না।"[৫০]

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অইংরেজিভাষীদের ইংরেজিভাষা-শিক্ষার বিষয়ে সমীক্ষা করা হয়েছিল। 'কার্য উপলক্ষে যুক্তরাষ্ট্রে আগত ঐ দেশে কাজকর্ম করে চলেছেন এমন কয়েকজনের ওপরে তাঁদের ছাত্রাবস্থায় ইংরেজি-শিক্ষণ সম্পর্কে সমীক্ষা করে জানা যায়, এঁদের মধ্যে মাত্র ২ জন ৮ বছর বয়সে প্রথম ইংরেজি ভাষায় পাঠ নিয়েছেন, ১ জন ১০ বছর বয়সে, বাকি সবাই হয় ১২ নয়তো ১৩ বছর বয়সে ইংরেজির পাঠ শুরু করেছেন। এঁদের সকলের ইংরেজি-শিক্ষারম্ভের গড় বয়স ১১.৯ বছর, যে-বয়সে এঁরা ইংরেজিভাষা শেখা শুরু করেন। এঁদের মধ্যে ৫৫ শতাংশ মাত্র ৭।৮ বছর ধরে ইংরেজি শিখেছেন। বাকি ৪৫ শতাংশের ইংরেজি শেখার সময় ৮ বছরের ওপর। সকলের ইংরেজি-ভাষা শেখার সময়কালের ব্যাপ্তি গড়ে সাড়ে নয় বছর, অর্থাৎ মোটামুটি গড় হিসাবে ১২ থেকে ২১ বছর বয়স পর্যন্ত এঁরা ইংরেজিভাষায় পাঠ নিয়েছেন।"[৫১]

রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত না হলে ডঃ. নীহাররঞ্জন রায় ও তাঁর সমমতাবলম্বী পণ্ডিত ব্যক্তিরা বিশ্বের ভাষা-বিশেষজ্ঞদের অভিমতের সঙ্গে একমত হয়ে বামফ্রন্ট সরকারের প্রাথমিক স্তরের ভাষানীতিকে সমর্থন করতেন। কিন্তু বামফ্রন্ট-বিরোধী তীব্র বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাবের জন্য তাঁদের দৃষ্টিশক্তি ঘোলাটে হয়ে গেছে। কেবলমাত্র ভাষা-বিশেষজ্ঞরা নন, এদেশে যতগুলি কমিশন-কমিটি গঠিত হয়েছে, তাঁরা সকলেই প্রাথমিক স্তরে একটিমাত্র ভাষা—মাতৃভাষা শিক্ষার পক্ষে রায় দিয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কমিশন (১৯৪৮-৪৯ খৃঃ.) বলেছেন, "প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষার্থীরা কেবলমাত্র মাতৃভাষা শিখবে। ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত মাতৃভাষা ও রাষ্ট্রীয় ভাষা-শিক্ষার ওপরে জোর দেওয়া হবে। নবম শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত এই দু'টি ভাষা-শিক্ষার সঙ্গে ইংরেজিভাষা-শিক্ষা যুক্ত হবে।"[৫২]

১৯৫৩ সালের ২৩ ও ২৪ জানুয়ারি দিল্লীতে অনুষ্ঠিত ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ইংরেজি-অধ্যাপকদের সম্মেলনে যে প্রস্তাব গৃহীত হয়, তাতে

বলা হয়েছে "মাধ্যমিক স্তরের ছয় বছর আবাশ্যক বিষয়-রূপে ইংরেজি শেখানো উচিত। কিন্তু ইংরেজি-শিক্ষকদের শিক্ষণ-পদ্ধতি উন্নয়ন ও সপ্তাহে ৫০ মিনিটের ছয়টি ইংরেজি ক্লাস নেওয়ার দ্বারা এই সময়কে আরো এক বছর কমানো যেতে পারে।"[৫৩] এই প্রস্তাব গ্রহণ করে মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন (১৯৫২-৫৩ খৃঃ.) সুপারিশ করেছেন, "মধ্য স্কুল স্তরে (৫ম-৮ম শ্রেণী, বয়স —১১-১৪) প্রত্যেকটি শিশুকে দু'টি ভাষা শিক্ষা দিতে হবে। ইংরেজি ও হিন্দীভাষা-শিক্ষা নিম্ন বুনিয়াদি স্তরের (১ম-৪র্থ শ্রেণী) পর থেকে প্রবর্তন করতে হবে। কিন্তু দু'টি ভাষা-শিক্ষা কখনো একই বছর থেকে শুরু করা উচিত নয়।"[৫৪] অর্থাৎ প্রাথমিক স্তরে কেবলমাত্র একটি ভাষা-শিক্ষা দেওয়া হবে।

১৯৫৬ খৃষ্টাব্দের সরকারি ভাষা কমিশনের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, "সংবিধানের ৪৫নং অনুচ্ছেদে রাষ্ট্রীয় নীতির নির্দেশক স্তম্ভে এরূপ বিধান আছে যে, 'রাষ্ট্র এই সংবিধান-সূচনার দশ বৎসরের মধ্যে ১৪ বৎসর বয়ঃক্রম পূর্ণ না হওয়া অবধি সকল বালকবালিকার অবৈতনিক ও আবশ্যিক শিক্ষা-ব্যবস্থা করিবে।' বলা বাহুল্য যে, অক্ষর পরিচয় ও প্রাথমিক শিক্ষার এই যে বিপুল সম্প্রসারণের কথা কল্পনা করা হইয়াছে, ইহা কেবল ভারতীয় ভাষা-সমূহেই কল্পনা করা যাইতে পারে, ইংরেজিভাষায় নহে। স্বাভাবিক অবস্থায়, প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে শিশুর শিক্ষা মাতৃভাষা অথবা আঞ্চলিক ভাষায় সীমাবদ্ধ থাকে ও থাকা উচিত।"[৫৫] সমগ্র ভারতের প্রাথমিক স্তরে ইংরেজি-শিক্ষা সম্পর্কে কমিশন মন্তব্য করেছেন, "ভাষা হিসাবে ইংরেজি শিক্ষার ব্যাপারে দেখা যাইবে যে, প্রাথমিক স্তরে ভাষা হিসাবে ইংরেজির পাঠ বিশেষ স্থান পায় নাই। অধিকাংশ রাজ্যে শিক্ষার মধ্যস্তরে ইহার সূচনা করা হইয়াছে।"[৫৬] কমিশন পুনরায় বলেছেন, "যে প্রকার ও পরিমাণ ইংরেজি জ্ঞান প্রাক-স্নাতক ও স্নাতকদের অপরিহার্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি তাহা বিবেচনা করিয়া আমরা প্রস্তাব করিয়াছি যে, ইংরেজি শিক্ষা মোটামুটি এস. এল. সি.-র পাঁচ বৎসর পূর্বে অর্থাৎ শিশুর যখন ১২বৎসর বয়ঃক্রম তখন হইতে শুরু হওয়া উচিত। সংবিধানের ৪৫নং অনুচ্ছেদ অনুসারে যেসব শিশু নিঃখরচা ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা-লাভ করিবে তাহার ইংরেজিভাষা শিক্ষা অপচয় হইবে মাত্র। এই অল্প সময়ে ইংরেজির মতো সম্পূর্ণ একটি বিদেশী ভাষায় শিক্ষাদানে কোন উদ্দেশ্যসিদ্ধি হইবে না।"[৫৭]

১৯৬২ সনে ইমোশ্যনাল ইন্টিগ্রেশান কমিটি বলেছেন, "আমরা সুপারিশ করছি যে, প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত কেবলমাত্র আবশ্যিক ভাষা-রূপে

মাতৃভাষা কিংবা আঞ্চলিক ভাষা থাকবে। এই স্তরের শিক্ষার্থীদের ভাষা-শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য হ'ল :

(১) তাদের কথাবার্তা বলার ক্ষমতা ও সহজে নিজেকে প্রকাশ করার ক্ষমতার বিকাশ,

(২) সঠিকভাবে পড়ার ক্ষমতা ও নিভুর্লভাবে লেখার শিক্ষা,

(৩) বয়সোপযোগী সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় ঘটানো।"[৫৮]

১৯৬৪ খৃষ্টাব্দে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ভারতে ইংরেজি-শিক্ষা বিষয়ে সমীক্ষা করার জন্য একটি স্টাডি গ্রুপ নিযুক্ত করেন। স্টাডি গ্রুপের রিপোর্টের কয়েকটি অংশ এখানে উদ্ধৃত হ'ল :

(ক) "মাতৃভাষায় প্রয়োজনীয় দক্ষতার আগে নিম্ন প্রাথমিক স্কুলের শিশু-শিক্ষার্থীদের ইংরেজি শিখতে বাধ্য করা উচিত নয়। যদি দ্বিতীয় ভাষা শেখায় কোনো সুফল পেতে হয় তাহলে মাতৃভাষায় প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন অগ্রাধিকার পাবে।"[৫৯]

(খ) "তৃতীয় শ্রেণী থেকে ইংরেজিভাষা শেখাতে হলে যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় হবে এবং শিক্ষক-শিক্ষণের প্রয়োজন হবে তার পরিমাণ বিপুল। এর চেয়ে উচ্চ প্রাথমিক স্তর থেকে ইংরেজি শেখার ব্যবস্থা করলে তা দেশের পক্ষে সহজসাধ্য।"[৬০]

(গ) "ভারতে ইংরেজিভাষার জীবন এখন প্রেতের মতো। পরীক্ষার খাতায় এই প্রেতের সাক্ষাৎ মেলে। প্লেটোর শিল্পকর্মের যেমন কোনো অস্তিত্ব নেই অথচ তার উল্লেখ আছে, তেমনি পরীক্ষার উত্তরপত্রগুলিতে ইংরেজিভাষার সঠিক চেহারার সাক্ষাৎ মেলে না। একটা দুষ্টচক্র গড়ে উঠেছে—নবীন শিক্ষক ও তার ছাত্রেরা ইংরেজি-বিদ্যায় সমান পারদর্শী।"[৬১]

(ঘ) "পঞ্চম শ্রেণীর আগে ইংরেজি পড়ানো অবশ্যই নিরুৎসাহিত করতে হবে।"[৬২]

শিক্ষা কমিশনের (১৯৬৪-৬৬ খৃঃ.) প্রতিবেদনে লিপিবদ্ধ প্রাথমিক স্তরের ভাষা-বিষয়ক কয়েকটি প্রাসঙ্গিক অংশ এখানে উদ্ধৃত হল :

(ক) নিম্ন প্রাথমিক স্তরে (১ম-৪র্থ শ্রেণী) শিশু কেবল শিক্ষার মৌলিক ব্যাপারগুলি শিখবে যেমন পড়তে শেখা, লিখতে শেখা, হিসেব করতে শেখা এবং তার পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নেওয়া। এই স্তরে মাতৃভাষার শিক্ষা দৃঢ় ভিত্তিমূল করার জন্যই প্রথম চার বছরে অন্য কোনো ভাষাশিক্ষা দেওয়া হবে না।[৬৩]

(খ) উচ্চ প্রাথমিক স্তরে (৫ম-৭ম শ্রেণী) মাতৃভাষার সঙ্গে দ্বিতীয় ভাষার প্রচলন হবে।[৬৪]

(গ) নিম্ন প্রাথমিক স্তরে শিক্ষণীয় একটি ভাষাই আবশ্যিক থাকবে — ছাত্রদের ইচ্ছানুযায়ী সেটি হবে মাতৃভাষা কিংবা আঞ্চলিক ভাষা।[৬৫]

(ঘ) উচ্চ প্রাথমিক স্তরে আবশ্যিক ভাষা-রূপে দু'টি ভাষা শিখতে হবে — (১) মাতৃভাষা অথবা আঞ্চলিক ভাষা এবং (২) রাষ্ট্রভাষা কিংবা সহযোগী রাষ্ট্রভাষা।[৬৬]

(ঙ) গ্রন্থাগারের ভাষা হিসাবে ইংরেজি আরো বহুদিন ভারতে থাকবে। সেকারণে বিদ্যালয় স্তর থেকেই ইংরেজি শেখানোর ওপরে জোর দিতে হবে। এর প্রথম পাঠ পঞ্চম শ্রেণী থেকে হতে পারে, কিন্তু আমরা মনে করি, অনেক শিক্ষার্থীর পক্ষে বিশেষত গ্রামের বিদ্যালয়ে অষ্টম শ্রেণীর পূর্বে শুরু নাও হতে পারে।[৬৭]

(চ) শিক্ষামন্ত্রক নিযুক্ত সমীক্ষক-গোষ্ঠী মনে করেন, তৃতীয় শ্রেণী থেকে প্রবর্তিত ইংরেজি-শিক্ষাব্যবস্থা অবৈজ্ঞানিক। আমরা এই মত অনুমোদন করি। ইংরেজির মতো একটি বিদেশী ভাষা শেখবার পূর্বে মাতৃভাষায় শিক্ষার্থীর যথেষ্ট দখল থাকা দরকার। আমাদের সুপারিশ হ'ল যে, পরীক্ষামূলক ব্যবস্থা ছাড়া অন্য কোনো ভাবে ইংরেজি পঞ্চম শ্রেণীর পূর্বে আরম্ভ করা যাবে না।[৬৮]

১৯৬৭ সালে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ডঃ. ত্রিগুণা সেনের সভাপতিত্বে গঠিত শিক্ষা-বিষয়ক পার্লামেণ্টারি কমিটি যে সুপারিশ করেন তাতে বলা হয়েছে, "যে ভাষা শিক্ষার মাধ্যম, কেবলমাত্র সেই ভাষাই স্কুল-শিক্ষার চার অথবা পাঁচ বছরের প্রথম উপ-বিভাগে পড়াতে হবে। পরবর্তী শিক্ষাস্তরে দ্বিতীয় ভাষা আবশ্যিকভাবে পড়ানো শুরু করতে হবে। এই ভাষা সংবিধানের অষ্টম তালিকা-ভুক্ত ভাষা অথবা ইংরেজিভাষা কিংবা অন্য যে কোনো ভাষা হতে পারে। দশম শ্রেণী পর্যন্ত এই ভাষা শেখাতে হবে।[৬৯]

কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা পর্ষদ্ ১৯৬৭ সনে সুপারিশ করেছেন, "পঞ্চম শ্রেণীর নীচে ইংরেজি পড়ানো হবে না। এর পরে শিক্ষার কোন্ স্তর থেকে ইংরেজি চালু করা হবে তা ঠিক করবে রাজ্য সরকার। পর্ষদের পরামর্শ হ'ল যে, যে-সকল বিষয়ে ঐক্যমত্যে পৌঁছানো গেছে, কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা পর্ষদ্ সে-বিষয়গুলির প্রতি ভারত-সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করুক। পর্ষদের সুপারিশ হ'ল, জাতীয় শিক্ষানীতির ভিত্তি-রূপে এই প্রস্তাবগুলি গৃহীত হতে পারে এবং

সমস্ত রাজ্য সরকার যত শীঘ্র সম্ভব এবিষয়ে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুক।"[৭০]

অথচ বিপরীত কথা বলেছেন ডঃ. সুকুমার সেন। ভাষাবিদ হলেও ভাষা-তাত্ত্বিক আলোচনায় না গিয়ে তিনি বলেছেন, "ইংরেজি সব দেশের পক্ষে মানুষ হবার অবশ্যমাধ্যম।" তাহলে প্রশ্ন দেখা দেয়, স্বাধীনতা-আন্দোলন চলাকালে যখন মানবপ্রেমিক শিক্ষাবিদেরা বারবার মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের দাবি উত্থাপন করেছিলেন, ইংরেজি-বর্জিত বুনিয়াদি শিক্ষা পরিকল্পনা যখন গান্ধীজী উপস্থিত করেছিলেন, তখন কি তাঁরা এদেশের জনসাধারণকে অমানুষ-রূপে গড়ে তোলার জন্য সচেষ্ট হয়েছিলেন? তখন 'মানুষ' করার জন্য সুকুমার সেন, নীহাররঞ্জন রায়, প্রমথনাথ বিশী, প্রেমেন্দ্র মিত্র, রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত প্রমুখ বিদগ্ধজনেরা কি ইংরেজিভাষা-শিক্ষার সপক্ষে কোনো কথা বলেছিলেন? তখন তো তাঁদের যৌবনকাল —দ্বিগুণ শক্তিতে তাঁরা ইংরেজি-রক্ষার আন্দোলন করতে পারতেন। যেমন উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ইংরেজদের সঙ্গে সখ্য-সূত্রে আবদ্ধ ও ভূস্বামী-নির্ভর বিদ্বৎজনেরা ইংরেজিভাষা-শিক্ষার আন্দোলন করেছিলেন। তাছাড়া স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পরে প্রাথমিক স্তর থেকে যখন ইংরেজি-শিক্ষা তুলে দেওয়া হয়েছিল, তখন তাঁরা কি প্রকাশ্যে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেছিলেন, তাঁরা কি আমাদের 'মানুষ' করার জন্য ইংরেজি রক্ষার কোনো আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন? তাঁরা কি ইংরেজিভাষায় তাঁদের গ্রন্থ রচনা করেছেন? মাতৃভাষায় রচিত তাঁদের গ্রন্থ পাঠ করে কি আমরা অমানুষ হয়েছি? জানি, এই সব প্রশ্নের উত্তর নেই। কিন্তু আমাদের শিক্ষাগুরুদের অন্ধ কমিউনিস্ট-বিদ্বেষের জন্য জনস্বার্থ বিরোধী ভূমিকা দেখে মনটা গভীর বেদনায় ভরে ওঠে। তাঁরা কি ভেবে দেখেছেন একালের ঘটনাবলীও ইতিহাসে স্থান পাবে এবং উত্তরসূরীরা তাঁদের সম্পর্কে কি ভাববেন?

এঁদেরই মতো ডঃ. রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত বলেছেন, "উচ্চশিক্ষা থেকে বঞ্চিত করে মানুষকে অজ্ঞতার মধ্যে রেখে বামফ্রন্ট রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিল করতে চায়।"[৭২] কী অন্ধ বামফ্রন্ট বিরোধিতা! 'রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিল'-এর জন্য ইতিহাসকে অস্বীকার করে, তথ্যকে বিকৃত করে, সত্যের অপলাপ করে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করার কী করুণ অপপ্রয়াস। সত্যের প্রতি যদি বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা থাকতো, তাহলে তাঁরা বলতেন, জ্ঞান বিস্তারের দ্বারা অজ্ঞতা-অশিক্ষার অবসানের মধ্য দিয়েই মার্কসবাদের অগ্রগতি ঘটে; জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব ত্বরান্বিত হয়, সমাজতন্ত্রের ভিত্তি সুদৃঢ় হয়; অজ্ঞতার অন্ধকার শাসক-শোষকশ্রেণীর

কাম্য। মার্কসবাদী না হয়েও সত্যবাদী কবিগুরু দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে সে-সত্য স্বীকার করেছিলেন। 'শিক্ষাসংস্কার' প্রবন্ধে তিনি স্বীয় বক্তব্যের সমর্থনে টলস্টয়ের উক্তি উদ্ধৃত করেছিলেন —"জনসাধারণের অজ্ঞতার মধ্যেই সরকারের শক্তি নিহিত এবং সরকার তা জানেন। সেকারণে তাঁরা সকল সময়ে প্রকৃত শিক্ষাদানের বিরোধিতা করেন।"[৭৩] সর্বোপরি বিপ্লবোত্তীর্ণ রাশিয়ায় গিয়ে তিনি যে শিক্ষাচিত্র দেখেছেন, তাতে তাঁর লেখনী উচ্ছল হয়ে উঠেছে। রাশিয়ায় 'না এলে এ জন্মের তীর্থদর্শন অত্যন্ত অসমাপ্ত থাকত'[৭৪] —এই সত্য স্বীকৃতিতে তিনি কুণ্ঠিত হননি। তিনি সোচ্চার কণ্ঠে বলেছেন, "দেশের লোককে আমি জানাতে চাই, আজ কেবলমাত্র দশ বছরের আগেকার রাশিয়ার জনসাধারণ আমাদের বর্তমান জনসাধারণের সমতুল্যই ছিল ; সোভিয়েট শাসনে এইজাতীয় লোককেই শিক্ষার দ্বারা মানুষ করে তোলবার আদর্শ কতখানি উচ্চ। এর মধ্যে বিজ্ঞান সাহিত্য সঙ্গীত চিত্রকলা সমস্তই আছে —অর্থাৎ, আমাদের দেশের ভদ্রনামধারীদের জন্যে শিক্ষার যে আয়োজন তার চেয়ে অনেক গুণেই সম্পূর্ণতর।"[৭৫] কেবলমাত্র সোভিয়েত রাশিয়ায় নয়, সমগ্র সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ায় শিক্ষার ব্যাপক বিস্তার ঘটেছে। এমনকি শিক্ষাক্ষেত্রে চীনের অগ্রগতিতেও ঈর্ষান্বিত হতে হয়, অথচ ভারতের স্বাধীনতা লাভের পরে চীনের বিপ্লব সম্পূর্ণ হয়েছিল। কিন্তু ভারতের এই হীনদশা কেন? চৌত্রিশ বছর ধরে কারা ভারত-শাসন করছেন? 'যে সর্বজনীন শিক্ষা দেশের উচ্চশিক্ষার শিকড়ে রস জোগাইবে কোথাও তার সাড়া পাওয়া গেল না'[৭৬] কেন? বামফ্রণ্ট সরকার তো তার সীমাবদ্ধ ক্ষমতা নিয়ে সেই কাজই করছেন। উচ্চশিক্ষা বিস্তৃত করার জন্য তাঁরা ভাষা-সংস্কারের দ্বারা প্রাথমিক শিক্ষাকে যথার্থ অর্থে সর্বজনীন করার প্রয়াসে লিপ্ত হয়েছেন। কবিগুরুর স্বপ্ন সার্থক হওয়ার সম্ভাবনা উজ্জ্বলতর হয়ে উঠেছে —"আমার নিবেদন এই যে, আজ কোনো ভগীরথ বাংলাভাষায় শিক্ষাস্রোতকে বিশ্ববিদ্যার সমুদ্র পর্যন্ত নিয়ে চলুন ; দেশের সহস্র সহস্র মন মূর্খতার অভিশাপে প্রাণহীন হয়ে পড়ে আছে, এই সঞ্জীবনী ধারার স্পর্শে বেঁচে উঠুক ; পৃথিবীর কাছে আমাদের উপেক্ষিত মাতৃভাষার লজ্জা দূর হোক ; বিদ্যাবিতরণের অন্নসত্র স্বদেশের নিত্যসম্পদ হয়ে আমাদের আতিথ্যের গৌরব রক্ষা করুক।"[৭৭] তবুও এই সমস্ত বিদ্বৎজনদের বামফ্রণ্টের বিরুদ্ধে অহেতুক ক্রোধ-জেহাদ কেন?

কেবলমাত্র কিছু সংখ্যক ব্যক্তির স্বার্থে বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠের ওপরে ইংরেজি ভাষা চাপিয়ে দেওয়ার জন্য এঁদের উৎকট আগ্রহ-প্রয়াস লক্ষ্য করে সং

বুদ্ধিজীবীদের মনে সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি হয়েছে। তাঁরা জিজ্ঞাসা করেছেন, "কিন্তু প্রশ্ন হল, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, গুরুদাস, বিপিনচন্দ্র, রামেন্দ্রসুন্দর, রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র, সত্যেন্দ্রনাথ (বসু), রমেশচন্দ্র (মজুমদার), সুনীতিকুমার প্রমুখ বিশিষ্ট সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ, দেশনায়ক, বিজ্ঞানী এবং ঐতিহাসিকগণ দীর্ঘকাল ধরে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে মাতৃভাষার সপক্ষে রায় দিয়ে এলেও এই দুষ্পাচ্য প্রাক্তন রাজভাষাটির প্রতি বাঙালি বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের আকর্ষণ বা প্রলোভন দিনদিনই বেড়ে চলেছে কেন ?"[৭৮]

অথচ 'মজার কথাটা হল, পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার শিক্ষাব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাবার কোনো প্রকল্প নিয়ে রাজনীতির মল্লভূমিতে অবতীর্ণ হননি। এর আগে কংগ্রেসী ও জনতা আমলে শিক্ষাব্যবস্থাকে নিয়ে বারবার নানারকম এক্সপেরিমেন্ট করা হয়েছে। তাতে ছাত্রছাত্রীদের বারবার হতে হয়েছে নাজেহাল। কিন্তু শিক্ষাব্যবস্থার কর্ণধারগণ অথবা উচ্চশিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালি প্রতিবাদ করতে রাস্তায় নামেননি। ·· পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা-সংস্কৃতি জগতের শীর্ষভূমিতে যাঁরা সুদীর্ঘকাল শোভমান, যাঁদের বিদ্যা, চিন্তন ও রচনা আমাদের শ্রদ্ধা দাবি করে এসেছে বহু বৎসর ধরে, তাঁদের অনেককে আজ দেখছি বার্ধক্য ও রোগ উপেক্ষা করে কারাবরণ করতে। যদিও এই কারাবরণে কোনও ক্লেশ নেই, বরং সাময়িক খ্যাতির উত্তেজক পুরস্কার আছে, তথাপি বহু মানুষ নিশ্চয় জানতে চাইবেন কী এমন গুরুতর অন্যায় বামফ্রন্ট সরকার করে বসেছেন, অথবা করতে যাচ্ছেন, যে এতগুলি সর্বজনশ্রদ্ধেয় বৃদ্ধবৃদ্ধা একেবারে গান্ধী-পথের জঙ্গী সৈনিক হয়ে উঠেছেন। প্রাথমিক শিক্ষা নিয়ে যাঁরা এই ত্রিশ বছর একটি বাক্যও উচ্চারণ করেননি, প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করবার দাবিও যাঁদের মুখে কোনো দিন সরবে উচ্চারিত হয়নি, আজ গ্রাম-গঞ্জের গরীব শিশুদের হাতে খড়ি থেকে ইংরেজি শেখাবার দাবি নিয়ে তাঁদের মিছিল, কারাবরণ এবং আন্দোলন এক বিস্ময়কর ব্যাপার বটে। এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ, তবু রঙ্গে ভরা।'[৭৯]

'রব উঠেছে; বাংলার শহরে গঞ্জে গ্রামে সর্বত্র চাষী জেলে কামার কুমোর ধোবা নাপিত মুটে-মজুর সবাইকে শিশুকাল থেকেই ইংরেজি শিখিয়ে ভারতীয় নাগরিক করে তুলতে হবে, বিশ্বসংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। আবার বলছি, কিমাশ্চর্যম্ অতঃপরম্। যে সময়ে উপর তলার ভদ্রসমাজে ইংরেজি মিডিয়াম স্কুলে ছেলেমেয়ে পড়াবার হিড়িক বেড়ে চলেছে আর নীচের তলার আর্ত মূক জনসমাজে মাতৃভাষার বর্ণজ্ঞানও দ্রুত কমে যাচ্ছে, ঠিক সে সময় সবাইকে

ইংরেজি শিখিয়ে দেশ থেকে শিক্ষাবৈষম্য তুলে দেবার 'মহৎ প্রস্তাব' তারস্বরে উচ্চারিত হচ্ছে। আমাদের বুদ্ধিজীবীদের মতে শিক্ষিত ও অশিক্ষিত জনগণকে এক সাংস্কৃতিক স্তরে মিলিত করার শ্রেষ্ঠ উপায় হল সবাইকে ইংরেজি বিদ্যায় শিক্ষিত করা।

'এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে তখনকার দিনের 'ডাহা ইংরেজ' মধুসূদনের কথা (১৮৬৫)—'বাংলা অতি চমৎকার ভাষা। আমাদের মধ্যে যাঁরা অল্পবয়সের শিক্ষার দোষে এ ভাষা ভাল করে জানেন না অথচ তাকে অবহেলা করেন তাঁরা নিরতিশয় ভ্রান্ত। যখন আমরা বহির্জগতের কাছে কিছু বলতে চাইব তখন আমরা যেন নিজের ভাষাতেই বলি। যিনি নিজের ভাষা ভাল করে আয়ত্ত না করেও নিজেকে শিক্ষিত বলে জাহির করেন তাঁর শিক্ষাভিমানকে ধিক।'[৮০] কারণ 'দূরদেশী ভাষার থেকে আমরা বাতির আলো সংগ্রহ করতে পারি মাত্র, কিন্তু আত্মপ্রকাশের জন্য প্রভাত-আলো বিকীর্ণ হয় আপন ভাষায়।' [৮১]

সেই 'প্রভাত-আলো'র সাধনায় রত প্রবীণতম শিক্ষাব্রতী ডঃ. প্রবোধচন্দ্র সেন উচ্চতর শিক্ষাক্ষেত্রে বামফ্রন্ট সরকারের ভাষানীতির সমালোচক হলেও প্রাথমিক স্তরের ভাষানীতিকে সমর্থন করেছেন। কোনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে নয়, 'বিশুদ্ধ শিক্ষানীতির প্রেরণা আর জনকল্যাণ কামনা —কোটি কোটি ভাইবোনের পুরুষানুক্রমিক নিরক্ষরতা ও অশিক্ষার অভিশাপ-মুক্তির কামনা'য় উদ্বুদ্ধ প্রবোধচন্দ্র সেন প্রাথমিক স্তরে ইংরেজিভাষা-শিক্ষার প্রস্তাবের অবাস্তবতা উল্লেখ করে লিখেছেন "যেখানে মাতৃভাষার আলোতেই এই দেশব্যাপী অন্ধকারকে নিরস্ত করা একটা দুঃসাধ্য ব্রতস্বরূপ, সেখানে বিদেশী ভাষার বিজলি-বাতি আমদানির প্রস্তাব কি অলীক স্বপ্নমাত্র নয়? প্রাথমিক শিক্ষার স্তর থেকে প্রত্যেক শিশুকে ইংরেজি শেখাবার প্রস্তাব কার্যত সমগ্র ভারতভূমিকে একটা বৃহত্তর ইঙ্গভূমিতে পরিণত করারই প্রস্তাব।

"শিক্ষা বহুলাংশেই নির্ভর করে শিশুর পারিবারিক ও সামাজিক ভাবমণ্ডলের উপরে। যে শিশু শহরে বাস করে এবং সুশিক্ষিত পরিবারে লালিত-পালিত, সে অতি সহজে ও স্বল্প সময়ে শিক্ষিত হয়ে ওঠে। পিতামাতা ভাইবোন আত্মীয়স্বজনের মতো হয়ে উঠতে হবে এই ইচ্ছা ও আশা তাকে ভিতরে ভিতরে প্রেরণা দিতে থাকে, তাতেই তার মনের মাটি উর্বর হয়। প্রতিনিয়তই পারিবারিক ও সামাজিক ভাবনাচিন্তা ও আশা আকাঙ্ক্ষার বীজ তার হৃদয়-মনে উপ্ত ও অঙ্কুরিত হতে থাকে। কিন্তু যে ছেলে গ্রাম্য অশিক্ষিত পরিবারে জন্মেছে তার অনুর্বর মনে শিক্ষার বীজ সহজে অঙ্কুরিত হয় না। যদিবা হয় তাহলেও

পারিপার্শ্বিক খরার উষ্ণ বায়ুস্পর্শে অচিরেই শুকিয়ে যায়। এসব ছেলেকেও অল্প বয়সে ইংরেজি শেখাবার (আর তাও শহুরে শিক্ষিত পরিবারের সমপর্যায়ে) কল্পনাকে সুচিন্তাপ্রসূত বলে মনে করতে পারি না।

"আমি এখানে বাস করি পল্লীবেষ্টিত শিক্ষাকেন্দ্রে। প্রত্যহ পল্লী অঞ্চলের নিরক্ষর অশিক্ষিত লোকের সঙ্গে যোগাযোগ হয়। আমি জানতে চাই তাদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার কথা। প্রায় সকলেই বুঝে গেছে ছেলেমেয়েদের, বিশেষত ছেলেদের কিছু লেখাপড়া শেখাবার প্রয়োজনীয়তা কতখানি। কিন্তু প্রায় কারও মনেই ছেলেকে উচু মানের শিক্ষা দেবার আকাঙ্ক্ষাটুকুও নেই। তাদের ছেলেরাও যে কখনো শিক্ষায় 'বাবুদের' সমান হয়ে উঠতে পারে তা তারা বিশ্বাস করতেই চায় না। ইস্কুলের শেষ সীমায় পৌছতে পারবে বলেও মনে করে না, তার প্রয়োজনীয়তাও বোধ করে না। ছেলেটা অল্পস্বল্প লেখাপড়া শিখে পিতার পেশাটাকে 'আরও ভাল করে' চালাতে পারলেই যথেষ্ট। কাগজে-কলমে হিসাবপত্র লিখবে, ব্যাঙ্কে টাকা জমা দেবে তুলবে, চিঠিপত্র লিখতে ও পড়তে পারবে ইত্যাদি রকম শিক্ষার চেয়ে বড় আশা বা ইচ্ছা তাদের মনে উকিও দেয় না। কিন্তু প্রায় সকলেরই অভিযোগ, 'বাবু, ছেলেটাকে তো লেখাপড়া শেখাতে পারলাম না। বারবারই ইংরেজিতে ফেল করছে, ইস্কুল থেকে ছাড়িয়ে দিয়েছে। ছেলেটারও ইংরেজি শেখায় মন নেই। আচ্ছা বাবু, বলুন তো এত ইংরেজি শিখে সে কি করবে ? ইংরেজিতে নিজের আর বাবার নাম-ঠিকানা লিখতে পারলেই তো হয়।' এই অভিযোগের উত্তর কি ? আমার দুঃখ, ইংরেজি শিখতে পারল না, এই অপরাধে সে মানচিত্র দেখে ভারতবর্ষের চেহারাটাও চিনে রাখতে পারল না, গণতন্ত্রের প্রকৃতি কি, তাতে তার দায়িত্ব কতখানি, তাও সে জানল না। অথচ তার ভোটের উপরেই নির্ভর করে দেশের কল্যাণ-অকল্যাণ ও ভাবী পরিণতি। প্রাথমিক শিক্ষায় যদি ইংরেজির বালাই না থাকত তাহলে এই দুর্দশা হত না, দেশের গণতন্ত্র অসংখ্য শিক্ষিত ও সচেতন নাগরিকের আশ্রয় পেত।

"শুধু সমাজের নিম্নস্তরের জনগণের পক্ষে নয়, উচুস্তরের শিক্ষিতদের পক্ষেও বিদ্যাদানের প্রাথমিক পর্যায়ে ইংরেজি শেখাবার ব্যবস্থাকে আমি কেবল অনাবশ্যক নয়, অকল্যাণকর বলেই মনে করি। আগে নিজের অভিজ্ঞতার কথাই বলি। আমার শিক্ষারম্ভ হয়েছিল মদনমোহনের 'শিশুশিক্ষা' বই দিয়ে। পড়তে পারার যে একটা আনন্দ আছে, বুঝতে পারার যে একটা রস আছে আর মাতৃভাষার ধ্বনিতে যে একটা কমনীয়তা আছে তা প্রথম বুঝতে

পেরেছিলাম এই বই পড়েই। চেনা জগৎকে নতুন করে চেনার যে আনন্দ, এ বই আমাকে সে আনন্দই দিয়েছিল। তাই এই বই পড়ার সুখস্মৃতি আজও মনে সতেজ আছে। আমার শিক্ষারম্ভের বছর দেড়েক পরে আমাকে ইংরেজি বই ধরানো হয় ইস্কুলে। আমাকে বাড়িতে পড়াবার কোনো ব্যবস্থাই ছিল না। নির্ভর করতে হত ইস্কুলের শিক্ষার উপর। ইস্কুলে আমার ইংরেজি-শিক্ষা মরুভূমিতে বালি চাষ করার মতো নিষ্ফল হল। বৎসরান্তে যখন পরীক্ষার ফল ঘোষিত হল তখন বাংলা অঙ্ক প্রভৃতি বিষয়ের ফল শুনে আমার লজ্জিত হবার কোনো কারণ ছিল না, বরং শিক্ষকমহাশয়ের সপ্রশংস উৎসাহবাণী শুনে আত্মপ্রসাদই লাভ করেছিলাম। সবশেষে যখন বললেন, 'কিন্তু ইংরেজিতে ফেল', তখন চোখের জল বাধা মানেনি। সে অশ্রু আজও আমার স্মৃতিতে শুভ্র সমুজ্জ্বল হয়ে বিরাজ করছে। তবে আমার প্রমোশন পেতে বাধা হল না অন্য বিষয়গুলির জোরে। নিরানন্দময় ইংরেজি-শিক্ষার এই পীড়ন সইতে হল আরও দু-তিন বৎসর। অবশেষে যখন বাংলা ব্যাকরণ পড়ে শব্দগঠন ও বাক্যরচনার আইনকানুন ও কায়দাকৌশল আয়ত্ত হয়ে গেল, তখন বাংলা ব্যাকরণের জ্ঞানই আমাকে ইংরেজি শেখার পথ চিনিয়ে দিল। তখনই আমার ইংরেজি-শেখা এগিয়ে চলল দ্রুতগতিতে। এবার আমার পক্ষে ইংরেজিতেও অন্য সবাইকে ডিঙিয়ে শীর্ষস্থান দখল করা কঠিন হল না। এভাবে ওঠা গেল ষষ্ঠ শ্রেণীতে। এবার আমার সঙ্গে এসে ভর্তি হল রামানন্দ পাল ও বসন্ত পাল নামে দুটি ছাত্রবৃত্তি পাস-করা ছেলে। রামানন্দ কলুর ছেলে অতি দরিদ্র। তাদের বংশের চিরন্তন নিরক্ষরতার কলঙ্ক মোচনের পথে সে-ই প্রথম পা বাড়িয়েছে। বসন্ত বণিক-বংশের ছেলে। তার পরিবারে বাংলা-শিক্ষার পথ অচেনা ছিল না, ইংরেজি বিদ্যার আলো তখনও প্রবেশ করেনি। দুজনই এসেছে ইংরেজি বিদ্যা আয়ত্ত করতে একেবারে গোড়া থেকে। তাদের মধ্যে রামানন্দের মেধাই ছিল উজ্জ্বলতর। অচিরেই দেখা গেল আমাদের ক্লাসে আমার যেটুকু সম্মান ছিল তা আর বজায় থাকছে না। ইংরেজি বাদে আর সব বিষয়েই তারা আমার থেকে বহু দূর এগিয়ে আছে। কিন্তু ইংরেজিতে তারা সবার পিছে, সবার নীচে, সবহারাদের মাঝে। দুই পক্ষেই চলল অধ্যবসায়ের প্রতিযোগিতা। বৎসরান্তে দেখা গেল ইংরেজি বাদে অন্য সব বিষয়ে আমি দৌড়ের ঘোড়ার মতো শুধু কান এগিয়ে দিয়ে অতি কষ্টে প্রথম স্থান অধিকার করেছি, রামানন্দ ও বসন্তের স্থান তার অতি অল্প নীচে। কিন্তু ইংরেজিতে তারা ক্লাসের অন্তত

চল্লিশটি ছাত্রকে ডিঙ্গিয়ে এসে আমাকে ছোঁয়-ছোঁয় অবস্থায় পৌছেছে। ক্লাসের বাইরে কেউ তাদের ইংরেজি শেখার সহায়তা করেনি। ক্লাসে ইংরেজি-শিক্ষক যা বলতেন তার সবটুকুই তারা পুরোপুরি আত্মস্থ করতে পারত তাদের উঁচুমানের বাংলা ভাষাজ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে। এই অভিজ্ঞতার কথা আমি আজও ভুলতে পারিনি। যতদূর মনে আছে স্বনামখ্যাত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় কোনো সময়ে 'প্রবাসী'তে বলেছিলেন, তিনিও বঙ্গবিদ্যালয়ে ছাত্রবৃত্তি পর্যন্ত পড়েছিলেন। তাতে যে শিক্ষার ভিত্ তৈরি হয়েছিল তার উপরে ইংরেজি বিদ্যার ইমারত গড়া দুঃসাধ্য হয়নি।

"রবীন্দ্রনাথও তাঁর অনুরূপ অভিজ্ঞতার কথা বারবার বলে গেছেন। তিনি তাঁর জামাতা নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে এক চিঠিতে (১৯২৪) তাঁর বারো বৎসর বয়স্ক দৌহিত্র নীতীন্দ্রনাথের বাংলা-শিক্ষা প্রসঙ্গে লিখেছিলেন —'কাঁচা বয়সেই ভাষাটা জীবনের সঙ্গে গভীর করে মেলে, আর ভাষার সঙ্গে সঙ্গে দেশের যথার্থ প্রাণ প্রাণের সঙ্গে যুক্ত হয়। আমি প্রায় ষোলো বছর পর্যন্ত ইংরেজি না শিখে বাংলা শিখেছিলুম। তাতেই আমার মনের ভূমিকা পাকা করে তৈরী হয়েছিল, সেই ভূমিকার উপর অতি সহজেই প্রায় বিনা চেষ্টায় ইংরেজির পত্তন হতে পারল' —দেশ, ১৩৬২, পৌষ ৮। তাঁর 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থে আছে —'বাংলা শিক্ষা যখন বহু দূর অগ্রসর হইয়াছে তখন আমরা ইংরেজি শিখিতে আরম্ভ করিয়াছি।' বাংলা ভাষায় তাঁর বিদ্যাচর্চা চলেছিল ষোলো বছর পর্যন্ত। তার শেষ চার বছরে তাঁকে কিছু ইংরেজি শেখানো হয়েছিল, ইস্কুলের নির্ভেজাল বাংলা বিদ্যা অর্জনে কোনো বাধা না ঘটিয়ে। অল্প বয়সে ইংরেজি শেখাবার কুফল সম্বন্ধে তাঁর সুস্পষ্ট উক্তি এই —'অতি বাল্যকালেই ইংরেজির সহিত মিশাইয়া বাংলা তাহাদের তেমন সুচারুরূপে অভ্যস্ত হয় না। ইংরেজিতেও শিশুবোধ্য বই পড়া তাহাদের অসাধ্য। ফলে তাহাদের চিন্তাশক্তি ও কল্পনাশক্তি বহুকাল পর্যন্ত খাদ্যাভাবে অপুষ্ট অপরিণত থাকিয়া যায়।' বস্তুত অল্প বয়সে দুই ভাষা একসঙ্গে শেখাতে গেলে কোনো ভাষাই ভাল করে আয়ত্ত হয় না, ফলে মনোবিকাশের পথ হয় অবরুদ্ধ। অভিজ্ঞ বিচক্ষণ শিক্ষকমাত্রই তা জানেন। বস্তুত দুই ভাষা একসঙ্গে শেখানো শিক্ষানীতি-সম্মতও নয়। আমি দেখেছি যেসব ইংরেজি-মিডিয়াম ইস্কুলে শিক্ষক-শিক্ষিকারা শিশুদের সঙ্গে সবসময় ইংরেজিতেই কথা বলেন তারা ইংরেজিটা ভাল করেই শেখে। কিন্তু তারা সাধারণত বাংলায় কাঁচা থাকে। তাই অনেক সময় বাংলা-ইংরেজী মিশিয়ে একরকম বাংরেজি ভাষায় ভাবতে ও বলতে অভ্যস্ত হতে হয়। তাদের

চিন্তাটাই হয় দ্বিচারী। আর নীচের ক্লাস থেকেই বাংলার সঙ্গে ইংরেজি শেখানো হলে শিশুরা কোনো ভাষাই ভাল আয়ত্ত করতে পারে না, ফলে বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে তাদের মনের বিকাশ হয় না।

"এসব কারণে আমি মনে করি বারো বছর বয়স পর্যন্ত সব শিক্ষাই চালানো উচিত একমাত্র মাতৃভাষায়। তার পরের চার বছরে ঠিক প্রণালীতে শিক্ষা দিলে আজকাল দশম শ্রেণীর ছাত্ররা যে মানের ইংরেজি শেখে, তার চেয়ে উঁচু মানের ইংরেজি শেখানো সম্ভব বলেই আমি মনে করি।"[৮২]

প্রাথমিক স্তরের ভাষা-শিক্ষা সম্পর্কে বিশ্বের ও এদেশের ভাষাবিদ ও শিক্ষাবিদেরা যে-সকল অভিমত প্রকাশ করেছেন, বিভিন্ন কমিশন-কমিটি এই বিষয়ে যে-সব সুপারিশ করেছেন, সেগুলির ভিত্তিতে বর্তমান সরকারের ভাষানীতি গড়ে উঠেছে। তাই কেবলমাত্র প্রবোধচন্দ্র সেন একা নন, শুভবুদ্ধি-সম্পন্ন সৎ বুদ্ধিজীবীরা জনস্বার্থে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের বৈজ্ঞানিক ভাষানীতিকে সমর্থন করেছেন। কিন্তু বর্তমান সরকার জানেন, ভাষানীতি নির্ধারণ করার চেয়ে তাকে কার্যকরী করা অতীব কঠিন কাজ। চাকরি-নির্ভর মধ্যবিত্তশ্রেণীর ইংরেজির প্রতি আত্যন্তিক দুর্বলতা ও অহেতুক ভীতি এই ভাষানীতি রূপায়ণের পথে প্রধান অন্তরায়। এবং এই দুর্বলতা ও ভীতিই হ'ল ভাষানীতি-বিরোধীদের একমাত্র মূলধন। ইংরেজি-সমর্থকেরা জানেন, ইংরেজ চলে গেলেও 'রাজভাষার দর বেশি, সুতরাং আদরও বেশি। কেবল চাকরির বাজারে নয়, বিবাহের বাজারেও বরের মূল্যবৃদ্ধি ঐ রাস্তাটাতেই।'[৮৩] অর্থাৎ চাকরির বাজারে ইংরেজি-জানাটা বৃটিশ-যুগের মত একালেও আবশ্যকীয় শর্ত। তাই শিক্ষা কমিশন সুপারিশ করেছিলেন, "যত শীঘ্র সম্ভব প্রত্যেকটি রাজ্যের প্রশাসনিক ভাষা-রূপে আঞ্চলিক ভাষা প্রবর্তন করতে হবে, যাতে উঁচু পদগুলির চাকরি লাভের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক ভাষায় শিক্ষিত ব্যক্তিরা কোনো প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন না হন।"[৮৪] কিন্তু পূর্ববর্তী সরকারগুলি এবিষয়ে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি। সুতরাং ইংরেজির রাজকীয় মর্যাদা অব্যাহত ছিল এবং এখনও আছে।

বর্তমান সরকার এ সমস্যা সম্পর্কে সচেতন। তাঁরা একদিকে প্রশাসনের সর্বক্ষেত্রে মাতৃভাষা প্রচলনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন, অন্যদিকে মধ্যবিত্তশ্রেণীর ঔপনিবেশিক মানসিকতা দূর করতে সচেষ্ট হয়েছেন। সুপ্রাচীনকাল থেকে আধুনিককাল পর্যন্ত শিক্ষাক্ষেত্রে বর্ণ-বিত্তের যে-আধিপত্য বর্তমান, তার বিলুপ্তি ঘটিয়ে শিক্ষাঙ্গনে সকলের প্রবেশাধিকার প্রতিষ্ঠায় তাঁরা বদ্ধপরিকর। দারিদ্র-

সীমারেখার নীচের মানুষেরা যাতে মানুষের মত বাঁচতে পারেন, করুণা-ভিক্ষার পরিবর্তে মনুষ্যত্বের মর্যাদা দাবি করতে পারেন, সেকারণে তাঁরা ভূমি-সংস্কার ও শিক্ষা-সংস্কার উভয় কর্মে লিপ্ত হয়েছেন। তাঁরা প্রাথমিক শিক্ষার যে-লক্ষ্য ঘোষণা করেছেন, তাতে তাঁদের মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ ঘটেছে —"শোষণ-মুক্ত গণতান্ত্রিক সমাজের উপযুক্ত সামাজিক ও মানবিক মূল্যবোধের বিকাশ-সাধন, সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশ সম্পর্কে অন্ধ বিশ্বাস ও কুসংস্কারমুক্ত বৈজ্ঞানিক যুক্তিশীল মনোভাব গঠনের এবং তদনুযায়ী নিজ জীবনচর্যায় অভ্যস্ত হওয়ার উপযুক্ত ভিত্তি স্থাপনই প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য।"[৮৫]

বামফ্রন্ট সরকার চান শিক্ষার বারিধারায় সিক্ত হোক দেশের মাটি, নব কিশলয়ে ভরে উঠুক সমগ্র দেশ। নিরক্ষরতার কলঙ্ক থেকে মুক্ত হোক অবজ্ঞাত-অখ্যাত মানুষেরা। শিক্ষার আলোয় তাঁদের জীবনের অন্ধকার দূরীভূত হোক। দারিদ্রের জন্য ভাগ্যকে অভিশাপ দেওয়া নয়, ভাগ্যের ওপরে নির্ভরশীলতা নয়, আপন কর্মক্ষমতায় উজ্জীবিত হোক তাঁরা। অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার থেকে মুক্ত হোক তাঁরা। সামন্ত-শোষণের শৃঙ্খল ভেঙে তাঁরা এগিয়ে চলুক জ্ঞানের রাজ্যে—তাঁদের জ্ঞানসমৃদ্ধ পদক্ষেপে আলোকিত হোক এই ধরণী।

দ্বাদশ অধ্যায়

অমৃত-লাভে হোক অধিকারী

স্বাধীন ভারতের বয়স ৩৪ বছর অতিক্রান্ত হলেও তার শিক্ষানীতি ঔপনিবেশিকতার অভিশাপ থেকে মুক্ত হয়নি। তার শিক্ষাদর্শ বৃটিশ-শিক্ষাদর্শের অনুবর্তন মাত্র। বৃটিশ-যুগে শিক্ষার লক্ষ্য ছিল সীমাবদ্ধ। প্রশাসনের প্রয়োজনে কিছু ব্যক্তিকে উচ্চশিক্ষিত করা, সাম্রাজ্যের সমর্থক-রূপে শিক্ষিত ব্যক্তিদের একটি পৃথক শ্রেণী তৈরি করা এবং এই দ্বিবিধ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য পাশ্চাত্য সাহিত্য ও বিজ্ঞানকে ইংরেজিভাষার মাধ্যমে উপস্থিত করার লক্ষ্য নিয়েই বৃটিশ-ভারতের শিক্ষানীতি গড়ে উঠেছিল। স্বাধীন ভারতের শিক্ষানীতির লক্ষ্যও তদ্রূপ। জাতীয় শিক্ষার জন্য জনগণের সোচ্চার দাবিতে ইংরেজ-সরকার বাধ্য হয়ে যেমন মাঝে-মধ্যে কমিশন-কমিটি গঠন, বিশেষজ্ঞ নিয়োগ ইত্যাদি কৌশল গ্রহণ করে শিক্ষা-সম্প্রসারণের প্রশ্নটিকে এড়িয়ে যেতেন, স্বাধীন ভারতেও সেই একই কৌশল গ্রহণ করা হয়েছে। অথচ ১৯৪৮ সালের জানুয়ারি মাসে সর্বভারতীয় শিক্ষা-সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু 'পরিবর্তিত অবস্থানুসারে শিক্ষাপদ্ধতি গড়ে তোলা'র জন্য 'বৈপ্লবিক' শিক্ষানীতি গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছিলেন।[১] কারণ, পণ্ডিতজীর মতে "ইংরেজরা ভারতবর্ষে একটা নতুন জাত বা শ্রেণী গড়ে তুলেছিল। তাঁরা হলেন ইংরেজি-শিক্ষিত শ্রেণী। জনগণের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে তাঁরা নিজেদের সৃষ্ট জগতে বাস করতেন। তাঁরা সবসময়ে শাসকদের করুণাঘন চোখের দিকে লক্ষ্য রাখতেন ; এমনকি তাঁরা যখন প্রতিবাদ করতেন, তখন তাও শাসকদের কাছেই।"[২]

পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু ও কংগ্রেসের অন্যান্য নেতারা 'বৈপ্লবিক' শিক্ষানীতির কথা বললেও সামন্তশোষণমুক্ত নতুন অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে না ওঠায় স্বাধীন ভারতের শিক্ষানীতিতে কোনো রকম মৌলিক পরিবর্তন ঘটেনি। ইংরেজদের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত ঔপনিবেশিক

শিক্ষাদর্শের পরিবর্তে 'বৈপ্লবিক' শিক্ষাদর্শ গৃহীত হয়নি। পক্ষান্তরে, শিক্ষাকে জনমুখী না করে ইংরেজ-সরকারের শিক্ষানীতি অনুসরণ করা হয়েছে। একাধিক শিক্ষা কমিশন গঠন, গালভরা নামে বহু শিক্ষা কমিটি গঠন, শিক্ষা-বিশেষজ্ঞ নিয়োগ, বিভিন্ন সময়ে শিক্ষা-সমীক্ষা করে শিক্ষার অগ্রগতি লক্ষ্য করা ইত্যাদি চোখ-ধাঁধানো বহুবিধ কাজ করা হলেও সর্বস্তরে শিক্ষার বিস্তার ঘটেনি, অপচয় ও বদ্ধতার অভিশাপ থেকে শিক্ষাজগৎ মুক্ত হয়নি, শিক্ষাক্ষেত্রে শ্রেণী-আধিপত্য অবলুপ্ত হয়নি। তাই ভারতের প্রবীণ শিক্ষাবিদ্ শ্রী জে. পি. নায়েক শাসকশ্রেণীর শিক্ষা-প্রয়াস লক্ষ্য করে তীব্র মন্তব্য করেছেন, "ইংরেজদের কাছ থেকে উত্তরাধিকার-সূত্রে প্রাপ্ত ভারতের শিক্ষাব্যবস্থায় বৈপ্লবিক পরিবর্তনের জন্য কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। নিজেদের মানসিক পরিতৃপ্তির জন্য আমরা টুকরো-টাকরা শিক্ষা-সংস্কার করেছি এবং শিক্ষার বিষয়বস্তু ও শিক্ষা-কাঠামোয় কিছু ছোটোখাটো পরিবর্তন করেছি। প্রকৃতপক্ষে ইংরেজ-শাসনে নির্মিত শিক্ষাব্যবস্থা বর্তমানে কিছু গৌণ সংস্কার সহ সম্প্রসারিত হয়েছে, যা চূড়ান্ত লক্ষ্য রূপায়ণের ক্ষেত্রে কোনো প্রত্যক্ষ প্রভাব বিস্তার করেনি।"[৩] কারণ তাঁর মতে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার ন্যায় উচ্চতর শিক্ষাও উচ্চ ও মধ্যশ্রেণীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তিনি বলেছেন, **"সমাজের অন্যান্য শ্রেণীর তুলনায় শহরের অধিবাসীরা, উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীভুক্ত ব্যক্তিরা এবং উচ্চতর পদের চাকরিতে অথবা পেশায় নিযুক্ত ব্যক্তিরা উচ্চতর শিক্ষার সুযোগ অধিকতর লাভ করে থাকেন।"**[৪] [মোটা হরফ লেখকের]

১৯৭৩ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ-উপাচার্য শ্রী পি. কে. বসু লিখেছেন, "এখনো পর্যন্ত ছাত্রদের সামাজিক-আর্থনীতিক অবস্থার উন্নতি হয়নি। ... সুতরাং উচ্চতর শিক্ষা কার্যত মধ্যবিত্তশ্রেণীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ।"[৫]

সুতরাং উচ্চতর শিক্ষা সহজলভ্য ও সম্প্রসারণের জন্য শিক্ষা-কমিশনের (১৯৬৪-১৯৬৬ খৃঃ.) প্রতিবেদনে বলা হ'ল, "শিক্ষার লক্ষ্য, শিক্ষণীয় বিষয়, শিক্ষাদানের পদ্ধতি, কর্মসূচী, ছাত্রসমাজের আয়তন ও মানসিকতা, শিক্ষক-নির্বাচন ও বৃত্তিগত প্রস্তুতি, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ইত্যাদি বিষয়ে পরিবর্তনের দ্বারা যদি আধুনিক, গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠন করতে হয়, তাহলে সামন্ততান্ত্রিক ও ঐতিহ্যানুসারি সমাজের দ্বারা লালিত সাম্রাজ্যিক প্রশাসনযন্ত্রের প্রয়োজন পূরণের উদ্দেশ্যে সৃষ্ট বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার মৌলিক পরিবর্তন প্রয়োজন।"[৬] এবং অহেতুক বিলম্ব না করে পরিবর্তনের পরিকল্পনাকে

কার্যকরী করতে হবে ; কারণ, কমিশনের মতে 'বর্তমান সমাজে একমাত্র জরুরী কাজ হ'ল, শিক্ষা-সংস্কারকে বাস্তবায়িত করা।'[৭]

অথচ একথা নতুন নয়। শিক্ষা-কমিশনের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, "আমরা এখানে যা বলেছি, তার অনেক বিষয় বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা-কমিশন (১৯৪৮-১৯৪৯) বহু পূর্বেই বলেছেন। যেমন কৃষি-শিক্ষা ও তার উন্নয়ন বিষয়ে কমিশন অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন, কিন্তু সে-বিষয়ে কোনো উল্লেখযোগ্য কাজ হয়নি। বর্তমানে প্রকৃত প্রয়োজন হ'ল কাজ।"[৮] অর্থাৎ ১৯৪৮-১৯৪৯ সাল থেকে ১৯৬৪-৬৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ইংরেজদের কাছ থেকে উত্তরাধিকার-সূত্রে প্রাপ্ত ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থার 'বৈপ্লবিক' পরিবর্তনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কোনো আন্তরিক প্রচেষ্টা ছিল না। তাই ১৯৬৫ খৃষ্টাব্দে শিক্ষা-কমিশনের সম্পাদক শ্রী জে. পি. নায়েক বলতে বাধ্য হয়েছেন, "বিগত ষোল বছরে ভারতের শিক্ষাজগতে বিষয়বস্তু ও প্রযুক্তিবিদ্যার কিছু সংশোধনের দ্বারা পূর্ববর্তী শিক্ষাব্যবস্থার কেবলমাত্র সম্প্রসারণ ঘটেছে।"[৯]

'পূর্ববর্তী শিক্ষাব্যবস্থার' অর্থ হ'ল, বৃটিশ-ভারতের ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থা এবং এই শিক্ষাব্যবস্থাই আজো পর্যন্ত অক্ষত রয়েছে এবং তার রক্ষণাবেক্ষণের কাজে সরকারি শক্তি নিয়োজিত হয়েছে। কিন্তু কেন? সকলের জন্য শিক্ষার সমান সুযোগ-দানের নীতি কেন কেন্দ্রীয় সরকার বাস্তবায়িত করলেন না? সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ-গঠনের সংকল্প গ্রহণ করেও কাদের স্বার্থে জনমুখীন শিক্ষাদানের নীতি গ্রহণ করা হ'ল না? জ্ঞানের রাজ্যে বৈষম্য কেন? একদিকে মহাকাশে উপগ্রহ প্রেরণ, অন্যদিকে সতীদাহ-প্রথা পুনঃ প্রচলন—আধুনিক ভারতে এই বিসদৃশ অবস্থা টিকে থাকে কেমন করে—এইসব প্রশ্নের উত্তর সুস্পষ্টভাবে না দিয়ে শিক্ষা কমিশন ইতিহাসের স্মরণাপন্ন হয়েছেন। কমিশন বলেছেন, "**ইতিহাসে এরকম প্রচুর ঘটনা দেখা যায়, যেখানে ছোট ছোট গোষ্ঠী ও আলোকপ্রাপ্ত বুদ্ধিজীবী শাসনক্ষমতার বিশেষ অধিকারের সুযোগ নিয়ে তাঁদের কর্তৃত্ব বজায় রাখার হাতিয়ার রূপে শিক্ষাকে ব্যবহার করতেন এবং সে-সকল তত্ত্ব চিরস্থায়ী করার চেষ্টা করতেন, যেগুলি তাঁদের অধিকার চিরস্থায়ী করার পক্ষে সহায়ক হত।**"[১০] [মোটা হরফ লেখকের]। এই ইতিহাসের ব্যতিক্রম নয় আমাদের দেশ। তাই একটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠী শাসকশ্রেণীর সাহায্যে উচ্চশিক্ষার বিনিময়ে ধনসম্পদে স্ফীত, অন্যদিকে বিশাল জনসমাজ প্রাথমিক শিক্ষার অভাবে দারিদ্রে পীড়িত, অন্ধ বিশ্বাস ও কুসংস্কারে নিমজ্জিত।

উনিশ শতকে সমাজের এই ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর কাছে জমিদারি ও ইংরেজি-বিদ্যা

ছিল সোনার খনি। তাঁরা অভিজ্ঞতায় বুঝেছিলেন, বিদ্যা এক ধরণের সম্পদ। শিক্ষায় হয় বিদ্যালাভ, বিদ্যালাভে অর্থ, ক্ষমতা ও সম্মানলাভ ঘটে এবং সমাজের উচ্চতর স্তরে বিচরণ করার অধিকার এনে দেয় —লেখাপড়া করে যে, গাড়ি-ঘোড়া চড়ে সে। সেকারণে তাঁরা বিদ্যাকে নিজের শ্রেণীর মধ্যে গণ্ডীবদ্ধ করে রাখার জন্য ইংরেজিভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের দাবি উত্থাপন করেছিলেন; শিক্ষার কাঠামো, ভাষাশিক্ষা ও পাঠক্রম এমনভাবে তাঁরা নির্ধারণ করেছিলেন যাতে দেশের অধিকাংশ মানুষ বিদ্যালাভের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন। শিক্ষা-ক্ষেত্রে আধিপত্য বিস্তারের প্রয়াস অবশ্য বিস্ময়জনক কিছু নয়। বৈদিক যুগে বিদ্যার মালিক ছিল উচ্চবর্ণভুক্ত ব্যক্তিরা। স্মৃতি-ন্যায়-সাহিত্য-দর্শন পাঠের অধিকারী ছিলেন কেবলমাত্র তাঁরাই, সে-জগতে নিম্নবর্ণের প্রবেশাধিকার ছিল না। বর্ণশাসিত ও শ্রেণীবিভক্ত সমাজে দুর্বলশ্রেণীর শিক্ষালাভের সুযোগ থাকে না। কারণ, উৎপাদন যন্ত্রের মালিকানার ওপরে শিক্ষা প্রসারের গতি-প্রকৃতি নির্ভর করে। ব্যক্তি-মালিকানার পরিবর্তে সমাজের কর্তৃত্ব ও অধিকার প্রতিষ্ঠিত না হলে শিক্ষা সর্বত্রগামী হয় না; শ্রেণী-আধিপত্যের বিলুপ্তি ঘটে না। 'অর্থনীতিতে লাসেফেয়ার বা অবাধ প্রতিযোগিতা যেমন যার হাতে টাকা আছে তাকেই আরো টাকার মালিক করে, শিক্ষার ক্ষেত্রেও তেমনি যাদের ঘরে শিক্ষা আছে বা যাদের বিদ্যা কেনার টাকা আছে তাদেরই আরো বিদ্যাবান (বিদ্বান নয়) করে তোলে। বাংলা সাহিত্যে পেটমোটা, গদীয়ালা শেঠজীর যে বর্ণনা আছে তাদের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরুষ আজ কেতাদুরস্ত সঙ্গীত-সাহিত্য-রসিক, বিজ্ঞানী, টেকনোলজিস্ট বা ডাক্তার। গত ত্রিশ বছরে গ্রামাঞ্চলে ধনী ও অধুনা-ধনী লোকেদের ঘরে শিক্ষার যতখানি বিস্তার হয়েছে ততখানি অন্য অঞ্চলে হয়নি। শিক্ষাক্ষেত্রে অবাধ প্রতিযোগিতায় হরিপদ কেরাণীর ছেলের যদিবা কিছু চান্স থাকে, হরি বাগদী বা নাথুরামের ছেলের কোনো চান্স নেই —এটা ধ্রুব সত্য —অভিজ্ঞ শিক্ষক ও শিক্ষা-গবেষক মাত্রেই একথা জানেন।'[১১] তাই যে বিদ্যা প্রাচীন যুগে ছিল বর্ণশ্রেষ্ঠদের অধিকারে, আধুনিক যুগে সেই বিদ্যা বিত্তশ্রেষ্ঠদের করায়ত্ত হ'ল।

কিন্তু অর্থনৈতিক জগতে 'অবাধ প্রতিযোগিতা' ক্রমেই সংকুচিত হয়ে একচেটিয়া ব্যবসার আধিপত্য বাড়ছে, মূল্যস্ফীতি ঘটছে, ছোট-ছোট ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি অসম-প্রতিযোগিতায় পিছু হঠছে, উচ্চশিক্ষার জগতেও তার প্রতি-ফলন ঘটছে। উচ্চতর বিদ্যালাভে অবাধ প্রতিযোগিতার পরিবর্তে ক্রমেই একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে; যার অঢেল অর্থ আছে, সে প্রচুর অর্থ

ব্যয় করে উচ্চতর বিদ্যা কেনে; আর অর্থের অভাবে হরিপদ কেরাণীর ছেলেরা ক্রমশ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষালাভের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, বি-সম প্রতিযোগিতায় সাফল্যলাভ করতে না পেরে বাপ-মায়ের রাগ-কান্না, হতাশা-ক্ষোভের কারণ হচ্ছে। তবুও যাঁরা অদম্য প্রাণশক্তির জোরে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় সাফল্যলাভ করেন, জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হবার স্বপ্ন দেখেন, কিছুদিনের মধ্যে তাঁদের স্বপ্ন বাস্তবের কঠিন আঘাতে ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। 'আমাদের অধিকাংশ দরিদ্র শিক্ষার্থী পরের নিকট ধার করা জীর্ণ গাউনে কথঞ্চিৎ শরীর আবৃত রাখিয়া ভাইস চ্যান্সেলারের হস্ত হইতে কম্পিত হস্তে সাধের ডিপ্লোমাখানি গ্রহণ করিয়া মুহূর্তের জন্য উৎফুল্ল হয়, কিন্তু তাহার পর সেনেট হাউসের সোপানাবলী অতিক্রম করিয়াই আপনাদের ভবিষ্যৎ জীবন আঁধার দেখে; যখন দেখিতে পায়, তাহাদের বৃদ্ধ পিতামাতা, তাহাদের বিধবা পিসী মাসী, তাহাদের ক্ষুধার্ত ভাই ভগিনী বড় আগ্রহের সহিত বহু বৎসর ধরিয়া তাহাদের মুখ চাহিয়া বসিয়া আছে, কিন্তু সেই আশা পূরণের বিশেষ কোন ভরসা নাই; যখন দেখিতে পাই, শতের মধ্যে পাঁচজন মাত্র সংসারে প্রবেশ করিয়া কিঞ্চিৎ সফলতা উপার্জন করে, কিন্তু বাকী পঁচানব্বই জনকে অধম কেরাণীজীবন অথবা তদপেক্ষা হীনতর অন্য কোন বৃত্তি আশ্রয় করিয়া প্রত্যহ শত অপমান নীরবে সহ্য করিতে হয়, অপমানের অশ্রুধারা তাহাদের গণ্ডদেশ দিয়া বিগলিত হইতে পারে না, কিন্তু লোকলোচনের অন্তরালে তাহাদের অভ্যন্তরে ক্ষরিত হইয়া তাহাদের হৃদয়কে ক্লিন্ন করে, তাহাদের প্রাণকে জীর্ণ করে, তাহাদের অন্তরিন্দ্রিয়কে অবসন্ন করে।'[১২]

এই চিত্র আজ থেকে আশি বছর পূর্বেকার হলেও একালে তা মর্মান্তিকভাবে সত্য; বরং আরো করুণ। লক্ষ লক্ষ শিক্ষিত বেকার যুবকের দীর্ঘশ্বাসে সমাজজীবন ভারাক্রান্ত। বর্তমানে উচ্চশিক্ষিত বেকারের সংখ্যা কুড়ি লক্ষ এবং শিক্ষার যথাযোগ্য বিন্যাস না ঘটালে এই সংখ্যা আগামী দশ বছরে দ্বিগুণ হবে। প্রাণশক্তিতে পূর্ণ অথচ কর্মহীন যুবকদের এই বিশাল বাহিনী নিয়ে ভারতের উন্নতি-সাধন সম্ভব নয়। 'সমাজের উপরের থাকের লোক খেয়ে-পরে পরিপুষ্ট থাকবে আর নীচের থাকের লোক অর্ধাশনে বা অনশনে বাঁচে কি মরে সে-সম্বন্ধে সমাজ থাকবে অচেতন এটাকে বলা যায় অর্ধাঙ্গের পক্ষাঘাত। এই অসাড়তার ব্যামোটা বর্বরতার ব্যামো।'[১৩] সুতরাং দেশ ও জাতির উন্নতির স্বার্থে 'শিক্ষার সহিত জীবনের সামঞ্জস্য সাধনের'[১৪] জন্য শিক্ষার সঙ্গে জীবিকার বিষয়টিও একই সঙ্গে বিবেচনা করতে হবে। জীবন-সমস্যার মৌলিক সমাধান

না হলে শিক্ষার ক্ষেত্রে অগ্রগতি সম্ভব নয়।[১৫] শিক্ষাজগতে একচেটিয়া প্রভুত্ব বিস্তারে প্রয়াসী দুষ্ট চক্রের অপপ্রয়াস ব্যর্থ করতে হলে 'আমাদের দেশে বিদ্যার ক্ষেত্রকে প্রাচীরমুক্ত করিতেই হইবে।'[১৬] শিক্ষা ও জীবিকার সমান সুযোগ সকলকে দিতে হবে এবং সেজন্য প্রয়োজন জনমুখীন সমাজভিত্তিক জাতীয় শিক্ষানীতি।

শিক্ষা কমিশনও একই অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তাঁরা প্রথমেই বর্তমান শিক্ষানীতির সমালোচনা করে বলেছেন, "বর্তমানে প্রচলিত শিক্ষানীতি জীবনের সঙ্গে অনেকাংশে সংযোগশূন্য এবং এর উদ্দেশ্য ও বিষয়বস্তুর সঙ্গে জাতীয় উন্নয়নের একটা বিরাট পার্থক্য বর্তমান।"[১৭] তাঁরা আরো বলেছেন, "পুনর্গঠনের জন্য জাতীয় কর্মকাণ্ডের বিষয়ে স্কুল-কলেজগুলির অধিকাংশই নির্বিকার এবং শিক্ষক ও ছাত্ররা এবিষয়ে সাধারণত দায়িত্ব গ্রহণে অনিচ্ছুক থাকেন। এমন কি তাঁরা প্রায়ই জাতীয় উন্নয়ন-প্রয়াসের মৌলিক নীতিগুলির বিষয়ে অজ্ঞ থাকেন এবং কর্মকাণ্ডে তাঁদের অংশগ্রহণ অনুল্লেখযোগ্য।"[১৮] সেকারণেই শিক্ষা কমিশন দেশ ও জাতির সঙ্গে শিক্ষার নিবিড় সম্পর্ক স্থাপনের প্রয়াসে সামগ্রিক শিক্ষা-সংস্কারের পরিকল্পনা উপস্থিত করেছেন এবং সকলের প্রতি সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বলেছেন, "শিক্ষা-বিষয়ে ইতোপূর্বে যে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, তার চেয়ে অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করে শিক্ষা কমিশনের সুপারিশগুলিকে নিরন্তর ও তীব্রতর প্রচেষ্টার দ্বারা কার্যকরী করতে হবে।... শিক্ষা-বিষয়ে পরবর্তী দশ বছরে কি কাজ করা হবে তারই ওপরে দেশের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। কমিশনের সুপারিশগুলির বিষয়ে অবিলম্বে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। এখনি কাজ আরম্ভ করা উচিত এবং তা দ্রুতগতিতে উচ্চতম পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া প্রয়োজন। কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকারসমূহকে এই সুপারিশগুলি রূপায়ণের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। তাঁরা যদি সে-দায়িত্ব গ্রহণ না করেন, তবে অন্য কেউ তা পারবেন না।"[১৯]

শিক্ষা কমিশন প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চতর শিক্ষা অর্থাৎ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে সামগ্রিক প্রতিবেদন এবং জীবন ও জীবিকার সঙ্গে সম্পৃক্ত করে শিক্ষার কাঠামো, শিক্ষণীয় বিষয়, বিভিন্ন স্তরে ভাষা-শিক্ষা ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে তাঁদের সুপারিশ ১৯৬৬ খৃষ্টাব্দের ২৯ জুন উপস্থিত করেছেন। উচ্চতর শিক্ষাক্ষেত্রে ভাষা-চর্চা সম্পর্কে তাঁরা বলেছেন, "**উচ্চতর শিক্ষাক্ষেত্রে ভাষা-শিক্ষা আবশ্যিক হওয়া উচিত নয়।**"[২০] কারণ তাঁদের মতে আবশ্যিক-রূপে ভাষা-শিক্ষা অব্যাহত থাকলে

'ছাত্রদের কাছে তা ভারী বোঝা হবে এবং তার ফলে দুর্লভ সংস্থানের অপচয় ও উচ্চতর শিক্ষায় জ্ঞান অর্জনের মানের অবনয়ন ঘটবে।'[২১] শিক্ষা কমিশন ভাষা-শিক্ষার বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে পুনরায় উল্লেখ করে বলেছেন, "আমরা নিশ্চিতভাবে মনে করি যে, বিশ্ববিদ্যালয়-স্তরে কোনো ভাষা আবশ্যিক বিষয়-রূপে গৃহীত হবে না। কিন্তু ভারতের প্রাচীন ও আধুনিক ভাষাসমূহ এবং গুরুত্বপূর্ণ বিদেশী ভাষাসমূহ নির্বাচিত বিষয়-রূপে গৃহীত হতে পারে। আমরা অন্যত্র যে সুপারিশ করেছি তদনুযায়ী বিষয়-নির্বাচনের ক্ষেত্রে যথোচিত সুবিধা ও অধিকার দেওয়া উচিত। কোনো একটি ভাষা-শিক্ষা আবশ্যিক হলে ছাত্রদের ওপরে ভারী বোঝা চাপে। তার ফলে কিছু কিছু প্রয়োজনীয় বিষয়-কম্বিনেশন অসম্ভব হয়ে যেতে পারে। কোনো এক বৃহৎ বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক-স্তরে কেবলমাত্র ভাষার পঠন-পাঠনের জন্যই শিক্ষার সামগ্রিক সময়ের শতকরা পঞ্চাশ ভাগ সময় নিয়োজিত হতে দেখে আমরা উদ্বিগ্ন হয়েছি। এটা নিশ্চিত যে, এরকম পরিস্থিতিতে প্রধান বিষয়গুলির পঠন-পাঠন খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং শিক্ষার মান নীচু থেকে যায়।"[২২] এঅবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয়-স্তরে ভাষা-শিক্ষা বিষয়ে শিক্ষা কমিশন দু'টি সুপারিশ করেছেন, "(১) দশ বৎসরের পরিকল্পনা নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়-স্তরে শিক্ষাদানের মাধ্যম-রূপে আঞ্চলিক ভাষা প্রবর্তন করতে হবে। (২) প্রাচীন ও আধুনিক ভারতীয় ভাষাসমূহকে নির্বাচিত বিষয়-রূপে অধ্যয়নের সুযোগ দিতে হবে এবং বিশ্ববিদ্যালয়-স্তরে কোনো ভাষা-শিক্ষাকে আবশ্যিক করা চলবে না।"[২৩] [উক্ত উদ্ধৃতিসমূহের মোটা হরফের বাক্যগুলি লেখকের]।

শিক্ষা-কমিশন ডিগ্রি-স্তরের বিষয়-কম্বিনেশনের ক্ষেত্রে নতুন নীতি অনুসরণের পক্ষপাতী। তাঁরা বলেছেন, "বর্তমানে স্নাতক-স্তরের কলা ও ও বিজ্ঞান বিভাগে বিষয়-কম্বিনেশনে যে সীমাবদ্ধতা রয়েছে, তাকে আরো সম্প্রসারিত করতে হবে। পূর্বে যে বিষয়গুলি একেবারে পৃথক মনে হত, বর্তমানে দেখা যায়, পরস্পরের সঙ্গে সেগুলি ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত এবং উচ্চতর স্তরে বিষয়-কম্বিনেশনের পুরোনো সীমারেখা ভেঙে পড়ছে। সুতরাং বিষয়-কম্বিনেশনের ক্ষেত্রে অঙ্ক ও অর্থনীতি অথবা দর্শন, জীববিদ্যা সহ পদার্থবিদ্যা অথবা রসায়ন বিজ্ঞান, শিক্ষা অথবা যে কোনো বিষয় সহ অধ্যয়নের অনুমোদন

দিতে হবে। এটা সত্য যে, অধিকাংশ ছাত্র সেই বিষয়গুলি পড়বে, যেগুলি তারা স্কুলে ভালোভাবে পড়েছে এবং কম্বিনেশনের যে বিষয়সমূহ সাধারণত সকলেই চিরাচরিত পদ্ধতি অনুসারে নির্বাচন করে। তাসত্ত্বেও কিছু ব্যতিক্রম ঘটে এবং নতুন শিক্ষা-ব্যবস্থায় তাদের সেই সুযোগ দেওয়া উচিত।"[২৪] অর্থাৎ বিদ্যালাভে সকলের সমান অধিকার ও সুযোগ থাকা উচিত যাতে প্রত্যেকে তার রুচি ও মেধা অনুসারে বিষয় নির্বাচন করতে পারে। সেকারণেই কমিশন সুপারিশ করেছেন, "ডিগ্রি-স্তরের কলা ও বিজ্ঞান বিভাগে বিষয়-কম্বিনেশনের ক্ষেত্রে বর্তমানের তুলনায় অধিকতর সুযোগ দিতে হবে। স্কুলে পঠিত বিষয়-সমূহের সঙ্গে তাকে অত্যন্ত কঠোরভাবে সংযুক্ত করা উচিত নয়।"[২৫]

শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার পরে বারো বছর অতিক্রান্ত হলেও শিক্ষা-কাঠামোর পরিবর্তন ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। শিক্ষা কমিশনের ঐকান্তিক আবেদন সত্ত্বেও বৃটিশ-যুগের শিক্ষা-ব্যবস্থার মৌলিক রূপান্তরের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্যসরকারগুলি কোনো ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করেননি। পক্ষান্তরে বলা যায়, এসময়ে শিক্ষাজগতে সংকট ঘনীভূত হয়েছে। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য জরুরী অবস্থার সময়ে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যের তালিকাভুক্ত শিক্ষাকে যুগ্ম তালিকাভুক্ত করে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের ধারণাটিকে আঘাত করেছেন; অথচ ভারতের প্রত্যেকটি রাজ্য যাতে জাতীয় বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী নিজেদের কৃষ্টি ও সংস্কৃতিকে বিকশিত করতে পারে, ভাষা ও শিক্ষাকে উন্নত করতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রেখেই সংবিধান-প্রণেতারা শিক্ষাকে ভারতের সংবিধানে রাজ্য-তালিকায় রেখেছিলেন। তাসত্ত্বেও কেন্দ্রীয় কংগ্রেস-সরকার শিক্ষা কমিশনের কাছে শিক্ষাকে যুগ্ম তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব রেখেছিলেন। পি. এন. সাপ্রুর সভাপতিত্বে লোকসভার সদস্যদের নিয়ে গঠিত উচ্চশিক্ষা-বিষয়ক কমিটি উচ্চশিক্ষাকে যুগ্ম তালিকাভুক্ত করার জন্য কমিশনের কাছে প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন। শিক্ষার অন্যান্য ক্ষেত্রকেও যুগ্ম তালিকায় রাখার জন্য বিভিন্ন প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। এমনকি শিক্ষা কমিশনের দু'জন সদস্য ডঃ. ভি. এস. ঝা এবং পি. এন. কৃপাল (শিক্ষা-উপদেষ্টা ও কেন্দ্রীয় সরকারের তৎকালীন শিক্ষা-সচিব) অভিমত প্রকাশ করেছিলেন যে, শিক্ষাকে সামগ্রিকভাবে যুগ্ম তালিকায় অবশ্যই রাখতে হবে। কিন্তু শিক্ষা কমিশন শিক্ষাকে কেন্দ্রীকরণের বিরোধী ছিলেন। রাজ্য-তালিকায় শিক্ষার অন্তর্ভুক্তি যে কত বিজ্ঞানসম্মত ও যুক্তিসম্মত ছিল তা বিশ্লেষণ করে তাঁরা উক্ত প্রস্তাব

নাকচ করে দিয়েছেন। কমিশন বলেছেন, "আমরা সমগ্র বিষয়টিকে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে পরীক্ষা করেছি। আমরা শিক্ষাকে বিভিন্ন অংশে ভাগ করে একটি অংশ যৌথ তালিকায় অন্য অংশ রাজ্য-তালিকায় রাখার পক্ষপাতী নই। যে কোনো অবস্থায় শিক্ষাকে সমগ্রভাবে বিবেচনা করা উচিত। আমরা আমাদের সহকর্মীদের সঙ্গে একমত নই এবং আমরা মনে করি যে, আমাদের মতো একটা বিশাল দেশে শিক্ষার জন্য যে অবস্থান সংবিধানে নির্দিষ্ট হয়েছে, তা সম্ভবত সর্বোত্তম ; কারণ তা এমন এক উদ্দীপক কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব সৃষ্টি করে যাঁরা উৎপীড়ক নন। শিক্ষাকে যুগ্ম তালিকাভুক্ত করলে অবাঞ্ছিত কেন্দ্রীকরণ ও সীমাবদ্ধকরণের ঝোঁক দেখা দেবে অথচ যেখানে পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য সম্প্রসারণ ও স্বাধীনতা প্রয়োজন। আমরা বিশ্বাস করি যে, সংবিধানের বর্তমান ব্যবস্থানুসারে শিক্ষার ক্ষেত্রে কেন্দ্র-রাজ্যের সম্পর্কের ভিত্তিতে কাজের প্রচুর সুযোগ রয়েছে যা এখনো সম্পূর্ণরূপে ব্যবহৃত হয়নি। এই সুযোগ সম্পূর্ণরূপে ব্যবহৃত ও অপর্যাপ্ত হলে সংবিধান সংশোধনের বিষয় চিন্তা করা যেতে পারে। সমগ্র বিষয় বিবেচনা করে আমরা সুপারিশ করছি যে, জাতীয় শিক্ষানীতির বিবর্তন ও শিক্ষার উন্নয়নের জন্য সংবিধানে প্রদত্ত অধিকারসমূহের সর্বাত্মক ব্যবহার করতে হবে। তারপরে ধরা যাক, দশ বছর পরে এই বিষয়ে পুনরায় পর্যালোচনা করা যেতে পারে।"[২৬]

শিক্ষা ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণের গুরুত্ব প্রয়োজনের ওপর জোর দিয়ে ১৯৭১ খৃষ্টাব্দে ইউনেস্কোর শিক্ষা কমিটি বলেছেন, "শিক্ষা সম্পর্কে আমাদের মূল চিন্তা যা কেন্দ্রীয় শিক্ষা-সংস্থার পক্ষে বাঞ্ছনীয়, তা হ'ল শিক্ষার সামগ্রিক কাজের ওপর পূর্ণ দৃষ্টি রাখা ; বহুমুখী স্থানীয় ও ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার জাতীয় রাজনৈতিক সমন্বয়-সাধন ; সিদ্ধান্ত-গ্রহণ ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণ ও গৃহীত ব্যবস্থার উপযুক্ত প্রয়োগে উৎসাহদান ; শিক্ষা-ব্যবস্থার সকল স্তরে যাঁরা সংশ্লিষ্ট, তাঁদের অংশগ্রহণে ব্যবস্থা গ্রহণ। আমাদের সুপারিশ হ'ল, সিদ্ধান্ত-গ্রহণ, দায়িত্বভার ও অর্থসংগ্রহ এবং শিক্ষা-সূচীকে সকল এলাকায় সুনির্দিষ্ট ও রূপায়ণের কাজে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের ব্যাপক অংশগ্রহণ ইত্যাদি বিষয়ের সর্বক্ষেত্রেই বিকেন্দ্রীকরণ।"[২৭] অর্থাৎ সমাজের সর্বস্তরে শিক্ষার আলো পৌছে দিতে হলে এবং প্রত্যেকটি জাতির সর্বাঙ্গীণ বিকাশ ঘটাতে হলে কেন্দ্রীকরণ নয়, বিকেন্দ্রীকরণ প্রয়োজন ; যুগ্ম তালিকাভুক্তির পরিবর্তে শিক্ষাকে রাজ্য-তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা আবশ্যক।

কিন্তু শিক্ষাকে যুগ্ম তালিকাভুক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রণের সমস্ত ক্ষমতা নিজেদের

হাতে নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার প্রাথমিক শিক্ষা সহ উচ্চশিক্ষার দরজা সকলের জন্য উন্মুক্ত করার বিষয়ে কিংবা কালোপযোগী করার জন্য কি কোনো ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন? কেন্দ্রীয় বাজেটের সমগ্র শিক্ষাখাতে বিনিয়োগের চিত্রটি তুলে ধরলে উত্তরটা হবে নেতিবাচক। জাতীয় আয়ের মাত্র তিন শতাংশ শিক্ষাখাতে ব্যয় করা হয়। অথচ শিল্পোন্নত দেশগুলির কথা ছেড়ে দিলেও তৃতীয় বিশ্বের আলজিরিয়া ব্যয় করে ৫ শতাংশ, মিশর ৫.৪ শতাংশ, জাম্বিয়া খরচ করে ৭.৪ শতাংশ।[২৮] আর আমাদের দেশে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বিনিয়োগের অবস্থা তো ভয়াবহ। পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় প্রস্তাবিত ২১০ কোটি টাকার পরিবর্তে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন পেয়েছেন ১৭৮ কোটি ৭৬ লক্ষ টাকা। ষষ্ঠ পরিকল্পনায় ব্যয়-বরাদ্দের পরিমাণ আরো হ্রাস করে ১২৬ কোটি টাকা নির্দিষ্ট করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে, এই ব্যয়-বরাদ্দ থেকে আরো ৪৩ কোটি ৩২ লক্ষ টাকা নাকি ছাঁটাই করা হবে। পঞ্চম পরিকল্পনায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে দেওয়া হয়েছে ৩ কোটি ৬৮ লক্ষ ৭৩ হাজার টাকা। কিন্তু ষষ্ঠ পরিকল্পনায় তার জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে মাত্র ২ কোটি টাকা — পঞ্চম পরিকল্পনার প্রায় অর্ধেক।[২৯] অথচ অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলির তুলনায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা সবচেয়ে বেশী। ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধির চিত্র[৩০] নিম্নরূপ :

বছর	স্নাতক শ্রেণী	স্নাতকোত্তর শ্রেণী
১৯৫১-৫২	৫৯,২৯১	২,৬৬৬
১৯৭১-৭২	২,৪৩,৭৪৬	১৬,০০০

অর্থাৎ কুড়ি বছরে স্নাতকশ্রেণীর ছাত্রসংখ্যা বেড়েছে ৪ গুণ এবং স্নাতকোত্তর শ্রেণীর ছাত্রসংখ্যা বেড়েছে ৬ গুণ। অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সরকার ঢক্কানিনাদের দ্বারা দেশ-বিদেশের খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ্‌-পণ্ডিতদের নিয়ে শিক্ষা কমিশন গঠন করলেও তাঁদের সুপারিশগুলিকে বাস্তবায়নের বিষয়ে আগ্রহান্বিত ছিলেন না। পক্ষান্তরে শিক্ষা কমিশনের সম্মতি আদায় করতে না পেরে তাঁরা গণতান্ত্রিক রীতি-পদ্ধতি বিসর্জন দিয়ে কমিশনের আপত্তি অগ্রাহ্য করেছেন। কেবলমাত্র রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির অভিপ্রায়ে রাজ্যগুলিকে কেন্দ্রের ওপরে নির্ভরশীল করে রাখার জন্য তাঁরা শিক্ষাকে যুগ্ম তালিকাভুক্তির দ্বারা সর্বস্তরের শিক্ষা নিয়ন্ত্রণ করছেন। প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ্‌ শ্রী জে. পি. নায়েক মন্তব্য করেছেন,

"বর্তমানে শিক্ষার সর্বস্তরে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রভুত্ব বিস্তারের প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। শিক্ষার ইতিহাসে লর্ড কার্জনের সময় ছাড়া আর কোনো সময়ে এধরণের প্রচেষ্টা দেখা যায়নি।"[৩১]

শিক্ষা ও সংস্কৃতির জগৎ সমাজ-মানসে গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র। দেশ ও সমাজের সংকট তাকে প্রভাবিত-আলোড়িত করে। সুতরাং শিক্ষাজগতের সংকট দেশের অর্থনৈতিক সংকটের প্রতিক্রিয়া ছাড়া কিছু নয়। বিগত দশকে ভারতের অর্থনীতি একটার পর একটা সংকটের সম্মুখীন হয়েছে। দারিদ্র, বেকারি ও জনসাধারণের দুঃখদুর্দশা সীমাহীনভাবে বেড়েছে। গ্রামাঞ্চলগুলি পরিণত হয়েছে দুঃস্বপ্নের একটা বিশাল সাগরে। আবার সেই একই সঙ্গে একচেটিয়া মালিক, বৃহৎ পুঁজিপতি, ভূস্বামী ও বড় বড় ব্যবসায়ীদের অর্থনৈতিক ক্ষমতা ও শক্তির পরিমাপহীন বৃদ্ধি ঘটেছে। তাঁদের হাতে অর্থ ও সম্পদ দ্রুত কেন্দ্রীভূত হচ্ছে। একই সঙ্গে অনেক পরিমাণে বেড়েছে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের ও বিশ্ব-পুঁজিবাদী বাজারের ওপর দেশের নির্ভরশীলতা। ফলে সমগ্র দেশের ন্যায় পশ্চিম বাংলাতেও অর্থনৈতিক সংকট ক্রমশ ঘনীভূত হয়েছে, জনসংখ্যার বৃহত্তম অংশ দারিদ্র-সীমারেখার নীচে নেমেছে, বেকারির সংখ্যা বেড়েছে, মুদ্রাস্ফীতির বিস্ফোরণ ঘটেছে, শিল্প-কৃষিক্ষেত্রে অর্থনৈতিক বিপর্যয় দেখা দিয়েছে। সেই অর্থনৈতিক সংকটের প্রতিফলন সমাজের ওপরতলায় শিক্ষা ও সংস্কৃতির জগতকেও কলুষিত করছে। দেশের শিক্ষার আলোকবর্তিকাকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরার যে অনিবার্য অর্থনৈতিক ও সামাজিক শর্ত ছিল, কেন্দ্রীয় সরকার সেই শর্ত পূরণ করেননি।

এই অবস্থায় ১৯৭৭ খৃষ্টাব্দে, পশ্চিমবাংলায় বামফ্রন্ট রাজ্যের শাসনক্ষমতা গ্রহণ করে সার্বিক সংকটের সম্মুখীন হয়েছেন। তাঁরা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে এই সংকটের কারণগুলি বিশ্লেষণ করে ঘোষণা করেছেন, "পশ্চিমবাংলার বামফ্রন্ট মনে করেন, স্বাধীনতা-উত্তর ভারতের সমাজ-ব্যবস্থায় যে মৌলিক সংকট সৃষ্টি হয়েছে তার পূর্ণ সমাধান একটি অঙ্গ রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকার করতে পারে না। সারা দেশের সমাজ-কাঠামোয় বৈপ্লবিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এই সংকটের সমাধান সম্ভব। সেই লক্ষ্যকে অবিচল রেখে গণ-আন্দোলনের বিকাশের ফলশ্রুতিতে পশ্চিমবাংলায় যে বামফ্রন্ট সরকারের আবির্ভাব ঘটেছে সে এই সমাজ-কাঠামোর মধ্যে একটি ভিন্ন পথে চলতে চায়; সংকটের বাস্তব মূল্যায়নের ভিত্তিতে জনজীবনের আশু সমস্যাগুলিকে খানিকটা লাঘব করতে চায়; জনসাধারণকে ঐক্যবদ্ধ করতে চায় বৃহত্তর সমাজ-পরিবর্তনের সংগ্রামের

লক্ষ্যে। ৩৬-দফা কর্মসূচীর মর্মবস্তুও তাই। এটি হ'ল সীমাবদ্ধ ক্ষমতার মধ্যেও নতুন পথে চলার পথনির্দেশ।"[৩২]

বামফ্রন্ট সরকারের ৩৬-দফা কর্মসূচীর অন্যতম হ'ল শিক্ষাবিষয়ক ৭-দফা কর্মসূচী। 'শিক্ষা-সম্পর্কিত যে কোনো নীতি প্রণয়নের সময়ে যে দিকগুলি কোনো এক দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন লোকায়ত সরকারকে মনে রাখতে হয় তা হ'ল সামাজিক পরিবেশ, বাস্তব অবস্থা, শিক্ষার্থীদের গ্রহণ ক্ষমতা ও প্রবণতা।'[৩৩] এই দিকে লক্ষ্য রেখে শিক্ষা কমিশনের সুপারিশসমূহকে ভিত্তি করে বর্তমান সরকার প্রাথমিক-স্তর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়-স্তর পর্যন্ত একটি সামগ্রিক বিজ্ঞান-সম্মত ভাষা ও শিক্ষানীতি গ্রহণ করেছেন। এদেশে জনগণতন্ত্র কিংবা সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে এই নীতির রূপরেখা রচিত হয়নি। শিক্ষা কমিশনের যে সুপারিশগুলি সমগ্র ভারতে রূপায়ণের দায়িত্ব ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের, সেই কর্তব্য পালিত না হওয়ায় একটি অঙ্গ রাজ্যের সরকার সীমাবদ্ধ ক্ষমতা নিয়ে সেই দায়িত্ব পালনে অগ্রসর হয়েছেন। শিক্ষা কমিশনের ন্যায় রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকার মনে করেছেন, 'বাস্তবমুখী ও জীবনধারার সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত শিক্ষা-ব্যবস্থা সকল স্তরে চালু করা একান্তভাবেই প্রয়োজন। সেই কথা চিন্তা করেই ডিগ্রি-স্তরে ভাষা-শিক্ষার প্রশ্নটি খুবই জরুরী হয়ে দেখা দেয়।'[৩৪] তাই তাঁরা স্নাতক-স্তরে শিক্ষা কমিশনের ভাষা-শিক্ষার সুপারিশকে বাস্তবায়নের জন্য সকলের কাছে সহযোগিতার আবেদন জানিয়ে বলেছেন, "ভাষা-শিক্ষা সংক্রান্ত সমগ্র প্রশ্নটি আমাদের মনোভঙ্গির সামান্য রূপান্তর দাবি করে। সময়ের সঙ্গে তাল রেখে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিকে অগ্রাধিকার দিয়ে যে কোনো গঠনমূলক পরিবর্তনকে আমরা যদি স্বাগত জানাতে পারি তাহলে আমরা কিছুটা এগিয়ে যেতে পারবো এ বিশ্বাস রাখা যায়। স্থিতাবস্থা থেকে বেরিয়ে আসা ভেঙে পড়া নয়, বরঞ্চ ভাঙন ও পচনের মুখ থেকে উদ্ধারের পথ রচনা করা। বামফ্রন্ট সরকার সকল স্তরের প্রগতিশীল শক্তিকে সামিল করে সেই পথ রচনাতেই অঙ্গীকারবদ্ধ।"[৩৫]

রাজ্য সরকারের আবেদনে সাড়া দিয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আভিজাত্যের অচলায়তন ভেঙে জনমুখীন্ শিক্ষা-নীতি রূপায়ণে অগ্রসর হয়েছেন। শিক্ষা কমিশনের সুপারিশ অনুসারে তাঁরা স্নাতক-স্তরে শিক্ষা-কাঠামো, ভাষা-শিক্ষা ও বিষয়-নির্বাচন সম্পর্কে একটি সামগ্রিক পরিকল্পনা বিদ্বৎজনদের দরবারে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য উপস্থিত করেছেন। পাঠকদের অবগতির জন্য এখানে সম্পূর্ণ পরিকল্পনাটি উপস্থিত করা হ'ল :

'বিষয়-নির্বাচনের ব্যাপকতর সুযোগ

'প্রস্তাবিত বি. এ., বি. এস-সি. ডিগ্রি কোর্সের প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'ল যে তা একজন পরীক্ষার্থীর সামনে ন্যূনতম বাধ্যবাধকতায় ব্যাপকতর বিষয়-নির্বাচনের সুযোগ দিয়েছে। জ্ঞানের যে-সব শাখার প্রতি তার আগ্রহ সর্বাধিক, কেবল সেগুলি পড়বার ভালমত সুযোগ সে এবার পাবে। কলাবিদ্যা ও বিজ্ঞানের মধ্যেকার কঠিন বাধা বেশ তাৎপর্যপূর্ণভাবে নমনীয় হবে, যার ফলে আন্তঃসহায়ক বিদ্যা ও বৃত্তিমুখী পাঠ্যসূচীর প্রতি আগ্রহ বাড়বে। এই ছকে পঠনীয় বিষয়গুলি তিনটি প্রধান বিভাগে বিভাজিত করা হয়েছে। মানবিকী বিদ্যা ও সমাজ-বিজ্ঞান বিভাগে থাকবে বাংলা, ইংরেজি, ইতিহাস, অর্থনীতি, দর্শন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক প্রভৃতি। প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বিভাগে থাকবে পদার্থবিদ্যা, গণিত, রসায়নবিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, মাইক্রোবায়োলজি, ভূতত্ত্ববিদ্যা, বায়ো-কেমিস্ট্রি, বায়ো-ফিজিক্স প্রভৃতি। আর বৃত্তিমুখী বিদ্যা বিভাগে থাকবে কম্পিউটর প্রোগ্রামিং, অ্যাপ্লায়েড ইলেকট্রনিক্স, ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ফিজিক্স, অ্যানালিটিক্যাল কেমিস্ট্রি, বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, কমিউনিটি ডেভেলপমেণ্ট ও ফার্ম ম্যানেজমেণ্ট ইত্যাদি। তাছাড়া কেবল মহিলা পরীক্ষার্থীদের জন্যে আরও একটি গৌণ বিষয়-বিভাগ থাকবে গৃহবিজ্ঞানবিদ্যা-বিভাগ।

'একজন পরীক্ষার্থীকে গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পেতে হলে তিনটি বিষয়ে পরীক্ষা দিতে হবে। যদি সে বি. এ. ডিগ্রি চায় তবে তাকে মানবিকী বিদ্যা ও সমাজ-বিজ্ঞান বিভাগ থেকে যে-কোনো দুটি বিষয় বেছে নিতে হবে, আর যদি সে বি. এস-সি. ডিগ্রি পেতে চায় তবে তাকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বিভাগ থেকে যে-কোনো দুটি বিষয় বেছে নিতে হবে। আর এ দুটি বিষয়ের যে কোনোটিতে সে ইচ্ছে করলে অনার্স নিতে পারবে। পূর্বে উল্লিখিত যে-কোনো বিষয়-বিভাগ থেকে সে তৃতীয় বিষয় বেছে নিতে পারবে। এইভাবে নতুন প্যাটার্নের ডিগ্রি কোর্সে বিষয়-কম্বিনেশন নির্বাচনে পুরানো প্রথা অপেক্ষা অনেক বেশি স্বাধীনতা পরীক্ষার্থীর থাকবে। প্রথাসিদ্ধ বিষয়-কম্বিনেশন ছাড়াও বেশ কিছু নতুন প্রথাবহির্ভূত অথচ বহুবিদ্যা-নির্ভর কম্বিনেশন-এর সুযোগ দেওয়া হবে। একজন পরীক্ষার্থী এখন এই ধরণের কম্বিনেশন নিতে পারবে—বাংলা, ইংরেজি, জর্নালিজম্; ইতিহাস, দর্শন, অর্থনীতি; অর্থনীতি, বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, বাংলা; পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, কম্পিউটর প্রোগ্রামিং; পদার্থবিদ্যা, দর্শন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ইত্যাদি।

'ভাষা-নির্বাচন ঐচ্ছিক

'নতুন পাঠ্যসূচীতে কোনো ভাষা বি. এ., বি. এস-সি. অথবা বি. কম. ডিগ্রিতে আবশ্যিক থাকছে না। তবে কোনো পরীক্ষার্থী ১০০ মার্কের ইংরেজি বা বাংলা বা হিন্দী বা উর্দু বা নেপালী একটি অতিরিক্ত ঐচ্ছিক বিষয়রূপে নিতে পারে, যদি সে ঐ ভাষাকে নির্বাচিত (ইলেকটিভ) বিষয়রূপে না নেয়। ঐ বিষয়ে ৩০-এর উপর মার্ক পেলে তা পরীক্ষার্থীর এগ্রিগেট মার্কের সঙ্গে যোগ হয়ে তার কৃতিত্ব-পরিমাপক ডিভিশন নির্ণয়ে সহায়ক হবে (পরে দেখুন)। এই ব্যাপারটি জনসাধারণ ও শিক্ষাবিদ্ সমাজের কোনো কোনো অংশের কাছে সংশয় ও ভুল ধারণার সৃষ্টি করেছে। এখানে বলা যেতে পারে প্রচলিত পুরানো প্রথায় বিজ্ঞানের ছাত্ররা কোনো ভাষা কোর্স গ্রহণে বাধ্য নয় বা তার অনুমতিও পায় না। কিন্তু কলাবিদ্যার (আর্টস্) ছাত্রদের পক্ষে তা বাধ্যতা-মূলক এবং তাদের ভালো না লাগলেও তা তারা প্রত্যাখ্যান করতে পারে না। আমরা যা চালু করতে চাই তা হ'ল, কলাবিদ্যা ও বিজ্ঞানের ছাত্রদের বিষয়-নির্বাচনে সমান স্বাধীনতা দান: তারা ইচ্ছে করলে কোনো ভাষা-বিষয় নিতেও পারে, না নিতেও পারে।

'আমরা এটা চাই, কারণ নবাগত ছাত্ররা ইতোমধ্যে ১২ বছরের বাধ্যতা-মূলক ভাষাশিক্ষার স্তর পেরিয়ে আসছে। যদি তারা ভাষা-সাবজেক্ট গ্রহণে আগ্রহী না হয় তবে এ ব্যাপারে তাদের বাধ্য করা উচিত বা সঙ্গত হবে বলে আমরা মনে করি না। অবশ্য, যারা ভাষা ও সাহিত্য ভালবাসে, তাদের জন্যে নতুন কাঠামোয় আরো বেশি গভীরতর শিক্ষণের ব্যবস্থা থাকছে। এইসব পরীক্ষার্থী ইচ্ছে করলে এ ধরণের কম্বিনেশন নিতে পারে—বাংলা, সংস্কৃত, ইংরেজি; ইংরেজি, বাংলা, ফরাসি প্রভৃতি। পুরানো কাঠামোয় তা সম্ভব ছিল না। নতুন কাঠামোয় যে ছাত্র বা ছাত্রী অর্থনীতিবিদ্ হতে চায় সে ভাষাশিক্ষার অতিরিক্ত বোঝা বহনে বাধ্য না হয়ে সহায়ক বিষয়রূপে ইতিহাস ও দর্শন নিতে পারে। বস্তুত দুনিয়ার কোনো অগ্রসর দেশে কলেজ স্তরে গ্র্যাজুয়েশনের জন্যে ভাষাশিক্ষা, বিশেষত মাতৃভাষা শিক্ষা, বাধ্যতামূলক নয়।…

'গত কয়েক বছরের পরীক্ষার ফলাফল বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, কলা ও বাণিজ্যের ছাত্রদের উপর ভাষা-পত্র চাপিয়ে দেবার প্রথানুবর্তনের ফলে আমরা বিশাল পরিমাণ মানবিক শক্তি ও পার্থিব সম্পদের অপচয় করছি। ছাত্ররা স্পষ্টতই এই প্রথার অনিচ্ছুক বলি, কারণ কখনো কখনো ইংরেজি, বাংলায়

অনুত্তীর্ণের হার ৮০-৯০ পার্সেন্ট—আবার ইতিহাস, অর্থনীতি, বাণিজ্যিক ভূগোল প্রভৃতিতে অনুত্তীর্ণের হার ৩০-৪০ পার্সেন্ট বা তার চেয়ে কম। এইভাবে ইংরেজি, বাংলাকে আবশ্যিক করে ছাত্রদের মাথার উপর গণ-অসাফল্যের বোঝা চাপিয়ে দিচ্ছি। এর ফলে আমাদের আর্টস্-কমার্স গ্র্যাজুয়েট শিক্ষা-কর্মসূচী কেবল অপচয়ধর্মী পরিহাসে পর্যবসিত হয়নি, সেই সঙ্গে আমাদের ছাত্রসমাজের এক বিরাট অংশ বিপুল অবমাননায় নিক্ষিপ্ত হচ্ছে। ভাষাশিক্ষাকে ঐচ্ছিক করলে আমাদের বি. এ., বি. কম. ছাত্রদের উত্তীর্ণের হার নিশ্চিতরূপে বর্ধিত হবে। তার ফলে এই ছাত্ররা অবশ্যই বহুল পরিমাণে তাদের আত্মবিশ্বাস ও আত্মমর্যাদা ফিরে পাবে। একবার যদি ছাত্ররা ও তাদের অভিভাবকরা—বিশেষত আমাদের গরীব ও মধ্যবিত্ত-শ্রেণীর বৃহদংশ থেকে আগত প্রথম প্রজন্মের শিক্ষার্থীরা—তাদের কাছে যা চিত্তাকর্ষী ও উপকারী, তা তাদের মাতৃভাষায় সার্থকভাবে শেখার ঐচ্ছিক সুযোগ পায়, তাহলে জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার প্রতি যথার্থ আন্তরিক আগ্রহ জন্মাবে। আর তাহলেই আমাদের উচ্চতর শিক্ষাসূচীতে বিশাল জাতীয় বিনিয়োগ সঙ্গত বলে প্রমাণিত হবে।

'সরলীকৃত বিধি

'তিন বছরের ডিগ্রি কোর্স প্রবর্তনের পর আমরা অতীতে মাত্রাতিরিক্ত উপকারীর ভূমিকায় অভিনয় করেছি। পিছিয়ে-পড়া ছাত্রদের স্পষ্টবোধ্য উপকারের জন্যে 'ক্রেডিট' আর 'চান্স'-এর নামে বহু সুবিধা দেওয়া হয়েছে। এর ফলে যেসব ছাত্র বাড়িতে লেখাপড়ায়, ক্লাসে বক্তৃতা শোনায় ও প্র্যাকটি-ক্যাল ক্লাসে অংশগ্রহণে উপযুক্ত সময় দেয় না, তাদের মধ্যে এইসব সুবিধা এনে দিয়েছে শৈথিল্য। অসফল পরীক্ষার্থীদের এক বিপুল সংখ্যা এখন আটবার পর্যন্ত পরীক্ষায় বসে ডিগ্রি লাভের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছে। প্রাসঙ্গিক বিধিসমূহ ও তাদের সংশোধনী এক জটিল অরণ্যের রূপ নিয়েছে। এর ফলে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনে, বিশেষত কণ্ট্রোলারের ডিপার্টমেণ্টে, সমূহ বিশৃঙ্খলা ও বিপর্যয় সৃষ্টি হয়েছে। কারণ এখন হাজার হাজার পরীক্ষার্থীর ধারাবাহিক রেকর্ড বছরের পর বছর রাখার প্রয়োজন ঘটে। আনুপাতিকভাবে মানসিক ত্রুটি এবং অসাধু ও অন্যায় কাজের পরিমাণও বেড়ে যেতে থাকে।

'এইসব কারণে আমরা নতুন ডিগ্রি কোর্সের বিধিসমূহের যতদূর সম্ভব সরলীকরণের প্রস্তাব করি। দু বছর বাদে, তথাকথিত 'ক্রেডিট' ও 'চান্স' বাদ দিয়ে, একটি মাত্র পরীক্ষা হবে। তিন বছরের অনার্স কোর্সের পাঠক্রম

(সিলেবাস) অবশ্য দুটি পার্টে বিভক্ত হবে। প্রথম পার্টে থাকবে প্রথম দু বছর, দ্বিতীয় পার্টে থাকবে তৃতীয় বছর। দুই পার্টের মোট মার্ক সমভাবে বিভাজিত হবে। যারা উচ্চতর মাধ্যমিক (এইচ. এস.) বা সমপর্যায়ী পরীক্ষায় ন্যূনপক্ষে ৪০ পার্সেণ্ট মার্ক পেয়ে উত্তীর্ণ হবে, তারাই অনার্স কোর্স নেবার অধিকারী হবে। অনার্স-সমেত বা অনার্স ব্যতীত সকল পরীক্ষার্থী দ্বিতীয় বছরের শেষে একটি পরীক্ষায় বসবে এবং সফল পরীক্ষার্থীরা পাস গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি অর্জন করবে। সকল বিষয়ে (সাবজেক্ট) ন্যূনতম পাস-মার্ক হবে ৩০ এবং আলাদাভাবে এগ্রিগেটে পাস করার দরকার হবে না। পাস কোর্সের লেখাপড়ায় অধিকতর গুরুত্বদানের জন্যে 'ডিভিশন' দেওয়া হবে – ৬০ পার্সেণ্ট মার্ক বা তদূর্ধ্বের জন্যে ডিভিশন ১,৪৫ পার্সেণ্ট বা তদূর্ধ্ব থেকে ৬০ পার্সেণ্টের কম মার্কের জন্যে ডিভিশন ২, আর ৩০ পার্সেণ্ট বা তদূর্ধ্ব থেকে ৪৫ পার্সেণ্টের কম মার্কের জন্যে 'পি' ডিভিশন। অনার্স পরীক্ষার্থীদের জন্যে প্রথম পার্ট ও দ্বিতীয় পার্টের মার্ক একত্র যোগ করা হবে, ৬০ পার্সেণ্ট বা তদূর্ধ্ব মার্ক-প্রাপ্ত পরীক্ষার্থীরা প্রথম শ্রেণীর অনার্স-প্রাপ্ত বলে গণ্য হবে, আর যারা ৪৫ পার্সেণ্ট বা তদূর্ধ্ব থেকে ৬০ পার্সেণ্টের কম মার্ক পাবে তারা দ্বিতীয় শ্রেণীর অনার্স-প্রাপ্ত বলে বিবেচিত হবে। যেসব অনার্স পরীক্ষার্থী প্রথম পার্টের অনার্স পরীক্ষায় ন্যূনতম ৩৫ মার্ক পাবে, তারা দ্বিতীয় বছরের পরে দ্বিতীয় পার্টের অনার্স পড়া চালিয়ে যাবার অনুমতি পাবে। পাস কোর্সের ভালো ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা যদি কোনো বিষয়ে ৫৫ পার্সেণ্ট বা তদূর্ধ্ব মার্ক পায় তবে তাদের বিশেষ সুবিধা দেওয়া হবে। তারা ঐ বিষয়ের অনার্সে প্রথম পার্টের পরবর্তী পরীক্ষায় বসার সুযোগ পাবে এবং দ্বিতীয় পার্টের অনার্স কোর্স শেষ করার নিয়মানুগ অনুমতি পাবে।"[৩৬]

উচ্চতর শিক্ষা-সংস্কারের এই পরিকল্পনা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন মৌলিক পরিকল্পনা নয়। শিক্ষা কমিশনের সুপারিশগুলির ভিত্তিতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জনমুখীন শিক্ষাদর্শে উক্ত পরিকল্পনা রচিত হয়েছে। চার দেওয়ালের বাধা ভেঙে উচ্চতর শিক্ষা-সম্প্রসারণের জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই উদ্যোগ জনজীবনে বিপুল চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে। জনসাধারণের মধ্যে এসম্পর্কে বিস্তৃতভাবে জানার আগ্রহ পরিলক্ষিত হয় ও নানাবিধ প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। অধ্যাপক-আন্দোলনের শ্রদ্ধেয় নেতা ও পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সহ-সভাপতি শ্রীসন্তোষকুমার মিত্র এবিষয়ে প্রাঞ্জল ভাষায় উচ্চতর শিক্ষা-বিস্তারের আলোকে যুক্তি ও তথ্যভিত্তিক আলোচনা করেছেন। তাঁর

রচনাটি এখানে সম্পূর্ণ উদ্ধৃত হ'ল :

'ডিগ্রি কোর্সের নতুন পাঠক্রম সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয়ের 'অ্যাকাডেমিক কমিটি'র প্রস্তাব ও সুপারিশ ইতিমধ্যে এই পত্রিকায় (অর্থাৎ 'গণশক্তি' পত্রিকায় —লেখক) প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমান রচনায় সেই প্রস্তাব ও সুপারিশগুলি পরীক্ষা করাই উদ্দেশ্য। এই পরীক্ষা কার্যে প্রচলিত পাঠক্রম ও পরের নতুন প্রস্তাবিত পাঠক্রমকে একসঙ্গে তুলনামূলকভাবে এখানে উপস্থিত করা হল যথার্থ গ্রহণযোগ্য এক সিদ্ধান্তকে নির্গলিত করার জন্যে —

টেবিল নং ১

	কলা বিভাগ		মানব-বিজ্ঞান ও সমাজ-বিজ্ঞান বিভাগ
	প্রচলিত পাঠক্রম		প্রস্তাবিত নতুন পাঠক্রম
	আবশ্যিক বিষয়সমূহ		**ইলেকটিভ বিষয়সমূহ**
স্ট্রীম্	(ক) ইংরেজি —২০০ নম্বর		যে কোন তিনটি বিষয়
	(খ) বাংলা অথবা যে কোন	স্ট্রীম্	(ক) ইংরেজি — ৩০০ নম্বর
	আধুনিক ভারতীয়		(খ) বাংলা — ৩০০ ,,
বি.এ.	ভাষা —২০০ নম্বর		(গ) ইতিহাস — ৩০০ ,,
পাস কোর্স	মোট —৪০০ নম্বর		(ঘ) অর্থবিদ্যা — ৩০০ ,,
(ত্রৈবার্ষিক)	**ইলেকটিভ বিষয়সমূহ**		(ঙ) রাষ্ট্রবিজ্ঞান —৩০০ ,,
পার্ট-১	যে কোন দুটি বিষয়	বি.এ.	(চ) দর্শন — ৩০০ ,,
+		পাস কোর্স	ইত্যাদি
পার্ট-২	(ক) ইতিহাস — ৩০০ নম্বর	(দ্বিবার্ষিক)	তিনটি বিষয় × ৩০০ – ৯০০ ,,
	(খ) রাষ্ট্রবিজ্ঞান —৩০০ ,,		**একটি বাড়তি ঐচ্ছিক বিষয়**
	(গ) অর্থবিদ্যা — ৩০০ ,,		ভাষা (রচনা, সংক্ষিপ্তসার ইত্যাদি)
	(ঘ) দর্শন — ৩০০ ,,		যে কোন একটি
	ইত্যাদি		(ক) ইংরেজি —১০০ নম্বর
	দু'টি বিষয় × ৩০০ = ৬০০		(খ) বাংলা —১০০ ,,
	মোট —১০০০ নম্বর		(গ) হিন্দী — ১০০ ,,
			(ঘ) উর্দু — ১০০ ,,
			(ঙ) আরবী —১০০ ,,
বি.এ. অনার্স		বি.এ. অনার্স	ইত্যাদি
(ত্রৈবার্ষিক)		(ত্রৈবার্ষিক)	একটি ভাষা × ১০০ – ১০০ ,,
পার্ট-১	বাড়তি ৮টি পত্র ৮০০ নম্বর	পার্ট-১+	মোট —১০০০ নম্বর
+			
পার্ট-২		পার্ট-২	বাড়তি ৮টি পত্র ৮০০ নম্বর

'মানব-বিজ্ঞান ও সমাজ-বিজ্ঞান' পর্যায়ের নতুন পাঠক্রমে যে পরিবর্তন ও ফলাফলগুলি উল্লিখিত টেবিলের সাহায্যে লক্ষ্য করা যাচ্ছে তা এই রকম —

কাঠামোগত পরিবর্তন

১ ইংরেজি ও বাংলা ইলেকটিভ বিষয়-রূপে এল। পূর্বের মতো ঐ বিষয়গুলি আবশ্যিক থাকল না ; ঐচ্ছিক হয়ে গেল।

২. ইলেকটিভ বিষয়গুলির মূল্যমান ২০০-র জায়গায় ৩০০ নম্বরের হ'ল।

৩ ১০০ নম্বরের একটি বাংলা, ইংরেজি বা আধুনিক ভাষার একটি ঐচ্ছিক বিষয় প্রবর্তিত হ'ল। ৩০ নম্বরের বেশী প্রাপ্ত নম্বর এগ্রিগেটের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ডিভিসন বাড়াবার সুযোগ থাকল।

৪. নতুন ডিভিসন প্রথা চালু হ'ল। প্রথম, দ্বিতীয় এবং পাস —এই তিনটি হ'ল ডিভিসন।

মৌলিক পরিবর্তন

১. ভাষা অধ্যয়নের ক্ষেত্রে কোনো রকম বাধ্যবাধকতা ছাত্রদের ওপরে চাপানো হ'ল না।

২. ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যয়নে বিশেষ প্রবণতা আছে, এমন ছাত্রদের জন্যে ঐ বিষয়ে আরো ব্যাপক ও গভীর পাঠ্যসূচীর আয়োজন হ'ল অর্থাৎ ৩০০ নম্বরের মোট তিনটি পেপার প্রবর্তিত হ'ল।

টেবিল নং ২

বিজ্ঞান-বিভাগ		প্রকৃতিবিজ্ঞান-বিভাগ	
প্রচলিত পাঠক্রম		প্রস্তাবিত নতুন পাঠক্রম	
ইলেকটিভ বিষয়সমূহ		**ইলেকটিভ বিষয়সমূহ**	
	যে কোন তিনটি বিষয়		প্রচলিত রীতির অনুরূপ।
স্ট্রীম্	(ক) পদার্থবিদ্যা — ৩০০ নম্বর	স্ট্রীম্	এর সঙ্গে ১০০ নম্বরের একটি
বি.এস-সি.	(খ) রসায়নবিদ্যা —৩০০ "	বি.এস-সি	ঐচ্ছিক পত্র চালু হবে। যে
পাস কোর্স	(গ) অঙ্ক — ৩০০ "	পাস কোর্স	কোনো একটি আধুনিক ভাষা
(ত্রৈবার্ষিক)	(ঘ) জীববিজ্ঞান —৩০০ "	(দ্বিবার্ষিক)	বিষয়-রূপে প্রবর্তিত হবে,
পার্ট-১	(ঙ) ভূগোল — ৩০০ "		যেমন আছে বি.এ. পাস
+	ইত্যাদি		কোর্সে।
পার্ট-২	ভাষা বা অন্য কোনো		
	আবশ্যিক বিষয় নেই		
	মোট মূল্যমান		
	৩টি বিষয় × ৩০০ —৯০০ নম্বর		

টেবিল নং ২

বিজ্ঞান-বিভাগ		প্রকৃতিবিজ্ঞান-বিভাগ	
বি.এস-সি. অনার্স (ত্রৈবার্ষিক)		বি.এস-সি. অনার্স (ত্রৈবার্ষিক)	
পার্ট-১	বাড়তি ৫টি পত্র —৫০০ নম্বর	পার্ট-১	বাড়তি ৫টি পত্র — ৫০০ নম্বর
+	প্র্যাকটিক্যাল — ৩০০ ,,	+	প্র্যাকটিক্যাল — ৩০০ ,,
পার্ট-২	মোট —৮০০ ,,	পার্ট-২	মোট —৮০০ ,,

'প্রকৃতিবিজ্ঞান' পর্যায়ের নতুন পাঠক্রমে যে পরিবর্তন ও ফলাফলগুলি টেবিলের সাহায্যে লক্ষ্য করা যাচ্ছে, তা এই রকম —

কাঠামোগত পরিবর্তন

১. আধুনিক ইংরেজি ও ভারতীয় যে কোনো ভাষার ১০০ নম্বরের একটি ঐচ্ছিক পত্রের নতুন প্রবর্তন।

২. ডিভিসন প্রথার প্রবর্তন।

মৌলিক পরিবর্তন ও ফলাফল

বিজ্ঞানের ছাত্ররাও এখন থেকে আধুনিক ইংরেজি ও ভারতীয় ভাষার যে কোনো একটিকে ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে নিয়ে ভাষা-শিক্ষার সুযোগ পাবে, অকৃতকার্যতার কোনোরূপ ঝুঁকি না নিয়েই।

টেবিল নং ৩

বাণিজ্য বিভাগ		বাণিজ্য বিভাগ	
প্রচলিত পাঠক্রম		প্রস্তাবিত নতুন পাঠক্রম	
১. আবশ্যিক বিষয়সমূহ		আবশ্যিক বিষয়	
স্ট্রীম্	ভাষা বিভাগ :	স্ট্রীম্	
বি.কম.	(ক) ইংরেজি —১০০ নম্বর	বি.কম.	৭টি পত্র — ৭০০ নম্বর
পাস, অনার্স	(খ) বাংলা অথবা অন্য	পাস কোর্স	ইলেকটিভ ২টি পত্র —২০০ নম্বর
(ত্রৈবার্ষিক)	কোনো আধুনিক	(দ্বিবার্ষিক)	মোট —৯০০ নম্বর
পার্ট-১	ভাষা —১০০ নম্বর		ঐচ্ছিক বিষয়
+	মোট —২০০ নম্বর		বি.এ. কোর্সের মতই যে কোনো
পার্ট-২			একটি ভাষা —১০০ নম্বর

টেবিল নং ৩

বাণিজ্য বিভাগ	বাণিজ্য বিভাগ
২. অর্থনীতি ভাগ (ক) অর্থবিদ্যা (তত্ত্ব) — ১০০ নম্বর (খ) ইকনমিক প্রবলেম —১০০ " মোট —২০০ নম্বর	
৩. বাণিজ্যিক ভাগ-১ (ক) ব্যবসায় সংগঠন —১০০ নম্বর (খ) হিসাবশাস্ত্র — ১০০ ,, (গ) কমার্শিয়াল ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ল — ১০০ ,, মোট —৩০০ নম্বর	
৪. বাণিজ্যিক ভাগ -২ (ক) সেক্রেটারিয়াল প্র্যাকটিশ— ১০০ নম্বর (খ) অর্থনৈতিক ভূগোল — ১০০ ,, (গ) বাণিজ্যিক অঙ্ক — ১০০ ,, মোট —৩০০ নম্বর	অনার্স কোর্স (ত্রৈবার্ষিক) পার্ট-১ + পার্ট-২ — ৯০০ নম্বর + ১০০ নম্বর এবং ৫০০ নম্বর
ঐচ্ছিক বিষয় এই ভাগগুলির মধ্যে একটি ভাগ গ্রহণ করতে হবে : ১০০ নম্বরের ২টি পত্র ১. (ক) অ্যাডভান্স অ্যাকাউন্টেন্সি —১০০ নম্বর (খ) অডিটিং — ১০০ ,, মোট —২০০ নম্বর ২. (ক) ব্যাংকিং —১০০ নম্বর (খ) কারেন্সী — ১০০ ,, ইত্যাদি মোট —২০০ নম্বর বাড়তি ১০০ নম্বরের একটি পত্র (অনার্স)	

বাণিজ্য-বিভাগের নতুন প্রস্তাবিত পাঠক্রমে যে পরিবর্তন ও ফলাফলগুলি উল্লিখিত টেবিলের সাহায্যে লক্ষ্য করা যাচ্ছে তা এই রকম —

কাঠামোগত পরিবর্তন

১. পাস কোর্সের পাঠক্রম তিন বছরের জায়গায় দু'বছর নির্দিষ্ট হ'ল।

২. আবশ্যিক দু'টি ভাষাপত্রের বিলোপসাধন ঘটল।

৩. দশটি পত্রের স্থলে ১০০ নম্বরের সাতটি আবশ্যিক পত্রের প্রবর্তন ঘটল।

৪. মোট মূল্যমান হ'ল ১২০০-র জায়গায় ৯০০।

৫. ১০০ নম্বরের একটি ঐচ্ছিক পত্রের প্রবর্তন, যেমন বি. এ, বি. এস-সি-তেও আছে।

৬. ডিভিসন প্রথা চালু হ'ল।

৭. অনার্সের ক্ষেত্রে কাঠামোগত পরিবর্তন খুব হ'ল না।

৮. অকৃতকার্যতার ঝুঁকি না নিয়েও একটি আধুনিক ইংরেজি বা ভারতীয় ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা হ'ল।

৯. সেক্রেটারিয়াল প্র্যাকটিশ এবং অফিস ম্যানেজমেণ্ট পত্রটি পুরোপুরি ইংরেজিতে লেখা বাধ্যতামূলক।

মৌলিক পরিবর্তন ও ফলাফল

১. আবশ্যিক ভাষাপত্রগুলির দুর্বহ বোঝা এবং অকৃতকার্যতার ঝুঁকি ছাত্রদের কমে গেল।

২. ছাত্র ও অভিভাবকগণের সময় ও অর্থের অপচয় কমল।

৩. একটি আধুনিক ইংরেজি ও ভারতীয় ভাষা শিক্ষা করার সুযোগ পেল শিক্ষার্থীরা।

এছাড়াও বৃত্তিমুখীন পাঠক্রম প্রবর্তনের কথা এই নতুন প্রস্তাবে বলা হয়েছে। এই পাঠক্রমের বিষয়গুলি এইরকম —কম্পিউটর প্রোগ্রামিং, ফলিত ইলেকট্রনিক্স, ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ফিজিক্স, অ্যানালিটিক্যাল কেমিস্ট্রি, ফার্ম ম্যানেজমেণ্ট ইত্যাদি। এই বিশেষ পাঠক্রমটি সম্পূর্ণ নতুন। মেয়েদের জন্যে গৃহবিজ্ঞানের নির্দিষ্ট পাঠক্রমও এই প্রস্তাবে আছে, কেবলমাত্র মেয়েদেরই জন্যে। উল্লিখিত দু'টি পাঠক্রমের বিস্তারিত টেবিল না দিয়েও মোটামুটি প্রস্তাবিত এই নতুন কাঠামোটির যেসব আরো বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য আমাদের চোখে ধরা পড়েছে তা নীচে সাজিয়ে দেওয়া হ'ল।

প্রস্তাবিত ডিগ্রি কোর্সের নতুন কাঠামোর বৈশিষ্ট্য যা বোঝা গেল

১. পাস কোর্স —তিন বছরের জায়গায় দু'বছর হ'ল। অনার্স কোর্স —পূর্বের মত ত্রৈবার্ষিকই থাকল।

২. পাস এবং অনার্স পর্যায়ের সমস্ত ছাত্র দু'বছর শেষে একটি পরীক্ষা দেবে। উভয় পর্যায়ের ছাত্ররা যদি কৃতকার্য হয় তবে পাশ ডিগ্রি পাবে। অনার্সের ছাত্ররা আরো এক বছর পড়বে এবং সেই বছর শেষে একটি চূড়ান্ত পরীক্ষায় বসবে। কৃতকার্য হলে প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণীর অনার্স ডিগ্রি লাভ করবে।

৩. আগে বি. এ, বি. এস-সি. বা বি. কম.-এ ডিভিসন প্রথা ছিল না। এখন এই কাঠামোয় শতকরা ৬০% বা তার বেশী নম্বর পেলে প্রথম ডিভিসনে, ৬০%এর নীচে এবং ৪০%এর বেশী নম্বর পেলে দ্বিতীয় ডিভিসনে এবং যারা ৩০% থেকে ৪০% এর নীচে নম্বর পাবে তারা পাস ডিভিসনে পাশ করবে।

৪. বি. এ. কোর্সে ইংরেজি এবং বাংলাকে ঐচ্ছিক করে দেওয়া হয়েছে। এখন আর তা আবশ্যিক নয়। বি. কম -এর ক্ষেত্রে আবশ্যিক দু'টি ভাষাপত্র বিলুপ্ত করে দেওয়া হয়েছে।

৫. একটি ১০০ নম্বরের ভাষাপত্রকে বি. এ., বি. এস-সি এবং বি. কম. —সমস্ত পর্যায়ে বাড়তি ঐচ্ছিক বিষয়-রূপে নিতে হচ্ছে। এই পত্রে প্রাপ্ত নম্বর ৩০ এর বেশী হলে এগ্রিগেটের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তা ডিভিশনকে বাড়িয়ে দেবে।

৬. বিজ্ঞানের ছাত্ররা তিনটি বিষয়ের মধ্যে দু'টি বিজ্ঞান বিষয়ক পত্র নিয়ে ইচ্ছে করলে মানবিক ও সমাজবিজ্ঞানের একটি বিষয় বা বৃত্তিমুখীন শিক্ষাধারার একটি পত্র নিয়ে বি.এস-সি. ডিগ্রি লাভ করতে পারবে। অপর পক্ষে বি. এ.-র ছাত্ররাও ইচ্ছে করলে দু'টি মানবিক বা সমাজবিজ্ঞানের পত্র এবং একটি বিজ্ঞান বিষয়ক পত্র নিয়ে বি. এ. ডিগ্রি লাভ করতে পারবে।

৭. প্রস্তাবিত পাঠক্রমে আবশ্যিকতার বাধ্যবাধকতা হ্রাস করে শিক্ষার্থীদের পছন্দ মত বিষয় নির্বাচন করে স্নাতক হবার সুযোগ সম্প্রসারিত করা হয়েছে।

ইংরেজি ও বাংলার ক্ষেত্রে নতুন প্রস্তাবিত কাঠামোয় পরিবর্তনের যুক্তি যা প্রস্তাবে পাওয়া গেল

১. বি. এ. কোর্সে শতকরা ৮০/৯০ জন ছাত্রছাত্রী অকৃতকার্য হয় এবং সময়, অর্থ ও বিপুল পরিশ্রমের বিনিময়ে তারা লাভ করে অসার্থকতা —গভীর হতাশা ও গ্লানি। পুরোনো কাঠামোয় ইংরেজি-বাংলার দিকে অধিকতর নজর

দিতে গিয়ে অন্যান্য বিষয়গুলির প্রতি যথেষ্ট নজর দেওয়া সম্ভব হত না বলেই ঐ ধরণের অপচয় ঘটত।

২. বি. এ. ক্লাসে বাংলা-ইংরেজির যে পাঠ্যসূচী এখনো চলছে, তা সম্পূর্ণত সাহিত্যাশ্রয়ী, সেই ভাষা সাহিত্যিক বা রচনাকারের ব্যক্তিগত বিশিষ্ট ভাবের ভাষা। সেই ভাষার সঙ্গে শিক্ষার্থীর মানসিক সাঙ্গীকরণ সবসময়ে সম্ভব নয়, অথচ পরীক্ষায় কৃতকার্য হবার জন্যে অমানুষিক পরিশ্রমে তাকে মুখস্থের ভিত্তিতে তৈরি করার অসম্ভব প্রয়াস চলত। এই ভাবের ভাষা কোনোক্রমেই ভাষা-শিক্ষার কার্যকর ভিত্তিটা ধরে নেই। শিক্ষার্থীরা এই পর্যায়ে ভাষা সম্পর্কে মৌলিকভাবে বেশী শিক্ষা লাভ করে না। বরং অন্যান্য সহযোগী ও ঐচ্ছিক বিষয়গুলি যদি শিক্ষার্থীরা মাতৃভাষায় অধ্যয়ন করে এবং লেখে তাহলে ভাষাজ্ঞানের যথেষ্ট উন্নতি হয়।

৩. বি. এস-সি. পর্যায়ের ছাত্রছাত্রীরা তাদের পাঠ্যসূচীতে ইংরেজি-বাংলাকে গ্রহণ করতে পারত না (পুরোনো পাঠক্রমের নিয়মানুযায়ী)। অনুসন্ধান করে দেখা গেছে যে, এর ফলে তাদের মধ্যে পরীক্ষায় সাফল্য তুলনামূলকভাবে ইংরেজি-বাংলা সহ বি. এ. কোর্সের অপেক্ষা অনেক বেশী।

৪. পুরোনো কাঠামোর ভাষায় ২০০ নম্বরের জায়গায় নতুন কাঠামোয় ৩০০ নম্বরের একটি পাঠ্যসূচী প্রবর্তনের মাধ্যমে ইংরেজি-বাংলা প্রভৃতি ভাষাকে সত্যিকারের অর্থে প্রয়োজনীয় করে তোলা হয়েছে। যে সমস্ত ছাত্রের ঐসব ভাষার প্রতি মানসিক পছন্দ এবং অভীপ্সা আছে, তারা বিশেষভাবে ব্যাপক পাঠ্যসূচীর সূত্রে বিশেষায়ন লাভ করলে ফল ভালো হবে, সমাজ উপকৃত হবে, অনর্থক অর্থ, সময় ও শ্রমের অপচয় বন্ধ হবে।

৫. প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, সমাজতান্ত্রিক উন্নয়নশীল দেশগুলি এবং আমেরিকার মত ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতেও ডিগ্রি পর্যায়ে ভাষা-শিক্ষার ব্যাপারে কোনো রূপ বাধ্যবাধকতা নেই।

৬. এই পরিবর্তন অর্থাৎ ভাষা সম্পর্কে এই নতুন বিন্যাস খুব মৌলিকভাবেই ছাত্র-অভিভাবকের ক্ষেত্রে সুফলবাহী হয়ে উঠবে।

৭. বিশেষত পাঠ্যসূচীর দুর্বহ বোঝাও খানিকটা কমে যাবে, ৪ থেকে ৩ এসে দাঁড়াবে। ছাত্রদেরও তা সহনীয় হবে।

৮. কমার্সে সেক্রেটারিয়াল ও অফিস ম্যানেজমেণ্ট পত্রটি পুরোপুরি ইংরেজিতে লেখা বাধ্যতামূলক। বাস্তবক্ষেত্রে বি. কম. ছাত্রদের যোগ্যতা ও প্রয়োজনীয়তার কথা চিন্তা করেই এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।'[৩৭]

সূত্রাকারে লিপিবদ্ধ অধ্যাপক মিত্রের দ্ব্যর্থহীন বক্তব্য শিক্ষা-ব্যবসায়ীদের সন্তুষ্ট করতে পারেনি। প্রাথমিক-স্তরের ন্যায় স্নাতক-স্তরেও অন্যান্য প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে কেবলমাত্র ভাষা-শিক্ষা বিষয়ে তুমুল বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির (মার্কসবাদী) মুখপত্র 'গণশক্তি' পত্রিকায় প্রস্তাবিত ভাষা-নীতির পক্ষে ও বিপক্ষে কয়েকজন বামপন্থী বুদ্ধিজীবীর রচনা প্রকাশিত হয়েছে। সেমিনারে-আলোচনা সভায় বিভিন্ন বক্তা পক্ষে-বিপক্ষে আলোচনা করেছেন। আবার কোনো কোনো সভায় বামপন্থী ফ্রন্ট সরকার ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি কেবলমাত্র নিন্দাবাক্য ভৎর্সিত হয়েছে, শিক্ষালোচনার নামে রাজনৈতিক আক্রমণ ঘটেছে, 'ধ্বংস হোক' ধ্বনি গগন বিদীর্ণ করেছে। অর্থাৎ ভাষা-শিক্ষার প্রশ্নটিকে তাঁরা একটি রাজনৈতিক ইস্যুতে পরিণত করতে চেয়েছেন। যাঁরা ডিগ্রি-স্তরের ভাষানীতির বিরোধিতা করেছেন, তাঁদের তিনটি দলে ভাগ করা যায়: প্রথম দলে রয়েছেন শ্রদ্ধেয় ডঃ প্রবোধচন্দ্র সেন ও কয়েকজন বামপন্থী বুদ্ধিজীবী; দ্বিতীয় দলে আছেন কিছু ব্যবসায়িক মনোবৃত্তিসম্পন্ন শিক্ষক ও অধ্যাপক; তৃতীয় দলে রয়েছেন তীব্র বামপন্থী ফ্রন্ট-বিরোধী ও ঐতিহ্যানুসারী রক্ষণশীল খ্যাতনামা পণ্ডিত ব্যক্তি। সুতরাং কোঠারি কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে ও বামফ্রন্ট সরকারের শিক্ষাদর্শে রচিত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষা ও শিক্ষা পরিকল্পনা বিশ্লেষণের পূর্বে বিরোধী বুদ্ধিজীবীদের অভিমত এখানে সংক্ষেপে উদ্ধৃত করা হ'ল।

শিক্ষাচার্য প্রবোধচন্দ্র সেন প্রাথমিক স্তরে বামফ্রন্ট সরকারের ভাষা-নীতি সমর্থন করলেও ডিগ্রিস্তরে ভাষা-নীতির তীব্র সমালোচনা করেছেন। তিনি স্নাতক-স্তরে আবশ্যিক বাংলাভাষা-চর্চার পক্ষপাতী। তিনি বলেছেন, "বি এ. শিক্ষার পর্যায়ে বাংলা 'অথবা' ইংরেজিকে যে-স্তরে নামানো হয়েছে তার মতো আত্মঘাতী ব্যবস্থা আর কি হতে পারে? যে-বাংলাকে সর্বশিক্ষার বাহন হবার মর্যাদা দেওয়া হ'ল সে-ভাষা ব্যবহারে দক্ষতা অর্জনের মানকেই টেনে নামিয়ে একেবারে ধূলোয় লুটিয়ে দেওয়া হ'ল। এ যেন ধনুকের ছিলে কেটে তীর ছুঁড়ে লক্ষ্য বিদ্ধ করার অলীক কল্পনা। রবীন্দ্রনাথের ভাষা একটু বদলে নিয়ে বলা যায়—'আপনি গড়ে তুলি বাংলা-প্রাসাদ, আপনি ভেঙে দেয় তাহা।' মাতৃভাষা ব্যবহারে দক্ষতার নিম্নতম মান হয়েছে শতকরা কুড়ি। ইংরেজ-আমলেও আমাদের ছাত্রাবস্থায় অবহেলিত বাংলার পাশ-মার্ক ছিল ছত্রিশ। তখন সব বিষয়ে শিক্ষার বাহন ছিল ইংরেজি। এখন বাংলাকে বসানো হচ্ছে সর্বোচ্চ সম্মানের আসনে, অথচ সে-ভাষায় দক্ষতার মান হ'ল

সবার পিছে, সবার নীচে। একথা ভাবলেও বিস্মিত হতে হয় —এ ব্যবস্থা কি সত্যই সুস্থচিন্তা প্রসূত? তার চেয়েও বিস্ময়কর, যে ছেলে বাংলায় কুড়ির বেশি মার্ক পাবে তার সেই বাড়তি মার্ক যোগ করা হবে অন্যান্য বিষয়ে প্রাপ্ত মার্কের সঙ্গে। যে ছেলে ইতিহাসে দর্শনে ফেল করল, বাংলা ভাল জানে বলে তার যেন ইতিহাস বা দর্শনের জ্ঞানও বেড়ে গেল; দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র প্রথম শ্রেণীর মর্যাদা পেল। ইংরেজির বেলাতেও তাই। এ ব্যবস্থার অবসান না হলে আমাদের ভবিষ্যৎ একেবারে অন্ধকার হয়ে যাবে। বাংলা 'অথবা' ইংরেজি কেন? পাশ এবং অনার্স উভয় ক্ষেত্রেই উচু মানের বাংলাকে করা চাই অবশ্য শিক্ষণীয়।"[৩৮] অর্থাৎ শ্রী সেন উচ্চতর শিক্ষাক্ষেত্রে বাংলা ও ইংরেজিকে সমমর্যাদাভুক্তির পক্ষপাতী নন। তিনি ডিগ্রি-স্তরে বাংলাভাষা-শিক্ষাকে আবশ্যিক ও অধিকতর গুরুত্ব প্রদানের সপক্ষে এবং ইংরেজির গুরুত্ব হ্রাসের পক্ষপাতী। তিনি 'ইস্কুলের ষষ্ঠ বা সপ্তম শ্রেণী থেকে ইংরেজিকে ঐচ্ছিক বিষয়-রূপে গণ্য করা বাঞ্ছনীয়'[৩৯] বলে মনে করেছেন।

এর বিপরীত মেরুতে রয়েছেন ডঃ. নীহাররঞ্জন রায়। তিনি বলেছেন, "ইংরেজি ভাষাটা এসেছে ইতিহাসের স্রোতে। গত প্রায় দেড়শ বছর ধরে দেশের শিক্ষিত লোকেরা ইংরেজি ভাষার চর্চা করছেন, এবং যদিও দেড়শ **বছর পরও তারা শতকরা দুজন কি আড়াই জন মাত্র, দেশের মধ্যবিত্ত সংস্কৃতি, আমাদের বর্তমান সমাজ ও রাষ্ট্রের নেতৃত্ব আজও কিন্তু এদেরই হাতে।** এঁদের গড়া বিধিবিধান আইনকানুন শিক্ষাসমাজ আদর্শবিশ্বাস প্রভৃতিই আমাদের সামগ্রিক জীবনের নিয়ামক। আর, অন্যদিকে ইংরেজের সাম্রাজ্য আজ অতীত ইতিহাস মাত্র, কিন্তু ইংরেজি ভাষার সাম্রাজ্য ক্রমবর্ধমান। ·· যাঁরা জীবনের নানা উচ্চতর ক্ষেত্রে সমাজের দায়দায়িত্ব নির্বাহ করবেন, সমাজকে নেতৃত্ব দেবেন, নানা সামাজিক কর্মের নিয়ামক হবেন, সাহিত্য সৃষ্টি করবেন, নানা জ্ঞানবিজ্ঞান, বিদ্যা ও অবিদ্যার চর্চা করবেন তাঁদের সকলকেই ইংরেজি একটু ভালো করেই শিখতে হবে, অন্তত একেবারে স্নাতকস্তর পর্যন্ত।"[৪০] [মোটা হরফ লেখকের]

অর্থাৎ 'প্রায় দেড়শ বছর ধরে' 'শতকরা দুজন কি আড়াই জন' ইংরেজিভাষার চর্চা করলেও ডঃ. রায়ের মতে এদেশে 'ইংরেজি ভাষার সাম্রাজ্য ক্রমবর্ধমান' এবং এই দু'জন-আড়াই জনকে নেতা বানাবার জন্য ও তাঁদের প্রভুত্ব বজায় রাখার জন্য বাকি ৯৮ জনকে ইংরেজিভাষার যূপকাষ্ঠে বলি দিতে হবে। এই ৯৮ জনের আত্মাহুতির বিনিময়ে গড়ে উঠেছে সমাজের ওপরতলার গগনচুম্বী

সৌধ —বাকি দু'জনের ঘরে জমেছে ঐশ্বর্যের বিশাল পাহাড়। এঁদের জন্য চিন্তায়-ভাবনায় বিনিদ্র রজনী যাপন করে ডঃ. রায় পাণ্ডিত্যের নম্রতা, শালীনতা ও সৌজন্যবোধ হারিয়ে ফেলে বামফ্রণ্ট সরকারের ভাষা ও শিক্ষানীতির সমর্থনকারীদের অশিষ্ট ভাষায় আক্রমণ করেছেন —"বামপন্থী সরকারের ধ্বজা যাঁরা বহন করছেন, তাঁরা কে ক পৃষ্ঠা বাংলা লিখেছেন, কে কতটা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সেবায় আত্মনিয়োগ করেছেন।···কিছু কিছু নূতন লেখককে তাঁরা অর্থ সাহায্য করছেন,বই প্রকাশে সাহায্য করছেন, কিন্তু অজ্ঞাতকুলশীল তাঁরা কারা? নিজেদের দলের লোকেরা?"[৪১] কিন্তু এই ভাষা ব্যবহার কি রুচিসম্মত, বিদগ্ধ মনের পরিচয়বাহী? ডঃ. রায়ের উক্তি উদ্ধৃত করে বলি, "এসব রচনা বিদগ্ধজনের বিতর্কের ভাষা নয়, পরিশীলিত মানুষের ভাবভঙ্গি নয়।"[৪২]

ডঃ রায় ও তাঁর মতাবলম্বী বুদ্ধিজীবীদের শ্রেণীস্বার্থ-সেবায় অবিচল নিষ্ঠা ও অন্ধ কমিউনিস্ট বিরোধিতা দেখে বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিক রমঁ্যা রলাঁর উক্তি মনে পড়ছে – "বুদ্ধিজীবী সুবিধাভোগী শ্রেণী; শোষণকারীরা তাহাদের যে সম্মান ও সুযোগ সুবিধা দেন তাহাতেই কৃতার্থ হইয়া তাহারা সাধারণ আদর্শের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে।"[৪৩] অথচ 'আজও মনস্বীশ্রেণীর বিকাশলাভের শ্রেষ্ঠ পন্থা জনসাধারণের বিকাশ লাভ; জনসাধারণের ভাগ্যের উপর বুদ্ধিজীবীর ভাগ্য নির্ভর করিতেছে।'[৪৪] মানবেতিহাস বিশ্লেষণ করলে এই উক্তির সত্যতা উপলব্ধি করা যায়। এই ইতিহাস-চেতনার পরিচয় পাওয়া যায় স্বামী বিবেকানন্দের রচনায়। তিনি লিখেছেন, "শ্রমজীবীরা কাজ বন্ধ করলে তোদের অন্নবস্ত্র জোটে না। এদের তোরা 'ছোটলোক' ভাবছিস, আর নিজেদের 'শিক্ষিত' বলে বড়াই করছিস? জীবন-সংগ্রামে সর্বদা ব্যস্ত থাকাতে নিম্নশ্রেণীর লোকদের এতদিন জ্ঞানোন্মেষ হয়নি। এরা মানববুদ্ধি-নিয়ন্ত্রিত কলের মতো একইভাবে এতদিন কাজ করে এসেছে, আর বুদ্ধিমান চতুর লোকেরা এদের পরিশ্রম ও উপার্জনের সারাংশ গ্রহণ করেছে; সকল দেশেই ঐ রকম হয়েছে। কিন্তু এখন আর সেকাল নেই। ইতর জাতিরা ক্রমে ঐ-কথা বুঝতে পাচ্ছে এবং তার বিরুদ্ধে সকলে মিলে দাঁড়িয়ে আপনাদের ন্যায্য গণ্ডা আদায় করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়েছে।...

"এখন হাজার চেষ্টা করলেও ভদ্রজাতেরা ছোট জাতদের আর দাবাতে পারবে না। এখন ইতর জাতদের ন্যায্য অধিকার পেতে সাহায্য করলেই ভদ্রজাতদের কল্যাণ।...

"তা না হলে কিন্তু তোদের (ভদ্রজাতিদের) কল্যাণ নেই। ...এই জনসাধারণ যখন জেগে উঠবে, আর তাদের ওপর তোদের অত্যাচার বুঝতে পারবে —তখন তাদের ফুৎকারে তোরা কোথায় উড়ে যাবি। তারাই তোদের ভেতর civilisation (সভ্যতা) এনে দিয়েছে, তারাই আবার তখন সব ভেঙে দেবে। ...

"এই জন্য বলি, এই সব নীচজাতদের ভেতর বিদ্যাদান জ্ঞানদান করে এদের ঘুম ভাঙাতে যত্নশীল হ।"[৪৫]

তাই ভগীরথ যেমন স্রোতস্বিনী গঙ্গাকে মর্তভূমিতে এনে এদেশকে শস্য-শ্যামলা সুজলা সুফলা করেছেন, তেমনি বর্তমান সরকার ঘুমের দেশে জাগরণী গান গেয়ে শ্রমজীবী মানুষের সুপ্ত সৃজনশীল শক্তিকে জাগাতে চাইছেন। অন্যদিকে ডঃ. রায় এবং তাঁর সমর্থকেরা ঘুমপাড়ানির গান গেয়ে এদেশে অসুর-দানবের রাজত্ব সৃষ্টি করতে চাইছেন।

ডঃ. নীহাররঞ্জন রায়ের সমর্থকগোষ্ঠী 'ফোরাম অব সিটিজেন্স ফর এডুকেশন'-এর পক্ষ থেকে ইংরেজিতে একটি ও বাংলায় দু'টি পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছে ; বাংলা পুস্তিকা দু'টি হ'ল, ডঃ. সত্যজিৎ চৌধুরী লিখিত 'স্নাতক-স্তরে ভাষাশিক্ষা প্রসঙ্গে' এবং অধ্যাপক অশোক মুখোপাধ্যায় রচিত 'সবারে করি আহ্বান'। তাঁরাও কণ্ঠ মিলিয়ে শিক্ষা-ব্যবসায়ীদের পক্ষে একই সুরে গান গেয়েছেন, কায়েমী স্বার্থে আঘাত পড়ায় তাঁরা গেল গেল রব তুলেছেন, যুক্তি প্রদর্শনের পরিবর্তে তাঁরা কুস্তিগীরের প্রবণতা দেখিয়েছেন, দিনের আলো গোপন করে তাঁরা রাতের আঁধার সৃষ্টি করতে চেয়েছেন, সকলকে জুজুর ভয় দেখিয়েছেন, ভাষা-নীতির সমর্থকদের প্রতি ভাষা-প্রয়োগে তাঁরা ডঃ. রায়ের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন।

ডঃ. সত্যজিৎ চৌধুরী তাঁর পুস্তিকায় রাজ্য সরকার তথা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষা ও শিক্ষানীতিকে 'সাময়িক জনপ্রিয়তা অর্জনের সুবিধাবাদী নীতি'[৪৬] বলে অভিহিত করে 'এ ধরণের একটি অপরিণামদর্শী প্রস্তাবকে সর্বতোভাবে প্রতিরোধ করা'র আহ্বান জানিয়েছেন। কারণ 'বহু খ্যাতিমান প্রবীণ শিক্ষাবিদ ভাষাসংক্রান্ত প্রস্তাব কার্যকর করা হলে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে দূরপ্রসারী অপূরণীয় ক্ষতির আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন।'[৪৭] অথচ পূর্ববর্তী অধ্যায়ের আলোচনায় আমরা দেখেছি, এই 'খাতিমান প্রবীণ শিক্ষাবিদ'-এরা ভাষা-আলোচনার চেয়ে বামফ্রন্টের বিরুদ্ধে বিষোদ্গারে বেশী আগ্রহী হয়েছেন এবং প্রাথমিক-স্তরে প্রত্যক্ষভাবে মাতৃভাষা-চর্চার বিরোধিতা

করতে সাহসী না হলেও তাঁরা এই স্তরে ইংরেজিভাষা শিক্ষার দাবি করে মাতৃভাষায় জনশিক্ষা বিস্তারের প্রয়াসকে ব্যর্থ করার জন্য কোমর বেঁধেছেন। এই অধ্যায়ের প্রথম দিকের আলোচনায় দেখানো হয়েছে, শতকরা দু'জন-আড়াই জন ইংরেজি-শিক্ষিতদের জন্যে তাঁদের চিন্তা-ভাবনা এবং তাঁদের যাবতীয় কর্মপ্রয়াস মুষ্টিমেয় ইংরেজি-আলোকপ্রাপ্তদের জন্যে।

উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রেও এই সমস্ত পণ্ডিত ব্যক্তি একই দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা চালিত হয়েছেন। চৌত্রিশটি স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপিত হলেও উচ্চতর শিক্ষা বৃটিশ-যুগের মত একটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর মধ্যেই আবদ্ধ হয়ে রয়েছে। তাঁরা উচ্চতর শিক্ষাকে জনপদে ছড়িয়ে দেবার ও জ্ঞান-সাধনার পূর্ণ সুযোগ দানের কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করেননি। কারণ সকলে জ্ঞান-লাভের সুযোগ পেলে সমাজ-জীবনে তাঁদের প্রভুত্বের অবসান ঘটবে, আপ্ত-বিশ্বাসীদের সংখ্যা কমে যাবে; যুক্তির কষ্টিপাথরে বিচার করে গ্রহণের মনোভাব প্রবল হয়ে উঠবে। তাছাড়া যে উচ্চশিক্ষার দৌলতে তাঁরা ধনসম্পদ ও সামাজিক সম্মানের অধিকারী, উচ্চশিক্ষা সম্প্রসারিত হলে সর্বক্ষেত্রে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা সৃষ্টি হবে। উচ্চতর শিক্ষার জগতে বর্ণশ্রেষ্ঠ-বিত্তশ্রেষ্ঠদের একচেটিয়া আধিপত্যের যে চিরন্তন ঐতিহ্য, সেই ঐতিহ্যকেই শিক্ষাভিমানী ব্যক্তিরা শ্রেণীস্বার্থে বজায় রাখতে চান। অথচ এঁদের অভিমতকে অধ্যাপক চৌধুরী আপ্ত-বাক্য বলে গ্রহণ করেছেন। যুক্তিধর্ম বিসর্জন দিয়ে যিনি 'প্রবীণ শিক্ষাবিদ'দের প্রতি অচল-অটল আনুগত্য প্রদর্শন করেছেন, স্বাভাবিকভাবে তাঁর রচনায় যুক্তির চেয়ে ভীতি-প্রদর্শনই প্রবল হয়ে উঠবে —ইংরেজি-বাংলা ঐচ্ছিক হলে অধ্যাপকদের চাকরি যাওয়ার ভয় দেখিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, "ইংরেজি-বাঙলার ক্লাশের পরিমাণ কমে যাওয়ায় এই সব বিষয়ের বেশ কিছু অধ্যাপকের কোনো কাজ থাকবে না এবং ক্রমে এঁরা কর্মচ্যুতির সম্মুখীন হবেন।"[৪৮] অন্য একটি মুদ্রিত ইস্তাহারে তাঁরা বলেছেন, "ভাষাশিক্ষা-সঙ্কোচন নীতির ফলে বিভিন্ন কলেজে ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপকদের জীবিকার্জন কঠিন হয়ে পড়বে – যদি না তাঁরা উচ্চ-মাধ্যমিক অর্থাৎ স্কুল-স্তরে অধ্যাপনা করতে রাজী হন।"

ধূম্রজাল সৃষ্টির দ্বারা শিক্ষক সমাজকে বিভ্রান্ত করার জন্য ফোরামের ইংরেজি পুস্তিকায় বলা হয়েছে, আবশ্যিক ভাষা-শিক্ষা না থাকলে 'অধিকাংশ কলেজের ইংরেজি ও বাংলার অধ্যাপকদের কাজের ভার লাঘব হবে এবং পরিণতিতে অধিকাংশ অধ্যাপক অতিরিক্ত ও অপ্রয়োজনীয় বলে ঘোষিত হবেন।'[৪৯] কেবলমাত্র শিক্ষক সম্প্রদায়কে নয়, জনসাধারণকেও জুজুর ভয় দেখানো হয়েছে

—"যে প্রতিকূল জনমতের দরুণ হিন্দী পঠন-পাঠনকে এযাবৎ পশ্চিমবাংলার উচ্চশিক্ষায় 'আবশ্যিক' রাজপথে আনা যায়নি, তাকে ধীরে ধীরে বশ্যতা স্বীকার করানোর জন্যই হিন্দীকে সুড়ঙ্গ পথে নিয়ে আসার প্রস্তুতি হচ্ছে।"[৫০] এবং "স্কুলশিক্ষার ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীমশাই…সুস্পষ্টভাবে আরো বলেছেন যে, মাধ্যমিক স্তর পর্যন্তই পাঠক্রম হয়ে যাবে ইংরেজিহীন।"[৫১] সত্যের প্রতি আনুগত্যের এত অভাব কেন? তাঁরা এসব সংবাদ পেলেন কোথায়? তাঁদের অপপ্রচারের সুবিধা হবে বলে কি মন্ত্রীমশাই কেবলমাত্র তাঁদেরই একথা গোপনে বলেছেন?

ডঃ. নীহাররঞ্জন রায়ও একই ভয় দেখিয়েছেন কিন্তু কেউই সংবাদের সূত্র জানাননি। তাছাড়া যখন বলা হ'ল, শিক্ষকরা উদ্বৃত্ত হবেন না, তাঁদের কাজের ভার লাঘব হয়নি, বরং বেড়েছে, কলা বিভাগের ছাত্রদের সঙ্গে বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রদেরও যে-কোনো একটি ভাষা-শিক্ষা ঐচ্ছিক হলেও আবশ্যিক এবং মোট নম্বরও বেড়েছে, তখন শাঁখের করাতের মতো তাঁরা দুদিকে কাটতে চেয়েছেন, "ইংরেজি ও আধুনিক ভারতীয় ভাষাসমূহের চর্চাকে অধিক নম্বরবাহী ঐচ্ছিক বিষয়ে পরিণত করা আর পরিবারের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কোন ব্যক্তিকে পঙ্গু ঘোষণা করে তাকে পূজো করার ব্যবস্থা করা একই ব্যাপার।"[৫২] তাহলে আবশ্যিক ভাষা-শিক্ষা তাঁদের কাছে সাহিত্যের রসাস্বাদনের জন্য নয়, একচেটিয়া ধনোপার্জনের হাতিয়ার মাত্র। তাই তাঁরা ভাষা-শিক্ষার সঙ্গে উপার্জনক্ষম ব্যক্তির তুলনা করেছেন। অথচ তাঁরা নানা কথার ফুলঝুরির আড়ালে এ সত্যকে গোপন করার জন্য সচেষ্ট ছিলেন। কেবলমাত্র সত্য গোপন করা নয়, তাঁরা সত্যের অপলাপও করেছেন—"ইংরেজি আজ বিশ্বের সর্বাগ্রহণ্য ভাষা যাতে পৃথিবীর তাবৎ বিষয়ে আহরিত জ্ঞান অতি শীঘ্রই প্রকাশিত হয়ে দেশে দেশে জ্ঞানপিপাসুদের মনের দিগন্ত বিস্তারে সহায়তা করে।"[৫৩] অর্থাৎ বিশ্বের সকল দেশের মানুষ ইংরেজিভাষার মাধ্যমে জ্ঞান অর্জনে ব্রতী। তাহলে ফরাসী দেশে কি ইংরেজিভাষায় জ্ঞান-চর্চা হয়? রুশ দেশে কি শিক্ষার মাধ্যম ইংরেজিভাষা? জাপান কি ইংরেজিভাষার জোরে বড় হয়েছে? তাহলে কি রবীন্দ্রনাথ আমাদের ভুল শিখিয়েছেন? কবিগুরু বলেছেন, "আমাদের এই ভীরুতা কি চিরদিনই থাকিয়া যাইবে? ভরসা করিয়া এটুকু কোনোদিন বলিতে পারিব না যে উচ্চশিক্ষাকে আমাদের দেশের ভাষায় দেশের জিনিস করিয়া লইতে হইবে? পশ্চিম হইতে যা-কিছু শিখিবার আছে জাপান তা দেখিতে দেখিতে সমস্ত দেশে ছড়াইয়া দিল তার প্রধান কারণ,

সেই শিক্ষাকে তারা দেশি ভাষার আধারে বাঁধাই করিতে পারিয়াছে।”[৫৪]

সেকারণেই পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিশ্ববিদ্যালয়-স্তরে মাতৃভাষায় শিক্ষাদানে প্রয়াসী হয়েছেন। তবে মাতৃভাষার বিরোধিতা সেকালের ন্যায় একালেও আছে এবং তাঁরা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে মাতৃভাষার চেয়ে ইংরেজিভাষার জয়গান করেন বেশী। এই সমস্ত ইংরেজ-নকলনবীশদের সার্কাস দলের জোকারের মত আচরণ দেখে কবিগুরু মন্তব্য করেছেন, “অসভ্যেরা যেমন গায়ে রঙ মাখিয়া, উল্কি পরিয়া পরম গর্ব অনুভব করে, স্বাভাবিক স্বাস্থ্যের উজ্জ্বলতা এবং লাবণ্য আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, আমাদের বিলাতি বিদ্যা আমরা সেইরূপ গায়ের উপর লেপিয়া দম্ভভরে পা ফেলিয়া বেড়াই; আমাদের যথার্থ আন্তরিক জীবনের সহিত তাহার অল্পই যোগ থাকে। অসভ্য রাজারা যেমন কতকগুলা শস্তা বিলাতি কাচখণ্ড পুঁতি প্রভৃতি লইয়া শরীরের যেখানে সেখানে ঝুলাইয়া রাখে এবং বিলাতি সাজসজ্জা অযথাস্থানে বিন্যাস করে, বুঝিতেও পারে না কাজটা কিরূপ অদ্ভুত এবং হাস্যজনক হইতেছে, আমরাও সেইরূপ কতকগুলা শস্তা চক্‌চকে বিলাতি কথা লইয়া ঝল্‌মল্ করিয়া বেড়াই এবং বিলাতি বড়ো বড়ো ভাবগুলি লইয়া হয়তো সম্পূর্ণ অযথা স্থানে অসংগত প্রয়োগ করি; আমরা নিজেও বুঝিতে পারি না অজ্ঞাতসারে কী একটা অপূর্ব প্রহসন অভিনয় করিতেছি এবং কাহাকেও হাসিতে দেখিলে তৎক্ষণাৎ য়ুরোপীয় ইতিহাস হইতে বড়ো বড়ো নজির প্রয়োগ করিয়া থাকি।”[৫৫]

বাঙালি-সাহেবদের ইংরেজিভাষা-জ্ঞানের বহর দেখে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় যে-ব্যঙ্গ কবিতাটি লিখেছিলেন, তা একালের ইংরেজি-ভক্তদের প্রতি সমভাবে প্রযোজ্য। যাঁরা ইংরেজির বিরহে কাতর, তাঁদের উদ্দেশ্যে কবি দ্বিজেন্দ্রলাল বলেছেন,

“আমাদের ভাষা একটু quaint
as you see,
এ নয় English কি Bengali,
করি English ও Bengali-র
খিচুড়ি বানিয়ে
Conversation-এ use;
কিন্তু একটিও ঠিক কইতে পারি
if you think
তাহলে You are an awful goose.”[৫৬]

প্রকৃতপক্ষে বিভ্রান্তি সৃষ্টি, ভীতিপ্রদর্শন, অসত্য প্রচার ইত্যাদির দ্বারা একালের ইংরেজি-সমর্থকেরা শিক্ষাক্ষেত্রে চিরন্তন আধিপত্য বজায় রাখতে চান। তাই তাঁরা 'একই দেহে ধরে দুই রূপ' —কখনো ফোরাম, কখনো স্বাধিকার। তথ্য ও সত্যের প্রতি তাঁদের আনুগত্য ততক্ষণ, যতক্ষণ তা শ্রেণীস্বার্থ পূরণের সহায়ক হয়। স্বার্থসিদ্ধির জন্য তাঁরা সত্যকে বিসর্জন দিয়ে নির্দ্বিধায় বলতে পারেন, "ভাষা শিক্ষার প্রভূত সঙ্কোচন তাই আমার কাছে পশ্চিম বাংলায় ভাবীকালের ছাত্রসাধারণের তথা নাগরিকবৃন্দের মনন হননের ভয়ঙ্কর সূচনা বলে মনে হয়।"[৫৭] তার ফলে 'নাগরিকবৃন্দের' অর্থাৎ বুদ্ধিজীবীদের 'সমাজে বিশেষ আসন পাওয়ার অধিকার থাকবে না, যেমন থাকবে না সমাজের অন্যান্য সম্প্রদায়ের শ্রমলব্ধ ফল ভোগ করার বিন্দুমাত্র অধিকার। তাঁরা তখন নিতান্তই শিক্ষিত শ্রমজীবীতে পর্যবসিত হবেন; বুদ্ধিজীবীর কৌলীন্য তাঁরা হারাবেন।'[৫৮] অর্থাৎ 'অন্যান্যসম্প্রদায়ের শ্রমলব্ধ ফল ভোগ' করতে হলে 'বুদ্ধিজীবীর কৌলীন্য' বজায় রাখতে হবে এবং সেকাজে একমাত্র সহায়ক আবশ্যিক ভাষা-শিক্ষা। এর অন্যথা হলে 'শিক্ষিত শ্রমজীবীতে পর্যবসিত' হতে হবে যা 'ভয়ঙ্কর' বলে পরান্নভোজীরা মনে করেছেন।

এঁদের অনৃতভাষণ জনচিত্তে যখন কোনো রেখাপাত করছে না, তখন ক্ষিপ্ত হয়ে তাঁরা ভাষা-প্রয়োগে সংযম হারিয়ে ফেলেছেন —'মন্ত্রীদের ও বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনকারী সরকার মনোনীত কাউন্সিলের সদস্যদের অজ্ঞতা ও অজ্ঞজনোচিত ঔদ্ধত্যের দরুণ বামফ্রন্ট সরকারের সম্পর্কে শিক্ষিত মানুষদের মনে যে প্রকাণ্ড আশা হয়েছিল, তা বকাণ্ড প্রত্যাশায় পর্যবসিত হয়েছে।'[৫৯] এবং 'একটা সুসংগঠিত দুষ্টচক্র সমাজকে সবসময়ে প্রতারিত করতে পারবে না।'[৬০] সেজন্য তাঁরা সেই 'সুসংগঠিত দুষ্টচক্র'কে অনুরোধ করেছেন, "বাড়তি ক্ষমতা, উপরি পাওনা, অঢেল প্রতিপত্তি ইত্যাদি যা কিছু নেওয়ার তাঁরা তা নিন"[৬১] এবং "ক্ষমতার দৌলতে অত্যন্ত রূঢ়ভাবে তাঁরা যে মূঢ়তা ক্রমাগত প্রকাশ করে চলেছেন"[৬২] তা বন্ধ করুন। 'ফোরামের' পণ্ডিত ব্যক্তিদের কথা শুনে রাস্তার সেই চোরটির কথা মনে পড়ে —যে নিজে চুরি করে জনসাধারণকে ধোঁকা দেবার জন্য সকলের সঙ্গে সেও 'চোর চোর' বলে চেঁচাতে থাকে। কিন্তু ধরা পড়লে তার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া মাঙতে হয়। এই সমস্ত শিক্ষা-বেওসাদারদের অবস্থাও হয়েছে তাই। যে-পদ্ধতিতে তাঁরা ধনদৌলতের মালিক হয়েছেন, পূর্বেকার সরকারগুলিকে তল্পীবাহক করেছেন, এবারেও তাঁরা ভেবেছেন, সেই একই পদ্ধতিতে বর্তমান সরকারকে কিছু

'উপরি' দিয়ে তাঁদের শিক্ষা-ব্যবসা চালিয়ে যাবেন।

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক হরিপদ চক্রবর্তী এডুকেশন ফোরামের শিক্ষকদের মত নিজেদের হিংস্র নখদন্ত গোপন করে বৈষ্ণব সাজেননি। ঢাক ঢাক গুড় গুড় না করে তিনি সোজাসুজি রাজনৈতিক আক্রমণ করেছেন। তিনি বলেছেন, "পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সিদ্ধান্ত স্নাতক পর্যায়ে বাংলা ইংরেজি সহ কোন ভাষা ও সাহিত্য আবশ্যিক পাঠ্য থাকবে না। সিদ্ধান্তটি কিন্তু আকস্মিক নয়, সুপরিকল্পিত। পূর্বে দুটি যুক্তফ্রন্ট সরকার অবিমিশ্র মার্কসবাদী ছিলেন না তত, কৃষি ও শ্রমিক ফ্রণ্টে তখন বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে চেষ্টা করেছিলেন। এবার সি. পি. এম. সংখ্যাগরিষ্ঠ দল এবং সঙ্গী সহচর দলগুলিও মার্কসবাদী। সুতরাং এবারে সার্বিক পরিবর্তন মার্কসীয় দৃষ্টিতে যতটা সম্ভব আনার চেষ্টা করা হবে—এটা প্রত্যাশিত ছিলই। এবার তাঁরা ধরেছেন শিক্ষাফ্রন্ট।"[৬৩] শ্রীচক্রবর্তীর মত বামফ্রন্ট-বিরোধীরা শিক্ষা-বিতর্কে অংশগ্রহণ করে শিক্ষা-বিষয়ে আলোচনা সীমাবদ্ধ না রেখে রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন বেশী; তাঁরা রাজনৈতিক মন্তব্য প্রকাশে অধিকতর উৎসাহী। যেমন অধ্যক্ষ অশোককুমার কুণ্ডু মন্তব্য করেছেন, "আজকাল উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে ভাষাশিক্ষার গুরুত্ব হ্রাস করার অপপ্রয়াস চলছে। ···ভাষাকে নিয়ে বিভিন্ন সময়ে এই যে ছিনিমিনি খেলা চলছে —এটা আসলে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত।"[৬৪]

শিক্ষা-বিষয়ে রাজনৈতিক আলোচনায় মার্কসবাদীরা আপত্তি করেন না। কারণ তাঁরাও জানেন, শিক্ষা সমাজের উপরিসৌধ, রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক কাঠামোর ওপর ভিত্তি করেই শিক্ষা-কাঠামো গড়ে তোলা হয়। 'জীবন এবং রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন শিক্ষা —মিথ্যা এবং ভণ্ডামী।'[৬৫] সুতরাং শোষণমূলক আর্থনীতিক-সামাজিক ব্যবস্থায় এক সের দুধে দু' সের জল মিশিয়ে কত লাভ করা যায়, সে-শিক্ষাই শিশুকে দেওয়া হয় যাতে শিশু বড় হয়ে এই শোষণ-ব্যবস্থাকে না ভেঙে তাকে রক্ষার কাজে নিযুক্ত হয়ে শোষণ-যন্ত্রের অংশীদার হয়। ডঃ. নীহাররঞ্জন রায় নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে বলেছেন, "আমি গভীরভাবে বিশ্বাস করি, সাহিত্য ও সংস্কৃতি যা নিয়ে আপনাদের এই সম্মেলন তা একান্তভাবেই সমাজনির্ভর, সমাজই তার একান্ত আশ্রয় এবং সেই সমাজে রাজনীতি, অর্থনীতি সমস্তই অঙ্গাঙ্গী জড়িত।"[৬৬]

এসব কথা মার্কসবাদীরা বললে তখন বিরোধীরা ধুয়া তোলেন শিক্ষাক্ষেত্রে রাজনীতি আমদানি করা হচ্ছে। অর্থাৎ এঁদের মনোভাব হচ্ছে তাঁরা কয়েকজন

চিরকাল লাঠি ঘোরাবেন, অপরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙবেন, বাকি সকলে বোবা পশুর মত মাথা নীচু করে তাঁদের অত্যাচার-উৎপীড়ন সহ্য করে যাবেন। তাঁদের হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও সেই বোবা পশুদের মুখে কথা ফুটবে, মাথা উঁচু করে অত্যাচারের প্রতিবাদ জানাবে, তা কিছুতেই চলতে দেওয়া যায় না। কিন্তু অ-চলার সঙ্গে চলার সংগ্রাম তো চিরকালের; সভ্যতার জন্মলগ্ন থেকে একাল পর্যন্ত মানুষ লড়াই করেই এগিয়ে এসেছে এবং ভবিষ্যতেও এগিয়ে যাবে। সামনে চলাই হ'ল তার গতিধর্ম—জীবনধর্ম, থামার অর্থ-ই হ'ল তার কাছে ছেদ-মৃত্যু। প্রাণের ধর্ম হ'ল চলমানতা, মৃত্যুর লক্ষণ হ'ল স্থবিরতা। তাই প্রাণবন্ত মানুষ থামতে জানে না, চলতে জানে—বাধাবিঘ্নকে অস্বীকার করে সে এগিয়ে চলে। একজনের পা ভেঙে দিলে অন্য জন তাকে কাঁধে নিয়ে এগিয়ে যাবে। মৃত্যুঞ্জয়ী মানুষের অবিরাম যাত্রা আলোর দিকে—জীবনের দিকে। বামফ্রন্ট-বিরোধীরা মিথ্যার কুহেলিকা সৃষ্টি করে তাঁদেরকে আলোর স্পর্শ থেকে বঞ্চিত করতে পারবেন না। তা না হলে সত্য-প্রকাশে তাঁদের দ্বিধা কেন? অহেতুক রাজনৈতিক কুৎসা প্রচারে তাঁদের এত উৎসাহ কেন?

সত্য কথাটা হ'ল, 'পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার শিক্ষা-ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাবার কোনও প্রকল্প নিয়ে রাজনীতির মল্লভূমিতে অবতীর্ণ হননি। এর আগে কংগ্রেসী ও জনতা আমলে শিক্ষাব্যবস্থাকে নিয়ে বারবার নানারকম এক্স্পেরিমেন্ট করা হয়েছে। তাতে ছাত্রছাত্রীদের বারবার হতে হয়েছে নাজেহাল। কিন্তু শিক্ষাব্যবস্থার কর্ণধারগণ অথবা উচ্চশিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী প্রতিবাদ করতে রাস্তায় নামেননি।'[৬৭] তাহলে বর্তমান সরকারের কোন্ অপরাধের জন্য গগনচুম্বী প্রাসাদের অধিবাসী বিদ্বৎজনদের জেহাদ ঘোষণা? এঁরা মনে করেন, বামফ্রন্ট সরকার চাষী-মজুর প্রভৃতি অন্ত্যজশ্রেণীকে মাথায় তুলতে চাইছেন। তাই তাঁরা উচ্চশিক্ষাক্ষেত্রে 'শতকরা দুজন আড়াই জনের' একচেটিয়া অধিকার ভেঙে ফেলে সকলের প্রবেশাধিকার প্রতিষ্ঠা করতে ব্রতী হয়েছেন। বর্তমান সরকার যদি পণ্ডিত নেহেরু ও অন্যান্য কংগ্রেস নেতাদের মত 'বৈপ্লবিক পরিবর্তন চাই', 'জনমুখী শিক্ষানীতি রূপায়িত কর' ইত্যাদি গালভরা বুলি আউড়ে বিভিন্ন শিক্ষা-কমিটি, কমিশন গঠন করে স্থিতাবস্থা বজায় রাখতেন, শিক্ষা-সংস্কারে ব্রতী না হতেন, তাহলে কিছুসংখ্যক বিত্তবান-ধনবান-বিদ্যাবান বুদ্ধিজীবী নিশ্চিন্তে দিনযাপন করতে পারতেন এবং বামফ্রন্ট সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য তাঁরা কেন্দ্রের কাছে দরবার করতেন না। কিন্তু

জনগণের শক্তির ওপরে নির্ভর করে রাজ্য-সরকার শিক্ষা-সম্প্রসারণে উদ্যোগী হয়েছেন। শিক্ষা-ব্যবসায়ীদের সুখস্বপ্ন ভেঙে দিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালকমণ্ডলী স্নাতক-স্তরে শিক্ষা কমিশনের ভাষাবিষয়ক সুপারিশগুলিকে ফাইলের বন্দীদশা থেকে বারো বছর পরে উদ্ধার করে বাস্তবায়িত করতে অগ্রসর হয়েছেন। এই ধরণের ঐতিহ্যবিরোধী কাজ ঐতিহ্যানুসারী বুদ্ধিজীবীদের কাছে হতবুদ্ধিকর। তাই তাঁরা বুদ্ধিভ্রংশ-স্মৃতিভ্রংশ হয়ে রচনায়-আলোচনায়, প্রবন্ধে-নিবন্ধে, ভাষণে-বক্তৃতায় বামফ্রন্ট-সরকারের বিরুদ্ধে বিষ উদ্গীরণকালে শিক্ষা কমিশনের নাম কখনো উল্লেখ করেননি। সত্য ও ন্যায়নীতিবোধকে রাস্তার আবর্জনাস্তূপে নিক্ষেপ করে তাঁরা বল্গাহীন কুৎসা প্রচার করে চলেছেন, মীরজাফর-জগৎশেঠ-উমিচাঁদের মত তাঁরা দিল্লীর দরবারে কাতর মিনতি জানাচ্ছেন। তাঁদের অভিযোগ, মার্কসবাদীরা এরাজ্যের শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে ধ্বংস করছেন। অথচ ইতিহাস বলে, মার্কসবাদীরা নন, বিভিন্ন যুগে বই পোড়ানো, প্রাচীন শিল্প-সংস্কৃতি ধ্বংস করা ইত্যাদি দুষ্কর্ম জনগণের শত্রুরাই করেছেন। একালেও আমরা এদেশে ষাটের দশকে তা প্রত্যক্ষ করেছি —ইংরেজি-শিক্ষার সমর্থক জনৈক সাহিত্যিক তাঁর বই কলেজ স্ট্রীটের রাস্তায় পুড়িয়েছেন। পক্ষান্তরে, 'বিপ্লবী প্রলেতারিয়েতের ভাবাদর্শ হিসাবে মার্কসবাদ বিশ্ব-ঐতিহাসিক তাৎপর্য অর্জন করেছে এই জন্য যে, মার্কস-বাদ কখনোই বুর্জোয়া যুগের মূল্যবান সংস্কৃতিকে বিসর্জন দেয়নি, বরং উলটে, মানব-চিন্তা ও সংস্কৃতির দুই সহস্রাধিক বছরের বিকাশের মধ্যে যা কিছু মূল্যবান ছিল তাকে আত্মস্থ করেছে ও ঢেলে সেজেছে।'[৬৮] সেকারণেই এরাজ্যের মার্কসবাদীরা উচ্চতর শিক্ষাক্ষেত্রে নৈরাজ্য দূর করার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করেছেন ; উচ্চতর শিক্ষাকে মুষ্টিমেয়ের মধ্যে আবদ্ধ না রেখে সকলের মধ্যে ছড়িয়ে দেবার চেষ্টা করছেন। বর্তমান রাজ্য সরকারের ভাষা ও শিক্ষানীতি আলোচনাকালে এই সত্যই উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক-স্তরে ভাষা ও শিক্ষাবিষয়ক প্রস্তাব আলোচনাকালে শিক্ষা কমিশনের ভাষাবিষয়ক সুপারিশসমূহ (যা এই অধ্যায়ের প্রথমদিকে উল্লিখিত হয়েছে —পৃঃ ৩৮৯-৯০ দ্রঃ) স্মরণে রাখা প্রয়োজন। শিক্ষা কমিশনের সংস্কার-প্রস্তাব প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থার বৈপ্লবিক পরিবর্তনের প্রস্তাব নয়। এর দ্বারা বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থার মৌলিক রূপান্তর ঘটবে না। তা সত্ত্বেও কমিশনের শিক্ষা ও ভাষাসংক্রান্ত অনেকগুলি প্রস্তাব সমর্থনযোগ্য এই কারণে

যে, এইবারেই সর্বপ্রথম ত্রিস্তরের শিক্ষা-কাঠামো, শিক্ষণীয় বিষয় ও ভাষা-শিক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে সামগ্রিক দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং শিক্ষাকে মুষ্টিমেয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে সমাজের সকল স্তরে ছড়িয়ে দেবার উদ্দেশ্যে সুপারিশ করা হয়েছে। এই সুপারিশগুলি ধনতান্ত্রিক শিক্ষাকাঠামো গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে রচিত হলেও বর্তমান আধা-ধনতান্ত্রিক ও আধা-সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় তা নিঃসন্দেহে গতিশীল চিন্তাধারার পরিচায়ক। সেজন্য কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে বামফ্রন্ট সরকারের ভাষানীতি গড়ে উঠেছে। এবং তাঁদের শিক্ষাদর্শে অনুপ্রাণিত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালকেরা শিক্ষা কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে স্নাতক-স্তরের শিক্ষার দরজা সকলের কাছে উন্মুক্ত করার উদ্দেশ্যে শিক্ষা-কাঠামো, বিষয়-নির্বাচন ও ভাষা-চর্চা ইত্যাদি বিষয়ে সুপারিশ করেছেন।

স্নাতক-স্তরের শিক্ষাক্রমে সময়-সূচী সম্পর্কে শিক্ষা কমিশনের সুপারিশ হ'ল, "প্রথম ডিগ্রি কোর্সের সময়-সীমা তিন বছরের কম হওয়া উচিত নয়। অবশ্য এ বিষয়ে সর্বত্র একই নীতি অনুসরণের প্রয়োজন নেই, তা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন রকম হতে পারে এবং এমন কি একই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ভিন্ন ভিন্ন বিষয় অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন সময়-সীমা নির্ধারিত হতে পারে। দ্বিতীয় ডিগ্রির সময়-সীমা দুই অথবা তিন বছরের হতে পারে।"[৬৯]

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রচলিত পাস ও অনার্সসহ তিন বছরের ডিগ্রি কোর্সের সময়-সীমাকে সংশোধনের জন্য যে নতুন প্রস্তাব দিয়েছেন, তাতে পাস কোর্সের জন্য দু'বছর এবং অনার্সের জন্য তিন বছর (দু'বছর পরে পার্ট ওয়ান এবং এক বছর পরে পার্ট টু) ধার্য হয়েছে। প্রথম, দ্বিতীয় ও 'পি' ডিভিসন প্রথা প্রবর্তনের প্রস্তাব করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে, এগ্রিগেটের প্রয়োজন নেই (এ সম্পর্কিত বিস্তৃত প্রস্তাব ৩৯৬-৯৯ পৃষ্ঠায় দেওয়া হয়েছে)।

শিক্ষা-কাঠামো পরিবর্তনের এই প্রস্তাব নিঃসন্দেহে বাস্তবোপযোগী ও প্রয়োজনভিত্তিক। ছাত্ররা এর দ্বারা বহুলাংশে উপকৃত হবেন। তাঁদের সময় ও শ্রমের অপচয় বন্ধ হবে এবং মেধা ও সৃজনশক্তির বিকাশ ঘটবে। প্রচলিত শিক্ষা-কাঠামোর সঙ্গে প্রস্তাবিত শিক্ষা-কাঠামোর তুলনা করলে লক্ষ্য করা যায়:

(১) প্রচলিত শিক্ষা-কাঠামোয় স্নাতক স্তরের পাস ও অনার্স কোর্সের সময় সীমা তিন বছর এবং দুটি অংশে বিভক্ত। দু'বছরের অধ্যয়ন শেষে প্রথম অংশের পরীক্ষা পাস ও অনার্স ছাত্রদের দিতে হয়। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেও তাঁরা কোনো ডিগ্রি পান না। পরবর্তী বছরের অধ্যয়ন-শেষে

দ্বিতীয় অংশের পরীক্ষা দিয়ে সাফল্য লাভ করলে তাঁরা ডিগ্রি-লাভের অধিকারী হন। কিন্তু এই পদ্ধতির জন্য ছাত্রশক্তির নিদারুণ অপচয় ঘটছে। প্রথমত, পাস কোর্স ও অনার্স কোর্সের একই সময়-সীমার জন্য পাস কোর্সের পাঠক্রম অনার্স কোর্সের পাঠ্যবিষয়ের তুলনায় অনেক লঘু হওয়া সত্ত্বেও পাস-এর ছাত্র-ছাত্রীদের ডিগ্রি-লাভের জন্য তিন বছর অপেক্ষা করতে হয়। দু'বছর পরে পরীক্ষা দিয়ে সাফল্য অর্জন করলেও তাঁদের মধ্যে অনেকেই আর্থিক ও নানাবিধ কারণে স্নাতক-স্তরের জগৎ থেকে বিদায় নিতে বাধ্য হন; তৃতীয় বছরের পাস কিংবা অনার্স কোর্সের অধ্যয়ন সম্পূর্ণ করতে পারেন না। দু'বছরের পরীক্ষায় সাফল্য অর্জন করলেও কোনো ডিগ্রির সার্টিফিকেট না থাকায় চাকরির ইণ্টারভিউতে তাঁদের উচ্চ-মাধ্যমিকের সার্টিফিকেট পেশ করতে হয়। কিন্তু নয়া শিক্ষা-কাঠামোয় এই অবিচার ও অপচয় বন্ধ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। পাস কোর্সের সময়-সীমা দু'বছর এবং অধ্যয়ন-শেষে পরীক্ষায় সাফল্যলাভ করলে ডিগ্রির পাস-সার্টিফিকেট পাবেন। ফলে পাস কোর্সের ডিগ্রিলাভ পর্যন্ত একটি ছাত্রের অধ্যয়ন-কাল হবে চৌদ্দ বছর, কিন্তু বর্তমান ব্যবস্থায় পনেরো বছর। অর্থাৎ একটি বছর কমানো হয়েছে। কিন্তু অনার্স ডিগ্রির ক্ষেত্রে পনেরো বছরই থাকছে। অনার্সের সময়-সীমা তিন বছর —প্রথম অংশে দু'বছর এবং দ্বিতীয় অংশে এক বছর। প্রথম অংশের পাঠশেষে পরীক্ষায় সফল হলে তাঁরাও পাস কোর্সের ছাত্রছাত্রীদের মত পাস-ডিগ্রি অর্জন করবেন। যদি তাঁরা কোনো কারণে অনার্সের চূড়ান্ত পরীক্ষা না দিতে পারেন, তবে তাঁরা চাকরির দরবারে পাস ডিগ্রির সার্টিফিকেট পেশ করতে পারবেন।

(২) বর্তমান ব্যবস্থায় পরীক্ষায় কৃতকার্য হতে হলে প্রত্যেকটি বিষয়ে শতকরা ৩৪ নম্বর পেতে হয়, কিন্তু নতুন ব্যবস্থায় তা কমিয়ে ৩০ নম্বর করা হয়েছে।

(৩) প্রচলিত ব্যবস্থায় এগ্রিগেট না থাকলে পাশ করা যায় না, কিন্তু প্রস্তাবিত পরিকল্পনায় এগ্রিগেট প্রথা তুলে দেওয়া হয়েছে।

(৪) এখনকার নিয়মে পাস কোর্সে কোনো ডিভিসন দানের প্রথা নেই। 'ডিষ্টিংশন' ছাড়া সকলেই পাস-ডিগ্রি লাভ করেন। কিন্তু নতুন ব্যবস্থায় ডিভিসন প্রথা প্রবর্তনের প্রস্তাব রয়েছে। অর্থাৎ শতকরা ৬০ অথবা তার বেশী পেলে প্রথম ডিভিসন, শতকরা ৪৫ থেকে ৬০-এর কম পেলে দ্বিতীয় ডিভিসন এবং শতকরা ৩০ থেকে ৪৫ এর কম পেলে 'পি' ডিভিসন দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। কোনো পরীক্ষার্থী পাস কোর্সে শতকরা ৫৫ ভাগ নম্বর লাভ করলে পরের বছরে

রেগুলার অনার্সে পরীক্ষা দেবার সুযোগ পাবেন।

ছাত্রদের লেখাপড়ায় উৎসাহদান, তাঁদের মেধা ও বুদ্ধির মান অনুযায়ী শ্রেণীবিভাগ এবং সর্বোপরি সমাজ-জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য অধ্যয়নের কাল-সীমা সংক্ষিপ্তকরণ, পরীক্ষার নিয়মাবলীর জটিলতা থেকে মুক্তিদান ইত্যাদি কারণসমূহের জন্য একথা বলা নিশ্চয়ই অসঙ্গত হবে না যে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রস্তাবিত শিক্ষা-কাঠামো ছাত্র-কল্যাণের দিকে দৃষ্টি রেখেই রচিত হয়েছে। সে কারণেই তাঁরা বিষয়-নির্বাচনের ব্যাপকতর সুযোগ দানের প্রস্তাব দিয়েছেন।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্নাতক-স্তরে শিক্ষা কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী বিষয়-নির্বাচনের ক্ষেত্রে অধিকতর সুযোগ দানের কথা ঘোষণা করেছেন। নয়া ব্যবস্থায় বি. এ.-র একজন ছাত্র ইচ্ছুক হলে মানবিকী বিদ্যা ও সমাজ-বিজ্ঞান বিভাগ থেকে যে কোনো দুটি বিষয় নিয়ে তৃতীয় বিষয়টি প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বিভাগ কিংবা বাণিজ্য বিভাগ থেকে নিতে পারবেন এবং অনার্স নিতে ইচ্ছুক হলে প্রথম দু'টি বিষয়ের যে কোনো একটিতে অনার্স নিতে পারবেন। বি. এস-সি. ও বি. কম.-এর ছাত্ররাও একই সুযোগ পাবেন। কিন্তু প্রচলিত ব্যবস্থায় বিষয়-নির্বাচনের অবাধ অধিকার নেই।

১৮৫৮ খৃষ্টাব্দ থেকে বি. এ. পরীক্ষা আরম্ভ হলেও বি. এস-সি. ডিগ্রি ছিল না এবং তৎকালে প্রচলিত বি. এ.-র পাঠক্রমে কলা ও বিজ্ঞানের বিষয় থাকলেও ইচ্ছানুযায়ী কলা ও বিজ্ঞানের বিষয় একসঙ্গে নির্বাচনের অধিকার ছিল না। কলা ও বিজ্ঞানের বিষয়সমূহ পৃথকভাবে সুনির্দিষ্ট ছিল। বিজ্ঞান নিয়ে কোনো ছাত্র বি. এ. ডিগ্রি লাভ করতে চাইলে তাঁকে কেবলমাত্র বিজ্ঞানের বিষয় নিয়ে অধ্যয়ন করতে হ'ত। ১৯০২ খৃষ্টাব্দ থেকে বি. এস-সি. পরীক্ষা আরম্ভ হলেও একত্রে কলা ও বিজ্ঞানের বিষয় অধ্যয়নের অধিকার দেওয়া হয়নি। এমনকি কলা কিংবা বিজ্ঞান-বিভাগের ছাত্ররা তাঁদের মেধানুযায়ী নিজ নিজ বিভাগের জন্য নির্দিষ্ট বিষয়গুলির মধ্য থেকে যে কোনো বিষয় নির্বাচনের সুযোগ পেতেন না। ফলে প্রাণের তাগাদা না থাকায় এবং রুচি ও মেধানুযায়ী বিষয়-নির্বাচনের অধিকার স্বীকৃত না হওয়ায় ছাত্ররা কেবলমাত্র মুখস্থ বিদ্যার দ্বারা পরীক্ষা-বৈতরণী পার হওয়ার চেষ্টা করতেন।

সেকারণে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেছেন, "আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ও শিক্ষাবিভাগের অধিষ্ঠাত্রী দেবী স্পন্দনহীন, বর্ণহীন, নীরস, নীরব ক'রে পর্য্যবসিতা হইয়াছেন। তাঁহার চিন্তা নাই, বেদনা নাই, অনুভূতি নাই,

তিনি কেবল শিক্ষা-যন্ত্রের কোন অনির্দেশ্য স্থানে অবস্থিত থাকিয়া শুষ্ক কঠোর ব্যবস্থা নির্দ্দেশে ও নিয়ম নির্দ্দেশে ও দণ্ড চালনায় শিক্ষার্থীর ভ্রমণপথ নিয়ন্ত্রিত করেন। বাগ্‌দেবী তা দূরে আছেন, যে শিক্ষক ও অধ্যাপক সম্প্রদায় মধ্যবর্ত্তী থাকিয়া উপাসিতার সহিত উপাসকের সম্বন্ধ স্থাপনে নিয়োজিত তাঁহারাও রাগানুরাগশূন্য যন্ত্রাঙ্গ মাত্রে পরিণত হইয়াছেন।"[৭০]

শিক্ষা কমিশন ১৯৬৬ সালে প্রচলিত বিষয়-নির্বাচন ব্যবস্থার সমালোচনা করে তা সম্প্রসারিত করার জন্য সুপারিশ করেছেন। দশ বছর অতিক্রান্ত হলেও এবিষয়ে কিছুই করা হয়নি। অথচ 'শিক্ষা বলিলে আমরা কেবল একটা মাত্র শিক্ষাই বুঝিয়া থাকি ; এবং সেই শিক্ষার অর্থ মনুষ্যত্বের বৃদ্ধি, স্ফূর্তি ও পরিপুষ্টি। যাহাতে অপুষ্ট মনুষ্যত্ব পুষ্টিলাভ করে, প্রচ্ছন্ন মনুষ্যত্ব বিকাশ পায়, হীন মনুষ্যত্ব স্ফূর্তিলাভ করিয়া জাগ্রত ও চেতন হইয়া উঠে, তাহাকেই আমরা শিক্ষা নামে অভিহিত করিয়া থাকি।'[৭১]

বর্তমান প্রথায় বিষয়-নির্বাচন বিভাগ-অনুযায়ী নির্দিষ্ট হওয়ায় ছাত্রছাত্রীদের জ্ঞান অর্জন অসম্পূর্ণ থেকে যায়। মনুষ্যত্ব-বোধের বিকাশ ঘটে না, চিন্তা ও কল্পনাশক্তির পরিপূর্ণতা লাভ করে না। বিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রীদের কলা বিভাগের সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস কোনো একটি বিষয় অধ্যয়নের সুযোগ না থাকায় সুকুমারবৃত্তির প্রকাশ ঘটে না, সামাজিক দায়িত্ববোধ সম্পর্কে চেতনার উন্মেষ ঘটে না। তদ্রূপ কলা-বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের অধিকার না থাকায় বিজ্ঞান-বিভাগের পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, প্রাণীবিদ্যা ইত্যাদির কোনো একটি বিষয় পড়ার সুযোগ পান না। ফলে তাঁরা আধুনিক বিজ্ঞানের অগ্রগতি সম্পর্কে একান্ত-রূপে অজ্ঞ থেকে যান। অথচ জীবন বিজ্ঞানের ওপর নির্ভরশীল। বিজ্ঞানের সাহায্য ছাড়া জীবনের পথে এক পাও চলা সম্ভব নয়। সুতরাং সাহিত্য ও বিজ্ঞান পরস্পরের পরিপূরক বলে শিক্ষাক্ষেত্রে আন্তঃবিষয়ক সমন্বয় একান্ত প্রয়োজন। প্রস্তাবিত পরিকল্পনায় সেদিকে লক্ষ্য রেখে বিষয়-নির্বাচনের সুযোগ সম্প্রসারিত হওয়ায়, পুষ্টি, স্ফূর্তি ও বিকাশের সম্ভাবনাকে প্রশস্ত করেছে।

এবারে ভাষা-প্রসঙ্গ। বামফ্রন্ট-বিরোধীরা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রস্তাবিত শিক্ষা-কাঠামো ও বিষয়-নির্বাচন প্রসঙ্গে নীরব থেকে কেবলমাত্র ভাষা-সংস্কারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠেছেন। ভাষাশিক্ষা-নীতির বিরুদ্ধে কোনো কোনো বুদ্ধিজীবী যুদ্ধং দেহি মনোভাব নিয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও রাজ্য-সরকারকে শিক্ষাক্ষেত্রে কালাপাহাড়-রূপে চিহ্নিত করার প্রয়াসে

সচেষ্ট হয়েছেন। উচ্চশিক্ষাক্ষেত্রে একচেটিয়া আধিপত্য ক্ষুণ্ণ হওয়ার আশঙ্কায় তাঁরা যুক্তি প্রদর্শনের পরিবর্তে বল্গাহীন কুৎসা প্রচারের দ্বারা উচ্চ ও মধ্যবিত্ত-শ্রেণীকে বিভ্রান্ত করতে চেয়েছেন। সেকারণে তাঁরা আধুনিক শিক্ষার ইতিহাস ও বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার পটভূমিতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-সংস্কার প্রস্তাবটিকে সামগ্রিকভাবে আলোচনা না করে কেবলমাত্র ভাষা-শিক্ষার বিষয়টিকে আক্রমণ করেছেন। সুতরাং সত্যের অপলাপ বন্ধ করতে হলে সংবেদনশীল বিষয়টিকে যুক্তিনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গিতে তথ্যনির্ভর আলোচনার প্রয়োজন।

শিক্ষা কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষা-শিক্ষা নীতি পরিকল্পিত হয়েছে। অথচ স্থিতাবস্থার পক্ষপাতীরা ভাষা-শিক্ষা নীতিকে আক্রমণের সময়ে একবারও শিক্ষা কমিশনের নাম উল্লেখ করেননি; সত্যানুগত্য থাকলে তাঁরা শিক্ষা কমিশনকেই দায়ী করতেন। কিন্তু সত্যের সঙ্গে তাঁদের ভাসুর-ভাদ্দর বৌয়ের সম্পর্ক —নাম উচ্চারণ করলে নরকস্থ হতে হয়। তাঁরা শিক্ষা কমিশনের নাম উল্লেখ না করলেও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষা-শিক্ষার প্রস্তাব আলোচনাকালে শিক্ষা কমিশনের ভাষা-শিক্ষা বিষয়ক সুপারিশসমূহ আমাদের স্মরণে রাখতে হবে (কমিশনের সুপারিশগুলি ৩৮৯-৯০ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হয়েছে)।

শিক্ষা কমিশনের সুপারিশ অনুসারে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রস্তাবিত পরিকল্পনায় বাধ্যতামূলক ভাষা-শিক্ষার পরিবর্তে ঐচ্ছিক ভাষা-শিক্ষা করা হয়েছে (ভাষা-শিক্ষার প্রস্তাবটি ৩৯৭-৯৮ পৃষ্ঠায় দেওয়া হয়েছে)। অবশ্য পরবর্তীকালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সকল বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের ভাষা-শিক্ষা আবশ্যিক-ঐচ্ছিক করেছেন। অর্থাৎ প্রত্যেকটি ছাত্রছাত্রীকে যে কোনো একটি ভাষাকে ঐচ্ছিক বিষয়-রূপে অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে। তা সত্ত্বেও বামফ্রন্ট-বিরোধীদের অবস্থানের পরিবর্তন ঘটেনি। সুতরাং তাঁদের কথা শোনা যাক।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালকমণ্ডলী তাঁদের ভাষাশিক্ষা নীতির সমর্থনে অগ্রসর দেশগুলির স্নাতক স্তরে ভাষাশিক্ষা দেওয়া হয় না বলে মন্তব্য করেছেন। অধ্যাপক সন্তোষকুমার মিত্র তাঁর রচনায় সমাজতান্ত্রিক ও ধনতান্ত্রিক দেশ-গুলির ডিগ্রি-স্তরে ভাষাশিক্ষা বাধ্যতামূলক নয় বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এই যুক্তি এডুকেশন ফোরামের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের উত্তেজিত করেছে। অধ্যাপক সত্যজিৎ চৌধুরী মন্তব্য করেছেন, "দেশের সমস্যা নিয়ে ভাবতে গেলেই অগ্রসর বিদেশী রাষ্ট্রগুলির তুলনা টানা আমাদের এক দুর্মর ব্যাধি

স্বরূপ।"[১২] ডঃ. চৌধুরী তো সাহিত্যের অধ্যাপক। অনার্সের ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাদানকালে তিনি দেশীয় নাটক-উপন্যাসের সঙ্গে বিদেশী নাটক-উপন্যাসের তুলনামূলক আলোচনা করেন। তখন কি তিনি 'দুর্মর ব্যাধি'গ্রস্ত হন? আসলে ব্যাপারটা হ'ল, উন্নত কিংবা উন্নয়নশীল দেশগুলির সঙ্গে আমাদের দেশের তুলনা করলেই স্থিতাবস্থার সওয়ালকারীরা বিচলিত হয়ে প্রতিপক্ষকে গালমন্দ করেন। অধ্যাপক চৌধুরীও তাই করেছেন। তাছাড়া তিনি আরো বলেছেন, "উক্তিটি তথ্য হিসাবেও ঠিক নয়। হঠাৎ অগ্রসর দেশের তুলনা মাথায় আসাটাও বিচিত্র। যেন আর সব দিক থেকে আমরা শিক্ষার ব্যাপারে অগ্রসর দেশগুলির প্রায় সমকক্ষ হয়ে উঠেছি, শুধু ভাষাশিক্ষাটা ঐচ্ছিক করে দিলেই ষোলকলা পূর্ণ হয়ে যাবে।"[১৩] কিন্তু সঠিক তথ্যটা যে কি, তা তিনি উল্লেখ করেননি। তিনি কেন সেই সমস্ত অগ্রসর ও সমাজতান্ত্রিক দেশের নাম উল্লেখ করলেন না যেখানে স্নাতক স্তরে ভাষা-শিক্ষা আবশ্যিক? অথচ এ তথ্য সকলেই জানেন, বৃটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, রাশিয়া প্রভৃতি কোনো দেশেই স্নাতক-স্তরে ভাষা-শিক্ষা আবশ্যিক নয়। তাসত্ত্বেও ডঃ. সত্যজিৎ চৌধুরী কাদের স্বার্থে সত্যকে বিকৃত করার জন্য দুঃসাহসী হয়েছেন? তাছাড়া তিনি উত্তেজিত হয়ে ভাষা প্রয়োগে সংযম হারিয়ে ফেলেছেন। তুলনামূলক আলোচনার জন্য অগ্রসর দেশগুলির প্রসঙ্গ উত্থাপন করায় ভাষাশিক্ষা-নীতির সমর্থকদের 'মাথায় আসাটা বিচিত্র' বলে ডঃ. চৌধুরীর মনে হয়েছে। গান্ধীজী, রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ প্রমুখ বরেণ্য শিক্ষাবিদেরা দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থার সমালোচনা প্রসঙ্গে জাপান, রাশিয়া ও অন্যান্য ইউরোপীয় দেশগুলির শিক্ষাপদ্ধতির উদাহরণ দিয়েছেন। অধ্যাপক চৌধুরী কি তাঁদের 'মাথার' সুস্থতা সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করেন? সুতরাং আবার বলি, কোমরের নীচে আঘাত করার এই রীতি মল্লযোদ্ধাদের হতে পারে, কিন্তু তা পরিশীলিত মনের, বিদগ্ধ রুচির পরিচায়ক নয়। 'ষোলকলা পূর্ণ' হবে কিনা জানি না, তবে এটা নিশ্চিত যে, প্রস্তাবিত ভাষা-শিক্ষা নীতি কার্যকর হলে শিক্ষাজগতে কায়েমী-স্বার্থরক্ষকদের আধিপত্য অনেকাংশে কমবে এবং সেকারণেই ভাষা-শিক্ষা নীতির সমর্থকেরা অগ্রসর দেশগুলি যে-শিক্ষাপদ্ধতির মাধ্যমে উন্নত হয়েছে, আমাদের দেশ শিক্ষার দিক থেকে অনুন্নত বলেই সেই পরীক্ষিত বিদেশী শিক্ষাপদ্ধতির আদর্শ উত্থাপন করেছেন।

প্রস্তাবিত ভাষা-শিক্ষা পরিকল্পনায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সাহিত্য-অধ্যয়ন অপেক্ষা ভাষা-শিক্ষার ওপরে অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এই

নীতিও বিরোধীদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে। যাঁরা ভাষা-শিক্ষাকে আবশ্যিক করতে চান, তাঁরা বর্তমান স্থিতাবস্থা বজায় রেখে সাহিত্য পঠন-পাঠনের পক্ষপাতী। অবশ্য এবিষয়ে ভাষা-শিক্ষা নীতির বিরোধীরা একমত নন। এডুকেশন ফোরামের অধ্যাপক অশোক্ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, "ব্যাকরণ সম্মত বাক্য গঠনই শিক্ষাক্ষেত্রে ভাষা সম্পর্কে একমাত্র বিবেচ্য বিষয় নয়।"[১৪] তাহলে একজন ভাষা-শিক্ষার্থীর কাছে আর কি আশা করা হবে? এই প্রশ্নের উত্তরে ডঃ নীহাররঞ্জন রায় বলেছেন, "আমিও মনে করি, শুধুমাত্র ব্যাকরণ-নির্ভর ভাষাশিক্ষায় ছুতোরমিস্ত্রি ও ট্যুরিস্টদের প্রয়োজন হয়তো বা মিটতে পারে; কিন্তু communication বা তথ্য ও ভাব বিনিময়ের প্রয়োজন তাতে মেটানো যায় না যদি সাহিত্যের কিছু স্বাদ ও গন্ধ তাতে না মেশানো থাকে। সাহিত্য-আস্বাদন ভাষাশিক্ষার এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।"[১৫] ভাষা-নীতির বিরোধিতা করলেও একজন বামপন্থী অধ্যাপক এবিষয়ে ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। তাঁর মতে "সাহিত্যের উপর জোর না দিয়ে ভাষাশিক্ষার উপর পঠনপাঠনের ব্যবস্থা করতে হবে—কীটস, শেলী, শেক্সপীয়রকে কমিয়ে এনে কন্‌ভারসেশনাল এবং কমার্শিয়াল ইংলিশ শেখাতে হবে।"[১৬]

এ বিষয়টিও কি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বকপোলকল্পিত? বিরোধীদের অভিযোগ অনুযায়ী তাঁরা কি এদেশে সাহিত্য-চর্চা বন্ধ করে দিতে চান? অথবা সমর্থকদের বক্তব্য অনুসারে ইচ্ছুক ছাত্রছাত্রীদের সাহিত্য-চর্চায় উৎসাহদানের জন্য তাঁরা একদিকে ২০০ নম্বরের দু'টি পত্রের পরিবর্তে ৩০০ নম্বরের তিনটি পত্র প্রবর্তনের প্রস্তাব দিয়েছেন, অন্যদিকে বুদ্ধি ও মেধার বিচারে দুর্বল ছাত্রদের কেবলমাত্র ভাষা-শিক্ষার জন্য ১০০ নম্বরের আবশ্যিক-ঐচ্ছিক পত্র প্রচলনের ব্যবস্থা করেছেন। কোন্ বক্তব্যটি সঠিক? উত্তরের জন্য অতীতের দিকে দৃষ্টি ফেরাতে হবে। কারণ এ প্রশ্ন কেবলমাত্র একালে নয়, সেকালেও ছিল।

সাহিত্য-অধ্যয়ন নয়, টেক্সট্ বুক পঠন-পাঠন নয়, ভাষা-শিক্ষার জন্য কেবলমাত্র ব্যাকরণ-শিক্ষাই প্রয়োজন বলে মনে করেছেন লোকেন্দ্রনাথ পালিত। তিনি ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে লিখেছেন, "ভাষাশিক্ষা দিতে হইলে ভাষাটা ভাষাস্বরূপ শিক্ষা দেওয়াই ভাল। ...ভাষা শিখাইবার জন্য টেক্সট্ বুক কেন? আর শিখাইবার জন্য হইলেও পরীক্ষার জন্য কেন? টেক্সট্ বুকের পরীক্ষা করিলে ভাষাশিক্ষার দিকে মনোযোগ না হইয়া সেই টেক্সট্ বুকখানি মুখস্থ করিবার দিকে মনোযোগ হয়। ভাষাশিক্ষা না হইয়া খালি প্রতিশব্দ ও 'নোট'

মুখস্থ হয়। ভাষা জ্ঞান পরীক্ষা করিতে হইলে দেখা উচিত, ছাত্র সে ভাষায় কেমন লিখিতে পারে, বলিতে পারে ও বুঝিতে পারে। টেক্সট্ বুক পরীক্ষায় ইহার কিছুই হয় না।"[৭৭]

এ প্রশ্নটিকে অন্য দিক থেকে বিশ্লেষণ করেছেন রবীন্দ্রনাথ। রসপ্রধান সাহিত্য-চর্চা আমাদের মননশক্তি ও চিন্তাশক্তিকে কিভাবে দুর্বল করছে, তা উপলব্ধি করে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "আমরা যতই বি. এ., এম. এ. পাশ করিতেছি, রাশি রাশি বই লিখিতেছি, বুদ্ধিবৃত্তিটা তেমন বেশ বলিষ্ঠ এবং পরিপক্ব হইতেছে না।···আমাদের মতামত, কথাবার্তা এবং আচার অনুষ্ঠান ঠিক সাবালকের মতো নহে। সেইজন্য আমরা অত্যুক্তি আড়ম্বর এবং আস্ফালনের দ্বারা আমাদের মানসিক দৈন্য ঢাকিবার চেষ্টা করি।"[৭৮] কিন্তু সে-দৈন্যকে ঢাকা যায় না। তা থেকে উদ্ধারের জন্য প্রয়োজন বিশল্যকরণী — বিজ্ঞান-শিক্ষা। তাই কবিগুরু বলেছেন, "গল্প এবং কবিতা বাংলা ভাষাকে অবলম্বন করে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। তাতে অশিক্ষিত এবং স্বল্প শিক্ষিত মনে মননশক্তির দুর্বলতা এবং চরিত্রের শৈথিল্য ঘটবার আশঙ্কা প্রবল হয়ে উঠেছে। এর প্রতিকারের জন্যে সর্বাঙ্গীন শিক্ষা অচিরাৎ আবশ্যক। **বুদ্ধিকে মোহমুক্ত ও সতর্ক করবার জন্য প্রধান প্রয়োজন বিজ্ঞান চর্চার।**"[৭৯] [মোটা হরফ লেখকের]

কবি পুনরায় বলেছেন, "একথা মানতেই হবে, আধুনিক বঙ্গ সাহিত্য বর্তমান যুগের অন্নে-বস্ত্রে মানুষ। এই সাহিত্য আমাদের মনে লাগিয়েছে একালের ছোঁওয়া, কিন্তু খাদ্য তো ওপার থেকে পুরোপুরি বহন করে আনছে না। যে বিদ্যা বর্তমান যুগের চিত্তশক্তিকে বিচিত্র আকারে প্রকাশ করছে, উদ্‌ঘাটন করছে বিশ্ব রহস্যের নব নব প্রবেশদ্বার, বাংলা সাহিত্যের পাড়ায় তার যাওয়া-আসা নেই বললেই হয়। ···তার ঝোঁক পড়েছে সেই দিকটাতে যেদিকে চলেছে মদের পরিবেষণ, যেখানে ঝাঁঝালো গন্ধে বাতাস হয়েছে মাতাল। গল্প কবিতা নাটক নিয়ে বাংলা সাহিত্যের পনেরো আনা আয়োজন। অর্থাৎ ভোজের আয়োজন, শক্তির আয়োজন নয়। ···আমাদের সাহিত্যে রসেরই প্রাধান্য। সেই জন্যে যখন কোনো অসংযম, কোনো চিত্তবিকার অনুকরণের নালা বেয়ে এই সাহিত্যে প্রবেশ করে তখন সেটাই একান্ত হয়ে উঠে, কল্পনাকে রুগ্ন বিলাসিতার দিকে গাঁজিয়ে তোলে। প্রবল প্রাণশক্তি জাগ্রত না থাকলে দেহের ক্ষুদ্রবিকার কথায় কথায় বিষফোঁড়া হয়ে রাঙিয়ে ওঠে। আমাদের সেই আশঙ্কা। এ নিয়ে দোষ দিলে আমরা নজির

দেখাই পাশ্চাত্য সমাজের ; বলি, এটাই তো সভ্যতার আধুনিকতম পরিণতি। কিন্তু সেই সঙ্গে সকল দিকে আধুনিক সভ্যতার যে সচিন্ত সচল প্রবল বৃহৎ সমগ্রতা আছে সেটার কথা চাপা রাখি।"[৮০]

সুতরাং 'আধুনিক সভ্যতার যে সচিন্ত সচল প্রবল বৃহৎ সমগ্রতা আছে' তা লাভের জন্য প্রয়োজন একাগ্র বিজ্ঞান-সাধনা, সাহিত্য-আরাধনা নয়। ১৯৫৬ সালে সরকারি ভাষা কমিশন কেবলমাত্র ভাষা-শিক্ষার ওপরে গুরুত্ব আরোপ করে বলেছেন, জীবনের পক্ষে "যে জ্ঞানের প্রয়োজন তাহা হইতেছে প্রথমত ব্যাকরণ ও বাক্যগঠনের শিক্ষা, দ্বিতীয়ত বাঞ্ছিত দিকে শব্দসম্পদবৃদ্ধি। শেলীর কবিতা বা সেক্সপীয়ারের কাব্যানুগ অলঙ্কার-সৌন্দর্যের সাহিত্যিক অনুভূতি এক্ষেত্রে অপ্রয়োজন।"[৮১]

সর্বজনশ্রদ্ধেয় শিক্ষাবিদ শ্রী প্রবোধচন্দ্র সেন বলেছেন, "বি. এ. পরীক্ষার্থীদের অবশ্য শিক্ষণীয় বিষয়-রূপে বাংলাকে মেনে নেবার মূলে ছিল বাঙ্গালীর পক্ষে বাংলাভাষার অধিকার থাকার আবশ্যকতা স্বীকার। আজও বি. এ. পরীক্ষায় যে একপত্র বাংলা থাকে, তার মধ্যে ভাষা ব্যবহারের অধিকারের কথাই প্রধান, ওই পত্রে তিন পঞ্চমাংশই ভাষা প্রয়োগের জন্য নির্দিষ্ট। এককালে ওই পত্রের সবটাই ছিল ভাষার অধিকার, কিন্তু কালক্রমে দুই-পঞ্চমাংশ ছেড়ে দিতে হয়েছে সাহিত্যের দাবি মেটাতে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, সাহিত্যের অধিকৃত ওই দুই-পঞ্চমাংশই এখন সবটার ওপরে আপন শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করে নিয়েছে। স্বল্প পরিসর সাহিত্যের মহিমাই এখন ভাষার বৃহৎ পরিসরকেও অবজ্ঞেয় করে তুলেছে। সারা বৎসর ধরে কলেজগুলিতে শুধু ওই সাহিত্য অংশেরই পঠন পাঠন হয় ; আর ভাষা অংশটুকুর সঙ্গে ছাত্রদের সম্পর্ক ঘটে শুধু পরীক্ষাগৃহে। ভাষা যাদের অচর্চিত তাদের হাতে সাহিত্য-বিচারের কি পরিণতি ঘটে, সে সংবাদ রাখেন শুধু পরীক্ষকরা। যাহোক, একপত্র মাত্র বাংলার এই যে দুই-পঞ্চমাংশ সাহিত্য, তার গৌরব কত। ওইটুকু পরিসরের মধ্যে মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র সকলেরই সমাবেশ ঘটে। প্রমীলার শৌর্য্য, কপালকুণ্ডলার অভিনবত্ব, রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতা, শরৎচন্দ্রের সমাজদৃষ্টি এই সমস্তেরই বিচার বিশ্লেষণ করতে হয় ওইটুকু পরিসরের মধ্যেই। এসব থাকা চাই, কেননা সাহিত্যজ্ঞান না হলে যে শিক্ষা মর্যাদারই অধিকার হয় না। আই. এ.-র অবস্থাও তাই। তিনপত্র ব্যাপী সাহিত্যপ্রধান ইংরেজী অবশ্য শিক্ষণীয় এবং একপত্রের দুই-পঞ্চমাংশের অধিকারী বাংলা সাহিত্যের অতি প্রাধান্য। ম্যাট্রিকুলেশনও কৌলীন্যের লোভে ওই পথেই পরীক্ষাতীর্থের

দিকে যাত্রা করেছে। এখানে ইংরেজীতে আড়াই পত্র এবং বাংলা দুই পত্রে সাহিত্যের আধিপত্য। এক্ষেত্রে বাংলা সাহিত্যের আধিপত্য আই. এ., বি. এ.-কেও ছাড়িয়ে গেছে। আর বাংলা পরীক্ষায় অকৃতকার্যদের যতই সংখ্যাবৃদ্ধি হচ্ছে, ততই বাংলার মহিমা উচ্চতর কণ্ঠে ঘোষিত হচ্ছে। …এইভাবে আমাদের সমস্ত ছাত্রসমাজকে অর্থাৎ সমস্ত জাতিটাকেই সাহিত্যের লোহার ছাঁচে ফেলে একাকৃতি করে গড়ে তোলবার চেষ্টা চলেছে প্রায় একশো বছর ধরে। তাই আমাদের জাতীয় চরিত্রের অন্যান্য অঙ্গ একেবারেই অপরিণত রয়েছে। তার উপরেও দুঃখের কথা এই অপুষ্টি বিষয়ে আমাদের চেতনা পর্যন্ত লুপ্ত হয়ে গেছে।"[৮২]

সুতরাং শ্রী প্রবোধচন্দ্র সেনের মতে "**বর্তমানে স্বাধীন ভারতে শিক্ষা সংস্কারের অন্যতম প্রধান কর্তব্য হবে আমাদের বিদ্যালয়গুলিতে সাহিত্যিক রসচর্চার অতি প্রাধান্য হ্রাস করে মনন সাপেক্ষ বিষয়গুলিকে আনুপাতিক গুরুত্ব দান করা।** জীবন সংগ্রামের উপযোগী শিক্ষাপ্রার্থী প্রত্যেক ছাত্রকে সেক্সপীয়রের নাটক প্রভৃতি রসপ্রধান সাহিত্য আয়ত্ত করতে বাধ্য করা যে কতবড় অত্যাচার এবং তাতে জাতীয় শক্তির যে কতখানি অপচয় ঘটে, দীর্ঘকালীন অন্ধ অভ্যাসের ফলে তা অনুমান করবার শক্তি পর্য্যন্ত আমরা হারিয়েছি। এই শিক্ষা-ব্যবস্থার ফলে, যাদের সহজাত সাহিত্য প্রবণতা নেই, তাদের জীবন যে কিভাবে নিষ্ফল হতে বাধ্য হয় তার হিসাব রাখে কে?"[৮৩] সুতরাং তাঁর প্রস্তাব হ'ল, "**আমাদের বিদ্যালয়গুলিতে ইংরেজি বা বাংলা সাহিত্যকে অবশ্য স্বীকার্য বিষয় বলে গণ্য না করে ঐচ্ছিক বিষয়ের পর্যায়ভুক্ত করা চাই।**"[৮৪] [মোটা হরফ লেখকের]

স্নাতক-স্তরে ভাষা-শিক্ষা নীতির বিষয়ে শ্রদ্ধেয় শ্রী সেনের অবস্থান বামফন্ট-বিরোধীদের থেকে স্বতন্ত্র। প্রবীণ শিক্ষাবিদ হিসাবে তিনি প্রাথমিক-স্তরে বামফ্রন্টের ভাষানীতিকে সমর্থন করলেও স্নাতক-স্তরে ভাষা-শিক্ষাকে আবশ্যিক-ঐচ্ছিক করার বিরোধী। ডিগ্রি-স্তরে ইংরেজির গুরুত্ব হ্রাসের পক্ষপাতী হলেও বাংলায় অধিকতর গুরুত্ব প্রদানের জন্য তিনি কেবলমাত্র বাংলাকে আবশ্যিক করার কথা বলেছেন এবং সেই বাংলা-শিক্ষায় 'সাহিত্যিক রসচর্চার' পরিবর্তে ভাষাশিক্ষার ওপরে বিশেষ জোর দিয়েছেন (এবিষয়ে তাঁর সাম্প্রতিকতম বক্তব্য ৪০৭-০৮ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হয়েছে)।

কবিগুরু যখন বেঁচে ছিলেন, তখন শিক্ষাক্ষেত্রে ইংরেজি বনাম মাতৃভাষার

দ্বন্দ্বই ছিল প্রধান; ইংরেজিভাষার শৃঙ্খল থেকে মাতৃভাষাকে মুক্ত করা ও মাতৃভাষায় শিক্ষাদান এবং বিজ্ঞান-চর্চাই ছিল একমাত্র প্রশ্ন। সুতরাং রবীন্দ্রনাথ দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে মাতৃভাষায় শিক্ষাদান ও রসপ্রধান সাহিত্য-অধ্যয়নের পরিবর্তে বিজ্ঞান-শিক্ষার ওপরে অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি বলেছেন, "আমার মনে যে সজীব সমগ্রতার পরিকল্পনা ছিল, তার মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তিকে রাখতে চেয়েছিলুম সম্মানিত করে। তাই বিজ্ঞানকে আমার কর্মক্ষেত্রে যথাসাধ্য সমাদরের স্থান দিতে চেয়েছি।"[৮৫] কারণ 'আধুনিক কালে জীবনযাত্রা সকল দিকেই জটিল। নূতন নূতন নানা সমস্যার আলোড়নে মানুষের মন সর্বদাই উৎক্ষুব্ধ। নিয়ত তার নানা প্রশ্নের নানা উত্তর, তার নানা বেদনার নানা প্রকাশ সমাজে তরঙ্গিত।'[৮৬] তাসত্ত্বেও একথা বলা যায়, কবিগুরুর জীবৎকালে বিজ্ঞানের এত উন্নতি ঘটেনি এবং নানা শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে বিজ্ঞান-শিক্ষা এত দুরূহ হয়ে ওঠেনি এবং জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রও এত জটিলতর হয়নি। সুতরাং তাঁর সময়ে এ প্রশ্ন ছিল না যে, যাদের 'সহজাত সাহিত্য প্রবণতা নেই', তাদের ক্ষেত্রে ভাষাশিক্ষা (ইংরেজি, বাংলা বা অন্য যে কোনো ভাষা) আবশ্যিক করার প্রয়োজন আছে কিনা এবং ভাষাশিক্ষা আবশ্যিক হলে তাদের জীবন 'নিষ্ফল হতে বাধ্য' হবে কিনা।

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন গতিতত্ত্বে বিশ্বাসী। উদার-মুক্ত দৃষ্টিতে তিনি চলমান পৃথিবীকে পর্যবেক্ষণ করেছেন; দেশ ও দশের মঙ্গলের জন্য যা প্রয়োজন তা আহরণ করে তিনি দেশবাসীর সামনে উপস্থিত করেছেন। তাঁর চিন্তাজগতে যখন নূতন ও পুরাতনের সংঘর্ষ ঘটেছে, তখন তিনি পুরোনো চিন্তাকে আঁকড়ে থাকেননি; নতুনকে স্বাগত জানিয়েছেন। যেমন রাশিয়া ভ্রমণের পরে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সম্পর্কে তাঁর পূর্বতন দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটেছে। সুতরাং কবির গতিশীল চিন্তাধারা অনুসরণ করলে এই সিদ্ধান্তে পৌছুনোটাই যুক্তিসঙ্গত হবে যে, কবি যদি আজ আমাদের মধ্যে বেঁচে থাকতেন, তাহলে আজকের জীবনের পটভূমিতে কবি স্নাতক-স্তরে শিক্ষা কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে গঠিত বামফ্রন্টের ভাষা-নীতিকে আশীর্বাদ করতেন।

কিন্তু যাঁরা ভাষা-শিক্ষার চেয়ে সাহিত্য-অধ্যয়নের ওপরে গুরুত্ব আরোপের পক্ষপাতী, তাঁরা সাধারণ ছাত্রদের গ্রহণের ক্ষমতা ভাবেননি কিংবা বাস্তব সত্যকে অনুধাবনের চেষ্টা করেননি। বর্তমান ব্যবস্থায় স্নাতক স্তরের বাণিজ্য-বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের সাহিত্য পাঠ করতে হয় না। তাহলে কি তাঁরা সুদীর্ঘকাল ধরে বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজা অতিক্রম করে বৃহত্তর জগতে 'তথ্য ও

ভাব বিনিময়ে'র ক্ষেত্রে অক্ষমতার পরিচয় দিচ্ছেন? বিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রীদের পাঠক্রমে ভাষাশিক্ষা নেই। তাহলে কি তাঁরা ভাষা ও সাহিত্যজ্ঞানের অভাবে বিজ্ঞানের জগতে অযোগ্যতার পরিচয় দিচ্ছেন? তাঁদের জীবনাচরণে কি সূক্ষ্ম ও কোমল মানবিক অনুভূতির প্রকাশ ঘটছে না? কলা বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা ভাষা ও সাহিত্য পাঠ করে কি সরকারি ও বেসরকারি সওদাগরি অফিসের ফাইল-পত্রে সাহিত্য-রচনা করছেন? ব্যাঙ্কের কর্মীরা কি হিসাবের খাতায় রামপ্রসাদের মতো 'দে মা আমায় তবিলদারি' গান রচনা করছেন, শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' কিংবা রবীন্দ্রনাথ-নজরুলের কবিতা-পাঠের দ্বারা উদ্বোধিত হয়ে শোষণমূলক সমাজব্যবস্থা ভেঙে ফেলার জন্য সকলে কি 'সব্যসাচী' হয়েছেন? উত্তরে বলা যায়, সাহিত্য-পাঠ না করেও কমার্সের ছাত্রছাত্রীদের সুকুমার বৃত্তির অভাব ঘটেনি; বিজ্ঞানের শিক্ষার্থীরা মানবিক বোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে বিজ্ঞান-সাধনায় ব্রতী হয়েছেন; কলা বিভাগের বিদ্যার্থীরা ভাষা ও সাহিত্য চর্চা করলেও 'সব্যসাচী' কিংবা 'রামপ্রসাদ' হননি, অফিসের ফাইলের চাপে তাঁদের সাহিত্য-প্রীতি শুকিয়ে গেছে।

তাছাড়া স্নাতক-স্তরের কেবলমাত্র একটি অংশের ওপরে জোর করে সাহিত্য-পাঠ চাপিয়ে দিয়ে তাঁদের মধ্যে সাহিত্য-অধ্যয়নের আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি করা যায়নি; কারণ সাহিত্যরস উপলব্ধি কোনো যান্ত্রিক পদ্ধতিতে সম্ভব নয়, সৃষ্টিক্ষমতা না থাকলে সাহিত্য-রচনার প্রয়াস ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। বি. এ. ডিগ্রির সার্টিফিকেট নিয়ে তাঁরা যখন কর্মজীবনে প্রবেশ করেন, তখন শকুন্তলা, মিরান্দা, দেসদিমনা তাঁদেরকে প্রমোশনের সন্ধান দেয় না, কিংবা চাকরি লাভে দক্ষ করে তোলে না। সেজন্য কলা বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীরা পঙ্গুর পর্বত লঙ্ঘনের চেষ্টার মতো কোনো রকমে সাহিত্য মুখস্থ করে পরীক্ষা-বৈতরণী অতিক্রমের চেষ্টা করেন। কিন্তু অধিকাংশেরই হাঁটু ভেঙে যায়। ক-২ সারণীতে অঙ্কিত চিত্রে (পৃঃ ৩০৬) তার পরিচয় পাওয়া যায়। সুতরাং কলা বিভাগের বর্তমান পাঠক্রম তৈরি করে একদল অশক্ত-অক্ষম মানুষ, যাঁরা ব্যক্তিগত জীবনে কোনোদিনই সার্থকতার সন্ধান পান না কিংবা বৃহত্তর জীবনে মানবিকতাবোধে অনুপ্রাণিত হন না; তাঁদের পঙ্গুত্ব সমাজ-জীবনের গতিশীলতাকে প্রতিহত করে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একশ' বছরের (১৮৫৭-১৯৫৭ খৃঃ.) বিভিন্ন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ-অনুত্তীর্ণের চিত্র (পরিশিষ্ট : ২ দ্রষ্টব্য) যদি দেখা যায়, তাহলে যুবশক্তির অপচয়ের ভয়ঙ্করত্ব উপলব্ধি করা যাবে।

এই অবস্থায় বামফ্রন্ট-বিরোধী বুদ্ধিজীবীরা কি দেশ ও দশের মঙ্গলের কথা ভাববেন না? কেবলমাত্র রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির অভিপ্রায়ে তাঁরা কি গ্রাম-বাংলার কোটি কোটি মানুষ নামধারী প্রাণীকে মানুষের পর্যায়ে তুলে আনার মহৎ কর্তব্য বিস্মৃত হবেন? তাঁরা কি রিক্ত-নিঃস্ব ভূমিহারাদের জমির অধিকার ফিরিয়ে দিয়ে শিক্ষা-লাভের সুযোগ করে দেবেন না? তাঁরা কি মানুষের মুখের ভাষায় শিক্ষিত হওয়ার অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে সমর্থন করবেন না? ইতিহাসের অনিবার্য সম্মুখ গতির কথা ভুলে গিয়ে তাঁরা কি শ্রেণীস্বার্থে মুষ্টিমেয়ের পক্ষাবলম্বন করে সমগ্র দেশকে নিরক্ষরতার অন্ধকারে নিমজ্জিত রাখবেন? উচ্চশিক্ষার দরজা তাঁদের জন্য কি উন্মুক্ত হবে না? বিজ্ঞানের আলোয় কি সমগ্র দেশ উজ্জ্বল হয়ে উঠবে না? অন্ধ কমিউনিস্ট বিদ্বেষে চালিত হয়ে তাঁরা যদি মানুষের শিক্ষালাভের আকাঙ্ক্ষাকে ব্যর্থ করতে প্রয়াসী হন, তাহলে সত্যদ্রষ্টা কবিগুরুর উক্তি স্মরণে রাখতে অনুরোধ জানাই:

"এক ধারেই সব-কিছু আছে, আর-এক ধারে কোনো কিছুই নেই, এই ভারসামঞ্জস্যের ব্যাঘাতেই সভ্যতার নৌকো কাত হয়ে পড়ে। একান্ত অসাম্যেই আনে প্রলয়। ভূগর্ভ থেকে সেই প্রলয়ের গর্জন সর্বত্র শোনা যাচ্ছে। এই আসন্ন বিপ্লবের আশঙ্কার মধ্যে আজ বিশেষ করে মনে রাখবার দিন এসেছে যে, যারা বিশিষ্ট সাধারণ বলে গর্ব করে তারা সর্বসাধারণকে যে পরিমাণেই বঞ্চিত করে তার চেয়ে অধিক পরিমাণে নিজেকেই বঞ্চিত করে —কেননা, শুধু কেবল ঋণই যে পুঞ্জীভূত হচ্ছে তা নয়, শাস্তিও উঠছে জমে। পরীক্ষায় পাস-করা পুঁথিগত বিদ্যার অভিমানে যেন নিশ্চিন্ত না থাকি। দেশের জনসাধারণের মন যেখানে অজ্ঞানে অন্ধকার সেখানে কণা কণা জোনাকির আলো গর্তে প'ড়ে মরবার বিপদ থেকে আমাদের বাঁচাতে পারবে না। আজ পল্লী আমাদের আধমরা; যদি এমন কল্পনা করে আশ্বাস পাই যে, অন্তত আমরা আছি পুরো বেঁচে, তবে ভুল হবে, কেননা মুমূর্ষুর সঙ্গে সজীবের সহযোগ মৃত্যুর দিকেই টানে।"[৮৭]

সুতরাং মরু-বিস্তারকে প্রতিরোধ করতে হলে শিক্ষার-বারিধারায় সমগ্র দেশকে সিক্ত করা প্রয়োজন; শিক্ষা-প্রসারের দ্বারা চিরলাঞ্ছিত জীবন্মৃত মানুষগুলির মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠা আবশ্যক। 'যে শিক্ষায় আমাদের প্রয়োজন তা শুধু শহরবাসীদের জন্য নয়, সমস্ত দেশের মধ্যে তার ধারাকে প্রবাহিত করতে হবে। সেটা যদি শুধু শহরের লোকদের জন্য নির্দিষ্ট থাকে তবে তা কখনো সার্থক হতে পারে না। মনে রাখতে হবে শ্রেষ্ঠত্বের উৎকর্ষে

সকল মানুষেরই জন্মগত অধিকার। গ্রামে গ্রামে আজ মানুষকে এই অধিকার ফিরিয়ে দিতে হবে। আজ আমাদের সকলের চেয়ে বড়ো দরকার শিক্ষার সাম্য। ...এ ছাড়া কোনো পথও নেই। নতুন যুগের দাবি মেটাতেই হবে।'[৮৮]

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কায়েমী স্বার্থান্বেষীদের সকল রকমের বাধাদানকে অস্বীকার করে সেই 'নতুন যুগের দাবি মেটাতেই' সচেষ্ট হয়েছেন। তাঁদের শিক্ষা ও ভাষানীতির একমাত্র লক্ষ্য অমৃতের পুত্ররা অমৃত-লাভের অধিকারী হোক। তাঁরা চান, জ্ঞান-সূর্যের রক্তরাঙা আলোয় সমগ্র দেশ আলোকিত হোক ; নতুন যুগের নতুন মানুষ গড়ে উঠুক —ন্যায়, নীতি, সততা ও মনুষ্যত্বের পতাকা ঊর্দ্ধে তুলে ধরুক তারা।

পরিশিষ্ট : ১

একটি সমীক্ষা

[গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে যে, স্বাধীনতোত্তর যুগে অর্থ নৈতিক সংকট ক্রমশ ঘনীভূত হওয়ায় মধ্যবিত্তশ্রেণীর শিক্ষার্থীরা লেখাপড়ার জন্য বেশী সময় ব্যয় করতে সক্ষম হন না এবং পাঠ্য-সময়ের অধিকাংশটাই তাঁরা ইংরেজি-পাঠে ব্যয় করেন ; তাছাড়া তাঁদের মধ্যে অনেকেরই পৃথক কোনো পাঠকক্ষ নেই। এই বক্তব্যের সমর্থনে নিম্নলিখিত সমীক্ষাটির প্রতি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। শিলংয়ের পি. জি. টি. সি -র এডুকেশন্যাল রিসার্চ ব্যুরো ১৯৭০ সন থেকে ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত সুদীর্ঘকাল ধরে শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে ব্যাপকভাবে সমীক্ষা করেন। এই সমীক্ষায় উদ্ভাসিত চিত্র কেবলমাত্র শিলং কিংবা আসামের নয়, এই চিত্র সমগ্র ভারতের। তাই পাঠকদের অবগতির জন্য উক্ত সমীক্ষার প্রাসঙ্গিক অংশ নিম্নে উদ্ধৃত হ'ল। —লেখক]

"শিক্ষা সমীক্ষায় দেখা যায় যে, শতকরা ৫৫ জন ছাত্র গৃহে অধ্যয়নের জন্য দৈনিক গড়ে ১ ঘন্টারও কম সময় ব্যয় করেন। শতকরা ২৫ জন দৈনিক গড়ে ১ ঘন্টা, শতকরা ১০ জন দু'ঘন্টা, শতকরা ৬ জন তিন ঘন্টা এবং শতকরা ৪ জন চার ঘন্টা বাড়িতে লেখাপড়ার জন্য ব্যয় করেন।

"এই সমীক্ষা অনুযায়ী গৃহে বিষয়ভিত্তিক অধ্যয়নের সময় বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ইংরেজী —উক্ত সময়ের শতকরা ৬০ ভাগ, অঙ্ক — শতকরা ২০, প্রথম ভাষা / মাতৃভাষা —শতকরা ৫ এবং অন্যান্য বিষয়ে শতকরা ১৫ ভাগ সময় ব্যয় করেন। অর্থাৎ ইংরেজির জন্য অধিকাংশ সময় ব্যয় করা হয় এবং তার পরে অঙ্ক। কিন্তু মাতৃভাষা-শিক্ষার প্রতি অবহেলার মনোভাব নিদারুণ। অন্যান্য বিষয়-শিক্ষার সম্পর্কে বলা যায়, ছাত্ররা পরীক্ষার পূর্বে সেই বিষয়গুলির অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন হন।

"বাড়িতে লেখাপড়ার জায়গা সম্পর্কে উক্ত সমীক্ষায় দেখা যায়, পড়াশুনার জন্য প্রতি ছাত্র পিছু একটি পৃথক ঘর — এই হারে ব্যবহার করেন শতকরা ১০ জন ; প্রতি দু জন ছাত্র পিছু একটি ঘরে একই সঙ্গে লেখাপড়া করেন শতকরা ১৫ জন ; প্রতি তিন জন ছাত্রের জন্য একটি ঘরে একই সময়ে পড়েন শতকরা ৩৫ জন এবং একটি ঘরে চারজন কিংবা ততোধিক ছাত্র একই সময়ে লেখাপড়া করেন —এঁদের সংখ্যা শতকরা ৪০ জন।" [Dr. N. Dasgupta : Four Research studies in a Nutshell. Samsad Parichiti. May & June, 1982 (No. 5 & 6), p. 157]

গ্রন্থ-নির্দেশ

প্রথম অধ্যায়

১. লুইস হেনরি মর্গান : আদিম সমাজ। পৃঃ ৩৪-৩৫
২. রাহুল সাংকৃত্যায়ন : মানব সমাজ (১ম ও ২য় খণ্ড)। পৃঃ ৪
৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : বাংলা ভাষা-পরিচয়। রবীন্দ্র রচনাবলী, ষড়বিংশ খণ্ড। পৃঃ ৩৭৪
৪. পূর্ববর্তী ২ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ৪৪
৫. পূর্ববর্তী ১ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ৯
৬. পূর্ববর্তী ২ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ৬৬
৭. জে. ভি. স্তালিন : ভাষাবিজ্ঞানে মার্কসবাদ প্রসঙ্গে। পৃঃ ৬৭
৮, ৯. পূর্ববর্তী ২ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ৯০-৯১, ৯১
১০. বিমানচন্দ্র ভট্টাচার্য : সংস্কৃত সাহিত্যের রূপরেখা। পৃঃ ১৮০
১১. পূর্ববর্তী ৭ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ৭২
১২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : ব্রাহ্মণ। কথা ; রবীন্দ্র রচনাবলী (১ম)। পঃ বঃ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯৬১। পৃঃ ৬১৮
১৩, ১৪. পূর্ববর্তী ২ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ৯১, ৯২
১৫. পূর্ববর্তী ১০ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ১৭৯
১৬. B. S. Goel & S. K. Saini : Mother Tongue and Equality of Opportunity in Education. p. 9
১৭. বলেন্দ্র গ্রন্থাবলী : ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত। পৃঃ ৪৯১-৯২
১৮. পূর্ববর্তী ১০ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ১৮০
১৯. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত। পৃঃ ৫
২০, ২১. রমেশচন্দ্র মজুমদার : বাংলা দেশের ইতিহাস (প্রাচীন যুগ)। পৃঃ ১৫, ১৫২
২২. পূর্ববর্তী ১৯ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ৬
২৩. S. N. Mukherjee : History of Education in India. p. 3
২৪. মার্কস-এঙ্গেলস : উপনিবেশিকতা প্রসঙ্গে। পৃঃ ৩৮-৩৯
২৫-২৭. পবিত্র সরকার : বাংলা ভাষা, পূর্ব-পাকিস্তান, বাংলাদেশ। 'প্রমা' পত্রিকা। প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা (অক্টোবর, ১৯৭৮)। পৃ: ৬৬, ৬৭, ৬৮-৬৯
২৮. পূর্ববর্তী ২৪ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ৮৬
২৯. পূর্ববর্তী ১৯ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ২৯-৩০
৩০. পূর্ববর্তী ২০ দ্রষ্টব্য। মধ্যযুগ। পৃঃ ২৪৭
৩১. পূর্ববর্তী ১৭ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ৪৯২
৩২. পূর্ববর্তী ৩০ দ্রষ্টব্য। পৃ: ২৯৮
৩৩. পূর্ববর্তী ২৫ দ্রষ্টব্য। প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা (জানুয়ারি, ১৯৭৯)। পৃঃ ১৫৭
৩৪. পূর্ববর্তী ৩০ দ্রষ্টব্য। পৃ: ২৩৮
৩৫, ৩৬. পূর্ববর্তী ২৪ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ৮৫-৮৬, ৮৬

দ্বিতীয় অধ্যায়

১. মার্কস-এঙ্গেলস : উপনিবেশিকতা প্রসঙ্গে। পৃঃ ৮৬
২, ৩. জে. ভি. স্তালিন : ভাষাবিজ্ঞানে মার্কসবাদ প্রসঙ্গে। পৃঃ ৬৬, ৬৬
৪. Sukumar Bhattacharya : The East India Company and The Economy of Bengal from 1704-1740. p. 17
৫. রমেশচন্দ্র মজুমদার : বাংলাদেশের ইতিহাস (৩য়)। পৃঃ ৩৯১
৬. রজনীপাম দত্ত : আজিকার ভারত (২য়)। পৃঃ ৩৯
৭. পূর্ববর্তী ১ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ৮২
৮. সুপ্রকাশ রায় : ভারতের কৃষক-বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম (১ম)। পৃঃ ১৭৪
৯. Mohit Moitra : A History of Indian Journalism. p. 7
১০ শিবনাথ শাস্ত্রী : রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ। পৃঃ ৭২
১১. রাজনারায়ন বসু : সেকাল আর একাল। পৃঃ ২৬-২৭
১২. বিনয় ঘোষ : বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা। পৃঃ ৬৮
১৩. পূর্ববর্তী ১১ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ২৪
১৪-১৬. পূর্ববর্তী ১০ দ্রষ্টব্য। পৃ: ৭৪, ৭০, ৭৫-৭৬
১৭. B. S. Goel & S. K. Saini : Mother Tongue and Equality of Opportunity in Education. p. 10
১৮. Census Report, 1951. Vol. VI, Part IA. p. 437
১৯. পূর্ববর্তী ৫ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ১২২

২০. স্বপর্ণা ঘোষ, অশোকলাল ঘোষ : হিন্দু কলেজের ইতিহাস। দেশ : ১৩ সংখ্যা, ৪১ বর্ষ; ২৬ জানুয়ারি, ১৯৭৪। পৃঃ ১০৯৬
২১. The Days of John Company : Edited by A. Dasgupta. p. 68
২২. B. B. Majumdar : History of Indian Social and Political Ideas. p. 71
২৩. পূর্ববর্তী ১০ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ৮১
২৪. রামেন্দ্র-রচনাসংগ্রহ : সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও অনিলকুমার কাঞ্জিলাল সম্পাদিত। পৃঃ ৪৯৮
২৫. পূর্ববর্তী ১০ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ৮২
২৬. ভবানীচরণ বন্দোপাধ্যায় : কলিকাতা কমলালয়। পৃঃ ১২
২৭. The English Works of Raja Rammohan Ray : Sadharan Brahmo Samaj. Part IV, p. 3
২৮. The Report of the University Education Commission (Dec., 1948—August, 1949). Vol. I. p. 11
২৯. G. C. P. I : Minutes & Progs. Vol. III. 1823-38. No. 30 dt. 7.4.1824
৩০. Tarachand : History of the Freedom Movement in India. Vol. II. p. 191
৩১. N. L. Basak : History of Vernacular Education in Bengal (1800-1854). p. 252
৩২. পূর্ববর্তী ৩০ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ১৯২
৩৩. পূর্ববর্তী ৩১ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ২৫৩
৩৪. যোগেশচন্দ্র বাগল : বাংলার উচ্চশিক্ষা। পৃঃ ২২
৩৫. S. Nurullah & J. P. Naik : A Students' History of Education in India (1800-1965). p. 61
৩৬. N. K. Sinha : Beginning of Western Education (Hundred Years of the University of Calcutta). p. 17-18
৩৭. পূর্ববর্তী ৩৫ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ৮৬
৩৮. পূর্ববর্তী ১২ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ১৯৮
৩৯. অনুষ্টুপ। সপ্তম বর্ষ; চতুর্থ সংখ্যা, ১৩৮০। পৃঃ ৭৫
৪০. বিনয় ঘোষ : সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র (১ম)। পৃঃ ২২৯
৪১-৪৩. পূর্ববর্তী ২৭ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ৩, ৪, ৮
৪৪-৪৫. কিশোরীচাঁদ মিত্র : দ্বারকানাথ ঠাকুর (দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ কর্তৃক অনূদিত)। পৃঃ ১২১, ১২১
৪৬. পূর্ববর্তী ৫ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ৪৯৯
৪৭-৪৯. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : সংবাদপত্রে সেকালের কথা (২য়)। পৃঃ ১৩১-৩২, ১৩৩-৩৪, ১৪১
৫০, ৫১. পূর্ববর্তী ৩৫ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ৮৬, ৬৩ ৬৪

তৃতীয় অধ্যায়

১. K. M. Panikkar : A Survey of Indian History. pp. 205-06
২. N. L. Basak : History of Vernacular Education in Bengal (1800-1854). p. 19
৩-৬. W. Adam : Reports on Vernacular Education in Bengal (1835-38). Ed. by A. N. Basu. p. 6, 231, 228, 251
৭. J. C. Marshman : History of Serampore Mission. Vol. I. p. 63
৮, ৯. সুনীলকুমার চ্যাটার্জী : বাংলার নবজাগরণে উইলিয়ম কেরী ও তাঁর পরিজন। পৃঃ ১৪-১৫, ১১৩
১০. সজনীকান্ত দাস : বাংলা গদ্যসাহিত্যের ইতিহাস। পৃঃ ২২২
১১, ১২. পূর্ববর্তী ৮ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ১১৩-১৪, ১৭
১৩. সুকুমার সেন : বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য। পৃঃ ৪৭
১৪. পূর্ববর্তী ২ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ১২৬
১৫. পূর্ববর্তী ৩ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ১২
১৬, ১৭. Calcutta School Book Society, Second Report, 1819, Sec. 2. Rule 3
১৮. অমলেন্দু দে : বাঙ্গালী বুদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদ। পৃঃ ৩০
১৯-২১. পূর্ববর্তী ২ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ১৬৩, ১৬৪, ১৬৬-১৬৭, ১৬৯
২২. পূর্ববর্তী ১৬ দ্রষ্টব্য। একাদশ প্রতিবেদন, ১৮৩৬
২৩. পূর্ববর্তী ২ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ১৭০
২৪. পূর্ববর্তী ৩ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ১৬

চতুর্থ অধ্যায়

১. শিবনাথ শাস্ত্রী : রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ। পৃঃ ১৪২
২. যোগেশচন্দ্র বাগল : বাংলার উচ্চশিক্ষা। পৃঃ ২৭
৩. পার্থ চট্টোপাধ্যায় : বাংলা সংবাদপত্র ও বাঙ্গালীর নবজাগরণ। পৃঃ ১৭৫
৪. বিনয় ঘোষ : সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র (১ম)। পৃঃ ৩৩১
৫. পূর্ববর্তী ১ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ৩০
৬. Dr. N. K. Sinha : Beginning of Western Education (Hundred Years of the University of Calcutta. Vol. I. pp. 29-30).
৭. N. L. Basak : History of Vernacular Education in Bengal (1800-1854). p. 272
৮. H. Sharp & J. A. Richey : Selections from Educational Records. Part I (1781-1839). p. 152
৯. পূর্ববর্তী ২ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ৩২
১০. পূর্ববর্তী ৮ দ্রষ্টব্য। ২য় খণ্ড (১৮৪০-১৮৫৯) পৃঃ ৭১
১১. পূর্ববর্তী ৬ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ৩২
১২, ১৩. অনুষ্টুপ। ৪র্থ সংখ্যা, ৭ম বর্ষ, ১৩৮০। পৃঃ ৯৪, ৯৪
১৪. S. Nurullah & J. P. Naik : A Students' History of Education in India (1800-1965). p. 57
১৫. B. D. Basu : History of Education in India under the East India Company. p. 86
১৬. William Adam : Reports on the State of Education in Bengal (1835 & 1838). Ed. by A. N. Basu. p. 492
১৭-২০. পূর্ববর্তী ৭ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ২৯৭-৯৮, ২৫৩, ২৭০, ২৫৭
২১, ২২. C. E. Trevelyan : On the Education of the people of India. p. 120, 121
২৩. পূর্ববর্তী ৭ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ২৭১
২৪. পূর্ববর্তী ১৪ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ৬৮
২৫-২৭. পূর্ববর্তী ১২ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ৭৯, ৭৯, ৮০
২৮-৩০. পূর্ববর্তী ১৬ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ৩৫৭, ৩৫৭, ৩৫৮
৩১. পূর্ববর্তী ৭ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ২৮৬
৩২, ৩৩. পূর্ববর্তী ১২ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ৭৮, ৭৯
৩৪, ৩৫. পূর্ববর্তী ১৬ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ৫২৭, ৫২৭
৩৬. Nirmal Sinha : Language Mass Education. পর্যদ বার্তা। পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। জুন-জুলাই, ১৯৮১। পৃঃ ২৪৭
৩৭. পূর্ববর্তী ৪ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ৩২২
৩৮. রাজনারায়ন বসু : সে কাল আর এ কাল। পৃঃ ৫৩-৫৫
৩৯. পূর্ববর্তী ৪ দ্রষ্টব্য। ৩য়। পৃঃ ৪৩৮
৪০. The Report of the Education Commission (1964-1966). Vol. I. p. 9
৪১. ইন্দ্র মিত্র : করুণাসাগর বিদ্যাসাগর। পৃঃ ৭৬৩
৪২. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : পত্রসূচনা। বঙ্গদর্শন (১ম)। ১লা বৈশাখ, ১২৭৯। ১ম সংখ্যা। পৃঃ ৩
৪৩. পূর্ববর্তী ৩৬ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ২৪১
৪৪-৪৭. পূর্ববর্তী ১৪ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ৭০, ৭০, ৭১, ৭২
৪৮. S. N. Mukherjee : History of Education in India. p. 104
৪৯. পূর্ববর্তী ৬ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ৩২
৫০. পূর্ববর্তী ৩৬ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ২৪৮
৫১. Pratulchandra Gupta : Foundation of the University (Hundred Years of the University of Calcutta. Vol. I. p. 43).
৫২-৫৯. পূর্ববর্তী ৪ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ২৩০, ২২৮, ২২৩, ২২৩, ২২৬, ২২৬, ২২৮, ২৩১
৬০. পূর্ববর্তী ৩৯ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ৩৯০
৬১, ৬২. পূর্ববর্তী ১২ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ৮৫, ৯০
৬৩. পূর্ববর্তী ৩৬ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ২৪১
৬৪-৬৭. পূর্ববর্তী ৪ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ৩০২, ৩০১, ২৯৫, ২৯৭-৯৮
৬৮, ৬৯. পূর্ববর্তী ৬০ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ৪৩০, ৪৩৪
৭০, ৭১. পূর্ববর্তী ৩৬ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ২৪৭, ২৪৭
৭২. B. S. Goel & S. K. Saini : Mother Tongue and Equality of Opportunity in Education. p. 17
৭৩, ৭৪. পূর্ববর্তী ১০ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ৩৬৭, ৩৬৭
৭৫. Pandit Gopesh Kumar Ojha : Compulsory Education in India. p. 21

৭৬. বিনয় ঘোষ: বাংলার বিদ্বৎসমাজ। পৃঃ ১৩৪
৭৭. Gunnar Myrdal: Asian Drama. Vol. III. p. 1641
৭৮-৮০. রামেন্দ্র-রচনা-সংগ্রহ। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও অনিলকুমার কাঞ্জিলাল কর্তৃক সম্পাদিত। পৃঃ ৪৯৭, ৪৯৬, ৪৯৭
৮১. Niharranjan Roy: The Formative Years: 1857-1882 (Hundred Years of the C. U. Vol. I. p. 71).
৮২. সৈয়দ শাহেদুল্লাহ: জনশিক্ষার প্রতিবন্ধক। নন্দন: শারদীয় সংখ্যা, ১৩৭৪। পৃঃ ৫৬৮
৮৩. পূর্ববর্তী ৭৮ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ৪৯৮
৮৪, ৮৫. Anilchandra Banerjee: Years of Consolidation: 1883-1904 (Hundred Years of the C. U. Vol. I. p. 150, 149).
৮৬. H. R. James: Education and Statesmanship in India. p. 62
৮৭. বিনয় ঘোষ: বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা। পৃঃ ২১১
৮৮. ব্যোমকেশ মুস্তফি: হরিদাস। কুমুদকুমার ভট্টাচার্য কর্তৃক সংগৃহীত। চতুষ্কোণ: কার্তিক সংখ্যা, অষ্টাদশ বর্ষ, ১৩৮৫। পৃঃ ২৭-৫১
৮৯. পূর্ববর্তী ৪ দ্রষ্টব্য। ৪র্থ। পৃঃ ১৪২-৪৩
৯০. প্রাগুক্ত। ২য়। পৃঃ ৪২৬-২৭
৯১. পূর্ববর্তী ৮৪ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ১৫০
৯২. পূর্ববর্তী ৮৯ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ১৪২
৯৩. পূর্ববর্তী ৬০ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ৪৩৭
৯৪. পূর্ববর্তী ৪ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ৩৮০-৮১

পঞ্চম অধ্যায়

১. অতুলপ্রসাদ সেন: গীতিগুচ্ছ। পৃঃ ৯১
২. বিহারীলাল চক্রবর্তী: সারদামঙ্গল। ভবানীগোপাল সান্যাল সম্পাদিত। পৃঃ ১৪২
৩, ৪. রমেশচন্দ্র মজুমদার: বাংলাদেশের ইতিহাস (আধুনিক যুগ)। পৃঃ ৪৬৯, ৪৮৭
৫. সুকুমার সেন: বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য। পৃঃ ৮৬
৬. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়: হরিনাথ মজুমদার। সাহিত্য-সাধক চরিতমালা: সংখ্যা ৩৫। পৃঃ ১৪
৭. বিনয় ঘোষ: সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র (১ম)। পৃঃ ৩০১
৮. পার্থ চট্টোপাধ্যায়: বাংলা সংবাদপত্র ও বাঙ্গালীর নবজাগরণ। পৃঃ ১৭৯
৯. পূর্ববর্তী ৭ দ্রষ্টব্য। ৩য়। পৃঃ ৪৩০
১০, ১১. প্রাগুক্ত। ৪র্থ। পৃঃ ৫৭৩-০৪, ৫০৪
১২, ১৩. প্রাগুক্ত। ২য়। পৃঃ ৪১৬, ৪৫৫
১৪. রাজনারায়ণ বসু: সে কাল আর এ কাল। পৃঃ ৬২-৬৪
১৫, ১৬. পূর্ববর্তী ১২ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ৪৫৫-৫৬, ৪৫৭-৫৮
১৭. যোগেশচন্দ্র বাগল: বাংলার জনশিক্ষা। পৃঃ ৪৭
১৮, ১৯. William Adam: Reports on the State of Education in Bengal (1835 & 1838). Ed. by A. N. Basu. p. 349, 362
২০. S. Nurullah & J. P. Naik: A Students' History of Education in India (1800-1965). p. 26
২১-২৩. পূর্ববর্তী ১৮ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ৩৬৩, ৩০৮, ৪০০-০১
২৪, ২৫. J. A. Richie: Selections from Educational Records. Part III. p. 65, 65
২৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর: শিক্ষার বিকিরণ। শিক্ষা। পৃঃ ২১৬
২৭. পূর্ববর্তী ১৮ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ৪৬৪-৬৫
২৮. প্যারীচাঁদ মিত্র: ডেভিড হেয়ার। ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক অনূদিত। পৃঃ ৭৩ ৭৪
২৯-৩১. N. L, Basak: History of Vernacular Education in Bengal (1800-1854). p. 304, 304, 305
৩২. পূর্ববর্তী ২৮ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ৭৪
৩৩. বিনয় ঘোষ: বাংলার বিদ্বৎসমাজ। পৃঃ ১৯৫
৩৪. পূর্ববর্তী ৫ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ৮০-৮১
৩৫. পূর্ববর্তী ২৯ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ৩২৪-২৫
৩৬. পূর্ববর্তী ৩৩ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ১৯৫
৩৭. পূর্ববর্তী ৮ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ১৭৫
৩৮. দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র রায়ের আত্মজীবনচরিত। পৃঃ ৩৭-৩৮
৩৯, ৪০. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়: সংবাদপত্রে সেকালের কথা (২য়)। পৃঃ ২২৩-২৪, ২২২
৪১. পূর্ববর্তী ৭ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ২৯৭

৪২. ইন্দ্র মিত্র : করুণাসাগর বিদ্যাসাগর। পৃঃ ১৭৬
৪৩, ৪৪. পূর্ববর্তী ২৯ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ৩৮৮, ৩৮৮
৪৫, ৪৬. পূর্ববর্তী ৭ দ্রষ্টব্য (৪র্থ)। পৃঃ ৫০৬, ৫০৩
৪৭-৫০. পূর্ববর্তী ২৯ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ৩৯৫, ৪০২, ৪০১, ৩৯২
৫১. পূর্ববর্তী ৪৫ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ৪৯৭
৫২-৫৪. পূর্ববর্তী ২৯ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ৪০৩, ৩৯৩, ৩৯৩
৫৫-৫৭. পূর্ববর্তী ৪২ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ১৬৮-৭৫, ১৭৭, ১৭৬
৫৮. পূর্ববর্তী ১২ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ৪১৭-১৮
৫৯, ৬০. পূর্ববর্তী ৭ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ৩০২, ৩০৪
৬১. যোগেশচন্দ্র বাগল : বাংলার উচ্চশিক্ষা। পৃঃ ১৮
৬২. পূর্ববর্তী ১৭ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ৫৫
৬৩, ৬৪. পূর্ববর্তী ৩৯ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ৩০, ৩০
৬৫, ৬৬. পূর্ববর্তী ৪২ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ১৬৬, ১৬৬
৬৭. পূর্ববর্তী ৯ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ২০৪
৬৮, ৬৯. পূর্ববর্তী ১২ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ৪১৭, ৪০০
৭০, ৭১. পূর্ববর্তী ৪২ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ১৮৬, ১৮৬
৭২. মার্কস-এঙ্গেলস : উপনিবেশিকতা প্রসঙ্গে। পৃঃ ৪৩

ষষ্ঠ অধ্যায়

১. কুমুদকুমার ভট্টাচার্য : অবাধ-বাণিজ্য আন্দোলন ও রাজা রামমোহন। তিস্তা থেকে গঙ্গা। বৈশাখ-আষাঢ়, ১৩৮০। পৃঃ ২১
২. মার্কস-এঙ্গেলস : উপনিবেশিকতা প্রসঙ্গে। পৃঃ ৫৫
৩. A. L. Morton : A People's History of England. p. 387
৪, ৫. পূর্ববর্তী ২ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ৫৬-৫৭, ৪৮
৬. G. T. Warner & C. H. K. Marten : The Groundwork of British History. p. 614
৭. পূর্ববর্তী ২ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ৬৬
৮. পার্থ চট্টোপাধ্যায় : বাংলা সংবাদপত্র ও বাঙ্গালীর নবজাগরণ। পৃঃ ১৭৮
৯, ১০. পূর্ববর্তী ২ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ৬৫, ৬৬
১১. রজনীপাম দত্ত : আজিকার ভারত। পৃঃ ৭
১২. পূর্ববর্তী ২ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ৮৭
১৩, ১৪. বিনয় ঘোষ : বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা। পৃঃ ১৩০, ১৯
১৫. কুমুদকুমার ভট্টাচার্য : শরৎচন্দ্র ও বাংলার কৃষক। পৃঃ ৮৯-৯০
১৬. শরৎ-সাহিত্য সংগ্রহ (১৩শ)। পৃঃ ৩৬১
১৭. সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর : বোম্বাই চিত্র। পৃঃ ৪৪৭-৪৮
১৮. পূর্ববর্তী ১৬ দ্রষ্টব্য। ৩য়। পৃঃ ১০০
১৯. পূর্ববর্তী ২ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ৮৯
২০. পূর্ববর্তী ১৫ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ৯১
২১. H. H. Dodwell & V. D. Mahajan : The Cambridge History of India. Vol. VI. p. 117
২২, ২৩. পূর্ববর্তী ২ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ৩৪, ২৯
২৪. N. L. Basak : History of Vernacular Education in Bengal (1800-1854). p. 228
২৫. যোগেশচন্দ্র বাগল : বাংলার জনশিক্ষা। পৃঃ ৩-৪
২৬. Pandit Gopeshkumar Ojha : Compulsory Education in India, p. 21
২৭. S. Nurullah & J. P. Naik : History of Education in India During the British Period. pp. 159-60
২৮. স্বামী বিবেকানন্দ : প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য। পৃঃ ২০
২৯-৩৪. পূর্ববর্তী ২৭ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ১৬১-৬২, ১৬১, ১৬৫, ১৬৫, ১৭১, ১৭২-৭৩
৩৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : শিক্ষার হেরফের। শিক্ষা। পৃঃ ১৪
৩৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ। শিক্ষা। পৃঃ ২৩৩
৩৭. কল্যাণী কার্লেকর : ভারতের শিক্ষা (২য় খণ্ড—বৃটিশ যুগ)। পৃঃ ৬৯
৩৮. The Indian Year Book of Education, 1964 (Elementary Education) : N. C. E. R. T. New Delhi. p. 579
৩৯. Dr. Anilchandra Banerjee : Years of Consolidation : 1883-1904 (Hundred Years of the C. U. Vol, I. p. 135).
৪০, ৪১. পূর্ববর্তী ৩৮ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ১৩, ১৩-১৪
৪২. পূর্ববর্তী ১৬ দ্রষ্টব্য। ২য়। পৃঃ ১৯৮

৪৩-৪৪. বিনয় ঘোষ : সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র (৩য়)। পৃঃ ৪৪৫, ৪৪৬-৪৭

৪৫. প্রাগুক্ত। ৪র্থ। পৃঃ ৫২৯

৪৬. পূর্ববর্তী ৩৮ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ১৪-১৫

৪৭. G. T. Warner, C. H. K. Marten & D. E. Muir: The New Groundwork of British History. pp. 847-48

৪৮, ৪৯. যোগেশচন্দ্র বাগল: মুক্তির সন্ধানে ভারত —কংগ্রেস পূর্ব যুগ। পৃঃ ১০১, ১০২

৫০-৫৪. পূর্ববর্তী ৪৫ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ৫৩৩, ৫৩৬, ৫৩৭, ৫৩৯-৪০, ৫৪২-৪৪

৫৫. পূর্ববর্তী ৪৮ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ২০৩-০৫

৫৬, ৫৭. পূর্ববর্তী ৪৫ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ৫৫০, ৫৫১

৫৮. সৈয়দ শাহেদুল্লাহ : শিক্ষা ও শ্রেণীসম্পর্ক। পৃঃ ১৪

৫৯. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী : কালেজী শিক্ষা। বঙ্গদর্শন ; ভাদ্র, ১২৮০। পৃঃ ২১৩

৬০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : রাশিয়ার চিঠি। পৃঃ ৭০০

৬১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : শিক্ষার বিকিরণ। শিক্ষা। পৃঃ ২১৬

৬২. পূর্ববর্তী ৩৬ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ২৩০

৬৩. বঙ্কিম-রচনাবলী (২য়)। সাহিত্য সংসদ কর্তৃক প্রকাশিত। পৃঃ ৩৭৭

৬৪. পূর্ববর্তী ৪৫ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ৫২৭

৬৫. জ্ঞানেন্দ্রলাল রায় : জমিদারগণ, সাবধান। নব্যভারত ; কার্তিক, ১২৯৯। পৃঃ ৩৬৫-৬৭

৬৬. বিষাদ কালিমা। নব্যভারত ; আষাঢ়, ১৩০৪। পৃঃ ১৪২

৬৭. জ্ঞানেন্দ্রলাল রায় : অনাহারে মরণ। নব্যভারত ; আষাঢ়। পৃঃ ১৩৮-৪০

৬৮. পূর্ববর্তী ৬৬ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ১৪১

৬৯. কুমুদকুমার ভট্টাচার্য : উনিশ শতকের নিষিদ্ধ গ্রন্থ ও কবি গোবিন্দ দাস। পৃঃ ৮৭-৮৮

৭০. পূর্ববর্তী ১৫ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ৫৫

৭১, ৭২. সুপ্রকাশ রায় : ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম। পৃঃ ৪১৬, ২১২

৭৩, ৭৪. পূর্ববর্তী ৩৭ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ৭৬, ৭৭

৭৫. পূর্ববর্তী ৩৯ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ১৩৫

৭৬ S. Nurullah & J. P. Naik: A Students' History of Education in India (1800-1965). p. 160

৭৭. কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যালেণ্ডার অবলম্বনে রচিত।

৭৮. পূর্ববর্তী ৩৯ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ১৩৪

৭৯. পূর্ববর্তী ২৭ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ১৯৪-৯৫

৮০-৮২. পূর্ববর্তী ৩৯ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ১৩৪, ১০৬, ১০৭

৮৩, ৮৪. পূর্ববর্তী ১৫ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ৬৮, ৭০

৮৫, পূর্ববর্তী ৭৭ দ্রষ্টব্য।

৮৬. পূর্ববর্তী ৩৮ দ্রষ্টব্য।

৮৭. S. N. Mukherjee: History of Education in India. p. 179

৮৮. পূর্ববর্তী ২৬ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ২৪

৮৯-৯১. পূর্ববর্তী ৭৬ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ২৫২, ২৫৩, ২৫৩-৫৪

৯২-৯৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : শিক্ষার বাহন। শিক্ষা। পৃঃ ১৪৪, ১৪৮

৯৪. পূর্ববর্তী ৬২ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ২৩২

৯৫. স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় : জাতীয় সাহিত্য। পৃঃ ৮৶০

৯৬, ৯৭. প্রমথ চৌধুরী : বাংলার ভবিষ্যৎ। প্রবন্ধ সংগ্রহ। পৃঃ ১১০-১১, ১২১

৯৮. প্রমথ চৌধুরী : তরজমা। প্রবন্ধ সংগ্রহ। পৃঃ ৩৪০

সপ্তম অধ্যায়

১, ২. Pratulchandra Gupta: Foundation of the University (Hundred Years of the University of Calcutta. Vol. I. p. 63, 63).

৩. Niharranjan Roy: The Formative Years, 1857-82 (Hundred Years of the C. U. Vol. I. p. 89).

৪, ৫. পূর্ববর্তী ১ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ৬৪, ৬৩

৬. পূর্ববর্তী ৩ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ৯৭

৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : বিদ্যাসমবায়। শিক্ষা পৃঃ ১৭৭

৮. রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী : সামাজিক ব্যাধি ও তাহার প্রতিকার। সাহিত্য ; আশ্বিন-কার্তিক, ১৩০৬। পৃঃ ১৩৩-৩৪

৯. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী : কালেজী শিক্ষা। বঙ্গদর্শন ; ভাদ্র, ১২৮০। পৃঃ ২১১

১০. রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী : শিক্ষাপ্রণালী। রামেন্দ্র-রচনাবলী (৪র্থ) —ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত। পৃঃ ৭৭-৭৮

১১. The Report of the Education Commission (1964-66), Vol. I. p. 9
১২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : শিক্ষার বিকিরণ। শিক্ষা। পৃঃ ২১৮
১৩. পূর্ববর্তী ৩ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ৮৮
১৪. বিনয় ঘোষ : সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজ-চিত্র (১ম)। পৃঃ ৩৮১
১৫. The Report of the University Education Commission (1948-49). Vol. I. p. 316
১৬. রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী : অরণ্যে রোদন। রামেন্দ্র-রচনা-সংগ্রহ। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও অনিলকুমার কাঞ্জিলাল কর্তৃক সম্পাদিত। পৃঃ ৪৮৮
১৭. কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বছরের বার্ষিক রিপোর্ট থেকে সারণীসমূহে উল্লিখিত সংখ্যাগুলি সংগৃহীত।
১৮. Atindranath Bose : Recent Developments : 1935-56 (Hundred Years of the C. U. Vol. I. p. 367).
১৯-২১. Anilchandra Banerjee : Years of Consolidation : 1883-1904 (Hundred Years of the C. U. Vol. I. p. 141, 141, 142).
২২. পূর্ববর্তী ১৪ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ৪৬৩
২৩. প্রাগুক্ত। ২য়। পৃঃ ৪৫১
২৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : শিক্ষার বাহন। শিক্ষা। পৃঃ ১৫২
২৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : শিক্ষাসংস্কার। শিক্ষা। পৃঃ ৩৪
২৬. রাজনারায়ণ বসু : সেকাল আর একাল। পৃঃ ৫৭
২৭. পূর্ববর্তী ১৪ দ্রষ্টব্য। ৩য়। পৃঃ ৪৩৭-৩৮
২৮, ২৯. পূর্ববর্তী ১৭ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ১৪৫, ১৪৫
৩০. পূর্ববর্তী ৯ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ২১২
৩১. S. Nurullah & J. P. Naik : A Students' History of Education in India (1800-1965). p. 165

অষ্টম অধ্যায়

১. দ্বিজেন্দ্র-রচনাবলী (২য়) : অজিতকুমার ঘোষ ও আবদুল আজীজ আল্-আমান কর্তৃক সম্পাদিত। পৃঃ ৯৭-৯৮
২-৪. বঙ্কিম-রচনাবলী (২য়)। সাহিত্য সংসদ কর্তৃক প্রকাশিত। পৃঃ ৯-১০, ১১, ৩৭৬
৫. K. G. Saiyidain, J. P. Naik & S. Abid Husain : Compulsory Education in India. p. 15
৬. S. Nurullah & J. P. Naik : A Students' History of Education in India (1800-1965). p. 183
৭. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় : রবীন্দ্র-জীবনী (১ম)। পৃঃ ৪১৫
৮. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : পত্রসূচনা। বঙ্গ-দর্শন : বৈশাখ, ১২৭৯। রিফ্লেক্ট পাবলিকেশন। পৃঃ ২
৯. রমাকান্ত চক্রবর্তী : বিস্মৃত দর্পণ (নিধুবাবু/বাবু বাংলা/গীতরত্ন) পৃঃ ৯৬
১০-১২. Anilchandra Banerjee : Years of Consolidation : 1883-1904 (Hundred Years of the C. U. Vol. I. p. 145, 146, 142).
১৩. পূর্ববর্তী ৭ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ৩৮৬
১৪-১৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : শিক্ষার হেরফের। শিক্ষা। পৃঃ ৮, ১০, ১৪, ১৬, ১৮
১৯-২১. লোকেন্দ্রনাথ পালিত : শিক্ষা-প্রণালী। সাধনা : মাঘ, ১২৯৯। পৃঃ ১৮৯-৯০, ১৯২-৯৩, ১৯৬
২২. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। সাধনা : চৈত্র, ১২৯৯। পৃঃ ৪৪০-৪১
২৩. গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। সাধনা : চৈত্র, ১২৯৯। পৃঃ ৪৪১-৪২
২৪. আনন্দমোহন বসু। সাধনা : চৈত্র, ১২৯৯। পৃঃ ৪৪২-৪৩
২৫, ২৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : প্রসঙ্গ কথা। সাধনা : চৈত্র, ১২৯৯। পৃঃ ৪৪৩, ৪৪৩-৫৩
২৭. পূর্ববর্তী ৭ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ৪৫২
২৮. রবীন্দ্র-রচনাবলী (১ম)। পঃ বঃ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত। পৃঃ ৫৬২
২৯. কামিনী রায় : অনুকারীর প্রতি। দীপ ও ধূপ। পৃঃ ৬৭
৩০. পূর্ববর্তী ১ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ২১৭
৩১. রামেন্দ্র-রচনাসংগ্রহ। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও অনিলকুমার কাঞ্জিলাল কর্তৃক সম্পাদিত। পৃঃ ৪৫৯
৩২. রাজনারায়ণ বসু : সেকাল আর একাল। পৃঃ ৬৪-৬৫

৩৩. মধুসূদন রচনাবলী। সাহিত্য সংসদ কর্তৃক প্রকাশিত। পৃঃ ১৫৯
৩৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ। শিক্ষা। পৃঃ ২৭
৩৫. অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর : ঘরোয়া। পৃঃ ৭২, ৭৬-৭৭
৩৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : কালান্তর। পৃঃ ৩৪৫
৩৭, ৩৮. Pramathanath Banerjee : Reform and Reorganization : 1904-1924 (Hundred Years of the C. U. Vol. I. p. 278, 279).
৩৯. ডেভিড সেলবোর্ন : ইংরেজীনবীশ বুদ্ধিজীবীদের বিরুদ্ধে। নন্দন ; মাঘ-ফাল্গুন, ১৩৮৭। পৃঃ ৮৬৩
৪০-৪২. পূর্ববর্তী ১০ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ১৪২, ১৪৬, ১৪৬
৪৩. রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী : সামাজিক ব্যাধি ও তাহার প্রতিকার। সাহিত্য; আশ্বিন-কার্তিক, ১৩০৬। পৃঃ ১০২
৪৪. পূর্ববর্তী ১০ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ১৫৯
৪৫. পূর্ববর্তী ৭ দ্রষ্টব্য। ২য়। পৃঃ ১৪১
৪৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : অসন্তোষের কারণ। শিক্ষা। পৃঃ ১৭২-৭৩
৪৭. পূর্ববর্তী ৬ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ২৬৭
৪৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : শিক্ষাবিধি। শিক্ষা। পৃঃ ১২৫
৪৯, ৫০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : শিক্ষার বাহন। শিক্ষা। পৃঃ ১৪৯, ১৫১
৫১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ। শিক্ষা। পৃঃ ২৪০
৫২, ৫৩. পূর্ববর্তী ৪৮ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ১৫৩-৫৪, ১৫০
৫৪, ৫৫. বিনয় ঘোষ : সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র (২য়)। পৃঃ ৪৬৭, ৪৬৮
৫৬. ভবেশ মৈত্র : গণশিক্ষার আলোকে ভাষার স্থান : একটি সমীক্ষা। নন্দন; মাঘ-ফাল্গুন ১৩৮৭। পৃঃ ৮৭১
৫৭-৬০. শরৎ রচনাবলী (৫ম)। শরৎ সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত। পৃঃ ৫২১, ৬০৫-০৬, ৬০৪, ৬০৪
৬১. পূর্ববর্তী ১৪ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ১৮
৬২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : শিক্ষার বিকিরণ। শিক্ষা। পৃঃ ২২২
৬৩-৬৬. গান্ধী-রচনাসম্ভার (৩য়)। গান্ধী শত-বার্ষিকী সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত। পৃঃ ৫৪, ২৩৮, ২৪১, ২৫৮-৫৯
৬৭, ৬৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : শিক্ষাসংস্কার। শিক্ষা। পৃঃ ৩৬-৩৭, ৩৭

নবম অধ্যায়

১, ২. S. Nurullah & J. P. Naik : A Students' History of Education in India (1800-1965). p. 182, 173
৩. পঞ্চানন সাহা : বাংলার শ্রমিক-আন্দোলনের ইতিহাস। পৃঃ ১৮
৪, ৫. সুপ্রকাশ রায় : ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস (১ম)। পৃঃ ২৯৭-৯৮, ৩৩৫
৬-৮. রজনীপাম দত্ত : আজিকার ভারত (২য়)। পৃঃ ১৫৪, ১৫৫, ১৫৫
৯, ১০. রমেশচন্দ্র মজুমদার : বাংলাদেশের ইতিহাস (আধুনিক যুগ)। পৃঃ ১৬৪, ১৬৫
১১. D. G. Tendulkar : Mahatma. Vol. I. p. 280
১২, ১৩. পূর্ববর্তী ৯ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ১৭১, ১৬৮
১৪. অযোধ্যা সিংহ : জাতীয় আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। পৃঃ ২৬
১৫, ১৬. পূর্ববর্তী ৬ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ৫১৭, ৫১৮
১৭. Pramathanath Banerjee : Reform and Reorganization : 1904-24 (Hundred Years of the C. U. Vol. I. p. 263).
১৮, ১৯. পূর্ববর্তী ১ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ২৪৬-৪৭, ২৮৪
২০. রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী : শিক্ষার পরিণাম। রামেন্দ্র-রচনা-সংগ্রহ। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও অনিলকুমার কাঞ্জিলাল কর্তৃক সম্পাদিত। পৃঃ ৪৬৪
২১. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় : রবীন্দ্র-জীবনী (২য়)। পৃঃ ৪৬৮-৬৯
২২. পূর্ববর্তী ১ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ২৬০
২৩. Amarprasad Dasgupta : The Postgraduate and other Problems : 192 4 (Hundred Years of the C. U. Vol. p. 338).
২৪, ২৫. পূর্বোক্ত ১ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ২৩৮, ২৩৯
২৬. নজরুল ইসলাম : সঞ্চিতা। পৃঃ ৯৬-৯৭
২৭. পূর্ববর্তী ১৪ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ৩০-৩১
২৮. Dr. Pattabhi Sitaramayya : History of the Indian National Congress (1920-23). p. 7
২৯. পূর্ববর্তী ১১ দ্রষ্টব্য। ২য়। পৃঃ ৩৩
৩০. Subhaschandra Bose : The Indian Struggle. p. 84
৩১. পূর্ববর্তী ১ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ২৫১

৩২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : অসন্তোষের কারণ। শিক্ষা। পৃঃ ১৭১
৩৩. পূর্ববর্তী ১ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ২৭৩
৩৪-৩৬. পূর্ববর্তী ২৩ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ৩৩৯, ৩৪৫, ৩৪৫-৪৬
৩৭-৩৯. পূর্ববর্তী ৬ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ১৭৪, ১৭৫, ১৭৭
৪০-৪২. কল্যাণী কার্লেকর : ভারতের শিক্ষা (২য়)। পৃঃ ১৫৭, ১৮১, ১৫৮
৪৩. K. G. Saiyidain, J. P. Naik & S. Abid Husain : Compulsory Education in India. p. 37
৪৪. The Indian Year Book of Education, 1964. N. C. E. R. T. New Delhi. p. 24
৪৫. সৈয়দ শাহেদুল্লাহ : শিক্ষা ও শ্রেণীসম্পর্ক। পৃঃ ১৪-১৫
৪৬. Revised Curriculum for Primary Schools in Bengal —Government of Bengal, Education Department, 1929. pp. 3-4
৪৭-৫১. S. Nurullah & J. P. Naik : History of Education in India During the British Period. p. 471, 535, 472, 538, 538
৫২. পূর্ববর্তী ৪৩ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ৩৮
৫৩. Indian Educational Policy, 1913. pp. 10-11
৫৪, ৫৫. পূর্ববর্তী ৪৭ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ৪৭২-৭৩, ৫৪৮
৫৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : রাশিয়ার চিঠি। রবীন্দ্র-রচনাবলী (১০ম)। পঃ বঃ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯৬১। পৃঃ ৭২৫
৫৭, ৫৮. পূর্ববর্তী ৪৫ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ৩৯, ১৭-২২
৫৯. পূর্ববর্তী ৫৬ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ৭০৭
৬০-৬২. পূর্ববর্তী ১ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ১৮৪, ২৪৭, ১৯৩
৬৩. পূর্ববর্তী ২৮ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ১৯৫
৬৪. পূর্ববর্তী ১৪ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ৫৫-৫৬
৬৫. পূর্ববর্তী ৯ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ৩৩১-৩২
৬৬, ৬৭. হরিসাধন গোস্বামী : ভারতে মাধ্যমিক শিক্ষার ক্রমবিকাশ। পৃঃ ৩০, ৩১
৬৮. S. N. Mukherjee : History of Education in India. p. 230
৬৯. ১৯৩৬-৩৭ থেকে ১৯৪৬-৪৭ সালের বিশ্ববিদ্যালয়, মাধ্যমিক ও প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে সংখ্যাতত্ত্বের জন্য পূর্ববর্তী ১ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ৩২৪, ৩২৭, ৩৩২, ৩৩৪
৭০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : ছাত্রসম্ভাষণ। শিক্ষা। পৃঃ ২৫১
৭১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : শিক্ষার বাহন। শিক্ষা। পৃঃ ১৪৯
৭২. পূর্ববর্তী ৭০ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ২৫০
৭৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : আবরণ। শিক্ষা। পৃঃ ৭০
৭৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : শিক্ষাসমস্যা। শিক্ষা। পৃঃ ৫২-৫৩
৭৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : শিক্ষার বিকিরণ। শিক্ষা। পৃঃ ২২৩
৭৬-৭৮. সরকারী ভাষা কমিশনের রিপোর্ট (বঙ্গানুবাদ), ১৯৫৬। পঃ বঃ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত। পৃঃ ২৭, ৬৭-৬৮, ৬৮
৭৯-৮১. M. K. Gandhi : Basic Education. p. 22, 22, 74
৮২. পূর্ববর্তী ১ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ৩৪৩
৮৩-৮৫. পূর্ববর্তী ৭৯ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ৯, ১১২, ১১৩
৮৬. পূর্ববর্তী ১ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ৩৪৮
৮৭-৯১. পূর্ববর্তী ১৪ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ৭৩, ৭৫, ৭৬, ৮০, ৮১
৯২, ৯৩. পূর্ববর্তী ৯ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ৩৯২, ৩৯৫-৯৬
৯৪. পূর্ববর্তী ৭০ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ২৬০

দশম অধ্যায়

১. Tarachand : History of the Freedom Movement in India. pp. 550-51
২. মুহম্মদ আবদুল্লাহ রসুল : সংস্কৃতির কথা। দেশহিতৈষী ; শারদ সংখ্যা, ১৩৮৮। পৃঃ ৮২
৩. কান্তি বিশ্বাস : পশ্চিমবঙ্গের বেকার সমস্যা। যুবমানস পত্রিকা : জুন-জুলাই ১৯৮১। পৃঃ ৯
৪-৬. মুহম্মদ আবদুল্লাহ রসুল : কৃষকসভার ইতিহাস। পৃঃ ১৬১-৬২, ১৬২, ১৯৮-৯৯
৭. Atindranath Bose : Recent Developments : 1935-56 (Hundred Years of the C. U. Vol. I. pp. 411-12).
৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : শিক্ষার বিকিরণ। শিক্ষা। পৃঃ ২১৯
৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ। শিক্ষা। পৃঃ ২২৯

১০, ১১. J. P. Naik : Educational Planning in India. p. 12, 72
১২. The Gazetter of India, Vol. IV. December, 1978. p. 464
১৩. রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী : সামাজিক ব্যাধি ও তাহার প্রতিকার। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস কর্তৃক সম্পাদিত রামেন্দ্র-রচনাবলী (৪র্থ)। পৃঃ ১০০
১৪. পূর্ববর্তী ১০ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ১৫
১৫. B. S. Goel & S. K. Saini : Mother Tongue and Equality of Opportunity in Education. N. C. E. R. T. New Delhi. p. 26
১৬. পূর্ববর্তী ১২ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ৪৭২
১৭. পূর্ববর্তী ১০ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ১৯
১৮. S. P. Jain : Indian Population Growth. p. 78
১৯. S. Nurullah & J. P. Naik : History of Education in India During the British Period. p. 467
২০. The Report of the Education Commission (1964-66) Vol. II. p. 278
২১. পূর্ববর্তী ১৫ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ৮২
২২-২৪. পূর্ববর্তী ২০ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ২৭৫, ২৭৯, ২৮২
২৫. পূর্ববর্তী ১৮ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ৭৬
২৬. অরুণ চৌধুরী : সকলের জন্য লেখাপড়া। দেশহিতৈষী (সাপ্তাহিক)। ১৬ অক্টোবর, ১৯৮১। পৃঃ ৪
২৭. পূর্ববর্তী ২০ দ্রষ্টব্য। ৩য়। পৃঃ ৭৮০
২৮. পূর্ববর্তী ১২ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ৫০২
২৯, ৩০. পূর্ববর্তী ১০ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ২৩, ৪৪
৩১. মহম্মদ আবদুল বারি : শিক্ষার সংকট এবং বামফ্রন্ট সরকারের চার বছর। যুব মানস পত্রিকা। জুন-জুলাই, ১৯৮১। পৃঃ ৪
৩২, ৩৩. অনুরূপ। সপ্তম বর্ষ; চতুর্থ সংখ্যা, ১৩৮০। পৃঃ ৩, ৩৮
৩৪. Second Five Year Plan Education Chapter XXIII. Government of India, Planning Commission. p. 500
৩৫. পূর্ববর্তী ১৫ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ৮৫
৩৬. পূর্ববর্তী ১২ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ৪৮৯
৩৭. সরকারি ভাষা কমিশনের রিপোর্ট (বঙ্গানুবাদ), ১৯৫৬। পৃঃ ২৬
৩৮. পূর্ববর্তী ৩২ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ২৭
৩৯. পূর্ববর্তী ১৫ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ৮৪-৮৫
৪০, ৪১. পূর্ববর্তী ৩৭ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ২৭, ২৮
৪২. M. K. Gandhi : Basic Education. p. 65
৪৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ। শিক্ষা। পৃঃ ২১০
৪৪, ৪৫. The Report of the University Education Commission (1948-49). Vol. I. p. 316, 317
৪৬-৪৯. সত্যেন্দ্রনাথ বসু : বিজ্ঞানের সংকট ও অন্যান্য প্রবন্ধ। পৃঃ ৯৭, ৯৩, ৯৪, ৯২
৫০. পূর্ববর্তী ৯ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ২৩৯
৫১-৫৫. পূর্ববর্তী ৪৪ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ১২৬, ১২৬ ১২৭, ১২৯-৩০, ৩২৬
৫৬, ৫৭. পূর্ববর্তী ২০ দ্রষ্টব্য। ৩য়। পৃঃ ৫৪৬, ৫২৭
৫৮. কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যালেণ্ডার অবলম্বনে রচিত।
৫৯. পূর্ববর্তী ৪৪ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ৯৮-৯৯
৬০. পূর্ববর্তী ১৫ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ৮০
৬১. পূর্ববর্তী ৩৭ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ৫৮
৬২. পূর্ববর্তী ১২ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ৪৮৫
৬৩-৬৮. পূর্ববর্তী ৪৪ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ৯৯-১০০, ৯১, ৯৩, ১১৫, ৮৯, ১৩৪-৩৫
৬৯. S. N. Mukherjee : History of Education in India. p. 259
৭০-৭৩. The Report of the Secondary Education Commission (1952-53). p. 23, 30, 31, 56-57
৭৪. পূর্ববর্তী ৫৮ দ্রষ্টব্য।
৭৫. পূর্ববর্তী ১০ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ১০৮
৭৬. S. Nurullah & J. P. Naik : A Students' History of Education in India (1800-1965). p. 431
৭৭, ৭৮. পূর্ববর্তী ৭০ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ৬, ৬১
৭৯. পূর্ববর্তী ১৫ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ৬৫
৮০-৮৬. পূর্ববর্তী ৭০ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ৬৭, ৬৮, ৭৩, ৩৩, ৮৩, ৬৩, ৮৪
৮৭. পূর্ববর্তী ১০ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ৪৬
৮৮-৯৯. পূর্ববর্তী ৩৭ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ৫৪, ৬১, ৬০, ৫৭, ৬০, ৬৯-৭০, ৭১, ২০৫, ২০৪, ২০৬, ২৪১, ২৪০
১০০. ভূদেব চৌধুরী : সমস্যা —শিক্ষাপ্রসঙ্গ — রবীন্দ্রনাথ। পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা। রবীন্দ্র-সংখ্যা ; ২৫ বৈশাখ, ১৩৮৮। পৃঃ ১০৫০-৫১

১০১. পূর্ববর্তী ৭০ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ২১
১০২. পূর্ববর্তী ৮ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ২১৭
১০৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : শিক্ষাসমস্যা। শিক্ষা। পৃঃ ৪১
১০৪-১০৬. পূর্ববর্তী ২০ দ্রষ্টব্য। ১ম। পৃঃ ৫৩, ৪৮, ৮০-৮১
১০৭-১১১. পূর্ববর্তী ২০ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ৩৩৫, ৩৩৫, ৩৩৫, ৩৩৬, ৩৪১
১১২, ১১৩. পূর্ববর্তী ১০৪ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ২৪-২৫, ২৫
১১৪. পূর্ববর্তী ২০ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ৩৩৪
১১৫. পূর্ববর্তী ১০৪ দ্রষ্টব্য। পৃঃ xvii

একাদশ অধ্যায়

১. প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকা। পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা-অধিকার। মে, ১৯৫০। পৃঃ ৩-৪
২. শিক্ষণ-ব্যবহারিকা। পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা-অধিকার। জানুয়ারি, ১৯৫০। পৃঃ ৪
৩, ৪. রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী : শিক্ষা প্রণালী। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজীকান্ত দাস সম্পাদিত রামেন্দ্র-রচনাবলী (৪র্থ)। পৃঃ ৮২, ৮৪
৫. কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ আশিস রায়ের কাছ থেকে সংগৃহীত।
৬. কমলকুমার চট্টোপাধ্যায় : প্রাথমিক শিক্ষার রূপান্তর। রাজ্য শিক্ষা সংস্থা। পশ্চিমবঙ্গ। পৃঃ ৪৭-৪৯
৭. নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি : কংগ্রেসী শাসনে পশ্চিম বাংলার শিক্ষার অবস্থা। পৃঃ ৩
৮. রাজ্যের শিক্ষাচিত্র : তখন ও এখন। শিক্ষা ব্যবস্থা গণতন্ত্রীকরণ সংস্থা। পশ্চিমবঙ্গ। পৃঃ ৬
৯. আলোক মাইতি : প্রাথমিক শিক্ষার সর্বাঙ্গীণ উন্নতিতে গণ-উদ্যোগের সংযুক্তি। রাজ্য শিক্ষা সংস্থা। পশ্চিমবঙ্গ। পৃঃ খ
১০. পূর্ববর্তী ৭ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ৮
১১. সত্যযুগ। ২২ মার্চ, ১৯৮১। পৃঃ ২
১২. J. P. Banerjee : Education in India : Past, Present, Future. Vol. I. p. 11
১৩. পূর্ববর্তী ৬ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ৪৭
১৪. পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা-অধিকারের পরিসংখ্যান বিভাগ থেকে সংগৃহীত তথ্যসমূহের ভিত্তিতে রচিত।
১৫. পূর্ববর্তী ১২ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ৩২
১৬. The Report of the Education Commission (1964-66). Vol. I. p. 18
১৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ। শিক্ষা। পৃঃ ২৩১
১৮. সত্যেন্দ্রনাথ বসু : বিজ্ঞানের সঙ্কট ও অন্যান্য প্রবন্ধ। পৃঃ ৯০
১৯-২১. পূর্ববর্তী ৮ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ১০, ১১, ১০-১১
২২-২৪. বামফ্রন্ট সরকারের ৩৬ দফা সাধারণ ন্যূনতম কর্মসূচী। পশ্চিমবঙ্গ সরকার পৃঃ ১
২৫. পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা-সংস্কৃতি ও বামফ্রন্ট সরকার। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি, ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি (মার্কসবাদী)। পৃঃ ১
২৬, ২৭. বামফ্রন্ট সরকারের চার বছর। পশ্চিমবঙ্গ সরকার। পৃঃ ৭-৮, ১২
২৮. পূর্ববর্তী ১৬ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ১৭-১৮
২৯. পূর্ববর্তী ২৫ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ৪-৫
৩০. পূর্ববর্তী ২৬ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ১২-১৪
৩১. দেবেশ রায় : নীহাররঞ্জন রায়, সুকুমার সেন, প্রেমেন্দ্র মিত্র, সুভাষ মুখোপাধ্যায় শ্রদ্ধাস্পদেষু। পরিচয় : ডিসেম্বর, ১৯৮০। পৃঃ ১ (খ) —১ (গ)
৩২. নীলরতন সেন : শিক্ষাধারায় মাতৃভাষার স্বপক্ষে। দেশ। ১৯ সংখ্যা, ৪৯ বর্ষ। ১৩ মার্চ, ১৯৮২। পৃঃ ৩৪
৩৩, ৩৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : শিক্ষার বাহন। শিক্ষা। পৃঃ ১৫১, ১৫৩
৩৫. পূর্ববর্তী ১৭ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ২৪০
৩৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : বিসর্জন। রবীন্দ্র-রচনাবলী (৫ম)। পঃ বঃ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত; ১৯৬১। পৃঃ ৪১২
৩৭. নীহাররঞ্জন রায় : রাজনারায়ণই তবে কি বঙ্গবিজেতা? আনন্দবাজার পত্রিকা। ১৩ মার্চ, ১৯৮১। পৃঃ ৪
৩৮, ৩৯. সরকারি ভাষা কমিশনের রিপোর্ট (বঙ্গানুবাদ). ১৯৫৬। পৃঃ ৬৮, ২৮
৪০. পূর্ববর্তী ৩৭ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ৪
৪১, ৪২. নীহাররঞ্জন রায় : শিখলে ৪ থেকে ১০ বয়সই আদর্শ। আনন্দবাজার পত্রিকা। ১৪ মার্চ, ১৯৮১। পৃঃ ৪, ৪
৪৩. পূর্ববর্তী ১৬ দ্রষ্টব্য। ২য়। পৃঃ ৩৭৬-৯০
৪৪. R. F. Price : Education in Communist China. pp. 133-34

৪৫. B. S. Goel & S. K. Saini: Mother Tongue and Equality of Opportunity in Education. pp. 101-02

৪৬. পূর্ববর্তী ৪১ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ৬

৪৭. ডি. পি. পট্টনায়েক : পশ্চিমবঙ্গে ইংরেজি শিক্ষা নিয়ে বিতর্ক —আমি যেমন দেখেছি। পশ্চিমবঙ্গ। ২৯মে, ১৯৮১। পৃ: ১০৯২

৪৮. H. W. R. Howes: Planning in the Primary School Curriculum. U. N. E. S. C. O. p. 13

৪৯. D. A. Wilkins: Second Language Learning and Testing. p. 31

৫০. F. Grittner: Teaching Foreign Languages. p. 163

৫১. ইণ্ডিয়ান স্কুল অব সোস্যাল সায়েন্সেস: প্রাথমিক শিক্ষা ও ভাষানীতি। পৃ: ২৫

৫২. The Report of the University Education Commission (1948-49). Vol. I. p. 126

৫৩, ৫৪. The Report of the Secondary Education Commission (1952-53). p. 68, 73

৫৫-৫৭. পূর্ববর্তী ৩৮ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ২৬, ৫৭, ৬০

৫৮. পূর্ববর্তী ৫১ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ১১

৫৯-৬২. Report of the Study Group on the Study of English, 1964. p. 18, 18, 18, 22

৬৩-৬৮. পূর্ববর্তী ১৬ দ্রষ্টব্য। ২য়। পৃঃ ৩২৫, ৩২৫, ৩৩৫, ৩৩৫, ৩৪২, ৩৪৩

৬৯. Report of the Committee of Members of Parliament on Education, 1967. pp. 3-4

৭০. Recommendation of the Central Advisory Board of Education, 1967. p. 37

৭১. আনন্দবাজার পত্রিকা। ২৫ জানুয়ারি, ১৯৮১। পৃঃ ৫

৭২. অমৃতবাজার পত্রিকা। ২৫ জানুয়ারি, ১৯৮১। পৃঃ ৫

৭৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর: শিক্ষাসংস্কার। শিক্ষা। পৃঃ ৩৭

৭৪, ৭৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর: রাশিয়ার চিঠি। রবীন্দ্র রচনাবলী (১০ ম); পঃ বঃ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯৬১। পৃঃ ৬৭৯, ৭০৭

৭৬. পূর্ববর্তী ৩৩ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ১৪৪

৭৭. পূর্ববর্তী ১৭ দ্রষ্টব্য। পৃ: ২৪৩

৭৮. পূর্ববর্তী ৩২ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ৩১

৭৯. ভবানী সেনগুপ্ত: মধ্যবিত্ত মৌচাকে ঢিল। যুগান্তর। ৫ মার্চ, ১৯৮১। পৃঃ ৪

৮০. প্রবোধচন্দ্র সেন: শিক্ষায় ভাষা সমস্যা। যুগান্তর। ১৯ মার্চ, ১৯৮১। পৃঃ ৪

৮১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ছাত্রসম্ভাষণ। শিক্ষা। পৃঃ ২৫২

৮২. প্রবোধচন্দ্র সেন: এই সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে। আনন্দবাজার পত্রিকা। ১১ মার্চ, ১৯৮১। পৃঃ ৪

৮৩. পূর্ববর্তী ৩৩ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ১৫৩

৮৪. পূর্ববর্তী ১৬ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ৪১-৪২

৮৫. প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী। প্রাথমিক শিক্ষা অধিকার; পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৮১। পৃঃ ১

দ্বাদশ অধ্যায়

১. J. P. Naik: Educational Planning in India. p. 12

২. Jawaharlal Nehru: The Discovery of India. pp. 413-14

৩, ৪. পূর্ববর্তী ১ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ১৬, ১০৯

৫. P. K. Bose: Calcutta University: Some Problems and Their Remedies. pp. 25-26

৬-৮. The Report of the Education Commission (1964-66). Vol. I. p. 9, VI, XII

৯. J. P. Naik: Education in the Fourth Plan. p. 180

১০. পূর্ববর্তী ৬ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ৯

১১. প্রিয়তোষ দত্ত রায়: শিক্ষা বিতর্কের ভিতরের কথা। যুগান্তর। ১৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮১। পৃঃ ৪

১২. রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী: অরণ্যে রোদন। রামেন্দ্র-রচনা-সংগ্রহ। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও অনিলকুমার কাঞ্জিলাল কর্তৃক সম্পাদিত। পৃঃ ৪৯৯

১৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর: শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ। শিক্ষা। পৃঃ ২৩১

১৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর: শিক্ষার হেরফের। শিক্ষা। পৃঃ ১৫

১৫. পূর্ববর্তী ৬ দ্রষ্টব্য। ৪র্থ। পৃঃ ৮৯৭

১৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : শিক্ষাবিধি। শিক্ষা। পৃঃ ১২৮
১৭, ১৮. পূর্ববর্তী ৬ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ১০, ১০
১৯. পূর্ববর্তী ১৫ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ৮৯৬-৯৮
২০, ২১. পূর্ববর্তী ৬ দ্রষ্টব্য। ২য়। পৃঃ ৩৪১, ৩৪১
২২-২৫ পূর্ববর্তী ৬ দ্রষ্টব্য। ৩য়। পৃঃ ৫২৯, ৫৪৬, ৫৭৮, ৫৯২
২৬. পূর্ববর্তী ৬ দ্রষ্টব্য। ৪র্থ। পৃঃ ৮২৯-৩০
২৭. রাজ্যের শিক্ষাচিত্র : তখন ও এখন। শিক্ষাব্যবস্থা গণতন্ত্রীকরণ সংস্থা। পৃঃ ১৫
২৮. দৈনিক বসুমতী। ৩০ জুলাই, ১৯৮১। পৃঃ ৪
২৯. পূর্ববর্তী ২৭ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ৬
৩০. পূর্ববর্তী ৫ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ৭২
৩১. পূর্ববর্তী ১ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ১১৭
৩২. পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা-সংস্কৃতি ও বামফ্রন্ট সরকার। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি, ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি (মার্কসবাদী)। পৃঃ ১
৩৩-৩৫. শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে ভাষার স্থান। তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ; পশ্চিমবঙ্গ সরকার পৃঃ ১, ৩, ৪
৩৬. ডিগ্রি কোর্সের প্রস্তাবিত নতুন প্যাটার্ন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। পৃঃ ১-৪
৩৭. সন্তোষকুমার মিত্র : কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রস্তাবিত নতুন পাঠক্রম প্রসঙ্গে আলোচনা। গণশক্তি। ১৩ জুলাই, ১৯৭৮। পৃঃ ২-৩
৩৮. প্রবোধচন্দ্র সেন : এই সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে। আনন্দবাজার পত্রিকা। ১২ মার্চ, ১৯৮১। পৃঃ ৪
৩৯. প্রবোধচন্দ্র সেন : শিশুশিক্ষার ভাষা — মাতৃভাষা। শিশুশিক্ষার ভাষা। পৃঃ ৬
৪০. ডঃ. নীহাররঞ্জন রায় : সভাপতির অভিভাষণ। নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন, ১৯৮০। পৃঃ ১৩-১৪
৪১, ৪২. ডঃ. নীহাররঞ্জন রায় : রাজনারায়ণই তবে কি বঙ্গবিজেতা? আনন্দবাজার পত্রিকা। ১৩ মার্চ, ১৯৮১। পৃঃ ৪, ৪
৪৩, ৪৪. রমাঁ রলাঁ : শিল্পীর নবজন্ম। সরোজকুমার দত্ত কর্তৃক অনূদিত। পৃঃ ৮৬, ৫১
৪৫. স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা। ৯ম। উদ্বোধন কার্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত। পৃঃ ১০৭
৪৬-৪৮. সত্যজিৎ চৌধুরী : স্নাতক স্তরে ভাষাশিক্ষা প্রসঙ্গে। পৃঃ ৫, ৩, ৭
৪৯. A Monitary Refutation. Published by Forum of Citizens for Education. p. 4
৫০-৫৩. অশোক মুখোপাধ্যায় : সবারে করি আহ্বান। পৃঃ ১৩, ৭, ১৩, ৭
৫৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : শিক্ষার বাহন। শিক্ষা। পৃঃ ১৪৯
৫৫. পূর্ববর্তী ১৪ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ১৩
৫৬. দ্বিজেন্দ্রলাল রায় : হাসির গান। অজিত কুমার ঘোষ সম্পাদিত দ্বিজেন্দ্র রচনাবলী। ২য়। পৃঃ ৯৭
৫৭-৫৯. পূর্ববর্তী ৫০ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ৪, ৪, ১৬
৬০. পূর্ববর্তী ৪৯ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ৬
৬১ ৬২. পূর্ববর্তী ৫০ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ১৭, ১৭
৬৩. হরিপদ চক্রবর্তী : স্নাতক পর্যায়ে সাহিত্য পাঠের যৌক্তিকতা। প্রসঙ্গ : ভাষা। পৃঃ ২৯
৬৪. অশোককুমার কুণ্ডু : ভাষা নিয়ে। প্রসঙ্গ : ভাষা। পৃঃ ১৮
৬৫. ভ. ই. লেনিন : জনশিক্ষা। পৃঃ ৭৬
৬৬. পূর্ববর্তী ৪০ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ৬
৬৭. ভবানী সেনগুপ্ত : মধ্যবিত্ত মৌচাকে ঢিল। যুগান্তর। ৫ মার্চ, ১৯৮১। পৃঃ ৪
৬৮. ভ. ই. লেনিন : প্রলেতারীয় সংস্কৃতি প্রসঙ্গে। জনশিক্ষা। পৃঃ ১১৬
৬৯. পূর্ববর্তী ৬ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ৬৪
৭০, ৭১. রামেন্দ্র-রচনাবলী। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস কর্তৃক সম্পাদিত। ৪র্থ। পৃঃ ৮০-৮১, ৮১
৭২, ৭৩. পূর্ববর্তী ৪৬ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ৫, ৫
৭৪. পূর্ববর্তী ৫০ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ২
৭৫. পূর্ববর্তী ৪১ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ৪
৭৬. সুখরঞ্জন মুখোপাধ্যায় : স্নাতক পর্যায়ে ভাষা শিক্ষা : আলোচনা। গণশক্তি। ২১ জুলাই, ১৯৭৮। পৃঃ ২
৭৭. লোকেন্দ্রনাথ পালিত : শিক্ষা-প্রণালী। সাধনা। মাঘ, ১২৯৯। পৃঃ ১৯৭
৭৮. পূর্ববর্তী ১৪ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ৮

৭৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : ভূমিকা, প্রমথ চৌধুরী রচিত 'প্রাচীন হিন্দুস্থান' (লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা —২)। পৃঃ /০-৵০
৮০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : শিক্ষার বিকিরণ। শিক্ষা। পৃঃ ২১৯-২০
৮১. সরকারী ভাষা কমিশনের রিপোর্ট (বঙ্গানুবাদ); ১৯৫৬। পৃঃ ৫৯
৮২ ৮৪. প্রবোধচন্দ্র সেন : রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা চিন্তা। পৃঃ ১১১-১৩, ১১৮, ১১৯
৮৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : আত্ম পরিচয়। পৃঃ ৯৮
৮৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ। শিক্ষা। পৃঃ ২০৮
৮৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : উপেক্ষিতা পল্লী। পল্লীপ্রকৃতি। পৃঃ ৮৪
৮৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : পল্লীসেবা। পল্লী-প্রকৃতি। পৃঃ ১১৩



১৯৩২ সালের ৯ ডিসেম্বর কলকাতায় লেখকের জন্ম। ১৯৪৮ সালে মাত্র ১৫ বছর বয়সে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সিটি কলেজে আই-এস-সি-তে ভর্তি হন। ছাত্রজীবনে তিনি বেআইনী কমিউনিস্ট পার্টির সংস্রবে এসে মার্কসবাদে দীক্ষিত হন। ফলে তাঁকে ঘরছাড়া হতে হয় এবং ছাত্রজীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে। বহুবার তিনি কারাবরণ করেন। পঞ্চাশের দশকে তিনি বিভিন্ন গণ-আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছেন, গোয়া মুক্তি অভিযানের সত্যাগ্রহী ছিলেন। বস্তীতে থেকে তিনি বস্তীবাসীদের সংগঠিত করেছেন, বস্তীর ছেলেমেয়েদের জন্য নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করেছেন। জীবন-ধারণের জন্য তিনি সংবাদপত্র বিক্রি করেছেন, সাইকেল রিক্‌সা চালিয়েছেন, কর্পোরেশনের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেছেন। ১৯৫৭ সালে তিনি প্রাইভেটে আই. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বিদ্যাসাগর কলেজে বাংলা অনার্স নিয়ে বি. এ.-তে ভর্তি হন। ১৯৫৯ সালে তিনি বি. এ. (অনার্স) ডিগ্রি নিয়ে কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের এম. এ.-র বাংলা ক্লাসে ভর্তি হন এবং ১৯৬১ সালে এম. এ. ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৬২ সালে তিনি ঘাটাল বিদ্যাসাগর হাই স্কুলে শিক্ষকতা করেন। ১৯৬৩ সাল থেকে ঘাটাল রবীন্দ্র শতবার্ষিকী মহাবিদ্যালয়ে শুরু হয় তাঁর অধ্যাপনা। এ সময়ে কমিউনিস্ট পার্টি বিভক্ত হয় এবং তিনি কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-র সমর্থক রূপে অধ্যাপক-আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৬৬ থেকে ১৯৭৩ সাল পর্যন্ত তিনি পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্য ছিলেন। সন্ত্রাসের রাজত্বে তাঁর ওপরে সশস্ত্র হামলা হয়। ১৯৭৪ সালে তিনি বেহালা কলেজ অব কমার্স-এর অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। তারপর থেকে তিনি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় গণজীবনকেন্দ্রিক গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখতে শুরু করেন এবং ১৯৭৮ সালে তিনি পি-এইচ. ডি. ডিগ্রি লাভ করেন। তাঁর কয়েকটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। তবে তিনি প্রধানত গণআন্দোলনের কর্মী—তাই লেখেন কম। তাঁর 'আধুনিক শিক্ষা ও মাতৃভাষা' গ্রন্থটিও গণসংগ্রামের প্রেরণা থেকে রচিত।